উত্তরসূরি ॥ দশম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৮৭ ।

কবি বিষ্ণু দে-কে কেন্দ্র ক'রে সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ। কবিতার ভাবনা নবম অধ্যায়ে বাংলাদেশের ষাটের কবিদের চিত্রকল্প আলোচনা। অরুণ ভট্টাচার্য, কল্যাণ সেনগুপ্ত, প্রদীপ [illegible], অশোক মহাপাত্রের কবিতা। কাব্যকাহিনী পর্যায়ে প্রাবন্ধিকের নতুন লেখা। পুস্তক পরিচয়।

উত্তরসূরি

সম্পাদক

অরুণ ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতীর বই

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

নারীর উক্তি

বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার, সম্বন্ধ, আদর্শ, ভদ্রতা, পাটেল-বিল, বঙ্গনারী— কঃ পন্থা ইত্যাদি নিবন্ধ। লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। মূল্য ৩.৫০ টাকা

মীরা দেবী

স্মৃতিকথা

কবিকন্যার এই স্মৃতিকথায় শুধু পারিবারিক স্মৃতিরসই উচ্ছলিত হয় নি—বিকশিত হয়ে উঠেছে তদানীন্তন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহের রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের জ্যোতিচ্ছটাও। অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্রসংবলিত। মূল্য ৯.০০ টাকা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে একটি বৃহৎ দেশ-কালের রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস। তৎকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের ইতিবৃত্ত।

মূল্য ১২.০০, শোভন ১৫.০০ টাকা।

শ্রীরানী চন্দ

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়। শিল্পগুরুর আত্মপ্রকৃতি, বিখ্যাত রঙিন চিত্র 'কালো মেয়ে', কুটুম-কাটামের তিনখানি প্রতিলিপি ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলংকৃত।

সচিত্র ১০.০০, শোভন ১২.০০ টাকা।

মণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত

শিল্প-শিক্ষার্থী এবং শিল্প-জিজ্ঞাসুদের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। গ্রন্থটি চার ভাগে বিভক্ত: ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, ভারতীয় চিত্রকলা, বহির্ভারতের শিল্পের ইতিহাস এবং সমসাময়িক চিত্রকলা ও অবনীন্দ্র-যুগ। ভ্রমণার্থীদের সহায়ক-গ্রন্থরূপে ব্যবহারের উপযোগী। মূল্য ২০.০০, শোভন ২৪.০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭

বিক্রয়কেন্দ্র: ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

বহু-প্রতিক্ষীত গ্রন্থ

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস

অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পর্কে অধ্যাপক অমলেন্দু বসু বলেছেন 'thoughtfully planned sensitive and rewarding'; ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডিরেক্টর ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত জানিয়েছেন 'এতদিনে ইংরেজী সাহিত্য বাঙ্গালীর ঘরে এলো'। কবি আলোক সরকার বলেছেন 'শেকস্‌পীয়ার এবং রোমান্টিক কবিদের উপর আলোচনা মনে পড়ছে। যে পাঠক একবার এই বই শুরু করবেন সহজে ছেড়ে উঠতে পারবেন না', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান ড অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন 'আপনার বই· মৌলিক গ্রন্থের মর্য্যাদা লাভ করবে'। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন· 'এ কাজ আপনার মত কবি-প্রাবন্ধিকের পক্ষে অনেক সহজতর'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার গুরুদাস অধ্যাপক ড ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন· 'আপনার বইটি পড়ছি। পরিচ্ছন্ন ছাপা, তথ্যনিষ্ঠ, চিত্তাগ্রাহী, স্ববেদী আলোচনা'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান কবি-অধ্যাপক ড. জগন্নাথ চক্রবর্তী কলকাতা বেতারে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। প্রবীনতম কবি-দার্শনিক অমিয় চক্রবর্তী নিউইয়র্ক থেকে লিখেছেন· 'আপনার উৎকৃষ্ট ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটি যেটুকু উল্টে দেখেছি খুবই মনে লেগেছে—জ্ঞান ও লাবণ্যের সমন্বয় ঘটেছে আপনার ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক আলোচনায়।···বাংলায় এর উচ্চমানের স্থান হবে।···আপনি খুব একটা ভালো বই বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন।'

প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা, বহু মূল্যবান ছবি, নির্দেশিকা, সুদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী ও তালিকা-সমন্বিত 'রেফারেন্স' বইটি আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখুন। টা. ৪৫·০০

উত্তরসূরি প্রকাশনী · ৯বি-৮ কে. সি. ঘোষ রোড কলকাতা ৫০
ইণ্ডিয়ানা : ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

New Oxford Titles in Indian History & Culture

JOHN PEMBLE
The Raj, The Indian Mutiny, and the Kingdom of Oudh : 1801–59 Rs 48

PARSHOTAM MEHRA
The North Eastern Frontier
A Documentary Study of the Internecine Rivalry between India, Tibet and China
Volume 1, 1906–14 Rs 50

EDWARD THOMPSON
The Making of the Indian Princes Rs 75

HUGH TINKER
The Ordeal of Love
C F Andrews and India Rs 90

D E U BAKER
Changing Political Leadership in an Indian Province :
The Central Provinces and Berar 1919-1939 Rs 60

STEN NILSSON
The New Capitals of India, Pakistan and Bangladesh Rs 60

B R NANDA, P C JOSHI, RAJ KRISHNA
Gandhi & Nehru Rs 14

Oxford University Press
P-17 Mission Row Extension
Calcutta 700013
DELHI BOMBAY MADRAS

Drs. M. L. Kothari and L. A. Mehta

CANCER

Myths and Realities of Cause and Cure

No disease in modern history has captured the imagination and fear as cancer has.

This is a book intended for both—lay and the learned—and for all who wish to know about its cause and cure

[Rs 45 00]

Rupa & Co

15 BANKIM CHATTERJEE STREET CALCUTTA 73
Also at—ALLAHABAD BOMBAY NEW DELHI

শ্রীমতী এলেন রায়ের জীবন-কথা

● জন্ম ফ্রান্সে, শিক্ষা জার্মানীতে, সেখানেই কম্যুনিজ্‌মে হাতেখড়ি এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ● হিটলারের অভ্যুত্থান মুহূর্তে আত্মগোপনকারী সহকর্মীদের মিলনকেন্দ্র স্থাপন ● রায়ের কারামুক্তির পর ভারতে আগমন ● র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ ● রায়ের মৃত্যুর পর আন্দোলনের পরিচালনাভার গ্রহণ ● আততায়ীর হাতে মৃত্যু।

THE WORLD HER VILLAGE

সম্পাদনা : শিবনারায়ণ রায় ॥ প্রকাশনা ' আনন্দ পাবলিশার্স

প্রয়োজনীয় টীকাসহ সম্পাদকের সুদীর্ঘ ভূমিকা, আত্মীয়বন্ধুদের মূল্যবান আলোচনা, এলেন হত্যা মামলার প্রতিবেদন, এলেনের কিছু স্বনির্বাচিত চিঠি এবং রচনা, একটি পরিশিষ্ট এই অনন্য স্মারক গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৭৬। মূল্য ৫০'০০ টাকা। 'উত্তরসূরী'র গ্রাহকদের জন্য ২০% কমিশন

উত্তরসূরী ॥ ৯বি-৮, কালীচরণ ঘোষ রোড। কলিকাতা ৫০

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কয়েকটি বাংলা বই

গঠনসম্পর্কীয় ভূবিদ্যা	ডঃ সুবীরকুমার ঘোষ	১৯·৬০
পুরাজীববিদ্যা	ডঃ শুভেন্দু কুমার বক্‌শী	১৯·০০
প্রযুক্তি সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা	পতাকী কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১২·০০
আধুনিক প্রস্তরবিদ্যা	ডঃ অনিরুদ্ধ দে	১২·০০
ভারতের খনিজ সম্পদ	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১২·০০
জ্যামিতীয় আলোকবিজ্ঞান	অরবিন্দ নাগ	১৯ ০০
তাপগতিতত্ত্ব	অশোককুমার ঘোষ	২৪ ০০
পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা	ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
আলোকের সমবর্তন	সুহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২ ০০
সমাজতত্ত্ব (২য় সং)	পরিমলভূষণ কর	১৫·০০
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (২য় সং)	ডঃ সুনীল রায়চৌধুরী	১৬·০০
রাষ্ট্রসংঘ	শেখর ঘোষ	১২·০০
খাদ্য ও পথ্য	ডঃ সমর রায়চৌধুরী	১৫·০০
পরিপাক, বিপাক ও পুষ্টি	দেবজ্যোতি দাশ	৩০·০০
ভ্রূণবিদ্যা	ডঃ কমলকুমার দাস	৯ ০০
সাইটোলজি	শ্রীমতী সুহিতা গুহ	১৮ ০০
মৌলিক কৃষিবিজ্ঞান	বলাইলাল জানা	১৪ ০০

কার্যালয় : ৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

উত্তরসূরি। ১০৩তম। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৬। ২৬বর্ষ ৩য়সংখ্যা

●

প্রবন্ধাবলী

কবিতাবলী

কবিতা কবিতা

পুস্তক পরিচয়

●

সম্পাদক . অরুণ ভট্টাচার্য

কার্যালয় : ৭বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড কলিকাতা ৭০০ ০৫০

With Best Compliments of :

THE ALKALI AND CHEMICAL CORPORATION OF INDIA LTD.

CALCUTTA ● BOMBAY ● MADRAS ● NEW DELHI

উত্তরসূরি’র নিয়মাবলী

১. কপি রেখে লেখা পাঠান প্রয়োজন। লেখা হারিয়ে গেলে উত্তরসূরি কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

২. লেখা ভালো লাগলেই প্রকাশিত হবে। সব সময় সকল চিঠি দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। আশা করি এ জন্য কোন নবীন লেখক দুঃখ বোধ করবেন না।

৩. শতকরা ২৫% এজেন্সী কমিশন। একসঙ্গে ৫ বা ততোধিক কপি নিলেই কমিশন দেওয়া হয়।

৪. উত্তরসূরির বহুল প্রচারের অর্থ রাজনীতি-বর্জিত, দক্ষিণ-বাম বর্জিত, শুদ্ধ মানবিকতা-ভিত্তিক সাহিত্য প্রচেষ্টার ব্যাপ্তি।

কার্যালয় : ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড কলকাতা ৫০

পত্র-দর্পণে সুধীন্দ্রনাথ ও কিছু প্রাসঙ্গিকতা

সলিলকান্তি দাশগুপ্ত

১ প্রস্তাবনা

আত্মপ্রকাশের যতগুলি লেখনি-মাধ্যম আছে, ব্যক্তিগত পত্র হয়ত তাদের সবগুলির মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর, প্রত্যক্ষ এবং সাবলীল। এই বিশেষণগুলি কিছুকাল আগেও ছিল কবিতার সামান্য লক্ষণ, কিন্তু কবিতা রচনা যেহেতু একটি অনুশীলন—সাপেক্ষ মনন-প্রক্রিয়া, এবং এর ক্রমিক উৎকর্ষ কবির শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং চিন্তন-সাপেক্ষ, তাই একে প্রত্যক্ষ এবং সাবলীল বলাটা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পক্ষে কোনোদিন সম্ভব হয় নি। সেইজন্যই দীর্ঘ বত্রিশ বছর (১৯২৮-৬০) যাবৎ প্রয়াত কবি সুধীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে যে একান্নখানি ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন, সেগুলি থেকে পত্রলেখকের এমন কিছুটা অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া গেছে, যে ঘরোয়া মেজাজ তাঁর কবিতায় এবং প্রবন্ধে স্বভাবতঃই অবিদ্যমান। অথচ কোথাও ছন্দপতন ঘটে নি, নেমে আসে নি সহজিয়া প্রগল্‌ভতা।

এই চিঠিগুলিকে একত্রে সংকলিত[১] করে এবং সুষ্ঠু সম্পাদনা ও তথ্যবিন্যাসের গুণে শ্রীঅরুণ সেন রাজনীতি ও ইতিহাস-সচেতন সাহিত্য-প্রেমিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। কারণ পত্রাবলীর পরিচিতি এবং প্রাসঙ্গিকতার স্বল্প পরিসরেও তিনি সমসাময়িক রাজনীতি এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ নিয়ে যথাসম্ভব ব্যাপক আলোচনা করেছেন। সংকলন-গ্রন্থটির

ভূমিকা ("দুই বন্ধু, দুই কবি") ও পত্র পরিচিতি ("চিঠি প্রসঙ্গে") রচনায় শ্রীসেন সম্পাদনার যে উন্নত ও মার্জিত মানের প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেটি আলোচনা-সাহিত্যে একটি অনুশীলনযোগ্য সংযোজন। তাঁর ভাষা মূলত ধ্রুপদী হ'য়েও বিস্ময়করভাবে নমনীয়, সাংবাদিক-সুলভ তথ্য-পরিবেশনেও তাঁর উপস্থাপনা বাহুল্য-ভাবাক্রান্ত নয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যাদর্শ বিষয়ক বিতর্কের অবতারণাতেও তাঁর বক্তব্য বিনীত সৌকুমার্যের প্রসাদযুক্ত। তাছাড়া, দুই কবির কাব্যজিজ্ঞাসা ও কাব্যানুশীলনের তুলনামূলক আলোচনার সূত্রে পাওয়া গেল মহা-মূল্যবান একটি উপরিপাওনা—"দুই কবি, দুই প্রস্থান"—এর মতো একটি রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধ, ভাব-সংহতি, উপলব্ধি ও প্রকাশরীতির সার্থক সমন্বয়ে যা অসাধারণ।

নবতর উক্তি ও উপলব্ধির সাধনায় রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির সচেতন প্রচেষ্টা এবং এলিঅট প্রবর্তিত নৈর্ব্যক্তিকতার সাধারণ্যে উভয়ের প্রাথমিক সাযুজ্য ধীরে ধীরে দু'টি ভিন্ন কাব্যাদর্শে উত্তরিত হ'ল। "বিষ্ণু দে এলিঅটের সাহিত্যিক আত্মসচেতনতাকে ছাড়িয়ে অনিবার্যভাবে প্রবেশ করলেন মার্কসের বিশ্বজাগতিক আত্মসচেতনতায়, সঙ্গে নিয়ে এলিঅটী আধুনিকতার প্রকরণ অভিজ্ঞতা। আর সুধীন্দ্রনাথ এলিঅট-প্রচারিত নৈর্ব্যক্তিকতাকে ক্রমশই পেতে চাইলেন যেন প্রকরণের অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতায় যা হয়ে ওঠে প্রকরণেরই সার্বভৌমতা।" (পৃঃ ১২৮—১২৯)। দুই কবির কাব্য স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এটি একটি অবশ্যমান্য মূল সূত্র।

যে 'আত্মসচেতনতা'তে এলিঅটের সাহিত্যচিন্তা এবং মার্কসের সমাজচিন্তার সাধারণ্য, তাকেই হয়ত বলা চলে ব্যক্তিস্বরূপ, আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্গে যার ব্যবধান মৌলিক এবং অপরিমেয়। সেইজন্যই বিষ্ণু দে-র পক্ষে প্রয়োজন আত্ম-সচেতনতাকে 'সাহিত্যিক' স্তর থেকে 'মার্কসীয়' স্তরে উন্নীত করা, পক্ষান্তরে সুধীন্দ্রনাথের কাছে অপরিহার্য হ'য়ে ওঠে রোমান্টিক কাব্যময়তা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তর থেকে নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতায় উত্তরণের সাধনা, কারণ আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভাববিলাস উভয়ই আত্মসচেতনতা তথা ব্যক্তিস্বরূপের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। এই নৈরাত্ম্য-সাধনায় তিনি যে শুধু 'তন্বী'র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রোমান্টিকতাকে 'অর্কেস্ট্রা'র নাম কবিতায় নৈর্ব্যক্তিক নির্বেদে

উত্তরিত করলেন তাই নয়, লোকায়ত ও লোকোত্তরের আদর্শগত ভাব-সমন্বয় ঘটালেন 'উট পাখী'র অব্যর্থ প্রতীকে। এই ধারাটিরই সার্থকতর উত্তরণ ঘটল সমসাময়িক ইতিহাসের কার্যকারণ শৃঙ্খলার সাহায্যে ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলার 'সংবর্ত'-কালীন বিশ্ববীক্ষায়। ফলে তাঁর এই পর্বের কবিতায় পাওয়া গেল,—যেমন দেখিয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,—দুর্নিবারতা আর নৈর্ব্যক্তিকতা, এবং সেই সঙ্গে দুই ধরণের সদর্থক বিষাদ—কাব্যিক ও সামাজিক। কাব্যিক বিষাদের কারণ রোমান্টিকতা ও অমৃতত্বের প্রাথমিক তৃষ্ণার প্রতি তাঁর চেষ্টাকৃত বিরূপতা, সামাজিক বিষাদ আসন্ন সংবর্তের করাল ছায়ায় ধ্রুপদী মূল্যবোধগুলির প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায়। 'জেসন' এবং 'সংবর্ত'র নাম কবিতা এই দুই ধারার দুই মুখ্য প্রতিনিধি। এই বিষাদ কাপুরুষের দুঃখ-বিলাস নয়, রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠে কঠিন সত্যকে আবিষ্কার করার প্রজ্ঞালব্ধ বেদনা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা নয়, নঙর্থক নয়, সদর্থক, মাইকেলী-আত্মবিলাপে নয়, এই সদর্থক বিষাদের পরিচয় পাওয়া যাবে বুদ্ধদেব বসুর নাট্যকাব্য 'প্রথমপার্থ'র কর্ণের অন্তিম সংকল্পের নিরহঙ্কার বিশুদ্ধতায়। ইতিহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সভ্যতার প্রতিটি বাঁক বদলে এই সদর্থক বিষাদের সাক্ষাৎ মেলে। সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে উভয়েই কালান্তরের উপলব্ধিকে স্ব স্ব কাব্যচেতনায় রূপায়িত ক'রেছেন, অবশ্য দু'টি বিপরীত অবস্থান থেকে। সভ্যতার কোনো পর্যায়ই অবিমিশ্রভাবে সু অথবা কু নয়, এবং এঁরা উভয়েই দু'টি ভিন্ন আদর্শের শ্রেয়-বোধেরই ধারক, বিকৃতির প্রচারক নন। তাই ইতিহাসের অন্তর্লীন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় এঁরা উভয়েই শ্রদ্ধেয়। সেইজন্যই কাব্যজিজ্ঞাসা এবং সমাজ-চেতনা কোনো দিক থেকেই একথা মেনে নেওয়া যায় না যে, "যে অস্মিতাবোধ থেকে নৈর্ব্যক্তিকতার কাব্যসচেতনতা সত্ত্বেও তিনি 'ব্যক্তি চিত্রকে জগচ্চিত্র' ভাবেন, অথচ রূপ-সাধনার নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জনের বৈপরীত্যে ক্লিষ্ট হন, সেই বোধই তাঁকে নিয়ে যায় নৈঃসঙ্গ্যে এবং ব্যক্তি-নির্ভর যুক্তিবাদের দুর্বল আশ্রয়ে, যে কোনো রকম সামাজিক চেতনার প্রতি ঘোর অনীহায়।"

একথা মিথ্যা নয় যে 'তন্বী' থেকে 'উত্তর ফাল্গুনী' পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতি সমাজচেতনার বাহক নয়, মুখ্যত কাব্যজিজ্ঞাসারই নানা অভিব্যক্তি,

কিন্তু এক 'সংবর্ত'-তেই সব ঘাটতির সম্পূরণ ঘটেও এমন কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেছে, যা সাম্প্রতিক সমাজচেতনাতেও অনিবার্যভাবে প্রসাবিত। 'সংবর্ত' সমাজ-অনীহা, নিশ্চেতনা বা নির্জনতার কাব্য নয়, দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী-কালীন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ-সচেতন বিশ্ববীক্ষার ব্যক্তি-রূপায়নেই এব সার্থকতা।

বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, প্রয়াত প্রাপকের প্রাক্তন ভাণ্ডাব থেকে সেগুলিব কোনোটিকেই পাওয়া যায় নি। বিষ্ণু দে পক্ষান্তরে, প্রাপ্ত চিঠিগুলি সযত্নে সংরক্ষা করেছিলেন বলেই, শুধুমাত্র সেগুলিই সঙ্কলিত হ'তে পেরেছে। সম্পাদক এমতাবস্থায় সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পবে তাঁর স্মৃতিব উদ্দেশ্যে বচিত বিষ্ণু দে-র অনন্য শোকগাথাটিকেই গ্রন্থ প্রচ্ছদে মুদ্রিত ক'রেছেন। "বন্ধুস্মৃতি: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত" কবিতাটি বিষ্ণু দে-কৃত সুধীন্দ্র-সাহিত্যেব অতি সংহত সামগ্রিক মূল্যায়নও বটে। ঐ কবিতাটির বাক্যাংশ-বিশেষই গ্রন্থটির নাম হিসাবে ব্যবহৃত। "মনে কবো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর/অন্যে বাক্য কবে, তুমি রইবে নিরুত্তব।" রামমোহনের এই উক্তি অন্তত আলোচ্য সঙ্কলনটির ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত। কাবণ লোকান্তরিত সুধীন্দ্রনাথই এখানে একক বক্তা, আর তাঁর জীবিত প্রতিপক্ষ নিজ জীবনের 'প্রৌঢ় এই বদ্বীপ' কে মুখবিত করেছেন 'আকৈশোর বন্ধুস্মৃতি'র উদ্দেশ্যে নীবব নমস্কার নিবেদনে। সুধীন্দ্রনাথকে লেখা বিষ্ণু দে-ব ব্যক্তিগত মৈত্রী ও আদর্শগত মনান্তরেব বার্তাবহ চিঠিগুলিকে খুঁজে না পাওয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব পক্ষে অঘটন বৈকি। কিন্তু সেই অঘটনেব উপস্থাপনাও যে কতটা নান্দনিক হ'য়ে উঠতে পারে, তাবই একটি সার্থক দৃষ্টান্ত রয়েছে অরুণ সেন সম্পাদিত 'এই মৈত্রী। এই মনান্তব।' গ্রন্থে।

২ পত্র দর্পণে সুধীন্দ্রনাথ

সঙ্কলিত পত্রগুলির বক্তব্যকে পাঠকের সুবিধার্থে মোট দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—মৈত্রী ও মতান্তব। মৈত্রীর ভিত্তি বিষ্ণু দে-ব প্রতিভার প্রতি সুধীন্দ্রনাথেব গুণগ্রাহিতা,—এবং মতান্তরেব মূল কারণ সাহিত্যাদর্শ এবং রাষ্ট্রাদর্শ বিষয়ে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা।

অনুজ কবি বিষ্ণু দে সম্পর্কে অগ্রজ সুধীন্দ্রনাথের আন্তরিক গুণগ্রাহিতার নিদর্শন হিসাবে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি স্মর্তব্য

ক "আপনার মত আমি সব সময়ই শ্রদ্ধাব সঙ্গে শুনতে চাই, কারণ আপনার বুদ্ধিব উপর আমার আস্থা আছে।" (১৯৩১, পৃ. ৪৭)

খ "বলাই বাহুল্য আমি আপনার কাব্য বিবেচনাকে শ্রদ্ধা কবি, আপনার বিচার থেকে আত্ম সংশোধন করতে পারবো, এই আশাতেই আপনাকে সমালোচনা করাব জন্যে অনুরোধ করছি।" (৯ ৯ ৩৫, পৃ ৫৬)

গ "আপনার বুদ্ধিব স্বাভাবিক প্রাখর্য ও আপনার অধীত বিদ্যার ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমাব এতটুকুও সংশয় নেই।" (২০. ১১ ৩৫, পৃ. ৫৮)

ঘ. "আপনার সৃজনীশক্তি সত্যই বিস্ময়কর, এবং অন্তত আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। এ দিক থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়।" (১৭ ১০ ৫৩)

ঙ "আপনার সৃজনীশক্তির প্রাচুর্য সত্যিই বিস্ময়কর। ['হে বিদেশী ফুল'-এর অধিকাংশ কবিতাই] আপনার বিরাট পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।" (৩০ ১০. ৫৬, পৃ ৯৮)

চ. [বিষ্ণু দে-র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রস্তাবিত] "সম্বর্ধনা পুস্তকে ··· আমার লেখাটা গেলে আমারই গৌরব বাড়বে।" (২০ ৮. ৫৯, পৃ ৯৯)

বিষ্ণু দে-র 'তেপাটি' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমি যেহেতু সাহিত্যের অবৈকল্য আর জীবনের সত্যতা সমপর্যায়ের বলে ভাবি না, তাই আমার পক্ষে কবিতার Formalness দোষের নয়। কিন্তু আপনার ধর্ম তো অন্য ধরণের।" (১২ ৩. ৩৩, পৃ. ৫১)। যে অনেকান্তবাদে সুধীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধে প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন, তারই প্রয়োগ এখানে পাওয়া গেল। তাঁর বিচারে বিষ্ণু দে মূলত প্রেরণাবাদী। সে প্রেরণাস্থল অন্তর্লোক, না কি বহির্লোকের নিপীড়িত জনগণ, অথবা এতদুভয়ের সমবায়ে স্বতোৎসারিত এক অবিভাজ্য অদ্বয়, সে প্রশ্নও হয়ত সুধীন্দ্রনাথের বিচারে গৌণ। তাই 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, "বর্তমান গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আমার পূর্ব পরিচিত, কিন্তু সেগুলিকে একত্রে পেয়েই বুঝলুম আপনার প্রেরণা কত স্বচ্ছন্দ, ·····কিন্তু আমার স্বভাব যেহেতু বিপরীত, তাই আপনার কাব্যাদর্শ আজও আমার কাছে অল্পবিস্তর অস্পষ্ট;

এবং বুঝিবা সেই কারণেই এখনও আমার মনে হয় যেন আপনার পদ্ধতি ও প্রসঙ্গের মধ্যে কোথায় একটা বিবাদ আছে।" (১৭ ১০ ৫৩, পৃ ৮৪)

কারণ গৌণতঃ "নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দেখেও, আপনি কবিতা লেখার সময়ে যুক্তির সাধারণ্য ছেড়ে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের আশ্রয় নেন ......" (ঐ), এবং মুখ্যতঃ "আপনার রচনারীতি যতটা সঞ্চারী, আপনার বক্তব্য ততখানি পরিণামী নয়।" (পৃঃ ৮৫)

সুধীন্দ্রীয় কাব্যবিচারের একটি মূলসূত্র হয়ত এখানে প্রাপ্তব্য, বিশেষত 'সংবর্ত' পর্বে, কবির ব্যক্তিগত চেতনা যেখানে যুক্তির সাধারণ্যে একটি বিশেষ যুগের ও মূল্যবোধের পরিচয়বাহী।

অনেকান্তবাদে (Pluralism) প্রত্যয় ছিল বলেই সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র কাব্য-বিচারে রাজনৈতিক মতান্তরকেও গৌণ ক'রে দেখতে সম্মত ছিলেন। 'বনস্পতি' তে 'দিউগাস্‌ভিলি' (স্ট্যালিন) উপমান কি উপমেয় সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেই তিনি ক্ষান্ত হ'য়েছেন (পত্রসংখ্যা ৩৮ ও ৩৯, অক্টোবর ১৯৫৩), স্ট্যালিনতন্ত্রের সোচ্চার সমালোচক হ'য়েও আদৌ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি যে কবিতাটিতে ('কালের রাখাল শিশু: ২১শে ডিসেম্বর') প্রকটিত এবম্বিধ স্ট্যালিন-ভক্তি স্ট্যালিন-বিরোধীদের কাছে রাজনৈতিক কারণেই গ্রাহ্য হবার অযোগ্য কিনা। 'উপমা উপমানের স্থান বিপর্যয়ে' 'যুক্তির সাধারণ্য' বিপর্যস্ত না হলে সুধীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে দিউগাস্‌ভিলিকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে তাঁর বিনীত মন্তব্য: "আপনি যদি প্রসঙ্গের স্বায়ত্তশাসন মেনে নিয়ে প্রকরণের স্বৈরাচার নির্দয়ে নিবারণ করেন, তাহ'লে আপনার কাব্য ধর্মাধর্ম নির্বিচারে পাঠক সাধারণের সমর্থন পাবে। (পৃঃ ৮৯)।

কারণ "স্বভাব তথা সংস্কৃতির বাইরে হ'লেও 'এলিঅটের খৃষ্টানি' কে যখন তিনি সাময়িকভাবে সাহিত্যে শিরোধার্য করতে পেরেছেন, তখন বিষ্ণু দে-র সাম্যবাদই বা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য হবে কেন? (পৃঃ ৮৯ দ্র.)

সুধীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানতেন যে খ্রীষ্টীয় বা মার্কসীয় কোনো নির্দেশ্যবাদী সাহিত্যাদর্শেই প্রসঙ্গের স্বায়ত্তশাসন এবং যুক্তির সাধারণ্য নীতি হিসাবে গ্রাহ্য হ'তে পারে না। পক্ষান্তরে, এই দু'টি আদর্শেই সম্ভবত অনেকান্ত বস্তুবাদের সার্থকতা।

'নয়' (Thesis) এবং 'প্রতিনয়' (Antithesis) পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ে উত্তরিত হয়—সমাজ-প্রগতির এই সূত্রটি থেকে মধ্যপন্থার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বই কি স্বতঃসিদ্ধ নয়? ত্রিশ সংখ্যক পত্রে কমিউনিস্ট মতাদর্শে চালিত সাহিত্যপত্র' সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

" কাগজখানির সমষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি স্বভাবতই বঞ্চিত। কোনো কোনো প্রবন্ধের পোলেমিকাল উগ্রতা আমাকে অল্পবিস্তর পীড়া দেয়, যদিও বুঝি যে গোলডন্ মিনের চর্চা অ্যারিস্টটেলীয় যুগের মতোই বর্তমানেও অসম্ভব।' (২৮.১০.৪৮-৫০, পৃ. ৭৭)। 'সাহিত্যপত্র'র লেখকগোষ্ঠীতে যাতে সুধীন্দ্রনাথ যোগ দেন এ বিষয়ে বিষ্ণু দে-র আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সচেতনভাবে নিরুৎসাহী। কারণ, "একথা নিশ্চয়ই কপোলকল্পিত নয় যে 'সাহিত্যপত্র' শুধু মার্কস্ নয়, স্টালিনের প্রতিও আস্থাবান। এবং আমার স্টালিন-বিদ্বেষ বরাবর উগ্র।" (৩১ ৭. ৫৬, পৃঃ ৯৭) অথচ একদা 'গোল্ডেন মিন'এর উৎসাহী পথিক ছিলেন বলেই, কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা যখন প্রগতি লেখক সংঘ'কে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির ছদ্মবেশীর রূপ বলে বর্ণনা করছে তখন সুধীন্দ্রনাথ উক্ত সংঘের পঞ্চ সভাপতির অন্যতমই শুধু নন, বাংলায় তখন তাঁর সম্পাদিত "পরিচয়'ই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রগতি আন্দোলনের মুখপত্র।" [হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'স্বদেশ-জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৬০]। এ ছাড়াও, "মার্কস্‌বাদকে সাধ্যমত জানতে, বুঝতে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা উৎসুক হয়েছিল, 'পরিচয়' শুধু তাদের সুযোগ দেওয়া নয়, সমাদরও করেছে। রাজনৈতিক বন্দী শিবিরে 'পরিচয়' তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত হ'ত।" (ঐ, পৃঃ ১১২)

ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং বহুত্ববাদে যাঁরা আস্থাশীল, তাঁরা অপর ব্যক্তির ভিন্ন চিন্তার সঙ্গে, এমন কি একত্ববাদী (Monistic) চিন্তার সঙ্গে, দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানে সম্মত এবং সেই সঙ্গে আনন্দিতও। বৃহত্তর সভ্যতার সংকটে সাধারণ মূল্য-বোধগুলির সংরক্ষণে একত্রে ব্রতী হওয়ার মতো অভিন্ন সমভূমিও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভিন্ন চিন্তকদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। বিশেষত সুধীন্দ্র-সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর নির্দিষ্ট কোনো অম্বিষ্ট ছিল না বলেই, কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের জন্যও সেখানে সম্মানজনক স্থান ছিল। কিন্তু মার্কসীয় আদর্শের ধারক 'সাহিত্য-

পত্র'য় সুধীন্দ্রনাথের মতো মার্কস্‌বাদ-বিরোধীর স্থান হবে কোন্ যুক্তিতে? তা ছাড়া অভিজ্ঞতা যে কোন গ্রহিষ্ণু মানুষকেই পরিণততর করে তোলে। '১৯৪৫'-এ স্ট্যালিন-বিরোধী যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন "অন্তত রুষ বাহিনী বন্যাবেগে/ কবলিত করে শোষিত দেশের মাটি" এবং তারই ফলশ্রুতিতে পূর্ব ইউরোপের নির্বিপ্লব কমিউনিস্ট-ভবন, তিনি যে ত্রিশের দশক অপেক্ষা পঞ্চাশের দশকে ফলিত মার্কস্‌বাদের প্রতি অধিকতর বিগতস্পৃহ হবেন এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, এবং সেই জন্যই তাঁর হতাশাব্যঞ্জক স্পষ্টোক্তি—"দুই অন্যোন্য-বিরোধী মতের ঐক্য আমার বিবেচনায় অসম্ভব।" (৩১ ৩ ৫৬, পৃঃ ৯.)। 'সাহিত্যপত্র' প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র ঔদার্য এবং সুধীন্দ্রনাথের রাজনীতি-সচেতনতা উভয়ই আনন্দদায়ক।

এর বহু আগেই রাষ্ট্রাদর্শগত মতান্তর উপলক্ষে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আসলে আমাকে 'লস্ট লীডর' বলে আপনি যে সম্মান দিতে চেয়েছেন, তা আমার প্রাপ্যই নয়। কারণ আমার পাঠকমাত্রেই জানেন যে আমি আজীবন প্রগতি পরিপন্থী।" (১ ৬. ৪১, পৃঃ ৬৭-৬৮)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, পূর্ব-ইউরোপের কমিউনিস্ট-ভবন, ভারতের স্বাধীনতা ও বিভক্তি এবং লালচীনের অভ্যুদয়ের পরেও তিনি স্বধর্মই শ্রেয় জ্ঞান করছেন, "আমার প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রনীতিই আপনার আমার মধ্যে অন্যতম বাধা।" (২৮. ১০ ৫৩-পৃঃ ৮৯)। নিজেকে প্রগতি-পরিপন্থী এবং প্রতি-বিপ্লবী বলা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়, প্রতিপক্ষ যখন প্রগতিক জীবন-চেতনা এবং মার্কস্‌বাদী ধ্যানধারণাকে সমার্থক বিবেচনা করেছেন।

বত্রিশ নং পত্রে 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে বিষ্ণু দে র উদ্ধৃত প্রামাণিক উক্তিগুলির অধিকাংশই যদিও সুধীন্দ্রনাথের বিবেচনায় "স্বতঃসিদ্ধ নয়, কোনো কোনোটা আবার বাগাড়ম্বর মাত্র", তবু দলীয় মনোভাব তথা বালসুলভ অতিশয়োক্তি বাদ দিয়েও যে বামপন্থী আলোচনা সম্ভব, তা বোধ হয়" বিষ্ণু দে ই "প্রথম দেখালেন অন্তত বাংলাদেশে।" গ্রন্থকার এই প্রশংসাবাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যমণ্ডিত বাস্তবতাবোধ: "অবশ্য সেই জন্যেই বর্তমান গ্রন্থ বামাচারীরা হয়তো পড়বেন না, অথবা পড়ার শেষে জানতে চাইবেন আপনার সাহিত্যাদর্শে সাম্যবাদের স্বাক্ষর কোথায়।" লক্ষ্য করেছেন। হয়ত এজন্যই "বইখানি তাঁদেরই বিশেষ ক'রে পাঠ্য" (১৯৫২-৫৩, পৃ. ৭৯)।

ভারতের মত বহুত্ববাদী দেশে,—আলোচনা, প্রত্যালোচনা, বাদ, প্রতিবাদ যেখানে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ, সেখানে বিষ্ণু দে-র সাহিত্যাদর্শ বিষয়ে উগ্র বামপন্থীরা যদি অবহিত না হন, তাতেও অদীক্ষিত জনসাধারণ এবং ব্যক্তিগতভাবে বিষ্ণু দে-র প্রত্যক্ষ ক্ষতির আশংকা নেই, পক্ষান্তরে, তাঁর সুস্থ আলোচনা থেকে ভিন্ন মতাবলম্বীরাও, যদি তাঁরা প্রকৃতই বুদ্ধিমান ও গ্রহিষ্ণু হন, ইচ্ছা করলে উপকৃত হ'তে পারেন। কিন্তু তথাকথিত কমিউনিস্ট দেশগুলির একত্ববাদী পরিমণ্ডলে "দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ" এবং "বামপন্থী হঠকারিতা", যখন যে ক্ষমতাসীন থাকে, প্রতিপক্ষের কণ্ঠরোধকেই প্রগতির পথ সংক্ষেপের প্রাক্‌শর্ত হিসাবে বিবেচনা করে।

উদাহরণস্বরূপ চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের কিছু ঘটনা স্মরণ করি। চীনা সাহিত্যিক হু ফেং চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর শিল্প বিষয়ক ইয়েনান ভাষণের (১৯৪২) জঙ্গী বক্তব্যের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ১৯৫৪য় 'তিন লক্ষ অক্ষরের' একটি বিকল্প সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব পেশ করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে ফং শিয়ে ফং, ছেন চি সিয়া এবং তিং লিং চারটি 'প্রতিক্রিয়াশীল' দাবী উত্থাপন করার দণ্ড হিসাবে নিজেদের সাহিত্যজীবনের পরিসমাপ্তি ডেকে এনেছিলেন। এই দাবীগুলি ছিল
ক বর্তমান চীনা সাহিত্যের তুলনায় অতীতের চীনা সাহিত্য ছিল উৎকৃষ্ট, কারণ সেখানে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ছিল বর্তমানের চেয়ে বেশি। খ পেশাদার সাহিত্যিকদের এবং সাহিত্য-বিশেষজ্ঞদের অ-সাহিত্যিক ও সাহিত্য ব্যাপারে অশিক্ষিত পার্টি নেতারা পরিচালনা করতে পারেন না; গ সাহিত্য শুধুমাত্র শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকের সেবায় নিয়োজিত হবে—এই আদর্শ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট, সাহিত্যের ক্ষেত্র হবে প্রশস্ততর। (ঘ) সত্যের প্রতিফলন হ'লো সাহিত্যের ধর্ম, অর্থাৎ জনগণের ভালো দিকটার সঙ্গে অন্ধকার দুর্বল দিকটিকেও তুলে ধরতে হবে। 'শতপুষ্প বিকশিত হোক' নীতিতে উৎসাহিত হ'য়ে ১৯৬১ সালে চৌ ইয়াং, লিন মো হান, তেং তো প্রমুখ সাহিত্যিকরা 'ওয়েন ইপাও' সাহিত্যপত্রে দাবী তুলেছিলেন—'সমস্ত দিকেই সাহিত্যকে বিকাশ করতে হবে, সমস্ত ধরণের প্রজ্ঞাকেই কাজে লাগাতে হবে, বৈচিত্র্যই সাহিত্যের প্রাণ, বিষয়বস্তুর প্রশস্তপথে লেখনী চালাতে হবে, প্রেম-

পরিবার প্রকৃতি সব কিছুকেই সাহিত্যের বিষয়বস্তু ক'রে তুলতে হবে।" সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বজ্র নির্ঘোষে এঁদের ঐ সব দাবীকে স্তব্ধ ক'রে দেয়া হয়। কারণ 'শত পুষ্প' নীতির প্রাক্‌শর্ত হ'ল 'শিয়াং হুয়া' (সুগন্ধী ফুল) কে 'তু ছাও' (বিষাক্ত আগাছা) থেকে পৃথক করা, এবং সেই পৃথকীকরণ ও আগাছা ধ্বংসের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন পার্টি-নেতৃত্বের নির্দেশই চূড়ান্ত।*

সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে উপরের অভিজ্ঞতার আলোয় সম্প্রসারিত ক'রে বলা যায় বিষ্ণু দে যে মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী, তাঁরই পরিচিতি বহনকারী তথাকথিত কমিউনিস্ট দেশগুলিতে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, বর্তমান বা অতীত কোনো ব্যাপারেই ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সামনে কোনো বক্তব্য আদৌ পেশ করতেই পারে না, কারণ সর্বশক্তিমান কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্য-উপশাখা সেই সমাজে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক রাষ্ট্র-নিযুক্ত অছি। ভারতের মতো অপরিণত গণতন্ত্রের দেশে ও বিষ্ণু দে-র মতো সৎ মার্কসবাদী সাহিত্য-চিন্তকদের পক্ষে দলীয় মনোভাব বা বালসুলভ অতিশয়োক্তি বাদ দিয়েও সাহিত্যালোচনা সম্ভব, কিন্তু তথাকথিত কোনো কমিউনিস্ট দেশে দলীয় মনোভাবের প্রতিফলনই সাহিত্যালোচনার প্রাক্‌শর্ত।

বিষ্ণু দে-র মতো বিবেক ও প্রতিভাবান মানুষেরা নিজেদের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে এ কথাই প্রমাণ করে থাকেন যে ব্যক্তিগত মনীষা তথা ব্যক্তিস্বরূপকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্যই প্রয়োজন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধের সম্প্রসারণ ঘটানো, এবং কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগত অছি'র মাধ্যম ছাড়াই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কটিকে প্রত্যক্ষ করে তোলা। অথচ তাঁরাই যখন রাষ্ট্রাদর্শগত ব্যাপারে এক বিশেষ ধরণের অতিরাষ্ট্রিকতার

---

* [হেমাঙ্গ বিশ্বাস: 'আবার চীন দেখে এলাম'—পৃঃ ১৭০, ২৭৫-৭৬, ২৯২ দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য —(ক) উক্ত নির্যাতীত চীন সাহিত্যিকরা সকলেই কমিউনিস্ট ছিলেন। (খ) ১৯৫৭য় গিয়ে আড়াই বছর এবং ১৯৭৪-এ গিয়ে ৬ মাস—মোট তিন বছর চীনে অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীবিশ্বাস আ. চী. দে. এ. গ্রন্থটি রচনা করেছেন। (গ) গ্রন্থটির প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৭৫—অর্থাৎ মাও-এর মৃত্যুর আগে। (ঘ) শ্রীবিশ্বাসকে একজন কট্টর মাওবাদী এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উগ্র সমর্থক বলে আমরা জানতাম, অথচ তিনিই নিজে উল্লিখিত দাবীগুলির প্রত্যেকটিকেই ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেন। : লেখক

আবাহক, তখন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে বলতে ইচ্ছা হয় . বিপরীত বিশ্বাসের জন্য বর্তমান সমাজ অত্যন্ত বিপন্ন। (৩১, ৭ ৫৬ ' পৃঃ ৯৭)

সুধীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে কোনো দিন এমন এক অধ্যায় ছিল যখন তিনি মার্কসীয় তত্ত্ববিদ্যাকে মার্কসীয় ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদের থেকে পৃথক করে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সম্ভবত উপলব্ধি করেন যে প্রাপনীয় ও পথের বৈপরীত্যই মার্কসবাদের সবচেয়ে বড় সংকট। সাতচল্লিশ নং পত্রের (৩১ ৭ ৫৬) নাতিদীর্ঘ অংশ বিশেষ এখানে সতর্কতার সঙ্গে পঠনীয় . "একথা নিশ্চয়ই কপোল-কল্পিত নয় যে সাহিত্যপত্র শুধু মার্কস্ নয়, স্টালিনের প্রতিও আস্থাবান। এবং আমার স্টালিন বিদ্বেষ বরাবর উগ্র" (পৃঃ ৯৭)। বোঝা যায় সুধীন্দ্রনাথের বিরূপতা মূল মার্কস্‌বাদের প্রতি ততটা নয়, যতটা তার স্ট্যালিনবাদী ভাষ্যের প্রতি। "অবশ্য আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন একদা আমি মুখে মার্কসভক্তি দেখাতুম না কি ? নিশ্চয়ই দেখাতুম , এবং অনেক দিন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে মার্কসের তত্ত্ববিদ্যা তার ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক মতের সংস্পর্শ বর্জিত।" (পৃঃ ৯৭)। মার্কসীয় তত্ত্ববিদ্যার যা সারাৎসার, তার বাস্তব রূপায়নের সম্ভাবনা সর্বাধিক বিপদগ্রস্থ বোধহয় মার্কসীয় ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদ তথা রাজনৈতিক মতের দ্বারাই। উদাহরণত, শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিমানবের মুক্তিকে এবং রাষ্ট্রহীন সমাজের প্রতিষ্ঠায় ইতিহাসের মুক্তিকে সুনিশ্চিত করতে হলে সর্বহারার একনায়কত্বের মার্কসীয় ধারণাকে একটি দার্শনিক পরিভাষা হিসাবেই গণ্য করা উচিত। একথাও মনে রাখতে দোষ নেই, রেনেসাঁস-সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে এবং 'এশিয়াটিক ডেস্‌পটিজম্'-এর প্রতি কঠোর সমালোচনায় মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ অনেকভাবেই মুখর হয়েছিলেন। অথচ রেনেসাঁস-সংস্কৃতিহীন রাশিয়া ও চীনে, জারের ও কুয়োমিণ্টাং চক্রের স্বৈরশাসনের বিকল্প হিসাবে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের পটভূমিকায়, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আক্ষরিক অর্থেই যে স্বৈরতন্ত্র, ব্যক্তিপূজা ও টোটালিটারিয়ান অতি-রাষ্ট্রিকতার উদ্ভব হল, তাকেই লেলিনবাদ ও মাওবাদ নামে 'বৈজ্ঞানিক' সমাজতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে প্রচারিত করা হচ্ছে। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্বকে ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদের নিগড়ে বাঁধাও তো মার্কস্‌বাদেরই অবদান। সেইজন্যই সুধীন্দ্রনাথের পরবর্তী উক্তি

বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে—"পরে ভেবে দেখেছি, আমার চক্ষে রুষ রাষ্ট্রের, তথা সে রাষ্ট্রের অনুরাগী যাঁরা তাঁদের আচার ব্যবহার মার্কসীয় তত্ত্ববিদ্যারই ফলাফল।" অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে এ সত্যই স্বীকৃত হয় যে মার্কসীয় আদর্শের পতনের বীজ স্ট্যালিন বা চৈনিক 'চারচক্রের' ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত বিচ্যুতির মধ্যে নয়, ফলিত মার্কস্‌বাদের মধ্যেই বিষয়গত ভাবে নিহিত।

৩ কিছু প্রাসঙ্গিকতা

'মৈত্রী। মতান্তর।' গ্রন্থটি নিছক পত্রসংকলনই নয়, তার চেয়ে কিছুটা বেশি, এ হ'ল "বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি অবলম্বনে দুই কবির বন্ধুত্বের ইতিহাস।" মুখবন্ধে সততার সঙ্গে সম্পাদক জানিয়েছেন "লেখক যদিও উভয় কবিরই কাব্য জিজ্ঞাসা ও কাব্যানুশীলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সমান সচেতন, তবু শেষ পর্যন্ত তার পছন্দ-অপছন্দ বা দৃষ্টিভঙ্গি এই সম্পাদনা ও আনুষঙ্গিক রচনাতে নিশ্চয়ই গোপন থাকে নি—বস্তুত গোপন রাখার চেষ্টাও হয় নি"। (পৃঃ আট)। সম্পাদনার এ রীতিও ক্ষেত্র বিশেষে নিশ্চয়ই গ্রাহ্য ও বাস্তব। কারণ অবস্থা গতিকে ইতিহাসের যে অন্তবর্তীকালীন যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের অবস্থিতি, সেখানে সচেতনতার দাবী এবং দর্শকের নিস্পৃহা পরস্পর-বিরোধী। এ যুগের অন্য একটি তাৎপর্য ন্যায়ের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে সংশয়-সম্পন্ন হওয়া, অথবা বলা ভাল, সংশয়ী হতে বাধ্য হওয়া। কারণ চেতনা বহু মাত্রিক, এবং জীবন অনেকান্ত।

তাই গ্রন্থটির প্রথম ত্রিশ পৃষ্ঠায় দুই কবির বন্ধুত্বের ইতিহাস বর্ণনায় এমন কিছু অনুষঙ্গ এবং প্রাসঙ্গিকতা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে, যেগুলি সম্বন্ধে সচেতন পাঠকও বিচিন্তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। বর্তমান অনুচ্ছেদে লেখকের কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সম্বন্ধে এই দায়িত্ববোধ থেকেই প্রত্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং সে প্রয়াসে মুদ্রিত অনুষঙ্গের আপাতদৃষ্ট সীমা কিছুটা সম্প্রসারিতও হতে পারে। গ্রন্থ সমালোচনা বলতে যা বোঝায়, পরবর্তী আলোচনা স্বভাবতই সে পর্যায়ের নয়। এটি বরং একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ, সমান্তরাল প্রতিবেদন,—যার ভিত্তি অবশ্যই 'মৈত্রী। মতান্তর।' এর ভূমিকা 'দুই বন্ধু, দুই কবি'।

এক

"বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় ও মন'নে যে দ্রুত পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে চলেছেন এ সময়ে [ত্রিশের দশকের মধ্যভাগে], মহাযুদ্ধ-পূর্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটে বরণ করে নিয়েছেন প্রগতিক জীবন-চেতনা, মার্কসবাদী ধ্যানধারণা সেই বাঁকবদল কি তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন বন্ধু সুধীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও কর্মে? (পৃঃ ১৩-১৪)

"সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য কখনই মার্কস্‌বাদী বা কমিউনিস্ট ছিলেন না— কিন্তু 'মুখে মার্কস্‌ভক্তি' না কি দেখাতেন—রুশ বিপ্লবে, সে যুগের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত বাঙালির মতোই আলোড়িত হয়েছিলেন যৌবনে।" (পৃঃ ১৪)

উনিশ শতকী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ভাববাদী অত্যুচ্ছ্বাস সাহসের সঙ্গে বর্জন করে-ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। 'কাব্যের মুক্তি'র আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী সেন নিজেই যথোচিত উদ্ধৃতি সহযোগে এ বিষয়ে প্রশংসনীয় গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সুধীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ব্যক্তিস্বরূপকে একাকার করে ফেলেন নি, সে বিষয়েও সজাগ থাকা দরকার। 'মনুষ্যধর্ম' প্রবন্ধে (১৯৩২) তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন "অগত্যা কাব্য আজ খামখেয়ালী, কবির স্বকীয়তা এখন শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারের ভেক পরেছে, ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে সে সম্প্রতি আঁকড়ে ধরেছে হিংস্র ব্যক্তিবাদকে।" এই হিংস্র ব্যক্তিবাদের প্রকাশ, উদাহরণত নীট্‌শে কথিত 'অতিমানব' তত্ত্বে। তাই উক্ত প্রবন্ধেই সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, " উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবিত খেয়ালীরা বিনয়ের প্রয়োজন শুদ্ধ মনে রাখেন নি, এবং তাঁদের চরম প্রতিনিধি নীট্‌শে নিত্য-নৈমিত্তিক সংসারে অতি মানুষের আতিশয্য অচল জেনে অবশেষে আশ্রয় নিলেন পাগলা গারদে।"

"কাব্যের মুক্তি" (১৯৩০)-তে পরস্পর সম্পূরক দুটি ধারার সহাবস্থান লক্ষণীয়। প্রথমত ব্যক্তি-সত্তার সমাজ-সত্তায় উত্তরণের আদর্শ। "কাব্য সমুদ্রের মতো, এবং কবি নদী মাত্র। সে যদি ইচ্ছা করে, তবে পথ-প্রান্তের মরুভূমিতে নিজেকে অনায়াসে হারিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে আত্ম-নিমজ্জন চাইলে, একটা বিশেষ দিকে বইতে সে বাধ্য।" এই জন্যই সুধীন্দ্রনাথ সকল মহৎ আর্টকে নৈরাত্ম্য বলতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, স্বকীয় চৈতন্য তথা ব্যক্তি-স্বরূপের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্‌ভাবনের আদর্শ। "কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটি পরম উপলব্ধির মাল্য রচনা।" কবি তাঁর দিনানুদৈনিক বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতাগুলিকে একটি পরম উপলব্ধির মালায় গ্রথিত করবেন কি ভাবে যদি না তিনি স্বোপলব্ধিকেই সূত্র হিসাবে ব্যবহার করেন? বৈজ্ঞানিকের সত্যোপলব্ধিও এই অর্থে স্বোপলব্ধির সার্থকতা ব্যতিরেকে অলভ্য। এই পরম উপলব্ধির প্রয়োজনে নাস্তিক ও অনেকান্তবাদী সুধীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত ঘোষণা করতে হ'লো—"ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যদি কোনও মাঙ্গলিক নিয়ম নাও থাকে, তবু কবির পক্ষে একটা এমন কাল্পনিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক যার সূত্রে আমাদের দিনানুদৈনিক খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো সার্থক ও সংগ্রথিত, এবং চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, আর সঙ্কল্প, নিরহংকার সঙ্কল্প, এই দুটি দুর্লভ গুণের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের পারিপার্শ্বিক নাস্তির মধ্যে কোনও রকমের শৃঙ্খলা আনা অসম্ভব।"

নিখিল মাঙ্গলিক নিয়মের অস্তিত্ব (অন্তত ধারণা) স্বীকারের প্রয়োজনীয়তায় সুধীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকতা স্পিনোজা-সুলভ। খৃষ্ট ধর্মে ধর্মীয়-নির্দেশ্যবাদ (Religious Determinism) পূর্বারোপিত ব'লেই ব্রাউনিং-এর শুভবাদ সুধীন্দ্রনাথের কাছে পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে স্পিনোজার বিশ্ববীক্ষায় বস্তু ও পরিচিন্তনের অদ্বয়ের মতো সৃষ্টি ও স্রষ্টা শেষ পর্যন্ত অভিন্ন। প্রাণ-অপ্রাণ, জড়-চেতনা—সমস্ত কিছুর ঐক্যতানে যে জাগতিক ও মহাজাগতিক নিয়ম-সঙ্গতি, তাই হ'ল স্পিনোজার নির্গুণ ঈশ্বর, যা স্বতঃসিদ্ধ নয়, পরিগ্রহনীয়। তা ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ যখনই বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং নিরহংকার সংকল্পে আস্থা স্থাপন করেছেন, তখন, বলার অপেক্ষা রাখে না, চেতনা ও সংকল্পের আধার যে ব্যক্তি-স্বরূপ, তাই তাঁর অন্বিষ্ট, তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কৃতির কোথাও আধ্যাত্মিকতার বাষ্পমাত্র নেই। সেইজন্যই, সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্তও নব-আধ্যাত্মিকতার প্রস্তাবক নন, ব্যক্তিস্বরূপের আবাহক মাত্র।

ফলিত মার্কসবাদ, পক্ষান্তরে, সামগ্রিকতার এমনই এক রূপ নিয়েছে, নির্দেশ্যবাদী রাষ্ট্রদর্শনের বার্তা বহনেই যেখানে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এমন কি বিজ্ঞানেরও (সমাজ বিজ্ঞানে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান ইত্যাদি তো বটেই)

চরিতার্থতা। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় নির্দেশ্যবাদ দাবী ক'রেছিল, ব্যক্তির পক্ষে চার্চের কর্তৃত্ব নিঃশর্তে মান্য কবার অর্থই হ'ল মর্তলোকে প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন কবা, কারণ চার্চ অনাগত স্বর্গবাজ্যের অতিমর্ত্য-অছি। অনুরূপ ভাবে মার্কস্‌বাদ এযুগে দাবী করছে যে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং প্রলেতারীয় নিয়ামকতন্ত্রকে নিঃশর্তে মান্য করার তাৎপর্যই হ'ল মানবেতিহাসে রাষ্ট্রহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার কাজটিকে ত্বরান্বিত করা; কাবণ এরা একত্রে অনায়ত্ত কমিউনিজমের অতিবাস্তব অছি। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মীয় নির্দেশ্যবাদ ব্যক্তির মানবিক অনুভূতি, এবং প্রজ্ঞার বিভিন্ন প্রদেশগুলির বস্তুতন্ত্র-ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে উপেক্ষা ক'রে খৃষ্টীয় ভাববাদকেই চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিল। তাই পববর্তী বেনেসাঁস প্রমাণ ক'বেছে বহুত্ববাদ ছাড়া বস্তুবাদ সার্থক হ'তে পারে না, এবং বহুত্ববাদ ও বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌শর্ত হ'লো ব্যক্তিস্বাধীনতা। কারণ ব্যক্তি যদি তাব অভিজ্ঞতালব্ধ ও গবেষণা-জাত প্রত্যয়কে মুক্ত কণ্ঠে সমাজের সামনে পেশ করতে না পাবে, যদি তার, বিরূপ সিদ্ধান্ত সমাজপতিদের নির্দেশিত 'বৈবিতাহীন দ্বন্দ্ব'র (Non-antagonistic Contradiction) শর্তাধীন পরিসীমাতেই আবদ্ধ থাকতে ব'ধ্য হয়, তবে প্রজ্ঞাব মুক্তি ঘটবে কি ভাবে? আধুনিক ফলিত মার্কসবাদে বহুত্ববাদ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা যেহেতু কার্যত অস্বীকৃত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ নামে নিয়ত-নিন্দিত, তাই তথাকথিত সর্বহারাব নিয়ামকতন্ত্র যত না বস্তুবাদী, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাববাদী। রাষ্ট্র ও সমাজ নিজেই যখন একটি নির্দিষ্ট ভাবের (idea) দ্বারা চালিত, তখন সেখানে সুধীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং নিবহংকার সংকল্পের সমবায়ে ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। সত্যেব সবকারী ভাষ্যই যেখানে একচেটিয়া চৈতন্য, এবং সংকল্প মাত্রেই যেখানে সরকারী সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে উচ্চার্য, ব্যক্তির বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং নিবহংকার সংকল্পের পক্ষে সে সমাজ বিশেষ সুবিধাজনক স্থান নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নির্মম আঘাতে যখন ভিক্টোরীয় উদারতন্ত্রের আর্থিক বনিয়াদ নিজেই বিধ্বস্ত হতে বসেছে তখন অভ্যুদয় ঘটে একদিকে ফ্যাসি-নাজি নিয়ামকতন্ত্রের এবং অপর দিকে বলশেভিক অতিবাষ্ট্রিকতার। একদিকে অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদ ও শোনিত-কৌলীন্য এবং অপর দিকে শ্রেণী ও রাষ্ট্রবত্তার

তথাকথিত সামগ্রিকতা একই সঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত হানল উদারতন্ত্র, বহুত্ববাদ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে।

ফ্যাসিবাদ মানবেতিহাসের জঘন্যতম অভিশাপ। কিন্তু ফলিত মার্কসবাদকেও সুধীন্দ্রনাথ কখনই সভ্যতার ত্রাণকর্তা মনে করেন নি। কারণ অতিরাষ্ট্রিকতা এবং ভাববাদী সর্বাত্মকতা উভয়েরই সামান্য লক্ষণ। ১৯৩৭ এ সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন," . অর্ধসত্য অসত্যের চেয়েও মারাত্মক। ফ্যাশিজম আর কমুনিজমের উভয়সংকটে শেষোক্ত নিগ্রহনীতিই যৎকিঞ্চিৎ কম অসৎ বলে আমাদের অবশ্য বরণীয় নয়, এবং সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য।" (স্বগত. পৃঃ ১০২-১০৩)।

এ মৌলিক প্রশ্ন আপাতত থেকেই যাবে যে প্রগতিক জীবন চেতনা এবং মার্কসীয় ভাবাদর্শকে কতদূর পর্যন্ত সমার্থক জ্ঞান করা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিবহ। বিশেষত মার্কসবাদ যখন জীবন চেতনাকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে একাত্ম ক'রেই দেখে থাকে, তখন এর ফলিত দিকটিকে তো তত্ত্ব থেকে বিযুক্ত করার অবকাশই বিশেষ নেই।

সত্য, প্রেম ও সৌন্দর্যের চিরন্তনতার তত্ত্বে বিগতস্পৃহ, 'অনেকান্ত জড়বাদী' সুধীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক ও ভিক্টোরীয় ভাববিলাস থেকে সাহিত্যাদর্শকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। হয়ত সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্ষণবাদে রূপান্তরিত, তবু সেই সদর্থক নির্বেদে ইতিহাসের নির্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপনেও তাঁর ছিল সঙ্গত অস্বীকৃতি। কারণ আনুগত্য-পরিবর্তন তো মুক্তির শর্ত হ'তে পারে না।

ভক্তিতে ফাঁকি থাকলে ভণ্ডামির সৃষ্টি হয়। তবে, ভক্তি আর বিচারী-গুণগ্রাহিতা (Critical appreciation) যখন এক নয়, তখন নিজেকে যিনি মার্কস্‌বাদী বলতে অস্বীকার করেন, তাঁর পক্ষেও, অন্য যে কোনো মতবাদ বা দর্শনের মতোই, মার্কস্‌বাদের কোনো কোনো সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা (সম্পূর্ণ বা আংশিক) অসম্ভব নয়। বস্তুত, মার্কস্‌বাদের মধ্যে এমন বহু দিক আছে যেগুলি সমাজ বিজ্ঞানেরই সত্য। সর্বোপরি এঙ্গেলস্-সহ মার্কস্ সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব প্রতিভাদের অন্যতম।

দীক্ষিত খৃষ্টান না হ'য়েও যে কোনো গ্রহিষ্ণু ব্যক্তির পক্ষেই, এমন কি

নাস্তিকর পক্ষেও, খৃষ্ট জীবনের এবং খৃষ্টীয় ভাবাদর্শের কোনো কোনো উজ্জ্বল সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ও নিজ জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু সামাজিক পরিচিতি:ত খৃষ্টান রূপে গ্রাহ্য হ'তে গেলে শুধু এই বিচারী-গুণগ্রাহিতাই যথেষ্ট নয়। খৃষ্টকে একমাত্র ঈশ্বরপুত্র এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে একটি স্বীকৃত খৃষ্টীয় ধর্মসংঘে প্রথাগতভাবে দীক্ষাগ্রহণ অথবা জন্মসূত্রে খৃষ্টান পরিবারেব সন্তান হওয়া এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। সামাজিক প্রতিষ্ঠান মাত্রেই যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক সত্তার অধিকাবী, তাই বিচারী-গুণগ্রাহিতা দূরের কথা, এমন কি ঈশানুসরণের (Imitation of Jesus) সরল প্রত্যয় ছাড়াও, নিছক সাম্প্রদায়িক পবিচিতিকে ভিত্তি কবেই খৃষ্টান হওয়া, এমন কি ক্রুসেডার হওয়াও সম্ভব। অনুরূপভাবে, মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি ও দার্শনিক সামাজিক সিদ্ধান্তগুলির প্রতি সচেতন ও বিচারী-নিষ্ঠা ব্যাতিরেকেও, নিছক দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতেও কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব। ধর্মীয় সাম্প্রদাযিকতার সঙ্গে মার্কসবাদের এই বিস্ময়কর সাদৃশ্য ১৯১৭-র পব থেকেই ক্রম প্রকটতর।

অনেকান্ত দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন কোনো আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষ যদি কান্ট, হেগেল বা রাসেলের মতো মার্কসের প্রতিও গ্রহণ-বর্জনের বিচারী পদ্ধতিকে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তবে মার্কসবাদীদের সরকারী দলে অন্তত তাঁর স্থান নেই। সৌভাগ্যবশত কাণ্ট্‌বাদ, হেগেলবাদ বা র সেলবাদ নামে কোনো সমাজগ্রাহ্য সত্তা নেই, কিন্তু মার্কস্‌বাদ এযুগের এক অতিজাগ্রত সামাজিক-রাজনৈতিক সত্তা, এবং সেইজন্যই এযুগের সামাজিক মনস্তত্বে তার মুখ্য আবেদন কার্যত নব-আধ্যাত্মিকতার ধারকরূপে।

সুধীন্দ্রনাথ যতটুকু মৌখিক মার্কসভক্তি দেখিয়েছেন বলে জানা গেল, সেটিকে আমবা ঠিক ভক্তি নয়, বরং বিচারী গুণগ্রাহিতা বলেই ধরে নিতে পারি। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "যখন তাঁব [সুধীন্দ্রনাথের] প্রতিভা ও চারিত্র্যের মধ্যাহ্ন···তখন কমুনিজমকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, বৈরী ভাবে হলেও অভিবাদনে কুণ্ঠিত হতেন না।" অধ্যাপক সুশোভন সবকার বর্ণনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ ও 'পরিচয়'কে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের একটি সুদৃঢ় পরিমণ্ডল কিভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল ত্রি.শব দশকে। এসব থেকে

প্রমাণিত হয়, মার্কসবাদী না হলেও সুধীন্দ্রনাথ মার্কসবাদ-বিরোধিতা নামক কোনো বিপরীত মতান্ধতারও শিকার ছিলেন না।

নিজে খৃষ্টান না হয়েও রামমোহন খৃষ্টধর্মের বহু আলোড়িত সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তুলনামূলক বিশ্বধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নে রামমোহনের আন্তরিকতা উপলব্ধি করতে অপারগ খৃষ্টান মিশনারীদের যতকাল প্রত্যাশা ছিল যে তিনি খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিতে পারেন, ততকাল তাঁর কোনো কোনো কীর্তি কলাপের সপ্রশংস উল্লেখ থাকত মিশনারী পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু খৃষ্টের অলৌকিকত্বকে অস্বীকার করে রামমোহন যখন নিবন্ধমালা প্রকাশ করতে থাকলেন, তখন থেকেই তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

রুশ বিপ্লবে, সে যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির মতো সুধীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই আলোড়িত হয়েছিলেন যৌবনে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার করলে এই সত্যের বিপরীত ধারাটিকেও উপলব্ধি করা যাবে সুধীন্দ্রনাথেরই একটি পরবর্তী উক্তিতে—"...রুষ বিপ্লব সম্বন্ধে আমার প্রাগ্রসর হতাশা যেমন সমবয়সী ছাড়া আর কেউ হৃদয়ঙ্গম করবে না, তেমনি যাদের শৈশব হিন্দু পুনঃরুত্থয়নের অন্তঃপাতী নয়, তাদের কাছে আমার উদগ্র জড়বাদ উপহাস্য ঠেকবে।" (স্বগত'র পুনশ্চঃ ১৯৫৬)। যে কোনো বিপ্লবই প্রথমে অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিগুলির কত শতাংশ সফল হ'লো, তার বিচার হবে পরবর্তী ইতিহাসের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে। তাছাড়া বিপ্লব নিজেই ভবিষ্যৎ কালের জন্য বিবর্তনের সম্ভাবনাকে প্রশস্ততর করে তোলে। এ মতের সমর্থনে নবতম সংযোজন 'ইউরো-কমিউনিজমে'র সাম্প্রতিক ধারণা।

দুই

"ফ্যাশিস্ট বিরোধী মনোভাবও ছিল তাঁর [সুধীন্দ্রনাথের] গভীর। এমন কি ১৯৩৯-এ 'এইড স্পেন' বা পরে 'এইড চায়না'র ব্যাপারেও নাকি তাঁর উৎসাহ ছিল।" (পৃঃ ১৫)

"এই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের আচরণ তাঁকে [সুধীন্দ্রনাথকে] কমিউনিস্টদের পন্থা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ক'রেছিল। ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েতের বোমাবর্ষণ কিংবা হিটলারের সঙ্গে স্ট্যালিনের চুক্তি—

এই সব ঘটনা তাঁকে খুবই বিচলিত করে—হীরেনবাবু প্রমুখ কমিউনিস্ট বন্ধুদের কোনো যুক্তি, সোভিয়েটের নিঃসঙ্গতার বিপদ, সময় হরণের প্রয়োজন, আদর্শ ও কৌশলের সম্পর্ক ইত্যাদি তিনি মানতে রাজি নন। তাঁর আদর্শবাদ নিদারুণ ভাবে আহত।" (পৃঃ ১৫)

পুঁজিপতি বা আত্মকেন্দ্রিক উচ্চাভিলাষীরা কমিউনিজমের বিরোধিতা করেন শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক বা স্বাধীন চিন্তকেরা ফলিত মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করেন এর টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র/সমাজ ব্যবস্থার জন্য। এই টোটালিটারিয়ান ব্যবস্থা আবার ফ্যাসীবাদেরও মূল কথা। তাই সুধীন্দ্রনাথের মতো কমিউনিজম-বিরোধীরা যে ফ্যাসীবাদেরও বিরোধী হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষত স্পেন এবং চীনের ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ নিজের দৃষ্টিভঙ্গি 'নান্দীমুখ' কবিতায় (২৭.৭.৩৮) স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন

"কখনও কখনও মনে হয় যেন চিনি—
বিদ্যুতে লেখা হেন রূপরেখা
চীনে পটে বন্দিনী।
স্পেনেও হয়ত অমনই অঙ্গভঙ্গি
চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী,
সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্ঘি
পণে উপবনে পরদেশী ঝিনিকিনি।
স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন
অথচ তাদের চিনি।"

নাৎসী জার্মানীর নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের (৭.৫.৪৫) মাত্র একমাস আগে রচিত '১৯৪৫' শীর্ষক কবিতায় চীন ও স্পেন প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের যে মনোভাব প্রতিফলিত, সেখানেও দেখা যায় কমিউনিজম্ ও ফ্যাসিজম্ উভয়ের প্রতিই তাঁর বিরাগ :

"অবশ্য চীনে নেতারা স্বার্থপর,
সর্বথা জনশক্তির বাদ সাধে ;"

স্পষ্টতই, 'চীনে নেতারা' অর্থাৎ তৎকালীন কুয়োমিণ্টাং কর্তৃপক্ষ এবং কমিউনিস্ট 'জনশক্তি' সুধীন্দ্রনাথের বিচারে যথাক্রমে স্বার্থপরতা এবং প্রগতিশীলতার আকর নয়। পক্ষান্তরে,

"রাইনে জুড়ায় বার্সেলোনার দাহ,
স্পেনে নিষিদ্ধ যদিও ধর্মঘট।"

মিত্রপক্ষের রাইন অতিক্রম (২০.৩.৪৫) এবং ম্রিয়মান নাৎসী জার্মানীর আসন্ন পরাভবে স্পেনের বিগত সাধারণতন্ত্রী সরকারের তৃতীয় ও শেষ আশ্রয়-স্থল বার্সেলোনার দাহ (মার্চ, ১৯৩৯) জুড়োলেও, ফ্রাঙ্কোর শাসন অপরিবর্তিতই রয়ে যাওয়ায় কবির ক্ষোভ এখানে মূর্ত।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের (১৯৩৬-৩৯) একদিকে ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসিবাদ, এবং অপর দিকে কমিউনিজম বনাম ফ্যাসিবাদ। ফলে কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে বৃটিশ লেবার পার্টিসহ, সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষেরা সে সময়ে সাধারণতন্ত্রী স্পেন সরকারের জয় কামনা করেছিল। যে দুজন ভারতীয় জননেতা সে দিন স্পেন-রণাঙ্গণে ছুটে গিয়েছিল, সেই জওহরলাল নেহরু এবং কৃষ্ণ মেনন, কেউই কমিউনিস্ট ছিলেন না। ফ্রাঙ্কো বিরোধী ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে স্বয়ং যোগ দিয়েছিলেন 'ফর হুম দ্য বেল টল্‌স্‌'-এর লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, কি সাহিত্যাদর্শে, কি রাষ্ট্রাদর্শে যিনি কোনো রকমেই কমিউনিস্ট ছিলেন না বা হন নি। চীনের উপরে জাপানের নির্লজ্জ আক্রমণকে যা পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, সে যুগে দেখা হত দুর্বল জাতির উপরে প্রবল সামরিক রাষ্ট্রের আগ্রাসী আস্ফালন, তথা যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা রূপে। অর্থাৎ এখানেও কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে জাপ-বিরোধিতা ঘটেছিল। চীনে জাতীয় কংগ্রেসের মেডিকেল মিশন প্রেরণ (১৯৩৮), জওহরলালের চীন ভ্রমণ (১৯৩৯) এবং রবীন্দ্রনাথ-নোগুচি পত্র বিনিময় (১৯৩৮) এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "China, Spain and the War" (Kitabistan, 1940) গ্রন্থে জওহরলাল ফ্যাসি-বিরোধী স্পেন এবং জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামরত নবীন চীনের প্রতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে গভীর আবেগ দেখিয়েছেন, এ যুগের ইতিহাসে তা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আবেগের দলিল হ'য়ে থাকবে। এই ধারারই ধারক

ছিলেন অকমিউনিস্ট সুধীন্দ্রনাথ। তাই 'এইড স্পেন' এবং 'এইড চায়না'র মতো ব্যাপারেও উৎসাহী হওয়াটাই ছিল তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

নাৎসী আক্রমণ ঠেকাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাশিয়ার জনগণ যে ঐতিহাসিক আত্মত্যাগ ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল, সে জন্য মানব জাতি তার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকবে। সে কৃতজ্ঞতার কিছুটা অংশ সি পি. আই-এরও প্রাপ্য, কারণ রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সে শেষ পর্যন্ত 'জনযুদ্ধ' বলে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু সে তো কিছুদিন পরের কথা। আমাদের আপাতত আলোচ্য রুশ-জার্মান-মৈত্রীর যুগে সুধীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার একটি সময়পঞ্জি পেশ করা যা'ক।

২৩ ৮ ১৯৩৯—রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি।

১ ৯ ৩৯ —জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণ।

১৭.৯ ৩৯ —রুশ বাহিনীর পূর্ব-পোল্যাণ্ড অভিযান।

২৮ ৯ ৩৯ —জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারা।

৩০ ১১ ৩৯—রাশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ।

১৩ ৩ ৪০ —ফিনল্যাণ্ডের পরাজয় ও রুশ-ফিনিশ শান্তিচুক্তি।

৯.৪ ৪০ —জার্মানীর নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ, (পরে একে একে পতন)।

১০.৫.৪০ —জার্মানীর হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ আক্রমণ, (পতন)

৫ ৬.৪০ —জার্মানীর ফ্রান্স অভিযান।

১৪.৬.৪০ —প্যারিসের পতন।

১৪ ৭,৪০ —রাশিয়ার এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া আক্রমণ, (পতন)।

২৭.৯.৪০ —জার্মানী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি।

১০.১.৪১ —রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তি।

২২.৬ ৪১ —জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ।

পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ, ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া

অধিকার করার পিছনে রাশিয়ার সম্ভাব্য কারণ হ'তে পারত '—(ক) আত্মরক্ষার্থে রণ-প্রস্তুতি গড়ে তোলা, (খ) যুদ্ধের দ্বারা বহির্দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা, (গ) জার্মাণী-সুলভ আগ্রাসনের দ্বারা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিকে নিজ কর্তৃত্বে আনা। প্রথম কারণটির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ দুটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় নি। কারণ এস্থোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া সেই থেকেই স্থায়ীভাবে রুশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত। এ থেকে ইতিহাসের অনেকান্তবাদী বিশ্লেষণের উপযোগিতাও প্রমাণিত হয়। প্রথম কারণটিকে গুরুত্ব দেওয়াই তৎকালীন মস্কোপন্থীদের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যদের পক্ষে এ সন্দেহ জাগাটা কি সেদিন সত্যই অযৌক্তিক ছিল যে জার্মাণীর সঙ্গে দশ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি যখন ইতোপূর্বেই স্বাক্ষরিত হ'য়ে গেছে, তখন ওই আগ্রাসন 'ক' অপেক্ষা 'খ' ও 'গ' তেই সার্থকতর? সোভিয়েট ইউনিয়নের আচরণে সে সময়ে আরো কিছু রহস্যময়তা ছিল যা বিস্ময়কর। যেমন—অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ড অভিযানের পিছনে শোণিত-কৌলিন্য বাদী জার্মাণীর আপাত যুক্তি ছিল ঐ সব দেশের সংখ্যালঘু (সুদেতেন) জার্মানদের বিজাতীয় অত্যাচার থেকে মুক্ত করা, সমাজতন্ত্রী রাশিয়াও ঘোষণা করেছিল যে প্রবাসী য়ুক্রেনীয় ও শ্বেত-রুশদের বিজাতীয় অত্যাচার থেকে উদ্ধার করার জন্যই তার পোল্যাণ্ড অভিযান। নিঃসঙ্গতার বিপদ বৃটেনেরও ছিল মারাত্মক ভাবে, ফ্রান্সের পতনের পরে সমগ্র ইউরোপে তখন সে একক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিয়েছে তার অনেক পরে (৮ ১২ ১৯৪৩)।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিই তো শেষ কথা নয়, রহস্য গড়িয়ে ছিল আরও গভীরে। জার্মাণী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক বার্লিন চুক্তি (২৭. ৯. ৪০) র ১নং ও ২নং ধারার মর্মার্থ ছিল এই যে জার্মাণী ও ইটালীর নেতৃত্বে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পুনর্গঠনে ("in the establishment of a new order") এবং অপর দিকে জাপানের নেতৃত্বে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পুনর্গঠনে যথাক্রমে জাপান এবং জার্মাণী ও ইটালীর পূর্ণ সম্মতি থাকবে। কিন্তু ঐ চুক্তির ৫নং ধারায় বলা হ'ল ' **Germany, Italy and Japan affirm that the aforesaid terms do not in any way**

affect the political status which exists at present as between each of the three contracting parties and Soviet Russia."

ঐ চুক্তির রাজনৈতিক তাৎপর্য কি আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের তরফ থেকে স্ট্যালিনতন্ত্র অপেক্ষা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিই অধিকতর বৈরিতার প্রকাশ নয়? এর ঠিক পরেই স্বাক্ষরিত হ'ল রুশ জার্মান মৈত্রী চুক্তি। এই মৈত্রী-চুক্তির ভিত্তিতে ফ্যাসিবাদ ও ফলিত মার্কসবাদ যদি রাষ্ট্রাদর্শ সম্বন্ধীয় পারস্পরিক মৌলিক মতবিরোধগুলি বিষয়ে সমালোচনা থেকে সাময়িক ভাবেও বিরত হয়, তবে বাকি থাকে সেই অশুভ সমন্বয়ের সম্ভাবনা, যাকে আগেই স্বাগত জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু. "Cosidering everything one is inclined to held that the next phase in world history will produce a synthesis between Communism and Fascism. And will it be a surprise if that synthesis is produced in India? . Inspite of the antithesis between Communism and Fascism there are certain traits common to both Both Communism and Fascism believe in the supremacy of the state over the individual Both denounce Parliamentarian democracy Both believe in party-rule. Both believe in the dictatorship in the Party and in the ruthless suppression of all dissenting minorities Both believe in a planned industrial reorganisation of the country. These common traits will form the basis of the new-synthesis." (Indian Struggle)

এ রকম অশুভ সমন্বয়ের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার জন্য ফ্যাসিবাদকে সমগ্র মানবতার সাধারণ শত্রু হিসাবে জ্ঞান ক'রে পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গেই সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের সমন্বয়-চিন্তার প্রয়োজন ছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন: "আজ প্রশ্ন হ'লো, গত ৪০০ বছর ধরে ইউরোপে যে আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা এই সংকট কাটিয়ে উঠে সভ্যতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবে, কিংবা ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিজয় অভিযানের তলায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।.........সময়োপযোগী সোভিয়েট সাহায্যে শক্তিমান হ'য়ে

হয় ইউরোপ বাঁচবে, নতুবা আসন্ন ফ্যাসিস্ত শক্তির বিজয় অভিযানের বর্বরতার অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যাবে।" (Independent India . 23 6 40)

এম এন. রায়ের বক্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি দিক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, (ক) গত ৪০০ বছর যাবৎ তিলে তিলে গড়ে-ওঠা পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁস সংস্কৃতি যথা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বহুত্ববাদ ভিত্তিক আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ; (খ) সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি তাঁর আস্থা, (গ) ফ্যাসিবাদকে একাধারে 'ক' ও 'খ'-এর সাধারণ শত্রু হিসাবে ঘোষণা করা।

কিন্তু জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়া তথা দুনিয়ার তাবৎ রুশ পন্থী কমিউনিস্টরা ইতিহাসের এই ধারাটিকে ঠিকমত ধরতে পারেন নি। ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের তৎকালীন ধারণা—আজও যা বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি,—মোটামুটি এই: বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদদের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রকৃত পক্ষে সর্বহারা শ্রেণীর উপরে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত একনায়কত্ব। তবে ফ্যাসিবাদে এই বুর্জোয়া একনায়কত্ব কিছুটা বেশি হিংস্র। কারণ এ হ'ল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের মরিয়া অবলম্বন। সমগ্র ধনতন্ত্রী জগতেই আজ অথবা কাল ফ্যাসিবাদ জেগে উঠবেই। এমতাবস্থায় পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে ফ্যাসিস্ত অক্ষের যে মহাযুদ্ধ তা স্বভাবতই ধনতন্ত্রী দুনিয়ারই অন্তর্বিরোধ। কমিউনিস্টদের পক্ষে এদের কারুর প্রতিই পক্ষপাতিত্বের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ রেনেসাঁস সভ্যতার প্রতি স্ট্যালিনবাদীদের আদৌ কোনো শ্রদ্ধার মনোভাব দেখা যায় নি।

পক্ষান্তরে রেনেসাঁস সভ্যতার দুই স্তম্ভ অনেকান্তবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার হন্তারক হওয়াতেই ফ্যাসিবাদ ও ফলিত মার্কসবাদ উভয়ের প্রতিই ছিল সুধীন্দ্রনাথের ঘোর অনীহা: "বলা বাহুল্য যে ফাশিস্ট রাষ্ট্র যেহেতু একাধারে বহির্জগতের প্রতিপালন সাপেক্ষ ও অন্তর্জগতের দৌর্বল্য-সূচক, তাই তার সংশ্রবে পৃথিবীর বিসংবাদ কমছে না, বরং অনৈক্য বাড়ছে; এবং কম্যুনিস্টরা নিত্যের মর্যাদা দেয় না, মিথ্যা মিথ্যা ভাবে যে নিমিত্তের তারতম্য ঘুচলেই, ব্যক্তিত্বের বিষ ফুরাবে।...এবং তৎসত্ত্বেও সার্বভৌম প্রভুত্বের মায়া কাটিয়ে, স্বাবলম্বনে ব্যক্তি ও জাতির জন্মগত অধিকার তারা স্বীকার করতে পারেন। প্রাবহম এইজন্যে যে তাদের বিবেচনায় তারাই অনিবার্য প্রগতির অভ্রান্ত

অগ্রদূত। কিন্তু বিশ্বমানবের দীক্ষা মনুষ্যধর্মের অমর জপমন্ত্রে, ...।" (প্রগতি ও পরিবর্তন—১৯৩৮)

রেণেসাঁস সভ্যতা এবং ধনতান্ত্রিক অভ্যুন্নতি তথা পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদ আদৌ এক জিনিষ নয়। অনেকান্ত বিশ্লেষণে তো বটেই, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে বিচার করলেও একই সংস্থিতির মধ্যে দুটি বিপরীত ধারার অস্তিত্ব সহজেই বোঝা যায়। তাই এম. এন. রায়ের মতে "ভারতের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন আজ তাঁদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের থেকে বৃটিশ গণতন্ত্রকে পৃথক করে দেখতে হবে, এবং এই ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে সমস্বার্থেই বৃটিশ গণতন্ত্রের সঙ্গে সংযোগিতা করতে হবে।" ১৯৪১-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন প্রমাণ করেছে, এ কথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, জওহরলালের আত্যন্তিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা এবং প্রশংসনীয় আন্তর্জাতিক চেতনা সত্ত্বেও, সেদিন সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি, ভারতের তথা বিশ্বের রুশ-পন্থী কমিউনিস্টরা যেকে বুঝতে বাধ্য হয়েছিল রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরে যে কথা মানবেন্দ্রনাথ, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার স্বচ্ছতার দ্বারা অতি সহজে বহু আগেই বুঝেছিলেন।

ফ্রান্সের পতনের পরে পশ্চিমা জগতের সামনে তখন দুটি পথ খোলা ছিল : (ক) নাৎসীদের সঙ্গে আপোষ ক'রে স্ব স্ব দেশের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমাধি রচনা ক'রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সমস্ত শক্তিকে সংহত করা, অথবা (খ) স্ব স্ব দেশের প্রগতিশীল সমস্ত শক্তিকে সংহত করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে ব্রতী হওয়া। ফ্রান্সের পেতাঁ ও নরওয়ের কুইসলিংকে যদি প্রথম ধারাটির ধারক ধরা যায়, তবে বৃটেনের চার্চিলকে বলতে হয় দ্বিতীয় বিকল্পের অপরিকল্পিত অনুসারী। কারণ পার্লামেণ্টে কনজারভেটিভ দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিনি ইতোপূর্বেই চির প্রতিদ্বন্দ্বী লেবার দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সর্বদলীয় সরকার গঠন করেছিলেন (১১.৫.৪০)। ফলে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে বৃটিশ জাতি শুধু যে সর্বশক্তি সংহত করতে পারল তাই নয়, সকল যুদ্ধের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে (১৯৪৫) পরাজিত হ'ল কনজারভেটিভ পার্টি নিজেই। যুদ্ধজয়ের মাশুল যোগাতে বৃটিশ ক্যাপিটালিজম সাম্রাজ্য টিঁকিয়ে রাখার উদ্বৃত্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকেই হারিয়ে ফেলল। অপর দিকে প্রগতিশীল লেবার সরকার ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যকে টিঁকিয়ে

বাবার চার্চিল-সুলভ জেদ থেকে সত্যিই কিছুটা মুক্ত ছিল। একদিকে অন্ধ জাতীয়তাবাদ এবং অপর দিকে রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য—এতদুভয় ভাববাদী মানদণ্ডের কোনোটিতেই তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির এই দ্বান্দ্বিক তাৎপর্যটি পরিমাপ যোগ্য হয় নি। আনন্দের কথা, সুধীন্দ্রনাথ এই দ্বিবিধ সংকীর্ণতার কোনোটির সঙ্গেই একাত্ম হ'তে পারেন নি।

মানবজাতির সৌভাগ্যক্রমে, অনাক্রমণ ও মৈত্রী চুক্তিকে ভঙ্গ ক'রে রাশিয়া-আক্রমণের দুর্বুদ্ধি যদি হিটলারের না ঘটত, তা হলে হয় দেখা যেত এক ম্লানতর পৃথিবী, যেখানে একদিকে রেনেসাঁস-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপরে দাঁড়িয়ে থাকত ফ্যাসিবাদী সর্বগ্রাসীতা, এবং অপর দিকে সর্বহারার নিয়ামকতন্ত্রের পরিচিতি বহনকারী স্ট্যালিনবাদী এশিয়াটিক ডেস্‌পটিজম।

"..... একচক্ষু ছায়া,
দীপ্তনখ, স্ফীত নাসা, নির্বিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।
পদধ্বনি—কার পদধ্বনি
. . .আগমনী—
কার আগমনী
বিকল্পই তবে কি নিশ্চয় ?
যে-পশুবলের কাছে হার মেনে তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
এ-বারে কি তার উজ্জীবন ?
অন্তর্ভৌম সমাধিতে ছিল সংগোপন
সে-মিসরী শব,
তুমি নও, আসে কি সে—অর্ধ পশু, অর্ধেক মানব
সঙ্গে ক'রে দিগ্বিজয়ী মরু ?"

রুশ জার্মান মৈত্রীকে সারা বিশ্বের রুশপন্থী কমিউনিস্টদের এইজন্যই স্বাগত জানাতে বাধে নি যে প্রগতিক জীবন-চেতনা এবং ফলিত মার্কসবাদের স্ট্যালিনবাদী ভাষ্যকে সমার্থক জ্ঞান করাকেই তাঁরা বুদ্ধি-বিবেচনার চরিতার্থতা হিসাবে ধরে নিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আজকের মতো সে দিনও রাশিয়ার রাষ্ট্রিক ও জাতীয় স্বার্থরক্ষাকেই তাঁরা প্রকৃত আন্তর্জাতিক চেতনা মনে করতেন। কিন্তু

সৌভাগ্যবশত স্ট্যালিনবাদী ছিলেন না বলেই সুধীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানে কমিউনিস্ট বন্ধুদের মতো গুরুবাদী নিশ্চেষ্টতা এবং অতি সরলীকৃত কৈবল্য প্রাপ্তি সম্ভব হয় নি। তবে, ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে তিনি নিজেকে যে কতদূর জড়িয়ে ফেলেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৯৪২ থেকে ৪৫ পর্যন্ত এ আর পি হিসাবে বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগে কার্যভার গ্রহণে। ঘটনাটি এই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, '৪২ এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন এবং সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিস্ত মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে সে সময়ে ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রতিরক্ষা-প্রচেষ্টা কে আদৌ সুনজরে দেখা হ'ত না। বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তখন সি পি আই এবং এম এন রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে প্রচণ্ড গণ-বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। ঐ অবৈতনিক কর্মভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে সুধীন্দ্রনাথ কথা ও কর্মের আত্মীয়তা স্থাপনের এক অসাধারণ নজির রেখেছেন।

তিন

> "…১৯৪৮ সাল নাগাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাল রেখে যখন শিল্পসাহিত্যের বিচারেও রাজনৈতিক মাপকাঠিটা বড় হ'য়ে উঠল, তখন ঐ ঋদ্ধাভনীয় ভ্রান্তিতে বিষ্ণু দে র ভূমিকা ছিল প্রতিবাদী। সে কারণেই বিষ্ণু দে কে বলতে শোনা যায় এ সময়, যাঁদের সঙ্গে রাজনীতির মিল, সাহিত্য সংস্কৃতির বোধে তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে চলা দুঃসাধ্য, আর সাহিত্য সংস্কৃতি বোধের দিক থেকে যাঁরা শ্রদ্ধেয় সঙ্গী, তাঁদের সঙ্গে রাজনীতির বাধা দুস্তর।" (পৃঃ ১৯)

বিষ্ণু দে র এই সঙ্গত আক্ষেপের মূল কারণটি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। সাহিত্য-চেতনার ও কাব্যরুচির যে উন্নত স্তরে তাঁর অবস্থান, সেখানে প্রবেশাধিকার পাওয়া শিক্ষা, অনুশীলন ও মনন-সাপেক্ষ। সেইজন্যই রাজনীতিতে যাঁদের সঙ্গে মিল, তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই সাহিত্য-সংস্কৃতির বোধে তাঁর একত্রে পথ চলা দায়। পক্ষান্তরে মার্কসীয় রাজনীতির এই শ্রদ্ধেয় পথিক যাঁদের সঙ্গে সাহিত্য-মনস্কতায় শরিক হ'তে পারেন, তাঁদের অনেকেই তাঁর রাজনৈতিক

সহযাত্রী নন। ব্যতিক্রম হিসাবে শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিরল সংখ্যক মানুষদের নাম অবশ্যই মনে পড়ে। তবু এ থেকে প্রমাণিত হয়. ক. রাজনীতি অর্থনীতি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচারের মানদণ্ড এক হতে পারে না, এবং খ. সাম্যের আদর্শ অর্থনীতিতে তর্কাতীত হলেও, সংস্কৃতি-মনস্তায় অধিকার ভেদ একটি বাস্তব ঘটনা। সুধীন্দ্রনাথের মার্কসবাদ বিরোধিতার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এতে অবনতের উন্নতি অপেক্ষা উন্নতের অবনতির আশংকাই বেশি। "আমি সর্বদা জানতে চাইতুম সাম্যবাদে অবনতের উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, উন্নতের অবনতিও তেমনিই অনিবার্য কিনা।" (কুলায় ও কালপুরুষ, মুখবন্ধ)। আশংকাটি আর্থিক সাম্য সম্বন্ধে নয়, সাংস্কৃতিক মান সম্বন্ধে।

যে চরমপন্থা শিল্প সাহিত্যের বিচারেও রাজনীতির অতি চঞ্চল ও আপাত-গ্রাহ্য মানদণ্ডকেই পরম প্রামাণ্য মনে করে, তার বিরুদ্ধে সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে বিষ্ণু দে কার্যত বহুত্ববাদের যাথার্থ্যই প্রমাণ করেছেন। অদূর অতীতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও অনুরূপ প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করতে হ'য়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ, উগ্র অসহযোগ এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু মার্কসীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় বিষ্ণু দে-র দায়িত্ব এ ব্যাপারে জটিলতর।

আমাদের সৌভাগ্য, বিষ্ণু দে এমন একটি সমাজের অধিবাসী, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বহুত্ববাদের আদর্শ যেখানে, অপরিণত হ'লেও, বিদ্যমান। এ দেশে বিভিন্ন মতের সহাবস্থান আইনগ্রাহ্য বলেই, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে ঝ্দাভনীয় ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো, রাশিয়াতে বসে একজন পাস্টেরনাক বা সলঝেনিৎসিনের পক্ষে যা সম্ভব হয় না। প্রসঙ্গত স্মরণীয় মাও উদ্ধৃত লেনিনের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক সেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য. "সাহিত্যকে হ'তে হবে সর্বহারা শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্মের একটা অঙ্গ, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি সচেতন সমগ্র অগ্রবাহিনী ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের যে বিরাট যন্ত্রকে গতিশীল করে তুলেছে, সাহিত্যকে হ'তে হবে তার অন্তর্ভুক্ত দাঁতওয়ালা চাকা ও ইস্ক্রুপ।" (মাও: ইয়েনান ভাষণ—পুনর্মুদ্রিত বাংলা সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৭৭)। ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, শিল্প সাহিত্যে উদ্দেশ্যবাদের আরোপ মধ্যযুগের খৃষ্টীয় এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন নাজি-ফ্যাসিস্ত সর্বাত্মকতারও সামান্য লক্ষণ।

পাস্টেরনাকের সাহিত্যকৃতির বিরুদ্ধে রুষ অভিযোগ ছিল মূলত "দুর্বোধ, রীতিপ্রধান, ব্যক্তিগত, জনগণের সঙ্গে সংযোগ রহিত"— ইত্যাদি [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনূদিত "শেষ গ্রীষ্ম" (রূপা, ১৯৬০)র ভূমিকা দ্রঃ]। এদেশের ঋদ্ধাভনীয় ভ্রান্তির সাম্প্রতিক ধারকদের মতে বিষ্ণু দে-র সাহিত্যেও উক্ত লক্ষণগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সাহিত্য সমালোচনার পদবাচ্য না হয়েও "কবি বিষ্ণু দে র দুর্ভেদ্য কেল্লা" [অনুষ্টুপ (কলকাতা) শারদীয়া সংখ্যা—১৩৮৫] নামক প্রবন্ধটি বিষ্ণু দে র বিরুদ্ধে উগ্র বামাচারীদের দলীয় মনোভাব প্রসূত বালসুলভ হঠকারিতা এবং অমার্জিত অতিশয়োক্তির রাজনৈতিক দলিল হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয়েছে, ভারতে কমিউনিস্টতন্ত্র স্থাপিত হ'লে পাস্টেরনাকের পরিণতি হয়ত বিষ্ণু দে কেও মহিমান্বিত করে তুলত। সমসাময়িকের নির্মম সমালোচনা বহু ক্ষেত্রেই যুগোত্তীর্ণ প্রতিভার কষ্টিপাথর। নিরুদ্দেশ যাত্রায় সোনার তরীর নিষ্ক্রমণ যে সমসাময়িক বঙ্গ সাহিত্যের নিস্রোত পরিমণ্ডলের পক্ষে কতদূর প্রাগ্রসর ছিল, সেটি বোঝার জন্যই তৎকালীন সাহিত্য সমাজপতিদের মুদ্রিত উষ্মা এখনও দর্পণের মতো কাজ করে। তাই আপত্তি বিরূপ সমালোচনায় নয়। বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথের যদি নিজেদের শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করার অধিকার থেকে থাকে, যদি তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে কোনো পাঠকের আনন্দিত হবার অধিকার থেকে থাকে, তবে একথাও স্বতঃসিদ্ধ যে সেই একই সাহিত্যেপাঠক বিশেষের ক্ষুব্ধ হওয়ারও নিশ্চয়ই অধিকার আছে। কিন্তু বিরূপতা যদি এমন কোনো রাষ্ট্রাদর্শগত ভিত্তিভূমি থেকে উচ্চারিত হয়, যা নিজেই নির্দেশ্যবাদী ও একত্ববাদী অতি-রাষ্ট্রীকতার পাদপীঠ, তখন আশঙ্কা থাকে, সেই ক্ষোভ অনাগত নিয়ামকতন্ত্রের অগ্রিম অনুজ্ঞা কিনা।

ব্যক্তি নিজে যদি উন্নততর সমাজচেতনার দ্বারা চালিত হ'য়ে গণ-শিক্ষার প্রচারকেই জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন (যেমন বিদ্যাসাগর), অথবা গণমুক্তির চারণ কবি হয়ে ওঠেন (যেমন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বা নজরুল), সেটি নিশ্চয়ই মহান দৃষ্টান্ত, যদিও মহত্ত্বের একমাত্র লক্ষণ নয়। ব্যক্তি তার পরিণতির স্তর অনুযায়ী যে কোনো প্রতিষ্ঠানের (পার্টি ও একটি প্রতিষ্ঠান) বা অপর ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাসঙ্গিক উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার এবং দায়িত্ব একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। ধর্মসংঘ, পার্টিতন্ত্র বা রাষ্ট্রযন্ত্রে, যে কোনো দেশে, যে কোনো সময়ে যখন স্বীয় আদর্শে ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে বা বুদ্ধিজীবীর স্বাধীন সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে উদ্যত হয়, তখন উন্মোচিত হয় প্রগতির সংগ্রামের অন্যতর দিগন্ত—প্রতিষ্ঠানতন্ত্র বনাম ব্যক্তি, যার সম্মানজনক স্বীকৃতি নেই তাত্ত্বিক কি ফলিত মার্কসবাদে, ব্যক্তি ও সমাজের অন্বয় যার ভিত্তি। সংস্কৃতিমনস্কতায় যাদের সঙ্গে পথ চলা দায়, তাঁরাই যখন সাহিত্য-নিয়ামক হয়ে ওঠেন সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার, প্রয়োগ বৈগুণ্যে শিল্প সাহিত্যের যেখানে সম্ভাব্য পরিণতি টোটালিটারিয়ান রাজনীতির চাকাওয়ালা দাঁত ও ইস্ক্রুপ হয়ে ওঠা, তখন সেই সমাজব্যবস্থার থেকে অবাঞ্ছনীয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো বাস্তবে কতদূর কার্যকর সেটিও বিবেচ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে

১ A World in Conflict (World War II and India) J. C Ahluwalia (Delhi, 1949) ২ The Major International Treaties (1914-1974) Edited by J A S Grenville, London, 1974)

পাদটীকা

১ সুধীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তা এবং রাষ্ট্রচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে কবির কিছু ইংরেজী প্রবন্ধ, যা 'The Marxian Way' (পরবর্তীকালে The Humanist Way') তে প্রকাশিত হয়েছিল, পড়া একান্ত প্রয়োজন। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং চিন্তার আদানপ্রদানও এবিষয়ে স্মর্তব্য। প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও সুধীন্দ্রনাথ চিন্তাজগতে মানবেন্দ্রনাথের শরিক ছিলেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনা, সুধীন্দ্রনাথের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে, গ্রা কফি হাউসের ত্রিতলে রেনেসাঁস ক্লাবে অথবা এস কে. দের (আই সি এস — যিনি সিকান্দার চৌধুরী নামে অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন) আড্ডায় উপস্থিত থেকে শোনবার সুযোগ আমাদের যৌবনকালে একাধিকবার হয়েছিল।

২. ১৩৩ পৃষ্ঠায়: 'জনযুদ্ধ' ঘোষণার উল্লেখে সি. পি. আই. শুধুমাত্র মানবেন্দ্রনাথ রায়ের যুদ্ধ-বিষয়ে মতবাদকেই সমর্থন করেছেন, যদিচ কার্যত মানবেন্দ্রনাথের রাজনীতিকে তাঁরা চিরদিনই বিরোধিতা করেছেন। সম্পাদক : উত্তরস্মৃতি

অরুণ ভট্টাচার্য

সহজিয়া পথঘাট

১ বাড়িটা বানানো দরকার। কেননা আমার
দেহকে আকাশ আর অবণ্যানী থেকে
গোপন করতে চাই।

বাড়িটা বানানো দরকার, তারই চারিদিকে
পরিখা থাকবে, জলে সহস্র হ ংস
পদ্মবাগান পাহারা দেবে। আমি
ঘরগুলিকে সুরক্ষিত করতে চাই।

বাড়ির জন্য বাগান দরকার। চারিদিকে
কাঁটাতারের ঘের অবশ্যই,
পূবে পশ্চিমে ময়দানবের প্রতিমূর্তি, উত্তরে
অহল্যার পাষাণ-আবক্ষ, দক্ষিণে

লাল পলাশের ঝাড়-বাড়ন্ত ঢেউ। এই সবের বন্ধনে
আমার ছোট্ট বাড়ি সুরক্ষিত। আরো
সুরক্ষিত করার প্রয়োজন আমার দেহকে
পৃথিবীর যাবতীয় ধূলিকণা থেকে।

আপাতত ঘুম যাও রমণী, স্বপ্ননিদ্রা যাও।

১৭. ৭. ৭৮

২ আমার সামনে রাস্তার ওধারে খাঁখ-খাঁখ করে বাড়ি উঠছে
ঝাউবনগুলি পালাচ্ছে নগর ছেড়ে যেদিকে চোখ যায়,
পরের লাইনে আবার বাড়ি উঠছে
ঘুঘুদের বৌঠান, যুবতী রেবেবা এবং হস্তিং এর ছেলেমেয়ের দল ভাবছে :
কোত্থেকে নেকটাই-পড়া সব উল্লুক আসছে,
যাই, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে উড়ে যাই সমুদ্রের পাড়ে।

আরো দূরে বাড়ি উঠছে, বাড়ি বাড়ি বাড়ির পর
কংক্রীট ইত্যাদির সমবোহ।
অবশেষে দেখা গেল
বাড়ি বাড়ি বাড়ি ইত্যাদির সীমানা পেরিয়ে
লক্ষ হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে কী যেন প্রার্থনার মত
বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছে, বলে যাচ্ছে।

আমি সেই সব অস্পষ্ট কথা শুনতে শুনতে
ময়দানবের শক্ত পেশীবহুল হাত দুটো মনে করতে পারছি।
১৯ ৭ ৭৮

৩ আমার এক বিলটু মাসী ছিল,
তার সঙ্গে আমার ভালোবাসা ছিল।
তাই, বিলটু মাসীর যখন বিয়ে হ'ল
আমি নদীর ধারে গিয়ে অঝোরে কাঁদলাম।

নৌকো করে বিলটু মাসী ঘোমটা মাথায়
শ্বশুর ঘর গেল। নৌকো আর ফিরলো না।
আমি প্রতিদিন নদীর ধারে যেতাম,
যদি বিলটু মাসী ফিরে আসে।
বিলটু মাসী এলো না।

এক বছর বাদে ফিরে এলো যে, হয়তো
সে অন্য এক নিটোল রমণী
আমি সঠিক তাকে আর চিনতে পারি নি।
২২ ৭ ৭৮

৪. আমাকে একজন বলেছিল, কলমীর চেয়ে
জলকলমী অবশ্যই সুস্বাদু।
আমি বস্তুত মাটি এবং জলের পার্থক্য জানতুম না।

আমার পুকুরে তাই আজকাল জলকলমী হলে আমি
তাকিয়ে থাকি। সবুজ রঙের লতানো
বৃক্ষশিশু আশ্চর্য আদর দেয় আমাকে। যখন কেউ
তুলতে যায়, বাধা দিই।

ওরা বাড়ছে বাড়ুক। লোককে বলি
হোক না সুস্বাদু, জলকলমী তুললে
ভগবান পাপ দেয়।

সম্ভবত সবাই আমাকে একটা আস্ত উজবুক ভাবে।
২৩. ৭ ৭৮

৫ ভরসন্ধ্যেবেলা পুকুরঘাটে বসেছিলুম। সূর্য ডুবেছে, কিন্তু
যাই যাই করে রাঙা পলাশ তখনো নারকোল গাছের চূড়ায়।
সেই অস্পষ্ট আঁধারেও
মাছগুলির ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি,—দেখছি
রমণ-ক্রীড়ায় কী আশ্চর্য জাদু।
ঘাই খাচ্ছে এক আধবার, আবার গভীরে
যাবার সময় সঙ্গিনীর সঙ্গে কী যে খুনসুটি।

কখন জানি না আমার ঘুম এলো, ঘুম।
আমি দীঘির অতলে ডুবে যাচ্ছি যেন
মনে হল, আমার দুটি পাখনা। গায়ে আঁশ,
রূপালি মসৃণ। ঘুম, ঘুম এলো
শীতল শরীরে।

ভোরবেলা কি মানুষেরা আকাশের
পাখি হয়ে উড়ে যেতে চায়।
২৩ ৭ ৭৮

* জানালা থেকে দেখছি ঝাঁক ঝাঁক মহিষ
নামছে জলে, বৃষ্টির জল জমে জমে
হয়েছে না পুকুর, না ডোবা।

ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি নেমে এল আকাশ থেকে,
সারাটা জল ফুলে ফেঁপে উঠছে, যেন তাদের
বাঞ্ছিত ক্রীড়াক্ষেত্র। কী যে সুখ দেয়,
সুখ দেয়। মহিষ বাথান থেকে
আসছে আরো দলে দলে, জলে নামবে বলে। জল
যেন শরীরের আরাম, ঘুম, মৈথুনের থেকেও প্রিয়
এক দুপুরের অনুভূতি। যেন
আচমকা ঘনকৃষ্ণ মেঘের দল উড়ে এলো আমার বাড়ির ছাদে,
স্পষ্ট দেখলুম, জানলা দিয়ে ঢুকে পড়লো
ঘরের মধ্যে।
২৪ ৭ ৭৮

৭ একটা জ্যান্ত বাড়ি আমাকে বেশ কিছুদিন থেকে
তাড়া করে ফিরছে। এর দরজা জানালা, খিলান

পুরনো নহবৎখানার বিস্মৃতপ্রায় সোহিনীর রেশ
আমায় যখন তখন বিরক্ত করছে।
মনে পড়ছে, বাড়িটা একেবারে নদীর পাড় থেকে
উঠেছে। যুবক-যুবতীরা রমণ করলে
তাদের ছায়া পড়ে জলে। আর
মাঝি-মাল্লার দাঁড় টানার ছলাৎছল শব্দ
যুবক যুবতীদের মুহূর্তে বিবশ করে দেয়।

আমি এই বাড়িটার স্মৃতি থেকে পালাতে চাইছি,
এমন কি কাল মাঝ-রাত্তিরেও
মন্ত্র পড়ে অভিশাপ দিয়েছি। দুদ্দাড়
বালিশ ছুড়েছি খাটপালঙ্কের চারদিকে।

সম্ভবত কোন বন্দিনী নারী গুণ করেছে আমাকে।
২৩. ৭ ৭৮

৮ রোজ সকালবেলা দুটি শালিখ
আমার বাড়ির সামনে
জলজঙ্গলে উড়ে এসে বসে।
প্রথমে জলের মধ্যে লুটোপুটি খায়, চারিদিকে
ডানা ঝাপ্‌টিয়ে জল ছিটোয়—আহা
কি নরম রৌদ্রে শালিখের পালকগুলি
খুশি হয়।

তারপর দুজনের স্নান শেষ হলে এ ওর
কাছে এসে বসে। কী সব কথা বলে, একান্তে
কিছু কিছু কথা আমি আজকাল বুঝতে পারি,
বাকিটা অস্পষ্ট থেকে যায়।

যে মুহূর্তে মনে হয়, ওদের কাছে ডাকি
মনে হয়, এই স্নান-করার এই ভালোবাসার
দৃশ্যটা আমি ধরে রাখি আমার বুকের মাঝখানে
ঠিক সেই মুহূর্তে দুজনে কোথায় দুষ্টুমি করে উড়ে যায়
২৭ ৭ ৭৮

৯ রমণীরা যখন নদীতে অবগাহনে নামে, যুবক
তুমি কি লজ্জা পাও
রমণীরা যখন নদীপথ ধরে ফিরে আসে, যুবক
তুমি কি মুখ ঢাকো।

টসটস্ করে মাথার ভিজে চুল থেকে
বুকের মাঝে জলবিন্দু পড়ে, যুবক
তুমি কি তা অপলক দ্যাখো নি।
কখনো শাড়ির আঁচল অবহেলায়
আধখানা সানুদেশ ঢেকে রাখে, যুবক
তোমার বুকের রক্ত কি উত্তাল হয়ে ওঠে না।

লজ্জা করো না যুবক, মুখ ঢেকো না।
পশ্চিমদিগন্তে ওই অস্তসূর্যের সোনালী আভার মত
রাঙা মেঘ জমেছে
ওই দুটি ভরন্ত বুকে। উদ্বেল হও, তাকাও
একবার সন্ধ্যাতারার দূরে, অন্যবার
ওই রমণীর দিকে।

২৮. ৭. ৭৮

কল্যাণ সেনগুপ্ত

দুটি শিশুকে

(সৃঞ্জয় ও ঋজন এর জন্য)

তোরা যা ভাবিস, যা-যা মনে হয়, তার মাঝখানে আমাকে নে।
আবোল-তাবোল কী এত বকিস্ ভুলেও প্রশ্ন করব না।
তোদের মনের নিরিবিলি ছায়াতে আমাকে শুধু ঘুমোতে দে।

অনেক বছর বেশি পৃথিবীকে দেখেছি তা ঠিক। কিন্তু কই
তোদের চেয়ে কি বেশি দেখা হলো ? 'জেনেছি অনেক' বলব'না।
তোদের বয়েস পেরোলে দু'চোখে কী থাকে, কেবল কুয়াশা বই ?

এত ভালবেসে যা-কিছু দেখিস তার মাঝখানে আমাকে নে।
বুকে তোর কী কী জমিয়ে রাখিস ভুলেও প্রশ্ন করব না।
তার-ই একপাশে যতটুকু ছায়া, অঘোরে আমাকে ঘুমোতে দে।

কলকাতা

কলকাতা মন্থন করে যতটা গরল
উঠেছে, তা চেটেপুটে খেয়েছে মানুষ।
'একদিন এ-শহরও অমৃতসম্ভব
ছিল'—ব'লে মাঝে মাঝে মুগ্ধ কথকতা
ক'রে যায় বন্ধু সুধাময়।

এখন কলকাতা নিংড়ে কিছুই মেলে না,
বিষ না, অমৃত না। বস্তুত এখন
মন্থন-অযোগ্য কলকাতা
একদিন জলে গড়া ছিল,
এখন কি কাঁচে ?

লোডশেডিং-এর পর

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতে সবাই কেমন অপ্রতিভ।
ঘণ্টা কয়েক অন্ধকারের স্পর্শে সবাই ভিন্ন মানুষ

একের মুখে সিক্ত মাটি, অন্য মুখে লতাপাতা।

সমর্থন

সদ্য পাটভাঙা ধুতি। তা'তে একটু কালি
ছিটিয়ে দেখছে মজা নিরাপদ দূরত্বে বালক।
কী করে রুষ্ট হবো? থমকে থাকি। বুকের ভিতরে
জমাট তুহিনে ক্লিষ্ট পাখিদের ওড়াতে ওড়াতে
এগিয়ে যাচ্ছে তার নিঃশব্দ হাততালি।

বসন

পৃথিবীর যাবতীয় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে
আকাশ ফাটিয়ে যারা তাণ্ডব করেছে কাল কীর্তনের নামে।
অন্যেরা অবান্তর। মূল গায়েনের ই দেখা ভোরবেলা পেলাম :
চোখ-নাক-মুখ সব স্বস্থানে। কেবল
যেখানে বিহিত কান, সাঁটা আছে দুর্ভেদ্য দু'পাটি দোমড়ানো তামা।

যে নিজে বিবর্ণ, তার প্রতিহিংসা এত
পেটাবে সবার কানে অদম্য হাতুড়ি?

প্রদীপ মুন্সী

১ কালো দেওয়াল

তুমি ডাকলে
যেন চীৎকারে চৌকাঠ নড়ে উঠল
বন্ধ কপাট
ভিতরে দ্বৈত খুনের সূচী
জোয়ারের লাল ফেনা
তুমি ডাকলে
যেন চীৎকারে বন্ধ কপাট কেঁপে উঠল
বুকের ভিতরে উপচে পড়ে একটি কথার সুর
বন্ধ কপাট দুলে উঠল ভেংগে পড়ল
ভূতের মতন উঠে দাঁড়াল কালো দেওয়াল

২. একদিন

একদিন
পথ ভুল হলে
ছায়া দীর্ঘতর হয়ে আসে
একদিন
ডাকের সাজ খুলে পড়ে
চিকন শরীরে হিম নামে
একদিন
মাটির গভীরে মাটি কাঁপে
লুপ্ত ঘণ্টা বেজে ওঠে
একদিন
আগুনের নীল শুধু একা জ্বলে

৩. ফেরার সময়

সব আভরণ খুলে ফেলে তোমার কাছে
যাবার সময়
বুকের ভিতর খুরের ধ্বনি তোমার কাছে
যাবার সময়
শিরায় শিরায় লাগাম ছেঁড়ার ডাক
যাবার সময়
কে জানতো
ফেরার সময়
রক্তে রক্তে হিম ঝরবে এমন

৪. বৃষ্টি হলে

বৃষ্টি হলে বড় বেশী ভারী হয়ে আসে
বুক।
বৃষ্টি হলে চোখের ছায়ায় ভেসে ওঠে আবছায়া
মুখ
বৃষ্টি হলে বড় ক্লান্ত ভার নামে শিরার
ভিতরে
বৃষ্টি হলে নিঃশব্দে বুকের ভিতরে তুষার চেরা হাওয়া
বয়
বৃষ্টি হলে বড় বেশী নিজেকে বড় বেশী ভার মনে
হয়

৫ মদের গেলাসে

মদের গেলাসে রাত ভোর
রাত ভোর মদের গেলাসে

উপুড় করা মুখ
জেগে ওঠে চোখের ভিতরে চোখ
বুকের ভিতরে বুক
কুয়াশা কুয়াশা আলোয়
ভিজে পায়ে
মুগ্ধ কিশোর একা ফিরে যায়

অশোক কুমার মহান্তী

১. প্রতীক্ষা

এমনি করেই প্রায়শঃ একটা চোখ
ঘোরে ফেরে আর খুঁজে ফেরে, যেন
অনেক কালের চেনা কোন লোক
এই পথ ধরে যাবে
তার বুকের উপরে দুলবে একটা বাঁধানো রামকৃষ্ণের ছবি
তার বুকের আড়ালে আদরে খেলবে একটা কালো বেড়ালের ছানা
চুলগুলো তার ভারে উড়ু উড়ু, নাকখানি তার রকেটের মতো
কিছুটা ছুঁচালো   কিছুটা আঙুর দানা
সে যে এই পথ দিয়ে যাবে   তা বলে নি
তবু মনে হয় হয়তো বা ভুলে   এই পথ ধরে যাবে

তার জন্যই প্রায়শঃ একটা চোখ
ঘোরে-ফেরে আর খুঁজে ফেরে সারাবেলা

২ প্রিয় হে অনুপম

ঈষৎ ব্যর্থতা থাক এবং সাফল্য কিছু কিছু
আমরা জলের মতো সাবলীল, আমরা হাওয়ার মতো অনাময়
হে প্রিয়, হে অনুপম, সুখী
তোমার আনন্দ ক্রমবর্ধমান, যদি হয় হোক
আশীর্বাদ রেখো শুধু চুলের নিপাট ভাঁজে
যেন পাথর কুচির ভয়ানক
পাহাড়চূড়ার মতো ক্লেশকর
অস্তিত্বের অনুভব পাই
হে প্রিয়, হে মহাশয়, বিচুটির পাতা
তোমার আনন্দ ক্রমবর্ধমান, যদি হয় হোক্
আশীর্বাদ রেখো শুধু করুণ মাংসের ত্বকে
যেন চাবুকের মতো আরো আর্তনাদ
অন্নের ক্ষুধার মতো অন্ধকার
মহাদুঃখে পরিত্রাণ পাই
হে প্রিয়, হে অনুপম, কুলিশ-কঠোর

৩. কিছু কিছু

প্রত্যেকের কাজ থাকে
প্রত্যেকের কিছু কিছু চেনাজানা থাকে
দেশী হাওয়া বিদেশী হাওয়ায়
অগ্নিকোণে ঝড় এলে একাকার তেঁতুল শিমুল
প্রত্যেকের নাম আছে, প্রত্যেকের ধাম আছে, সময় নিবাস
ঠিকানার খোঁজে গেল পারাবত ডানায় অমল ক্লান্তি জমে
কিছু কিছু মূলাক্ষরে ফুটে থাকে জীবন দোপাটি
জীবনের অর্থ থাকে গভীরে, বিস্ময়ে, ভয়াবহে

৪. অভিযান

এখন আমার পবিত্র দিন কুলায় কাঁপে রোদ
সূর্য থেকে দীর্ঘ ছায়া নামছে চঞ্চুপুটে
রাঙা বসন পাট করেছি চলব অভিযানে
মাঠ পেরিয়ে ঘাট পেরিয়ে শূন্য তেপান্তরে

শূন্যে গেলে একলা যাবো থাকবে তুমি ঘরে
মৃত্যু কঠিন দাঁত ভ্যাঙচায় চলার অভিমান
নারী এবং স্বংম্বরা দু'দিকে দুটো ফাস
জীবন যদি লাগাম টানে মরণ টানে ঘোড়া

কবিতার ভাবনা (৯)

অরুণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'মহিলা কবি'। 'বঙ্গের মহিলা কবি' এমত রচনাও আছে। সাহিত্যের ইতিহাসকারের পক্ষে এ ধরণের গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা যারা কবিতার আলোচনা করি, মহিলা কবিদের 'মহিলা' বিশেষণে ভূষিত করে সত্যি কি তাঁদের গুণান্বিত করি। এটা ভাববার। এই কথাটা বিশেষ করেই মনে হচ্ছে এ কারণে যে বাংলা দেশে এবং বাংলা ভাষায় হাল আমলে বহু মহিলা কবি লিখছেন যাঁদের প্রসঙ্গে 'মহিলা' বিশেষণটি পৃথকভাবে প্রয়োগ করবার প্রয়োজন দেখি না। তাঁরা 'কবি' বলেই চিহ্নিত হতে পারেন। তাঁদের রচনা শুধু যে 'মেয়েলিপনা'-বর্জিত তাই নয়, উৎকর্ষ-বিচারে সমকালীন 'পুরুষ' কবিদের থেকে তাঁদের কারু কারু রচনা উচ্চমানের না হলেও অন্তত সমমানের বলেই আমার মনে হয়েছে।

আমরা যখন স্কুলে পড়তুম, পাঠ্যপুস্তকে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতির কবিতা মুখস্থ করতে হ'ত। সেকাল ছিল বাহির-মহল ও অন্দর মহলের যুগ। দুটি পৃথক জগৎ—পৃথক তাঁদের অস্তিত্ব। সেকালে একজন পুরুষের পক্ষে বি. এ পাশ করা একটা ঘটনা, মহিলাদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। সুতরাং কামিনী রায় যখন বি এ পাশ করে বেথুন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলেন সেটা বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতে একটা ঘটনা ছিল। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন বছর পরে জন্মে কবিগুরুর মৃত্যুর আট বছর আগে তিনি মারা যান। পারিবারিক জীবনে তিনি 'সুখ' বস্তুটির আভাস পান নি। এবং সে অনুভূতিরই স্পষ্ট প্রতিফলন ছিল তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতায়। সেই কবিতাটি বারো পংক্তি মুখস্থ বলতে পারলে, দাঁড়ি কমা শুদ্ধ নির্ভুল বানানে, তৎকালে বারো নম্বর পাওয়া যেত। কিন্তু কবিতাটির মূল্য ওই বারো নম্বর ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। এখন, এই বয়সেও,

কবিতাটির গূঢ়ার্থ আমাদের রীতিময় ভাবায়। সেকালের বড় কবিদের সঙ্গে একালের অনেক কবিদের একটা জায়গায় তফাৎ মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। সেটা এই তাঁরা যেটুকু পরিধির মধ্যে বাস করতেন, সেই অভিজ্ঞতাটুকুর নির্যাস আমাদের গভীর গভীরতর ভাবেই পরিবেশন করতেন—মহিলারা যেমন অন্দরমহলের কবি হতেন তেমন সেই অন্দরমহলটুকুই পাঠকের কাছে নিপুণ ভাবে তুলে ধরতেন। এখনকার কবিরা অনেক 'চতুর' হয়েছেন। যা জানেন না, যা অভিজ্ঞতার সীমানার বাইরে তাকেও যেন 'অনায়াসে জানেন' বলে কাব্য সাহিত্যে চালাবার চেষ্টা করে থাকেন। অর্থাৎ সাংবাদিকতার প্রভাব পড়েছে এমন কি কবিতাতেও। কামিনী রায়েরা এটি কখনো করতেন না। তাই 'সুখ' কবিতাটি যখন এই বয়সেও আবার পড়তে বসলুম মনটা উন্মনা হয়ে গেল। তাঁর কথাগুলি যে তাঁরই জীবনের গভীরতম অন্দরমহল থেকে উৎসারিত। —আর কবিতাটি রচিত হবার এত দীর্ঘ দিন বাদেও তাই আমাদের ধাক্কা দেয়। তখন কিন্তু 'মহিলা' কবি বলে আর সীমারেখা টানতে মন চায় না। এমন কোন সাহিত্য-রসিক সেকালে ছিলেন না যিনি এই চারটি পংক্তি মুখস্থ বলতে না পারতেন :

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কবিতায় অবশ্যই একটা প্রচণ্ড 'মর‍্যাল' টোন আছে যাকে আমরা সাহিত্যের পরিভাষায় 'ডাইডাকটিক' বলে থাকি, কিন্তু এই 'ডাইডাকটিক' টোন আছে বলেই কি কবিতাটি আধুনিক কালের কবিদের মপঃপূত হবে না? মিল্টনের কবিতাও তো তাহলে সেই দোষে দুষ্ট. গ্রীক নাটকের ছায়ায় রচিত অমন যে 'স্যামসন অ্যাগনিস্টেস', তারও শেষ দিকে অভিজ্ঞতার সারাৎসার 'Calm of mind all passion spent' জাতীয় পংক্তি, তাও একটি নীতিমূলক ধারণার পরিণতি নয় কি? কোন বিশেষ ধরণের বক্তব্যই কি কবিতার গূঢ় রহস্যকে আহত করতে পারে? অর্থাৎ আমার ভাবনা এই, কোন কবিতায় নীতিবাগীশতা থাকলেও তা বড় কবিতা হয়ে যেতে পারে, যদি কবি তাঁর কবিতাটিকে কি করে রসবস্তুতে উত্তরা করতে হবে তার হদিস্ জানেন।

কামিনী রায় পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন, স্বাধীনতার মুখ দেখতে পান নি। স্বাভাবিকভাবেই পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে এবং সমকালের সব কবিকেই ভয়ানকভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। দেশকে মাতৃরূপী কল্পনা করার মধ্যে অবশ্য নতুনত্ব কিছু নেই—সকলেই করে থাকেন (অবশ্য ইয়োরোপের কোন কোন দেশ 'পিতৃভূমি' নামে পরিচিত) এবং দেশমাতৃকার জন্য চরম ত্যাগের একটা সংকল্প বাক্যও অনেক কবি করে থাকেন। বলাই বাহুল্য, এসব কবিতায় ভাবাবেগ প্রকট হয়ে অনেক সময় দেখা দেয়, তবু কামিনী রায়ের এমন একটি কবিতার পংক্তিগুলিতে লক্ষ্য করা যায় সুন্দর লিরিক্যাল মেজাজ

> গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার
> মরিব তোমারি তরে—মা আমার মা আমার।

'মা আমার, মা আমার' ঘুরে ফিরে বারবার একটি বিষণ্ণ অথচ স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কামিনী রায়ের কাব্যগ্রন্থগুলি আর কি পাওয়া যায়, 'আলো ও ছায়া', 'দীপ ও ধূপ', 'মাল্য ও নির্মাল্য'—এইসব ?

বরিশালের মেয়ে ছিলেন কামিনী রায়, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। আর প্রিয়ংবদা দেবীর বাড়ী ছিল পাবনায়। মার নাম ছিল প্রসন্নময়ী দেবী। প্রায় সাত আট বছরের ছোট ছিলেন তিনি কামিনী রায়ের চেয়ে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই তিনিও মারা যান। কিন্তু মধ্য জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার তাঁর সুযোগ হয়েছিল। তাঁর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যাক—যা মনে হবে হয়তো বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা হতেও পারে।

> পরিব্যাপ্ত নীলিমায় সম্মুখ আকাশে
> নির্মল প্রসন্ন দৃষ্টি সূর্যরশ্মি হাসে
> বরদাত্রী অভয়ার মত, দূরতর
> দিগন্তসীমায় ঘন কৃষ্ণ মেঘস্তর
> নেমেছে প্রান্তরে

ইত্যাদি। স্মরণীয়, মালার্মের 'লা জ্যুর' অবলম্বনে সুধীন্দ্রনাথের 'নীলিমা' নামক কবিতার কিছু কিছু অংশ এই কবিতাটির ধার ঘেঁষে যায়। নিছক চোদ্দমাত্রা পয়ারে আবদ্ধ বলেই নয়, শব্দ ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ দৃঢ়সংবদ্ধ প্রয়াসে এই মহিলা কবি কি সত্যি সুধীন্দ্রনাথের পূর্বসূরি ছিলেন ? গবেষকরা এ নিয়ে ভাবতে পারেন

হয়তো বা কোনদিন। এঁরও বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, 'রেণু', 'তারা' ইত্যাদি তৎকালীন পোষাকী কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও 'পত্রলেখা' বলে একটি বই ছিল। এই নামটি বহু পুরাতন, কিন্তু বড় নবীন। কবির মানসিকতাকে হঠাৎ চেনা যায়। মানকুমারী বসুর কবিতাও আমরা পড়েছিলাম। বড় স্নিগ্ধতা রয়েছে তাঁর কবিতায়। কামিনী রায়ের মত জনপ্রিয় তিনি ছিলেন না, কিন্তু কবি পরিবারের মেয়ে ছিলেন, মাইকেলের ভ্রাতুষ্পুত্রী হিসেবে নিশ্চয়ই কবিতার অন্দরমহলে তাঁর সহজ প্রবেশাধিকার ছিল। কামিনী রায় এবং প্রিয়ম্বদা দেবী —দুজনার চাইতেই তিনি বয়সে বড় ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুবছরের ছোট। দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৩ এ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুবছর বাদে মারা যান। তাঁর দুটি বই একদা কাব্যরসিকদের কাছে প্রিয় ছিল, 'কনকাঞ্জলি', 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি। কবিতা যেন ঈশ্বরের কাছে ফুলের মত উপহার—যা অঞ্জলি-পুটে নিবেদন করাতেই সার্থক। এরকম একটি ধারণা—শুদ্ধতার বা শ্রেয়সের, সেকালের প্রায় অনেক কবিতেই দেখা যেত।

ছোটবেলায় পড়া এই সব মহিলা কবিদের জগতের সঙ্গে আজকের দিনে ১৯৭৯ তে যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের জগতের প্রায় কোন মিল নেই বললেই চলে। যে সময় একজন মহিলার বি এ পাশ করা সংবাদপত্রের ঘটনা ছিল, এখন মধ্যবিত্ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নবিত্তদের ঘরেও কোন মেয়ের বি. এ পাশ না-করাটাই ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাজে নেমেছে—আধুনিক জীবন ও জগতের প্রায় সবরকম অভিজ্ঞতার ধাক্কা তাদের শরীরে লেগেছে। সুতরাং মানসিক চেতনাও নানাভাবেই বিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় কবিতার কথা, কবিতার ভাবনা, ভাষা এবং শৈলী যদি বদলায় তাহলে তাই-হবে স্বাভাবিক। একজন কবির কয়েকটি ইতস্তত পংক্তি উদ্ধার করছি

১. যন্ত্রণা আমাকে কাটে, যেমন্ পুঁথিকে কাটে উই

২ হৃদয় ফেরৎ চাই। মহাজন, বিশ্বাস করুন
সুখ সুখ করে আর আপনাকে ঘোর জ্বালাব না।

৩ কাল রাত্রে হঠাৎ বুকের মধ্যে কিরকম ঠাণ্ডা মেরে গেল।

কামিনী রায় বা মানকুমারীর কবিতা থেকে আমরা যেন অন্য দিগন্তে পৌঁছে

গেলুম মুহূর্তে। প্রাচীনগণ অবশ্য বলতে পারেন, এর মধ্যে তুমি কবিতা পেলে কোথায়? সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, যার উত্তর সহজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি ভাবা যায় এই সব পংক্তিগুলি একজন গালের কবিরই লেখা এবং সেই কবি মহিলা—তাহলে প্রাচীনাগণ তো বটেই, অনেক আধুনিকও অস্বস্তিতে পড়বেন।

এই সব পংক্তি যিনি লিখেছেন তিনি এ যুগের, এ জগতের অধিবাসী—আগেই বলেছি ১৯৭৯ তে এসে যিনি বয়সে যৌবনের প্রান্তে, তাঁর অভিজ্ঞতার সমান্তরাল ঘটনাবলী বিশ্ব জুড়ে, এবং এই কলকাতাতেই তিনি বিশ্বের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন, ইচ্ছে হলে। কিন্তু এই কবির বাচনভঙ্গি রবীন্দ্র-আরতি ও কবিতার পরিমণ্ডল থেকে দূরে স্থাপিত হলেও, মানসিকতা এবং দৃষ্টিভংগির পার্থক্য থাকলেও যে মূল বিষয় কবিতার উপজীব্য তা কি কিছু ভুঁইফোঁড়? মনে তো হয় না। যন্ত্রণার বোধ যে কোন পুরুষ বা নারীর হতেই পারে—বিশেষ করে অনুভূতি-সচেতন কবির পক্ষে তার তীব্রতা নিশ্চয়ই আরো বেশী। পুরাকালেও উই পুঁথিকে কাটতো। সুতরাং এই দুটি ঘটনা কিছু আধুনিক কালের বিশিষ্ট ঘটনা নয়। বিশিষ্ট হচ্ছে যন্ত্রণার অভিব্যক্তিকে 'কাটা' এই ক্রিয়াপদ দিয়ে বোঝানো—এবং উই যে পুঁথিকে কাটছে সেই কাটবার পদ্ধতির সঙ্গে কবিকে যন্ত্রণা যেভাবে বিদ্ধ করছে তার একটা সমীপ্য আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া। এতে নতুনত্ব আছে, চমক আছে, চিরাচরিত উপমা প্রয়োগ থেকে সরে এসে একটি নতুন ভূমির ওপর একে দাঁড় করানোর সাহস এই কবির আছে। এ প্রসঙ্গে স্বীকার্য, নিছক নতুনত্ব বা চমক সৃষ্টি কবিতার প্রধান গুণ তো নয়ই, বিশেষ গুণও নয়। সে আলোচনার দিকে আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু এই কবি যে আমার স্থবিরত্বকে জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলেন এবিষয়ে তো আমার সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি উৎসুক হয়ে উঠতে বাধ্য হই। এই কবিরই দুঃসাহস রয়েছে তাঁর কবিতার মধ্যে এমন সমস্ত শব্দ সংযোজনার যা আপাতদৃষ্টে কবিতার ভাষা হবে না বলেই মনে হতে পারে। যেমন 'সাপের জিভের খ্রিকখ্রিক', 'আগুপিছু', 'পায়তাড়া', 'ফালাফালা', 'ভুলভাল,'—অথবা ধরা যাক্ এই সব শব্দগুচ্ছ 'হাত-ফেরতা মাল', 'বিকল্প সেকেণ্ড হ্যাণ্ড', 'ছেড়ে দিচ্ছে ডামচিপে', 'মডেলটা যথেষ্ট লেটেস্ট', 'কোন চান্স নেই'। বস্তুত এই কবি বোধহয় জেনেছেন, কোন শব্দই পৃথিবীতে বাতিল করবার নয়। সমস্ত শব্দই

অনন্ত শক্তি ধরে। তাদের এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যে সেই সব শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সুষমা বাক্যবন্ধে জমাট হয়ে একটি অর্থবহতায় সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু শুধু পৌরুষ নয়, কারুণ্য এবং স্নিগ্ধতাও যে কত সহজে এই কবির কাছে ধরা দিয়েছে তা এই কটি পংক্তিতেই অনুমিত হবে

১ কাল রাতে, সে আমাবে ঘুমাতে কহিল বড় স্নেহে—
(জীবনানন্দের ছায়া হঠাৎ এসে পড়েছে কি ?)

২. কুঁড়িতে ভাঙ্গিয়া দিও তেমন বাসনা যদি ফোটে ('ভাঙ্গিয়া' ক্রিয়াপদ কি কুঁড়ি 'ছিঁড়া'র সমার্থক ?)

৩ ঈশ্বর আমাকে তুমি যৌবন যাবার আগে দিও না মরণ।

এই কবি কবিতা সিংহ, যিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সহজ সুন্দরী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে পরিচিত হয়েছিলেন প্রায় চোদ্দ বছর আগে। তাঁর একটি নিশ্চিত আসন বাংলাকাব্যে স্থির হয়ে গেছে। 'কবিতা পরমেশ্বরী' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—বিদ্যুৎ চমক নেই, কিন্তু রয়েছে মননের গভীরতা। অন্যত্র আলোচনার অবকাশ রইল। আমি কবিতা সিংহকে সেই কবি মনে করি যিনি রবীন্দ্র-অনুসারী মহিলা কবি জগতের এবং ১৯৭৯ এর মধ্যে অন্যতম প্রধান মহিলা কবি যাঁকে আর 'মহিলা কবি' বলে পৃথক করবার প্রয়োজন হয় না। তিনি পুরুষদের সঙ্গে একাসনে তাঁর স্থান করে নিয়েছেন অনেকটা যেন 'ইন হার ও-রাইট্'। বরং চ অনেক 'পেলব' পুরুষ কবিদের থেকে এই মহিলা কবির 'পৌরুষ' আমাদের চমৎকৃত করে। এরকম একটি বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল।

আর একজন কবির কথা মনে পড়ছে—যিনি আমাদের থেকে একটু প্রবীণ, কিন্তু সাহসে যিনি তুখোড, যিনি রীতিমত পড়ুয়া কবি, গ্রীক সাহিত্য এবং ইংরেজী সাহিত্যে সমান অধিকার। তিনি শ্রীমতী বাণী রায়। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি সারাজীবন প্রেমের সন্ধান করেছেন। প্রেমিক তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গিয়েছে—কিন্তু আকুল প্রার্থনা তাঁর

বাতাস, বাতাস তুমি, তুমিও পাগল,
নিয়ে এস, নিয়ে এস চেতনা তাহার,
বলে দাও, এতটুকু ভালো সে-ও বাসে,
তুমিও বিক্ষুব্ধ হও তারি দীর্ঘশ্বাসে।

এই কটি পংক্তি যে কোন বড কবির গভীরতম পংক্তির সংঙ্গে সমান তুলনীয়। উমা দেবীও বোধহয় বাণী রায়ের সমবয়সী। একজন ইংরেজীর, দ্বিতীয়া বাংলার অধ্যাপিকা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের ওপর উমা দেবী একটি বিরাট কাজ করেছেন। যদিচ এটি তাঁর গবেষণা পত্র ছিল, তথাপি তথাকথিত গবেষণার চাইতে এটি অনেক মূল্যবান, চিরস্থায়ী আবেদনে। উমা দেবীও প্রেমের কবিতায় আর্তি জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ধরণ পৃথক

আমার প্রেমিক নেই। কিম্বা কোন বান্ধবসংহতি

তবু আমি সুখে সমাসীন

কারণ তিনি 'আনন্দে একক' থাকবার সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন বলে বিশ্বাস করেন। বয়সী কবিদের মধ্যে রইলেন প্রবাসীনী রাজলক্ষ্মী দেবী, দীর্ঘকাল থেকেই 'কবিতা' পত্রিকায় এঁর কবিতা পড়েছিলাম আমরা। ভারী আশ্চর্য একটি স্বাদ রয়েছে এঁর কবিতায়

এই নারী মোমের মতন—

এই নারী ধূপের মতন—

এই নারী ছায়ার মতন

হলেও, এখনো ঠিক তথাগতা নয়।

যত্রতত্র কি এমন সব পংক্তি বাংলা কবিতার সংকলনে পাওয়া যাবে? এ বছরের আকাশবাণী আয়োজিত বিশেষ কবি সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে ভালো লেগেছিল।

এই সব প্রতিষ্ঠিত কবিদের পাশেই আরো বেশ কয়েকজন কবিকে আমার উজ্জ্বলচিহ্নিত মনে হয়। তাঁদের কবিতা আমি যত্ন সহকারেই পড়ি। জানিনা কেন, তাঁদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও চোখে পড়ে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সবিশেষ পরিচিত, কবিতা-ব্যতিরেকে অন্য নানাবিধ কারণেও। কেউ কেউ শুধু কবিতাই লেখেন, কবিতাই তাঁদের পরিচয়। প্রথম শ্রেণীতে আছেন কেতকী কুশারী ডাইসন, নবনীতা দেব সেন, দ্বিতীয় সারিতে আছেন সাধনা মুখোপাধ্যায়, প্রকৃতি ভট্টাচার্য, এবং বিজয়া মুখোপাধ্যায়। প্রথম দুজনের কবিতায় তাঁদের অর্জিত মননশীলতার ছাপ রয়েছে—যা নাকি কবিতার সঙ্গে কোথাও একাত্ম হয়েছে, কোথাও তেলজলের মত পাশাপাশি ভাসছে, কিন্তু

শেষের তিনজন কবিদের মধ্যে নির্ভেজাল কাব্যরসটুকু আমি আস্বাদন করি।

জলের অতল বড় জাদু জানে
ওর মায়ামুকুরে মুখ ডুবোলে দারুণ অভিশাপ
তোকে ভুলিয়ে নিতে কতক্ষণ
জলের খেলা বড় ভয়ংকর
না থাক, ডাকিস্ না তাকে
তারা সবাই সরে যা রে, যা

(জলের অতল বড় জাদু জানে প্রকৃতি ভট্টাচার্য)

এবং আর একটি কবিতার অংশ

কী ভাবে প্রমাণ হবে, ভালবাসি
মুখে হাসি, অনুভবে ভ্রূভঙ্গ প্রলাপে ?
অথচ বাহিরে এই তীক্ষ্ণ সূর্যতাপ
ত্বক পোড়ে শুকোয় নবনী

(অপ্রমাণ বিজয়া মুখোপাধ্যায়)

'জলের খেলা বড় ভয়ংকর' এবং 'ত্বক পোড়ে শুকোয় নবনী'—এই দুটি পংক্তি রীতিমত ঈর্ষণীয় আমার কাছে। আমাকে এ সং কবিতা বেশ গভীরে নিয়ে যায়। এঁদের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক। তবে কি না—বস্তুত এরা তো 'মহিলা কবি'ই। কর্তাদের সময়মত চা দিয়ে, উনুন নিবে গেলে কয়লার খোঁজ করে—ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে সময় পান কি এঁরা কবিতা চর্চা করবার। দোষ বোধহয় কর্তাদেরই। এদের একটি স্বতন্ত্র নাম দেওয়া যায়—'মহিলা কবি'র পরিবর্তে 'গৃহিণী কবি'। সমালোচকরা ভেবে দেখবেন, এই নামটা চলে কি না।

আরও এক গুচ্ছ কবি রইলেন। এঁদের লেখা যত্ন করে পড়ি। তবে বয়সে এঁরা বোধহয় যথেষ্ট বয়সিনী নন। আর একটু অপেক্ষা করতে পারেন, আলোচনা শোনবার জন্য। দিন তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এরা কেউ কেউ হলেন দেবারতি মিত্র সুচেতা মিশ্র, রমা ঘোষ, শিখা সামন্ত, স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়—এঁদের সামনে অনেক সময়। এমন কবিতা লিখুন যার অন্তত একটি দুটি পংক্তিও যেন আমাদের মনে শক্ত গেঁথে থাকে, চেষ্টা করলেও উপড়ে ফেলা যাবে না সহজে।

নতুন কবিতা

[বাংলা আধুনিক কবিতার জগতে সবচেয়ে বড় এবং নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে 'উত্তবহুরি'র পৃষ্ঠায়। গ্রাম বাংলার এবং কলকাতার, শহরতলীর এমন কি বাংলা দেশের অজস্র অসংখ্য 'লিটল ম্যাগাজিন' থেকে অতি যত্নে কবিতা উদ্ধার করে সম্পাদক প্রমাণ করেছেন কত ভালো কবিতা অনাদরে অবহেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। বাংলা কবিতার ইতিহাস যেদিন সঠিক লেখা হবে তখন এই নিঃশব্দ বিপ্লব একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে থাকবে।]

অমিতাভ মৈত্র

সৈকতাবাস থেকে

জলের উল্লাস আজ স্পর্শ করে আমাকেও, এইখানে মধ্য দুপুরে
অদূরেই তটরেখা, জল প্রণামের মতো ছুঁয়ে যায়—
এবং গভীরে যায়, ফিরে আসে, খেলাছলে জল আর বিষম বালির
ঈষৎ দূরত্ব থেকে আমি দেখি এই সব, আমি দেখি সামুদ্রিক সাপ
শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে কি, জল ও বালির বিভাজনে
যেন স্বপ্ন শেষ হলে ফিরে যাবে বর্ণময়, আলোর ভিতরে
যে আলো জলের কাছে ঋণী
আমিও কি ঋণী নই অই কার্পাসের কাছে মানুষের বিষাদের কাছে ?
আমিও কি ঋণী নই নিহিত জলের কাছে, তার নীল সন্ন্যাসের কাছে ?
জলের সন্ন্যাস আজ বিদ্ধ করে আমাকেও,
আমি আজ তার কাছে যাবো
জলজ লতার মতো আমিও নষ্ট হবো শ্যাওলার প্রকীর্ণ সবুজে।

অন্তর্ধর ও গৌরব। ৩, ড্যানিয়েলস্ লেন, গোরাবাজার, বহরমপুর

নিমাই মান্না

'প্রবেশ নিষেধ' মুছে

[দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি-সংগ্রামী সলোমান রাম্মাংগুর নিষ্ঠুর হত্যায়]

'প্রবেশ নিষেধ' আঁটে স্বার্থপর দৈত্যকুল
আমাদেরই সাজানো বাগানে।
বসন্তের দামাল দাপট ঘিরে রাখে আমাদের চোখের আড়াল,
সম্মুখে প্রাচীর আঁটে রক্তহীন ভাবীভারী লৌহ যবনিকা।
অলীক স্পর্ধায় ফুঁসে হত্যাকারী বলে ওঠে
রক্তের নদীর ধারায় ধুয়ে দেবো সভ্যতার সমস্ত ভঁড়ার
দুর্বার গতিতে হাটে দুরন্ত মানুষ
থোকে-থোকে জেগে ওঠে অরণ্যের সুগন্ধি সৌরভ,
পৃথিবীর সব নদী জেগে ওঠে,
জেগে ওঠে ব যুস্তবে সুগভীর দুন্দুভির সাড়া,
বাতাস আক্রোশে জাগে।
'প্রবেশ নিষেধ' মুছে
প্রতিদিনই ফোটাব আমরা অবাক কমল॥

জোয়ার। মহানন্দা প্রিন্টার্স, রবীন্দ্র অ্যাভেনিউ। মালদহ

অমল কুমার বর্মন

বিক্ষোভের তিনটি কবিতা

এক

চোখের সামনেই চোখ ছুটে আসে অদৃশ্য হাওয়ায়
চকচকে টকবগে মসৃণ পালকের মতো
গোপন কিছু কারুকার্য, চিঠির শব্দে উড়ে যায়
রক্তলাল রুমাল, কিছু পলাশের গন্ধে ছন্দময় কথায়
চোখের সামনেই চোখ, বিক্ষোভ
জ্বলে ওঠে শহরে রাজপথে অদৃশ্য হাওয়ায়॥

দুই

কথায় কথায় সবকিছু শেষ হয়
দিন দিন দিনরাত্তি শেষ হয়
নতুন কিছু কথায় জন্ম হয়
বক্ত বেরক্ত চোখের বিক্ষোভ
মেঘনা যমুনায়।

তিন

এইখানে বারুদ জ্বলে ওঠে জ্বলজ্বলে
অই বুকে, অই সুন্দরী নগরীর বুকে
নিশ্চুপ কথার মতো বিক্ষোভে।

শঙ্খ। C/o আশুতোষ দত্ত, ডক্টরস্ ক্লিনিক, স্টেশন রোড, রংপুর। বাংলাদেশ

মৃদুল দাশগুপ্ত

আমরা এসেছি

পাতার সবুজ নিয়েছি বলেই এতো টগবগে
ছুটছি, আবার কখনো ইচ্ছে, আকাশে ওড়ার,
তাহলে প্রকৃতি, কিছু নীলমেঘ চাই আমাদের
মাটিতে নামাবো সূর্যদেবের সাতখানা ঘোড়া,

আমরা এসেছি ওঠো, ফুলমণি, দাও খেতে দাও,
আমরা এসেছি উড়িয়ে আকাশে নীল লণ্ঠন,
আমরা এসেছি, আজ আমাদের—আমাদের সব—
'ভালোবাসি' এই মন্ত্র জেগেছে হাজার কণ্ঠে,

আজ আমাদের ইচ্ছে হয়েছে আকাশে ওড়ার,
পাথর ফাটিয়ে মাটিতে নামাবো পাগলা ঝোরা।

শোনপাংশু। ২৮/২ কাটাপুকুর লেন, কদমতলা। হাওড়া ৭১১ ১০১

অশোক সেন

ইচ্ছে করে

একটি মেয়ের বুকের শীতল ছায়ায়
ইচ্ছে করে দুপুর রোদে বসি
একটি মেয়ের নিজস্বতার মায়ায়
ইচ্ছে করে হাওয়ার মতো মিশি।

ছড়িয়ে আছে চোখের সমুদ্দুর
অবগাহন সারা সকাল বেলা
এলোমেলো কালো চুলের ঝড়ে
বিরামবিহীন সমর্পণের খেলা।

অমন একটি মেয়ের জন্য আমার
বিকিয়ে গেল নিজস্ব ক্ষেত খামার।

জোয়ার। মহানন্দা প্রিন্টার্স, রবীন্দ্র অ্যাভেনিউ। মালদহ

জয় গোস্বামী

একটি বিদেশী কবিতা

হঠাৎ ফুটে উঠলে নতুন ক্রিসনথিমাম
তোমার কী নাম ?
কী নাম তোমার সোনালী চুল সঙ্গিনীটির ?
সান্ধ্যগীতি ?
ছদ্মনামে তোমরা দুজন কী কৌশলে
কুসুম বলে
ছড়িয়ে দিলে পুরোনো হাড় কয়েক টুকরো—
তেমন উগ্র
আগুন কিন্তু হাড়ের মধ্যে আর ছিলো না ;

এখন জানি বার্সিলোনায়
সেই যুবাটির কবর আছে, বাগানটি তাব
প্রায়ান্ধকার
চোখের মত, লোক আসে না একটা দুটোও—
হঠাৎ তাকে উপক্রত
করতে এলে কী নাম তোমার, তোমার কী নাম
সন্ধ্যেবেলার ক্রিসনথিমাম ?
তখন কী মাস ? বাংলা দেশে সেদিন পুজো—
পুরোনো গ্রাম দেখতে গেলে তোমরা দুজন....
ফেরার সময় আকাশ ভরা মিথ্যে ফুলের প্রকল্পনা
ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে নিও আবার—আমি 'না' বলব না।

শোনপাংশু। ২৮/২ বাঁটাপুকুর লেন, কদমতলা ॥ হাওড়া ৭১১ ১০১

আবু হেনা ইকবাল আহমেদ

আমাদের জাহাজ এখন

আমাদের জাহাজ এখন
মাঝদরিয়ায় দিক্‌চিহ্নহীন
লুপ্তসব যোগাযোগ—
আমরা এখন পৃথিবীর বিপন্ন জনপদ।

কোন দিকে যাব ?—
: 'ডাইনে'।
তারস্বরে চীৎকার করে ওঠেন আরেক ক্যাপটেন
: 'আমার অভিজ্ঞতা আছে এই সব লোনাজলে

আশৈশব, বাঁয়ে কেটে যেতে হবে দক্ষিণ
বরাবর—নিরাপদ আশ্রয়ে'

এরি মাঝে জমে গেছে নিজস্ব ভূমিকার
মহড়া।

অশান্ত উর্মিতে টলে ওঠে এই বুঝি
ডুবতে ডুবতে জেগেছে জাহাজ,
বোঝাই যাত্রী—
অবাক বিস্ময়ে কেউ কেউ ফিরে ফিরে দেখে
'ঘর্মাক্ত চোয়ালে পতাকার মত কে ঐ মাস্তুলে'। 'দেবদূত'।
'পাটাতনে বিবোধী সিদ্ধান্তে অটল নাবিকের বহর'
কখনো বা লোনাজল ভেদ করে জেগে ওঠা
স্বদেশের মুখ,—আহা। নিরাপদ আশ্রয়—
আমাদের জাহাজ এখন।
মাঝদরিয়ায় দিক্‌চিহ্নহীন
লুপ্ত সব যোগাযোগ

আমরা এখন পৃথিবীর বিপন্ন জনপদ।

শব্দ। C/o. আশুতোষ দত্ত, ক্লিনিক, স্টেশন রোড রংপুর। বাংলাদেশ

আলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

অতর্কিতে বিক্রী হয়

প্রত্যেক মানুষের একান্ত প্রয়োজন কিছুটা সময়
আত্মগত অন্তর্মুখী নিবিড় হবার মতো
কিছুটা সময়
অথচ অতর্কিতে বিক্রী হয় বাড়িঘর দোকান বনানী
নিলামের ডাক বাড়ে ক্রমাগত অচিন দুপুরে
যেমন গিয়েছে ফিরে কোলাহল বেদনায়
মাথামাখি রক্তাক্ত শরীরে
প্রতিহত মানুষের দল
ভুরুর প্রতিটি খাঁজে চিবুকের ভাঁজে
জমা আছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ যাহাদের
আমাদের কবিতায় এমন কি জীবনযাপনে
বিশাল হর্ম্যের শব্দে ছায়া ফেলে যায়
চারিদিক আলোকিত অনাগত বাষ্পের মেঘ
সহসা ঝাপসা করে আমাদের চশমার কাচ
প্রকরণ থেকে ফের ছায়া দেয় পচা মাছ
সুঠাম খরগোশ
প্রত্যহ চলে যায় প্রতিদিন সূত্র এক নিপুণ আপোষ।

বিষপাথর। ৯৩/১বি বোসপুকুর রোড, কসবা। কলকাতা ৪২

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

কবি এবং শিল্পরসিক কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের বইটি হাতে এসেছে ইতিহাস ও সংস্কৃতি। কুড়িটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের সুনির্বাচিত সঙ্কলন 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'। আপাতদৃষ্টিতে প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন অস্তিত্বে প্রতীয়মান এবং একক কিন্তু বিষয়বস্তুর অন্তরালে সমস্ত বইটির সামগ্রিকতায় একটি নিখুঁত ঐকতান। লেখক ঐতিহাসিক, তথ্যনিষ্ঠ এবং গভীর তার মনন এবং তাই প্রাসঙ্গিকতার আঙ্গিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আবহমান ও মানবিক। ইতিহাস ও সংস্কৃতি এই দুটি খুব কাছাকাছি শব্দের সুষ্ঠু সম্মিলন সাধারণত পরিদৃষ্ট হয় না। ইতিহাসের মনোযোগী চর্চায় যুগে যুগে সংস্কৃতিকে দেওয়া হয়েছে গৌণতা, এই শব্দের গুরুত্ব ও সম্পর্ক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা অনেক ঐতিহাসিক বিস্মৃত হয়েছেন।

এই সঙ্কলনের মূল প্রবন্ধটি ইতিহাস বিষয়ক নয়, 'ইতিহাস রচনার ইতিহাস' এবং **'Among all the fields of learning in the world there prevails, like a fundamental chord that keeps sounding through, the history of the ancient world i e. of all those people whose lives have flowed into ours'**-বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাসবেত্তা জ্যাকব বুখহারডট্ এর এই সত্যকে শিরোধার্য করে যাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্যের গঙ্গোত্রী থেকে জ্ঞান তপস্যায় ও শ্রমসাধনায় আনয়ন করেছিলেন ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন ভাগীরথী, তাঁদেরই কথা বলা হয়েছে সশ্রদ্ধ বিনয়ে এই প্রবন্ধে। লেখকের স্বীকৃতি আঠারো উনিশ শতকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পুনরুদ্ধারে প্রাথমিক প্রেরণার উৎস

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত রচিত 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী, কলকাতা ৫৫। এই বইটি প্রসঙ্গে আমরা সদ্য লোকান্তরিত অম্বিকা ভট্টাচার্যের কথা স্মরণ করি—যাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা ব্যতীত এই গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হ'ত না।

. সম্পাদক উত্তরসূরি।

কিছু আগত প্রতীচী মনীষা। ইংরেজ আগমনের প্রথম যুগে এদেশে বিদ্যাচর্চা স্বভাবতই ছিল অবিন্যস্ত এবং স্বদেশ সন্ধিৎসার উদ্দীপনা তখনও দেশীয় মনীষী-দের মধ্যে জাগ্রত ছিল না। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্সের ভারত-আগমন ও পরের বছর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং জোন্স ও চার্লস উইলকিন্সের আত্যন্তিক ভারত প্রেমে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমে এ দেশীয় প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতীচ্যের পরিচিতি এ দেশে ইতিহাস-চর্চায় কয়েকটি স্মর্তব্য ঘটনা। জোন্স ও উইলকিন্সের ভারত সংস্কৃতি সাধনায় উদ্দীপিত হয়ে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করেন পরবর্তী উত্তরসাধক হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭), হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০), জেমস প্রিন্সেপ (১৭৯৯—১৮৪০), খ্রীষ্টীয়ান ল্যাজেন (১৮০০-৭৬), ইউজীন বার্নুফ (১৮০১-৫২), মনিআর উইলিয়ামস (১৮১৯ ৮৯), আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (১৮১৪-৯৩) রুডলফ রোট (১৮২১-৯৫), ফ্রীডরিখ ম্যাক্স মূলার (১৮২৩-১৯০০), ইভান পাভ্লোভিচ মিনায়েভ (১৮৪০-৯০)। উপলব্ধ হলেন প্রতীচ্যের মনীষী-গন যে 'এশিয়া তথা ভারতবর্ষেরও ইতিহাস ও সংস্কৃতি আছে এবং তা পুরাতন বলে পর্যাপ্ত গবেষণার বিষয়ীভূত' যখন ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামক গবেষণা-পত্রিকা যার উপজীব্য ছিল 'এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য'। এরপর ইতিহাস চর্চার ধারাবাহিকতায় ও চেতনার উদ্বুদ্ধিতে আরও তিনটি পত্রিকার জন্ম হয়—১৮২১ এ 'কোয়ার্টার্লি জার্নাল,' ১৮২৯এ 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স', ১৮৩২এ 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি'।

এইভাবে সনিষ্ঠ ক্রমিকতায় লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন স্বদেশ-সন্ধিৎসায় প্রতীচী মনীষার গবেষণা ও প্রভাব এবং প্রমাণ করেছেন যে ঐ প্রভাবের অব্যবহিত ফলস্বরূপ গত শতকের মধ্যাহ্ন থেকে জন্ম নিয়েছেন স্বদেশী ঐতিহাসিক কেদারনাথ দত্ত, নীলমনি বসাক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ এবং সমতুল্য না হলেও ভাউ দাজী। প্রথমোক্ত দুজনের ইতিহাস চেতনার ব্যাপকতা ও গভীরতা অপ্রতুল তথ্যে সে অর্থে সার্থক না হলেও পথিকৃৎ হিসেবে তাঁদের প্রয়াস স্মরণীয়। এরপর নিষ্ঠার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে লেখক আলোচনা করেছেন স্বদেশী ও বিদেশী ভারততত্ত্ব-বিদদের জীবন ও কর্মসাধনা। আলাদা করে বিশিষ্টতা দিয়েছেন প্রিন্সেপ,

রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে। আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়বস্তু ও বক্তব্য হয়েছে ইতিহাসের বর্তমান খণ্ডন। 'ইতিহাস ও সাহিত্যের যোগ্য সহযোগেই জাতি তার আত্ম-পরিচয় লাভ করে,'-উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই উপলব্ধির শুভ সাযুজ্য ঘটেছিল কিন্তু পরে ইতিহাস সামগ্রিকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও যুগবিভাগের দুর্মর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে বলে লেখক শঙ্কিত। লেখকের অন্য এক বিক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে মাতৃভাষায় ইতিহাস চর্চার বর্তমান অবজ্ঞায়। অথচ ইতিহাস চর্চার সেই অবজ্ঞাত দিনগুলিতে যখন তথ্য সংগ্রহের এবং জ্ঞান চর্চার নানামুখী ধারার বর্তমান বিস্তার প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল অক্ষয়কুমার, হরপ্রসাদ প্রমুখ ইতিহাস সাধকগণ অসীম সাহসিকতায় মাতৃভাষায় রচনা করেছেন ইতিহাস, মুদ্রাতত্ত্বের মত দুরূহ বিষয় অনায়াসে বাংলায় ব্যাখ্যাত হয়েছে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে। প্রসঙ্গত, আধুনিক বাংলাদেশে যখন একটি বা দুটির বেশী ঐতিহাসিক পত্রিকা নেই, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ইতিহাস চর্চার প্রসারের জন্য অক্ষয়কুমার ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা শুরু করেন।

'স্বদেশ সন্ধানে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মন্তব্য করেছেন 'জোন্স, প্রিন্সেপ, কানিংহামের বিপরীত মেরুতে ছিলেন একশ্রেণীর প্রতীচী লেখক, জেমস মিল, উইলিয়াম ওঅর্ড, জন ক্লার্ক মার্শম্যান।' বিপরীত মেরুর এই প্রতীচী লেখকগোষ্ঠী থেকে প্রবন্ধকার বাদ দিয়েছেন আরও কিছু উল্লেখ্য নাম যেমন চার্লস গ্রাণ্ট, জেমস্ পেগস, বল্ডওয়েল ও পোপ। আসলে একটা সময়ে ভারতীয় ইতিহাস রচনার ইতিহাসে উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। খ্রীস্টান মিশনারি ও মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত ঐতিহাসিকেরা এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। এঁদের মতবাদ ছিল, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যেন ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধির উপায়। তবে এঁদের মধ্যে জেমস মিল তাঁর সমসাময়িক ইওরোপীয় চিন্তাধারায় প্রবাহিত হয়ে উপযোগবাদের (ইউটিলিটারিয়ানিজম্) নিরিখে ভারত ইতিহাসের মূল্যায়ন করেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন শুধুমাত্র উপযোগবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত

বাস্তব।বস্থাই বিজ্ঞানসম্মত, যেমন লর্ড এ্যাকটন একসময় আধুনিক ইওরোপীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াসে সমকালীন দর্শনের দৃষ্টবাদ (পজিটিভিজম্) ও প্রয়োগ-বাদের (এম্পিরিসিজম্) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চেতনা ও ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বিষয়ে লেখকের বিদগ্ধ মনন ও বিশ্লেষণ পাঠককে নিমগ্ন রাখে। বস্তুত, উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে ফ্রান্সে দুর্খেইমের প্রভাবে যে ইতিহাস বিজ্ঞান চর্চার প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করেছিল ও যার সার্থক ফসল হয়েছিলেন মার্ক ব্লক, লুসিয়েন ফেবরের মত যুগান্তকারী ঐতিহাসিক, ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এক নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছিল তখনই। এই প্রথম বোধ করি রাজনীতি বহির্ভূত, রাজা-রাজ্য রাজনীতি অবহেলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত। উপকরণ সংগ্রহের রীতি, গ্রহণ-বর্জনের নানা দ্বন্দ্বে ইতিহাস-রচনা এক জটিল কর্মসাধনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার, ভাণ্ডারকার ইতিহাসবোধের এই সামগ্রিকতার যোগ্য ভারতীয় উত্তরস্মরি বললে অত্যুক্তি হয় না। তথ্য নির্বাচনের প্রাথমিক সমস্যায় এঁরা সবাই কণ্টকিত হয়েছেন বার বার কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছেন সেই সার্থক লোকে, বিশ্লেষণের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থপূর্ণ তথ্যকে নির্বাচন করে। সীজারের আগে বহু লোক রুবিকন নদী পারাপার করেছে কিন্তু সীজারের এই নদী অতিক্রম ঐতিহাসিকের মূল্যায়নে কেন নতুন তাৎপর্য পায় এই মৌলিক প্রশ্নে উনিশ শতকের বহু ঐতিহাসিকের মত আলোচ্য ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও জিজ্ঞাসু হয়েছেন। লালিত হয়েছেন তাঁরা জার্মান ঐতিহাসিক রাংকে-র (১৭৯৫-১৮৮৬) ইতিহাস দর্শনে। নীতি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ইতিহাসের ব্যবহারকে রাংকে সমালোচনা করেছিলেন ও মনে করতেন এর ফলাফল ইতিহাসের অনিবার্য বিকৃতি। রাংকে-র ইতিহাস বাস্তবের অনুলিপি, যেমনটি ঘটেছে তার যথাযথ চিত্রণ। প্রতিটি ইপক্, তিনি মনে করতেন, 'immediate to God' এবং সেই অর্থে তার যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন ও আবশ্যক। তবে যখন এই সব ঐতিহাসিক তাঁদের রচনায় ব্রতী, সেটা ভারতবর্ষে যুগসন্ধিক্ষণ, টয়েনবির 'চ্যালেঞ্জ অ্যাণ্ড রেসপন্স' তত্ত্ব অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সার্বিক অনুপ্রবেশে ভারতবাসী তখন পেছনে ফিরে তাকিয়েছে, এসেছে আর্কাইজম্।

দেশীয় সাহিত্য ও ধর্মের ব্যাখ্যায় তখন প্রাচীনতার গৌরব সাধন হচ্ছে, হিন্দু-ধর্মের পুনরুজ্জীবনে, ভারতীয় প্রাচীন ধর্মের মহিমা প্রচারে সবাই অগ্রণী। লেখক নিরপেক্ষভাবে আলোচ্য ঐতিহাসিকদের ওপর ঐ সময়ের প্রভাবটুকু আলোচনা করলে আলোকিত হতাম। এঁদের আলোচনায় লেখকের মূল দৃষ্টি যেখানে সেটা প্রশংসা বহির্ভূত নয়। আলোচ্য বাঙালী ঐতিহাসিকগণ প্রত্যেকেই শুধু ইতিহাস চর্চায় ব্যয়িত করেননি নিজ স্বত্তা, বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গেও এঁরা সমগুরুত্বে সম্পৃক্ত। আজকের সাহিত্যিক যখন শুধু লেখকই, এবং ঐতিহাসিক শুধু ইতিহাস রচনার নীরস তরুবরে জলপ্রদানে ব্যস্ত, দুটি ধারার এই বিরল সম্মিলনের সঙ্গে লেখক আমাদের পরিচিত করে ধন্য করেছেন।

পরবর্তী রচনাগুলি 'ভারত সংস্কৃতি, মূর্তিতত্ত্বে', 'মূর্তিশিল্পে হিন্দু দেবদেবী, কয়েকটি দৃষ্টান্ত', 'তিলকচিহ্ন, হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতীক', 'মুদ্রার আলোকে, প্রাচীন ভারতে,' 'লেখালেখির প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে', 'সংস্কৃত নয়, দেবনাগরী', 'ঐতিহাসিক ভূগোলে বঙ্গ বাংলা-বাংলাদেশ', 'ভারত-শিল্পের আদিপর্ব, বিদেশ বাণিজ্যের সংযোগে', 'আনন্দ কুমারস্বামী শতবর্ষে', এবং 'ইতশ্চিন্তা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি', লেখকের মৌলিক চিন্তাধারা এবং ঐতিহাসিক সন্ধিৎসার সার্থক ফসল। শেষোক্ত প্রবন্ধটি পাঁচটি বিচ্ছিন্ন ছোট প্রবন্ধের সঙ্কলন। উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি থেকে আমরা পেয়ে যাই প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্মে মূর্তিশিল্পের বৈচিত্র্য ও প্রভাবের বিচিত্র বিধৃতি, মুদ্রা-নির্ভর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইতিহাসের স্পষ্টতর চিত্রণ, প্রাচীন ভারতে লেখনীর উপকরণের বৈচিত্র্য ও ক্রমবিবর্তন, দেবনাগরীর উৎস সন্ধানে ঐ শব্দের তাৎপর্য নির্ণয়, ঐতিহাসিক ভূগোলে বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ এই বিবর্তনের মধ্যে নিহিত অখণ্ডতা এবং ভারত--শিল্পে বিদেশী শিল্প-শৈলীর নীরব অথচ ঐতিহাসিক সংক্রমনের গভীর গোপন তথ্য। ভারত-শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ, অনন্য ভারত পথিক আনন্দ কুমারস্বামীর প্রতি লেখক শতবর্ষের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন শুধু তাঁর শিল্পচর্চার সন্ধান ক্ষেত্রের বহু ব্যাপ্তিকে আলোচ্য করে। শেষে খুব ছোট আলোচনায় ব্যাখ্যা করেছেন এই মহান পুরুষের স্বাদেশিকতা। জন্মসূত্রে পরাধীন এই ভারতীয়ের গভীর স্বদেশ চিন্তা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা প্রত্যাশিত

ছিল। নিছক দেশপ্রেমিকতার আবদ্ধ গণ্ডীতে নিজেকে সংবদ্ধ না রেখে যাঁর দর্শন আলিঙ্গন করেছিল বিশ্বভুবন, যিনি একদা মন্তব্য করেছিলে—'Nationalism is not enough. Patriotism can be parochial, even banal, and there are finer parts great souls must play এবং অন্যত্র 'civilization henceforth must be human rather than local or national',—সেই প্রাচ্য-প্রতীচ্য সম্মেলক আন্তর্জাতিক মানুষটির স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক ভাবনা দিয়ে আরও কিছু জানালে শ্রী দাশগুপ্তের শ্রদ্ধা নিবেদন সম্পূর্ণ হোত মনে হয়।

'ইতিচিন্তা'য় লেখকের বিদ্যাচর্চার সামগ্রিকতা সহজেই ধরা পড়ে, তিনি দা ভিঞ্চির শিল্পকর্ম থেকে সমাজবিজ্ঞান আনুষঙ্গিক ভারতবর্ষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন ও অনায়াসে প্রমাণ করেন তার তত্ত্ব 'জ্ঞাতিবিদ্যার মূল সূত্রগুলি জানা না থাকলে নিজের বিষয়ের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে'। তবে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রতি তাঁর অহেতুক কটাক্ষ আমাকে বিস্মিত করেছে। 'সমালোচনার সমালোচনা'য় তিনি যে 'ছায়াপিণ্ড' দের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা আজকের সমালোচনা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিকে আবদ্ধ। অন্যত্র সমালোচনার ঐ 'আরূঢ় ভনিতা' লক্ষ্য করি না, বরং তার মান আজ সার্বিকভাবে উন্নত। তথাপি, চিন্তার সমগ্রতায়, সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতির তীক্ষ্ণ মূল্যায়নে, সনিষ্ঠ ইতিহাস সাধনার মেধাবী অভিপ্রকাশে বর্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন এবং যেমন গিবন, রাংকে বা বাংলার অক্ষয়কুমারের ওপর ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্লিও আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন, আশা করব সেই সাধনার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে শ্রী দাশগুপ্তও আলোকিত করবেন অখণ্ড, সামগ্রিক, সাহিত্য-সংস্কৃত ইতিহাসের বিস্তীর্ণ ভূমিকে—তাঁর এক হাত ক্লিওর পদযুগলে ও অন্য হাত সরস্বতীর পাদপীঠে স্থাপিত হোক্।

অনুপ মতিলাল

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিণ্টস্মিথ, ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

অভয়া মঙ্গল—সম্পাদিত ডঃ আশুতোষ দাস। ৭·০০

বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। ৫·০০

বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য . ডঃ প্রভাময়ী দেবী। ৬.৫০

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু। ৭·০০

বাঙ্গালীর সমাজচিন্তা—ডঃ ফুল্লরেণু গুহ। ৬·০০

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী—ডঃ নরেশচন্দ্র জানা। ১৫·০০

বিপ্লবী সূর্য্য সেন—গণেশ ঘোষ। ৫·০০

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২০·০০

ফাউস্ত অনুবাদ—কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ৮·০০

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। ১৫·০০

গোপীচন্দ্রের গান : সম্পাদিত—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। ১০·০০

শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতামালা) জনার্দন চক্রবর্তী। ১২·০০

লোকনাট্য যাত্রাগান—মন্মথ রায়। ৫·০০

মহাভারত সঞ্জয় বিরচিত ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ। ৪০·০০

মৈমনসিংহ গীতিকা—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। ২০·০০

●

প্রকাশন বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৪৮, হাজরা রোড। কলিকাতা-১৯

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ

(বাংলা সাপ্তাহিক)

প্রচার-সংখ্যা : ৭০,০০০

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা ● বার্ষিক সডাক—১০ টাকা

●

পশ্চিম বংগাল

(হিন্দী পাক্ষিক)

প্রচার-সংখ্যা : ৫৫,০০০

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা ● বার্ষিক সডাক—২·৫০ পয়সা

●

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

(ইংরেজী পাক্ষিক)

প্রচার-সংখ্যা : ১০,০০০

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা ● বার্ষিক সডাক—৫ টাকা

●

এছাড়া, সাঁওতালী পাক্ষিক **'পছিম্ বাংলা'**

এবং উর্দু পাক্ষিক **'মগরেবী বংগাল'**

পত্রিকা দুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়।

●

বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য শর্তাদির জন্য যোগাযোগ

তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭০০০০১

আই. সি. এ. ৮১০৯/৭৯

বুদ্ধদেব বসু

মেঘদূত ২০、 মহাভারতের কথা ২০、

সুশীল রায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী ১৫、

টিপু সুলতানের তরবারি ২৫、

উৎপল দত্ত

চীন যাত্রী ২০、

শেকস্পীয়রের সমাজচেতনা ২৫、

শম্ভু মিত্র

চাঁদবণিকের পালা ৮、

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুই প্রধান কবির কাব্য সংকলন :

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা (১ম)
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা (২য়, যন্ত্রস্থ)

বিক্ষুব্ধ অথচ হৃদয়বান, বিদ্রোহী অথচ মানবচৈতন্যের
শুভ্রতায় বিশ্বাসী কবির সমগ্র কবিতাবলী পড়ুন ॥

অরুণ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা (প্রস্তুতির পথে)

সায়াহ্ন, ময়ূরাক্ষী, মিলিত সংসার, সমর্পিত শৈশব, হাওয়া দেয়, ঈশ্বরপ্রতিমা ও সময় অসময়ের কবিতা থেকে সংকলিত প্রায় দেড়শত কবিতার সংকলন। প্রতীকী এবং মিস্টিক কাব্যভাবনার যে জগৎ অরুণ ভট্টাচার্য গড়ে তুলেছেন তা বাংলা কাব্যইতিহাসে এক নতুন দিক চিহ্নিত করেছে।

"আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়গাথা আগমনী কত যে—
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে॥"
—রবীন্দ্রনাথ॥

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ

মার্টিন বার্ন

কলকাতা ● নিউ দিল্লী ● বোম্বাই

সংগ্রহ করে রাখার মত কিছু রেকর্ড

এপার বাংলার গান
ECSD 2588 স্টিরিও

পরিচালনা : বুদ্ধদেব রায়

এপার বাংলার লোকগীতির উল্লেখযোগ্য সংকলন—লোকগীতির জনপ্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে প্রাণবন্ত।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়
ECLP 2579

পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম, যেদিন জীবনে তুমি, আমার এ গানে, জীবনে যদি দীপ ইত্যাদি আধুনিক গানের সংকলন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ECLP 2571

তুমি এলে অনেক দিনের পরে, অবাক পৃথিবী, কত রাগিণীর ঘুম ভাঙাতে, ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না ইত্যাদি জনপ্রিয় গানের সংকলন।

রবীন চট্টোপাধ্যায় স্মরণে
ECLP 2550

প্রয়াত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কণ্ঠে স্মরণীয় গান।

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ
ECSD 2598 স্টিরিও

সংকলন ও পরিচালনা : সুচিত্রা মিত্র

ছোটদের জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের গান ও আবৃত্তির অভিনব সংকলন।

মঞ্জু গুপ্ত
ECLP 2569

অতুলপ্রসাদের গানের স্বনামধন্য শিল্পীর ১২টি গানের অনবদ্য সংকলন।

শৈলেন মুখোপাধ্যায়
45 NLP 2022

প্রয়াত শিল্পীর জনপ্রিয় ৮টি গানের সংকলন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

জনগণই আমাদের শক্তির উৎস

বামফ্রন্ট সরকার ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক দলগুলির সভা, সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

গ্রাম শহরের শ্রমজীবি মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। ক্ষেত মজুররা বিধিসঙ্গত নিম্নতম মজুরী আদায় করছেন। বর্গাদাররা 'অপারেশন বর্গায়' পাচ্ছেন বর্গার স্বত্ব। নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। গ্রামীণ জনজীবনে আজ এসেছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জোয়ার।

শ্রমিকশ্রেণী অর্থ নৈতিক দাবিদাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হচ্ছেন জয়যুক্ত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এসেছে নতুন জোয়ার।

বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে দৃঢ়সংকল্প।

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বেকার সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা ও নানাপ্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী অনেকগুলি ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

গ্রাম-শহরের কায়েমী স্বার্থ ও জনগণের শত্রুরা গণ আন্দোলনের আঘাতে আতঙ্কিত। তাই তার মুখপাত্ররা আর্তনাদ সুরু করেছেন, ধুয়ো তুলছেন আইন ও শৃঙ্খলার।

বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন পশ্চিমবাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চান। এই সরকার একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির উৎস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৮১১০/'৭
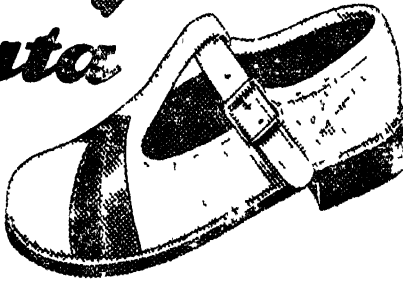
পুজোয় চাই
নতুন জুতো
Bata
লিলিপুট ৫
সাইজ ৫-
টা ১৯৯৫
ব্যালেবিনা ৪৬
সাইজ ৯-১১, ১২-১, ২-৫
টা ২৫৯৫, ২৮৯৫, ৩২৯৫

আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ

আই. টি. সি. লিমিটেড

With Compliments from

★

The Alkali and Chemical Corporation of India Ltd.

CALCUTTA ● BOMBAY ● MADRAS ● NEW DELHI

STRIKING THE RIGHT CHORD

DUNLOP INDIA has been in harmony, striking the right chord in the country's industrial development. In the service of India's transport, industry, agriculture, defence and exports
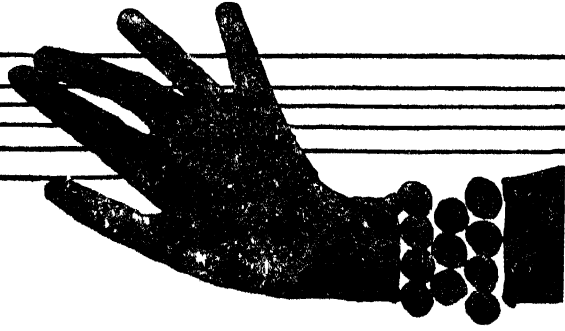
DPRC-80
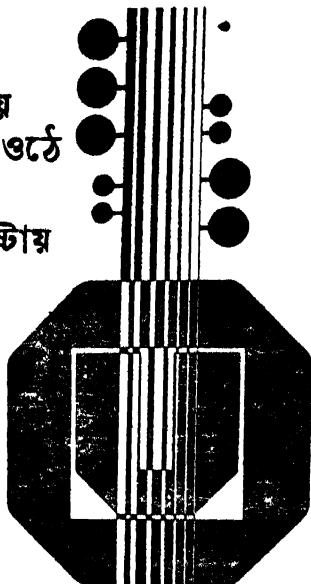
ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী
করে তুলতে সাহায্য করছে

UCOC 103 BEN

বাংলার দুঃস্থ তাঁতশিল্পীদের সেবায়

এবং

অনুরাগী ক্রেতাসাধারণের স্বার্থে

'তন্তুশ্রী'

কম দামে সেরা গুণমান। কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্পে তৈরী—সকলরকম রেশম ও তাঁত বস্ত্রের বিচিত্র সমারোহ।

'তন্তুশ্রী'র সম্ভারে আপনার আনন্দের দিনগুলোকে রঙীন করে তুলুন।

বিক্রয়কেন্দ্র: কলকাতা, নয়া দিল্লী ও অন্যত্র

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম অ্যাণ্ড পাওয়ারলুম

ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ৭০০০১৩

ফোন নং:— ২৭-২২৫০ ২৭-২২৫১

এই প্রতীক
কী এবং কেন?

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্—
সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে
উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও
সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্
আপনার সেবায়

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১৩

তিনশো বছরের শৈশবেই এই মহানগর আজ জীর্ণ ও শ্লথগতি। অসহনীয় ভাবে ক্লিষ্ট ও ন্যুব্জ। তার পদক্ষেপ আজ ব্যাহত। দুরন্ত অশ্বের মতো তার কেশর আন্দোলিত হোক। পায়ের খুরে সঞ্চালিত হোক গতিবেগ। কলকাতা দুর্বার হোক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে। স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর জীবনের উদ্দেশে। এই প্রার্থনা আমা। আপনার সকলের। কলকাতাকে যারা ভালবাসি।

medium

এই এক সময়
আকাশে সাদা মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রায় মন দেশান্তরী। কখনও বা প্রিয়জন মিলনে ব্যাকুল।
এই এক সময়। যখন স্নেহ ও ভালবাসায়, উৎসব ও উচ্ছলতায় দিনগুলি আনন্দঘন। প্রকৃতি সুন্দর।
পূর্ব রেলওয়ে
medium

যে কোনো
উপলক্ষে
অনবদ্য উপহা

ইউবিআই গিফ্ট চেক

শুভ পরিণয়, জন্মদিন, নববর্ষ, শারদীয়া পূজা, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ কি অন্য যে কোনো উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন ইউবিআই গিফ্ট চেক। দেখতে ভারি সুন্দর —চেক ও চেকের ফোল্ডার দুটিই নজর কেড়ে নেবে।

ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকলেও চেকে আপনি সই করতে পারবেন।

স্কেচ ● শানু লাহিড়ী

প্রবন্ধ ● ভবতোষ দত্ত কবির কথা কবিতায়। তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় . ঋগ্বেদের সূক্তগুলির সময় সীমা প্রসঙ্গে। স্মাতি কেপলার . কবি অমিয় চক্রবর্তী এবং একটি সকাল॥ অরুণ ভট্টাচার্য—কবিতার ভাবনা।

কবিতাবলী ● অরুণকুমার সরকার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিত্ত ঘোষ জগন্নাথ চক্রবর্তী অরুণ ভট্টাচার্য সিদ্ধেশ্বর সেন আলোক সরকার শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় অতীন্দ্র মজুমদার মৃগাঙ্ক রায় আনন্দ বাগচী পূর্ণেন্দু পত্রী কবিতা সিংহ কল্যাণ সেনগুপ্ত সুনীলকুমার গুপ্ত সুনীল বসু শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় মানস রায়চৌধুরী শান্তিকুমার ঘোষ প্রকৃতি ভট্টাচার্য সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় কালীকৃষ্ণ গুহ মলয় শঙ্কর দাসগুপ্ত দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায় মণীন্দ্র গুপ্ত পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী কুশল মিত্র ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় দেবারতি মিত্র অমূল্যকুমার চক্রবর্তী দাউদ হায়দার দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রদীপ মুন্সী রাখাল বিশ্বাস তুলসী মুখোপাধ্যায় যতীন্দ্রনাথ পাল তুষার বন্দোপাধ্যায় গোকুলেশ্বর ঘোষ রবীন সুর অজিত বাইরী গৌরাঙ্গ ভৌমিক কৃষ্ণ ধর লোকনাথ ভট্টাচার্য অমিয় চক্রবর্তী বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত অসিতকুমার ভট্টাচার্য জীবেন্দ্র সিংহরায় অমর ষড়ংগী পরেশ মণ্ডল মঞ্জুভাষ মিত্র শরৎকুমার সুনীল নন্দী জয়ন্ত সান্যাল অশোক মহান্তি শিখা সামন্ত হিমাংশু বাগচী কিরণশঙ্কর মৈত্র মধুমাধবী ভট্টাচার্য ব্রততী বিশ্বাস মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অমরনাথ বসু নারায়ণ ঘোষ ব্রততী ঘোষরায় সুনীলকান্তী ভট্টাচার্য জহর সেন মজুমদার সুব্রত সান্যাল উদয়ন ভট্টাচার্য বেষ্ট চট্টোপাধ্যায় শংকরজ্যোতি দেব সন্তোষ চক্রবর্তী শুক্লা দে প্রবীর নন্দী পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য শুক্লা দাস দীপ সাউ দীনবন্ধু হাজরা শংকর চক্রবর্তী কৃষ্ণা বন্দোপাধ্যায় বিকাশ দাস শ্যামল কুমার বিশ্বাস পিনাকী ঠাকুর।

কবিতা কবিতা ● ভাস্কর মিত্র করুণা সেন নাসের হোসেন দেবাশিষ চৌধুরী অনুপ মুখোপাধ্যায় নির্মল হালদার সনৎ দাস কার্তিক ঘোষ মুরলী দে স্বকমল দাস তৃপ্তি সান্ত্রা।

আলোচনা ● প্রদ্যুম্ন মিত্র জীবনানন্দের আকাশলীনা।

শিল্প প্রসঙ্গ ● কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পের বিস্তৃত দিগন্ত॥ নির্মল দে ' শানু লাহিড়ী॥

রূপান্তর ● মাতিদিয়েস ক্লাউদিয়েস, আনদ্রিয়াস গ্রাইফিউস. ফ্রিডরিখ ফন্ লোগাউ —সুনীথ মজুমদার।

চিঠিপত্র ● শ্যামলকুমার বিশ্বাস 'কলিকাতা প্রসঙ্গে'।

অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ৯বি ৮ কে সি ঘোষ রোড কলিকাতা ৫০। ফোন ৫২-২৪৫২

জাতির জীবনে তাব সবচেয়ে বড় পরিচয় নিহিত বয়েছে তার শিল্পকর্মে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে। বিশেষ বিশেষ বাষ্ট্রনীতি সামযিক ভাবে একটি জাতিকে পবিচালিত করে একথা সত্য, কিন্তু তার আদর্শ চিরদিন বিধৃত বযেছে এই সংস্কৃতিব রূপান্তবের মধ্য দিযে।

ভীমচন্দ্র নাগ বাংলা দেশে মিষ্টান্ন শিল্পের ঐতিহ্যে একটি স্বতন্ত্র নাম। শতবর্ষেবও অধিককাল জাতীয জীবনে তাব অবদান আজ একটি ইতিহাস।

কলকাতাব ইতিহাসে, বিশেষ কবেই, ভীমচন্দ্র নাগ একটি গৃহনাম। এখনো মুখে মুখে সতত উচ্চারিত হযে চলেছে।

●

ভীম চন্দ্র নাগ

৪৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭

হাওড়া উত্তরপাড়া

স্কেচ : শান্ত লাহিড়ী

কবির কথা কবিতায়

ভবতোষ দত্ত

সেকালের দিনে কবিরা কবিতায় ভণিতা দিতেন। সে ভণিতার তেমন বৈশিষ্ট্য কিছু থাকত না। কবিতার শেষে কবির নামটি থাকত এই মাত্র, যেমন 'গাইল বড়ু চণ্ডিদাসে' বা 'কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতসমান'। কখনো কখনো উল্লেখে একটু বৈচিত্র্য থাকত

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুব লীলা কত অবতার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জ্ঞান শুভক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

কবি এখানে শুধু রচয়িতা হিসাবে তাঁব নাম জুড়ে দেন নি। তিনি রামাযণ কাব্যের নানা বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাল্মীকি রামাযণে এ-সব কথা নেই। রামায়ণের নানারকম রূপ আছে। অদ্ভুত রামায়ণ থেকে কৃত্তিবাস এই পালা নিয়েছেন।

ঐই ভণিতায় আমরা রামায়ণ-সাহিত্যের বিশালতার আভাস পাই। অনেক দিন থেকে রাম-কাহিনী অবলম্বনে বহু কাব্য লেখা হয়েছে, কৃত্তিবাস তারই অন্যতম কবি। কবি এখানে লেখক হিসাবে নিজের নামটি ছাড়াও একটা সাহিত্য প্রবাহের অস্তিত্বের কথাও জানাচ্ছেন। সেকালের কাব্যে

বস্তুগত বর্ণনাই হত। তার মধ্যে কবি নিজের কথা সাধারণত বলতেন না। দৈবাৎ কখনও একটু আধটু ইতিহাসের ইঙ্গিত থাকত। কখনও বা কাহিনীর রসে নিজে আর্দ্র হয়ে ভণিতায় তার জানান না দিয়ে পারতেন না

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
ধার্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ॥

কাব্যের মধ্যে কবির প্রবেশ এই পর্যন্তই।

একালের দিনে কবিরা কবিতা থেকে নিজেকে একখানি বিচ্ছিন্ন রাখেন না। কবির ব্যক্তিগত বক্তব্যই কবিতার বক্তব্য হয়ে ওঠে, তাই সমগ্র কবিতাই কবির নিজস্ব একক অনুভূতির প্রকাশ হয়ে যায়। এ ব্যাপারটা ঘটেছে বিশেষ করে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথ থেকে। মধুসূদনের মহাকাব্যে দুটি সর্গের গোড়ায় কবির এক আত্মকথা আছে যা ঠিক মূল কাহিনীর অঙ্গ নয়। মহাকাব্যের রীতি-রক্ষা করতে গিয়ে বস্তুনির্দেশ বা নমস্ক্রিয়া করলেও সেই সঙ্গে কবি একটু ভিন্ন ধরনের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন। প্রথম সর্গে তিনি বলছেন

—তুমিও আইস, দেবী তুমি মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্ত-ফুলবনমধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

আবার চতুর্থ সর্গে বলেছেন

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে,
তব কাব্যোদ্যানে ফুল, ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা, কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী তুমি নাহি দিলে—

এই দুই জায়গাতেই কবি শুধু নিজের কথা নয়, তৎকালীন বাংলা কাব্যসাহিত্যের দীনতার আভাস দিয়েছেন। তখনকার কাব্য কল্পনায় দীন, স্থূল বর্ণনায় পূর্ণ। এমনি জড়বৎ কাব্যে প্রাণসঞ্চার করতে তাকে ঐশ্বর্যবান করে তুলবার জন্য জগতের নানা কবির কাব্যলোক থেকে মধু সঞ্চয় করে নিয়ে আসতে হবে। তাতে যে মধুচক্র গড়ে উঠবে গৌড়জনরা তার সুধা নিরবধি পান করবে। মধুসূদনের পূর্ববর্তী গৌড়ীয় কাব্যে যে সুধার অভাব ছিল তা মেটালেন

মধুসূদন। মেঘনাদবধ শুধু মধুসূদনের রচিত চক্র নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকে আহৃত মধু দিয়ে রচিত চক্র। মধু কথাটির মধ্যে যেমন শ্লেষ আছে, গৌড়জন কথাটির মধ্যেও তেমনি ঈষৎ কটাক্ষ আছে। ভাবখানা এই, গৌড়জনেরা এতদিন এ রসের রসিক ছিল না। এবার আমি তাদের রসিক করে তুলব। চতুর্থ সর্গের কবিতার পংক্তি কথাটিতেও নতুন কাব্য লেখার উচ্চাশা জাগিয়েছেন কবি।

মধুসূদনের এই কাব্যসূচনা চাতুর্যের চমৎকার নিদর্শন। কারণ এ শুধু মামুলী প্রথায় বস্তুনির্দেশ নয়। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারা সম্বন্ধে কবির মনোভাব। এর সমর্থন পাওয়া যায় মধুসূদনের লেখা চিঠিপত্রেও যাতে তিনি বলেছিলেন বাঙালি পাঠক কাব্য কি তাই জানে না।

কবি-ব্যক্তিত্ব (পোয়েটিক পারসোনালিটি) বলতে যা বোঝায় বড় এবং ভালো কবি মাত্রের রচনাতেই তা ফুটে ওঠে। কল্পনার ভঙ্গিমায়, ভাবনার বিশিষ্টতায়, শব্দপ্রয়োগের অনিবার্য বিশেষত্বে কবি-ব্যক্তিত্বটি পাঠকের অনুভূতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু কখনও কখনও কবি বেশ সচেতন ভাবেই আপনার কাব্যধর্মটি কবিতায় প্রকাশ করে বলেন। সেই বক্তব্যটি হয় প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ কবিতার বর্জনীয় বিষয়ের সঙ্গে সেটি লগ্ন থাকে। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতায় অন্যের মুখ দিয়ে যে কথাটি বলানো হয়েছে সেটি কবিব্যক্তিরই কথা। এতে রবীন্দ্র কবিব্যক্তিত্বের সাহিত্য ধর্মটিই উচ্চারিত।

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি
পুষ্পের মতো সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশ ভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।

এখানে কবি জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সাহিত্যধর্মটিকে। তাঁর কবিধর্ম লিরিক রচনার ধর্ম। অন্তর থেকেই তিনি বচন সংগ্রহ করেন, সংসারের দুঃখজালে

রচনা করেন আনন্দলোক। বাইরে আনন্দ নাই বা থাকল, কবির কাব্যে আনন্দের জগৎ তৈরি হবে। এরই নাম লিরিক প্রবণতা যা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আগাগোড়াই সক্রিয়।

তখন এই ঘোষণাটির বিশেষ মূল্য ছিল। যে সময়ে কবি 'কবির পুরস্কার' লিখছেন সে সময়ের বাংলা কবিতার প্রকৃতি ছিল বিপরীত। তখন মহাকাব্য লেখা প্রায় বন্ধ হয়েছে। কিন্তু হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র তখন কবিতার রাজ্যে আদর্শ পুরুষ। অন্তর থেকে বনে আহরণ করে আনন্দলোকে বিচরণ তাঁরা করতেন না। তাঁরা লিখতেন সমাজের কথা, মানুষের দুঃখ সংঘাতের কথা। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল আত্মকেন্দ্রিক কবি, একজন প্রসন্ন, আর একজন বিষণ্ণ— কিন্তু কল্পনার সেই প্রসার কারো নেই যা দিয়ে আমাদের নিত্য দেখা এই জগৎ, এই প্রকৃতি এই ধূলা-মাটির ভিতের এক মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হতে পারে। 'সোনার তরী'তে কবি তাঁর আত্মধর্ম অনুভব করেছেন। বুঝতে পেরেছেন তাঁর ধর্ম প্রচলিত কবিতার ধর্ম থেকে আলাদা। 'চিত্রা'য় একাধিক সৌন্দর্য-বিষয়ক কবিতা আছে। তাতে তিনি তাঁর ইসথেটিক কল্পনার বিশিষ্টতাটি নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'উর্বশী' 'বিজয়িনী' 'চিত্রা' 'আবেদন' 'সাধনা'— এ সব কবিতায় কবির বক্তব্য কি? একদিকে মর্ত্য পৃথিবীর প্রতি প্রেম আর একদিকে এক অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী সৌন্দর্য-চেতনার উপলব্ধি, যা মৃত্যুর দুঃখকে ব্যথাবেদনাকে আচ্ছন্ন করে পরম রমণীয়তা লাভ করে।

এই নূতন কাব্যতত্ত্ব দিয়ে শুরু হল রবীন্দ্র যুগ। কবিতা শুধু বাইরের জগতের নতুন রূপ বা রসসৃষ্টি নয়। কবিতায় কখনও কখনও কবি ধর্ম এবং সাহিত্যান্দোলনের প্রতিক্রিয়াও সচেতন ভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মধুসূদনের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র যুগের কাব্যে তার নিদর্শন আছে। শুধু কবিতায় নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

'মানসী' থেকে আরম্ভ হল রবীন্দ্রাদর্শের প্রসার। আস্তে আস্তে সে আদর্শ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রবীন্দ্রনাথ অনুজ কবিদের প্রভাবিত করতে লাগলেন। নিজেও 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা' 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টি করে তাঁর

বিঘোষিত কাব্যতত্ত্বের নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। এই সব কাব্যের কোনোটাই কোনোটার অনুকরণ নয়, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র উজ্জ্বল স্বমহিমায় মহিমান্বিত। ভাষা ও শিল্পের সৌকুমার্য, শব্দচয়নের সাবলীলতা, অনুভূতির গভীরতা, জীবন-ভাবনার তন্ময়তা, প্রকৃতির রূপরেখা সবই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের কাব্যেও অম্লান উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হল।

এই শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়াতেই বাংলা কবিতা বর্ধিত। এ সময়ে সাহিত্যের কোনো নতুন আন্দোলন কিছু হয় নি। রবীন্দ্রসাহিত্যধারার পাশাপাশি আর একটি হেমচন্দ্রানুরাগী কাব্য-ধারা ছিল বটে। কিন্তু তার প্রকাশ ক্ষীণ। এ কোনো নতুন আদর্শও নয়। তাই ক্রমবিলীয়মান। বরং রবীন্দ্র সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে থেকেও একটি নতুন দৃক্‌ভঙ্গিমা ধীরে ধীরে আভাসিত হতে থাকে। প্রথম দিকে ততটা সচেতনতা এ সম্বন্ধে তখনও সম্ভবত পাঠকদের মধ্যে দেখা যায় নি। চোখে না পড়ার কারণ সম্ভবত এই যে এই নতুন কবিরা রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দকে পরিহার করেন নি। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'ঘুমের ঘোরে'র কবিতাগুচ্ছের বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিমা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' বা 'বলাকা'র কবিতার চেয়ে যে আলাদা এ নিয়ে কেউ সংশয় করবে না তবু তার ছন্দ রবীন্দ্রনাথের তৈরী করা ছয় কলামাত্রার ছন্দ, ভাষায় যেটুকু আটপৌরে সরলতা ছিল 'ক্ষণিকা'তে রবীন্দ্রনাথই তার সূচনা করে দিয়েছিলেন। ফলে 'ঘুমের ঘোরে'র মধ্যে বিশ্ববিধান সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য, রোমান্টিক স্বপ্ন ভাঙার যে অভিনব বিদ্রোহ ছিল সেটা সেকালের পাঠক উপভোগ করলেও বাংলা কাব্যকল্পনায় রবীন্দ্রযুগের প্রতিবাদ হিসাবে প্রথমেই তাকে মনে না হওয়া আশ্চর্য নয়।

শুধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নন মোহিতলাল মজুমদারও স্বপ্নপসারীর কবিতার প্রথম দিকে কোনো কোনো কবিতায় অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন। যেমন 'অঘোরপন্থী'তে। 'অঘোরপন্থী' সত্যেন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল শুধু নয়, এর নতুনত্বটুকু তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সে কথা তিনি মোহিতলালকে বলেও ছিলেন। বীভৎসতাকে নিয়ে এমন উল্লাস রবীন্দ্রনাথ করতেন না, তাঁর রুচিতে বাধত। মোহিতলাল 'ভারতী'রই কবি এবং রবীন্দ্রভক্ত। অবশ্য যখন তিনি 'ভারতী'তে কবিতা লিখছেন তখন রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ সময় কেটেছে বিদেশে, সমারোহে

বর্ধিত হচ্ছে রাজসম্মান। তাঁর নিজের কবিতার ধারা 'বলাকা'র পর থেকেই শীর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা 'ভারতী'র প্রদীপে তার আলো জ্বালিয়ে জেগে রয়েছেন। মোহিতলাল তখন 'ভারতী'র আসরে আসতেন, কাব্যালোচনা হত। সমালোচনামূলক কিছু কিছু গদ্য রচনা বের হত 'ভারতী'তে।

রবীন্দ্রযুগে থেকেও স্বতন্ত্র হয়ে অলক্ষ্যে যে কাব্যান্দোলনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল অনতিবিলম্বেই। নজরুল সম্পূর্ণ 'ভারতী'র বাইরে থেকে এলেন। তাঁর কবিতার নতুনত্ব কারো চোখ এড়াল না, কারণ তিনি বড়ো সবল, উচ্চকণ্ঠ, বাঁধভাঙা। নজরুলের যৌবনাবেগও রোমান্টিক কিন্তু এ রোমান্টিকতা পারিপার্শ্বিকের, ধ্যান গভীরতার নয়। এ শুধু চারপাশের স্থূল জীবনটাকে নিয়েই আবেগে প্রতিবাদের কবিতা রচনা করা, সংযমকে বর্জন করে অনির্দেশ্য স্পষ্ট জীবনকে অযথাশনিত করে তোলা।

এও এক সাহিত্যান্দোলন। এ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনকে কী চোখে দেখেছিলেন? কল্লোল-কালিকলমের সাহিত্যদ্বন্দ্ব নিয়ে পরে অনেক বাদবিতর্ক হয়েছে, নানা লেখা নানা লেখক লিখেছেন। সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যও আছে। কিন্তু এই সাহিত্যান্দোলনের কোনো ছায়াপাত তাঁর কবিতায় হয়েছিল কি? এক সময়ে 'কবির পুরস্কারে' কবি তার সাহিত্যধর্মটি অকুতোভয়েই ঘোষণা করেছিলেন। তখন তাঁর সাহিত্যধর্ম বাংলা কাব্যধারার প্রবর্তক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে, এ কাব্যধারার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ নন। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া তাঁরই কবিতায় কিছু পাওয়া যায় কিনা সেটাও কৌতূহলোদ্দীপক অনুসন্ধান সন্দেহ নেই।

এই নতুন কাব্যান্দোলনের তরফ থেকে রবীন্দ্র কাব্যাদর্শকে আক্রমণের প্রথম আঘাত এসেছিল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাতেই।

হায় রে ভ্রান্ত কবি।
নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে নিজের ছবি।
অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে,
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে।
দূর থেকে তুমি দেবে না আমল, ভাবি দেবতার দান,

জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান,
—এসবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,

.. ..

কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখসন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি?

—ঘুমের ঘোরে, চতুর্থ ঝাঁক।

এর ছন্দ এবং শব্দ বৈশিষ্ট্য রাবীন্দ্রিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এর বক্তব্য? এখানে তো সরাসরি রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমের তত্ত্বকেই আক্রমণ করা হয়েছে। সেই সৌন্দর্যবোধ যা দুঃখকেও আনন্দরসে অভিষিক্ত করে দেখে। যতীন্দ্রনাথের ভিক্ত জিজ্ঞাসায় তা সুখসন্ন্যাস ছাড়া তো কিছু নয়। আক্ষরিক অর্থে যতীন্দ্রনাথ ভারতীর কবি নন, কিন্তু ভারতীর যুগেই তার কণ্ঠে এই প্রতিবাদ উত্থিত হল।

আমাদের আর একটি প্রধান বক্তব্য এই যে, যতীন্দ্রনাথের এই কবিতা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করবার 'থীম' নিয়ে লেখা হয় নি। তাঁর থীম 'ঘুমের ঘোরের' সাতটি ঝোঁকে বিস্তারিত জীবনভাবনা। এই জগৎ এই জীবন এই অস্তিত্ব নিয়ে কবি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাই, সে দেখায় মিথ্যাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমরা মিথ্যাকে মনের আনন্দে সাজিয়ে তৃপ্তি পাই। কবিও জগতের সেই রূপটাকে নিয়ে রঙিন কথার মালা রচনা করেন। আমরা নগ্ন সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পাই, দুঃখকে অস্বীকার করতে চাই, রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রবণতাকেই সীমা-অসীমের তত্ত্ব দিয়ে রমণীয় করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের ঈসথেটিক আর্টকে যতীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করেছেন নৈর্ব্যক্তিক জীবনচিন্তারই অঙ্গ হিসাবে।

কোথা সে অগ্নিবাণী
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্নমূর্তিখানি?

—এই হচ্ছে নতুন সাহিত্যের ধর্ম, তার আর্ট। সাহিত্য দেখাবে সত্যকে, দুঃখের মূর্তিকেই নিরাবরণ সত্যতায় উদ্ভাসিত করে তুলবে। এই সাধনা কবির জীবন-বোধেরই নতুন প্রকাশ হয়ে উঠবে। এই ভাবেই কবিতায় সাহিত্যান্দোলনের

বীজমন্ত্রটি অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। এই কবিতায় যে কবিকে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি একাধারে প্রতীক—কাব্যরচয়িতার, আর একদিকে তিনি বাংলা কবিতার আদর্শ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ।

এই কবিতার সঠিক রচনাকাল বলতে পারছি না, তবে 'মরীচিকা' (১৩২৯) কাব্যে সংকলিত হয়েছিল বলে অনায়াসেই বলা যায় ১৯২২-এর আগেই এ কবিতাটি লেখা। আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। মোহিতলালের 'বিস্মরণী' কাব্যের অন্তর্গত 'মোহমুদ্গার' কবিতাটির রচনাকাল পৌষ ১৩২৯ অর্থাৎ ১৯২২-এ। মোহমুদ্গর নামেই প্রকাশ, যতীন্দ্রনাথ সে মোহকে ভাঙতে লিখেছেন 'ঘুমের ঘোরে', সেই মোহকেই মুদ্গরাঘাত করেছেন মোহিতলাল। মোহমুদ্গার মূলত শংকরাচার্যের—কে তোমার কান্তা কে তোমার পুত্র, এই ধনজন যৌবনের গর্বই বা কীসের? মোহিতলালের মোহমুদ্গার ঠিক তার উলটো—এই আমার কান্তা এই আমার পুত্র—

এ ধরার মর্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহব্যথা, সন্তানপিপাসা
তাই রবে ফিরিবার আশা।
দুধের বাটিটি তুলে রেখে দিবে সে যে মোর লাগি—
মৃতবৎসা জননীর বেদনা যে নিত্য রহে জাগি।
ক্রোড়ে তার বার বার আহ্বান আকুল—
ঝরিবেই পরলোক-নিশীথের ফুল,
তারি তরে, ওরে মূঢ়! জেলে রেখে দেহদীপে স্নেহ-ভালোবাসা
—নবজন্ম-আশা।
—মোহমুদ্গার, বিস্মরণী

এই অন্তহীন পিপাসাই মোহিতলালকে করেছে কবি। তিনি এই জীবনের সুখ-দুঃখ বেদনাকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে চান। যে-দেহকে আশ্রয় করে এই অনুভূতি-গুলি সঞ্চারিত হয়, সে-দেহ মিথ্যা নয়, সত্য, হয়তো আত্মার থেকেও সত্য। তাই দেহের সুখদুঃখকে বাস্তবের মধ্যেই পেতে হবে—কাল্পনিক তত্ত্ব দিয়ে নয়। যিনি জীবনের ধূলামাটিকে বস্তুগত সত্যতায় দেখেন না, দেখেন সাহসকল্পনার রঙে তিনি মিথ্যাকে নিয়েই থাকলেন। মোহিতলালের এই জীবনতত্ত্বের সঙ্গে কাব্যতত্ত্বেরও কোনো অমিল নেই বরং তা অতিসুসঙ্গত। তাই ওই কবিতাতেই তিনি বলেন :

ঊর্দ্ধমুখে ধেয়াইয়া বজ্রোহীন রজনীর মল্লিকা-মাধবী
নেহারিয়া নীহারিকা ছবি,—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি নীরক্ত অধরে,
উপহাসি দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে।
বুভুক্ষু মানব লাগি রচি ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত কবি চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
হে কবি-বাসব?

এখানেও সম্বোধন করা হয়েছে কবি বাসবকে। রবীন্দ্রকে কবি মোহিতলাল আহ্বান করেছেন কল্পনার দ্রাক্ষাসব ত্যাগ করে প্রত্যক্ষরূপা ধরিত্রীর দুগ্ধধারায় পিপাসা নিবারণ করতে। স্পষ্টতই অতিচারী কল্পনার কাব্য রচনা ত্যাগ করে বাংলা কবিতার আমন্ত্রণ এল বাস্তব-জীবনের পথানুবর্তী হতে। বাস্তবকে বরণ করে নেওয়া নতুন কাব্যান্দোলনেরই মর্ম কথা। যতীন্দ্র সেনগুপ্ত অতিচারী কল্পনার ভ্রান্তপথ পরিহার করে সৃষ্টির নগ্ন সত্যকে চেয়ে দেখবার জন্য বাংলা কবিতাকে আহ্বান করেছিলেন, মোহিতলালের মোহমুদ্গরেও সেই আহ্বান বাজল। নতুন কাব্যান্দোলনের মর্ম সত্যটি কবিতা হয়ে ফুটে উঠল। কবি-বাসব নিখিল কল্পনার অধিনেতা আবার পরিমিত অর্থ সীমায় কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। মোহিতলালের প্রসঙ্গেও যতীন্দ্রনাথের মতোই অবশ্য বলা যায় মোহিতলালের জীবনতত্ত্বের অঙ্গরূপেই এই কবিতায় কবি ও কল্পনার প্রসঙ্গতা এসেছে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার থীম নয়।

যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলালের চ্যালেঞ্জের উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কবিতাই লিখলেন। পরম কৌতূহলের বিষয় এই যে এই কবিতা লিখবার আগে বেশ কয়েক বছর তিনি কবিতা লেখেন নি। অকস্মাৎ তাঁর মনের দুয়ার খুলে গেল। তিনি লিখলেন পূরবীর 'তপোভঙ্গ' 'লীলাসঙ্গিনী'। বিশেষ করে তপোভঙ্গেই যেন কবি যে-কাব্যাদর্শের তিনি স্রষ্টা যার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করছে বিদ্রোহী তরুণ কবিরা সেই কাব্যাদর্শেরই তত্ত্বটিকে কবিতায় রূপ দিলেন। তপোভঙ্গেও দেখা গেল কবিই অলক্ষ্য নায়ক—

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের। হে রুদ্র সন্ন্যাসী—
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।

যে কবি যুগে যুগে ফিরে আসে সে কোন কবি? সে অমর মৃত্যুঞ্জয়ী। কবিতার সেই চিরন্তন আদর্শ কোনো যুগের অভিঘাতেই একেবারে মরে যায় না—হয়তো কিছুদিনের জন্য প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আবার সে উজ্জীবিত হয় ভস্ম অপমান ছেড়ে। কবিতার চিরন্তন আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্যের নব নব বিকাশে নতুন আবির্ভাবে। কুমারসম্ভবের কাহিনীকে রূপকার্থে প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন শিব পার্বতীর প্রেমবন্ধন অবিনশ্বর। যেমন অবিনশ্বর প্রকৃতির বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য। শিব-সতীর মধ্যে কিছুকালের জন্য বিচ্ছেদ আসতে পারে। প্রকৃতিতেও যেমন বসন্ত-সৌন্দর্য ঋতুচক্রের বিবর্তনে হারিয়ে যায়। কিন্তু ওই প্রেম আর ওই সৌন্দর্যের লোপ নেই। মানুষের জীবনে বিক্ষোভ আসতে পারে, মনে হতে পারে এটাই সত্য। এটাই বাস্তব কিন্তু সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ এবং প্রেমের প্রতি মুগ্ধতাই মানুষের চিরন্তন রসপিপাসার নিবৃত্তি করে। আর তাই দিয়েই হয় কবিতা। যারা দুঃখের বা দারিদ্র্যের গর্ব করে বাস্তবতার কাব্য রচনা করতে চায় তাদের তিনি বলেছেন বৈরাগ্যবিলাসী—দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে দর্পিত।

তপোভঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁর আজন্মসাধ্য কাব্যতত্ত্বটিকে নতুন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন। তিনি বাঁশীই বাজাতে চেয়েছেন। অন্তর থেকে বচন আহরণ করে আনন্দলোকেই বিচরণ করতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্য ধর্ম থেকে নতুন যুগের কবির চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তিনি স্খলিত হন নি। জীবনের বা সমাজের বাস্তবতাকে নিয়ে একেবারেই উৎকণ্ঠিত নন। দুঃখ ও মৃত্যুকে তিনি জগতের আনন্দযজ্ঞের আয়োজন বলেই নিশ্চিত। পূরবীর 'যাত্রা' কবিতাটি লেখা হয়েছিল তপোভঙ্গের মাসখানেক আগে ১৩৩০-এর আশ্বিনে। সেখানে কবিকে দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতির ফুল-ফোটা আর ফুল-ঝরার বিশ্বলীলায় সঙ্গীরূপে

ওরা ডেকে বলে, কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি,
সন্ধ্যা মেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনাসভায়,

সেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির বক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য।

কবি বলছেন,

যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যু দূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি।

এটা কবি রবীন্দ্রনাথেরই আনন্দিত উক্তি। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে নিখিল কবিরই কাব্যকলাপ ধ্বনিত। মৃত্যুর বাস্তবতাকে বিশ্বজীবনের চিরন্তন লীলা বলে জানার প্রত্যয়টি একটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মগ্ন।

কিন্তু এমন করে মৃত্যুর কথা বলাতে দুঃখের তীব্রতা প্রকাশ পায় না। কবি বুঝি কোনো আশ্বাস পেয়েছেন—মৃত্যু কোনো অমৃতফল তুলে দেবে। সেই অমৃতত্বের কথা আছে পূরবীর বিভিন্ন কবিতায়। যাত্রার পরেই রচিত হয়েছে তপোভঙ্গ। সমগ্র কবিতাটির মধ্যে বিশ্বলীলার আনন্দধ্বনি বেজেছে। এই বিশ্বলীলাতে কবির কাজ সৌন্দর্যের বাণীমন্ত্রটি রচনা করা। পৃথিবীর বিনম্র মুহূর্তগুলিতে কবির প্রতীক্ষা সুন্দরের পুনরাবর্তন প্রত্যাশায়। মহাদেব যখন ধ্যানে বসেন তখনই চারিদিকে উদ্বেগ এবং দীনতার ছায়া। কবিও নীরব। আবার মহাদেব এবং পার্বতীর যখন মিলন তখনই সৌন্দর্যের ও আনন্দের বন্যা। তখনই কবি মুখর

ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে। বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি।

কবির কাজ শুধু যদি হয় আনন্দ ও সৌন্দর্যের শিল্পরচনা তবে যন্ত্রণা-পীড়িত দুঃখাভিহত একালের কবির পক্ষে সে কাজের ভার তুলে দেওয়া কঠিন বটে। রবীন্দ্রনাথ এখানে কবিতার যে সার্থকতার কথা বলেছেন তা একদিকে প্রিরাফায়েলাইটদের বাস্তব বিচ্ছিন্ন আর্ট ইসথেটিসিজম। সংস্কৃত আলংকারিকদের রসতত্ত্বের সঙ্গেও মিল আছে। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে বাস্তবের প্রসঙ্গটা গৌণ। অলৌকিক রসসৃষ্টিই প্রধান। লৌকিক জীবনচেতনা অপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ পূরবীর যুগে এই যে সৌন্দর্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন

একালের কবিরা তাকে মেনে নিতে পারলেন না। পরবর্তী কবিদের নানা ঘোষণায় তার প্রমাণ আছে।

ফলে বহুজনতার মধ্যে কবি হলেন একা, অনুভব করলেন তাঁর কাব্য-প্রতিমার নিঃসঙ্গতা। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদের আকর্ষণে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রযুগ, এবার সেই সৌন্দর্যবাদ আর নতুন অনুগামী তৈরি করে তুলতে পারছে না। 'লীলাসঙ্গিনী' তপোভঙ্গের পরের লেখা। কবি যে তাঁর সাথী খুঁজে পাচ্ছেন না, সেই বেদনাই এখানে আত্মগুঞ্জনে ব্যক্ত।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির সময়সীমা প্রসঙ্গে

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

বোধ হয় এ ধরণের জিজ্ঞাসা অবান্তব। কারণ আধুনিক পণ্ডিতজন এ বিষয়ে নিশ্চিত সময় তালিকা তৈবী করেছেন যেমন পিগোট তৈরী করেছেন মৃৎপাত্রের উপব লিখিত একটি সংবাদের ওপব ভিত্তি কবে। যদিও এ ধরণের সময়কে ঐ দেশীয় আর একজন গবেষক আবও একটু পেছনে নিযে খৃ পূঃ ১৭০০ করেছেন। কিন্তু মুস্কিল, যে সিন্ধু সভ্যতাব ওপর লক্ষ্য বেখে এই ভিত্তি তৈরী হচ্ছে, সেই ভিত্তি কোন সূত্র থেকে ? এ সম্বন্ধে হুইলার কিম্বা পিগোট কেউ নিশ্চিন্ত নন। সেই সভ্যতার প্রেবণা কোথা থেকে এসেছিলো, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষা করার প্রেরণাই-বা কিভাবে তৈবী হোযেছিলো, এ সম্বন্ধে প্রায় সবাই অনিশ্চিত। পিগোটেব একটি মন্তব্য উদ্ধার করি . 'What blending of cultural traditions took place whose individuality is shown by this painted pottery and the new comers, whose style of pot-making must indicate on sharply contrasted heritage, we do not know'[১] একটু ভিন্নভাবে হলেও হুইলারও এই ধরণের মন্তব্য করেছেন। আমাদের প্রশ্ন অন্যদিকে—বৈষম্য প্রদর্শনের এই মানসিকতা—যা সেই যুগের সাথে মেলে না—কোথা থেকে সংগ্রহ কবেছিলো ? যেমন 'ক্র' নিযে তাদের মানসিকতা কিম্বা প্রকৃতির নিয়ম থেকে কেন অশ্বত্থবৃক্ষ তাদের কাছে প্রতীক হলো, এখনো যেমন ভিন্ন আযতনেব প্রশ্ন তেমনি স্বক্ষেত্রেরও প্রশ্ন। কারন স্বক্ষেত্র-ই স্বকীয়তা আনযন কবে এবং এই স্বকীয়তার উন্মেষে অনেকগুলো মানসিক সংঘর্ষেরও প্রযোজন. তা সমান্তবালভাবে হ'তে পারে আবার অ-সামন্তরাল গতির ভিতব থেকেও আসতে পাবে। এই আযতনের সংবাদ যদি মেসোপোটেমিয়ায় না থাকে কিম্বা পার্শ্ববর্তী অন্য কোন স্থানে, তবে স্বভাবতই প্রশ্ন আসবে—সে স্থান তাহ'লে কোথায় ? আমরা উপরোক্ত উদ্ধৃতির ভিতর 'স্বকীয়তা' শব্দটিকে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জন্যে বলবো, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও রাখবো—এই স্বকীয়তা কি তাদের জন্মগত না কোন বিরুদ্ধগত ঐতিহ্যের

সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষের পরে পরিপ্রকাশ? সেই সংস্কৃতি যদি প্রতিবেশী দেশ থেকে না আসে তবে তা কী? এর উত্তর সিন্ধুসভ্যতার আকারে নেই বল্লে যেমন প্রমাদ হয়, তেমনি আছে বল্লেও। ঐ সিন্ধুসভ্যতার নাগরিক আকারে যেমন সংখ্যা এ জ্যামিতির বোধ নিয়ে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক বোধের সন্ধান মেলে তেমনি মেলে তাদের সাংস্কৃতিক বোধের সাথে ধর্মিয় চেতনায়, তাদের লিপিমালা, এবং অংকন পদ্ধতির ভিতর নৈসর্গিক বোধের বিন্যাস-এ।

এখন প্রশ্নটা উল্টো ভাবে করা যাক, যদি এইসব স্বকীয়তা অন্য কোন স্থানের সাথে না মেলে, নিশ্চয় কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পাশাপাশি ছিলো যে ঐতিহ্যের সাথে ক্রমাগত বিরোধের জন্যেই ওপরে উদ্ধৃত সেই 'Contrasted cultural heritage এর সূত্র ছিলো। সেই ঐতিহ্য কি ঋগ্বেদীয় সমাহার? প্রশ্নটি অর্বাচীন নয় এই কারণের জন্যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মত অস্বীকার করে আর একটি দ্বিতীয় মতও এই দেশে তৈরী হয়েছে: 'স্বামী শংকরানন্দ এবং ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের বহু বিষয় ও মন্ত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে কৃষি ও সংস্কৃতির ব্যাপারে বহু বিষয়েই বৈদিক সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার ঐক্য রয়েছে।'[২] এখানে 'ঐক্য' শব্দটি কি গ্রাহ্য? প্রথমেই পিগোটের মন্তব্য অনুসরণ করি, যে আর্যগুষ্টি বাইরে থেকে এসে সিন্ধুসভ্যতাকে ধ্বংস করতে এসেছিলো তারা 'হানাদার'। এবং সেই হানাদারদের নিয়ে বিশেষণ রাখছেন 'carrying off loot a knowledge of new technique'[৩] বিশেষণগুলো কি লক্ষনীয়? অবশ্য হুইলার এতো নীচে যেতে পারেন নি, তিনি এই মানসিকতাকে আরও সংস্কৃত করে বলেছেন—মনের দিক দিয়ে বিত্তহীন হলেও—'were not too proud to learn a little from the conquered'।[৪] আমরা তর্কে না গিয়ে শুধু এই প্রশ্ন তুলে ধরবো, যে আগন্তুকদল এত নিম্নমানের অধিকারী ছিলো তারা অত তাড়াতাড়ি একরকম উচ্চমানের সংস্কৃতির ধারক হলো। কি করে? মেটারলিংকের ভাষায়—'related to the loftiest speculations of modern agnosticism'—সহজেই এইসব আর্যগুষ্টি বাইরে থেকে খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে এসে এই রকম সংস্কৃতির বাহন হলো, অংকের নিয়মে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। যাস্ক নামে আমাদের পণ্ডিতজন, যাঁর সময় কাল খৃঃ পূঃ অষ্টম শতক, তিনি তাঁর বেদ-বিষয়ক আলোচিত গ্রন্থে তাঁর পূর্বস্মৃরি আরো চোদ্দজনের নাম করেছিলেন, সেই

সময় কতখানি পেছনে নেওয়া যায়? বেদাঙ্গর জ্যোতিষতত্ত্বের সময় ধরা হয় আর্যভটের দেড় হাজার পূর্বের সময়ে এবং আর্যভটের সময় ছিলো খৃঃ পূঃ ৪৬৮, এবং আরো আলোচিত—এটা সবাই স্বীকার করেন, বেদের ভিতর 'নিবিদ' বলে যে শব্দ তা বোধ হয় বেদ থেকেও প্রাচীনতর, তার থেকে আরও সহজ সিদ্ধান্ত—সবাই একমত, মহাভারতের যুদ্ধ ও বেদসংকলন একই সময়ে হোয়েছিলো। সেই যুদ্ধের কাল পণ্ডিত জয়েসওযাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতে খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে, এবং কর্মের বিচারে সংকলন ও রচনা উভয়েই যখন পুরোপুরি পৃথক তখন কিভাবে ধারণা করা যায়, বেদের সময় খৃঃ পূঃ ১৫০০? এই ধরণের আংকিক নিয়ম যখন প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে, তখন চিন্তা করা উচিৎ, এর পেছনে অন্য কোন তথ্য আছে কিনা যার ওপর নির্ভর করে আমরা অগ্রসর হতে পারি। আমরা দেখছি দুটো সভ্যতা প্রায় পাশাপাশি স্থানের ওপর তৈরী হোয়েছে, এটা সবাই স্বীকার করেছেন—হিমালয়কে কেন্দ্র করেই ঋগ্বেদের সাংস্কৃতিক গঠন, যেমন অগ্নি-সোম-ইন্দ্র—আবার সিন্ধুসভ্যতা হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তৃত হোয়ে তা আরও ভিতরের দিকে অগ্রসর হোয়েছে। ঋগ্বেদের মধ্যবর্তী সূক্তগুলো যদি অনুধাবন করা যায়, দেখা যায় কাশ্মীর থেকে ইরাণের সীমা পর্যন্ত তার স্থান ছিলো, প্রস্তর যুগের আলেখ্য নিয়ে সিন্ধুসভ্যতায়-ও সেই নিদর্শন। তখন এ প্রশ্ন কী তোলা যায়, দুই সভ্যতার ভিতর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিলো—না তার আঙ্গিক গঠন পুরোপুরি ভিন্নতর মানসিকতা রক্ষা করে বর্ধিত? যদি আমাদের দেশের পণ্ডিতজনের কথা মানতে হয় তাহ'লে এইভাবে চিন্তা করতে হয়। তাই যদি করতে হয় তাহলে এভাবেও চিন্তা করা উচিৎ, সেই সূত্র নিবারণের ব্যবস্থা আমাদের সাহিত্যে আছে কিনা! 'দ্রাবিড়' শব্দের আগে 'অনার্য' শব্দটা প্রচলিত ছিলো, কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার সংবাদের পরে 'দ্রাবিড' শব্দের মূল্যায়ন অন্যভাবে গড়ে উঠেছে। এই দ্রাবিড়রাই কী ঋগ্বেদের 'দাস' কিম্বা 'দস্যু'?[৫] প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনার ভিতর আমরা দুই গুষ্ঠিকে পাই, একটি 'অগ্নি'র বিষয় নিয়ে চালিত সম্প্রদায় যাদের প্রকৃত আর্য বলে ধারণা করে নিয়ে নেওয়া হোয়েছে, আর একটি 'পণি' সম্প্রদায় যারা সেই যুগে তাদের কর্মপদ্ধতির দ্বারা ঐহিক জীবনের প্রথম সূত্রস্বরূপ গোসম্পদের ধারক হোয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হোয়েছিলো, ঋগ্বেদের ভাষায় বণিকবৃত্তির ধারক, সায়ণের 'পণি' শব্দের ব্যাখ্যায় তাই। আর্য-

গুষ্টির যেমন 'অগ্নি' তাদের নৈসর্গিক বোধকে সঞ্জীবিত করার জন্যে কর্ম দিয়েছিলো তেমনি এই পণি শ্রেণীর ঐহিক চেতনার জন্যে 'গো' নামক পশুর অধিকাব নিয়ে কর্ম এই দুই সম্প্রদায় প্রথম একই স্থানে ছিলো, অন্তত ঋগ্বেদের বর্ণনাব ভিতর যদি আস্থা থাকে, অঙ্গিরাভৃগুগুষ্টি যেমন 'অগ্নি'র প্রথম সূত্র আবিষ্কার করেছিলো, আবার এ-ও দেখি এই গুষ্টিই আর্য শ্রেণীকে গোসম্পদেব ধারণাকে বুঝবার জন্যে ব্যবস্থা করেছিলো। এ কি দুই বোধের সমন্বয় প্রচেষ্টা, এক অন্য ছাড়া থাকতে পারে না, দ্যাবাপৃথিবী বলে যা তারা আগে ধারণা করতে পেরেছিলো, তারই বাস্তব রূপ ভিন্ন ধারায় প্রকাশিত? যদি তাই হয় সেই বাস্তবরূপ আসতে কতদিন লেগেছিলো? সেই প্রাচীন রূপেব কথা ঋগ্বেদে নেই, কিন্তু তাব মধ্যযুগের বর্ণনা আছে, যে বর্ণনার ভিতর দেখি—তাদের সংঘর্ষ বিদ্বেষ নিয়ে ঘটনা, এই ঘটনাগুলো ধরতে হলে ঋগ্বেদের সংবাদগুলোর ভিতব সতর্ক দৃষ্টি ছাড়া তা বের করার উপায় নেই। ঋগ্বেদে 'পূর্ব' ও 'নূতন' শব্দ বার বাব ব্যবহার করা হোয়েছে, সেইজন্যে সেই যুগের ঐতিহাসিক সূত্র ধবার জন্যে 'পূর্ব পরম্পরা' শব্দদ্বয় একটি বিশেষ মাধ্যম। সেজন্যে ঋগ্বেদীয় শব্দগুলো সে ভাবে দেখা উচিৎ, ব্রহ্মা একজন হোতাব নাম, এই শব্দটিই ঋগ্বেদীয় কাল থেকেই কিভাবে রূপান্তরিত হোয়েছে, তা ঋগ্বেদীয় সাহিত্যের সাথে যাঁদের সংযোগ আছে তাঁরা ধরতে পারেন। যখন ব্রহ্মা থেকে ঋগ্বেদীয় কালের উৎপত্তি, তার মানে 'অগ্নি'-র স্বরূপেব প্রথম জ্ঞান এসেছিলো যার থেকে, এবং এই ব্রহ্মা থেকে মরীচিকশ্যপ প্রভৃতির পরম্পরা, তেমনি রাজন্যবর্গের ভিতব শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনু (হয়তো রাজন্যবর্গ বল্লে অনেকের আপত্তি হ'বে, সেজন্যে বলা যেতে পারে গুষ্টি প্রধান কিম্বা সামন্ত প্রধান)। কিন্তু প্রশ্ন এই তালিকা নিয়েও কি তাদের সময় নির্দেশ করা যায়? আমরা ঋগ্বেদে প্রাপ্ত কয়েকটি দেবের শরণ নিতে পারি, যেমন দশম মণ্ডলে একটি সূক্তের উল্লেখ—ঋভুগণ অগ্নির জন্যে স্তব রচনা করেছেন (১০।৮০।৭)। এই উল্লেখের ভিতর দুটো বিষয় যুক্ত, একটি হলো 'অগ্নি' আর একটি হলো 'ঋভুগণ'। 'অগ্নি'—যা আগে উল্লেখ করেছি—হলো প্রথম বস্তু যার দ্বারা সেই কালের ঋষিগণ এই পৃথিবীর সম্বন্ধের কথা ধরতে পেরেছিলেন। এর দ্বারা যেমন প্রাকৃতিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি ভোগের ব্যাপারেও এর সদ্ব্যবহার হ'তে পারে, এবং এ অত্যন্ত আদিরূপের ঘটনা, তুষার যুগের—এই

যুগের কথার সামান্য উল্লেখ আছে, বলা যেতে পারে বীজাকারে, এ ছাড়া অন্য কোন সূত্র নেই—সেই হেতু তা প্রাক্‌বৈদিক যুগ, কিন্তু যা উল্লেখের ভিতর না-থেকে বিবরণ কিম্বা কাহিনীর দ্বারা সংরক্ষিত তা তার মধ্যযুগ—এবং এই মধ্যযুগের কথাই আমরা বর্তমান ঋগ্বেদে পাই, এবং এই মধ্যযুগ থেকে তৎকালীন আধুনিক যুগ। কশ্যপের কিছু কিছু সূক্ত আমরা পাই, ইন্দ্রের মানুষরূপের সন্ধান নেই, কিন্তু তার ইঙ্গিত আমরা ব্যাসদেবের সূক্তে পাই, যেখানে ইন্দ্রকে দেখি কুৎস ঋষির সখারূপে, এর দ্বারা যেমন কুৎস ঋষির প্রাচীনতার সংবাদও মেলে তেমনি জানি—ইন্দ্রের পূর্বে নৈসর্গিক ভূমিকা ছাড়াও অন্য ভূমিকাও ছিলো। আমরা আদিরূপের কয়েকটি বীজস্বরূপ ঘটনা রেখে মূলপ্রসঙ্গে যেতে চেষ্টা করবো।

দশম মণ্ডলের একটি ঋকে অগ্নি নিয়ে এই বর্ণনা আছে—অগ্নি প্রথম আকাশে, তার দ্বিতীয় জন্ম আমাদের নিকট, তৃতীয় জন্ম জলের ভিতর (১০।৪৫।১)। এই ঋককে সামনে রেখে শুধু আমরা এই প্রশ্ন করতে পারি—এই সত্য জানতে তাঁদের কতদিন সময় লেগেছিলো? এ হলো সেই রকম চূড়ান্ত সত্য, সেই যুগের অনুপাতে এ জগতে তাঁদের কয়েক হাজার বছরের প্রয়োজন হোয়েছিলো। এঁরাই কি সেই অঙ্গিরাগুষ্ঠ, যাঁরা দ্যাবাপৃথিবীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক প্রথম যেভাবে তৈরী হোয়েছিলো, তা তাঁরা জানতে পেরে-ছিলেন? যদি ধরতে না পারেন, তারা কিছুতেই বলতে পারতেন না—দ্যাবা-পৃথিবী প্রথমে জলাকৃতির ভিতর সম্মিলিতভাবে ছিলো. যখন চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হলো তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক হোয়ে গেলো (১০।৮২।১)। কথাগুলো কী বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক? আমরা সেই কূট তর্কে না গিয়ে, এই দ্যাবাপৃথিবীর বহু পরবর্তী অংশ আধুনিক আলোচকেরা কিভাবে পরিবেশন করেছেন তার সামান্য সংবাদ রেখে পরবর্তী প্রশ্নে যাবো। পিগোটের বর্ণনা: 'The North Polar Ice-sheet spread South in Europe to form a continuous ice-mass to the River Thames in England and the Himalayas of North India reaching the foot-hills, are the familiar ice-ages or glacial periods. .'[৬] এই ঘটনার পরবর্তী ঘটনাই কী জীবজগতের স্থান নির্ণয়? যদি তাই হয়, সেই সময় এই তুষার যুগের কতদিন পরে? যদিও সেসব আনুমানিক সিদ্ধান্ত, তবু সেইসব সিদ্ধান্ত

ধরেই আমাদের এগোতে হ'বে। এই তুষার যুগের সময়ে যেসব জীবজগতের স্থান হিমালয়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিলো তা-ই আমাদের বিবেচ্য, এবং ঋগ্বেদের বর্ণনা আমরা বর্তমান সংহিতায় যেভাবে পাচ্ছি তা-ই আমাদের একমাত্র নথি, যেমন আগে যা উল্লেখ করেছি—ঐ 'অগ্নি' নিয়ে বিষয়, যাযাবর জীবনের পর গোধন নিয়ে কৃষিকর্মের আরম্ভ, তার বিকাশ ও পরিণতি অন্তত ঋগ্বেদীয় সাহিত্যে যার উল্লেখ আছে, তা-ই হবে আমাদের সূত্র। যদি গোধন কৃষি-যুগের ঘটনা হয়, যদি তা হয় খৃঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে, এই ঋগ্বেদীয় সময় কি সেইভাবে নির্ণয় করা যায়? আমরা আংকিক বিচারে না গিয়ে ঋগ্বেদে উল্লিখিত আর একটি দেব-এর শরণ নিই। পূষা ঋগ্বেদে পশুচারণের দেব বলেই স্বীকৃত। তার হাতে অস্ত্র রাখা হোয়েছে পশুদের চালনা ও রক্ষা করার জন্যে (৪।৩৫।৯), পশুচারণের জন্যে তৃণযুক্ত দেশের সন্ধান (১।৭২।৮), পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য দুষ্কৃতকারীকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা (১।৪২।২)—এগুলো লক্ষ করলে ধরা যায় এই দেব তাদের কি কারণের জন্যে প্রয়োজন হোয়েছিলো, এবং এই শ্রেণীর সাথে 'পণি' শব্দ যোগ করার পর (৪।৩৫।৫) ধরা যায় কারা প্রথম পশুশ্রেণীকে নিজেদের অধিকারে রাখতে পেরেছিলো। ঋগ্বেদে 'পঞ্চশ্রেণী' 'পঞ্চক্ষিতি' 'পঞ্চকৃষ্টি' শব্দ বিশেষ অর্থে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, মুর (Muir) যার অর্থ করেছেন—ফাইভ্ ট্রাইবস্, যদি এই ভাষ্য স্বীকার করা হয়, তা'হলে স্থির করা যায় এই সময়ে কতদূর অবধি ঠেলে নেওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর উদ্ভবের পরেই দেখি ইন্দ্রের আবির্ভাব, যে এই শ্রেণী থেকে পশুসম্পদ গ্রহণ করার জন্যে অস্ত্র গ্রহণ করে নিজের অধিকার নিয়ে এসেছিলো, কৃষিকর্ম তৈরী হলেও গুহা-বাস থেকে তাদের সমতল ক্ষেত্রে তখনো প্রবেশ ঘটে নি। উদাহরণের জন্যে কয়েকটি ঋকের স্মরণ নিই। ইন্দ্র পণিদের কাছ থেকে লুক্কায়িত গাভী জয় করেছে (১।৩২।১১-১২), এই গাভী জয় করার কথা দশম মণ্ডলের ৬৮ সূক্তেও যেমন বিস্তৃতভাবে আছে (যদিও সেখানে নাম আছে বৃহস্পতির), তেমনি আছে অন্যান্য মণ্ডলে, এবং এইসব করার পর ইন্দ্র স্থাবর ও জঙ্গমের শৃঙ্গী পশুদের রাজা হলেন (১।১২।১৫)। এইসব সংবাদের পর ধারণা করা যায় ইন্দ্রের কর্ম কি ধারায় অগ্রসর হয়ে তার পরিণতি নিয়েছিলো, এবং দশম মণ্ডলের সেই বিখ্যাত সূক্তটি (১০।১০৮), যাকে বলা যায়—যে বিরাট বিরোধ

চলছিলো পণি ও ইন্দ্রপন্থীদের ভিতর, তার মীমাংসাস্বরূপ একটি সন্ধি সূত্র। আরও লক্ষণীয়, সরমা যখন এই সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে পণিদের কাছে উপস্থিত হোয়েছিলো তখন তাদের আবাদ স্থান ছিলো গুহার ভিতর। এর দ্বারা কি নির্দেশ, তারা তখনও হিমালয়বাসী? তাই। পরবর্তী কালের বর্ণনায় আবার পণিদের নিয়ে অন্য চেহারা দেখি, এবং সেই বর্ণনায় ধারণা হয় তা আরও পরবর্তী কালের, তাতেও সেই দুই চিত্র—তাদের নিয়ে যেমন অসূয়াও আছে তেমনি আছে হৃদ্যতার চিত্রও। যেমন অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়ের কাছে পণিদের প্রাণ বিনাশের আবেদন জানাচ্ছেন (১৮২।৩), বিশ্বামিত্র পণিদের বুদ্ধি নাশ করার কথা বলছেন (৩।৫৮।২)। কিন্তু ভিন্নরূপ চেহারা আবার বশিষ্ঠ সূক্তে, তিনি পণিদের হব্য ও ধন দান করছেন, ভরদ্বাজসূক্তে পাই—তিনি পণিদের ধনশালী ও প্রাজ্ঞ বলে বিশেষণ দিচ্ছেন (৬।৪৪ ৬৩)।

নীজাকারে দুই শ্রেণীর যে ধর্মের কথা বলা হলো, এই ধর্ম না ধরা গেলে সেই সময়কার সাংস্কৃতিক চেতনা ধরা যাবে না। কম্বগোত্রীয়ের পণিদের যখন সুদখোর ও দিবসগণনাকারী বলে নিন্দা করছেন (৮।৬৬।১০), এই শ্রেণীদেরই বৃবু তখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলো। এই দুই মানসিকতাকে না চেনা গেলে যেমন এই শ্রেণীকে ধরা যাবে না, আবার সংযোগ সূত্রের কাহিনী ধরে বশিষ্ঠের সাংস্কৃতিক মানসিকতার চেহারা-ও ধরা পড়ে, তেমনি অসূয়ার কারণ ধরে বিশ্বামিত্রের কর্মকাণ্ডকে। বশিষ্ঠ সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন, বিশ্বামিত্র দশজন ভারত রাজার। বশিষ্ঠের বরুণের ওপর সূক্তগুলো বিখ্যাত, বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী মন্ত্রের-এর কারণ কী ধরা যায়? যদিও তা এই পরিসরে আলোচনার বিষয়বস্তু না, তবুও সংক্ষেপে বলা যায় একজন ঐহিকের ভিতর থেকে মীমাংসা চেয়েছিলেন আর একজন নৈসর্গিক ক্ষেত্রে থেকে।

তবু এ কূট তর্কে না গিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খাতিরে আরও একটি সহজ দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হই। বৈদিক সাহিত্যে প্রথমত চোখে পড়ে তিন সংখ্যার আধিক্য, তারপর পাঁচ, তারপর সাত—এবং অনুপাত ধরে চোখে পড়ে দুই-এর। কারণ কী নৈসর্গিক? প্রথমে দ্যাবাপৃথিবী ছিলো, দুই, তারপর আয়তন রক্ষার জন্যে যুক্ত হলো অন্তরীক্ষ, তারপর পঞ্চজাতি পঞ্চকৃষ্টি পঞ্চঋতু। সবাই জানেন গণনার নিয়মে দশমিক নিয়ম কত সহজবোধ্য, প্রয়োজনের ব্যাপারে সেই

সংখ্যাগুলো তাঁরা এইভাবে রেখেছেন—দশ কুড়ি ত্রিশ সহস্র (২।১৮।৫) আবার ঐ সূক্তেই দেখা যায়—দুই চার ছয় অথবা আট। পণিজন নিয়ে ভিন্ন অনুক্রম বৈদিক সাহিত্যে মেলে না, হয় তাদের এই অনুপাত ছিলো, ব্যবসায়িক প্রয়োজনের জন্যে তারা এই অনুপাত-ই হয়তো ব্যবহার করতো। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার সংগ্রাহকেরা আমাদের একটি সংবাদ দিয়েছেন : The weights have been found run in a ratio 1, 2, 8/3, 4, 8, 16, 32, 64. can be recognized as a system in which the unit was ratio 16 .. This use of multiple 16 is interesting and curious '[৭] আমরা শেষ দুটো শব্দের ওপর লক্ষ করে বলবো, সত্যিই কি এ ধরণের অনুপাত 'চমকপ্রদ' এবং 'অদ্ভুত'? এই ধরণের বিস্ময় সিন্ধুসভ্যতার অলংকরণের ভিতর নাক্ষত্রিক জগতের সন্ধান পেয়ে তারা করেছেন, কিন্তু তা দেখে আমাদের আশ্চর্য লাগে না—কারণ আমরা ঋগ্বেদের উষা কিংবা সূর্যের ওপর সূক্তগুলো দেখেছি। যেমন বৃষব প্রতীক নিয়ে পিগোটের উক্তি—'The origin of the humped bull is obscure'. 'বৃষ' শব্দ কি ব্যাপকভাবে ঋগ্বেদে ব্যবহার হোয়েছে, যার আদি অর্থ ছিলো 'পূর্ণ করা' তারপর হলো 'অভীষ্টবর্ষী'। আমরা যদি ধারণা করে নিই, দু'টো শ্রেণী পাশাপাশি বাস করার পর একে অন্যকে গ্রহণ করেছে তাহ'লে সমস্যা অনেক কম হয়। কিন্তু ভিন্নার্থে ধরলে সমস্যা বাড়ে। আমরা কৃষিকর্মের ঘটনা নিয়ে আর একটি দৃষ্টান্তের শরণ নিই।

এমন জানা যাচ্ছে ঋগ্বেদীয় সময়ে যব-ই একমাত্র শস্য ছিলো। 'বীজ' শব্দ অবশ্য ঋগ্বেদে বহুবার ব্যবহার করা হোয়েছে, 'অন্ন' শব্দও আছে, কিন্তু 'ব্রীহি' শব্দ যার অর্থ চাল সেই শব্দ ঋগ্বেদে নেই। এই 'ব্রীহি' কী ঋগ্বেদের পরবর্তী কালের? পিগোটের বর্ণনা, চাল নামক উৎপাদিত শস্য ইয়াং সি কিয়াং নামক নদীপথে খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে ভারত থেকে গিয়েছিলে। 'But by 2000 B C. agriculture had been established for at least three thousand years in Persia and Mesopotamia and for a thousand In Western India '[৮] তাই যদি হয়, কি ক'রে ধারণা করা যায় ঋগ্বেদের সময় খৃঃ পূঃ ২০০০ এর পরে? গৃৎসমদ অত্যন্ত প্রাচীন ঋষি সেই প্রাচীন ঋষি তাঁর ঋকে এর দ্বারা শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করার কথা বলছেন

(২।১৪।১১), এই ঋষির ঋক এই জন্যেই উল্লেখ করা হলো যেহেতু এই ঋষি অত্যন্ত প্রাচীন—হয়তো বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক। কিন্তু মূল সমস্যা অংকের ধর্ম নিয়ে এঁদের সময় তালিকার অন্বেষণ। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা, যেহেতু আগন্তুক আর্য শ্রেণীর দল অর্ধ শিক্ষিত, সেই শ্রেণীর সাথে যোগ করা যায় না। ঋগ্বেদীয় বর্ণানুযায়ী যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধ তৈরী হোয়েছিলো —তার সাথে মেলে না। মেলে না বলেই আমরা এজন্যে একজন দেশীয় আলোচকের সম্মুখীন হচ্ছি। ওঁকারানন্দ সরস্বতী রামায়ণের ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেই সময়কার পঞ্জিকা মহাভারতের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রক্ষা করেছেন।[৭] যেহেতু প্রাক্‌বৈদিক যুগের কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই, মধ্যযুগের কথা যেহেতু ঋগ্বেদে মেলে, সেই হেতু সেই কাল পর্জিটার ও জায়সওয়ালের পদ্ধতি ধরে স্থির করেছেন খৃঃ পূ ২৯৫৭ (আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ধরে নেবো খৃ. পূ ৩০০০)। কিন্তু প্রশ্ন, এই সময় তালিকা কি গ্রাহ্য? ভৃগুগুষ্টির প্রাক্‌পুরুষ কারা ছিলো তা জানার আমাদের উপায় নেই, রাজন্যবর্গের ভিতর মধ্যপুরুষের নহুষ-যযাতি-মান্ধাতার নাম ঋগ্বেদে মেলে। কিন্তু তাঁদের পুরো বিবরণ জানতে হলে আমাদের পরবর্তী সাহিত্যে যেতে হয়, যদিও সেই কাহিনী কিছুটা রং-এর দ্বারা রঞ্জিত যেমন রং আছে ঋগ্বেদের যম-যমীর কাহিনীতে উর্বশী পুরূরবার বৃত্তান্তে, যেমন ঋগ্বেদের মূল অর্থ না জানলে এর তদর্থে প্রমাদ ঘটতে পারে—যেমনি প্রমাদ ঘটতে পারে পুরাণ কাহিনীর বিবরণে যদি সঠিক অর্থ চোখের সামনে ধরা না থাকে। কারণ পুরাণ কাহিনীর বীজ ঋগ্বেদে।

য়ুরোপের আধুনিক পণ্ডিতজন এগুলো লক্ষ্য না করেই এই সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে এই বিপদ সৃষ্টি করেছেন, ধরতে পারেন নি—'দাস' ও 'দস্যু' কোন সাংস্কৃতিক অর্থ ধরে প্রযুক্ত, যেমন এইসব ঋক—প্রয়োজনবোধে ইন্দ্র দস্যু-পণি-আর্যদের হত্যা করতো (৬।৩৩), ঋগ্বেদের ভিতর যেসব যুদ্ধের বিবরণ আছে তার ভিতর সুদাসের নাম কেন এত বিশেষ করে। যদি তাঁরা একটু সতর্ক হতেন ধরতে পারতেন, বশিষ্ঠের বিশ্বামিত্রের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কোথায়! এ-ও ধরতেন, একজন যখন আর একজনের ওপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন তার সূত্র কোনখানে। এই রহস্য জানা না থাকলে বশিষ্ঠ যখন বিশ্বামিত্রকে 'যজ্ঞরহিত' বলছেন, তখন অসতর্ক

আলোচকু এই সূত্র ধরেই বিশ্বামিত্রকে 'অনার্য' শ্রেণীতে ফেলে বিচারে বসতে পারেন। সমস্ত ঋগ্বেদে যদু 'দাস' বলে চিহ্নিত, কিন্তু যদু কী 'দাস'?

এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি মূল প্রশ্ন রাখা যায়, কেন সেই সময় এত যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ, ঋগ্বেদের ভাষায়—জল ও উর্বরা ভূমি পাবার জন্যে (৬।২৫।৪)। এই মূল সত্যটি চোখের সামনে থাকলে ধরতে পারবো, বিশ্বামিত্র দশজন রাজা সহ কি কারণে বশিষ্ঠের দেশকে ঘিরে ধরেছিলো এবং প্রথমবার পরাজিত হোয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হোয়েছিলো। বশিষ্ঠের কৃতিত্ব যুদ্ধজয়ে না তাঁর সাংস্কৃতিক বিজয়ে, যে বিজয়ের কারণ তাঁর সমন্বয়সূত্রে। এতে যেমন তাঁর যাজ্ঞিকসম্মান বৃদ্ধি পেলো তেমনি তৈরী হলো ভবিষ্যৎকালের জন্যে সমন্বয়সূত্রের বীজ। বিশ্বামিত্রের মূল পরাজয়ও এইখানে, যার পরিণতি আমরা পাই পরবর্তী সাহিত্যে 'কামধেনু' নামক গাভীর প্রতীকাশ্রয়ে। সেজন্যে ঋগ্বেদীয় সাহিত্যে সুদাস এত বিশেষ, তাঁর পূর্বপুরুষ দিবোদাস যাকে বলা হতো ঋগেদীয় ঋকে 'অতিথিবৎসল', আরো সহজ ক'রে বলা যায় শ্রেণীগত চেতনার অপহ্নব দূর করার প্রথম পুরুষ। কিন্তু দিবোদাস কখনকার? খৃঃ পূঃ ২৪০০ অব্দের[১০]। এই ধরণের সিদ্ধান্তের সমস্যা তৈরী হয়, যেমন ঋগ্বেদের বর্ণনায় দ্রুহ্যু-অনুর সুদাসকে আক্রমণকারী বলে বলা হোয়েছে, এরা কারা, যযাতির পুত্র? তাহ'লে সেই সময় খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি আসে, সপ্ত ঋষির ভিতর বশিষ্ঠ-ও যখন একজন তখন এই সময় তালিকার সাথে মেলে, কিন্তু এই সময় তালিকায় যদি বশিষ্ঠকে ত্রিশ পুরুষের পরে ধরা হয় (যা ওঁকারানন্দ সরস্বতী করেছেন) তবে তা খৃঃ পূঃ ২৬০০ অব্দের আগে নেওয়া যায় না। আমরা আর একটি সংবাদের সম্মুখীন হ'তে পারি। ঋগ্বেদে কুরুবংশের উল্লেখ আছে। এই কুরুবংশের প্রাক্-ভূমি কি কাশ্মীরের উত্তরে রুশ দেশ, যা বর্তমান পণ্ডিতের আবিষ্কারে প্রাচীন প্রস্তর যুগের 'অমুকালচার' বলে চিহ্নিত?[১১] আমরা ঋগ্বেদেই পাই, সিন্ধুর জ্ঞানবাদের সংবাদ চতুষ্পার্শে ছড়িয়ে পড়ার পর কক্ষীবাণ নামক ঋষি গান্ধার থেকে সিন্ধুতে শিক্ষা নেবার জন্যে এসেছিলেন (১।১২৫)। যদি আমরা ওঁকারানন্দের হিসাব রাখি তাহ'লে এই কক্ষীবাণের সময় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের দু'শ বছর পর। এই ঘটনায় দু'টো জিনিস স্মরণ, সংঘর্ষে-সংঘর্ষে সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হয় নি, এবং শিক্ষার্থ্যধ্যানীর জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিলো।

তাহ'লে প্রশ্ন, য়ুরোপীয় পণ্ডিতজনের ভুল কোথায়? উত্তর বোধ হয় এই-সেই সময়কার ভৌগোলিক তাৎপর্য না ধরে তাঁদের প্রমাদ তাঁরা নিজেরাই ডেকে এনেছেন। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক কারণে যে ইন্দো-ইরাণীয় শব্দের জন্ম হোয়েছিলো, তার বদলে ইন্দো-য়ুরোপীয় শব্দ গ্রহণ করে সমস্ত বিষয়বস্তুই সেই দিক থেকে ধরতে চেয়েছেন। 'অগ্নি'-র সাংস্কৃতিক চর্চা ইরাণে যা ছিলো, ভৌগোলিক কারণেই তার চর্চা হিমালয়ের চতুষ্পার্শে অন্যরূপ নিয়েছিলো। ঐহিক কারণেই ভোগজাত সম্পদের বৃদ্ধি হোয়েছিলো, যা অন্য দেশের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এই কারণের জন্যেই প্রতিবেশীর চোখ এই ভূমির ওপর আকর্ষিত হ'তো। য়ুরোপীয় পণ্ডিতজন একটু সতর্ক হ'লে তা ধরতে পারতেন। ধরতে পারতেন, 'অসুর' শব্দ ঋগ্বেদীয় ঋকে দেব-এর পূর্বে সুবিশেষণ নিয়ে কেন ব্যবহৃত। এবং তৎপরবর্তী কালে যদি পুরাণ সাহিত্যগুলো অনুসরণ করতেন, দেখতে পেতেন এই শব্দই আবার অন্য অর্থে ব্যবহৃত। তাঁরা এই দিকে না গিয়ে, নিজেদের দেশে সাংস্কৃতিক বিকাশ কিভাবে হোয়েছে সেই সূত্র ধরে ইন্দ্রের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করলেন। যেমন কেল্টিক পরিবেশ নিয়ে পিগোট স্পষ্টতঃই বলছেন: 'The atmosphere is that of the Irish tales that reflect the conditions of Celtic Iron age of the first century B C ?[১২] এবং অন্য কিছু অর্থ ধরতে না পেরে ইন্দ্রের পরিণতি সেই অর্থেই ধারণা করে নিলেন 'Young brand of heroes and the cattle raiding is as familiar ?—এবং ধরতে পারলেন না পণি শ্রেণীকে সামনে রেখে ইন্দ্রের বিবর্তনমূলক ঘটনাগুলো, এবং ধরতে পারলেন না এই সাহিত্যে 'বৃষ' শব্দ কি অর্থে তৈরী হোয়েছে, সিন্ধুসভ্যতায় যে অর্থে তাঁরা 'শিব'-এর আরম্ভ বলে ধারণা করছেন, সেই আরম্ভের সূত্র-ও যে ঐ ঋগ্বেদীয় সাহিত্যে—যে ঋকে আছে এই শব্দগুলো 'বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে' (২।৩৩।৮) এবং এর সাথে 'রুদ্র' শব্দ যেভাবে প্রযুক্ত—এ তাঁদের চোখে পড়লো না।

আর একটি বিশ্লেষণ সামনে রেখে আমি এই আলোচনার শেষ পর্বে যাব।

২.

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ২৭।৫ ঋকে 'হরিয়ূপীয়া' বলে একটি স্থানের নাম আছে। ঋগ্বেদের বর্ণনানুসারে জানা যায়, এখানে একটি বিরাট সংঘর্ষ হোয়েছিলো। এবং

আধুনিক পণ্ডিতবর্গ মনে করছেন, এই হরিয়ূপীয়া ও সিন্ধুসভ্যতার হারাপ্পা এক।[১৩] কিন্তু এই সব প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে হুইলার একটু ভুল করেছেন, বলেছেন 'The tribe of the Vrievants is likewise nowhere else referred to in the Rigveda, but may be connected with Varchin, who was a foe of Indra and therefore Non-Aryan.' ইন্দ্রের শত্রু হ'লেই 'অনার্য' হ'তে হ'বে ঋগ্বেদ পাঠ করার পর এই চিন্তা কেন অসম্ভবতা আমি আগে রাখতে চেষ্টা করেছি। 'বর্চি'-র উল্লেখ আমরা দ্বিতীয় মণ্ডলে (২।১৪.৬) পেয়েছি, সেখানে দেখি ইন্দ্র তার প্রস্তরের ন্যায় বজ্র নিয়ে (বিশেষণটা কি লক্ষণীয় ?) বর্চির শত পুত্রকে হত্যা করছে। আমাদের প্রশ্ন 'বর্চি' নিয়েও নয়, ষষ্ঠ মণ্ডলের 'চয়মান' নামক ব্যক্তি যে ইন্দ্রের সহায়তায় ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলো। এই চয়মানের নাম আবার আমরা বশিষ্ঠসূক্তে-ও পাই যার পুত্র সুদাসের সাথে যুদ্ধে নিহত হোয়েছিলো (৭।১৮।৮-৯)। এই স্থান কোন স্থান, ষষ্ঠমণ্ডলে যে স্থানের উল্লেখ এ স্থানও কি সেই স্থান ? বশিষ্ঠের বর্ণনায় এই কথাও আছে, দুরভিসন্ধিযুক্ত হোয়ে সুদাসের প্রতিপক্ষ নদীর কূল ভেঙ্গে দিয়ে সুদাসের স্থান প্লাবিত করতে চেয়েছিলো, এ কি হরপ্পার নগর ? আমরা দুই ঘটনা প্রায় একইভাবে পাই, পার্থক্য শুধু চয়মানের পুত্রের নামে—ষষ্ঠমণ্ডলে সেই নাম দেখি 'অভ্যবর্তী' আর সপ্তম মণ্ডলে 'কবি' বলে। আর্য-অনার্য প্রসঙ্গটি ধরবার জন্যেও এই প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

এবার আমরা আলোচনার শেষ পর্বে নাবার চেষ্টা করবো। ঋগ্বেদেই এমন কতগুলো প্রসঙ্গ আছে, তাতে সন্দেহ আসে হিমালয় এবং তৎসংলগ্ন স্থান নিয়ে। সত্যিই কি প্রাকবৈদিক যুগে হিমালয় এবং তৎসংলগ্ন ভারত কোন জলসীমা দ্বারা বিভক্ত ছিলো ? আমাদের পুরাণ কাহিনীতে এবং মহাভারতে জম্বুদ্বীপের সংবাদ আছে। বৈদিকোত্তর বর্ণনায়ও সেই নামের উল্লেখ দেখা যায়, যেমন অশোকের অনুশাসনে তার সাম্রাজ্যকে জম্বুদ্বীপ বলছেন। পালি সাহিত্য পৃথিবীকে চক্রবালরাজ্য বলছে, পুরাণকাহিনীতে সুমেরুর চতুর্দিকস্থ চারটি দ্বীপ নিয়ে কথা আছে। এই পরম্পরা এই জন্যেই রক্ষা করা হলো, ঋগ্বেদ সংহিতায়ও তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পর্বতের ইঙ্গিত নিয়ে তাদের চিন্তার অর্থ ধরা যায় যেহেতু তাদের বাসস্থান হিমালয় ছিলো, কিন্তু সমুদ্রের কল্পনা নিয়ে চিন্তা, তখন ধারণা

করতে হয় সমুদ্র তাদের কাছে কতটুকু নিকট ছিলো। যেমন তুগ্র ভুজ্যু নিয়ে সংবাদ, যে সংবাদ ঋগ্বেদে ছড়ানো ছিটানো। তুগ্র একজন অত্যাচারী ব্যক্তিকে দমন করবার জন্যে তার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে নৌবহর দিয়ে পাঠিয়েছিলো (১।১১৬), বামদেবের সূক্তে দেখি—এই দেশ 'ইন্দ্রবাণ দেশ' বলে (৪।২৭।৪)। প্রশ্ন আসে, এই ঘটনা কি একটি বিশেষ ঘটনা যার জন্যে এই সংবাদ বারবার উল্লেখিত? সংবাদটি আমাদের যুগেও মনোরম যেহেতু এর ভিতর হোমারের ইলিয়ডের একটি ছবি পাই, ভুজ্যুর নৌকা ডুবে যাবার জন্যে তিনদিন ভাসমান অবস্থায় থাকার পর অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা সে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। আমরা ভুজ্যু প্রসঙ্গের পর বশিষ্ঠের একটি ঋকে যাই। তিনি বলছেন—সমুদ্রে নৌকায় ভ্রমণ তাঁর কাছে ক্রীড়াদায়ক ছিলো। (৭।৮৮।৩-৪)। আমাদের প্রশ্ন, এ কোন সমুদ্র, কাস্পীয়ান না আরব? দশম মণ্ডলে একটি সুন্দর চিত্রও আছে—এ স্থানে হ্রদ আছে, শ্বেতপদ্ম আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে (১০।১৪২।৮)। এ কথাও আছে তুর্বশ যদু সম্বন্ধ, ইন্দ্র কর্তৃক তাদের সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়েছিলো। তুর্বশ-যদুর প্রসঙ্গ যেহেতু মধ্য-যুগে, সেইহেতু ধরে নেওয়া যায় এ সিন্ধুযুগের, কিন্তু তুগ্র ভুজ্যু?

কাশ্মীরে প্রাপ্ত নবপ্রস্তর যুগের একটি সংবাদ পিগোট হুইলারের বই থেকে আমাদের দিয়েছেন। শ্রীনগর ও গণ্ডরবলের (Gandarbal) ভিতর বুরজাহম্ (Burzahom) স্থানে এই আবিষ্কার হয়েছে: 'Unweathered post-glacial locss, 9 feet in thickness at the base of which, on origin soil, was a hearth with polished axes, bone awls and pottery' এবং এই প্রাপ্ত বস্তুর ওপর পিগোটের মন্তব্য: 'it is highly dangerous to regard the 9 feet of loess as implying such a passage of time that the Neolithic material at its base would be antiquity 'far beyond' the earliest Mesopotamian agricultural of the fifth or sixth millenium B. C'।[১৪] আমাদের প্রশ্ন, যদি তথ্যানুযায়ী কোন কালের প্রাচীনতা এইভাবে কোন দেশের প্রতিষ্ঠিত কাল থেকেও পেছনের দিকে যায় তাহ'লে অসূয়া বোধের কারণ কেন। যা সত্য তা যেমন নস্যাৎ করা যায় না, আবার যা মিথ্যা তা সত্য বলেও প্রমাণ করা যায় না। পিগোট তাঁর মন্তব্য অনুপাতে আনবার জন্যে ঐ স্তরাচ্ছাদনের কারণ এই বলে বর্ণনা করেছেন, এটি

স্থানীয় প্রাকৃতিক ঘটনাপঞ্জীর জন্যে—'locally by relatively rapid accumulation of wind deposited soil'—এবং তার সময় খৃঃ পূঃ ১৫০০-এর ওদিকে নয়। এই মত কতখানি সঠিক তা ভূতাত্ত্বিকের বিষয়, আমরা হুইলারের বই থেকে জি. এফ. ডেলস্-এর একটি মন্তব্য রাখবো : 'The coast is an active geological zone and indications are that it has been gradually rising for thousands of years'[১৫] কিন্তু এইখানে সেই সৈকত ?

ওপরোক্ত প্রসঙ্গ সামনে রেখে আমরা আর একটি সংবাদের সম্মুখীন হই। আধুনিক আর একদল পণ্ডিতের মত, যেমন H C. Wabs, খৃঃ পূঃ ৭০০০ বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে 'থিবস্' বলে এক সমুদ্র বিদ্যমান ছিলো।[১৬] এই সমুদ্র হিমালয় এবং তথাকথিত প্রাচীন ভারতকে বিযুক্ত করে আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত ছিলো, এবং 'থিবস্' সমুদ্রের অবলুপ্তির কারণস্বরূপ রাজস্থান মরুভূমির জন্ম। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিমালয় এবং তৎসংলগ্ন ভূপ্রকৃতির চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, মিলে যায় আমাদের পুরাণ কথিত জম্বুদ্বীপের সঙ্গে, মিলে যায়—কি কারণের জন্যে সেই প্রাচীন যুগের সিন্ধু দেশের জমি এত উর্বরা ছিলো, মিলে যায় বশিষ্ঠের ঋগ্বেদের বিবরণের নৌকাভ্রমণের সঙ্গে—কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায়, খৃঃ পূঃ ৩০০০ যা নিয়ে এত হৈচৈ কিম্বা সিন্ধুসভ্যতার দুই নগর, তা কখন গঠিত ? পরবর্তী ৪০০০ বছরের ভিতর কি জমি সেই নগর তৈরী করার সুবিধা দিয়েছিলো ? কিন্তু আর একটি সংবাদও পিগোট আমাদের দিয়েছেন। বেলুচিস্তানে কিছু বসতির পাশে 'double defensive wall তৈরী হোয়েছিলো, তার একটি Kohtrus Buthi-তে, একটি পাহাড়ের শ্রেণীর ওপর আর একটি Tharo Hill-এ। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে পিগোটের রসিকতার সহিত মন্তব্য : 'Here is an isolated, flat-topped hill, now inland but on what was the prehistoric coast line, from which it would have projected as a promontory or as an island in tidal marshes.'[১৭] পিগোট কল্পনায় যা 'মার্শ' বলে ধারণা করেছেন বাস্তবে তা কি সমুদ্রের অতি নিকট ছিলো, এবং ঐ 'defensive wall' ? যদি তাই হয় তার বয়স কি এই প্রাপ্ত সময়ের সাথে মেলে ?

মুস্কিল হচ্ছে, প্রাপ্ত বস্তুর সাথে সমতা রক্ষা ক'রে ওদেশীয় পণ্ডিতজন যেভাবে

বিচারের সম্মুখীন হ'তে চান সেই পদ্ধতিই ভ্রান্ত, ভ্রান্ত এই কারণের জন্যে—যখন ধারণা করে নেওয়া হয় ওটাই মূল আর সব গৌণ। যেমন তিলকের জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে যে ধারণাকে স্থায়ী করতে চেয়েছিলেন, পিগোট এক কথায় তা 'উদ্ভট' বলে বাতিল করেছেন, কিন্তু জ্যোতির্বিদরা স্পষ্ট করে জানেন, সপ্তর্ষির 'দি গ্রেট বিয়ার' —এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রে যেতে কত সময় লাগে, কিন্তু তাঁরা প্রয়োজনের খাতিরে তা স্বীকার করতে চান না। কুৎস ঋষি অত্যন্ত প্রাচীন ঋষি, যেহেতু তাঁর সূক্ত প্রথম মণ্ডলে স্থান পেয়েছে সেই হেতু আমাদের পণ্ডিতজন বলে বসলেন—প্রথম মণ্ডল অর্বাচীন—একবারও ধারণা করলেন না, অন্যান্য মণ্ডলে এই নাম বারবার উচ্চারিত তখন প্রথম মণ্ডলের ওপর এই বিশেষণ টানা যায় কিনা, একবারও ধারণা করলেন না, এই সংহিতার সম্পাদকের একটি উদ্দেশ্য ছিলো—প্রথম মণ্ডলে ঐতিহাসিক কারণগুলো এবং দশম মণ্ডলে সামাজিক সূত্রগুলো রক্ষা করা, একবারও লক্ষ্য করলেন না দশম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ঋষি এই 'ত্রিত' কে? কুৎস ঋষি তাঁর প্রতি সূক্তের শেষে একটি লাইন বারবার ব্যবহার করেছেন—মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু প্রভৃতি দেব আমাদের রক্ষা করুন, কুৎস ঋষি এই আকুতি কেন বারবার রক্ষা করেছেন জানি না—সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে আমি শুধু বলবো—'সিন্ধু' শব্দটি সদর্থেই ব্যবহৃত হোক এবং আমাদের রক্ষা করুক।

সূচক গ্রন্থপঞ্জী

ঋগ্বেদ প্রসঙ্গ নিয়ে যেসব সূক্ত এই আলোচনায় রাখা হোয়েছে তা হরফ-প্রকাশনীর 'ঋগ্বেদ সংহিতা' আশ্রয় করে। অন্যান্য বই-এর সূচক নিম্নরূপ : ১. Prehistoric India—(Pelican Books)—Stuart Piggot, পৃ' ৬৬। এ প্রসঙ্গে হুইলারের 'The Indus Civilization' বই-এ সেই সভ্যতার শিল্পোপকরণ নিয়ে মন্তব্য : 'Though the seal-intaglios of the Indus Civilization are in a class of their own, the general range of Harappan artistry is not comparable with that of the contemporary civilization of Mesopotamia and Egypt.'—পৃ. ৮৬

২. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিগ্দর্শন-রূপরেখা—পশুপতি মাল, পৃ. ৫।

৩. Prihistoric India—Stuart Piggot, পৃ. ২৬০।

৪. The Indus Civilization—(Cambridge University, 1968), S M. Wheeler, পৃ ১৩৩।

৫ Hall's The Ancient History of Near East, পৃ ১৭১-এ আছে —দ্রাবিড়দের সাথে প্রাচীন সুমেরীয় জাতির রক্তের সম্বন্ধ ছিল।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মত 'আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে।' বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ ২৩।

উপরোক্ত দুই মন্তব্যই 'বাঙ্গালী কোন পথে?' অশোক মুখোপাধ্যায় রচিত পুস্তক, পৃ ৩৪ থেকে গৃহীত।

৬. Prehistoric India—Stuart Piggot, পৃ ২৩।

৭ ঐ ঐ ঐ পৃ. ১৮১।

৮. ঐ ঐ ঐ পৃ ৪৩।

৯ রামায়ণ রহস্যোদ্ঘাটন—স্বামী ওঁকারানন্দ সরস্বতী, প্রকাশক সুনীল কুমার রায়—নকশালবাড়ী, প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী।

পর্জিটার ও জয়েসওয়ালের একজন রাজার রাজত্বের গড় ১৬ বছর ধরে তিনি সংহিতা যুগের হিসাব নিম্নরূপ রেখেছেন

অতি প্রাচীন যুগের বৈদিক হিসাব পাওয়া যায় না।

কিন্তু মনু থেকে যুবনাশ্ব	২০	পুরুষ	:	৩২০ বৎসর
মান্ধাতা „ এয্যারুণ	১০	”	:	১৬০ „
কীর্তবীর্য „ রামচন্দ্র	৩৪	”	:	৫৪৪ „
কুশ „ হিরণ্যাভ	১৯	”	:	৩০৪ „
পুষ্প „ বৃহদ্বল	১২	”	:	১৯২ „
	৯৫		:	১৫২০ বৎসর

তারপরেই মহাভারতের যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ১৪২৪ + ১৫২০ = খৃঃ পূঃ ২৯৪৪.

দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিতরা এই কথা স্বীকার করেন না, তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যায় (ঋগ্বেদ অনুসারে) এই যুদ্ধের সময় ধরেন খৃঃ পূঃ ৩০৬৭ অব্দ। মহাভারতের

যুদ্ধ এই সময় ধরলে সমস্ত হিসাব পাল্টে যায়। যেহেতু আমার আংকিক জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সেই হেতু ঋগ্বেদের তথ্যানুসারে সেইদিকে আমি যাই নি।

১০. রামায়ণ রহস্যোদ্ঘাটন—ওঁকারানন্দ সরস্বতী, পৃঃ ২।

চান্দ্রবংশ অনুসারে দিবোদাস ৪০ পুরুষ, সেই হিসাবে তাঁর সময় খৃঃ পূঃ ২৪০০ অব্দ। ঐ বই-এর ভূমিকার 'ট' পৃষ্ঠায় দেখা যায় বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সময় ৩০ পুরুষের পর, এই হিসাবে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র খৃঃ পূ ২৬০০ অব্দের ঋষি। কিন্তু সুদাসের পুরোহিত হিসাবে যে বশিষ্ঠ তাঁকে নিয়ে সন্দেহ, সুদাসের সময়ানুসারে তাঁর সময় খৃঃ পূঃ ২২০০ অব্দ। এতে মনে হয় এই বশিষ্ঠ বোধ হয় বশিষ্ঠবংশীয় পরবর্তী বশিষ্ঠ। নবম মণ্ডলে সপ্তঋষি রচিত এক সূক্ত আছে (৯.৬৭), তার দশম ঋকে দেখা যায়, পুষার কাছে তাঁরা যেভাবে আবেদন জানাচ্ছেন তাতে মনে হয়—তাঁদের স্থানস্থিতি তখনও পুরোপুরি অনিশ্চিত।

সুদাসের সময় নিয়ে আরও সন্দেহ, তাঁর আক্রমণকারী দশজন রাজার ভিতর দ্রুহ্য অনু ভারত প্রভৃতি। পুরাণানুসারে দ্রুহ্য-অনু যযাতির পুত্র, গোত্র প্রবরদের ভিতর ভারত আছে, এই অনুসারে এইসব রাজা প্রায় খৃঃ পূঃ ৩০০০ এর কাছাকাছি।

১১. 'উত্তর কুরু' কাশ্মীরের উত্তর দেশ, রুশ দেশ। (প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন-রূপরেখা, পশুপতি মাল—পৃঃ ৪০)

দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রস্তর যুগের 'অনুকালচার' বলে একটি সাংস্কৃতিক নিদর্শনের আবিষ্কার ঘটেছে যার সময় খৃঃ পূঃ ৪০০০ থেকে ২০০০ অবধি। কিন্তু খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে দেখা যায় তাদের সাংস্কৃতিক রুচিতে বহিরাগতের মানসিকতা, এরকম ছাপ ইরাণেও। পিগোট ধারণা করতে পারেন নি সেই সংস্কৃতির কারক কোন দেশ, ধারণা করে নিয়েছেন বোধ হয় আফগানিস্তান। (Prehistoric India—পৃঃ ৬৩)।

কিন্তু এ দেশীয় পণ্ডিত বলছেন, এইভাবে সেই সময়কার ভৌগোলিক গঠন ধরলে ভুল হবে: 'বৈদিক ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল পূঃ অঃ ৪৪° হইতে ৭৬° এবং উঃ দ্রাঃ ৩৫° হইতে ৪৫° অর্থাৎ কাসপিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূল হইতে পামির অধিত্যকার পূর্ব সীমা পর্যন্ত এবং হিন্দুকুশ (সিন্ধুগিরি) হইতে Aral (আর্য-ল) সাগরের উত্তর দিক পর্যন্ত।' (প্রাচীন সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন-রূপরেখা, পশুপতি মাল, পৃঃ ১০)

১২. Prehistoric India—Stuart Piggot, পৃ' ২৬০

১৩. 'There is a possibility, or perhaps, rather not an impossibility, that in the modern place name may be recognized the Hari-yupua which is mentioned once in the Rigveda (vi, xxvii,5) as the scene of the defeat of the Vreivants by Abhya-vartin Cajamana' The Indus Civilization, S. M Wheeler, পৃঃ ২৭

১৪ Prehistoric India—Stuart Piggot, পৃ ৩৯

১৫ The Indus Civilization—S M Wheeler, পৃ' ১২৮

১৬ 'H C Wabs বলিয়াছেন খৃঃ পূঃ ৭০০০ অব্দ পর্যন্ত ঐ সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, গোমতী প্রভৃতি হিমালয়ের যাবতীয় নদীধারাই 'থেটিস' সাগরে আসিয়া পড়িত। পার্বত্য অঞ্চলের পলি, বালুকা, শিলাচূর্ণ ঐ সমস্ত নদ-নদী দ্বারা যুগ যুগ ধরিয়া বাহিত হইয়া ঐ থেটিস্ সাগরের তিরোধান ঘটাইয়াছে, রাজস্থানের সুবিস্তৃত মরুভূমি তার সাক্ষ্য দিতেছে। ·· থেটিস্ সমুদ্রের তিরোভাবের পর দুই দেশের ভৌগোলিক সংযোগ স্থাপিত হয এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটিতে থাকে। এবং বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলেই আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য একীভূত হইয়া কালক্রমে ভারতবর্ষ নামে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে।' ভারতীয় সাহিত্যের দিগদর্শন রূপরেখা, পশুপতি মাল, পৃঃ ৩৭-৩৫।

এবং বৈদিক সভ্যতার প্রসারের ব্যাপারে 'History informs us that one branch of Aryan stock descended from the Himalayas conquered and occupied the vast and wealthy regions of the Indus and the Ganges Valley, and the other branch of family emigrated in the other direction to Iran which was a less fertile region.' Glimpses of World Religions, Jaica Publishing House, Bombay, 1962, পৃঃ ১২৮

১৭. Prehistoric India—Stuart Piggot, পৃ. ৭৭

কবি অমিয় চক্রবর্তী এবং একটি সকাল

স্যাণ্ডি কেপলার

[ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিট্যুট অব্ এশিয়ান স্টাডিজ এর ছাত্রদের বার্তাপত্রের পক্ষ থেকে ডঃ অমিয় চক্রবর্ত্তীর সাক্ষাৎকার নিতে বলা হয়েছিল আমাকে। এই উপলক্ষে সানফ্রান্সিস্কোর কালচারাল ইন্টিগ্রেশান ফেলোশিপে তাঁর আবাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার সঙ্গে সেদিনের আলোচনার আংশিক পরিচয় উপস্থাপিত হল। আমাদের আলোচনা সুরু হয়েছিল ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিট্যুট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর ঐতিহাসিক লেখনী নিয়ে কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখা গেল আমরা প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করেছি —ডঃ চক্রবর্তীর জীবনের সুদূর দিগন্ত পরিক্রমায় নিরত হয়েছি। আশা করি আমাদের মাঝখানকার এই সৌম্য ঋষিসদৃশ মানুষটির পরমাশ্চর্য জীবনকথা ইন্স্টিট্যুটের আবাসিকদের নিকট পরম উপভোগ্য বলে বোধ হবে। বিশ্বমনা তিনি, ঐশ্বর্যময় তাঁর জীবনের সংস্পর্শে এসে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি।

লেখক]

প্রশ্ন কালিফোর্ণিয়া ইনস্টিট্যুট অব্ এসিয়ান স্টাডিজ সম্পর্কে আপনি কিরূপ ধারণা পোষণ করেন ?

ডঃ চক্রবর্তী আজকের এই বহুধাবিক্ষিপ্ত পৃথিবীতে যেখানে সংবাদ ও মতামতের বিচিত্র প্রবাহ নিত্যতরঙ্গিত সেখানে ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিট্যুট অব্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর মতো সমন্বয় সাধনক্ষম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সাগ্রহ সাযুজ্য, জ্ঞান গর্ভ গবেষণা আর অতীত ও বর্তমানে এশীয় ঐতিহ্যের নানা দিকের প্রতি একাগ্র মনোযোগিতার আবহাওয়ার মধ্যে সৃজনী প্রেরণাকে সমন্বিত করে তোলা প্রয়োজন। আমার ধারণা এই প্রতিষ্ঠান সেই উদ্দেশ্যের পরিপোষক। দূরদূরান্তের বিদ্বজ্জনদের একত্রিত করে জ্ঞান-মার্গে তাদের দুঃসাহাসিক অভিযাত্রী হয়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে এশীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। এশীয় অর্থে কিন্তু অন্য নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন সত্তা

নয়। পাশ্চাত্য ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ব্যাপক সংমিশ্রণও এর অন্তর্গত। কেন্দ্রগতধারার প্রতি ক্রমবর্ধিত অভিনিবেশ ছাড়াও এর মূলে রয়েছে জাতিধর্মনির্বিশেষে অবস্থানিক ঘনিষ্ঠতা,—যেমনটা অ্যামেরিকার অনেক শিক্ষাক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়,—যেখানে ছাত্র গবেষক পরিদর্শক শিল্পী চিন্তাবিদ প্রভৃতির সমবায়ে গড়ে উঠছে বিশ্বজনীন অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি। কিন্তু এখানে একটি সাবধানবাণী উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। এইপ্রকার সহাবস্থান নিঃসন্দেহে স্পৃহনীয়, কিন্তু তৎসহ প্রত্যাশিত ফলোদয় যাতে ঘটে তার জন্য সুপরিকল্পিত প্রগতি, শৃঙ্খলাবোধ ও স্বাধীন উদ্যমও আবশ্যিক। আমার ধারণা এইরকমের প্রেরণাই ডঃ হরিদাস চৌধুরীকে এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রবর্তিত করেছিল যেখানে বিভিন্ন মত ও পথের সমুচিত সমন্বয় সাধিত হবে। এশীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে এক ছত্রছায়াতলে সমন্বিত করে তোলা এবং সর্বভেদাভেদরহিতভাবে এই সংস্কৃতির পরিশীলিত রূপের প্রকটন—ডঃ চৌধুরীর মনোগত বাসনা ছিল এই রকমের। মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি।

প্রশ্ন আপনার পারিবারিক প্রসঙ্গের কিছু কিছু বিবরণ শ্রীমতী চৌধুরী আমাকে দিয়েছেন। যেমন নারীজাতি সম্পর্কে আপনার আধুনিক মানসিকতার কথা যার উৎসে আছে আপনাদের পরিবারে আপনার মায়ের ভূমিকা।

ডঃ চক্রবর্তী. হাঁ, নারীর অধিকার সচেতন আশ্চর্য্য মানুষ ছিলেন আমার মা। আমাদের বাস ছিল যে গ্রামে তিনি ছিলেন সেখানকার সেই কালের মুক্তমনা মহিলাদের অন্যতমা। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের বাড়ীর বাইরে বেরোনোটা যখন অকল্পনীয় ছিল সেই সময়ে তিনি নিয়মিত বেড়াতে যেতেন। এসব বিধিনিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। বঙ্গনারী ছদ্মনামে কয়েকটি চমৎকার প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর দৈনিক ও সাপ্তাহিক রচনাগুলি পরে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছিল। দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে হাঁপানি রোগাক্রান্ত হয়ে নিদারুণ কষ্টভোগ করতেন, আর এইটিই ছিল তাঁর সব থেকে বড় বাধা। ছেলেবেলায় দেখেছি বিছানায় ঠায় বসে আছেন, একটু শ্বাস নেবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছেন। কিন্তু এসব কোন বাধাই নারীমুক্তি তথা সামাজিক মুক্তিপ্রয়াসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াতে পারে নি। এইরকমের

আবহাওয়ায় তিনি আমাদের লালন করেছিলেন। কল্পনা করতে পারেন, সেই শৈশবে সংস্কৃত ও বাংলা কবিতার পাশাপাশি আমরা ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত "যশের সন্ততি তোমরা···" যেটা জার্মান সঙ্গীত "জার্মানি, সবার সেরা জার্মানি"-র মতো নয়, তার থেকে অনেক ভালো—মুখস্থ করেছি। রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন,—আমাদের বয়েস তখন পাঁচ কি ছয়। অক্ষরপরিচিতি আমাদের শুরু হয়েছিল চারে এবং অতি ক্ষিপ্রতায় আমরা সাক্ষর হয়ে উঠেছিলুম। খুব ব্যস্ত সমস্ত মানুষ হলেও বাবা এ ব্যাপ্যারে সহযোগিতা করেছিলেন। আসাম বাংলা সীমান্তবর্তী নৃপতিশাসিত একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তিনি। জায়গাটি ছিল খুবই মনোরম, কিন্তু আমাদের মনে হোত বাবাকে তাঁর জীবনের আপন ক্ষেত্র থেকে যেন কিছুটা দূরে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর খেদ ছিল না এর জন্য। রাজ্যটিকে তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে দিয়েছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী রাজদত্ত প্রহরীকুল পরিবেষ্টিত ছিল আমাদের বাড়ি। চোর ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করা, ফাইফরমাস খাটা, বাচ্চাদের খেলা দেওয়া—এই ধরণের যাবতীয় কাজ তারা আমাদের জন্য করত। কিন্তু বাবা কেবল একজনকে রেখে এই প্রহরীদের আর সবাইকে অব্যাহতি দিলেন। এই প্রহরী-দঙ্গল তাঁর কাছে বাহুল্য মনে হয়েছিল। সত্যিই আশ্চর্য্য মানুষ ছিলেন তিনি। স্থানীয় প্রথা মেনে প্রজারা রাজা ও সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বাৎসরিক ভেট নিয়ে আসত। বিশুদ্ধ মাখন, মিষ্টি, শর্করা প্রভৃতি নানা উপাচারে পূর্ণ পাত্র উপহার দিত তারা। বাবা তাদের জিজ্ঞেস করতেন, "কেন এসব এনেছ?" "হুজুরের নজরানা"—নিবেদন করত তারা। তিনি তাদের বলতেন, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু আমি এভাবে এসব নিতে পারব না। তোমরা এগুলো বাড়ীতে ফেরৎ নিয়ে যাও। ভোজের আয়োজন করে সবাই মিলে খাবে।" বাইরে থেকে এই উপহারপ্রদান ব্যাপারটাকে স্বতোস্ফূর্ত বলে মনে হলেও আসলে এটা ছিল একপ্রকার বাধ্যতামূলক বিধান। কারণ এর অন্যথা ঘটলে তাদের দুর্ভোগ ভুগতে হোত। সর্বোপরি অদৃশ্যভাবে বিরাজমান ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তি। এসব প্রথাপদ্ধতিকে তারা সুরক্ষিত করে রেখেছিল কারণ তারা কর আদায় করত দেশীয় নৃপতিদের কাছ থেকে আর এই নৃপতিরা

তা উসুল করে নিতেন প্রজাদের কাছ থেকে। দু বৎসরে প্রাপ্য না মিটিয়ে দিতে পারলে প্রজাদের ঘর জ্বালিয়ে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হোত। ফিউডাল ব্যারনদের সগোত্র ছিলেন দেশীয় রাজা জমিদার জোতদাররা। কাজেই এই প্রথার পীড়ন ছিল অব্যাহত। আর ইংরেজের রাজকোষে বাৎসরিক খাজনা যতোদিন ঠিক ঠিক জমা পড়ত ততোদিন এ ব্যবস্থা চলত নিরঙ্কুশভাবে। বাবা এসব লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটাই অপরাধ-মূলক। তিনি নিজে এই ব্যবস্থার অংশীদার হবেন না এই ছিল তাঁর সংকল্প। বুঝতেই পারছেন, তাঁর এই মনোভাব যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল।

আমার বাবা ছিলেন এই প্রকৃতির মানুষ। আর অফুরন্ত উদ্যম, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও আত্মিক শক্তির অধিকারিনী ছিলেন আমার মা। বেদ উপনিষৎ গীতা ছিল তাঁর নখদর্পণে। আমরা তখন কিন্তু এতোটা বুঝতে পারতুম না। একজন সংস্কৃত পণ্ডিত এবং একজন অঙ্কের শিক্ষককে তিনি নিয়োগ করেছিলেন যাতে স্কুলের পড়াশুনোর বাইরে আমরা তাঁদের সাহায্য পেতে পারি। আমার কিন্তু আকর্ষণ ছিল কেবল খেলাধুলোয়। ফুটবল, হকি বা ক্রিকেট খেলার থেকে আর কিছুই আমার কাছে প্রিয় ছিল না। সারাদিন—দিনের যে কোনো সময়, আমি খেলতে চাইতুম। বাবা অবশ্য নিষেধ করতেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে পরবর্তী জীবনে এসে সেই আমারই সারস্বত সাধকে রূপান্তর ঘটেছে।

তিন ভাই ও এক বোন—এই চারটি শিশুতে গড়া আমাদের পরিবার। ঠিক আমার পরের যে বোন সংস্কৃতে সে ছিল অসাধারণ মেধাবী,—উজ্জ্বল দীপ্তিময়ী মেয়ে। একের পর এক দুর্দৈবে তারা সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সকলে মিলে আমরা গড়ে তুলেছিলুম ছোট্ট একটি দল। বড় গলা করে বলা নয়, তবে একথা সত্যি যে বিশেষভাবে মায়ের দিক থেকে একটি সংস্কৃতিবান পারিবারিক উত্তরাধিকার আমাদের ওপরে বর্তেছিল। কলকাতা থেকে প্রায় পনের মাইল দূরের গঙ্গাতীরবর্তী শ্রীরামপুরের সেই বিখ্যাত পরিবারের সবাই ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিতজন। তার ফল হয়েছে এই যে, প্রবল জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এমন কি মধ্যবিত্তজীবনের থেকে দূরে কিছুটা স্বতন্ত্র আবহাওয়ায়

আমরা বেড়ে উঠেছিলুম। আবার গৌরীপুর নামক সেই রমণীয় স্থানটির সেই ছোট্ট রাজত্বের মধ্যেও আমরা ছিলুম স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন :—পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে কোথায় প্রথম আপনার সংযোগ ঘটে?

ডঃ চক্রবর্তী : গৌরীপুরে। একটি নদী ছিল সেখানে,—ছ'মাইলের মাথায় ভারতের অন্যতম দীর্ঘ নদ ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে যুক্ত। হিমালয় থেকে নেমে আসা সমুদ্রবৎ সেই নদী—এপার ওপার দেখা যায় না। আমি প্রায়ই সেখানে চলে যেতুম—মুগ্ধ আবেশে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতুম ওই নদীর দিকে। ওই জায়গায় নদীর ধারে ইংরেজরা চমৎকার সব বাংলো তৈরি করেছিল, নদীতে তাদের হাউজ-বোট নোঙর করা থাকত, সমস্ত রকমের খেলাধুলোর বন্দোবস্ত ছিল। একান্তভাবে ওদেরই ভোগের জন্য সংরক্ষিত ছিল এসব আয়োজন, এদেশীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল সেখানে। ছিটেফোঁটা যাই হোক ইংরেজদের স্বপক্ষে বলবার মতো বক্তব্য কিছু না কিছু থাকে। দূর থেকে ওই আয়োজনের দিকে তাকিয়ে থাকতুম, মনে হোত অপূর্ব। বিলাসবহুল ব্রিটিশ পণ্যে বোঝাই দোকান ছিল সেখানে একান্তভাবে তাদেরই কেনাকাটার জন্য। সর্বপ্রযত্নে সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠাটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়ার উচিৎ এমনি ধারণাই পেয়ে এসেছি আমরা। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলুম। কিন্তু তীব্র আকর্ষণবোধ করতুম আমি। অসম্ভব বোধ হলেও স্বপ্ন দেখতুম সেই দিনের আশায় যেদিন আমি পশ্চিমে পাড়ি দিতে পারব। নদী, নদীতীরবর্তী বাড়িগুলির দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতুম। মনে দুরন্ত আশা—কোনদিন এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তুলতে হবে। মনে মনে ঠিক করলুম পশ্চিমজগতে আমি ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে পড়ব। আমেরিকায় এসেছিলুম ১৯৪৮এ, তারপর ত্রিশবছর এই ভবঘুরের জীবন। প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনিই দীক্ষিত করেছিলেন আমাকে এই বিশ্বপথিকের ভূমিকায়।

প্রশ্ন : কেমন করে আপনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন?

ড চক্রবর্তী : আমার বয়েস যখন সবে পনের, দীর্ঘকায় সুদর্শন সেই আশ্চর্যব্যক্তিত্বময় সতের বছর বয়সের আমার দাদার মৃত্যু ঘটল ট্রেনে চাপা পড়ে। চরম বিপর্যয় ঘটে গেল আমাদের জীবনে। একথা বলছি এই কারণে

যে এই ঘটনা এমনই মর্মান্তিক ছিল যে আমার সমস্ত অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। খেলাধুলো পড়াশুনো যা কিছু করতুম সবই আমার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। সেদিনের সেই বিধ্বস্ত অবস্থায় বুঝতে পারতুম না কি করব। এর আগে পড়েছি অনেক। হাঁ, বেশ জবরদস্তভাবেই। পনের পেরোবার আগেই আমি সেকালের সেরা লেখক ডিকেন্স্, ওয়াল্টার স্কট, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, শার্লট ব্রন্টে প্রভৃতির প্রায় সমস্ত রচনা, ব্রাউনিং, টেনিসন ও রোমান্টিক কবিদের লেখা পড়ে ফেলেছি। কিন্তু দাদার মৃত্যুর এই আকস্মিক আঘাতে মনের আশ্রয় হারিয়ে গেল। আমি চিঠি লেখা শুরু করলুম। এই পরিস্থিতিতে আশ্রয় দিতে পারেন বলে যাঁদের মনে হোত তাঁদের কাছে লিখতুম। আমার এই জীবনকে নিয়ে কী করব এই সংশয় নিবেদন করে, সেদিন অনেকের কাছেই চিঠি লিখেছি। লিখেছি জর্জ বর্নার্ড শ'-কে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কাজটা অস্মিতাসূচক বটে, কিন্তু বিস্ময়করভাবে সাড়া পেয়েছিলুম। উত্তর দিয়েছিলেন সবাই। সেইটিই অনেকখানি, যদিও আমি নিশ্চিত যে, আমার ইংরেজী ভাষা সেদিন ছিল ভয়াবহ। জর্জ বার্নার্ড শ'-এর কথাই প্রথমে বলি। প্রায় সপ্তাহ তিনেকের ব্যবধানে তাঁর কাছ থেকে দীর্ঘ বক্রমথিত একখানি চিঠি পেলুম। আপনাকে দেখাব চিঠিখানি,—বইনে আমার বক্তৃতার অংশরূপে মুদ্রিত হয়েছে। যাহোক তাঁর পত্রের মূল কথাটা ছিল এই রকমের—"মনে হচ্ছে তুমি তোমার দুঃখবেদনা ও প্রিয়জনকে ঘিরে অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছ আর কোনো ঐশীশক্তির আনুকূল্যে তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছ। কিন্তু তুমি কি মনে কর বিপুল এই বিশ্বে তুমি এতোই মহার্ঘ্য যে, বিধাতাপুরুষ তাঁর আর সব কাজকর্ম ফেলে কেবল তোমারই উদ্ধারে লেগে থাকবেন? 'ঈশ্বর' নামক পুরুষটির অস্তিত্বের সংবাদ কে তোমায় জানিয়েছে? আর তার অস্তিত্ব যদি মেনেও নেওয়া যায় তাহলে এটা ঠিক যে তিনি চাইবেন তাঁর অনুগ্রহলাভের আশায় আকুল না হয়ে তুমি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে। দেখা যাচ্ছে তুমি তাঁর অনুগামী নও। তাঁর অভিপ্রায়ে সহচর না হয়ে তুমি দোষারোপ করে যাচ্ছ সমস্ত দুনিয়াকে আর সেই সঙ্গে নিজেকে করুণার পাত্র করে তুলছ। নিরাশ করে তুলছ তাঁকে।" (আমি প্রায় অবিকলভাবে তাঁর কথাগুলিই উদ্ধার করছি।) প্রথমে সাপ গড়ে তাকে দমন করার জন্য আবার সেই

সৃষ্টিকর্তাকে বেশি গড়তে হয়েছিল। বিবর্তনের পথে এ হল একটি ভ্রমাত্মক কর্মের সংশোধনের জন্য আর একটি কার্য্যের অবতারণা। কিন্তু পুনরাবৃত্তি ঘটেই যাচ্ছে। তোমার দায়িত্ব এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করা। দুঃখের তিমির রাত্রে মঙ্গল আলোক জ্বেলে সেই আলোতে তুমি অপরের পথের দিশারী হতে পার—তোমার দুঃখকে মানুষের উপকারে লাগাতে পার।" অনুপম উপসংহার চিঠির। আর্তক্রন্দনে করুণাধারানিষেকে তাৎপর্যময়। প্রার্থিত সহানুভূতির পরিবর্তে কেন তিনি এমন আঘাত হেনেছিলেন আমি সেদিন ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। আসলে ওটা ছিল আঘাত দিয়ে আরোগ্যসাধনের চিকিৎসা।

আর সকলেও চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। পরম সুন্দর একখানি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার যোগের সেই ছিল প্রাথমিক সূত্র। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা দূরের সম্পর্ক ছিল—পরিবারের মানুষরা তাঁকে জানতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "তোমারি বয়সে (রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-তে, ১৯১৬/১৭তে যখন তাঁকে চিঠি লিখেছিলুম তখন তাঁর বয়েস প্রায় ৫৫) তোমারি মতো শোকাভিভূত হয়েছিলুম আমি। যিনি ছিলেন আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার সমস্ত সৃজনকর্মের প্রেরণার উৎস অকস্মাৎ একদিন তিনি বিদায় নিলেন—আত্মঘাতী হলেন।" তীব্র অভিমানিনী এই নারী রবীন্দ্রনাথের বৌদি। একখানি শ্লেট আর পেন্সিল নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিলেন তার ওপরে কবিতার খসড়া রচনা করে যেতে আর পছন্দসই না হলে মুছে ফেলে দিতে। কাগজে কলমে লেখার থেকে শ্লেটে লেখায় যে অনেক বেশি স্বাধীনতা সেটা এইভাবে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে ঠিক ঠিক চিনে নিতে পেরেছিলেন বিস্ময়কর এই মহিলা। তবে তিনি একে লালন করেছিলেন গভীর নীরবতার আবরণে। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি কদাপি তাঁর মুখে উচ্চারিত হোত না, বরং কবির কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি। এই মহিলার আত্মহননের ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র যোগ ছিল না—পারিবারিক অন্য ঘটনাই তার হেতু—যদিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অলীক কিম্বদন্তী কেউ কেউ রচনা করে তুলেছেন। এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের পায়ের নিচে থেকে সমস্ত পৃথিবীর মাটি যেন সরে গেল। বলেছেন, "আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল—বোধ হচ্ছিল যেন নিবাত এই

পৃথিবীটা আর আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ বুঝি বা এই মহাশূন্যতার মাঝখানে নিমজ্জিত। এই অবস্থায় সহসা আমার মনে হল মৃত্যুর সিংহদ্বার পেরিয়েই জীবনের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা যায়। সেদিন প্রথম জীবন-মৃত্যুর সত্য তাৎপর্য উপলব্ধি করলুম। সত্যের এই উদার মূর্তির সঙ্গে আদিম পরিচয় মৃত্যুর পথ বেয়ে যখন ঘটে তখনকার সে অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক। কিন্তু জীবনের অনিঃশেষ বাক্তি ক্রমশ সহনশক্তি যুগিয়ে যায়। জীবনের নিরবধি ধারায় জন্মমৃত্যু একাসনে উপবিষ্ট, অভিন্ন। মৃত্যু প্রবাহাচ্ছন্ন জীবনপ্রবাহেরই অন্তর্নিহিত অঙ্গ।" রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিলেন, "সুখ বা দুঃখ আমাদের পথরোধ করে দাঁড়াতে পারে না। স্রষ্টার ভূমিকায় আমরা অসীমের অভিসারী—সেই যাত্রাপথ আমাদের নির্মাণ করে তুলতে হবে।" এমনি আরো অনেক কথাই লিখেছিলেন সেদিন। "পথিকের গান কণ্ঠে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ো। মৃত্যু তোমার কাছ থেকে যেটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি দানে তোমাকে পূর্ণ করে তুলুক।"—এই রকমের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। নিতান্ত ব্যক্তিগত অথচ একান্ত সত্য—একটি অপরিচিত বালকের উদ্দেশ্যে রচিত এই পত্র। মূল পত্রটি তাঁর "চিঠিপত্র" বইয়ে ১১ খণ্ডে আছে। আমি স্মৃতি থেকে কিছু বললুম। আমি বালকমাত্র একথা তাঁর জানা ছিল না বটে, তবে আমার চিঠির অসংযত প্রকাশ থেকে তাঁর পক্ষে এই রকমের অনুমান করে নেওয়াটা স্বাভাবিক। এই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর সব সময়ই তাঁকে ওইভাবেই পেয়েছি।

প্রশ্ন আপনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হল কেমন করে, আর কেমন করেই বা আপনি তাঁর একান্ত সচিবের আসন লাভ করলেন?

ড চক্রবর্তী. আমার চিঠি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ একদা আমাকে জানালেন, "কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে এসে কাটিয়ে গেলে তোমার পক্ষে তা শুভকর হবে।" কলকাতা সন্নিহিত অন্যতম গৌরবময় স্থান তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর পীঠস্থান এই শান্তিনিকেতন। আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করে বললেন, "একটা বিষয়ে সাবধান থেকো। একটা সময় ছিল যখন আমার জীবনাবেগ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে চলত না;—তার প্রকাশ ছিল ফোয়ারার মতো শতধারায় উচ্ছ্বসিত। কিন্তু আজ আমি আমার জীবননদীর গভীর থেকে গভীরতম তলদেশে ডুবে চলেছি। আলাপে

আচরণে বাইরে থেকে তা বোঝা যাবে না। আমার এই চেহারাটা তোমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে· ·।" প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ওভাবে দেখতে পাই নি—নিরন্তর তাঁর আনন্দিত, পূর্ণপ্রাণ দরদী অন্তরেরই স্পর্শ পেয়েছি। কিন্তু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তাঁর জীবনের সেই আদি পর্বে যখন তিনি বিচিত্র কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন। লেখার মধ্যেই নিরত রেখেছেন নিজেকে,—দিনে চৌদ্দ ঘণ্টা করে লিখে গেছেন, যা লিখেছেন একটা গ্রন্থাগারকে ভরিয়ে তোলার পক্ষে তা যথেষ্ট। টলস্টয় পড়েছেন। শিক্ষা, সঙ্গীত চর্চা করেছেন। আমাদের এই শতাব্দীর পরম বিস্ময়কর এক ব্যক্তিত্ব। (অযথা বিশেষণ প্রয়োগ আমি করছি না।) শান্তিনিকেতনে তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমি আত্মস্থ ও প্রফুল্ল হয়ে উঠলুম। "তোমার যতোদিন সাধ থাকতে পার" আমাকে বললেন। কাজেই শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কাটিয়ে আমি ফিরে গেলুম। কিন্তু ফিরে এসে চিঠিতে জানালুম, "যে অবস্থায় আছি সেটা অসহনীয় ঠেকছে।" ভারতের অন্য প্রান্তে বিহারের শৈলশহর হাজারিবাগের একটি কলেজে পড়াশুনো করব বলে স্থির করলুম। ডাবলিনের সেন্ট কলম্বাস কলেজ-অনুমোদিত এটি একটি আইরিশ মিশনারী কলেজ। এই কলেজটিকে বেছে নিয়েছিলেম এই জন্য যে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধের জন্য এর সুখ্যাতি ছিল। নিশ্চয়ই শুনেছেন, ভারতে অবস্থিত অধিকাংশ পশ্চিমী, ব্রিটিশ ও আইরিশ কেন্দ্রগুলি শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রশংসিত। ইংরেজ বিরোধী ছিলেন যাঁরা তাঁরাও কিন্তু তাঁদের কন্যাদের ইংরেজী স্কুলে পাঠাতেন,—সবাই, এমন কি আমার বাবাও। এগুলি সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত হোত আর এঁরা ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্ব-সচেতন। এগুলিকে উৎকট বৃটিশগন্ধী বা ওরকমের কিছু মনে করার কারণ নেই। কলকাতায় যেখানে আমি থাকতুম জায়গাটা সেখান থেকে বহুদূরে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথ জানালেন, "যাওয়ার আগে আগে কয়েকটা দিন আমার কাছে থেকে যাও। ঠিক জায়গাটি তুমি বেছে নিতে পেরেছ কারণ ওখানে অরণ্য আর পাহাড় তোমাকে ঘিরে রাখবে।" অতঃপর কলেজে গিয়ে হাজির হলুম। ওখানে খ্রীষ্টানদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্ময়কর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলুম। ওঁরা ছিলেন মিশনারী,—মিশনারীদের ওপরে আমার আস্থা ছিল না যেমন আজও নেই—তবে ব্যতিক্রম সর্বত্রই বিদ্যমান। ওই কলেজ থেকেই

বি.এ. পাশ করলুম, কিন্তু এম.এ. পাঠের মাঝামাঝি এসে আর ধৈর্য্যরক্ষা সম্ভবপর হল না। ফিরে গেলুম শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে এম এ পাশ করলুম।

প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে আপনার যাত্রার সূত্রপাত কেমন করে ঘটল ?

ড চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তখন আছি। দেখতুম তিনি বালি, জাভা, ইওরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি নানাদেশে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। একবার ডেকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে এসো না। এবার আমি ইওরোপ যাচ্ছি।" আমি ভাবতেও পারি নি। এ যেন দেবতার আশীর্বাদ হয়ে ঝড়ে পড়ল আমার জীবনে। বিবাহ করেছি ইতিমধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "দুজনেই চলে এসো।" সেই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে আমার আমন্ত্রণ এসেছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই জাহাজে রওনা হয়ে ফ্রান্সে নেমে আমরা অন্য পথ ধরলুম। বার্মিংহামের কাছে থেকে কোয়েকারদের প্রতিষ্ঠান উড্‌ব্রুক কলেজ ভিজিটিং ফেলোশিপ দিয়েছিল আমাকে। আমরা ওখানেই গেলুম। বনময় আধাশহুরে পরিবেশ আর সেই সঙ্গে উন্নতমানের বিদ্যাচর্চার সুখ্যাতি—আশ্চর্য রমণীয় সেই স্থানটিতে রয়েছি তখন। রবীন্দ্রনাথ তখন জার্মানিতে। জরুরী বার্তা এলো তাঁর কাছ থেকে। "কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে তুমি কি আমার সঙ্গে এসে যোগ দিতে পার না?" জানতে চাইলেন। ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য পড়ানোর উদ্দেশ্যে 'কোয়েকার সেণ্টার' আমাকে এনেছিল। তাঁরা কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিলেন, জার্মানীর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলুম এবং অচিরেই দেখলুম আমি সারা জার্মানি ঘুরে বেড়াচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন ডেনমার্কে। আমার স্ত্রীর বাড়ীও ডেনমার্কে। তিনি অবশ্যই ইংল্যাণ্ডেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেলুম এর পর। রাশিয়ায় এই আমন্ত্রণের ব্যাপারে সম্ভবতঃ আইনষ্টাইনের হাত ছিল। আইনষ্টাইন কম্যুনিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু মানুষটি এমনই ছিলেন তিনি যে জগতের যে কোন প্রান্তে শুভচেতনার উদ্বোধন তাঁর দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে বার্লিন শহরে সেই প্রথম আইনষ্টাইনের সঙ্গে মিলিত হলুম। ভালোভাবেই তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ আলোচনা হল। তাঁর

কন্যা আমার সুপরিচিতা। অবশেষে স্টালিনের সাংস্কৃতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ লুনাচারসকির নিকট থেকে আমন্ত্রণ এলো। ভাগ্য ভালো স্টালিন সেই সময়ে ছিলেন জর্জিয়ায়, তিনি আসতে পারলেন না। বিরোধীদের নির্বিকার অপসারণ এবং অনুরূপ নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের নেতা স্টালিনের সঙ্গে দেখা করতে হল না বলে আমরা স্বস্তি বোধ করলুম। কারণ এসব ক্রিযাকলাপ হজম কবা আমাদেব পক্ষে দুরূহ হোত। বার্লিন থেকে মস্কো যাতাযাতেব জন্য বিশেষ ট্রেনে বন্দোবস্ত করেছিলেন ওঁরা। শুধু আমাদেবই জন্য নির্দিষ্ট একটি ট্রেনে করে যাত্রা, তাও আবার সেই সুদূর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, অবিশ্বাস্য ঠেকছিল ব্যাপারটা। তিনটি কামরা ও একটি রেল এঞ্জিন নিয়ে আমাদের জন্য বরাদ্দ সেই ট্রেনের যাত্রী আমরা মাত্র চাবজন। আমি, আইনষ্টাইন-দুহিতা মার্গট আইনষ্টাইন, অপর একজন ভারতীয় বন্ধু আর্যনায়কম এবং রবীন্দ্রনাথ, আমাদের এই চারজনের যাত্রীদল। পোল্যাণ্ডের পথে যেতে যেতে অনেক কিছুই চোখে পড়ল। প্রতিটি রেলষ্টেশনের ইহুদিদের ভীড দেখলুন। স্টালিনের প্রথম দিকের ক্রিয়াকলাপেব সব খবর রবীন্দ্রনাথের কানে এসে পৌঁছয় নি। হিটলারী পদ্ধতিব হুবহু অনুকরণের পথে স্টালিন নামেন নি। তবু যেন ইহুদিরা অবাঞ্ছিত এমনি একটা মনোভাবের উৎপত্তি হয়েছিল। ইহুদি বিদ্বজ্জনদের দেখলুম ওয়ারসতে, স্মোলেনস্কে। যতগুলি ষ্টেশনে ট্রেন থামল সবত্র ইহুদি সম্প্রদাযের লোকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করলুম, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলুম একটা অশুভ কালো ছাযার ইঙ্গিতে। জডবৎ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তাদের, ইওবোপের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ ছিল তাদের ওপবে। নিষ্ঠুর ভযাবহ ঘটনাবলীব পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

মস্কোয় পৌঁছে এধরণের কোনো সমস্যাব সম্মুখীন হতে হয় নি আমাদেব —রবীন্দ্রনাথকে ওরা একজন শিল্পী হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ পর্বে এসে চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করেছিলেন। দু'হাজারের ওপরে ছবি আঁকেন—প্রত্যেকটাই বিস্ময়করভাবে মৌলিক, আশাতীতভাবে অভিনব। আশ্চর্য্য মানুষ ছিলেন তিনি প্রায় তিন হাজার গান রচনা করে তাতে সুর দিয়েছিলেন। আমাদের মনে হোত এ যেন তিনি নিজে নন, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তাঁকে দিয়ে এসব করিয়ে নিচ্চে। অতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যময় সুরের

স্রষ্টা তিনি। কয়েকশত রাগরাগিণীর সঙ্গে যাঁর পরিচয় ছিল, এদের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে নতুন সুরের রূপসৃষ্টি করে গেছেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা রুশবাসীর দ্বারা প্রশংসিত হল। একাধিক সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করলেন, বলশয় ব্যালে দেখলেন। বহু শিল্পসম্পদ দেখলুম আমরা, শেখভের সহধর্মিনীসহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। অবশেষে তিনি ক্লান্ত হলেন। সময়টা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর বয়েস তখন উনসত্তর, শরীর খুব শক্ত সমর্থ ছিল না তখন। কাজেই একদিন আমাকে ডেকে বললেন, "তোমরা বেরিয়ে পড় না। সরজমিনে এদের কাজকর্ম দেখে এসো।" রাশিয়ার বন্দীনিবাসের অবস্থা পর্যাবেক্ষণের জন্য একটি বন্দীনিবাসের উদ্দেশ্যে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা এবং বন্দীদের প্রতি ব্যবহার প্রশংসনীয় মনে হল। মস্কোতে সে সময়ে রেলওয়ে উৎসব চলছিল। আমি সেই উৎসব দেখতে গিয়েছিলুম। দেখলুম মস্কোর উপকণ্ঠে একটি জলাভূমির সমস্ত জল নিষ্কাশিত করে তার ওপর দিয়ে রেললাইন পাতা হয়েছে। আর সেই রেলের সাহায্যে ঝুড়ি বোঝাই রুটি গ্রামাঞ্চলে চালান দেওয়ার আয়োজন হয়েছে। আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগে জনজীবনের পরিবর্তন আনবার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন রুশবাসীরা। "দুনিয়ার মজদুর এক হও", "প্রত্যেককে তার প্রয়োজন আনুপাতিক সুযোগ সুবিধে প্রদান" রাশিয়ানদের সর্বকর্মে এই ধরণের লক্ষ্যের মাত্রা সংযোজন ঘটেছিল। হিটলারের জার্মানির অবরুদ্ধ অবস্থার মতো নয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন ছিল এঁদের আদর্শ। দাগী আসামীদের আর অবক্ষয়িত মানুষদের পুনর্বাসনের আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করেছিলুম বন্দীনিবাসে গিয়ে। অন্য নানাক্ষেত্রেও সেই জনহিতকর প্রয়াস লক্ষ্য করলুম।

প্রশ্ন : আপনি অ্যামেরিকায় এসেছিলেন কোন্ সময়ে ?

ড. চক্রবর্তী : সেবারের সেই যাত্রাতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি অ্যামেরিকায় পদার্পণ করেছিলুম। প্রেসিডেন্ট হুভার রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া আর বস্টনে আমাদের সময় চমৎকার কেটেছিল। রবার্ট ফ্রস্ট, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, পার্ল বাক্-সহ আরো বহুসংখ্যক খ্যাতিমানদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল। ইয়েলে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ আমাকে বললেন, "তোমরা অ্যামেরিকার বন্দীনিবাস দেখে এসো।" আমার ধারণা ছিল

বন্দীনিবাস হবে পুতপরিচ্ছন্ন, কিন্তু তার পরিবর্তে যা দেখলুম তাতে গা শিউরে উঠল। আজো মনে করি সেদিন যে দেখেছিলুম সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। এর পর অবশ্য আমি আর কখনো কোনো বন্দীনিবাসে যাই নি। একমাত্র বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটেছিল বহু পরে যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজিকে দেখতে গিয়েছিলুম পুনার Yearvda Jail-এ। মার্কিন দেশের সমালোচকদের ভেতরকার কেউ নন, বন্দীনিবাসের একজন ওয়ার্ডেন আমাদের নিয়ে গেলেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের এলাকায়। দেখলুম প্রতিটি কয়েদীর গায়ে জামার সঙ্গে সেলাই করে সাঁটা রয়েছে তাদের মৃত্যুর পরওয়ানা মৃত্যুর তারিখ সমেত। ঠাণ্ডা প্যাচপেচে অন্ধ কুঠরীর মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে মানুষ। লৌহতারের অন্তরালের অবর্ণনীয় এই অবস্থাটার গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, বরং ঠিক তার বিপরীত। এদেশকে সুসভ্য ও সুযোগ্য বলেই জানি। তবে এহেন বর্বরোচিত ব্যবস্থার বিরোধী আমি। অ্যামেরিকার বন্দীনিবাসের এই অভিজ্ঞতা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। অন্যদিকে আবার অ্যামেরিকায় অনেক সুন্দর এবং মজার জিনিষও চোখে পড়েছিল। মনে পড়ে ন্যুইয়র্কের পথে সেই প্রথম যেদিন হেঁটেছি। ওফল (Waffle) আমার প্রিয়, কিন্তু আগে কখনো খাওয়ার সুযোগ হয় নি। দেখলুম মেপল সিরাপের সঙ্গে ওফল বিক্রি হচ্ছে—স্বর্গবৎ মনে হল। বহু বছর ধরে যে দেশ আমার প্রতি সদাচারী তার প্রতি দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নয়। আমি নিজে থেকেই ১৯৪৮-এ এখানে চলে এসেছিলুম, আর তখন থেকেই এখানে রয়েছি। কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় নি আমাকে। দিলখোলা মানুষের সদয় ব্যবহার সবত্র লক্ষ্য করেছি। আইনষ্টাইনের আহ্বান পেয়েছিলুম প্রিন্সটনে তাঁর সেই মহান বিজ্ঞানাগারে স্কলার হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য। সবাই জানেন যে হিটলারের শিকার হয়েছিলেন আইনস্টাইন, তাঁর মুণ্ডটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল হিটলারের অনুচরেরা। অতএব পালাতে হল তাঁকে, প্রথমে বেলজিয়মে তারপর ইংলণ্ডে ও অন্যান্য নানা জায়গা ঘুরে অবশেষে ন্যুইয়র্কে। অবশেষে এক মহান সভ্যতার আশ্রয়ে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটে।

ইনষ্টিটিউট তাঁর কাছে জানতে চাইল তিনি কত বেতন চান। বিনয়ী মানুষ স্বল্পেই সন্তুষ্ট; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনেক বেশি নেওয়ার জন্য অনুরোধ

জানালেন। পর্যাপ্ত অর্থ তিনি চাইলেন না। পরিবর্তে চাইলেন নিয়মিত বক্তৃতা প্রস্তুত করে দেওয়ার অথবা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করে দেওয়ার শর্তবন্ধন থেকে মুক্তি। সম্মতি জানিয়ে কর্তৃপক্ষ বললেন, "আপনি এ্যালবার্ট আইনস্টাইন, কর্মক্ষেত্রে আপনার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।" আর এরই ভিত্তিতে ইনষ্টিট্যুটের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হতে থাকে। আইনস্টাইনের নির্বাচন তাঁর অসামান্য সৃজনীপ্রজ্ঞার স্বীকৃতি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বরেণ্য ব্যক্তিরা তাঁর ইনষ্টিট্যুটে এসে থেকে গেছেন। এমনকি টি. এস এলিয়টও। এই পরিস্থিতিতে ইনষ্টিট্যুটের সভাপতি ওপনহাইমারকে বললুম, "আমি তো কোনদিক থেকেই যোগ্য নই। আমি আঙ্কিক বা বৈজ্ঞানিক নই। আকাশপথে বিচরণ করবার কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও আমার অজানা।" ওপনহাইমার জানালেন, "আপনার উপযুক্ত মৃন্ময়ী বাসার ব্যবস্থা আমরা তৈরি করে দেব।" কেমন হবে সেটা আমার জানা ছিল না। তবে থাকবার জন্য একখানা বাড়ি, রেফ্রিজারেটার, খাদ্যবস্তু ও ক্যাফেটরিয়া ব্যবহারের সুযোগ আমাকে দেওয়া হল। পাঠপ্রস্তুতির কোনো দায় আমার রইল না। বেশ ভদ্রগোছের সম্মান-দক্ষিণার ব্যবস্থাও হল। এ অবস্থাটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কারণ অচিরেই আমাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে সরকারী পরামর্শদাতারূপে যোগ দিতে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি ওখানে বসবাসকারী প্রতিভাবানদের কাজকর্মের পরিচয় পেয়েছি। সকালে দেখা গেল কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসেছেন কেউ, হয়তো কাগজের ওপরে N-O শব্দের অক্ষরও বা ওই ধরণের অক্ষর সাজিয়ে বসে আছেন। ঘণ্টা তিনেকের ব্যবধানে ফিরে এসে দেখা যাবে এতোক্ষণে তিনি হয়তো আর একটিমাত্র N অক্ষর তার সঙ্গে যোগ করেছেন। বাইরের যে কোন লোক দেখলে এঁদের বদ্ধ উন্মাদ বলে ভাবতে বাধ্য। কিন্তু আসলে হয়তো তিনি কোনো সুদূর জ্যোতির্মণ্ডলের নকসা রচনায় ব্যস্ত। সে যা হোক, অ্যামেরিকার সঙ্গে যোগসূত্র আমার এইভাবেই স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর—১৯৪১-এ তাঁর তিরোধান—আমি এখানে বসে যুক্ত হই। গান্ধীজির সঙ্গে আমার যোগাযোগ সেও ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই জানেন রবীন্দ্রনাথের মহান সুহৃদ ছিলেন গান্ধী।

রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই যেতেন গান্ধীর কাছে। শেষবারে তিনি গিয়েছিলেন

পুণায় যখন গান্ধী আমৃত্যু অনশনে রত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "অনশন কেন করছেন তিনি। অনশনে আমার আস্থা নেই। তবু তিনি গান্ধী, আর এপথ বেছে নিয়েছেন তিনিই।" অতএব রবীন্দ্রনাথ পুণায় জারবেদা জেলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জেলের ভেতরে একটি গাছের দিকে একটি ছোট্ট খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছিলেন দুর্যোগ-সৃষ্টিকারী এই ব্যক্তিটি। সাম্রাজ্যবাদী প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়েছিলেন তিনি। পুণার পথে পথে মেসিনগান পাতা হয়েছিল, বন্দুকধারী প্রহরী চতুর্দিকে। আশঙ্কা ছিল গান্ধীর মৃত্যু ঘটলে সারা ভারতজুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়ে যাবে। এসব তারই প্রতিরোধক প্রস্তুতি। আমরা জেলখানার ভেতরে এগোচ্ছি আর আমাদের পেছনে একটির পর একটি করে দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল আর বোধ হয় বেরিয়ে আসতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নির্বিকার, এগিয়ে চললেন গান্ধী সমীপে। সমস্ত নাটের মূলে যিনি সেই মানুষটি কিন্তু বসে আছেন শান্তভাবে শিশুর সারল্য নিয়ে। তাঁর সঙ্গীরা অনুরোধ জানালেন, ওঁকে কথা বলতে না দেওয়াই বিধেয় কারণ কথা বলতে গেলে অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। সম্ভবত সে দিনটি ছিল তাঁর অনশনের দশম দিবস। আরো কয়েকদিনের অনশনের পর তাঁর উদ্দেশ্য কিছু আছে বলে বোধ হলে গান্ধী অনশন প্রত্যাহার করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল— হিন্দুরা কেবলমাত্র হিন্দুদের ভোট দিতে পারবে এই মর্মের নতুন আইনের মাধ্যমে দেশকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে উদ্যত হয়েছে ব্রিটিশশক্তি। তিনি ঘোষণা করলেন,—"আমার মৃতদেহ মাড়িয়েই এ পথে অগ্রসর হতে পারবে তারা। তার আগে কিছুতেই এ আমি হতে দেব না।" বিদ্রোহ করলেন এই সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের বিরুদ্ধে। সংকল্প করলেন এ ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে আমরণ অনশন করবেন। সত্যিকারের প্রতিবিধান তেমন কিছু হল না বটে, কিন্তু সি. এফ্. এণ্ড্রুজ বিলেতে গিয়ে যেদিন প্রশ্ন তুললেন "এই মানুষটির মৃত্যু সংবাদ ব্রিটিশ নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা কি সমীচিন হবে?" সেদিন ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আবাসে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক, একদিন কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা তাঁর কাছে এলে গান্ধী তাঁদের বলেন ব্রিটিশের পরিবর্তনের সূচনা দেখে তিনি আশান্বিত। "আমরা ওদের ক্ষতি করতে চাই না। যে কোন একজন মানুষের জন্য আমার যতখানি উদ্বেগ একজন ইংরেজের

জন্যও আমি ঠিক ততোখানিই উদ্বেগ বোধ করি। ওদের বোঝা উচিত যে সাম্রাজ্যের জগদ্দল বোঝা থেকে আমি ওদের মুক্ত করতে চাই,—ভারমুক্ত হয়ে যাতে মানুষের প্রতি ওদের কর্তব্য পালনের পথ সহজ হয়।" গান্ধীর মানসিকতা ছিল এই রকমের। গান্ধীর পথ প্রেমের পথ। ব্রিটিশের প্রতিও তিনি প্রেমময়, তবে সেই সঙ্গে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় যে তাদের অবশ্যই ভারত ছেড়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি আপোষহীন। এ পথ মহান সন্তদের পথ। বুদ্ধ থেকে গান্ধী অবধি এই হল যথার্থ উত্তরাধিকার। কবীর, রামদাস, শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক প্রভৃতি এমনি আরো অনেকেই ছিলেন পরিপূর্ণভাবে আপোষ-বিরোধী। ঐশী অভিপ্রায় হৃদি মনসা উভয়তঃ অনুধাবনীয়। উপনিষদ তাই বলে "অসীমকে বাদ দিয়ে শুধু সীমার মধ্যেই আবদ্ধ যে মন তা অন্ধকারে ডোবে। আর সীমার সম্পর্ক ত্যাগ করে যে কেবলমাত্র অসীমের উপাসক সে আরো গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।" বৃক্ষ, ব্যক্তি, সৌন্দর্য্য, প্রেম সবই এখানে বাস্তবরূপে প্রকটিত। এই বাস্তবের সীমার সঙ্গে অসীমের সত্যের সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যেই নিহিত পরিত্রাণের পথ। যোগের মূল লক্ষ্যও তাই—ইন্দ্রিয় জগতের উৎসে অতীন্দ্রিয় চেতনার উদ্বোধন। সুগভীর সামঞ্জস্য সৃষ্টিই মূল কথা।

শিথিল কতকগুলি প্রান্তকে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরতে দেখি আজকাল। এর ফল কেন্দ্রচ্যুতি—মূল বৃত্তকে পাশ কাটিয়ে লক্ষযোজন দূরে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হওয়া। এইসব আধুনিক প্রবণতা এমন সব কথাবার্তা বলছে সত্যের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁরা বলে বেড়ান ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ কারো না কারো আবির্ভাব ঘটবেই। আর এইসব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করার আশায় মানুষ উদগ্রীব হয়ে আছে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি আর এক ধরণের অলৌকিকতা। আমার স্ত্রী এবং আমি প্রায়ই যেতুম হেলেন কেলারের কাছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে তিনি বই লিখেছিলেন। স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁর তীক্ষ্ণ সচেতন ছিল। তিনি দেখে নিতেন তাঁর প্রসারিত হাত দুখানি মুখের ওপরে বুলিয়ে নিয়ে আর তারপর ঠিক চিনতে পারতেন। হারানো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এ হল আত্মিক পুনরুজ্জীবন। ইন্দ্র, বরুণ বা বলিপ্রসন্না কোনো দেবতার অনুগ্রহ এ নয়। আর তা যদি ঘটে কখনো তাহলে এ পৃথিবী পরিণত হবে বাসের অযোগ্য

একটি উন্মাদাগারে। অপরপক্ষে সাধনার মধ্য দিয়ে যদি আপন স্বরূপকে চিনে নেওয়া যায় আর সেখানে ক্ষতির প্রকৃত কারণটাকে অনুধাবন করা যায় তাহলে আমার কাছে সেইটাই আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু ব্যক্তিগত সুবিধে আদায় করার আশায় তথাকথিত কোনো ভগবানের ভজনা আমি করি না যিনি অঘটনঘটনপটু আর নিজের নিয়ম লঙ্ঘন করে যিনি আমাকে খুসী করতে ব্যাগ্র। ভগবানের এই প্রসাদ আমার প্রার্থিত নয়।

প্রশ্ন : আপনার এই রকমের মানসিকতার উৎস কি বার্নার্ড শ'-এর সেই চিঠি ?

ড চক্রবর্তী : তিনি কিছুটা বেশি দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন,—দৃষ্টি তাঁর সংশয়ীর কিন্তু অন্তর খাঁটি সোনার।

গভীরে তলিয়ে দেখতে সচরাচর মানুষ চায় না। সংস্কার বশেই চলে তারা। যেমন পুরীতে অবস্থিত বিশ্ববিধাতা জগন্নাথ মন্দির। কাদের পুজোয় অধিকার সেখানে ? অবশ্যই খ্রীস্টানদের নয়। গান্ধী একবার পুরীতে গিয়ে প্রশ্ন তুললেন, "খ্রীস্টানরা কি বিশ্বপিতার সন্তান নয় ?" দেখলেন হিন্দুদের মধ্যেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই। কাজেই তিনি সংকল্প করলেন, "আমিও মন্দিরে প্রবেশ করব না। দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে যাব।" ফিরে গেলেন তিনি। চিরাচরিত প্রথাসংস্কার মেনে তাঁদের পরিবার চলে না এই অপরাধে রবীন্দ্রনাথকেও মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। মানুষ যে কতো অবুঝ হতে পারে। এসবের সঙ্গেই আমাদের বসবাস, আমরা মেনেও নিচ্ছি এদের। কিন্তু যে দেবতা মানুষের মর্যাদা দেয় না আমরা কেন তার পুজো করব ? প্রেমই পরম পুরুষার্থ আমরা বলি, কিন্তু কই তারা তো তা স্বীকার করে না। আমি বলি তাই অবুঝ অমানুষিক ক্রিয়াকলাপের মাঝখানে থেকেও আমাদের মানবিক হতে হবে। গুরুপুরুতের বংশজাতদের অনেকেই এই ধর্মীয় ধোঁকা সৃষ্টিতে তৎপর। 'ধর্ম'-চর্চা অনেকটা এই ভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু আমি জানি প্রকৃত ভারতীয় ধর্ম এ নয়। ধর্মের নামে যা চলে তা একপাত্রে সবকিছু ঢেলে মিশিয়ে এক আজগুবি জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাও আবার একজন গান্ধী বা একজন রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনো মহাত্মার এই সত্য কথাটুকু অকপটে বলবার সাহসও নেই। বিজ্ঞ সুধী ব্যক্তি অনেকেই আছেন

দেবায়ত মানবিকতার সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। যথার্থ আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে অস্পৃশ্য, খ্রীষ্টান, ইহুদি, মুসলমানের ভেদ নেই, সবমানবে তার সমান ভালোবাসা, তিনি বিশ্বপ্রেমিক।

স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ' পুলিন দাশ

অরুণকুমার সরকার

মাথুর

ও প্রেমিক, তুমি কোথায় যাচ্ছো, শোনো,
অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তোমায় দেখবো বলে
ছাখো কত ভীড় জমেছে পথের পাশে, বারান্দায়,
মধ্যিখানে আমিও আছি, আমাকে দেখবে না?
ছাখো আমায়, ছাখো, প্রেমিক, কাতর আমার মুখ
একতরফা ভালোবাসায় মন যে ভরে না
এই যে আমি, আমায় ছাখো।

ওদের হাতে মালা, প্রেমিক, আমার শূন্য হাত,
ওরা রঙের ঢেউ তুলেছে, আমি ছিন্নবাস।
কিন্তু ওরা ভীড়ের, ওরা তোমার কেউ না,
আমি তোমার, তোমার শুধু, আমি তোমার।

আমি তোমায় ভালোবাসি, প্রেমিক আমায় ছাখো।
হৃদয় জুড়ে গন্ধ আমার পূর্ণ আমার প্রাণ,
বুকের মধ্যে টকটকে লাল রঙ।
ওদের শুধু দেখতে আসা, ভাসতে আসা নয়।
এই যে আমি রুদ্ধ জোয়ার, প্রেমিক আমায় নাও।

সূত্র: 'বারো বছরের বাংলা কবিতা', অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কয়েকটি দুঃস্বপ্ন

রূপসী রাজনীতি

রূপসী তুই রাজনীতি, দিস
ছেলে ছোকরার মাথা ঘুরিয়ে,
কিন্তু বুড়ো শয়তানদের
সঙ্গে থাকিস রাত্রে শুয়ে।

ভূতের গল্প

এপার বর্ষা, ওপার খরা,
মধ্যে নদী লক্ষ্মীছাড়া।
ভূতের মতো হাঁটছে মানুষ—
লঙ্গরখানায় যাচ্ছে যারা।

শিশুবর্ষ

শিশুরা যায় হাটে
শিশুরা যায় মাঠে,
দিনদুপুরে তাদের বাবা
মায়ের গলা কাটে।

চিত্ত ঘোষ

দখল

ভেঙে গেছে সেই মোহিনী রাতের
বিস্ময়ভরা মেলা—
নিজের সঙ্গে নিজেরই এখন
রঙমিলান্তি খেলা।

সময়ের স্বাদ শীতল এবং
একেবারে বিষ-তেতো
দিনরাত্রির সমান্তরাল রেখা যেন ঠিক
রেল লাইনের মতো।

সারাদিন শুনি অন্ধের গান
বোবার আর্তনাদ—
ভোরের আকাশে ঘুড়ি ওড়ে যেন
লাল নীল সংবাদ।

ছাপানো দিনের বাংলার দেশেও
দুহাতে মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে পাগল।
দিনে দিনে কারা নিয়ে নিচ্ছে যে
মানব জমির দখল।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

যে দেবী সর্বভূতে

যে দেবী সর্বভূতে সে কি তুমি?
ওষ্ঠে প্রহেলিকা গ্রীবায় মরাল
কটিদেশে লজ্জাবতী লতা এবং
দেহের পাতালে নিমগ্ন সমুদ্র নিস্তল।

ফেনোত্থিত ভিনাস অথবা
ভিনাস দ্য মিলো রঙ্গিনী
সে কি তুমি?

যার চুম্বনে দয়া, আলিঙ্গনে দয়া,
যার নগ্নতায় এবং মগ্নতায় দয়া
সেই সর্বভূতেশ্বরী তুমি আমার অঞ্জলি নাও।

চুনকামকরা দেয়ালের মতো শুভ্র ঘ্রাণ
তোমার জঙ্ঘায় কটিতে বিষণ্ণ স্তনে
যেখানে জগৎ সংসার ঘুরে বেড়ায় আত্মার খোঁজে,
খোঁজে এবং অবশেষে দুঃখিত হয়।

তোমার দৃষ্টি স্নেহ দিক অভয় দিক আমার পৃথিবীকে
আমার বাগানে ফলবতী হোক তোমার দয়া,
খেলা করুক আমার মুখের ওপর
হাওয়া এবং ভ্রমর এবং তোমার নির্জন কটাক্ষ
এবং স্পর্শ করুক তোমার জিহ্বাগ্র
আমার সহস্র লোমকূপ।
যা দেবী সর্বভূতে তুমি যদি সেই হও
তবে উঠে এসো সমুদ্রতীর থেকে মৎস্যগন্ধা
উঠে এসো গোলপাতার কুটির থেকে
ভৎসনা করো এই দয়াহীন গঞ্জ শহর ও উপত্যকাকে
যেখানে বসন্তহীন রাত্রি এবং রাত্রিহীন বসন্ত
এবং রাগিণীহীন সংবাদ অসংখ্য
তোমার বুকের তাপ স্ফুলিংগ জ্বলুক প্রান্তদেশে
পুড়ুক জীর্ণ খড় বিগত দিনের, পুড়ুক স্মৃতি এবং বাসনা
যেমন করে সকলের মন পোড়ে আগন্তুক পদশব্দের জন্য।

শিরায় উপশিরায় বাঁধা পড়ে আছে এই পৃথিবী
একে উদ্ধার করো
উদ্ধার করো বৈরাগ্য থেকে বিতৃষ্ণা থেকে
নেমে এসো তোমার ডাকের সাজ থেকে বন্ধ্যা থেকে

এবং তোমার বিভূতি, ব্রীড়া ভূষণ থেকে
অর্ঘ্য ও পুষ্পাঞ্জলি থেকে
মাটিতে পার্কের বেঞ্চে বৃক্ষমূলে, ব্রীজের ধারে,
যেখানে দারিদ্র্য, ঈর্ষা এবং দুঃখের বলয়,
এসো তারা-জ্বলা ইষৎ আলোয়
যেখানে ঝিঁঝিঁ পোকারা মিলিত হয় তৃতীয় থামে।

তোমার স্তনের মতো স্তোকনম্র এই দুপুর
এবং জলপাইরঙ-ছায়া বারান্দায়
বড়ো দয়াহীন এই সংসার, এই দিনমান
বড়ো সখ্যহীন এই মানুষের আকাংখী জটলা
তোমার চুম্বনের দয়া ঝরে পড়ুক এই শস্যহীন মাঠে
এবং ওষ্ঠহীন ভাস্কযে, হে অলিভগ্রীন দেবী।

তোমার অগ্নিবর্ণ রথে
ঈশান অগ্নি বায়ু নৈঋত কম্পিত, যখন
অন্তরীক্ষ স্থির এবং অধোদেশে অশ্বহীন সবণি উদ্দেশ্যহীন
দিগন্তনেমি ধূসর এবং হরিৎ
এবং আকাশ অভিমানে গম্ভীর

নিষ্পাপ কটিগহ্বরে থেকে উদ্গত তোমার মনোহর আদেশ
বাহুমূলে আকাংক্ষার পিপীলিকা স্পর্শ
তোমার আজবদেশের অ্যালিস-সম সরলতা
আমার ভারতীয় মুখের ওপর তোমার ভারতী মুখ
এই আলপিন-পীড়িত সুখ, স্নায়ুর ওপর স্থাপিত
নির্ঝর-স্নিগ্ধ তোমার দৈববাণীতে আমি স্নাত।

যে-সৌন্দর্যের ফেনা তোমার আদিতে, হে সর্বভূতেশ্বরী,
তাকেই আহ্বান করি আমি তোমার দিকে তাকিয়ে

যে-সৌন্দর্য জগৎসংসারের আদিতে
তাকেই আহ্বান করি আমি রূপময় প্লাবনের আশায়
যে-সৌন্দর্য থেকে জন্ম নেয় আকাংক্ষা এবং অহংকার
জন্ম নেয় স্বেদ এবং নির্বেদ
যে-সৌন্দর্য আমাকে পাঠায় রণক্ষেত্রে
মগ্ন করে ধ্যানে, সমাজ ভাঙে এবং গড়ে
এবং ছুঁড়ে দেয় মানুষকে মহাকাশে
নক্ষত্রের উৎসে
তাকেই আমি স্তব করি তোমার মধ্যে তোমার দিকে তাকিয়ে।

অরুণ ভট্টাচার্য

প্রিয়তম শব্দ ঘুম

আমার কাছে একটি প্রিয় শব্দ ঘুম।
তোমরা কি জানো আমি বিগত চার বছর
ঘুমোই নি। আমি
সব আবোলতাবোল ভেবেছি, রাত্রিবেলা
বারান্দায় পায়চারি করতে করতে
কত সময় বৃক্ষ হতে চেয়েছি যদি শান্তি পাই,
নদী হতে চেয়েছি যদি যৌবনবতী হতে পারি,
এমনকি প্রেতযোনিতেও থাকতে চেয়েছি যদি
দেহ এবং দেহের যন্ত্রণা থেকে
মুক্তি পেতে পারি।

তোমরা সব জেনে রাখো, আমি
চার বছর আঁখিপল্লব বন্ধ করি নি। আজ
শুধু ঘুম। এসো, আমার প্রিয়তম শব্দ
ঘুম। রমণীরা উলুধ্বনি দাও, আমি
ঘুম যাই।

সিদ্ধেশ্বর সেন

রেখো একটু মনের বাগান-ও

ঘরবাড়ি কি বানাও, তুমি বানাও,
তাহলে তুমি আমার যুক্তি মানো

ইটকাঠের ইস্পাতের স্তূপে
রেখো একটু মনের বাগান-ও

সবুজ শুধুই সংকুচিত, সবুজ—
কোথায় তোমার চোখের আরাম, রঙ-ও,

চোখের আরাম, মনেরও তাই আরাম,
মন-ও বাঁচুক প্রাকৃতিকের রূপে

নইলে কী সে সমাজেরও বিন্যাসে
ফেরাবে তোমার সহজ কান্তি অবুঝ ?

তোমার দায় যে অনেক, তারই তো দাম
দিতেই হ'বে তোমার পরিবেশে

বা পরিবেশের বদলে, যাই-ই মানো,
কংক্রিটের-ইস্পাতের স্তূপে
রেখোও খানিক মনের বাগান-ও ॥

আলোক সরকার

শিউলি ফুল

একজন স্বাভাবিক মানুষ বারবার শিউলি ফুলের কথা ভাবছে
শরৎকালে যখন রোদ্দুর হয় তার মনে পড়ে শিউলি ফুলের কথা—
তার মনে পড়ে অনেকগুলো অন্ধকার
অন্ধকার লাফিয়ে হচ্ছে আলো আলো লাফিয়ে হচ্ছে অন্ধকার।

আলো নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই ওই তো আলো টলমল করছে রাস্তায়।
অন্ধকারের ভিতর বাঁকা হয়ে জলছে মাধবীলতা দোপাটি ফুল ঝরাচ্ছে অন্যমন—
কতো সহজ আর স্পষ্ট ক'রে দেখা
যখন তার ভাবনায় শিউলি ফুল যখন রোদ্দুর হয়েছে শরৎকালে।

সে স্বাভাবিক বলেই এইরকমভাবে ভাবে শিউলি ফুলের কথা।
আলোগুলো তার খুব মনে আছে টুকরো টুকরো আগুন-জ্বলা আলো
আলোর ভিতরেই দেখা যাচ্ছে তাকে
যেমন সে দেখতে পাচ্ছে আলো যা দেখাচ্ছে—অনেক উঁচুনিচু আর সমভূমি।

আলো নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই সে কোথাও দেখতে পায় না অন্ধকার
অন্ধকারের ভিতর দেখা যায় না তাকে ফুল-নোয়ানো বাঁকা ডাল
ফুল-ঝরানো স্তব্ধতা।

শরৎকালে যখন রোদ্দুর হয়েছে
সে আস্তে আস্তে হয়ে উঠতে চায় স্বাভাবিক, সে ভাবে কেবল
শিউলি ফুলের কথা।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ হাওয়া

হঠাৎ কে যেন আমার মনের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে
আর পথ পাচ্ছে না বেরোবার—
তবে কি সে ভুল ক'রে ঢুকে পড়েছে?
তার যেন একান্তই অনিচ্ছা আমার সঙ্গে দেখা করার

তাই যতবার আমি তার মুখটা দেখে নেবার চেষ্টা করছি
　　　　ততবারই সে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে—
কখনও কখনও আমি তার খুব কাছে এসে পড়েছি, একটু হাত বাড়ালেই
　　　　যেন তাকে ছুঁতে পারবো,—
কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে স'রে দাঁড়াচ্ছে
দু'একবার চোখের সুমুখ থেকে এমন আড়াল হ'য়ে গেলো
　　যেন চলেই গেছে, ব'লে মনে হোলো
　　　　আবার মনের উপর ভেসে ওঠে তার ছায়া
কিন্তু কেন সে আমার মনের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে
　　　　এমন আঁকুপাঁকু ক'রে বেড়াচ্ছে—
যে পথ দিয়ে ঢুকেছিলো সেই পথ দিয়েই তো সে বেরোতে পারে—
আমি তো আমার মনের কোনো দরজাই অর্গলবদ্ধ করি নি
　　দিয়েছি অবাধ মুক্ত হাওয়াকে ঢোকবার অধিকার
　　　　এবং স্বাধীন চিন্তাকে অধিকার—
　　　　এবং যথারীতি বাইরে যাওয়ার অধিকার।
তবে কে সে ?　সে কি আমার শত্রু, আমার আততায়ী
　　আমাকে খুন করার জন্যে গোপন কোনো অন্ধকার
　　　　খুঁজছে আমার মনের মধ্যে
অথবা কোনো সলজ্জ মিত্র অভিমানে
　　　　আমার সঙ্গে ছলনা করছে
আমি অবিলম্বে টের পাই, এ সবই আমার মনের ভুল
　　　　কোথাও কেউ নেই—
অথবা আমার ভুলে-যাওয়া কোনো স্মৃতি ?
তবু মাঝে মাঝে আমার মনে এই রকম হয়
　　মনে হয় কে যেন আমার মনের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে
　　　　পথ খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ আমার সঙ্গে
　　　　　　মুখোমুখিও হতে চায় না।

অতীন্দ্র মজুমদার

ভাবুক

বর্দ্যার ভাবুক একা শীতল মার্কিনী যাদুঘরে
অহোরাত্রি চিন্তাগ্রস্ত। দিগ্‌ভ্রান্ত অন্ধ তার গায়
ছড়ি ঠুকে চলে যায়, বগলের ফাঁকে ক্রীড়াচ্ছলে
শিশু মাথা গুঁজে দিয়ে হি হি হাসে, কিছু নিকডিয়া
অদ্বৈত প্রভুর চেলা পিঠ ঘেঁষে বসে চোখ বুজে।
মাথার কুঞ্চিত চুলে চামচিকের বিষ্ঠা জমে রোজ—
লেজ তুলে নির্বিকার ইঁদুরের মূত্রবৃষ্টি প্রত্যহ সন্ধ্যায় ॥

বাগানে 'বুড়ির চুল' বিক্রি করে হাস্যময় গ্রীক,
বিকেলে প্রৌঢ়ার দল গল্প করে হারানো পরীর,
জানু ভেঙে পাদ্রি ব'সে বার করে বাতের মালিশ,
গণিকা রাত্রিতে ভাড়া দেয় তার গলিত শরীর ॥

কচিৎ ক্যামেরা খুলে ছবি তোলে ট্যুরিস্ট ভিন্‌দেশী,
নিয়ে যায় মেলবোর্নে, এন্টোয়ার্পে, গুয়াটেমালায়—
হেসে ওঠে মেয়েবন্ধু পাথরের ভাবুককে দেখে,
এবং ম্যাগপাই, উইলো, বীরভূমের সাঁওতাল বা হ্যানয়ের মাঝি,
লিসবনের 'ফাদো'—গাইয়ে, মাকড়সার শিশু
উত্তরায়ণের কোণে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধায় ॥

মৃগাঙ্ক রায়

নির্বোধ

কতদূর গেলে শেষ
জন্মের বারিধারা—
মৃত্যু কতদূর?

কোথায় ভূমিষ্ঠ হবার মাটি,
জল, গাছ, গভীর গভীর ছায়া।
কতদূর হেঁটে গেলে
শেষ হয় পথ ?

জানে না উত্তর
তাই কবিতার সেই নির্বোধ কারিগব
শব্দের ভিতবে খোঁজে
স্থিরতাব বিন্দু প্রতিদিন।
কবিতার জন্ম হলে
তার মৃত্যু হয় একবার
একবার ভূমিষ্ঠ হয় নিজে ॥

আনন্দ বাগচী

কুয়াশা

ছেঁড়া কাগজের টুকবো ক্যালেণ্ডার উড়ে যায় দূরের বাতাসে।
ধূলোর ঝড়ের নদী দিকচক্রবাল ঝপসা ক'রে
নিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি চেনা মুখ নষ্ট খেলনা যেন
শব্দ যেন নৈশব্দ্যের চাবিকাঠি, দৃশ্য যেন অদৃশ্য গুণ্ঠন।
রৌদ্রকরোজ্জ্বল পট ঢেকে দিচ্ছে ধূসর প্রলেপ,
করাল কুয়াশা এসে ছিনিমিনি খেলে চতুর্দিকে—
বর্ণপবিচয় যায়, কথামালা, শতছিন্ন ধারাপাত যায়
শিমুলের তুলো ওড়ে শিমুল ফুলের পিছু পিছু
কৈশোর, যৌবন, মৃত মঞ্চের ওপবে যেন
একে একে নিবিছে দেউটি
আলো অন্ধকার ঘনঘটা ছুঁয়ে বেদনাব শিহরণ কাঁপে।

বেলা যায় করতলে জনশূন্য রেখা-পথ ছুঁযে

পূর্ণেন্দু পত্রী

গোলাপের কাছে আত্মসমর্পন

আবৃত অথচ নগ্ন
একই সঙ্গে উন্মুক্ত, গোপন
গোলাপ রে, সত্যি তোর বাহাদুরি বটে।
অনেক কবির স্তব, অনেক নারীর মুগ্ধ প্রশংসার আঝোর পরাগে
ডুবে স্নান করেছিস জানি।
অনেক নক্ষত্র তোকে পাঠিয়েছে প্রীতি-উপহার।
অনেক নির্ঝর তোর এতটুকু স্পর্শ পাবে বলে
সুস্থির সংসার ছেড়ে বিবাগী বাউল।
গোলাপ রে, সত্যি তুই ভাগ্যবান বটে।

মানুষের এত কাছে, তবুও মানুষ
গোলাপের মত স্বচ্ছ
গোলাপের মত সুস্থ নয়।
মানুষের নগ্নতাই দিনে দিনে উৎকট, উজ্জ্বল
পেরেক হাতুড়ি নিয়ে দিনরাত রক্তারক্তি খেলা।
কে কত যুযুৎসু জানে, কে কতটা দ্রুত
নিজের আত্মাকে বেচে অভিনব ফ্ল্যাট কিনে নেবে
তারই জন্যে ব্যস্ত ও বিহ্বল।

গোলাপ রে, তোর কাছে আত্মসমর্পনে রাজী আছি
যদি বলে দিস
উৎকৃষ্ট মানুষ হতে কতখানি বজ্রপাত লাগে
উৎকৃষ্ট মানুষ হতে কতখানি ধূপগন্ধ পোড়ে।

কবিতা সিংহ

সেই মানুষ

একজন মানুষ যখন শরীরে শক্তি নামায়
সে দেওয়াল গলিয়ে দিতে পারে—
ঘরের চংক্রমণ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে
প্রপাতের ঝিনঝির মত

যদি চায়

চাওয়ার মধ্যে দিয়েই শক্তি নামায় সেই মানুষ

তুমি কেন সেই মানুষ হতে পারো না ?

গুটিয়ে যাওয়া

একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিলে নিজেকে
হরিদ্বারে তোমার সবুজ চাদর দেখা গিয়েছিল
সুইডেনের লেটারবক্সে তোমার পাঠানো নীল চিঠি।
পুনায় কোন সভায় দেখেছি তোমায়, গলায় মালা
আমেরিকার কোন পত্রিকায় তোমার ছবি
আল্পস্-এর তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ কে যেন বলেছিল—
"সরসীকে আজও মনে পড়ে ? কেমন আছে সে ?"

এখন গুটিয়ে নিচ্ছ ক্রমশ।

কোথাও আর তোমার সবুজ চাদর দেখা যায় না
কাউকে নীলচিঠি পাঠাও না তুমি
বক্তৃতা দাও না—ছবি ছাপাও না—সবার মন থেকেও
ক্রমশ সরিয়ে নিচ্ছ নিজেকে

তুমি কি সেই কথা বুঝে গেছ সরসী
যা মৃত্যুর সময়েও মানুষে কিছুতেই বুঝতে চায় না।

সম্পর্ক

সমস্ত রাত টুক্‌রো টুক্‌বো হাওয়া ঘসেছে—
জ্যোৎস্নার চটা উঠেছে কুয়াষার চূণকাম।
হিম জমে জমে ম্যাগ্নোসিয়াব কুঁড়ির গাযে জলবিন্দু দুলিয়েছে দুটি—

স্বপ্নের ভিতর কিছু সত্য উঠে এসেছে—
সেই সত্যের নাম তোমাব আব তার সম্পর্ক।

যেখানে খসা হাওয়ার ছেঁড়া ক্যানভাস পং পং কবে না
যেখানে জ্যোৎস্নার অলীক চটা ওঠা নেই—
ম্লান হাওয়া নেই কুয়াশার চূনকামে
কেবল একটি অনন্ত ম্যাগ্নেসিয়াব কুঁড়ি দুলে উঠেছে

গায়ে দু ফোঁটা জলবিন্দু।

স্বপ্নের ভিতরের সত্য—সম্পর্ক।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

শুধু একবার

ওই-তো আমার শব শান্ত পড়ে আছে।
বড দীর্ঘদিন আমি বহন করেছি
রক্ত-মাংস-আকাঙ্ক্ষার স্তূপ।

এখন নিঃসীম মুক্তি এতদিনে বিশ্বচরাচবে
অর্জিত প্রবেশপত্র, অকুণ্ঠ ভ্রমণ।
তবুও কোথাও সূচ বিঁধে থাকে, তীক্ষ্ণ বিঁধে থাকে :
পৃথিবীর যাবতীয় সুষমা কি চেয়েছিল
শেষবার মুগ্ধ অশ্রুপাত ?

সুশীল কুমার গুপ্ত

শিশুসম্পর্কিত

এই সব শিশুদের কোনখানে রাখি ?   চারিদিকে
কিলবিল করে হিংস্র ক্ষুধার্ত মানুষকীট ।   শয়তানের দল
এদের বিকৃত ক'রে বসায় মোটর সামনে, পাতালরেলের পাশে,
ময়দানের আনাচে কানাচে
নাগরিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী এবং দলিত কণ্ঠস্বর
ভিক্ষা করে দয়ার উচ্ছিষ্ট ।   এরা নিয়ত পালিত
যুগের খোঁয়াড়ে কিছু স্বাদ দিতে স্বার্থের আহারে ।
এদের দু একটি ক'রে ফুটিয়ে আস্বাস্থ্য কামবোধে
সুসজ্জিত করা হয় আধুনিক গৃহ, কিছু মধুবর্ষী বুলি
রুগ্ন মনে ঔষধার্থে কাজে লাগে, রক্তের ধারায়
বংশপাপ স্খালনের চেষ্টা চলে, কান্না ও হাসিতে
রামধনুরচনার খেলা জমে, ঝুমঝুমি পোশাক কেড়ে নিয়ে
হাস্যকর অভিনয় মাঠে মঞ্চে সংসদে মিছিলে ।
গোপনে এদের হত্যা ক'রে লোভী সভ্যতার যম
শতাব্দীর জীর্ণ সৌধতলে রক্ষা করে তার পাপার্জিত ঘৃণ্য গুপ্তধন ।

তবুও শিশুরা আসে, তারা ঠিক আসবেই, জীবনের দুর্মর বিধানে,
তারাই এ সভ্যতাকে শোধন সাধন ক'রে বানাবে খুশির খেলাঘর,
সত্তার প্রকৃত অর্থ তারাই ফোটাবে রক্তে, তাই
মুদ্রা ফেলে চায় খেলনা, শয্যা ছেড়ে গড়ায় ধুলায়,
অভিযুক্ত করে আজ হত্যাদায়ে সভ্যতাকে কালের এজলাসে ।

সুনীল বসু

দহন-ভস্মে অশ্রুজলে ধোয়া দেহ-দীপাধার

আমাদের বাড়ির ঝি-টা রোজই
কাঁসা পিতলের বাসনকোসন মাজে
সেদিনও ভোরবেলাতে মাজছিল রোজকার মত
বাসন-পত্রে আঙুলের ছাপ, চেটে খাওয়ার চিহ্ন
গ্লাসে বাটিতে ঠোঁটের স্পর্শ, জিবের ছোঁয়াছুঁয়ি
ও গুঁড়ো ছাই দিয়ে ক্রমাগত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে,
মাজতে মাজতে বাসনগুলোকে ময়লা থেকে
নিয়ে আসছিল উজ্জ্বলতায়, আরও উজ্জ্বলতায়, ঔজ্জ্বল্যে
আরও আরও দেদীপ্যমান লাবণ্য ঠিকরোনোয়
আমি অবাক হয়ে দেখছিলুম, দেখতে দেখতে আরও অবাক
হয়ে হারিয়ে গেলুম

তুমি যে পুজোর বাসন মাজো
তামার থালা রুপোর রেকাব, কোষা আর কুশি
আর পিলসুজ
তারও দেখি ধুলো বদল হয়, ধুলো মুছে আলো
ছিটকে ছিটকে বেরয়
ব্যবহারের চিহ্ন উঠে তাতে ঠিকরোয় স্বর্গীয় দ্যুতি
দেখি আর আমি হারাই
ধূপ আর ধুনো আর গন্ধ
ফুলের গন্ধে আমি স্তব্ধ হই আর ভাবি,
আমি মাজি, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যবহারের,
দেহের মালিন্যকে মাজি, শুধু মাজি
দুঃখের দহন-ভস্মে

মাজি, শুধু মাজি, প্রতি দিন,
দিনের হাতে, রাতের ঘর্ষণে,
মাজি, মাজি, মার্জনা করি
হয়ে উঠি পবিত্র বাসনের মত, নতুন পাত্রের মত
নতুন অলঙ্কারের মত
আমিও যে ঈশ্বরের পূজোর বাসন-কোসন
অশ্রুর সরোবর থেকে মেজে ধুয়ে আকাশের
নক্ষত্রের নীচে রেখে দিই ॥

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

মোদের গরব মোদের আশা

ভয় কি তোদের যখন রক্ত তাজা ?
ভুলিয়ে দে মা-এর মুখের বুলি ।
কে আর বলে, বাইরে জানলা খুলি ?
আলো না কি ? শিউরে ওঠে গা ।
রবি ঠাকুর বলেছিলেন যেন
আমরা সাবেক আঁধার ঘরের রাজা ॥

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

পিকনিক গার্ডেন

তুমি সেই বাগানে তখন পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলে
হৃদয়ের বাগান ভরসা
যেমন মানুষ তার বাড়িগুলোর সামনে জমি রাখে
ফুল দিয়ে সাজায় সেসব
এবং পিছনে থাকে পুঁইমাচা কিচেনগার্ডেন

সেরকমই হৃদয়ের নানা দিক
বাগান পেরিয়ে সিঁড়ি
দুধাপ যেতে না যেতে তরমুজের লাল মেঝে
ঝকঝকে বারান্দায়
কাঠের ঘোড়া বা গাড়ি, ভাঙা কিংবা তোবড়ানো পুতুল
আমাদের মাঠঘাটে যেমন কোথাও কোথাও টয় ট্রেন
রোদেজলে আপাত অর্থহীন চুপচাপ দাঁড়িয়ে
চললেও মনে হয় এরকমই বুঝিবা দাঁড়ানো সময়ের
যেখানে বৃহৎ কিছু স্কাইস্ক্র্যাপারের মত উঠছে ত উঠছেই
যেখানে সময় মানে মানুষের শুধু ছুটে-চলা
সেখানে বাগান একা পিকনিক
দীর্ঘ জীবনের মধ্যে প্রত্যেকের জীবন বাগান।

মানস রায়চৌধুরী

সূর্যের সঙ্গেই পাহাড়তলীর কথাবার্তা হয়ে গেছে
এবারে শীতকালে হবে দীর্ঘতম দিন
সমস্ত পশম হবে আয়েসী গরম
খুব বেশি লাগবে না মাংস মধু অথবা আগুন।

কিন্তু এ পাহাড়তলী কি দেবে সূর্যকে, তাই ভাবি
পাহাড়তলীর আছে সুন্দর সবুজ
যাকে বলা যেতে পারে এক প্রগল্‌ভা যুবতী
নাকি এক বয়সিনী যার আভা আতপ্ত আপেল
পথ ভুলে ফিরে আসে দিন ও রাত্রির দেওনা নেওয়া
এবার শীতকালে হবে সামান্য তুষারপাত, তাই
মাথা নীচু করে দেখি পাহাড়তলীর রূপ, রূপচর্চা আর
সবুজের মাঝখানে নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাস উত্থানের
সূর্য কি এসব চোখে একেবারে দেখে নি ভাবতে বলো।

শান্তিকুমার ঘোষ

দুই নগর বুডাপেস্ট

খ্রীষ্টের মুকুটের মতো এই গীর্জা
এখানে গোলাপ পাহাড়
নীচে ব'য়ে যাচ্ছে মন্দ মন্দ ড্যানিয়ুব
এই দুর্গ প্রাকার রক্ষা করেছে মৎস্যজীবীরা
কত কাল ধ'রে
যারা এসেছিল যাযাবর দীর্ঘ পথ বেয়ে
এশিয়া মহাদেশ থেকে
গড়েছিল সুন্দরী নগর বুডা
পরিয়েছে স্বর্ণালঙ্কার নটিনী নদীকে
ঝুলিয়ে দিলো অষ্টাদশ সেতু নদীর বুকে
ওই ত্রিমূর্তি নীলাকাশ তলে
নিয়ে তাদের জ্যোতিশ্চক্র
তারা তুলে ধরেছে ক্রুশচিহ্ন গৌরবময়
আজ কি অভিষেক মানবপুত্রের
সূর্যরশ্মি এসে পড়ছে বর্ণালীময় কাচের ভেতর দিয়ে
পূজাবেদীর ঠিক উপরে
পরীরা মাথায় ক'রে ব'য়ে আনছে শ্বেতপাথরের থালা
সাদা পারাবত উড়ছে ধর্মমন্দিরের শীর্ষ ঘিরে

প্রাগ

প্রথমে তোমাকে চিনতে একটু সময় লেগেছিল
রহস্যময় নগরী প্রাগ
পাহাড়ের চাইতে অরণ্যময় তটরেখা
নদীর জল উদ্ভিদসবুজ কিন্তু কেমন দুর্জ্ঞেয় আমার কাছে
কালো পাথরের সাঁকোর পর সাঁকো কত কালের

বনের মাথায় বিখ্যাত সেই দুর্গ, প্রাচীন গির্জা
ধর্মযাজক মন্দিরের ভিতর নিহত, দুর্গাধিপতি আজো
আড়ালে থেকে অপ্রতিরোধ্য
কিন্তু যখন একে-একে বিজলী বাতি জ্ব'লে উঠলো দীর্ঘ কিনার জুড়ে
জলেব অন্তর বিঁধলো ছটা
অর্ধেক চাঁদ যেন মাত্র আবেকটা বাতি
পাহাড়েব সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে-আসতে লাগলো ইঞ্জিনের গর্জন
অন্ধকারের মাথায় ধূ-ধূ পুড়ে যেতে থাকলো মায়াবী আলো
তার সঙ্গে জলেব ভেতর ঝাড়-লণ্ঠনের জগৎ
তখন যেন খুলে স'রে যেতে দেখলাম ইন্দ্রজাল
স্পষ্ট ফুটে উঠলো এক অভিজ্ঞ পরিশ্রান্ত মুখ

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

বৃক্ষছায়াতলে

ও হাওয়া তুমি একটুখানি ব'স
বৃক্ষছায়াতলে
আমি দীঘিকালো
জল হয়ে যাই।

একটুখানি থাকো
শালপিয়ালের ভালোবাসায়
যেও না।
দুঃখলাগা দূর্বাদলে শিশির-
সিক্ত হয়ে যাই।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি

আমাকে তুমি বাসা দিয়েছিলে, ভালবাসা আশা এবং দিয়েছিলে এমন এক আকাশ সূর্য, স্ফটিক বরফ ছাওয়া অজস্র অবাক আলোর চুমো, অকথ্য তোমার সুন্দর মুখের থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারতুম না, এমনি আলোর সারাদিন আর সারাদিন। সেই অপরূপ অপরূপ আলোর ঝরনাতলায় বসে সর্বনাশী স্মৃতিগুলি আমার ভাসিয়ে দিতেম চোখের জলে তোমার পায়ের তলায়। বেলা বইত, দেখতেম ধানসিঁড়ি নেমেছে পাহাড়ের বুকে, সবুজ টলটলো হাওয়ায় দুলছে তোমার ঘাঘরা বুকের কাঁচুলী উজ্জ্বল নীলে কাঁপছে। ভেসে এসেছে গানের সুরে, 'ধুত তেরিকা' কথার খেই ধরে এসেছে নবীন যুবকেরা দুরন্ত দেশান্তরী স্বপ্নে, মৃত্যুর সোহাগী সুরা ওদের ধমনীতে, অনেকবাল এমনি শুনতে শুনতে দিন কেটে যেত। একটুও ভাবতে পারতুম না আমিও সংসারের অনেক অনেক জনের মত অপদার্থকে বুকে বয়ে পথ হারিয়েছি যেহেতু তুমি আমাকে বাসা দিয়েছিলে ঈশ্বরপ্রতিম ভালবাসা এবং অনন্ত আশা।

কালীকৃষ্ণ গুহ

কুষ্ঠরোগীদের গান

যূথবদ্ধ কুষ্ঠরোগীদের গান ওই ভেসে আসে—
এখনই মির্জা গালিব স্ট্রীটে নেমে আসবে শীতের বিকেল।

এরপর বাড়ি-ফেরা।

নিঃসঙ্গ গর্ভিনী যুবতীর পাশে বাড়ি ফেরে প্রতারক হস্তরেখাবিদ,
ঠিকাদার ও চতুর্থ-শ্রেণীর কর্মচারী বাড়ি ফেরে
নির্বোধ কায়েমী নেতা বাড়ি ফেরে, ধূর্ত বড়বাবু শান্ত কেরাণীর পাশে বাড়ি ফেরে

মিনি-স্কার্ট পরা শিক্ষয়িত্রী বাড়ি ফেরে
লিটন হোটেলে ফেরে বিদেশী যুবক।

আমিও কি মির্জা গালিব স্ট্রিট পার হ'য়ে বাড়ি ফিরে যাবো? মধ্যবয়সের দিকে
কতোদিন ঝুঁকে আছি আমি?
কতোদিন আগে আমার ভিতরে এই বধিরতা জন্ম নিলো?

ইচ্ছে হয়, সম্পূর্ণ বধির হবার আগে একবার কুষ্ঠরোগীদের গান শুনে নিই—
বুঝে নিই, কোন্ এক অমোঘ নিয়মে মানুষের হাহাকার মিশে থাকে
মানুষেরই প্রকৃত সঙ্গীতে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

রূপকথা

কী জানি কোন্ যুগের আড়াল থেকে একদিন
হলুদ প্রজাপতিগুলি উড়ে উড়ে আসে
এক এক দিন শালিখ চড়ুই
রোদ্দুর মেখে শুকনো মাঠে ধান খুঁজে ফেরে
ভিজে বাতাসে কখনো ফুলের সুবাস
মনের মধ্যে ভেসে আসে কেকাধ্বনি
কলকাতার বুকে এ সমস্ত বাতুলতা, অথচ এক একদিন
আশ্বিনের আলোয় ছুটির সানাই বাজলে
বুকের মধ্যে স্থলপদ্ম পাঁপড়ি মেলে ভ্রমরকে ডাকে

যা হবার নয় তা যখন ঘটে যাচ্ছে দুর্নিবার
তখন চৌরঙ্গীর ট্রাফিককে উদ্‌ভ্রান্ত করতে অকস্মাৎ
একদল হলুদ প্রজাপতির অভিযান
বড়ো বেশী রোমাঞ্চকর,
রূপকথার মতো॥

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায

জলেব আগুনবেড

জলের আগুন বেড গায পেঁচিয়ে পালিযে যাচ্ছ—পাহাড টিযোনো
আষাঢপাড দিয়ে এক ঝিলিক শলাসন্ধি করে মেঘ সুনসান্ ·
উঠোনে ঠায দাঁডিযে হাবা আদুড ছেলেটা, হাতিমুণ্ডু দেবতাব
মুখোশ টান মেরে ফেলে গন্‌গন্ কবতে কবতে চলে গেল
জন্মদাতা বাপ—লম্বা ঘেয়ো ছাযা তার পা লেপটে চলেছে, নাছোড।
পাথবঢেউযের মত যত দূর শুধু আগুনবিছুনি ঘোলা জল।
ফটিকসবুজ তাব ভেতব দিয়ে সার চলেছে হাডহদ্দ গাঁ-উজোর মিছিল।
ভয, অশনকামনাব নিদারুণ ভয—পালাও গো, পালাও—
গা নেই মুখ নেই—পাবনদিঘিব পাডে স্থিব জমে উঠল চলন্ত কুটো।
হাডমালা বাঘছাল গা ভর্তি ছৌয়েব সাজ ছুঁডে ফেলে খুঁজছে—
ছত্তরখাটানো তাঁবু, বুডো শিবেব গাছবাড়ি মন্দিব

ঠাকুর,

একটা ধর্মিষ্ঠি আশ্রয় দাও মববাব। উঠোনে দাঁডিয়ে
হাবা আদুড ছেলেটা তার দু মুঠো মুডিব দানা ছুঁযে উডছে
ঘননিস্বনমন্দ্রিত মেঘ ছুটে এলো আতশঝলসানো ঢালকিরীচ আগলে,
বাশ বাশ কুসুমতাবাব ঘুলে গগন আকুল হযে নুযে এলো,
পাবনদিঘিতে নেযে সবাই একএকবাব উঠে বসছে ফুলের পাটিতে ওইখানে
বনঅযাত্রাব কালে ঘাম মুছে বসেছিল রাম সীতা লক্ষ্মণ দেওব,
সেই তাপটুকু হাওয়া অশবীর হয়ে ঘুরছে এখনো, ছুঁযে গেল।
সর্বকাল দুখে যায় ওগো
সুখ না জানলাম কভু না দেখলাম শ্যামচাঁদের মুখ।
সারা মুখ ভর্তি কালি চিড়বিড মুখোশের দাগ জ্বলছে· ·

ঠাকুর,

একটা ধর্মিষ্ঠি আশ্রয় দাও মরবার
পিঁপড়েপোকার মতো স্থির জমে উঠল হাহুতাশ।
বোবা তাপ ছড়িয়ে চলেছে পাহাড়ঢেউয়ের আগুনবিছুনি জলে জলে ··
উঠোনে ঠায় হাবা আতুর ছেলেটা—ফুলের বুকোর মধুমাস
রুষিত লোভ হয়ে ছুটোছুটি করে অযোধ্যা পাহাড়ে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

জন্মদিন ১৯৪০

খুব সন্তর্পণে পা ফেলি। অসতর্ক হলেই বিপদ। বালি আর পাথর খুবলে
খাবে আমাকে—
প্রসাধনের প্রচ্ছদে ঢাকা শরীর, স্থাপত্যধর্মী বায়াতক—তার পঞ্চবীডাল।

এই হেরে যাবার অর্থ বুঝি নি একদিন—অন্তত জন্মদিনের জামা যখন মায়ের
বাক্সে তোলা ছিলো—তার ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধে ভাবি বাতাস—এই চল্লিশ
বছরের শ্যাওলাধরা খাট্‌লা থেকেও ঠিক চিনে নিতে পারি অনায়াসে

অনেকগুলো জন্মদিন পোষাক পাল্‌টে সঙ সাজালো তারপর। আর
দিনে দিনে বেড়েছে আমার অভিনয়ে পটুত্ব। অথচ বুকের হাড়ে সেই
সকালবেলার চিলতে হাওয়ার নীল রুমাল দুলতে থাকে—হারিয়ে যায়
মাঝে মাঝেই হারিয়ে যায় ভিড়ের মধ্যে—মিলিয়ে যায়
আবার কখন ফিরে এসে দুলতে থাকে তিরতিরিয়ে—টের পাই

খুব সন্তর্পণে পা ফেলি। তামাটে ভারি আকাশ ভাসছে আকাশে
আর তারাগুলো খুবলে তোলা চোখ যেনো মাছের, আর পৃথিবীর
নাভি ছিঁড়ে উৎক্ষিপ্ত হাওয়ার অবিশ্বাসী দাপাদাপি

এই ভাবেই জ্বলে যাচ্ছে নশ্বর মাটির হাড়পাঞ্জরা
অবিনশ্বর শব্দটাই ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে উড়ে যায়

এই সব ভ্রান্তি।
মাতাল কবে যেতে চেয়েছে হাসপাতালের ত্রিসীমানায় ? জানে না, যে—
পথগুলোর রশির টান ছিঁড়তে তার জেরবার হবার পালা, সেই সব রাস্তা
তার গলিঘুজি, চৌরাস্তা ছড়িয়ে আছে জলের ভিতর, জালের মধ্যে
ধরা পড়েছে কখন, তার এখন হাটের মধ্যে উদোম হয়ে পড়ে থাকার পালা

ভুল, না ঠিক—নিখুঁত অর্থ কে-ই বা জানে ? খুব সাবধানে হাঁটতে শেখা
উঠতে উঠতে পড়ে যাওয়া, আবার দেয়াল ধরার চেষ্টা—এই ভাবেই
প্রসাধনের প্রচ্ছদে ঢাকা শরীর—স্থাপত্যধর্মী কায়াতরু—পঞ্চবী ডাল
ঝুরে ঝুরে তুলোট কাগজ, ছোঁয়া লাগলেই হাজার টুকরোয় ভেঙে যায়

পদ্ম আঁকা টিনের বাক্স, ডালা খুলতেই ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধ—খুব পুরনো
দমকা বাতাস, রঙ জ্বলা বেনারসী, জাফরানী চুলের ফিতের ফ্যাকাশে সুতো
মা এইসব বিয়ের যৌতুক হিসেবেই পেয়েছিলেন—

মণীন্দ্র গুপ্ত

জাতিস্মর

পাহাড়ের খাদে মরা বাঘের দেহ অনেক দিন হল নীরবে পচে গিয়ে
এখন শুয়ে আছে সাদা কঙ্কাল। শক্ত হাড়ের কঠিন কপালে
হিজিবিজি দাগ কাটা, প্রকাণ্ড শ্ব দাঁত দুটো ক্রমশ মাটিতে
বসে যাচ্ছে। দিন খুব উজ্জ্বল হলে, রোদ্দুর কয়েক মিনিটের
জন্য এসে দাঁড়ায় তার উপর, নইলে সেই খাদে সব
সময়ই ছায়া—ভিজে ভিজে ছায়া। গাছের শিকড় ধরে

ধরে সাহস করে একটু নেমে গিয়ে দেখতে পেতাম
আশ্চর্য দৃশ্য · তার চোখের কোটরের মধ্য দিয়ে ফুঁড়ে
বেরিয়েছে দু গুছি শক্ত ঘাস, তাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল
নীল ফুল।

পাহাড়ের পক্ষী অঞ্চলে ছোট্ট সুখের কুটীর আমি ভুলতে
চাইলে কি হবে, বার্নিশ করা বাঁশের বুনোনো জানলার
মধ্য দিয়ে পৌষরাত্রির হিংস্র হাওয়া লাফিয়ে পড়ে আমাকে
জাগায়। ঘাসের মাদুর-মোড়া দেয়ালের গা ঘেঁষে পুরু
লাল কম্বলের আদুরে বিছানায় কোথায় আরো ডুবে যাব
তা না আমি একলাফে ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে আসি।
সুস্থ তরুণ বাঘ তখন কালো আকাশ ভরে থাবা
চালিয়ে তারা ছিটকোচ্ছে—নখের ঘষায় টানছে
উল্কার টান—শূন্যে পা বেথে রেখে ক্ষিপ্র চক্কর
দিচ্ছে নিঃশব্দে—তার পায়ের তলায় পুরু স্তব্ধ
মখমল।

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

মাকড মরলে ধোকড় হয়
মাকড়ে ধোকড লাগ
হক মান্নৎ জোড়া ছাগ
ছাগের যদি হাড্ডি ফাটে
গৌড়া বাঁশ চচ্চড জাগ।
বাঁশ বাঁশ কঞ্চি কই
কঞ্চি নলচে বানায়

বাঁশ বাঁশ পত্তর কই
পত্তব ঠেক্‌নাখানায় ॥

মাকড়ে ধোকড় লাগ
হক মান্নৎ জোড়া ছাগ
ছাগের যদি হাড্ডি ফাটে
গেঁড়া মাথা চচ্চব জাগ
মাথা মাথা চুল কই
চুল চিল নিয়েছে
মাথা মাথা ঘিল্লু কই
ঘিল্লু হাড্ডি প্যাচে ॥

মাকড়ে ধোকড লাগে
জোড়া ছাগ তডবড ভাগে
ফাটে হাড্ডি ছোটে ঘিল্লু
মাকড় বিলকুল ধোকড ছিল্ল ॥

কুশল মিত্র

কাপালিকেব ব্যথা

রাত্রির আঁধাবে বিষ, বিষ-ফল তোমার বাগানে
তুমি সেই বুনোফল খেয়ে তাব কাঠোর আস্বাদে
এখন তুমি কাপালিক পুরুষ।
তোমার কীসের ব্যথা?
তবে কেন ঘন পারদের ভাবে বুকে ব্যথা লাগে।
তোমার কীসেব রোগ? বাড়ি ঘরদোর সংসাবের
যা-কিছু সম্পদ সবই আছে—আছে নবীন শবীব,
তাকে নিয়ে এত সুখ—তবু বলো—"জানিনে, জানিনে।"

হায়। তুমি শুধু ব্যথা নিয়ে খেলা করতেই জানো।
যে-ব্যথা রাত্রেই আসে অন্ধকারে মন ডুবে গেলে
স্বপ্নের ভিতর, ঘুমে, সন্ন্যাসীর শ্মশানভূমিতে—
রাত্রির নদীর কাছে জল চেয়ে তুমি
শীর্ণ শরীরের ছায়া শয্যা এক, সেই
ব্যথাকেই শিশুর মত
কোলে তুলে নিলে—
শরীরে নদীর দোলায়, যারা ছিল সোহাগের বশে।
ব্যথারা রাত্রেই আসে। দিনের আলোয় পোড়া মাঠে
বিবাগী পৌরুষ তারা। ফিরে আসে—ব্যথা, ব্যথা,
অন্ধকারে ঘেমে ঘেমে শরীর বিস্তৃত হয় ঘুমে,
নির্ব্বিকার নিরাসক্ত প্রেমে অন্ধকার ছাই হয়
চিতাভস্ম মেখে। স্বপ্নের শরীরে সেই ছাই, ব্যথা,—
ঘুমের ভিতর আছে শ্মশানভূমির কোন নেশা?
রাত্রির আঁধারে বিষ—তুমি সিদ্ধ কাপালিক ভেবে
নিজের বাগানের বিষ ফল তুমি নিজেই খেয়েছো
তৃষ্ণায়, রাত্রির নদী যদিও জল দিতে চেয়েছিল।

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

বিচ্ছুরলগ্ন

পঁচিশ বছর ধূমপান অভ্যাস করেছো,
এখনও কুণ্ডলী পাকাতে শেখো নি।
এখনও কলকাতার ভীড়ে পিষ্ট হও,
ভ্রূকুটিতে দৃষ্টি আনত হয়।
যুথবদ্ধ জিঘাংসায় বুক কাঁপে।
এখনও দুপায়ে শৃঙ্খল, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
কৃতঘ্ন পামর বাসা বেঁধে আছে।

বহুদিন পৃথিবীতে আছো,
এখনও ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে শেখো নি।
এখনও তৃষ্ণার্ত কাগজকুড়ানীকে জল দাও,
এখনও প্রাবৃট্‌রাত্রি অলকাদিশারী,
এখনও আশ্রয় খোঁজো কবোষ্ণ অধরে॥

দেবারতি মিত্র

নিষ্ফল নৈঃশব্দ্য

নীরবতা। কোনও গুঞ্জনও নয়
বোবাধরা দুঃস্বপ্ন সেও কত দূর।
কেবলই চুপ, বিস্বাদ চুপ
কাঁচের মতন হাওয়ামণ্ডল পৃথিবীর চারিদিকে
ঘুরে ফিরে আসে শুধু ভূত ছায়া
কখনও দেখি না সরু সরু মেঘ
জড়িয়ে ধরছে চাঁদের লাটিম।

পৃথিবীর কোনও নড়াচড়া নেই
নারীর গর্ভে বহুদিন মৃত ভ্রূণের মতো
এ কোথায় আমি বিঁধিয়ে রয়েছি,
তোমাদের চোখ এখানে পড়ে না
এখানে কাঁপে না শিরীষ গাছের প্রান্তে
সবুজ বই উলটোনো পাতার শব্দ
আঙুলের হাসি,

সূর্যবছর,
মানুষের খুলি
ফাঁক করে ছুটে যায় ঘোর বোকা শূন্য।

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

কৌতূহল

গাছ গাছালির জটলার মধ্যে পথ রোজ যাওয়া আসা অথচ
আজ হঠাৎ এক অজানা ফুলের নূতন সুবাস,
থমকে দাঁড়ানো যায় কি বুক ভরে পবিত্র বাতাসে শ্বাস নিতে ?

রুক্ষ কাঁকর ভরা জমি লাঙলে খুঁড়ছে চাষী
ক্লান্ত বলদজোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত চলে গেল,
শুকনো এঁদোপুকুরের তলানি জল কলসীতে ভরে নিয়ে
গ্রামের বঁধুরা গেল চলে

একফালি দীর্ঘশ্বাস আকাশে উড়িয়ে ফেলে রেখে

শুধু বনমালী দাঁড়িয়ে আছে একান্তে, সে আর তার কৌতূহল
কোন অজানা ফুলে হঠাৎ আজ এমন সুগন্ধ।

রোজ যাওয়া আসা জলভরা হালচাষে বলদ তাড়ানো
আজ হঠাৎ কেন অচেনা পাখির ডাকাডাকি
অজানা ফুলে ফুলে নূতন সুবাস ?

দাউদ হায়দার

চাঁদ সিরিজ :

... তখন, বিড়লা তারামণ্ডলের মাথার উপর
চাঁদ জেগেছিল। আমরা, গঙ্গার উপকূল থেকে সন্ধ্যার হাওয়া খেয়ে ,
গড়ের মাঠে এসে ইয়ার-দোস্তি করছিলাম

গঙ্গার জলে চাঁদ ও তারা
ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছিল। আমরা দেখেছি ,

একটি জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে, তরঙ্গ তুলে চাঁদ-তারাদের
মাড়িয়ে
মাড়িয়ে
উত্তরে চলে গেল।

আমরা সৌন্দর্য সন্ধানী নই কিংবা 'রোমান্টিক'
এই অপবাদ কেউ দেবে না, কিন্তু এইমাত্র বিড়লা তারামণ্ডলের মধ্যে
শিক্ষা ও বিনোদনের জন্যে কারা যেন
টিকিট কেটে ঢুকে যাচ্ছে।

দেবপ্রসাদ ঘোষ

ব্যাধের প্রতি

ওদের শবদেহ ভেসে গেল।
যুবতী হরিয়াল কুমারী শালিখ
গর্ভবতী খঞ্জনার শব।

চষা খেত মাটির মতো জ্যোৎস্নায়
স্মিত-চোখ রমণীর মতো
নদীর জল ওদের রক্তের শ্রুতি
উদাত্ত মন্দিরের মতো অর্থবহ ছিল।

ওদের প্রার্থনা ছিল
আমাদের রক্তস্রোত
মার্জনা করুক তোমার অ[illegible]ার।
তোমার চোখের অন্ধকারে
মার্জনা করুক আমার রক্তের উষ্ণতা।
আমার রক্তের নুন

মার্জনা করুক খণ্ডতা ,
অন্ন থেকে প্রাণ
প্রাণ থেকে তোমাব চৈতন্য
উত্তীর্ণ হোক, পুষ্ট হোক শস্যের মতো
আমার মৃত্যু
তোমাকে বহন করুক
প্রত্যহ থেকে চিরদিনে।
তোমার কণ্ঠস্বর
উচ্চারণ আমার মৃত্যু
উদাত্ত এবং আন্তরিক
মা হিংসী, মা হিংসী, মা হিংসী।

প্রদীপ মুন্সী

সেতার

সেতারের হাহাস্বর গড়িয়ে আসে
নীলাম ফেরৎ
সকলের বুকে
বন্ধ কপাট
সেতারের হাহাস্বর নেমে আসে
একটানা
পাহাড়ী ঝোবাব মতন
খুঁজে ফেরে আদিম সবুজে সিক্ত চারাগাছ
গড়িযে নামে
ধানের শিকড়ে
প্রথম নিহত শিশুর
রক্তে মিশে যায়
সাতটা নীল ছুরি রক্ত ফালা ফালা ক'রে

রাখাল বিশ্বাস

বুঝতে পারি

তোমার চৌকাঠে পা রেখে নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারি
স্তব্ধতায় স্পর্শ করি অপরাহ্নের আলো
যেখানে শীর্ণ মুখের ছায়া, নামে
শীত রাত্রির আকাশ, ছিন্নতা, নামে
রৌদ্রহীন ভালোবাসার নদী

সে নদীর বুকভরা ছিল জল, ভেঙ্গে পড়ে বিসর্জনের হাওয়ায়
নিথর রিক্ত পত্রে ভেসে ওঠে, আর
আমার পিপাসা মেটায়
তোমার চৌকাঠের তপ্ত চোখের জল

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আর ভিক্ষাপাত্র নয়

পৃথিবীর সঙ্গে আজো আমার একটুও সদ্ভাব হোল না
এই প্রৌঢ় চল্লিশেও আজো আমি ঘোরতর ব্যর্থ প্রেমিক
একা একা ঘুরে বেড়াই ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে ·
আমার ছোঁয়ায় বন্ধ্যা হয়ে যায় শস্যক্ষেত্র
বিনা মেঘে বজ্রপাত নেমে আসে বটের ছায়ায়।

আজো অব্দি পৃথিবীর সঙ্গে আমার সদ্ভাব হোল না
এক পা এগিয়ে গেলেই ঘুরিয়ে নেয় মুখ·
আর আমি যথারীতি দীনমলিন অভিমানী—
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াই
ফলতঃ ক্রমেই যেন দুচোখের জ্যোতি কমে আসে
পাতালের ঘোর লাগে রক্তের ভেতরে

দুহাতে উস্‌খুস্‌ করে পৃথিবী বিরোধী সব কার্যকলাপ
অতএব আর ভিক্ষাপাত্র নয়
ভাবছি দস্যুর মতো একবার ঝাঁপ দেব কি না।

আজো অব্দি পৃথিবীর সঙ্গে আমার সদ্ভাব হোল না।

যতীন্দ্রনাথ পাল

পিতৃদেব

ডুবন্ত মন্দির তিনি। ডুবন্ত মন্দিরই।
গভীর প্রশান্ত, নির্বিকার।
চারদিকে পৃথিবীর দুবন্ত প্রবল কোলাহল—
তার দিকে অভেদ্য দেওয়াল তুলে, ইদানীং—

অটল মন্দির তিনি।
পেয়েছেন পরম-দেবতা
ভেতরে গভীরে, ক্ষমাময়, মহীয়ান
তাকে তিনি অর্চনা করেন দিনরাত :

তাই ইদানীং সমস্ত গভীর ব্যথা
অভিঘাত দূরে
হৃদয়ের রক্তপাত দূরে
এখন কপালে শুধু বেলাশেষ ঐশ্বর্যের আলো,

এবং এমনিভাবে ডুবে চলেছেন
পার্থিব আলোর দূরে,
তবু একদিন আমাদেরই মত তিনি রক্ত মাখতেন

হাতে, আলোড়িত হয়ে উঠতেন
আত্মবোধে, আত্মসুখ-গান গাইতেন,

অরণ্যের মত পর-গণ্ডি ভাঙতে চাইতেন,
এখন সমস্ত ছেড়ে, একান্তে গুটিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন,
ডুবন্ত মন্দির ঘিরে এখন কাঁসর-ঘণ্টা আমরা বাজাব।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

একা শুয়ে আছো সাহেব

[শ্রমিক নেতা আলেকজাণ্ডার হেনরী বেষ্টারউইচের স্মরণে]

খোলা আকাশের নীচে এখন একা শুয়ে আছো সাহেব
এমন সহজে, যখন রুগ্ন জ্যোৎস্না শোক-তাপ বা সুখ
মুছে, অনায়াসে তোমার সমস্ত অস্তিত্বকে ছুঁয়ে আছে,
কুয়াশার চাদরে রাত্রি ঢেকে দিয়েছে শীতল শরীর।

অনেক জায়গা ছুঁয়ে এইমাত্র তুমি নেমে এলে পাহাড় থেকে
পায়ের তলায় সমতল, যে দাঁড়িয়েছিল অধীর প্রতীক্ষায় …
পাহাড়ী পথে কাল সারাদিন ধ্বস নেমেছিল অকাল বৃষ্টিতে
হিমেল হাওয়ায় দু'হাত তুলে খোঁজ করছিলে ছদ্ম ঈশ্বরকে।

ধূপের গন্ধে ম-ম করছে ভালোবাসা, বালো কালো মাথায়
হারিয়ে গেলে ফুলের মধ্যে, ভেঙে পড়ছে তীব্র জনস্রোত
সবাই দেখতে চায় তাদের প্রিয়নেতাকে, আসন
তুলে নিয়েছে বুকে শান্তবিরতা উঁচু করে রেখেছে অভিজ্ঞান

ভ্রষ্ট চাঁদ উঁকি মারে আকাশে, কয়েকজন পাদ্রী ও যাজক
সাদা পোষাকে ঢেকে ফেলছে বিপ্লব-বন্দিত শোণিত বর্ণ।

খোলা আকাশের নীচে এখনো একা শুয়ে আছো সাহেব।

গোকুলেশ্বর ঘোষ

ক্রুশবিদ্ধ হাত

বুকের উপর হাত পড়লে দুঃস্বপ্নে জেগে উঠি
জলমগ্ন মানুষকে ফুঁ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা
নানা পরিকল্পনা তৈরী করে যাচ্ছি
শব্দের সঙ্গে শব্দ মিশে হৃদ্‌পিণ্ডে স্বপ্নের বোঝা।

প্রতিকাজ সফল ভেবে নিষ্ফল হতে পারে,
পাতাল রেল খোঁড়া হচ্ছে জেনে স্বপ্নের মোড়কে
ফেরিওয়ালা বিক্রী করে খাবারের ঠোঙা
খাবার নেই যেখানে—

যেন ঘুমের বড়িতে দেহমন ঝিমিয়ে আছে
মুমূর্ষুকে বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা
বুকের উপর দুঃস্বপ্নের ক্রুশবিদ্ধ হাত।

নবীন সুর

ছেলের কাছে

জুনমাসের দীর্ঘতম উজ্জ্ব। বিকেলে
বিলটুকি জিজ্ঞেস করবে, বাবা—
এত ঘুরে দীর্ঘবেলা
কোন্ অলৌকিক মায়া উন্মোচনে
মাথায় চুলের পরে রূপোর মুকুট নিয়ে
ঘরে ফেরো উত্তরচল্লিশে ?

অজিত বাইরী

গ্রহণ

গ্রহণ লেগেছে চাঁদে
চন্দ্রভুক রাত্রির চূড়ায় বসে
ডাকছিলো পেঁচা :
গৃহস্থের অমঙ্গল হবে

রাত বারোটায় হেঁকে উঠলো চৌকিদার
জাগা রহো
লণ্ঠন দুলতে দুলতে নেমে গেলো
মাঠের ভেতর
আরো কতিপয় ছায়া

নদীর চড়ার ওপর কারা জ্বেলেছিলো চিতা
ভেসে আসছিলো ফাটা বাঁশের শব্দ
পোড়া মাংসের গন্ধ

নিঃশ্বাসে, ঘুমে
কয়েকটি মানুষ ছিলো
মসিলিপ্ত, পোকা।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দুটি কবিতা

মনে হতেই

যেই মনে হল,   মিথ্যেবাদী ঝাউ এবং ঐ আকাশ
সকাল বিকেল মিথ্যে কথাই রটায়
যেই মনে হল,   সূর্য
ব্যস্ত থাকে উদ্দেশ্যহীন আলপনা আঁকায়,
অমনি সে-ও   'টুপ'
জলের মতো অন্ধকারে হঠাৎ-ই দেয় ডুব,
কোথাও মুখ লুকায়।
যেই মনে হল,   মাটি,
মিথ্যে তাকে জন্ম দিল মিথ্যে ছলাকলায়,
যেই মনে হল,   মানুষ
অকারণে চতুর্দিকে কত কী-ই না ঘটায়,
অমনি সে-ও   'টুপ'
জলের মতো অন্ধকারে হঠাৎ-ই দেয় ডুব,
কোথাও মুখ লুকায়।

অন্তহীন

উত্তরে যা উত্তরে যা উত্তরে তুই যা,
উত্তরেরও শেষে আছে অনন্ত উত্তর,
যেতে যেতে কখনো তুই বিরাম নিবি না।
দক্ষিণে যা দক্ষিণে যা দক্ষিণে তুই যা,
দক্ষিণেরও শেষে আছে অনন্ত দক্ষিণ,
পথের শেষে পথ রয়েছে নানা।
পূরবে যা, পশ্চিমে যা, যেদিকে খুশি যা,
পাহাড়ে যা, পর্বতে যা, সমুদ্রে তুই যা,
যেতে যেতে পেয়ে যাবি পথের নিশানা।

কৃষ্ণ ধর

সময়ের কৌটো

আমি তোমাদের জন্য অনেক কিছুই রেখে যাব
তোমাদের পূর্ণ-অপূর্ণ আশা ও আকাঙ্ক্ষা
তোমাদের স্বপ্ন কামনা কাতরতা
যেমন লিখতে তোমরা নীলচিঠিতে প্রিয়তমা রমণীর কাছে
কবিতার গূঢ় কথা, ব্যঞ্জনা সংকেত
কোনো কিছুই বাদ থাকবে না।

এই ছাখো, আমার হাতে ধরা আছে কুমারী ইস্পাতের অমলিন কৌটো
তার শরীরে বা হৃদয়ে কোনোদিন আঁচড় পড়ে না
পরখ করে ছাখো দীর্ঘ শতাব্দীর মোড়কে-পোরা টাইম ক্যাপসুল
তার ভেতরে অক্ষরের মালায় বন্দী
তোমাদের কীর্তি খ্যাতি সম্ভাবনা
ইচ্ছা করলেই তার সব কিছু মুঠোর ভেতর পেতে পারো।

কৌটো খুললে অনেক কথা মনে পড়ে যাবে তোমাদের
মনে পড়ে যাবে তোমাদের অজস্র রক্তক্ষরণ শুধু ভালবাসার জন্য
নিঃসঙ্গ কোকিলের গলায় বিষণ্ণতা ছাপিয়ে ফুটে উঠবে
রবোটের গলার মতো অটোমেটিক সংলাপ
স্মৃতির পর্দায় প্রতিফলিত অস্থির আকুতি, কান্না দীর্ঘশ্বাস

ইতিহাসের দলা পাকানো ছেঁড়া পাতার বল গড়িয়ে গড়িয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে আসবে
তোমাদের উঠোনে এক চিলতে কৃপণ রোদের ওপর
তা দেখে আলতো ঠোঁটে শিস্ দিয়ে উঠবে খাঁচার-পোষা হলুদ পাখি
তখন স্বেচ্ছাচারী বাতাসও অন্যমনস্ক হয়ে উঠবে মুহূর্তের জন্য।

কী মনে হবে তোমাদের তখন ?
ফিরে যেতে চাইবে কি মায়াবী নদীর ধারে
সুরু হবে তোমাদের দীর্ঘ পদযাত্রা উজানের দিকে
যেখানে তোমাদের উৎস ,
বিস্মিত হয়ে দাঁড়াবে কি আলতামিরার গুহাচিত্রের সামনে।
অরণ্য নিষাদের সহোদর,
তোমরা একদিন নিজেরাই যা এঁকেছিলে ?
নিশ্চয় তোমাদের স্মৃতিতে মাঝে মাঝে ভেসে উঠবে এক একটা ফ্রীজ শট

সময়কে মুঠোতে ভরে যেদিন জমে উঠেছিল সভ্যতার পিকনিক

নীলিমায় ডুবে-থাকা মস্ত চাঁদ তার গোলমাল জ্যোৎস্নায়
তখনই তোমাদের প্রেমিকার গাল ঘষে দেবে।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

রাজনর্তক

এখুনি হবে। প্রথম প্রয়োজন যা, তা নিশ্বাসকে সমান হতে দেওয়া, চতুবালি গলির সহর এই-যে শরীর, তাকে সম্পূর্ণ আযত্তে আনা, তার সৌধে উঠে বিজয়-দুন্দুভি বাজানো।

এ-কক্ষে অনন্ত জন্ম স্তব্ধ হয়ে আছে, অনন্ত সমুদ্র। তুমি আগল উন্মোচন করবে একটি একটি ক'রে—করলেই, প্রতিবারই, কী জোয়ার তোমার জননেন্দ্রিয়ে, বিহ্বলতা ব্যাপ্তির, ধক্ ধক্ রক্ত বুকে ছলাৎ ছলাৎ, সমুদ্র-সৈকতই যেন।

এখুনি হবে।

কক্ষের স্যাঁৎসেতে গন্ধ ছাখো ইতিমধ্যেই একটু একটু যেন ভূর্জের অরণ্য, ভাগীরথী-শৃঙ্গ ঐ দূরে দেখা গেল কি গেল না। এখুনি যাবে। কস্তুরী-মৃগের

ঝাঁক হু-হু গতিতে কেবলই এক চলমান ডোরা-কাটা স্বপ্ন, সর্-সর্ শব্দ পাতায়-পাতায়, হাল্কা পালকের মতো পা উঁচু-নিচু মাটিতে পড়তে-পড়তে পড়ে না, গন্ধের ঝড় বয়।

এই সবই হল ব'লে, এই ভাখো-না।

তুমি তো দেখতেই চাও। তাই চোখ ফুটছে আস্তে-আস্তে—ঢুকেই পেয়েছিলে যে-অজস্র কুযোর অন্ধকার, ফলে হঠাৎ রকমারি কত সর্ষে ফুল, তাও স'য়ে এসেছে ইতিমধ্যে। দেখছ এতক্ষণে প্রদক্ষিণ করার মতো অলিন্দটিকে, দ্বারিকের মূর্তিকে, বাবা, কী চক্ চক্ করছে মানুষটার টিকলো নাকটা গো। চলল আরো ভিতরে তোমার চোখ—ঘাড় বেঁকিয়ে পর্যবেক্ষণের সুরু, ঐ আবিষ্কার করলে ব'লে তাকে।

কাকে ?

সে-প্রশ্নের এখুনি মীমাংসা হবে। জোয়ার তোমার জননেন্দ্রিয়ে।

এই তুমি দেখলে ব'লে নগরী, এক সংসার যা তোমারই—রাস্তাঘাট, উপকণ্ঠে পাইন-বন, পর-পর আঙিনায় কী দাপাদাপি, চোরপুলিশ বিনুনি-ঝোলানো মেয়ের, মুখে খই-ফোটা ছেলের। মাথার ওপরে আকাশ মণিমানিক্য-খচিত ছত্র। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সন্ধ্যা।

তোমার মতো আমরা তো ঢুকি নি, তবু তুমি যে ঢুকেছ, দেখছ, তার প্রসাদে আমাদেরও চোখ খুলছে, তাই বলছি। আমরা দাঁড়িয়ে কক্ষের বাইরে চত্বরে, সারা গ্রাম উজাড় ক'রে হাজির শিমুল গাছের ছায়ায়—অপরাহ্ণের আলোকে সে-গাছ সুদক্ষ রাজনর্তক।

কবিতার ভাবনা (১০)

অরুণ ভট্টাচার্য

আমার একটি খাতা ছিল, লম্বায় চওড়ায় বেঢপ সাইজ, পুরনো দিনের আটোসাঁটো বাঁধানো। খাতাটি এখনো আছে, প্রায় ছিন্নভিন্ন—আমি তথাপি সযত্নে রেখেছি। তাইতে অনেকের নাম ঠিকানা ছিল। আমি তাঁদের মাঝে মধ্যে চিঠি লিখতাম— আমার কিছু কবিতা কোথাও প্রকাশিত হলে দুচারজনকে তাঁদের ঠিকানা দেখে পাঠাতাম। তারপর যখন থেকে উত্তরসূরি পত্রিকা নিয়মিত-ভাবে অনিয়মিত বেরুতে থাকলো—তাঁদের কাছে আমাদের কাগজ পাঠাতাম। আমার কবিতার বইও এঁদের মধ্যে কাউকে ডাকে পোষ্ট করতাম। আমার যখন কোন কাজ থাকত না, এমনকি কাগজ পেন্সিল নিয়ে কবিতা লেখার কোন চেষ্টাও করতাম না, তখন এই বিপুলাকার খাতাটি ওল্টাতাম। পাতার পর পাতা। নাম-ঠিকানা দেখতাম, সেই অভ্যাসটি এখনো আছে।

যে ঢাউস খাতাটির বিষয়ে বলতে যাচ্ছি তার ইতিহাস না বললে ঋণগ্রস্ত থাকতে হবে। খাতাটি আমার শ্বশুর মহাশয়ের, এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহস্বরূপ প্রাপ্ত। সেই খাতাটিতে ওঁর জমিদারীর হিসেবপত্র লেখা থাকতো। বহু খালি পৃষ্ঠাও ছিল—সেগুলিতে আমি এঁদের নাম ঠিকানা লিখতুম। জমিদারী পাবনার, সুতরাং ভাগাভাগ হতেই জমিদারীটি গেল। কিন্তু জমিদারী গেলেও জমিদারের হিসেবনিকেশ আমি এখনো সযত্নে রক্ষা করে চলেছি, বাংলাদেশ সরকারকে, যাকে বলা যায় কলা দেখিয়ে।

বছর ঘুরে এসে যখন খাতাটি খুলতাম তখন ফুল ঝরে পড়ার মত কিছু কিছু নাম ঝরে যেতো। এই তো সেদিন খাতাটি খুলে চমকে উঠলাম—এই দীর্ঘ ছাব্বিশ সাতাশ বছরে এতো ফুল ঝরে গেছে। আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলুম না যেন। মনে হল এই তো সেদিন দুপুর প্রায় বারোটার সময়, অনেকটা অভদ্রভাবেই বিবিদি-র বাড়িতে ভর দুপুরে গিয়েছিলাম যখন তিনি খেতে বসে-ছিলেন টেবিলে। মনে মনে ভাবছিলুম—এই কি দেখা করবার সময়, তিনি কি দেখা করবেন। কিন্তু সটান ডাকলেন টেবিলে, বললেন খাবে কিছু। আমি জানালাম, খেয়েই বেরিয়েছি। সঙ্গীত ভবনের একদা অধ্যাপক যামিনী চক্রবর্তীর

স্ত্রী গীতির সঙ্গে আমি বিবিদির বাড়ি গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে—সেই থেকে যখনই আমি শান্তিনিকেতন যেতাম—সঙ্গী থাকতেন আমার পিসতুতো ভাই সাহিত্যশিল্পে অনুরাগী, সুরসিক কেবুদা, ভালো নাম অজিত মৈত্র, —বিবিদি-র কাছে যাবার টান এড়াতে পারতুম না। শেষ জীবনে আমি তাঁর বড় স্নেহ লাভ করেছি। ওঁর কিছু চিঠিপত্র আমার কাছে আছে, পত্রিকার জন্য লেখাও দিয়েছেন। তিনি একদিন হুট্ করে চলে গেলেন। একটি স্নিগ্ধ ফুল ঝরে পড়লো। মনে আছে, মহাজাতি সদনে গীতবিতান' সংস্থা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেছিল। শেষ জীবনে আমি তাঁর কাছে এসেছিলাম জেনে গীতবিতান কর্তৃপক্ষ আমাকেও কিছু বলতে বলেছিলেন। বোধ হয় লেডী প্রতিমা মিত্র সভাপতি ছিলেন সেই অশ্রুসজল সন্ধ্যাবেলা। তার কিছুদিন পরে আমাদের বাসায় বিবিদির একটি স্মরণ-সভা করি। কলকাতায় এ দুটিই বিবিদি-বিষয়ক স্মরণ সভা। কমলা বসু একে একে বারো খানা গান গাইলেন। আমার পরিকল্পনা ছিল, রবীন্দ্রনাথের সেই সব গান কমলাদি গাইবেন যা বিবিদিরই-করা স্বরলিপি। অবশ্যি শেষ পযন্ত তা হয় নি। বড় সুন্দর শান্ত কেটেছিল সেই রাত্রি। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে রাজ্যেশ্বর মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, অম্লান দত্ত—যাঁরা এসেছিলেন,—কমলাদির গানে তারা ডুবে গিয়েছিলেন। অম্লান অনেকটা এরকম বলেছিলেন, 'আমি কাঠখোট্টা বিষয় পড়াই, অর্থনীতি। কিন্তু আমারও চোখ দুটি ভারী হয়ে এসেছে।' আমার এখনো দুটি গান কানে ভাসছে, 'অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে' এবং 'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে'। এ গান দুটি অবশ্য বিবিদি অর্থাৎ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী স্বরলিপি করেন নি। যতদূর মনে পড়ছে কাঙালীচরণ সেন এবং অনাদিকুমার দস্তিদারের করা। যাই হোক, সব সময় তো সব গান ভালো গাওয়া হলেও ভালো লাগে না। কেন লাগে না এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অবশ্য মানস রায়চৌধুরী করতে পারবেন, যিনি একই সঙ্গে কবিতা গান এবং মনস্তত্ত্বের ককটেল-প্রস্তুতে অভিজ্ঞ। এই গান কতবার পরে কত জায়গায় শুনেছি। মন ভরে নি। সত্যি কথা বলি, আর কারো কাছেই এই গান দুটি শুনতে চাই না। এবং কমলা বসুর কাছেও আর না। অনেকটাই ভয়ে, যদি সেদিনের মত কানে না বাজতে থাকে।

বিবিদি-র প্রসঙ্গ এলো কবিতার কথায়। বিবিদি একটি ব্যক্তিত্ব যিনি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিলেন, মার্জিত রুচি এবং সহজ বিনয় দ্বারা। কবিতা, গান বা নাটক, আবার গানেরও কত সুর, পুরাতনী, বিলীতি, ওস্তাদী সব কিছুকেই তিনি আপন করে নিতে পেরেছিলেন—নিয়ে সেই সমুদ্রমন্থন করেছিলেন, যে সমুদ্রের অন্য নাম রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথে গান কবিতা অভিন্ন নয। কবিতাই গান, গানই কবিতা। সুর এবং তালও বাহ্য। ঠিক এ বস্তুটি আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না, বোঝাতে চাইবও না,—এ আমার একান্তই আমারই অনুভাবনার কথা।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নামটি সীমাবদ্ধ ছিল শুধু রসিকজনের কাছে, বিবিদি নামটি ছিল আরো সীমাবদ্ধ। হালে, তাঁর নাতনী সুপূর্ণা আর নাতনীজামাই সুভাষ তাঁদের দিদিমার নামটি কলকাতার সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ বড় আনন্দের কথা। 'ইন্দিরা' সংস্থা থেকে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর বই প্রকাশিত হয়েছে। এর দরকার ছিল। সেই কবে বিবিদি র গানের দুটি বই পড়েছি। সেই থেকে বই দুটি কাছে কাছে রাখি। একটি, তাঁর স্বামী প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে লেখা 'হিন্দু সংগীত'। অপরটি 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম। প্রথম বইটি অবশ্য মৌলিক কোন গ্রন্থ নয়। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামী বই 'গীতসূত্রসার' অবলম্বনে লেখা। কিন্তু বড় চিত্তাকর্ষক রচনাভঙ্গি। নিরেট ব্যক্তিরাও সঙ্গীতের রসবস্তু পাবেন, এমনই লেখার প্রসাদগুণ। আসলে যে কোন বিষয়ই, যত দুরূহই হোক, অতি সহজে বোঝানো যায, যদি তিনি নিজে বিষয়টি সহজ করে বোঝেন। আর দ্বিতীয় বইটি তো আমাদের সব সময় কাজে লাগে। রবীন্দ্রসংগীতের আকরগ্রন্থ যাকে বলে। বইটির শুরুতে ইন্দিরা দেবী বলছেন. 'আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কিরকম পরকে আপন করে নিতে পেরেছেন—চলিত কথায় যাকে আমরা তাঁর গান ভাঙা বলি—তার পরিধি কত বিস্তৃত, এবং তাতেও কিরকম অপরূপ কারিগরী দেখিয়েছেন, তার একটি স-দৃষ্টান্ত আলোচনা করি।' ইন্দিরা দেবীর ব্যবহৃত 'গান ভাঙা' শব্দ দুটি যে বর্তমানে রবীন্দ্রসংগীতের জগতে 'ভাঙা গান' রূপে কিরকম বিস্তার লাভ করেছে তা যে কোন ছাত্রছাত্রীই জানেন। কবি হিসেবে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি বইটির দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠে। বাংলা গীতিকবিতা—সেই বিদ্যাপতি থেকে—রামপ্রসাদ থেকে, রবীন্দ্র-

নাথকে যে কী ভয়ানক কাছে টানতো এই ছোট্ট রচনা পাঠে তা জানা যাবে। বিদ্যাপতির 'এ ভরা বা-র' এবং গোবিন্দদাসের 'সুন্দরি রাধে আওএ বনি' কবিতা দুটিতে তিনি সুর দিয়েছিলেন একান্ত আপন করেই। অবশ্য বেদগান এবং পালি বৌদ্ধমন্ত্রেও তিনি সুর দিযেছেন আমরা জানি। কিন্তু এগুলি থেকেও যেটা আমার কাছে তাৎপর্যমণ্ডিত মনে হয়েছে তা রামপ্রসাদের কবিতার প্রতি, বিশেষত প্রসাদী সুরের প্রতি, কবির এক সময়কার প্রচণ্ড দুর্বার আকর্ষণ। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর মহীরূহ-সদৃশ জীবনী গ্রন্থে কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথের এমনতর বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, ভাগ্যে প্রসাদী সুর ভুলে যাই—তা না হলে আমার সব গানেই রামপ্রসাদের সুর চলে আসতো।

ইন্দিরাদেবী এই প্রসঙ্গে বলছেন 'বাংলা গানের সুরের প্রসঙ্গে এখানে রামপ্রসাদী সুরের উল্লেখ না করে থাকতে পারছিনে। এই একটিমাত্র সুর রচনাতেই এমন ঐক্য ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে, শুনলেই রাম-প্রসাদী সুর বলে, দেশশুদ্ধ লোক চিনতে পারে। এ যে রামপ্রসাদ সেনের কত বড়ো কৃতিত্ব তা বোধহয় আমরা কখনো ভেবে দেখিনে ব'লেই তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা তাঁকে দিইনে।' এই প্রসঙ্গে তিনি তিনটি কবিতার উল্লেখ করেছেন যা 'এই খাঁটি, সবল, বাংলা সুরে' রবীন্দ্রনাথ গান বেঁধেছেন যেমন 'আমিই শুধু রইনু বাকি' 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,' 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা।' ইন্দিরাদেবী শেষ গানটি বিষয়ে বলছেন 'শেষোক্ত গানটি যখন কবি নিজে বাল্মীকি সেজে তাঁর পূর্ণ গলা ছেড়ে দিযে অভিনয়পূর্বক গাইতেন, তখন ভাষায় রূপে রসে যে কী অপূর্ব আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ত, যাঁরা না দেখেছেন না-শুনেছেন তাঁদের শুধু শুষ্ক কথায় তা বোঝানো অসম্ভব।' রবীন্দ্রনাথ যে কত ভালো গাইতেন, কী প্রাণবন্ত তাঁর ভঙ্গিমা ছিল এ তো আমরা তাঁর সত্তর বছরের রেকর্ডেও বুঝতে পারি। এখানে একটি বড় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় উল্লেখ করি। বেশ কয়েকবছর আগে ভবানীপুরে সকালবেলা কোন একটি গানের আসরে (বোধহয় রামবিক ইনষ্টিট্যুশনে অথবা তার কাছাকাছি, একতলার হলঘরে) শৈলজাদা তাঁর বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতে শুরু করেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের নবীন প্রবীন ছাত্রছাত্রীই ছিলেন সংখ্যায় বেশী। রবীন্দ্রনাথের

একটি মাত্র গান শুরু হতেই এই সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা চাপা হাসির রোল পড়ে যায়। কেউ কেউ শাড়ির আঁচল মুখে দিয়ে হেসেছিলেন এখনও মনে পড়ে। এরা সবই উঁচু সমাজের উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়ে—এ ভাবেই এঁরা রবীন্দ্র-বালচারকে গ্রহণ করেছেন। সেদিন যে আঘাত পেয়েছি তার বেদনা লুকোতে আমার এ জীবন কেটে যাবে। এবং এ কারণেই কলকাতার বেশীর ভাগ বড় বড় আসরে যে পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতাদের শোনানো হয় তা তথাকথিত 'ফিল্মী গান' বা গীত আধুনিক শোনাবার পরিবেশ থেকে বিন্দুমাত্র উন্নত মানের নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গায়ের নামাবলী, খুব সহজেই বাংচারের তকমা এঁটে শহরের বুকে ঘোরাফেরা করা যায়। বিবিদি বেঁচে নেই, তার ভাগ্য ভালো। একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করেই বিবিদি প্রসঙ্গ শেষ করি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটি বড় ছবির ওপর হঠাৎ নজর পড়ে গেল। ছবিটিতে কয়েক জন খেতে বসেছেন। একটি সলজ্জা বধূ পরিবেশন করছেন আর অন্য এক মহিলা হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। বড় স্নিগ্ধ মনোরম ছবিটি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পুরনো অয়েল-পেনটিঙ্। আমি তিনজনকে সঠিক চিনতে পেরেছিলাম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরাদেবী। বাকী চিনতে পারি নি, চিনিয়ে দিলেন মিউজিয়মের সমর ভৌমিক ও নির্মল দে মহাশয়। পাত পেড়ে খেতে বসেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর ভাই (একেই আমি প্রথমদর্শনে প্রমথ চৌধুরী ভেবেছিলুম) এবং রবীন্দ্রনাথদের মাতুল ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেশ্বর বাবুর পৈতেটা ঝকমক করছে এখনো। খালি গায়ে এমন মানানসই চেহারা বড় জমিদারবাড়ির ডাকসাইটে ম্যানেজারবাবু মনে হয়। সলজ্জা বধূটি স্বয়ং ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী—সকলের বিবিদি। আর হাতে পাখা নিয়ে ব্যজনরতা সরলা দেবী। এমন ছবিটি সযত্নে রেখেছেন বলে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষত মিউজিয়ম কর্মীরা আমাদের প্রশংসা পেতে পারেন অবশ্যই। ছবিটি ইন্দিরা দেবীর স্মারকগ্রন্থেও বোধহয় প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

বিবিদি-র সঙ্গে কলকাতাতেও দেখা হ'ত। 'ওল্ড বালীগঞ্জের' বাসায়, পাম প্লেসে বোধহয়, শেষ জীবনে মাঝেমধ্যে আসতেন—যেন কার বিয়ে

উপলক্ষ্যে। আমাকে চিঠি দিলেন শান্তিনিকেতন থেকে, 'তুমি দেখা কোরো'। আমি সন্ধ্যেবেলা বাড়ি খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলুম। বিবিদি তখন আসর জমিয়ে গল্প করছিলেন। আমার এক কলেজ জীবনের সতীর্থ ছিলেন তখন—বিবিদির সম্পর্কিত, গৌতম। অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে। আমরা একসঙ্গে বিদ্যাসাগর এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি যেতেই বিবিদি আসর ছেড়ে উঠে পড়লেন। আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন, অনেকক্ষণ গল্প করে ফিরেছিলুম বেশ রাত্রে, এখনো সেসব সুখস্মৃতি ভাবলে বড় কষ্ট হয়।

বিবিদির সঙ্গে আমার যেদিন শেষ দেখা তা যে অন্য একভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে মার্মান্তিক ভাবে, কে জানতো। সেই তারিখটি হয়তো ভুলে যেতাম। কিন্তু এমন একটি ঘটনা ঘটলো যে কোনদিনই বোধহয় তা ভুলতে পারবো না।' সেদিন ছিল ২৫শে জুন, ১৯৬০। তিন চারদিন শান্তিনিকেতনে যাবার পর ২৫শে জুন সকালবেলা বোলপুর স্টেশনে যাবার পথে বিবিদির বাড়ি রিক্সা থামিয়ে প্রণাম সেরে 'মুঠো মুঠো বাঙা জবার' মত আশীর্বাদ কুড়িয়ে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ধরতে ছুটলুম ফের রিক্সা নিয়ে। শান্তি-নিকেতনের মানুষদের আপার ইণ্ডিয়া-স্মৃতি মোহবার নয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেট করে বাড়িতে পৌঁছুলুম দুপুরবেলা। স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে রেডিও চালিয়ে একটু গড়িয়ে নেবো ভেবেছিলুম। হঠাৎ সংবাদের প্রথম কটি কথা শুনে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠলুম কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আকস্মিক রক্ত-ক্ষরণের ফলে কাল শেষ রাতে তাঁর কলকাতার রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে পরলোক গমন করেছেন, ইত্যাদি। শেষ অবধি শোনবার ধৈর্য ছিল না। এতো প্রচণ্ড আকস্মিকতার সঙ্গে শব্দ ক'টি আমাকে অভিভূত করেছিল যে কখন জামা গায়ে দিলুম, কোন বাস ধরলুম এসব কিছুই আর মনে ছিল না। মনে হচ্ছিল শুধু, ৮নং রাসেল স্ট্রীটের তিনতলার ঘরটি কি সাগরপারে।

অবশেষে পৌঁছলুম। সুধীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় কবি ছিলেন না যে হাজারে হাজারে লোক তাঁর বাড়িতে ভীড় করবে। কিন্তু যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই বাংলা দেশের শিল্পী কবি প্রাবন্ধিক সম্পাদক। শোকযাত্রায় বিজ্ঞানী সত্যেন বসু যেমন বিহ্বল ছিলেন, কবি বুদ্ধদেব বসুও তেমনি ছিলেন অসার নিস্পন্দ।

ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিসের অবনী চাটুজ্যে মহাশয় সুধীন্দ্রনাথের সুঠাম দেহের প'র আছড়ে পড়ে কী কান্নাই কেঁদেছিলেন দেখে আমাদের অনেকেরই অশ্রুসজল চোখ দুটি দিয়ে অবিরল ধারা নেমেছিল। সুধীন্দ্রনাথের অত বড় ভক্ত আমি এ পর্যন্ত আর কাউকে দেখি নি। রাজেশ্বরীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ছিলেন প্রতিভা বসু। শোকযাত্রাটি থিয়েটার রোডের একটি বাড়ির সামনে থামানো হয়েছিল। সে-দৃশ্যটি আরো গভীর শোকাবহ মনে হয়েছে আমার কাছে। সুধীন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী ছবি বসু বাড়ির দরজার কাছে এসে স্বামীকে বিদায় দিলেন। এ দৃশ্যের পাশাপাশি আর একটি দৃশ্য আমি দেখেছি তারও বেশ পরে, কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটের বৈদ্যুতিক চুল্লীর সংলগ্ন বাগানে। কথ'-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃতদেহ যখন চুল্লীতে, গৌরকিশোর আমাকে বললেন, দেখবে এসো এধারে। গৌরের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি অদূরে একাকিনী বেঞ্চের ওপরে বসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রমথা স্ত্রী। আমি তাঁকে পূর্বে কখনো দেখি নি, পরেও আর না। গৌরকিশোর তাঁকে কি করে চিনলেন তাও জানি না। তবে আমাদের বন্ধু গৌরকিশোরের পক্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রীকে সনাক্ত করা কঠিন কাজ নয়, এ আমার মত সবাই জানেন। সেই একাকিনী মহিলাকে কিন্তু সান্ত্বনা দেবার কেউ সেদিন ছিল না। তাঁর হৃদয়ের দুঃখটাও কি আইন-বিরুদ্ধ ছিল? কে জানে। ছবি বসুর, অর্থাৎ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলের দক্ষিণে ইটেল রঙের ভোসেদের বাড়ির মেয়ের ছবিটি আমার ভোলবার কথা নয় আরো একটি কারণে। সেবছর শীতকালে মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মেলায় কবিতা মেলার স্টল ছিল। কবি স্বদেশ দত্ত কবিতার বই, ম্যাগাজিন সব জড়ো করে স্টল সাজিয়েছিলেন। বীরেন্দ্র চাটুজ্যে মলয়শংকর দাশগুপ্ত শান্তি লাহিড়ী এবং আমি স্টল সাজিয়ে বসে থাকতুম রোজ—যদিও পুরো দায়দায়িত্ব ছিল স্বদেশরঞ্জনের। ইতিমধ্যে 'উত্তরস্মৃতি' পত্রিকার 'সুধীন্দ্র স্মরণ সংখ্যা' প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, স্টলে সেটা বেশ ভালোভাবেই সাজানো ছিল। আচমকা এক ভদ্রমহিলা ঢুকলেন স্টলে। 'উত্তরস্মৃতি'র সংখ্যাটি নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে জিজ্ঞেস করলেন, কত দাম? আমরা তো রীতিমত উৎফুল্ল হলাম,

যাক্ এতক্ষণ মাছি তাড়াবার পর একটি পত্রিকা বিক্রী হতে চলেছে। দাম বললাম সাগ্রহে, এক টাকা। স্বদেশের চোখ দুটি তখন জ্বলজ্বল করছে—তাহলে কবিতার স্টল দেওয়া সার্থক হয়েছে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। ভদ্রমহিলা বাইরে-দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে ডাকলেন। তিনি আসতেই আমি চমকে উঠিলাম, আরে সমর যে! আমরা একসঙ্গে দুবছর ইংরেজী ক্লাসে পড়েছি। 'তুমি'? আমার আচমকা প্রশ্ন, 'উনি আমার দিদি'—সমর শান্ত কণ্ঠে বললো।

এক নিমেষে আমার কাছে সমস্ত রহস্যের অবসান হল। ভদ্রমহিলা ছবি দত্ত, অথবা বসু অথবা ভোস। সমরের দিদি, সুধীন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী। সুধীন্দ্র-নাথের মৃত্যুদিনে তাঁকে দেখেছিলুম উন্মাদিনী বাই। আজ শান্ত স্তব্ধ বিষণ্ণ 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী' ছবি দত্তকে প্রথমে চিনতে পারি নি (বাংলাদেশের কবি-বন্ধু শামসুর রাহমান সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে এই নামেই একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন নিরঞ্জন হালদার-সম্পাদিত 'সুধীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে)। ঘুরতে ঘুরতে মেলায় 'উত্তরসূরি'র মলাটে লেখা 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে' কথা কটি দেখে কাঠের পুতুলির মতোই জড় বনে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েকটি মুহূর্ত। সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বিশ্বে শুধুমাত্র আমরা চারজনই ছিলাম। স্বদেশ তখনো পুরো বিষয়টি বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিল না। সম্বিৎ ফিরতে আমি বললুম, 'দিদি, আপনাকে দাম দিতে হবে না, এটি কবিদের উপহার আপনাকে।' বহু কথা কাটাকাটির পর আমরা দুজনে ওঁকে বইটি উপহার দিতে পেরেছিলুম। আমাদের সেদিন কোন কবিতার পত্রিকা বিক্রী হ'ল না। স্বদেশ কি আমার বদান্যতায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল? কিন্তু স্বদেশকে একথা মানতেই হবে, এমন মর্মান্তিক উপহার আর কেউ কোনদিন কাউকে দিতে পারে নি, যেমন আমি দিয়েছিলাম সেদিন ছবি দত্তকে।

'উত্তরসূরি' পত্রিকার যে 'সুধীন্দ্রনাথ স্মরণ সংখ্যা' নিয়ে এতক্ষণ একটি বিষণ্ণ নাটকের ভূমিকা রচনা করা হয়েছিল, তার থেকে মুখবন্ধ হিসেবে, আমি যে ছোট স্মৃতিচিত্রটি এঁকেছিলুম, তা এখানে নতুন করে নিবেদন করছি, বহু তরুণ কাব্য-রসিকের সুবিধের জন্য। এখন যেসব কবিদের বয়স কুড়ি থেকে তিরিশ, তাঁদের কাছে জীবনানন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথ রীতিমত 'মিথ'। অনেকটা তাঁদের জন্যই আমার এই উদ্ধৃতি, বয়স্কদের জন্য নয়। আমার রচনাটি ছিল এরূপ

"রাসেল ষ্ট্রীটের তিনতলায় দক্ষিণের বারান্দাতে আরাম করে বসে টার্কিশ সিগেরেটের টিন এগিয়ে নিয়ে বলতেন, ভালো আছেন তো। যে কোন অতিথি হোক প্রথমেই তার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা। তারপর আপনি যদি সাহিত্যিক হন, সম্প্রতি কি লিখছেন? এবং তারপর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে—সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রাচীন কলকাতার বিবরণ, ছোটবেলার ধ্রুপদ গানের আসর প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে আলোচনার মোড় ঘুরত। চা খাবার সময় শ্যামায়িজ্ বিড়াল দুটি চেয়ারের পাশে এসে বসত, শ্রীমতী দত্ত একটু একটু করে চা খাওয়াতেন (বেড়াল দুটো আর জীবিত নেই)। সূর্য অস্ত যেত, আলো জ্বলত, মনে হোত, এরকম গল্প চলুক আরো কিছুক্ষণ, আরো আরো। এখানে সময় নামক বস্তুটি অনুপস্থিত, অবশ্য কোথাও যদি পূর্ব-নির্দ্ধারিত নিমন্ত্রণ থাকতো, বলতে সংকোচ করতেন না, আমার কিন্তু ঠিক সাড়ে ছটায় বেরুতে হবে। অবশেষে যাবার সময় বলতেন, আবার আসবেন। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন মুখের দিকে চেয়ে শেষবার হাসতেন—সে হাসি আমাদের কারো ভুলবার কথা নয়।

"২৫শে জুন শনিবার ভোর রাতে মাথায় রক্তক্ষরণের ফলে সুধীন্দ্রনাথ মারা গেলেন।

"বাংলা সাহিত্যে চিন্তায় ও রচনারীতিতে বিশিষ্টতা সত্ত্বেও তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বেশী ছিল না, বিগত দশবছর তাঁকে নিয়ে সামান্যই আলোচনা হ'য়েছে, (চতুরঙ্গ, পূর্বাশা, পরিচয় কবিতা ও উত্তরসূরী পত্রিকা ছাড়া তাঁর সম্পর্কে পূর্ণাবয়ব প্রবন্ধ মনে পড়ছে না)

"এবং সে জন্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। সংখ্যায় স্বল্প হলেও যাঁরা তাঁর অনুরাগী ছিলেন তাঁদের আন্তরিকতা ও প্রীতিতে কোন খাদ ছিল না। নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের তরফে মহাজাতি সদনে বছরের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে পুরস্কার দেবার জন্য আমরা তাঁকে নিয়ে এসেছিলাম—সভা সমিতিতে আড়ষ্ট সুধীন্দ্রনাথ সেদিন সকৌতুকে অনেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন।

"বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে কবিতা পাঠের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সন্দেহ ছিল, তিনি অন্তত একটি কবিতার বইও এনেছেন কিনা (বলা বাহুল্য, আমরা পূর্বে জোগাড় করে রাখি নি); জিজ্ঞেস করতেই বললেন, সবগুলোই

এনেছি। তিন হাজার লোককে কবিতা পড়ে শোনালেন, কলকাতার সাহিত্য মহল জানলো, সাহেবপাড়ার বাসিন্দা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মাঠে ময়দানে আসেন, ভালবেসে ডাকলে, সে ভালবাসা শতগুণে ফিরিয়ে দেন। আমার মনে পড়ে না, কখনো কোন বিষয়ে আমাদের কোন প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়েছে।

"ব্যক্তিগতভাবে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ তেরো চৌদ্দ বছর পূর্বে, রাসেল ষ্ট্রীটের বাসায় এক সন্ধ্যেবেলা মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর স্ত্রী এলেন রায় এসেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি ও অরুণ সরকার দুজনে গিয়েছি। শুধু এটুকু মনে আছে এবং সে স্মৃতি যে কোন তরুণের কাছেই চির-স্মরণীয় যে আমরা ওদের সঙ্গে আলাপে অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলাম, মনে হয়েছিল, এই বারান্দাটিতে যখন খুশী আসা যেতে পারে, যে কোন বিষয় নিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে আলোচনা চলতে পারে এবং সর্বোপরি, নানা রকম বিরুদ্ধ উক্তি করলেও উদার হাসিতে ও উজ্জ্বল কৌতুকে কখনো রসহানি ঘটবে না। উত্তর-সূরীর প্রথম সংখ্যাতেই উনি দুটি কবিতা দিয়েছেন। একবছর পরে কাগজ বন্ধ হ'য়ে যায়, আবার দীর্ঘ দিন বাদে পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোর হলে সেবারও তিনি প্রথম কবিতা দিলেন, অর্থাৎ 'উত্তরসূরী সুধীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র উৎসাহে পুষ্ট নয়, তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় গৌরবান্বিত। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতেন। গোড়ার দিকে ছাপা ভালো নয় এমন অনুযোগ করেছেন। মাঝে মাঝে প্রবন্ধগুলিতে ভাষা ও চিন্তার দৈন্য নিয়ে আলোচনা করেছেন—প্রুফের ভুল সম্বন্ধে সজাগ হতে বলেছেন।

"কিন্তু আমার ও উত্তরসূরীর লেখকদের সবিশেষ পরিতৃপ্তির কারণ এই যে য়ুরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি ভূয়সী প্রসংসা করেছেন—বাংলা সাহিত্যের বর্তমান মান হিসেবে এই পত্রিকা উন্নত রুচির পরিচায়ক এমন মন্তব্য করেছেন। আমাদের কাছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছু নেই।

"শিবনারায়ণ রায়কে (প্রথম বৎসর শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রায় যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন) সুধীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক মতামত জানালে তিনি এমন মন্তব্য করেছিলেন যে, সুধীন্দ্রনাথকে আমরা পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে পেতে পারি কিনা। সময় সুযোগ মতো এ প্রস্তাব তাঁর কাছে তুলবো মনে করেছিলাম, সে সুযোগ আর আসে নি।

"বিগত ৪ঠা জুন সন্ধ্যেবেলা 'উত্তরস্বূরী' পত্রিকার তরফে তাঁর কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল রেনেশাঁস ক্লাবে, বাংলা দেশের তরুণ কবি, সমালোচক, অনুরাগী পাঠকে ঘরটি ভরে গিয়েছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা একাদিক্রমে কবিতা পড়লেন, সে সন্ধ্যাটি বাংলাদেশের তরুণ কবিদের কাছে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। যাবার সময় আবার শীতকালে আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সাহিত্য-সভায় সুধীন্দ্রনাথের সেই শেষ যোগদান। সুধীন্দ্রনাথের লেখা দিয়ে পত্রিকার শুরু এবং এখানকার সাহিত্য আসরেই তাঁর শেষ উপস্থিতি—এমন আশ্চর্য দুটি যোগাযোগের কথা মনে করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে পাই।

"বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অবদান অসামান্য এবং সে বিচার আজকেই করা সম্ভব নয়, কিন্তু দেশের সাহিত্যের মান উন্নয়নে ও কবি গঠনে সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার আবির্ভাব শুধু আকস্মিক নয়, অকল্পনীয়। 'উত্তরস্বূরী' সেই ধারারই চিহ্ন অনুসরণ করবে এবং সৎসাহিত্য ও সৃষ্টিশীল সমালোচনার আদর্শে আস্থা স্থাপন করবে—সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতির যোগ্য মর্যাদা এমনতর সাহিত্য প্রয়াসের মধ্য দিয়েই—অন্যত্র নয়। বর্তমান সংখ্যাটি তাঁর স্মৃতিতে নিবেদিত।

জুলাই, ১৯৬০ অ ভ"

১৯শে আগস্ট সেই বছর কলকাতার মহাজাতি সদনে সুধীন্দ্রনাথের স্মরণসভা করেছিলাম আমরা। অর্থাৎ তৎকালে তরুণ কবি, প্রাবন্ধিক বুদ্ধিজীবীদের পরিচালিত পত্র পত্রিকা এবং সংস্কৃতি সংস্থাগুলি। যে ছোট আমন্ত্রণ পত্রটি প্রচারিত হয়েছিল তাতে ব্যক্তিগত স্বাক্ষর দিয়েছিলেন যামিনী রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসু। সুধীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন শিল্পী সুনীলমাধব। স্বাক্ষরকারীরা সবাই সুধীন্দ্রনাথের পর পর আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমার খাতা থেকে এঁদের সবারই নাম কালোকালির টানে এক এক আঁচড়ে মুছে গেছে। মাত্র কদিন আগে সুনীলমাধব সেন তাঁর স্ত্রী অরুণা সেনকে হিন্দুস্থান পার্কের বাসায় একাকিনী রেখে চলে গেলেন। 'উত্তরস্বূরী'তে সুনীলমাধবের একাধিক ছবি প্রকাশিত হয়েছে—দুর্গার একটি অসাধারণ চিত্র তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন যা দু'বার শরৎ-

সংখ্যায় প্রকাশ করে আমরা ধন্য হয়েছি। সে কথা বরং আজ থাক। সুধীন্দ্রনাথের স্মরণ-সভায় অতুলচন্দ্র গুপ্তকে সভাপতি হিসেবে থাকার জন্য রাজী করান হযেছিল। কী আশ্চর্য, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষেব কাছাকাছি চারজন রবীন্দ্রভক্ত আগে পরে চলে গেলেন, ইন্দিরা দেবী, অতুল গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ এবং সুধীন্দ্রনাথ। এ এক আশ্চর্য ঘটনা! ইয়েটস্ এব বান্ধবী মাদাম ব্লাভাট্স্কী বেঁচে থাকলে এর একটা অলৌকিক কারণ বের কবতে পাবতেন হয়ত। নীলিমা সেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গেযেছিলেন। রাজেশ্বরী কিছুতেই সেই সভায এলেন না। আসা সম্ভবও ছিল না ঠিক সেই মুহূর্তে। যে কয়টি সংস্থা এবং পত্র-পত্রিকা এই সভাব আয়োজন কবেছিলেন তাবা ইণ্ডিযা বেনেশাঁস ইনস্টিট্যুট, সংস্কৃতি পরিষদ, ইণ্ডিয়ান কমিটি ফব কালচারাল ফ্রিডম, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, রবীন্দ্র মেলা, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, উত্তরসূরী, শতভিষা, কৃত্তিবাস, দর্পণ, কবিপত্র এবং ডি এম. লাইব্রেরী। সুধীন্দ্রনাথের লেখা বই চিঠিপত্র, যার বেশীব ভাগই পাওয়া গিযেছিল সুরজিৎ দাশগুপ্তেব কাছে, এবং কবিব বইগুলিব প্রথম সংস্করণের একটা প্রদর্শনী করা গিয়েছিল।

আমবা এই দীর্ঘ দীর্ঘ বছবে সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে আর কি কিছু করতে পেরেছি —মাঝে মধ্যে দু'একটি আলোচনা সভা ছাড়া। অবশ্য মৃত্যুর পর পর নানাভাবে তাঁকে স্মরণ করা হযেছে। সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে 'কবিতা' 'উত্তরসূরী' এবং 'The Radical Humanist' তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলো। কয়েকবছর আগে নিরঞ্জন হালদাব সুধীন্দ্রনাথ বিষযে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সম্পাদনা কবে বাঙ্গালী কবিদের কী যে উপকার কবেছেন। বুদ্ধদেব বসু'র একান্ত প্রচেষ্টায় সেই সংখ্যার 'কবিতা'টি এখনো আমাদের স্মরণে আসে। 'উত্তরসূরি'র বিশেষ সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথের ভাই হরীন্দ্র দত্তকে দিয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিযেছিলাম— সেটি এখন অনেকেরই কাজে লাগছে। পত্রিকাটিব লেখকসূচীতে ছিলেন ধূর্জটি-প্রসাদ, সঞ্জয ভট্টাচার্য, সুবজিৎ দাশগুপ্ত, বটকৃষ্ণ দাস, অরুণকুমাব সরকার, নির্মল মুখোপাধ্যায এবং অরুণ ভট্টাচার্য। বলা বাহুল্য, এঁরা সবাই সুধীন্দ্রনাথের বড় কাছাকাছি ছিলেন—ফলে বেশীব ভাগ লেখাতেই একটা আন্তরিকতার ছাপ ছিল —যা পড়লে এখনো একধরণের উজ্জ্বল বিষণ্ণতা আমাদের গ্রাস কবে। অন্নদাশঙ্কব রায় তাঁর সম্বন্ধে সেসময লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, রাজেশ্বরীকে (চিঠিটিও

উত্তরস্বরীতেই প্রকাশিত হযেছিল) "I regarded him as our greatest living poet Sudhindranath Datta was one of those poets who missed his due in life' অন্নদাশঙ্করেরর দুটি বক্তব্যই নিদারুণভাবে সত্য। কি জানি, আমার বরাবর মনে হ'ত, তাঁর জীবনের শেষ যে দশ বারো বছর আমরা কাছে এসেছিলাম, কবিতা বিষয়ে কোথায যেন তাঁর প্রচ্ছন্ন অভিমান ছিল। হবেও বা। বহু কষ্ট করে দুটি তালিকা আমবা কবতে পেবেছিলাম, তৎকালে প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথেব সমগ্র গ্রন্থপঞ্জী এবং 'পবিচয়' পত্রিকায প্রকাশিত তাঁব সমগ্র কবিতা, প্রবন্ধ এবং পুস্তক পরিচয।

সুধীন্দ্রনাথেব কবিতা এবং প্রবন্ধ বিষয়ে সাহিত্যপাঠক মাত্রই অবহিত আছেন। কিন্তু গ্রন্থ সমালোচনা তাঁর হাতে যে কী অসাধারণ ফুটে উঠতো তা না পডলে বিশ্বাস কবা যেত না। যাকে বলা যায় he set his own standard, আমার প্রায়ই মনে হয়েছে বাংলা সাহিত্যে এই একটি দিক সবচেয়ে অবজ্ঞাত। সুধীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সমালোচনা 'দি টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টের' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগুলির সঙ্গে সহজেই তুলনীয়। আর এ থেকেই জানা যাবে কত বিভিন্ন বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের ভালোবাসা ছিল। যেমন ধরা যাক ভার্জিনিয়া উলফ্, ফ্রাঁসোয়া মারিয়াক, হারমান ব্রক, পল মোরাও, আলডুস হাক্সলি, উইলিয়ম ফকনার ও লরেন্স এর বচনাবলী। উইগুহ্যাস লিউইস, ম্যাক্স ঈষ্টম্যান বা এজরা পাউণ্ড এর গ্রন্থও বাদ পডে নি। নন্দনতত্ত্বের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিচয় মিলবে আলেকজাণ্ডার এর 'Beauty and Other Forms of Value', আর্থার সিওয়েলএব ' The Physiology of Beauty' গ্রন্থ দুটিব সমালোচনায়। ফ্রয়েড এর 'Moses and Monotheism' গ্রন্থটির আলোচনায় তাঁর মনস্তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণেব পবিচয় পাওয়া যাবে। তালিকাটিতে রযেছে থিওডোর ড্রেসিয়ার বা জন ডস প্যাসস এব গ্রন্থও। বর্তমানে অতি পরিচিত অথচ সেকালে আনকোড়া কত বিদেশী লেখককেই যে বাংলা সাহিত্যে তিনি পরিচিত করিয়ে দিযেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্বসাহিত্য এবং দর্শনকে হীরেন দত্তর গ্রে ষ্ট্রীটের বাঙ্গালী আড্ডায় এনে ফেলেছেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের সুধী পাঠক সমাজে। এটি যে তাঁর কত বড় অবদান হাল-আমলের 'Comparative literature' এর ছাত্র অধ্যাপকগণ তা অবশ্যই

বুঝবেন। ঈষ্টম্যান এবং সিওয়েলের বই দুটির সমালোচনা 'উত্তরসূরি'র উক্ত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণ করেছি আমরা, এবং 'ফরাসী কথাসাহিত্য' বিষয়ে তাঁর অনবদ্য প্রবন্ধটিও। এসব কথা বললুম এজন্য যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ ছিল তা সচরাচর অন্য কবিদের মধ্যে দেখতে পাই নি। এটা ভালো মন্দর প্রশ্ন নয়—একজন কবিকে অন্যান্য কবিদের চেয়ে পৃথক করে বোঝবার জন্য, কোথায় তাঁর মানসিকতা পৃথক ছিল। আর একটি প্রসঙ্গে, তা বোঝা যাবে। আমাকে অনেক সময়েই বলেছেন, 'আপনারা যাই বলুন, খেয়াল ঠুংরীর চেয়ে এখনো ধ্রুপদের গাম্ভীর্য আমার মনকে টানে বেশী। ছোটবেলায় বেশ কিছু ধ্রুপদের আসরে যেতুম—ললিত বাবু এবং মহিমবাবুর গান শুনেছি।' কথাটি বলেই রাজেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে মজা করে হাসতেন—কারণ রাজেশ্বরী ঠুংরী গাইতেন—আমি ওঁর গুণগুণ করা কণ্ঠে বেশ কিছু ঠুংরী ওখানে বসে বসেই শুনেছি—আমাদের বন্ধু বিখ্যাত সারেঙ্গীয়া সগিরুদ্দিন ভাই নিয়মিত রাজেশ্বরীর সঙ্গে সঙ্গত করতেন। সুধীন্দ্রনাথের মত এমন একটি পরিশীলিত বিদগ্ধ রুচিবান মানুষটির মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসচেতনতা আমি দেখি নি, যখন হালফিলে কিছু কিছু কবিকে দেখি, দুচারটে কবিতা এদিক ওদিক প্রকাশিত হলেই তাঁদের মেজাজ সামলানো দায় হয়ে পড়ে। আমরা বোধহয় এই জিনিটি তাঁর কাছে শিখে নিতে পারি।

আর সুধীন্দ্র-সহধর্মিনী পঞ্চনদের কিশোরী রাজেশ্বরী, যিনি শেষ কটা বছর বিভ্রান্তের মতই আমেরিকা, প্যারিস এবং লণ্ডনে কাটিয়ে বোধহয় স্বামীর শ্মশানে শেষ শয্যা পাতবার জন্যই কলকাতা এলেন—তাঁর কথা কার বা মনে আছে, কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত-অনুরাগী ছাড়া। সুধীন্দ্রনাথ আমাকে কিন্তু একাধিকবার বলেছেন, 'রাজেশ্বরীকে দিয়ে আপনারা উত্তরসূরিতে ইট্যালিয়ান এবং স্প্যানিশ কবিতার তর্জমা করাতে পারেন—এ'দুটি ভাষা উনি যত্ন করে শিখছেন। দরকার হলে আমিও ওঁর কাছে দেখে নিই।' এখন অনুতাপ হয়। রাজেশ্বরীর বেশ কিছু চিঠি আমার কাছে ছিল, বিশেষ করে একটি প্যারিস থেকে লেখা—মিঞামল্লারের একটি গান চেয়েছিলেন। 'বরষণ লাগি রে বাদরিয়া শাওন কি' গানটি আমি স্বরলিপি করে তাঁকে পাঠিয়েছিলুম—উনি স্কুল অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ যখন ভারতীয় সঙ্গীত শেখাতেন তখন এসব গান কিছু কাজে লেগেছিল বোধহয়।

প্রচুর চা কফি এবং ভালোবাসার ঋণ কি মিঞামল্লারে ত্রিতালের এই সুন্দর বন্দিশ্ দিয়ে শোধ করেছিলুম। যেদিন রাজেশ্বরী হঠাৎ সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন সেদিনই বিকেলে রবীন্দ্রসদনে আমাদেব একটি গানেব অনুষ্ঠান ছিল—শৈলজাদা সভাপতি। শৈলজাদা শিখিয়েছিলেন এবং গানগুলি আমি পরিচালনা কবেছিলুম। রাজেশ্বরীই দু'খানি একক গান গাইবেন ক'দিন আগে তাঁকে বলে ঠিক করে রেখেছিলুম। বাজেশ্বরী হঠাৎ ক'দিনের জন্য কাশী গিয়েছিলেন, ফিরে এসে আকস্মিকভাবেই বিশপ লেফ্রয় রোডে, তাঁর দেওরের বাড়িতে, মারা যান। আমাদের অবশ্য অনুষ্ঠান বন্ধ হল না। শৈলজাদা সহজে ভাঙেন না, মচ্কালেও। কিন্তু সেদিন বললেন, চোখের জল মুছতে মুছতে, রবীন্দ্রসদনের স্টেজে, 'রাজেশ নেই—আজ কেমন করে গান হবে।'

গান কিন্তু হোল। রবীন্দ্রসদনেই, এবং রাজেশের সুন্দর দেহবল্লরী যখন শ্মশানে—স্বামীর কাছাকাছি। রাজেশ কবিতা লিখতেন না, গান গাইতেন, কিন্তু প্রচুর কবিতা পড়তেন একথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিখে 'এ পরবাসে রবে কে হায়' তান বিস্তার করে গাইলে আমরা শৈলজাদাকে মজা করে বলতুম—'এরকম খেয়ালভঙ্গিম স্বাধীন বিস্তার রাজেশ্বরী করছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে—আপনি কিছু বলছেন না কেন?' শৈলজাদা বলতেন, 'রাজেশের সাত খুন মাপ'। রাজেশ যে রাজেশ্বরী—তাঁর সাত খুন মাপ তো হবেই।

অমন স্নিগ্ধ কবিতা-প্রেমিক সংগীতশিল্পী, যিনি সুদূর পাঞ্জাব থেকে এসে বাংলাদেশকে, বাংলা সংস্কৃতিকে নিজের করে নিয়েছিলেন, তাকে আমরা কিছু কি দিয়েছি, একধরণের ঔদাসীন্য-মিশ্রিত নিদারুণ অবহেলা ছাড়া।

নতুন কবিতা

[বাংলা আধুনিক কবিতার জগতে সবচেয়ে বড় এবং নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে 'উত্তরসূরি'র পৃষ্ঠায়। গ্রাম বাংলার এবং কলকাতার, শহরতলীর, এমন কি দুই বাংলার অজস্র অসংখ্য 'লিটল ম্যাগাজিন' থেকে অতি যত্নে কবিতা উদ্ধার করে সম্পাদক প্রমাণ করেছেন কত ভালো কবিতা অনাদরে অবহেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। বাংলা কবিতার ইতিহাস যেদিন সঠিক লেখা হবে তখন এই নিঃশব্দ বিপ্লব একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে থাকবে।]

ভাস্কর মিত্র

স্বর্গসন্ধান

ডাকহরকরার ঘুঙুরবোলে এই স্বপ্ন ভেঙে যায়,
শাদা-কালো তারা ফুটে থাকে ভিখারি সাহেব (ভিকার অব
বহরমপুর) তার বাগানের দিকে পদচারণার লাঠি নিয়ে
বেরিয়ে আসেন স্বর্গ থেকে। শাদা শাদা রাশি রাশি
ফুলের বাগানে, যেখানে বালিকা, বালকেরা
খেলছে ফুলের হোলি লৌকিক আড়ালে, অনাবৃত,
এতদিন তবে কোথায় ছিলাম? জেলের কোকিল?

কত নগর আর রাজভবনের পাশে পাশে কত ভ্রমের
অনুসন্ধান, যেন অণুবীক্ষণের তলে ফুলের কঙ্কাল,
কীট ও পরাগরেণু সবই ছিল, ছিল না শুধু মাত্রা,
আত্মার গান, ভিখারির মত ঘুমক্লান্ত নগরে আমার আত্মিক
বাঁশি, তবু এ ধূম্রঘুম ভ্রমণের সবটুকু কেন ভুল হবে?

যেন তাই আজ এই ভোরে ঘুম ভেঙে যায় . মেঘ ফাটা
আলো অন্ধারে শিউলি ও জুঁই সারি স্বর্গীয় বীথির
চারপাশে। লাল পলাশের গাছে পুরোনো হৃদের মতো
রক্ত ফুসফুস সেই বালকেব : তার পুনরুত্থান সে যে স্কুলে
যেতে চায , ডাকহরকরার ঘুঙুরবোল এই স্বপ্নে সারারাত ছিল
কোন্ পথে ফিরে আসে সে নিরন্ন উজ্জ্বল উপগ্রহ, সে যাবে কোনো দিকে

অক্ষক্রীড়া। C/o শ্রীদুর্গা প্রেস পো: গরিফা ২৪ পরগণা

করুণা সেন

নদী

আস্থা রাখো সম্ভব হবে নদী মোহানার কাছে
পায়েব আলতা ধুয়ে শ্বেতহাঁস, পড়ন্ত বেলায়
হামাগুড়ি দিতে দিতে ধবল বালুচরে
ডানা ঝাড়ে অপরূপ জলের আয়নায়
মুখে তার গাছগাছালির ছায়া, চোখে নীল মহিষেব মগ্ন অনুভূতি
ঝাউবন খুবলিয়ে অসহিষ্ণু হাওয়ায় দুরন্ত জল মোরগ লাফ দেয়
নদীতে জোয়ার আসে, পা ছড়িয়ে শঙ্খ, ঝিনুক নুড়ি হাঁটে
জলোচ্ছ্বাসে মাটির ঢাল বেয়ে ফেটে পড়ে নদী
ওহে, নদীকে কেউ বিশ্বাস করে নি কোনদিন
দেবতার উপাসনা ধ্রুবের বুকের মধ্যে অরুন্ধতী নদী
এরা স্বাতী নক্ষত্রের জল নয়,
কে বলেছে ধ্রুপদ নদীর মধ্যে নদী?

লুব্ধক। উদয়পুর, ত্রিপুরা। বাঁকুড়া। ৭২২ ১৫৩

নাসের হোসেন

যেখানেই যাও

যেখানেই যাও আমার এই হাত তোমার কাছে দীর্ঘ হয়ে আছে
সমস্ত করুণা হয়ে ঝরে যাচ্ছে চতুর্দিকে বৃক্ষের পাতা, আর
ভীষণ আক্রোশ। যেখানেই যাও তোমার জন্য রেখে এসেছি
সভ্যতার ঘ্রাণ, তুমি ইচ্ছে করলেই যেন তা পেতে পারো—
কিংবা এই পায়ের নীচের শূন্যতার আলো, ভয়, বিমূঢ় বিস্ময়
আমি কি কোনদিন ফিরে পাবো সেই হারানো শৈশব।
অসংখ্য মৃত্যু দেখি চতুর্দিকে, বিশ্বাস চুরমার, তবু তো
ধ্বংসস্তূপ থেকে ওঠে গাছ, বৃক্ষের পাতা
আমি বুকের ভিতরে রেখেছি একটি থাবা, মুখহীন—
প্রতিদিন রোদ্দুর এসে খেলা করে যায় শরীরের ওপর

স্বয়ম্বর। C/o সমীরণ ঘোষ, শুভ চট্টোপাধ্যায়। ৩ ড্যানিয়েলস্ লেন, বহরমপুর। ৭৪২১০১

দেবাশিস চৌধুরী

প্রভু তুমি

প্রভু তুমি আমাকে দিলে
ভোরবেলার নিমের দাঁতন
আর রাতের একটা খড়কে কাঠি।
আমার সারা শরীরে
হরেক রঙের ছয়লাপ
মুখের ভেতর
দাঁতের ফাঁকে
কাগজ কুচি তুলির লোম

যত দিয়েছিলে তোমাকে আঁকতে
যেন এক দৃঢ়চেতা খুশী লোক
যার ইচ্ছে সব্বাইকে
তোমার সুদীর্ঘ হাতে
"প্রভু তুমি আমাকে দিলে
ভোরবেলার নিমের দাঁতন
আর রাতের
একটা শড়কে কাঠি।"

অব্যয়। C/o অতীন্দ্রিয় পাঠক। ২এ, খেলাত বাবু লেন, কলকাতা ২

অনুপ মুখোপাধ্যায়

পাগল

আলোয় তাকে বড় একটা দেখা যায় না
অন্ধকার কোণ, ঘুপচি, তার খুব পছন্দ
আলোর দিকে খোলা পেছন দিক
উপুড় করে যে একজন একলা শুয়ে থাকে
লোকেরা তাকে, 'পাগল', ব'লে ডাকে

ভর' চামড়া চিট ময়লা গা'য়
চুল নেমেছে কান ছাপিয়ে, উকুন ঘোরে তাতে
ঘা ফেটে তার পুঁজ-রক্ত গড়ায় চুপচাপ
মাছি বসলে তাড়ায় না সে একটু হাত নেড়ে
'ধুর্ পাগল।'—লোকেরা তাকে এইরকমই বলে

জিভ নেড়ে সে কথা বলে না বেশী
মাঝে মধ্যে, গলার শিরা ছিঁড়ে, চল্‌কে
শব্দ উঠে আসে—না, ঠিক শব্দও না
শব্দাংশ, আদিম জান্তব
ভাঙা, জটিল, ঠাণ্ডা বিকৃত

অন্ধকারে পথ চলতে হঠাৎ কানে বাজে যখন
কুঁকড়ে থেকে লাফিয়ে পড়া, ছেঁড়া শব্দ, তীব্র
আমার সারা পায়ে মাথায়
কি যেন এক, শ্বাসবোদ্ধা
না জানা ভয় শিব্‌শিবিয়ে ওঠে

কিসের ভয়? পাগ্‌লাকে কি
পোষাকহীন তার নগ্ন, তার শব্দ
আমাকে খুব লজ্জা দেয় কি
আমি কিছুই বুঝতে পারি না
এমনি করে দিন চলে যায়, এম্নি ভাবে রাত

আর একজন একলাতম ক্রমিক বসে থাকে
লোকেরা তাকে, 'পাগল' ব'লে ডাকে

অক্ষক্রীড়া। C/o শ্রীদুর্গা প্রেস, পো. গরিফা, ২৪ পরগণা

নির্মল হালদার

হাড়ে হাড়ে

হাড়ে দুর্ব্বাঘাস গজালে মানুষ কী থাকে আর
আজ চারপাশে কোনো মানুষ নেই, মানুষের হাড়ে হাড়ে
দুর্ব্বা ঘাস
ঘাসগুলি চিবিয়ে খাবে ছাগল, গরুর পাল
গোপাল গরুর পাল নিয়ে মানুষের দিকেই এগিয়ে আসছে
মানুষের হাড়ে হাড়ে দুর্ব্বা ঘাস
ঘাসগুলি চিবিয়ে খাবে ছাগল, গরুর পাল
গোপাল গরুর পাল নিয়ে মাঠে কেন যাবে, মাঠের চেয়ে
ঘাসের ফলন বেশী মানুষের হাড়ে

রোবট। C/o জীবতোষ দাস, ব্যাঙচাতরা রোড কোচবিহার ৭৩৬ ১০১

সনৎ দাশ

জল ও রোদ্দুরের মতো

বহুদূর পাথরের খোঁজে
যেতে পারে জল:
রোদ্দুর পারে না,
ফসলের খেত থেকে সুখ তুলে নিতে জানে রোদ
এই সুখ জলেরা চেনে না ।
মানুষ জলের মতো যেতে পারে দূর
অন্ধকার হৃদয়ের নীচে,
মানুষ রোদের মতো হলুদ সুখের জন্য
কখনো বা দিতে পারে।

সাহিত্যকল্প। C/o অসিতবরণ হালদার, সিনপাড়া, পোঃ বসিরহাট- জেলা : ২৪ পরগণা

কর্তিক ঘোষ

সভ্যতা

দরোজায় তালাচাবি, ভিতবে থুরথুরে অন্ধকার
এখন আর ঘরেটরে ঢুকো না।
সাবা আবাদ রক্তহীনতায় ভুগছে,
চলো বেড়িয়ে পড়ি।
যেতে যেতে দেখতে থাকো
সভ্যতা, আলো, সম্পদ কীভাবে
সিঁড়ি বেয়ে
স্কাইস্ক্রাপাবেব মাথায় উঠে গেল
আরো ত্যাখো :
সারা উঠোন আর চল্লিশ বর্গমিটাব ঘবেও
পাচিল দিয়ে
রাতারাতি এই সভ্যতা কীভাবে
মানুষের পোষাক বদলাচ্ছে অনবরত।

স্ফুলিঙ্গ। C/o প্রণব মাণিক্য L I C House, বসিরহাট, ২৪ পরগণা

মূরলী দে

দীপকেব কথা

আজ আমাব মনে পডছে দীপকের কথা
সে এখন কী করছে জানি না
গতকাল বলেছিল আমাদের ওদিকে কী ভীষণ বৃষ্টি ..
আমি, প্রকাশ এবং অন্তবা চৌধুরী
বটেব শীতল ছায়ার দিকে হাঁটছি।
ওদিকে নিমগাছেব ডালে বসে
গান গাইছে পাখি, দুঃখের গান

রাণীদির শাঁখা ভাঙার মতোন বড় দুঃসময় তার ··
আমি এবং প্রকাশ চৌধুরী হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি
দীপকের কথা, গতকাল বৃষ্টির কথা ·

ঘাস মাটি। C/o মুরলী দে ঠাকুরপুর বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া

সুবমল দাশ

জানালায় ঝুলে থাকে অমলের সকাল

শানিত সকাল ওই মরালীর মত ডানা মেলে উড়ে যায়
ঘোড়ার খুরের শব্দে কাছে পিঠে ঘুরে আসে
বিক্ষিপ্ত ঘরবাড়ী, আলস্য মথিত সূর্য
অমলের জানালা তাই ঝুলে থাকে ভোরবেলাকার দিকে
পাখী চায়, শ্যামলী নদী চায়, পাঁচমুড়ো পাহাড়ের
সোনালী সূর্যোদয়
ভালবাসার গোপন ব্যাধি শুভ্র আলোয় স্নাত হয়ে
ছুটে যায় সুজাতার কাছে
আঁখি চায়, ওষ্ঠ চায়, আশীর্বাদের রুপোলী আচড়
বাদামী পাতায় ঘ্রাণ, মায়াবী পালক ফেলে
সাথী করে দুঃখের আলিঙ্গনে।
তখনই পথিক তুমি পথ থেকে পথে ঘোরো
দুরন্ত দুঃখের খোঁজে
রোদ— ভাঙা দুপুরের মত উদাস করো রাজপথের প্রশ্নাবলী
প্রিয়তমার অনুচ্চারিত গান নাবিককে দিকভ্রান্ত করে
সোনালী দ্বীপের সেই রাজকন্যের গল্প
সুখের তকমা এঁটে ঝুলে থাকে নাবিকের বুকে
সুজাতার চুলে মুখ রেখে ভেঙে যায় অমলের অভুক্ত স্বপ্ন।

ক্রবাদুর। C/o জয়দেব বসু, ফেজ II, ২৯এ, কাটওয়ারিয়া সরাই, নতুন দিল্লী ১১০ ০২৯

তৃপ্তি সান্ত্রা

পাড়ি

১০৮টা নীল পদ্মের জন্য চল্ একবার আঁতিপাতি নদীনালা খুঁজে আসি
তোর কাপড়ে শিউলির রঙলাগা। রিখিয়া, রাত ভোর তুই আগমনী
গান গাবি বাসন্তী রঙ হয়ে। সোনালী স্বর্ণে সুবাসিত তেলের
কুসুম কুসুম গন্ধ আর সব শিশুদের মোমবাতি শরীর—
সুবাস এবং গাণ্ডীব বহনের জন্য যুবকদের অ্যাকিলিস্ শরীর চাই।
অযথা পৃথিবীর মূর্খ উচ্ছাস বন্ধ হোক্—কিছু ধ্রুপদী সুর আমাদের
কানের লতির পাশে এবং
বুদ্ধদেব আজানুলম্বিত বাহু আশীর্ব্বাদের জন্য প্রস্তুত
আগ্রাসী চুম্বনে সূর্য মুছে নেবে নারীদের সাটিন-গ্লো গণ্ডদেশ।
সোঁদা মাটির গন্ধ আঁচলে বেঁধে ফুলেশ্বরীর মজা বুকে তুফান তুলে চল্
এবার বেড়িয়ে পরি আনন্দময়ীর খোঁজে—
খুউব সহজ কিছু কবিতার আল্পনা, ধূপের মত নারী অথবা
কিশোর কল্মীলতার স্বপ্নের জন্য॥

সময়ের স্বরলিপি। C/o অশোক সেন, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, মালদহ

জীবনানন্দের আকাশলীনা

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের প্রথমতম কবিতা এই 'আকাশলীনা'।[১] 'আকাশলীনা'র নায়িকা সুরঞ্জনা। জীবনানন্দের কাব্যে সুরঞ্জনার সাক্ষাৎ আমরা এর আগে আর একবার পেয়েছি 'বনলতা সেন' গ্রন্থে, সেখানে প্রকৃতি পৃথিবীর প্রশান্তির ব্যাপ্ত পটভূমিকায় আবহমান এক নারীপ্রতিমায় কবি আভাসিত করেছিলেন মানব হৃদয়ের দুর্মর প্রেম যা সভ্যতা থেকে নব সভ্যতার যাত্রায় অন্বেষার ক্লান্তি আর সংগ্রামের ঊর্ধ্বে স্থিত এক চিরকালীন অস্মিষ্ট। আদিম দেহলালসা থেকে উত্তরিত হয়ে 'সুরঞ্জনা' তাই ভোরের "কল্লোল" হয়ে আজও রয়ে গেছে মানুষের হৃদয়ে।

'আকাশলীনা' কবিতাটি প্রথম পাঠে আমাদের চমকিত করে তার বক্তব্যের আপাতদুর্বোধ্যতায়, শব্দের বিস্ময় বিন্যাসে। তবু আমরা বলবো জীবনানন্দের কবিতায় এর আগে যে 'সুরঞ্জনা'কে আমরা পেয়েছি, যিনি প্রতীকের অন্তরালবর্তিনী হয়েও অভ্রান্তভাবে প্রেমেরই প্রতিমা, সেই সনাতন, পরমাগতি

১ 'কবিতা' পত্রিকার ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ভিন্ন নামে, ভিন্ন সম্বোধনেও বটে। 'ও হৈমন্তিকা'। এই শিরোনামায় তখন কবিতাটির আদি পঙক্তির রূপ ছিল "হৈমন্তিকা অইখানে যেয়ো নাকো তুমি।" 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে কবিতাটির অন্তর্ভুক্তি ও প্রকাশের কালে কবির প্রখর অভিভাবকতায় তার যে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত রূপ দেওয়া হয়েছিলো, সেটি আমার বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতার নায়িকা ছিলেন আদিতে 'হৈমন্তিকা', পরে কবি সেখানে নিয়ে এলেন সুরঞ্জনাকে'। অনুরূপভাবে কবিতার নামেরও পরিবর্তন হ'ল। এ কবিতার নায়িকার ভূমিকায় 'সুরঞ্জনা'কে স্থাপনা কবির দ্বিতীয় অন্তপ্রেরণার ফল বলেই সচেতনভাবে একটি প্রতীকী তাৎপর্যে তিনি কবিতাটিকে অভিষিক্ত করেছেন বলেই মনে হয়। 'ও হৈমন্তিকা'র মত একটি সাধারণ সম্বোধনমূলক নামকরণ যখন 'আকাশলীনা'য় পরিবর্তিত হয় তখনও অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে এমন একটি ব্যঞ্জনা যাকে কবির দিক থেকে একটি সচেতন প্রতীকায়নের প্রয়াস বলে মনে হয়।

প্রেমকেই কবি আর একবার আহ্বান জানালেন এই সাতটি তারার তিমির এর সমাচ্ছন্ন আঁধারের জগতে যেখানে 'অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে বারেবারে' মানবহৃদয় জেগে উঠছে এক নিরর্থক কালিমায়, এক প্রগাঢ় তামসী অস্তিত্বের হৃদয়বিহীনভাবে পরিব্যাপ্ত ইতিহাসে'। আমার কাছে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে 'সাতটি তারার তিমির'-এর মত কাব্যগ্রন্থে যেখানে যা কিছু ধ্রুব যা কিছু সুন্দর তাই এক নিদারুণ নিরর্থকতায় এক দিশাহীনতায় পর্যবসিত, সেখানেই তিনি 'সুরঞ্জনা' তথা প্রেমকে আহ্বান জানিয়েছেন এক নবীনতর হৃদয় অধিষ্ঠানে। অ-বিশ্ব মূল্যবোধের বিপর্যয় ও বিনষ্টিতে যুগচিহ্নিত, ভ্রষ্ট অন্বেষার তিমির অবলীন সংগ্রামের যে যন্ত্রণা ও নিরর্থকতার কাহিনী 'সাতটি তারার তিমির'এর কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে তারই তামসী পটভূমিকায় কবি যেন 'সুরঞ্জনা' তথা প্রেমকে আহ্বান জানালেন এক নবীন পৃথিবীর স্বপ্নের প্রয়াসে, এ গ্রন্থের আদিত্য কবিতায়।

এ কবিতার 'আকাশলীনা' নামটিও অর্থবহ। 'সুরঞ্জনা'কে যদি আমরা জীবনানন্দের কবিতার পূর্বাপর বিচারে, প্রতীকের অন্তরাস্থিত ব্যঞ্জনায় 'প্রেম' বলে গ্রহণ করি, তাহলে তাঁর 'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'সুরঞ্জনা' কবিতাটির মত এখানেও মানবের শাশ্বত প্রেমচেতনা কি মূল্যবোধ একটি নারী প্রতিমার রূপকে বিধৃত হয় নি। কিন্তু মানবহৃদয়ের সেই দুর্মর প্রেম, সেই শাশ্বতী শক্তিকে এখানে, এ কবিতায়, তিনি দেখছেন 'আকাশলীনা' রূপে, এই আকাশলীনতার চিত্রকল্পে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে আর একটি ছবি, আর একটি ভাব মানবহৃদয় থেকে বহুদূরে নির্বাসিত নাকি অপসৃত এই প্রেম। আবার যখন মনে রাখি, এ গ্রন্থের নাম 'সাতটি তারার তিমির', আর এর অন্তর্গত বহু কবিতার বহু চিত্রকল্পই তুলে ধরেছে এক ব্যাপ্ত সমাচ্ছন্ন তমসার বিস্তার যেখানে এমন কি শাশ্বত মূল্যবোধগুলিও পথনির্দেশে ব্যর্থ, তখন 'সুরঞ্জনা'র রূপকে বিধৃত মানবহৃদয়ের চিরকালীন অভীপ্সার বস্তু প্রেমকে কবি স্থাপন করেছেন এই তিমির পটভূমিতে যেন গাঢ় আঁধারের বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তিতে বহুদূরস্থ নীলিমা অবলীন এক অপ্রাপ্য এই সুরঞ্জনা। সেই সুদূর নারীকে কবি আহ্বান জানালেন এমন এক নবীন অধিষ্ঠানে যা প্রসিদ্ধ প্রথাসিদ্ধ নয় বলেই আমাদের চমকিত করে, উজ্জীবিত করে নতুন তাৎপর্যে।

প্রথম স্তবকে দেখি কবি স্থরঞ্জনাকে সম্বোধন করে নিষেধ জানাচ্ছেন যুবকের সঙ্গে যেতে, পরিবর্তে রয়েছে প্রত্যাবর্তনের নৈসর্গিক পটভূমি—নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাত, মাঠের ঢেউ থেকে একেবারে অন্তরলোক (হৃদয়ে আমার)। ঠিক এর বিপরীতেই রাখা হয়েছে এক আর্ত আবেদন 'দূর থেকে দূরে—আরো দূরে। যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর'। কোনও যুবকের বাহুলগ্না এক অপসৃয়মানার চিত্রকল্পে এখানে আমরা 'সুরঞ্জনা'র সাক্ষাৎ পাই, 'সুরঞ্জনা' তথা প্রেমের। আমরা ফিরে যেতে পারি 'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'সুরঞ্জনা' কবিতার শেষ স্তবকে যেখানে কবি তাকে জেনেছেন দেহোত্তর এক প্রেমের উজ্জ্বল স্বরূপ 'দেহ দিয়ে ভালোবেসে আজ তবু ভোরের কল্লোল'। সেই বিশ্বাসে লালিত থেকে আজ এই বিশ শতকের কবি যখন তাকে দেখেন বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধের বিপর্যয়ে[২] এক আগ্রাসী বিনষ্টির তিমিরে আবার ফিরে যেতে, দেহবাদে নয়, দেহসর্বস্বতায়, যেন তার মৃদু অথচ আর্ত নিষেধ:

সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে,

ভদ্র, মৃদু তবু আর্ত এই অনুনয়, বেদনার গভীর যন্ত্রণায় সংযত যেন স্থিতধী প্রেমিকের প্রাজ্ঞ নিবেদন। যুবক এখানে দেহসর্বস্ব অস্তিত্বের প্রতীক হয়ে উপস্থিত চতুষ্কটির শেষ দুই চরণে। ছিলো যে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান তাই নিসর্গ থেকে ধ্বনিত অনুরণিত হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় স্তবকে

২ অনুরূপ এক বিপর্যয়ে প্রেমের · · ·র এক নিদারুণ চিত্র তিনি এঁকেছেন 'সোনালি সিংহের গল্প' কবিতাটিতে

"আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মত বিচক্ষণ,
যে কোনো রাজার কাছে উৎসাহিত নাগরের তরে,
পৃথিবীর বারগৃহ ঘরে তারা উঠে যেতে চায়"

উদাহরণ সহজেই বাড়ানো যায় সংক্ষেপ তবু আমাদের একটি বক্তব্যের দিকেই ধাবিত করে

ফিরে এসো সুরঞ্জনা,
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে,
ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে,
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার,
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

'সুরঞ্জনা' তথা প্রেমকে কবি ডেকে আনছেন নক্ষত্রের আকাশ থেকে নিসর্গে, মাঠের তরঙ্গ থেকে হৃদয়ের নিহিত গভীরে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায় থেকে বনলতা সেন' পর্যন্ত যে পরিব্যাপ্ত নির্জনতা ও প্রশান্তির নৈসর্গিক জগতে জীবনানন্দের বিচরণ স্বচ্ছন্দ ছিলো সেখানে নক্ষত্রের আকাশ বারেবারে উপস্থিত হয়েছে এক অপরা সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনায়, এমন এক স্থির তর রূপের প্রতীকে যার বিকল্পে জীবনানন্দ বারেবারেই রেখেছেন শিশুর মতন চাঁদ। চাঁদ' বা পরিবর্তনের, এক চঞ্চল নশ্বরতার দ্যোতক। তাই, 'নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাত' এমন এক রাত্রির ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে যা 'সাতটি তারার তিমিরে'র নিবদ্ধ আঁধারের রাত্রি থেকে ভিন্ন। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে এই গ্রন্থেরই আর একটি কবিতায় মকরস ক্রান্তির রাত্রির বোধন,

মকরসংক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন।
তবুও তা পৃথিবীর নয়,
এখন গভীর রাত হে কালপুরুষ
তবু পৃথিবীর মনে হয়।[৩]

এই রকম এবং অনুরূপ সব চিত্রকল্পের কথা মনে রেখে আমরা বুঝে নিতে

---

৩ এই আশ্চর্য পঙ্‌ক্তিগুলির কোনো ব্যাখ্যার পরিসর বা অবকাশ কোনটাই এখানে নেই। যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের অনুবোধ করি 'এক্ষণ', পত্রিকার ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের উপর আলোচনাটি। সেই প্রবন্ধে আমি এই নিতান্ত স্বল্পালোচিত, দুরূহ কিংবা 'বিমূঢ়' বলে এড়িয়ে যাওয়া কবির এই পরিণত কাব্যপ্রয়াসটির আলোচনা প্রসঙ্গে 'সাতটি তারার তিমির'-এর মূল চিত্রকল্পগুলির একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

চাই নক্ষত্রের রূপালি অগ্নিময় রাত্রির কথা। 'সাতটি তারার তিমির'-এর কালিমা অবলীন ভ্রান্তির রাত্রি থেকে এক নবীন দ্যুতিময় নক্ষত্রালোকিত রাত্রিতে 'সুরঞ্জনা'কে আহ্বান। আবার, নক্ষত্র জীবনানন্দের কবিতায় প্রায়শই চিরন্তনের ব্যঞ্জনাবাহী। ভ্রান্ত দিশাহীন মানবের প্রেমে হৃদয় উদ্বোধনের এইতো সুসময়। এবং তারপরে, নিসর্গ পরিক্রমার পথ ধরে 'সুরঞ্জনা' প্রত্যাবর্তিত হবেন হৃদয়ে যেখানে তার স্বধর্মনিষ্ঠ অধিষ্ঠান নিতান্ত।

স্বাভাবিক। 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে জীবনানন্দ প্রেমকে স্থাপন করেছেন নিসর্গের প্রশান্তির পটভূমিতে। তবু শেষ পর্যন্ত সেখানেও আছে 'সব পাখি, সব নদী' ঘরে আসার পরে 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। কেননা, নির্বিকল্প হৃদয়ই তো প্রেমের চিরকালীন আধার, উৎস কি আশ্রয়। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের এই প্রথমতম কবিতাটিরেও সেই হৃদয় অধিষ্ঠানের আহ্বান। শুধু আরও গভীর ব্যাপক যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে হয়ে, অভিজ্ঞায় সাবিত হতে হতে মানব প্রতিভূ কবি এখন আরও বড় আরও গাঢ় প্রত্যয়ে উত্তরিত, তাই অনাবশ্যক আবেগে তার কণ্ঠ অকম্পিত। 'সাতটি তারার তিমির'-এর অন্যান্য কবিতার পাশাপাশি যখন এ কবিতাটি রাখি, তখন এই প্রত্যাবর্তনের আহ্বান, হৃদয় অধিষ্ঠানের নাটক কী গভীর তাৎপর্যেই না বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। তিমির বিলাসী বিশ্বাসহীন বিশ শতকের এই পৃথিবীতে কবি যেন প্রেমকে আবার আহ্বান জানাচ্ছেন মানবহৃদয় উদ্বোধনের সনাতন দায়িত্বে। সভ্যতার সমস্ত জ্ঞান ও সঙ্কল্পের আয়োজন অতিক্রম করে প্রেমই পৃথিবীতে রয়ে গেছে মানব অস্তিত্বকে এক দুর্লভ মহিমা দিতে। মানুষের সমস্ত অন্বেষা ও অগ্রস্থতির ইতিহাসের পিছনে রয়েছে এই দুর্মর প্রেমেরই অবিনাশী প্রেরণা

তবুও কারুকে আমি পারি নি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো, মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

(সুরঞ্জনা : বনলতা সেন)

'আকাশলীনা'র তৃতীয় স্তবকে প্রচ্ছন্ন প্রায় অনুরূপ একটি বচন, কিছুটা নবীন অভিজ্ঞতায় জারিত, বিবর্তিত.

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে !

'আকাশের আড়ালে আকাশে

মৃত্তিকার মতো তুমি আজ

তাঁর প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সেই মৃদু আর্ত ভদ্র অথচ ব্যাহত নিষেধের বাণী প্রথম পঙক্তিটিতে আবার অনুরণিত যুবকের সাথে অত ঘনিষ্ঠ আলাপের কি বা প্রয়োজন ? অর্থাৎ দেহসর্বস্বতায় তুমি, প্রেম, কেন আজ এমন অবলীন কেন এই অন্ধ দেহী জিজীবিষা ? 'সুরঞ্জনা' কবিতায় সুরঞ্জনা ছিলেন পৃথিবীর বয়সিনী মেয়ের মতন। 'আকাশলীনা'র নায়িকা সেই 'সুরঞ্জনা'ই—কিন্তু, এখানে কবি তাকে আহ্বান জানিয়েছেন এক নতুন পৃথিবীর উদ্বোধনে। সভ্যতার জয়যাত্রার ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন নায়িকাই পারেন এক তামসী অস্তিত্বের গ্লানি থেকে তাঁকে তথা মানবকে উদ্বোধিত, নবজাগরিত করতে এক নবীন পৃথিবীর স্বপ্নে। এ কবিতাটির দ্বিতীয়াংশে, অর্থাৎ শেষ দুটি চতুষ্কে, সেই স্বপ্নের নির্মাণ ও বাস্তবের সঙ্গে তার অনপনেয় ব্যবধানের ইঙ্গিত। 'আকাশের আড়ালে আকাশে'—এই বাস্তব, জৈব অস্তিত্বের যে জগৎ তার আকাশ থেকে আরও দূরে আর এক আকাশে, স্বপ্নের আকাশে 'সুরঞ্জনা'র ধর্মনিষ্ঠ অধিষ্ঠান, সেখানেই 'সুরঞ্জনা' মৃত্তিকার মতো অপেক্ষাতুর—নবীন প্রাণায়নের গভীর বংশটি তো সেখানেই নিহিত। মৃত্তিকার প্রতীকে প্রেমের উর্বর প্রাণদায়িনী শক্তির কথাই আভাসিত। মাটির গভীর থেকে উদ্বর্তিত হয়ে আসে যেমন উদ্ভিদের উর্বর প্রাণ তেমনই প্রেমের অমর সঞ্জীবনীতে বারেবারে উজ্জীবিত হয় মানবের স্বপ্নের প্রধান। ঠিক এই কথাটিই জীবনানন্দ আমাদের শুনিয়েছিলেন 'বনলতা সেনের 'সুরঞ্জনা' কবিতাটিতে—যে 'সুরঞ্জনা' তথা প্রেম সভ্যতা থেকে নব-সভ্যতার-উত্থানে পতনে মানবের অন্বেষার নিত্য-সহচরী, প্রাণদায়িনী শক্তি। কিন্তু, 'আকাশলীনা' কবিতাটিতে প্রায় এইরকম একটি ভাব আভাসিত করেই কবি আমাদের নিয়ে যান স্বপ্নভঙ্গে। মৃত্তিকার মতো অপেক্ষাতুরা সুরঞ্জনা, মৃত্তিকারই মতো সঞ্জীবনের শক্তিতে জারিত করে দিতে পারে মানব-হৃদয়। কিন্তু, পরমুহূর্তেই এর বিপরীতে উঠে আসে মৃত্তিকার চিত্রকল্পের অনুষঙ্গে আর একটি চিত্র, আর এক একটি ভাব, আরও একটি ভিন্নতর

প্রতীক ঘাস। মাটির অনুষঙ্গে আসে ঘাস—সেই দুর্মর ঘাস যা জৈব প্রাণের প্রতীক। তখনই গভীর বেদনায় কবি বলে ওঠেন "তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে", তার, অর্থাৎ যুবকের। যুবকের প্রেম ঘাসেরই মতো এক জৈব অস্তিত্বের এক নিতান্ত স্থূল দেহবদ্ধ জীবিষার দ্যোতক।

এই জৈব, দেহী আকাঙ্ক্ষার স্থূলাবলেপে এমন প্রেম অবলীন। তাই কবিতার আদিতে ছিলো কবির মৃদু আর্ত আকুতি 'যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো।' সেই নিষেধের নির্দেশ থেকে হৃদয়ের নিদানে 'সুরঞ্জনা'কে ফেরাবার প্রয়াস কবি রেখেছেন কবিতার শেষে চরণসম্ভারে:

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস,
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

এখানে যেন কবি জেগে উঠলেন আর এক আহত চেতনায়। ঘাসের অনুষঙ্গে তাঁর মনে আসে, ঘাস ইতর প্রাণীর খাদ্যবস্তু। এই বিশশতকে ক্রান্তিকালের যন্ত্রণায়, মূল্যবোধের বিপর্যয়ে তাঁর মনে হচ্ছে 'সুরঞ্জনার' হৃদয়ও আজ ঘাস—অর্থাৎ ঘাসেরই মতো খাদ্যে ইতর প্রাণের খাদ্যে। প্রেম, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, মানবের অন্যান্য শাশ্বত মূল্যবোধগুলির মতো নিজের মূল্যমহিমা হারিয়ে ফেলে পর্যবসিত হয়েছে ইতর প্রাণের খাদ্যে। তাই তাঁর 'সুরঞ্জনা' পৃথিবীর বয়সিনী সেই মেয়ে, মানবের হৃদয়নিহিত সেই দুর্মর প্রেমচেতনা যা প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিলো দূরাবস্থিত মাত্র, যেন শুধুমাত্র সঠিক আহ্বানের প্রতীক্ষমানা—এখন তাঁর উপলব্ধি ফিরে এলো আরও রূঢ় নিষ্ঠুর এক চেতনায় তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে "সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস।" প্রেম আজ এই পৃথিবীতে স্থূল দেহসর্বস্বতায় অবলীন, হৃদয় আজ খাদ্যবস্তু, তাও ইতর প্রাণের, তাই ঘাস। তবু, কবি ভুলতে পারেন না তার স্বপ্ন (বা Vision) যেখানে প্রয়ানের আগ্রহেই কবিতার প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিলো। সেই স্বপ্নের কৌতূহল আগ্রহ, স্বপ্নপ্রয়ানের আকুতি আর তার নির্মাণ কবিতার শেষ দুই চরণে:

বাতাসের ওপারে বাতাস
আকাশের ওপারে আকাশ।

যেন 'সুরঞ্জনা' কে তিনি শেষবারের মতো শুনিয়ে গেলেন আর এক নবীন স্বপ্নজগতের বাণী। এই বাস্তবের আকাশ আর বাতাস থেকে দূরে আছে এক পরিচ্ছন্ন উজ্জল তিমির অনবলীন আকাশ আর বাতাস, স্বপ্নে উদ্বোধিত দ্বিতীয় পৃথিবী যেখানে সুরঞ্জনার সহজ অধিষ্ঠান স্বাভাবিক ছিলো।

ষোলটি চরণে চারটি চতুষ্কে বাঁধা এই অনবদ্য লিরিকটি জীবনানন্দের সমগ্র কবিতার জগতে আপন বিশিষ্টতার উজ্জল হয়ে আছে। হ্রস্ব পংক্তি, মিতভাষণ আবেগ-সংহতি এর-চরিত্র, সঙ্গে রয়েছে লৌকিক ভাষারূপের অনবদ্য প্রয়োগ আর পাত্র-পাত্রীর নাটকীয় সংস্থান। তবু „সাতটি তাবাব তিমির'-এর মত কাব্যগ্রন্থে এর উপস্থিতি আমাদের ভুলতে দেয় না সামগ্রিক ভাবে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এর কাব্যবক্তব্য নিহিত রয়েছে। সেই প্রতীকের অন্তর্লীন অর্থোদ্ধারের একটি ত্বরিং ক্ষীণ প্রয়াস হিসেবেই বর্তমান নিবন্ধটি পবিকল্পিত।

প্রদ্যুম্ন মিত্র

অমিয় চক্রবর্তী

ঘরানা কবিতা

১ গরজ

তাতেই বা কি
তাতেই বা কি?
মরতে যদি হয় এ মর্তে
তাতেই বা কি—
প্রাণ যদি হয় অজর অমর
তাতেই বা কি, তাতেই বা কি?

রূপ-মঞ্জরীর নতুন কুসুম
রঙিন বোঁটা হারায় যদি বনে
তাতেই বা কি—
উরন্ত মেঘ দূরের আলোয়
নীলাম্বরের শূন্য খোঁজে
লুপ্তি পথে
তাতেই বা কি, তাতেই বা কি—

কেউ বা দাঁড়ায় প্রদীপ হাতে
মাটির ঘরের আঁধার কোলে
ভরা সন্ধ্যায়
তাতেই বা কি—
কুলুকুলু ধ্বনির স্রোতে
পুরবে সবই
শেষ তারাতে
ধু ধু মাঠের হঠাৎ চেতন খসে।

২ আশাবরী

মনে হয় আজ হতাশ বাতাস—
তবু তো জেনেছ তুমি
বিশ্ব মধুর চিত্ত পুণ্যভূমি
যা ছিল হবার, সবই যদি হয় পার
চিরদিন সেই রয়েছে সুবাস
পুষ্পের মৌসুমী
তোমার পুণ্যভূমি।

যদি ভাবো বুঝি হারিয়ে গিয়েই
যেমন হারায়
ত্রুকোটি তারায়
মিলিত জ্যোতির গতি—
তুমি তো নিয়েছ
ধ্রুবকেন্দ্রের কপালে চরম নতি—
অমিত জীবনে জেনেছ তোমার গতি॥

সান্ ফ্রান্সিসকো ১৯৭৯

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বর্ষা

এখন বিপুল বর্ষা—বাহিত ঝঞ্ঝনা দ্রিমদ্রিম
এবং নিটোল, ভেজা-অন্ধকার নক্ষত্রবিহীন,
ভাস্বতী—তোমার নাম, তুমি আনো রৌদ্রময় দিন
বিমুক্ত শ্রাবণধারা, রাত্রি, ঝোড়ো-ঝাপটার হিম।

বসন্তের চারুশিল্প : উড্ডয়নশীলা তুমি পিক—
ফুল, রৌদ্র ভালবাসো, তবু, কই রৌদ্র কলরব ?
রজনী, ঝটিকা, বৃষ্টি—শনৈঃ বিভ্রান্তি ও পরাভব
কে চায় ? প্রার্থনা দাও ক্ষান্ত বর্ষণের সুস্থ দিক ।

কেননা জীবন-ক্লান্ত পীত-রৌদ্র, কুসুম ছাড়াই,—
অঙ্গাঙ্গি জড়িত তারা , তুমি বাঁধবে চুল ফুলে, মালা
—পুষ্পহার গাঁথবো আমি প্রণয়-হ্লাদিত, জানো বালা।
জলধারা, দুঃখ—ভুলে যেতে হলে রৌদ্র, ফুল চাই !

ভাস্বতী—তোমার নাম, তুমি গড়ো রৌদ্রের নির্মিতি,
প্রত্যর্পণে আমি দেবো হৃদয়ের অনিঃশেষ প্রীতি ।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

ভালোবাসা

ভালোবাসা কথা নয়--
অথবা প্রতীক ।
ক্ষমাহীন দাহ ।
ভালোবাসা সারাদিন সমস্ত শিরায়
অসহ্য প্রবাহ ।
বাতাসে বিদ্যুৎ-বেগ
জলে জলে হীরা
একি সাড়া পাতায় পাতায়—
কুয়াশার পথে যবে ঘরে ফিরি
ছিন্ন মৃগশিরা
সারা বুক রক্তে ভরে যায় ॥

জীবেন্দ্র সিংহরায়

স্বীকারোক্তি

বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজয় অক্ষয়
অধ্যাপক, দাঁতে নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি।

জীবনানন্দ

রায়সাহা স্বীকারোক্তি নয়, ব্যাঘ্রমারী গাম্ভীর্য গৌরব
নিয়ে নয়, সত্যস্নাত শুদ্ধ উচ্চারণে বলি—
আমি অধ্যাপক।
দাঁত নেই—অন্নদাত্রী জরায়ুর স্নেহে
শিরার শর্করা সব অব্যর্থ কামড়ে
তাদের দিয়েছে ছুঁড়ে বাণপ্রস্থে একে একে।
চোখে নেই পিঁচুটি চাহনি—তবে ঝাপ্‌সা দেখি,
নোট লিখে নয় – ত্রিবিশ বছর ধরে
ফুল ফোটাবার মরীচি লিপিকা লিখে রোদে বৃষ্টি ঝড়ে।
সিংহাসন জোটে নি আজও, জুটেছে অবশ্য
যাত্রারম্ভে মোটরবিলাস, সভামঞ্চে লীলাময়ী মালা
আধ ঘণ্টা পণ্ডিত্বের কবোষ্ণ দক্ষিণা।
শেষ হলে আমার কেতাবী ছড়া
যারা গেছে ট্যাক্সির সন্ধানে তারা নষ্টফলে বেশিক্ষণ
আঙুল রাখে নি, তাদের ওপর সময়ের চাপ
বড়ো বেশি—ততক্ষণে সুমিত্রা সেনের গান শুরু হয়ে গেছে।
পায়ে পায়ে ফিরে আসি, ছেলের দু'হাতে তুলে দিই
শরৎসুনীল মালা, বলি বেশ হলো—
অভ্যর্থনা, রাজভোগ ইত্যাদি ইত্যাদি।
রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবি, এতক্ষণে
সারি সারি সিংহাসনে বসে গেছে হাজার টাকার সব ছাড়পত্রধারী।

আর এই ছন্নছাড়া বিছানায়
সত্যিই কি সমারূঢ় আমি ?
কবি, যে খাতায় কিছুদিন দস্তখত বসিয়ে গিয়েছো
সেখানে আমারো আছে অক্ষম স্বাক্ষর।
জীবিকা, জীবনানন্দ, জীবনকে ছদ্ম পরিহাস—
আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস আমরা সবাই। তাই হাততালি শুধু
বাঁচার আঙুলে রাখে চিত্রল অঙ্গুরী।
তবে এত ক্রোধ কেন ?
যে দু'হাতে সুদর্শন পাখি উড়িয়েছো,
ওহে মগ্নচেতা অস্থিত মৈনাক,
সেই হাতে তোতাহন্তা ঈগলের পাখা কেটে কেন
সময়কে দিয়েছো কষ্ট ? অন্ধকারে ক্লান্তমুখে
বসে আছে নাটোরের বনলতা সেন
সে কি ভুলে গেলে ?
তোমার জনক রক্ত
তবে কি প্রহত কোনো জীর্ণদৃষ্টি কৌরবের কাছে ?

তুমি আজ নেই, কী করে জানাবো
উদ্ধার কৃপাণ তুমি সংহত করবে না ?
যে আকাশ চাঁদ ভাসে সোনার ময়ূরপঙ্খী
সেদিকে তাকিয়ে শুধু কবি উচ্চারণ—
নির্জনের কবি,
তোমার ঘৃণার নীলে
বারবার স্নান সেরে নিযে
নীলিমার স্বয়ম্বরে নীলকণ্ঠ পাখির মতন
স্বপ্ন খুঁজে পাই।

অমর ষড়ংগী

বস্তুতঃ সকলে এক

আকাশে অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে।
পরিচিত নক্ষত্রের মেলা সেই ভিড়ে, ছায়াপথ
ধরে হেঁটে যেখানে পৌছুতে পারি—
অপস্রিয়মান তরুলতা, কাঁটা গুল্ম
বাবলার বন, কাজুবাদামের গাছ সারি সারি,
শেষ-না-হওয়া বালিয়াড়ী, কতকিছু
দূরে পড়ে থাকে। সজল প্রতিভা দেখি
অন্তরীক্ষ্যে। আপদ বিপদে নির্ভরতা তিনি।
স্পর্শে অনুভূতি, আশীর্ব্বাদ তাঁরই লোক
আমরা সকলে। তবু স্বখাত সলিলে আমরাই ডুবি।

যেহেতু ব্যতিক্রম পৃথিবীতে বাঁচার তাগিদে।
আমরা সকলে ভাবি এ জীবন চাই না চাই না
আমাদের নবজন্ম হোক্। কেবল নকল সোনা পরে
রূপান্তর বাহ্যিক সময়ে নিশ্চয়তা নেই।
চতুর্দিকে বৃক্ষ, জল, পশু-পক্ষী মানব-মানবী
সমস্তই ডুবে আছে প্রকৃতির চিরায়ত রূপে।

হরিষে বিষাদ চিহ্নে, কল্পচিত্রে, আনন্দবার্তায়
বস্তুতঃ সকলে এক। একই প্রতিধ্বনি একই সুর…
কণ্ঠস্বরে, কিন্তু অজ্ঞানতা ব্যাপ্তি যুদ্ধ অবসন্ন হয় নি এখনও।
মিলিত সংসারে থেকে কিছু লোক বিচ্ছিন্নতাকামী।
অদৃশ্য শক্তির টানে নিরন্তর আমরা সকলে নিয়ন্ত্রিত।
ব্যাপক মহিমা জানা নেই। পরিজ্ঞাত সৃষ্টির প্রাসাদে
নগ্ন শিশুর রাজ্যে আন্দোলিত। কত দৃশ্য

আবিলতা, শব্দহীন স্মৃতির পেটিকা
উন্মোচিত পৃথিবীতে রাত্রিদিন ব্যাপ্তি নিয়ে

আকাশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।
বস্তুতঃ সকলে এক, মানব সমাজ জেগে থাকে
রাত্রিদিন উচ্চারিত অনির্বচনীয়।

পরেশ মণ্ডল

ছোট্ট ট্রেন

পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে
ছোট্ট ট্রেন
কোথায় যায় বাঁশি বাজিয়ে
বাঁশির শব্দে পাইনের পাতা কাঁপে
উপত্যকায় ঝরনার জল কাঁপে
ঝরনার জলে বিকেলের ছায়া কাঁপে
ছোট্ট ট্রেন কোথায় যায়
অনেক দূরে
কাংড়া পেরিয়ে
হিমালয়ের ভেতরে
তপস্যার যেখানে পাহাড়ের মৌনী ধ্যান
ছোট্ট ট্রেনের বাঁশি বাজে
বাঁশির শব্দে পাইনের পাতা কাঁপে
আমার বুক কাঁপে
ছোট্ট ট্রেন
কোথায় যায়

মঞ্জুভাষ মিত্র

বাজো তবু ভায়োলীন

সুন্দরের বাহুলীন বাজো, বাজে ভায়োলিন
সুন্দরী সন্ধ্যায়
দীর্ঘচুল পুরুষের দুচোখে প্রেমের আলো স্কন্ধের নর্তকভঙ্গী
মিলালো বাতাসে,
মৌনবালিকার নির্বাক আঁখিতারা ওই প্রতিবিম্বিত শ্রাবণের
মেঘ বৃষ্টিপাতে। রজনীগন্ধার দণ্ডের মত স্বপ্ন ও কামনার
এই দীর্ঘ দীর্ঘতম রাতে
স্যাম্পেনের দামী শিশি খুলে পান করো তুমি মুক্তার মত গোল
ঝকঝকে দামী পানীয়
সাগরের তীরে যাও কান পেতে খুলে নাও বাতাসের স্বরলিপিখানি
পৃথিবীতে দুঃখ শুধু চিরন্তন এই কথা মনে রেখে
সুখী হও বিবসন রমণীর মতো।
মুহূর্তের শুভ্রফুল হয়ে থাকো ভয়ার্তের হৃদয়ের বীজপত্র ছুঁয়ে
সময়ের বালিকারা একে একে নিভে যাক কালো কালো ফুঁয়ে
মৃতের ক্ষুধিত অশ্ব চলে যাক দলে দলে সওয়ারবিহীন
তারাসাগরের জলে, সাগরতারার জলে
পৃথিবীতে বহুরাত নামক শ্রাবণ
কবিদেবতার মৃত্যু হোক গায়কের মৃত্যু হোক
রজনীগন্ধার দণ্ড ঘাতকের হস্তধৃত মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাক
সুন্দরের বাহুলীন বাজো তবু ভায়োলীন
শেষ সন্ধ্যায়।

শরৎকুমার নন্দী

নিজস্ব পৃথিবী

হৃদয়ের ভিতর-ঘরের মধ্যে তুমি সীমাহীন
ঘরের সীমানা ভাঙো সেই জন্যেই,
অথচ আমরা যারা ভালোবাসি সীমা
সীমার ভিতরে সুখ সংসার পেতেছি
সাজিয়েছি গৃহ জনপদ লতাগুল্ম গাছপালা দিয়ে
তোমার ভাষার খেলা তাদের কেবলই দুঃখ দেয়।
কেবলি নতুন করে সাজাবার নেশা
তাই তুমি পুরোনো ইঁটের পাঁজা ভাঙো
অনুকম্পাহীন,
একথা জেনেছি বহুবার
পৃথিবীর পিছল শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
তথাপি ঘরের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে
মাকড়ের মতো ক্ষুধা নিয়ে
জাল পেতে শিল্পের সীমানা গড়ি,
এ আমার নিজস্ব পৃথিবী॥

জয়ন্ত সান্যাল

নিজের জন্য কিছু থাকে না

নিজের মধ্যে একে একে শব্দেরা অতিক্রান্ত হলে
স্থিতিশীল প্রলয়ে সে অধিকার নিয়ে
মেতে ওঠে, বাইরে কৃষ্ণচূড়া কেমন লুকিয়ে
আকাশ ছোঁয়, শব্দের শালিকেরা ওড়ে,
আর টুপ্‌টাপ্‌ পাতা ঝরে পর্যন্ত দুপুরে

ঠিক এই সময় তার নিজের জন্য এতটুকু সুতো
থাকে না বুকের মধ্যে জাল বোনার
মতো, থাকে না কথারাও যা নিয়ে
বেঁচে থাকে পরিশুদ্ধ জীবন

অশোক মহান্তি

হয়তো

হয়তো তোমাকে দেখেছি কখনো, দেখি নি কোথাও
হয়তো তোমাকে ভালোবেসেছি কি, আদৌ চিনি নি
হতে পারে তাও
তবু মনে রেখো পরানে আবির কখন খেলেছে
ফাগের খেলা
বেশ মনে পড়ে যেদিনটা ছিল মাঘের মেলা
তার পরই যেন কী কারণে তুমি গিয়েছ দূরে
সেই যে গিয়েছ ফিরে আসো নি কো বছর ঘুরে
আমি অপলাপে বসে যে থেকেছি, বসেই আছি
আজকে হঠাৎ কী যে করে বুক
মনে হয় যেন পালালে বাঁচি
আড়ালে   কোথাও লুকোলে বাঁচি ।

শিখা সামন্ত

বদল

একটা ফুল কেমন নদীতে ভাসতে ভাসতে
পাথর হয়ে যায়
একটা মানুষ হাসতে হাসতে কেমন
পাথর হয়ে যায়
একটা পাথর ক্ষয়ে-ক্ষয়ে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে মাটি হয়,

এসব বানানো গল্প থাক
দিনকাল পাল্টাচ্ছে
মানুষের ঘরে অতর্কিতে ঢুকে পড়ছে চোরা বান
মধ্যাহ্নে গেরস্তের হৃদয় চুরি করে পালাচ্ছে
ছাখো, ছাখো নদী—
ধূর্ত শেয়াল তা দেখে হি হি হাসছে লোভে
নখ দিয়ে চিরে চিরে প্রস্তুত করছে পথ
দিনকাল পাল্টাচ্ছে
ভন্ ভন্ মাছির ভীড়ে, গিস্ গিস্ আবসোলার জঙ্গলে
রক্তচোষা মশার গুহার ভেতর আজ
প্রস্তুত রাখতে হবে রথ
শ্রীকৃষ্ণ আসছেন

হিমাংশু বাগচী

দ্বীপবাসিনীর প্রতি

আমি দূর থেকে শুনি তোমার কণ্ঠস্বর
কোনো দ্বীপের রহস্য ভেদ করে
ভেসে থাকা নামহীন প্রাণীরা

আমার সংসারের প্রাত্যহিকতায় জোটবদ্ধ হবার পর
আকাশবাতাস মুখরিত হয়
তোমার চিবুক বেয়ে তখন দুঃখের প্রকাশ
কণ্ঠে মালিন্য
মনে হয় তুমে কোনো দ্বীপবাসিনী
আমায় দু-হাত বাড়িয়ে ডাক দিয়ে ফেরো

আমি ছুটে যেতে চাই কাঙালের মতো।

কিরণশঙ্কর মৈত্র

কথনও পলাতক

আমাকে পরিপূর্ণ নিরস্ত্র কোব না,
না হয় চুলে লেগে থাক দুএকটা
বনজ ফুলের পাপড়ি,
জংলা কলের গন্ধ শরীরে—
আমাকে মঞ্চের তীক্ষ্ণ আলোয় এনো না।
না হয় কামিজে জড়াক মেঠো ধুলোর সৌরভ
চপ্পলে বালখিল্য পেরেকের লুকোচুরি
আঙুলের নখে মুক্ত আকাশের রঙ
জামার আস্তিনে কিশোর ক্রিকেট ম্যাচের উল্লাস

আমাকে আলোর সতর্ক বলয়ে এনো না,
আমাকে পরিপূর্ণ নিরস্ত্র কোরো না।

মধুমাধবী ভট্টাচার্য

সাজিয়েছ জতুগৃহ

ভাসমান শব্দের কাছে
আরও কাছাকাছি—
প্রমত্ত মনোজালে
ধরা পড়ে না কথাদের উষ্ণ প্রবাহ।

তবু আছ,
শিশির শিহরণে,
কতটুকু স্নিগ্ধ কল্পনায়—।
তোমার ওষ্ঠ প্রান্তিকে—
পায় না শব্দের মতো সুঘ্রাণ।
চিনো না এই মত্তপ্রিয় কথাদের
সুরের আখরে শব্দ ভ'রে ভ'রে
অখ্যাত খসড়ায় সাজিয়েছ জতুগৃহ ॥

ব্রততী বিশ্বাস

সজল দুঃখের মতো অভিধান

সজল দুঃখের মতো অভিধান স্থির
আমার করতলে
ভেতরে প্রাচীন গুহার শোকলিপি অনন্ত অপার
এভাবে কেটেছে সময়, কাটবে বলেই
কথা ছিল অর্থশুদ্ধ শব্দের শেকলে
কেউ বলে নি কোথায় সংজ্ঞার সেতু
কেউ ভাসে নি গহীন অথৈ জলে

আমার অক্ষর তুলেছে আঙুল
পবিত্র দরোজার দিকে
বিগ্রহে পাপ ছিলো কি না
জেনে নেবে তন্ত্রপূজারী
প্রাণবান শব্দের জপমালা হাত থেকে
খসে পড়ে
অভিধান দেখি নি যখন।
শব্দের চতুরালি ভুলে গেছি ব'লে
শুদ্ধ হাওয়ার প্রহার জীর্ণ ললাটে
অভিধান থেকে উঠে আসে দুঃখ
প্রগাঢ় মাটির টানে
শিরার সমূলে।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জল

জলে পাপ ধুতে গিয়ে সিক্ত করি ঈশ্বরের মুখ

ঈশ্বর কি কেঁদে যায় আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে?
অশ্রু ঝরে জন্মের সবুজ পত্রে ধ্বংসের আগুনে।
কদর্য নরক এসে সামনে দাঁড়িয়ে হাসে
লুঠে নেয় সূর্যের ফসল

জলের মহিমা জল জেনে গেছে তাই বাজে
এক সঙ্গে সৃষ্টি আর স্রষ্টার মাদল।

অমরনাথ বসু

তুমিও যাবে

তুমিও যাবে বিলাসী অবসরেবর রোদ্দুর মাখতে মাখতে
বিদায়ী প্রতিমার মত সব সুখ ভেসে যাচ্ছে
কিংবা সবটাই খসে যাচ্ছে
কোথায় কেউ জানে না···
চারপাশের ওই পক্ষপাখী লতাবৃক্ষের স্তবকে
ও কিসের ঘ্রাণ তুমি গ্রহণ করো কেউ জানে না
ভালোবাসার ভিক্ষের সুবাদে কি সব বলাবলি কেউ বোঝে না
ছ্যাখো নিঃশব্দে বিসর্জনের পালা চলেছে
শব্দিত শ্মশানভূমি জুড়ে
তুমিও যাবে বিলাসী অবসরের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে
যা গভীর দুঃখের মধ্যে ভাবা যায় না ··
তোমার ওই অসঙ্গতি চাহনি ঘিরে কত শতবার বজ্রাহত হবো আমি
শুধু ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য...সেও দুঃসময়ের ধোঁযায় ঢেকে রাখে
তুমিও যাবে বিলাসী অবসরের গান গাইতে গাইতে
সহসা কেন নির্মম অট্টহাসি বিষণ্ণ অশ্রুর ফোঁটায
কী আশ্চর্য বৈপরিত্যে যখন ঢেকে যায় দশদিক্
অপ্রাপ্তির বর্ণবাসনা আস্তে আস্তে অন্ধকার পথটা দেখিয়ে দেয়······

নারায়ণ ঘোষ

আর কোন ভাষা নেই

[প্রয়াত কবি মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) স্মরণে]

'প্রত্যহের মহোৎসবে নিত্যযাত্রী নিয়তির লিখা
অম্বিত প্রত্যয় বক্ষে, ললাটে মৃত্যুর জয়টিকা ।'—মনীশ ঘটক

আর কোন ভাষা নেই, তোমার ভাষাই আজ তোমার ভূষণ
তুমি যেন প্রত্যহ প্রত্যুষ ।
প্রভঞ্জন হার মেনে গেছে
'একটি বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে' ।
সেই গাছ টলে নি কখনো
আজ শুধু ঘুমায়ে রয়েছে
'আজ সে ঘুমোক । আজ কাজ নেই ডাক দিয়ে তারে ।'
আজ আর কোনো ভাষা নেই
তোমার ছায়ায় মুগ্ধ অনুজেরা আছে
আর আছে তোমাব 'সন্ততি' ।

মনীশ ঘটক ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২-২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ।

ব্রততী ঘোষরায়

এসব লুকোনো থাকে

ঘাসের শিকড়ে নদী, নদীটির স্রোত
কোথাও লুকোনো ।
পরিপাটি জ্যোৎস্নায় ছিমছাম গুণে নেওয়া
কয়েকটি পাতা, পাতার সবুজ

এসব লুকোনো থাকে অমল বিভ্রমে
ছায়ার আড়ালে সব শব্দেরা যেমন

সে দিগন্তে পত্রকণা নেই,
শুকনো আঁচল খুলে বালুবিন্দু
ঝরে যায়। নির্জন সুখেরা সব
সেখানে একাকী হয়ে পথ হাঁটে ॥

সুনীলকান্তি ভট্টাচার্য

একটি বৃক্ষের কাহিনী

গাছটির ছায়ায় আমার শীতলতা
অবচেতনে আমার, মৌন।

গাছটিব শিকড় ছিল শক্ত
হাওয়া দিত অবিরল।

ভাবনার অলিন্দে কত নিশি
ভাবৎ যন্ত্রণায়।

কত অনিবার্য নিশীথে দুরন্ত বাগান ;
কত ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে পত্রপল্লবে ॥

গাছটি এখন নেই।
নেই পাতাঝরার মর্মর।

জহর সেন মজুমদার

প্রিয় আমার প্রিয় মানুষ

কে আসছো, এসো এখানে কোনো বাঁধা নেই
শস্য গন্ধময় ক্ষেতের এ বাতাসে
দরজা আটবানোর কোনো ইচ্ছা নেই --
এখানে নিজস্ব সঞ্চারপথ আছে
অতি সম্ভ্রমে যদি ভঙ্গিটুকু ঠিক থাকে
তবেই আপন হতে পারো .
কে আসছো, এসো অপরিচয়ের গণ্ডি ভেঙে
চিনে নিই দ্বিধাহীন,
পরম প্রাপ্তিতে মুখর হয়ে উঠুক
ঘর-দোর মেদ-মজ্জা
এই মায়াচ্ছন্নতা ছেঁড়া পোষাকের মত
পরিত্যক্ত হোক
কে আসছো, এসো হাত ধরো
দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলাও
দুর্বল মানুষ, বিষণ্ণ মানুষ· ·প্রিয় আমার প্রিয় মানুষ
কে আসছো, এসো হাত ধরো।

সুব্রত সান্যাল

উৎসমুখে

তুমি সৈনিক নাকি রূপসী
তুমি আলো না আঁধার না
ঝর্না না জল দীঘির
'স্মিত হাসি না ক্রুদ্ধ শরীর।

ভাবছি ভেবে দেখছি
তুমি কী তাও জেনেছি
যা জেনেছি, তাও গোপনে, তুমি
মৃত প্রেয়সী, মধুর স্বপনে।

উদয়ন ভট্টাচার্য

ইচ্ছে ছিল

ইচ্ছে ছিল ফিরে আসবো না
রক্তপাত হোক, মালিন্যে ভরে যাক সংসার
নীল পাখি এসে আমার চোখ ছিন্ন করে দিক
তবু আসবো না
গ্রামের পথেই শিশুর মত বলবো
ফিরে এসেছি সন্ন্যাসী, ভিক্ষা দাও।

ইচ্ছে ছিল ফিরে আসবো না
যুদ্ধ হোক, বাস্তুসাপ চলে যাক ভিটে ছেড়ে
অসৌজন্য এসে ছিন্ন করুক আমার মেধা
তবু আসবো না
গ্রামের পথেই গৌতম বুদ্ধের মত বলবো
ফিরে এসেছি সন্ন্যাসী, ভিক্ষা দাও।

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

আমি তো বলি না কিছু

নিজের-ই অপূর্ণতা নিয়ে নিজে-ই নিথর
কেউ-ই বোঝে না
কাজে থাকি কিম্বা যখন-যেমন
থামাতে পারি না তাকে। অন্তরে টাইপ চলে অশ্রুর অক্ষর।

যেটুকু বা আছে সবুজের রেশ
তার মূল্য না-ই দিলে
তাতে কি ক্ষতি—কতটুকু কার
আমি তো বলি না কিছু—নিজের ভিতরে নিজে ব্যথায় নিঃশেষ।

শংকরজ্যোতি দেব

শোক

আমাকে ছোটো শব্দ ধার দাও
আমি যে কতোকাল এই প্রেমহীন সময়
মেনে নিয়েছি
যদি কাল মুচকুন্দ পাতা চুইয়ে পড়ে
সৌররশ্মির শোক, তবে
বনহরিতের পা ঘসে যাক আদিম আত্মার করুণা!

সন্তোষ চক্রবর্তী

ফেরা

শুভ, তোমরা কি সব বেঁচেবর্তে আছো?

এখন বেলা গেছে। আশ্চর্য ম্যাজিকে
দামী কারুকাজের পাত্র থেকে জল পড়ছে তো পড়ছেই।
মানুষটাও উধাও।

এখন অমোঘ শীত নির্বাচিত। কাল
কার অভিষেক, শুভ?
আতরের শিশি, রামায়ন, কুশল
আলো নিয়ে
সেই মানুষটা কোনোদিন ফিরবে না?

টেবিলের পাশে শিশকর্তা কাঙাল সেজেছে॥

শুক্লা দে

আর্তি

মাগো ·
এই-ই কি তোর সব
এরকম বাষ্প-ভেজা ঘর ভাঙ্গা-চোরা বেড়া
মল-মূত্রে একাকার ছেলে মেয়ে কোলে-কাঁধে করে
অনাহার অর্ধাহারে উলঙ্গ উঠুনে
বংশ বেড়ে যাবে তোর প্রতিদিন
আর অসুস্থ উন্মাদ সব সন্তানের ভিড়ে
তিলে তিলে ক্ষয়ে যাবি তুই

যাগো আমাকে হরণ করে নে
আমার রক্ত মাংস হাড় মজ্জা
সমস্তই জন্মপূর্ব তোরই শক্তিতে ফিরে যাক—

গাছে গাছে আবার সবুজ পাতা ঘেরা
তোর ছায়ার মাঝে বিস্তারিত শুশ্রূষায়
উজ্জ্বল হাসির রেখা যেন দেখা যায় আর
নিরপেক্ষ প্রেম-স্বাধীনতা সেদিনের মত
যেদিন প্রথম তুই আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে
আমাদের মাটিতে নামালি

প্রবীর নন্দী

ত্রিভুজ

১. তুমি বিষপত্র নও, তবে কেন ছুঁড়ে মারো বিষের পাথর
এতো অবনত আমি যে তোমার পা ছুঁয়ে দিতে পারি
আরো কতো নত কর, দুই হাত ছেনেছে শিকড়
এখন অতল গভীর, দেখা যায় পৃথিবীর তট।

২ শুধু একবার ঠোঁট কাঁপে তার, তারপর চুপ,
শূন্য থেকে লাফিয়ে পড়ে মেঘ, তার ছায়া
টলে পড়ল গ্রেগর সামসার মতো একদিন
এমন নিথর শোক শুধু জানে খ্রীষ্টকার রোড্।

৩ চোখ ফেরাও বা বন্ধ রাখো চোখ, যা খুশী,
প্রকাণ্ড নিকষরাত নেমেছে কসবার ঘরে ঘরে।
অন্তরাত্মা শুষে নিচ্ছে জল, বায়বীয় আলো
এমন গভীর রাত কসবার নিজস্ব ছিল না কোনদিন।

শুক্লা দাস

বিষণ্ণতা কেবলি

এই সাঁকো কোনদিন পেরোনো যাবে না
এই সাঁকো অন্ধকার ম্লান বিষণ্ণতা
অমিত আবেগে। আমরা কোথায় আজ
কত যুগ দূরে ? সামনে হাওয়ার খেলা
বিবাগী হাওয়ার, সাপের হিস্ হিস্ তোলে
শরীরে শরীরে।

নদীরা ক্রমশঃ যেন দীর্ঘতর হয়
এক তীর থেকে অন্য তীরের ভূমিতে—
ক্রমশঃ শীতলতর জলের গভীর
নদীরা ক্রমেই যেন অনস্তিত্ব হয়।
আমরা কেবলই যেন ধীর নির্জনে
শেষ বিকেলের রঙে আলো ছায়া হই—
জাফরির কারুকার্য সাবেক কালের
তারপর ক্রমাগত অন্ধকার হই।
অন্ধকার অনুভবে শেষ বিষণ্ণতা
দানা বাঁধে। নিশ্চিত বুঝে নিই সব অতঃপর
এই সাঁকো বিষণ্ণতা পেরোনো যাবে না।

দীপ সাউ

কাছাকাছি

কোলাহল থেকে দূরে সঙ্গীহীন এইখানে থাকো
এই গাছ ছুঁয়ে উড়িয়ে দাও ঝিঁ ঝিঁ এ ঝোপ থেকে
সব পাকা পাতা ফেলে দাও দেখ পাখিরা না ডাকে
চুপচাপ বসো দূরে জিপ ছেড়ে দরকার মত

হেঁটে যেও পেন বেখে গাড়ীতে খবরের কাগজ ও
খুচরো পয়সা দেশলাই কাঠি মণিবন্ধ জুড়ে
টিক টিক করা ঘড়ি কোযার্টারে ঝগড়াটে বউ
ফেলে একা হেঁটো আসো এই মোরাম বিছান পথে
দেখো বুকেব ভেতর থেকে কেমন লেবু গন্ধ উঠে আসে।

দীনবন্ধু হাজরা

উড়াল

দুপুর দুপুব ঘুঘুব গলায ঘুবে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
পান-পাতা-মুখ গ্রাম কিশোরীর ঘুঙুর-বাঁধা চিক-পায়রা
থম্-রোদে ঠিক থমকে গিয়ে গুঁড়িযে পড়ি আতসবাজী
ঝুমুর জলের দুব্বো দোহাব একলা শিমূল উড়ে বেড়াই

নীল কুয়াশার সিঁড়ি ভাঙতে তাসের বাড়ী মেঘের পাঁজর
শিরিষ নাকি খিরীষ ডালে দোকলা ঘুঘু কুড়োয দুপুর
দুপুর তখন সবাল ডানায হুমড়ে পড়ে উড়াল পুলে
কার্নিশে তাব চিত্তাহরণ গড়ন গঠন একলা ঘুঘুর

খুব তেষ্টায় ঝুঁকলে পরে মৌটুসকী মৌসুমী জল
চেষ্টা চরিত শান-বাঁধানো শ্বেতপাথবের ছাড়িযে চাবি
মউলতলায গন্ধ সবুজ খোদাই পাথব কানবোশেখী
আর তখনই পায়ের নীচে মোরাম ভেঙে খুনখাবাবি

হঠাৎ কখন ছিঁড়েছিল উইলো বনের সবলবেখা
পেলিকানের হদ্দ দুটি নবম পালক পর্দা জুড়ে
নুনের ফেনা পিছন ক'বে তেষ্টাতে সেই জলপ্রপাত
দুপুর দুপুর ঘুঘুর গলায ঘুরে বেড়াই, বেড়াই উড়ে—

শংকর চক্রবর্তী

অনেক উত্তাল বাধা

চিত্রিত উঠোনে ওই ফুটে আছে বিশুদ্ধ করবী,
নিচেও পড়েছে কিছু ঝরে
মৃত সব, নষ্ট আত্মা, দৃশ্যপট বদ্‌লে বদ্‌লে যায়
নিজস্ব নিয়মে সময়ের—একান্ত আক্রোশে
ফোটে গলিত পুষ্পের। অনেক উত্তাল বাধা
ভ্রষ্টমুখ মিছিলের—মিছিলে দেয় উঁকি
সুখী ও বিন্যস্ত চিন্তারা সার বেধে দাঁড়ায় না উঠোনে
স্বভাবে ওঠে না ফুটে প্রাত্যহিক বেদনার
রমণীয় মুখ, গুচ্ছিত অলক আর ওড়ে না বাতাসে।

দু'পায়ে মাড়িয়ে এসে সংক্রামক ব্যাধির শরীর
পরবাসী হয়ে আমি যেতে চাই নিজ বাসভূমে।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বারপ্রান্তে

পর্যটন সেরে এলুম অনেক দেশে দেশে
ডিঙিয়ে পাহাড়, পেরিয়ে কতো সাগর ঢেউ,
কতো অরণ্য, কতো নগর, গ্রাম
পার করে ফিরে এলুম।
দেখেছি ভীড়
নানারঙে রঙীন,
নানা কণ্ঠে মুখর

দেখেছি একাকী মুখ ক'তো
সচল ছবির মতো,
রেখায় রেখায় বর্ণবিন্যাসের
অচঞ্চল প্রবাহ
বাহির অন্তরের আলোছায়ায় চপল।
তাদের কাছে বিদায় নিয়ে এই যে ফিরেছি আজ,
খুলেছি সব উৎসবের সাজ,
আমার এঘরের
আমারি এ দুয়ার ধারে
দাঁড়িয়ে আছি একা চুপচাপ
যেন কোনো অশ্রুত আহ্বানের প্রতীক্ষায়।
জানি, আরো দু'পা গেলেই পাবো গৃহকোণ,
তবু এ আশঙ্কা কেন -
কেন এ অনধিকার প্রবেশের ভয়
নিজের ঘরেই ?
ঘরের আগল দেওয়া নেই, জানি,
শুধু আছে পর্দা ফেলা,
তবু মনে হয় যদি পর্দাটি সরিয়ে দিই,
আমার হঠাৎ এই আগমন অহমিকা ভরে
বেসুরো বাজবে সারা ঘরে .
ঘরের জমাট ধুলো নীরবে করবে তিরস্কার .
ওই আরো অন্ধকার, ওই নীরবতা,
চিনবে না আমায় কেউ।
তাই প্রতীক্ষায় আছি দ্বারপ্রান্তে—
জানি একদিন শুনতে পাবো ডাক,
পর্দা যাবে সরে।
না দেখেও দেখতে পাই যেন,
ওই ঘরে—

প্রদীপের শিখা জ্বলে,
ধূপের সুরভি ছায়,
শেষ হয়ে যায় সব সময়ের হিসাব নিকাশ।

মহাকালের হাত থেকে খসে পড়ে অক্ষমালা।
দেখতে পাই, দেখতে পাই সব,
কার হাত লিখে চলেছে ঘরে ফেরার আমন্ত্রণ লিপি ;
লেখা শেষ হয়ে গেলে জানি,
সে হাতের আঙুলগুলি সরিয়ে দেবে পর্দার আড়াল,
ডাক দিয়ে নিয়ে যাবে ঘরে।

বিকাশ দাস

দুটি ইতস্তত কবিতা

১. তারপর হাওয়া দেয় এলোমেলো
বৃষ্টি ঝরে কানাকানি
তারপর ঘন নীরবতা
নতমুখী অশ্রুমতী নদীটির বাঁকে।
এ ভাবেই দিন যায়, বৈতরণী কূলে।

২. বালক জানে না তাই
নির্বিকাব বিচবণ করে
ঘন আগাছার ঝোপে
সর্পশঙ্কাকুল

বালক জানে না তাই
ভয়ঙ্কর ভুল
করে যায় নির্বিকার

আমি কি বালক আছি
নিঃশঙ্কায় হাত দেব
বিষের বিবরে ।

শ্যামল কুমার বিশ্বাস

নারী

যতদূর চোখ যায়   আমার দুধারে
কালাহারি মরু ছেয়ে আছে।
তার শেষ কিনারায়   একটি খেজুর গাছ

সেই ফল পাওয়া যায় বন্ধুর পথ কেটে কেটে
মহাসুখে অবিরাম অস্থি পুড়িয়ে।
তবু আমি তার কাছে যাব।

কেননা শরীরে তার উদ্যত যে ভল্ল ডাকে
তার চেয়ে গাঢ় আপ্যায়ন আজো পৃথিবী জানে না

তাই এই বোকা মরু   বৃথাই বালির বুক জ্বালে
তাই রাগী স্ব-প্রকাশ   বৃথাই দাঁতের সারি মেলে।
আমি যাব।   তার কাছে যাব।

পিনাকী ঠাকুর

চিত্রমালা

১. বোধি

মূলদেশে বোধি আছে, বৃক্ষ তাকে করেছে গোপন
এই হিমপল্লবস ভুলগুলি, যেন অন্ত বনরাজীনীলা
মানুষের সংঘারামে সারাদিন জেগে থাকে, সারারাত
অক্লেশে ঘুমায়···
মূলদেশে বোধি আছে, সেও গূঢ় সর্বনাশে গিয়েছিলো একদিন
একদিন গিয়েছিলো ম্লানতায়, সমূহ বিষাদে

২. বাতিঘর

সে এখন একা নয়, আমি তবু অবেলায় তার কাছে যাবো
বাতাস ফুরায় যদি, তবু যাবো দু হাত সরাবে মেঘমালা
বড় তীব্র অই রাত, নষ্ট আলো, সমুদ্রশাসন
শীতের আড়ালে থেকে আগুন জ্বেলেছি সারাবেলা···

৩. পরিত্রাণ

পরিত্রাণ নেই এই মৃদুজলে, তবু তুমি ছুঁয়ে ছাখো নষ্টজল, পাতালের প্রেম
পরিত্রাণ নেই তবু জলে ও শিকড়ে কৃষ্ণছায়া
আলোকবর্তিকাগুলি শোভা হোক তোরনশীর্ষে যাও প্রমা
সমুদ্রশাসনকাল মনে পড়ে লুপ্তগান—
পাথরপ্রতিমা ?

শিল্পেব বিস্তৃত দিগন্ত

জীবনের আদিমতম কাল থেকে মানুষের মনে সঞ্জাত হয়েছে পরিদৃশ্যমান জগত সম্বন্ধে সীমাহীন বিস্ময়। আর এই বিস্ময়ের হেতু অন্বেষণ থেকে উৎসারিত হয়েছে মানুষের প্রতিভা, নানা সৃজনমুখী অভিব্যক্তির মাধ্যমে। অন্তরের গভীবে উপলব্ধ অনুভূতিকে রূপায়িত কবে তুলবাব জন্য মানুষ নানা মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে শিল্প। আর এই শিল্পের ভেতর দিয়ে রূপ নিয়েছে মানুষের চিত্তের ব্যপ্তি। অনুভূতিব সংবেদনশীলতা, ভাব ও আদর্শের রূপ। শিল্পসৃষ্টির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে অবলম্বন করেই মানুষ তার অন্তরাত্মাকে অনুভূতির অতীন্দ্রিয় জগতে প্রসাবিত করবার প্রয়াস করেছে। স্থান ও কালেব সঙ্গমে বিভিন্ন যুগে ব্যক্তি এবং সমাজ আপনার রচিত শিল্পের মাধ্যমে চিরন্তন মরণশীলতাকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছে। মহান শিল্প মানুষকে করেছে মহীয়ান। পার্থিব অস্তিত্বের সীমা থেকে মানুষকে অপর্থিব লোকের দিকে যাত্রার অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

পৃথিবীর শিল্প মানুষের অন্যতম ঐশ্বর্য, অতুলনীয় উত্তরাধিকার। কিন্তু দৃষ্টিকে উপলব্ধির পথে প্রবুদ্ধ করে তুলতে না পারলে শিল্পের ঐক্যতানে মনের তন্ত্রী অনুরণিত হয়ে ওঠে না। কোন এক শীতের প্রভাতে, শিল্পানুরাগী এক তরুণেব মনে সাঁচীব স্তূপ দর্শনে সমাগত যাত্রীদলের এক অরসিকের মন্তব্যে যে প্রত্যয়ের উদগম হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ এক অমূল্য শিল্প নিদান রূপে রচিত 'বিশ্বশিল্পের রূপরেখা' নামে পুস্তকখানি পেয়ে মনে গভীর প্রীতির সঞ্চার হল। বইখানা পডতে গিয়ে মনে হল এক অনুপ্রাণিত প্রদর্শকের হাত ধরে নির্গত হয়েছি তীর্থ পরিক্রমায়, চলেছি তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে. উদ্ভাসিত হচ্ছে মানসচিত্তে মানব সৃষ্টিব অপ্রমেয় সমাবোহ, যার মাধ্যমে রূপায়িত হযে উঠছে

*বিশ্বশিল্পের রূপরেখা: অলোক মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বাকুলিয়া হাউস, কলিকাতা ২৩

এক একটি সমাজ তার জীবন বৈচিত্র্য, বিস্তৃত মনন কল্পনা, জটিল প্রয়োগ কৌশল নিয়ে কালকে অতিক্রম করে অনন্তলোকের পরিবেশে। এ এক অভূত-পূর্ব অভিজ্ঞতা।

পাশ্চাত্যের বহু তীর্থকামীর দৃষ্টি সে সব দেশের ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর শিল্পসম্ভার অনুরাগী পাঠকদের কাছে বহুদিন থেকেই উপস্থিত করে আসছে। সম্পদের অভাবে বাংলা ভাষার যে দীনতা ছিল তার অনেকটাই অপনোদিত হল এই পুস্তকের মাধ্যমে। গ্রন্থকার পরিক্রমায় নিয়ে চলেছেন আমাদের এগারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সুদূর অতীত, আদিম যুগ থেকে এক দীর্ঘ প্রসারিত বহু সভ্যতার লীলাক্ষেত্রে পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত যে বিস্তৃত অঞ্চলে যুগের পর যুগ ধরে উন্মোচিত হয়েছে শিল্প-কীর্তির অসংখ্য নিদর্শন। মেসোপোটেমিয়া থেকে মিশর, ইরান থেকে গ্রীকো-রোমক কর্মভূমি এবং খ্রীষ্টীয় ইয়োরোপ, বিশেষ করে ইটালী, বাইজেনটাইন রোমানেস্ক ও গথিকের অপর্যাপ্ত শিল্পকীর্তির যে বিস্তৃত ধারাবিবরণ এখানে গ্রথিত হয়েছে, সুখশ্রাবী সেই উন্নত রসাত্মক বর্ণনার তুলনা একান্তই বিরল। মনে হয় গ্রন্থকারের সঙ্গে যেন চলেছি এক বিচিত্র অভিযানে, যার পদে পদে বিস্ময়, ক্ষণে ক্ষণে নূতন চমক। এ যেন এক সঁ এৎ লুমিয়ে যাতে করে প্রত্যুদ্ভাসিত হচ্ছে বর্তমানের কালাবশিষ্ট কীর্তিস্মারকগুলিকে অতিক্রম করে জাগ্রত জীবনের প্রবহমান সৃষ্টি-প্রয়াস। গভীর অরণ্য বিস্তারের অন্তরালে আদিম মানুষের হাতে বৃক্ষদেহ শিলাখণ্ড জন্তুর অস্থি হাতির দাঁত বা ধাতুর আধারে গড়ে ওঠা ভাব এবং উপলব্ধি-ভিত্তিক নানা নক্সা আর আকৃতি। ক্রমে পরশুরামের কুঠারাঘাতে বিযুক্ত হল অরণ্য, বলরাম এলেন তার লাঙ্গল নিয়ে, গড়ে উঠল সভ্যতা, প্রতিষ্ঠিত হল নগর—মানুষ আকৃতি দিল দেবতাকে—ভূপৃষ্ঠে নক্সা টেনে তার উপর উত্তুঙ্গ করে নির্মাণ করল মন্দির আর প্রাসাদ।

খরস্রোতে বয়ে চলেছে নদী ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস, তারই স্নেহচ্ছায়ায় গড়ে উঠছে সুমের আর অক্কাদ, উর আর কীশ, তাদের জিগুরাত প্রাসাদ আর দেবতাদের নিয়ে। চলুন যাই এখান থেকে আরেক নদের দেশ মিশরে। মরু-ভূমির গা ঘেঁষে নীলের প্রবহমান জীবনধারাবাহী ঘন সরিৎ স্রোতে পুষ্ট হয়ে দাঁড়াল বিশাল দেহ মন্দির, গগনচুম্বী সমাধি-সৌধ পিরামিড; উত্তর আর

দক্ষিণ মিশরে সম্মিলিত সাম্রাজ্যের অমিত প্রতাপ অধীশ্বর ফারাও আর তাদের উপাস্য দেবতারা নিজ নিজ চরিত্র অভিনয় করে গেলেন বিস্তীর্ণ রঙ্গমঞ্চে।

পট পরিবর্তন ঘটল, অকস্মাৎ দৃষ্টি প্রসারিত হল পূর্বদিগন্তে আহুর মাজদার জ্যোতিচ্ছটায় উদ্ভাসিত পারসিপলিসকে ভিত্তি করে—উৎসারিত হল শতস্তম্ভ খচিত বৃহৎ সমাবেশ গৃহ, বিচিত্র পশুমূর্তি আর প্রচণ্ড শক্তির অভিপ্রকাশ। কালের দামামা বাজছে। দৃশ্যপটের পরিবর্তন নিয়ে এল অভিযাত্রীকে স্বগৃহের অঙ্গনে, যেখানে অভিনীত হল এক দৃশ্যকাব্য সিন্ধুতীর থেকে গঙ্গা যমুনার অববাহিকা বেয়ে। দেখা গেল জমাট পাষাণকে মূর্ত করে তুলতে বিগলিত করুণার কায়াবৃত্ত রূপে, ভগবান বুদ্ধের মূর্তিতে মায়াবতী যক্ষকন্যাদের ক্বণিত নূপুরের দ্রুত যমকের গতি, ছায়া ছায়া পথ ধরে যাত্রীরা এগিয়ে চলল, দক্ষিণাভিমুখে—নর্মদা গোদাবরী অতিক্রম করে কবেরীর তীর ধরে—আকাশ মণ্ডলের প্রতীক স্তূপের সমারোহ দেখে অমরাবতীর গতিপ্রবন জনোচ্ছ্বাসকে পাশে রেখে মহাবলীপুরের সমুদ্রবীচি বিক্ষুব্ধ বেলাভূমির তীরে—সেখান থেকে মেরুপর্বতের মত মন্দির সমূহ পরিক্রমা করে—নৃত্যপর নটরাজের মূর্তির সম্মুখে আভূমি প্রণত হয়ে পরিসমাপ্ত হল এই মহাযাত্রা।

নূতন দৃশ্যপট। সুদূর ভূমধ্যসাগরের তীরে উন্মোচিত হচ্ছে এক নূতন সভ্যতার নির্মোক' রূপবতী হেলেনিক দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করল এক নবাগত জনগোষ্ঠী। গড়ে তুলল নূতন সভ্যতা ক্রীটে মাইসিনিতে ইজিয়ান সাগরের তীরে। সৃষ্টি হল কত মন্দির মর্মরের কঠিনতা বিমোচিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল লীলালাস্য দার্ঢ্য আর প্রজ্ঞামণ্ডিত কত মূর্তি, কয়েক শতাব্দীর ধ্রুপদী সভ্যতার পরিচয় ছড়িয়ে রইল কিছু রূপদ্রষ্টা শিল্পীর অনবদ্য রচনায়। হেলেনিষ্টিক অন্তপ্রভার দ্যুতি এসে পৌছল ইট্রুরিয়ার—সেখান থেকে রোমে—বহুবিস্তৃত সম্রাজ্যের সম্পদ সংগৃহীত হয়ে রূপায়িত হয়ে উঠল বহু মন্দিরে, বিজয়-তোরণে, ক্রীড়া কেন্দ্রে, হেলেনিক মূর্তির প্রতিরূপায়নে, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্যে। তার পর একদিন রোমক জগতে উপনীত হল খ্রীষ্টের বাণী গ্রীকো-রোমক চিন্তা কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে খ্রীস্টীয় পাপবোধ ও দুঃখ বরণের আবরণ প্রসারিত হল অবগুণ্ঠনের মত। এই অবগুণ্ঠনের আন্তরাল ভেদ করে খ্রীস্টীয় ধ্যানধারণাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠল মিলিত আরাধনার সমাবেশ ক্ষেত্র প্রার্থনাগৃহ আর এই দৃঢ়-ভিত্তিক

ইমারতের অলঙ্করণে সৃস্ট প্রতীক প্রবণ মূর্তি। বিভক্ত রোমক সাম্রাজ্যের প্রারম্ভিক খ্রীষ্টীয় কেন্দ্র বাইজান্টিয়মের (কনস্টান্টিনোপল) সাণ্টা সোফিয়া আর রোমের সেণ্ট পিটারের ব্যাসিলিকায় যার সূত্রপাত হয়েছিল ক্রমে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করল ব্যাপকভাবে ইটালীতে স্পেনে ফরাসী দেশে—, রোমানেস্ক থেকে বিবর্তিত হল দৃঢ়সংবদ্ধ আকাশের দিকে দেহ-প্রসারী গথিক ক্যাথিড্রালে। একটা আদর্শ, একটা ধ্যান একটা কল্পনাকে অবলম্বন করে খ্রীষ্টীয় মানস অকল্পনীয় একটা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তুলল, গ্রথিত করল এই স্বপ্ন মন্দিরের প্রাচীরে যীশু আর সাধুসন্তদের নানা মূর্তি, ধ্যানে, আত্মমগ্নতায় মানব দরদে পরিপ্লুত আনন ও অবয়বে সমৃদ্ধ।

যাত্রানির্দেশক এবং তীর্থপরিক্রমনের সহযাত্রী হিসাবে গ্রন্থকারের সাফল্য তুলনাতীত। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্য শিল্পের বিস্তৃত মহাসত্র পরিক্রমনের যে উপচয় তিনি সমুপস্থিত করেছেন তার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশীলন ও বিশ্লেষণ প্রয়াসীদের জন্য লেখকের বিস্তৃতি ধর্মী বৈশিষ্ট্য সচেতন বিবরণ। ব্যাপক টীকা এবং জটীল পরিভাষা স্বভাবতই গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করবে। গ্রন্থকারের নিকটে ভবিষ্যতে বিস্তৃততর শিল্প পরিচিতির প্রত্যাশা রইল।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শানু লাহিড়ী

বর্তমান ভারতের অন্যতম প্রথিতযশা শিল্পী শানু লাহিড়ী। জন্ম কলকাতায় ১৯২৮ সালে। সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। গুরু হিসেবে বিশেষ কোন শিল্পীর কাছে পৃথক শিক্ষা নেন নি। হয়তো অনেকেই তাঁর শিল্পগুরু, অথবা কেউই নন। শিল্পীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মনে হতে পারে, এই বিশ্বজগৎ এবং জীবনই তাঁর শিক্ষাগুরু।

প্রায় তিরিশ বছর আগে ১৯৫০-এ তাঁর প্রথম প্রদর্শনী হয়। সেই থেকে ভারতবর্ষের বহু স্থানে ও বিদেশে তাঁর একক প্রদর্শনী হয়েছে। বর্তমানে শ্রীমতী শানু লাহিড়ী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে অধ্যাপিকা হিসেবে যুক্ত আছেন।

নির্মল দে

কয়েকটি বিদেশী কবিতা

•

মাতিদিয়েস ক্লাউদিয়েস

মৃত্যু ও বালিকা

বালিকা : ফিরে যাও, ওহে, ফিরে যাও আরো
যাও, পুরুষকঙ্কাল, নৃশংস
এখনো তরুণী আমি, যাও, করো
অনুগ্রহ, আমারে কোরো না স্পর্শ।

মৃত্যু : হাত রাখো হাতে, রূপবতী, বিনম্রস্বভাবী
বন্ধু আমি, শাস্তি দিতে আসি নি তোমারে
ভয় নেই, নৃশংস নই আমি
আমারি দুবাহু জুড়ে ঘুমোবে অঘোরে।

আনদ্রিযাস গ্রাইফিউস

সরাইখানায় জায়গা নেই

এখানে তোমার কোনো স্থান নেই, জনতার ভিড়ে ভ'রে আছে ঘর
কেন? যা রে নিয়ে আয়, পৃথিবী নিজেই, যেন তার খুব ছোট পরিসর।

সময় ভাবনা

এসব বছর আমার নয় যা সময় আমার নিয়েছে কেড়ে
এসব বছর আমার নয় যা আসতে পারে বা কখনো ফিরে
মুহূর্ত আমার, আর যদি আমি তাতে মনোযোগ দি' নিজে
তবে সে আমার, সময় এবং শাশ্বত করেছে তৈরি যে।

ফ্রিডরিখ ফন্ লোগাউ

মে

একটি চুম্বন যেন এই মাস আকাশ যা দেয় ধরিত্রীরে
হতে এইক্ষণে তারি নববধূ, আর মা হতে অনতিদূরে।

সুনীথ মজুমদার

কলিকাতা প্রসঙ্গে

উত্তরসূরি সম্পাদক সমীপেষু
মাননীয় মহাশয়,

উত্তরসূরির ১০১-১০২ সংখ্যাটি বাংলা সাহিত্য-পত্রিকার জগতে নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় সংখ্যা বলে বিবেচিত হবে। বিশেষ করে ভাষাচার্য সুকুমার সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি এবং তাঁর "ক'লকাতা গোড়ায় কলকাতায় ছিল কি" নামক প্রবন্ধটি, অতি বিরল সংযোজন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উক্ত বিষয়টি নিয়ে যে প্রবল তর্ক বিতর্ক হবে, তা স্বয়ং আচার্যই তাঁর রচনার শেষে ব্যক্ত করেছেন। চূড়ান্ত মত কি হবে তা অবশ্য এখনই কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই অভিনব এবং চমকপ্রদ তথ্যটি যেভাবে পরিণত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাতে আমাদের অনুসন্ধিৎসা প্রবল হয়ে উঠেছে। আশা করি মাননীয় পণ্ডিতবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট মহল শীঘ্রই এ বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াবেন।

একজন অতি সাধারণ পাঠক হিসাবে আমি শুধু দু'টি ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা আপনার পত্রিকা মারফৎ ব্যক্ত করতে চাই। আশা করি শ্রদ্ধেয়রা আমার প্রগল্ভতা নিজগুণে মার্জনা করবেন।

ভাষাচার্য তাঁর রচনার এক জায়গায় [পৃঃ ৪১] লিখেছেন সুতানটী নামের ইংরেজী বানান, তারিখের ক্রম অনুসারে

১৭০০ খ্রীঃ CHUTANUTTE
CHUTANUTTY
১৭১১ খ্রীঃ CHUTTY NUTTY
CHITTA NUTTE

কিন্তু হবসন্ জবসনের ১৭১১ সালের গ্রন্থ The English Pilot থেকে তাঁরই উদ্ধৃত করা অংশে দেখছি : CHITTY NUTTY

এই বানানটি উপরে উল্লিখিত তালিকার কোনোটির সঙ্গেই মেলে না। তাহলে CHITTA NUTTE এই বানানটি নিশ্চয়ই তিনি অন্য উৎস থেকে পেয়েছেন। সেই উৎসটি কি ?

আবার ৪৩ পৃষ্ঠায় জেমস লঙের "Selections From Unpublished Records Of Government [Fort William For The Years 1748-67" থেকে হুগলী ফৌজদারের চারমাসের জন্য খাজনার তালিকাটিতে দ্বিতীয় অঞ্চলটি'র [Govind Poor] বাংলা বানান, 'গোবিন্দ্পুর' হবে না 'গোবিন্দপুর' ?

সুতানুটী নামটির উৎস বিশ্লেষণ খুবই সার্থক বলে মনে হয়। ইতি

শ্যামলকুমার বিশ্বাস
পল্লীশ্রী। শ্যামনগর

উত্তরসূরি'র নিয়মাবলী

১. কপি রেখে লেখা পাঠান প্রয়োজন। লেখা হারিয়ে গেলে উত্তরসূরি কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

২ লেখা ভালো লাগলেই প্রকাশিত হবে। সব সময় সকল চিঠি দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। আশা করি এ জন্য কোন নবীন লেখক দুঃখ বোধ করবেন না।

৩. শতকরা ২৫% এজেন্সী কমিশন। একসঙ্গে ১০ বা ততোধিক কপি নিলেই কমিশন দেওয়া হয়।

৪ উত্তরসূরির বহুল প্রচারের অর্থ রাজনীতি-বর্জিত, দক্ষিণ-বাম বর্জিত, শুদ্ধ মানবিকতা-ভিত্তিক সাহিত্য প্রচেষ্টার ব্যাপ্তি।

কার্যালয়ঃ ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড কলকাতা-৫০

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টম্যান, ১১৬ বিবেকানন্দ রোড থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ক বি তা প ড়ু ন

বৃষ্টি পড়ে,
ছাতাঅলা গলির ভিতরে।
গঙ্গা
বেত্রবতী নদী নয় শিপ্রা নয়, তবু তার সংজ্ঞা
সেই জলে, সেই মেঘে, হাওয়ায় প্রবাহে। অমিয় চক্রবর্তী

পূর্ণলোহ যৌবনের মধ্যাহ্ন ভাস্কর
সেদিন জ্বলিতেছিল এ দেহ-অম্বরে।
দিকে দিগন্তরে
সমীর শ্বসিতেছিলো অগ্নিবর্ষী শ্বাস।
চক্ষে ভরি' ত্রাস,
তুমি কেন ঝাঁপ দিলে সে ধ্বংস-উৎসবে? : মনীশ ঘটক

মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই।
হে-ইডি,' হাইডি হাই।
হে-ইডি, হাইডি হা-ই। : প্রেমেন্দ্র মিত্র

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি
কোথায় ঘোড়সওয়ার? . বিষ্ণু দে

একমাত্র এই আশা নিয়ে আমি টিঁকে আছি যে কাঠের চেয়ার টেবিল দুটো একদিন শিকড় গজিয়ে মাটি থেকে রস টানতে শুরু করবে এবং সেই সঙ্গে আমি এই সব আলো হাওয়ার শরিক হ'য়ে যাব। : অরুণ মিত্র

বিশ্বভারতী

মিতাক্ষরা দায়বিভাগ	সুখময় ভট্টাচার্য	৩·০০
মীমাংসা দর্শন	সুখময় ভট্টাচার্য	১ ০০
তন্ত্রপরিচয়	সুখময় ভট্টাচার্য	২·০০
শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার	সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২ ৫০
রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা	নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১২·০০
পরশুরাম রায়ের মাধবসংগীত	অমিতাভ চৌধুরী	১৫·০০
উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা	যোগীরাজ বসু	৩ ০০
স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য	পশুপতি শাশমল	৩৪·০০
রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন	সান্ত্বনা মজুমদার	২৩·০০
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ	অমিয়কুমার সেন	৩ ০০

পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত

পুঁথি-পরিচয়ঃ ১ম ১০·০০, ২য় ১৫·০০, ৩য় ১৭·০০, ৪র্থ ৫০ ০০

সাহিত্যপ্রকাশিকাঃ ২য় ৬ ০০, ৩য় ৮·০০, ৪র্থ ১৫ ০০, ৫ম ১২·০০, ষষ্ঠ ২০·০০

গোর্খবিজয়ঃ ৫ ০০ **চিঠিপত্রে সমাজচিত্রঃ** ১ম ১৪ ০০

গবেষণা প্রকাশন সমিতি
শান্তিনিকেতন

প্রকাশিত হলো :

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুবাদিত

মহাপৃথিবীর কবিতা

প্রচ্ছদ ॥ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৮.০০ টাকা

পরিবেশক কথাশিল্প ॥ ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলকাতা ৭০০০৭৩

... ...

প্রকাশিতব্য :

অরুণ ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ

সমুদ্র কাছে এসো

প্রচ্ছদ মলয়শংকর দাশগুপ্ত

মূল্য ৮.০০ টাকা

উত্তরসূরি প্রকাশনী ॥ পরিবেশক . ইণ্ডিয়ানা ॥ দে'জ পাবলিশিং

.. ..

শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত

জিজ্ঞাসা (ত্রৈমাসিক পত্র)

অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অসীম রায় এবং

সীতাংশু চট্টোপাধ্যায় . সম্পাদকমণ্ডলী।

গ্রাহক মূল্য : ২০.০০ বার্ষিক

কার্যালয় : ৪, জগদীশনাথ রায় লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬

Major Modern Plays

HENRIK IBSEN

A Doll's House

edited by J W. MCFARLANE & N. EZEKIEL — Rs 6

J M SYNGE

Riders to the Sea & The Play boy of the Western World

edited by R K KAUL — Rs 7

T S ELIOT

Murder in the Cathedral

edited by NEVILL COGHILL — Rs 6 50

The Family Reunion

edited by NEVILL COGHILL — Rs 10

BERTOLT BRECHT

The Life of Galileo

edited by A G STOCK — Rs 4 50

JEAN GENET

The Balcony — £ 1 35

SAMUEL BECKETT

Waiting for Godot — £ 0 75

JOHN OSBORNE

Look Back in Anger — £ 0 85
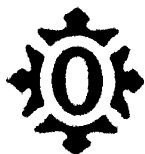
OXFORD UNIVERSITY PRESS
P 17 Mission Row Extension
Calcutta 700 013

DELHI *BOMBAY* *MADRAS*

Some outstanding periodicals published by the University of Calcutta

1. Journal of the Department of English (Bi-annual)
2. Journal of the Department of Philosophy (Annual)
3. Journal of Ancient Indian History (Annual)
4. Calcutta Historical Journal (Bi-annual)
5. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (বার্ষিক)
6. Business Studies Published Half-yearly
7. Bulletin of the Department of Comparative Philology Published Annually

For other information please contact.

Dr. Subhash Chandra Bannerjee M A., P. R. S., Ph. D.
Secretary, U C A C, Secretary, Board of Editors:
Departmental Journal,
Asutosh Buildings, Calcutta University, Calcutta 700 073

বিনয় ঘোষ

বাংলার নবজাগৃতি

গত তিন দশক যাবৎ একটি আকর-গ্রন্থ হিসাবে বহুমানিত রচনার পরিবর্ধিত সংস্করণ। 'নব-জাগরণে'র পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির অভিনবত্ব বইটিকে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-বিশ্লেষণের জোরালো হাতিয়ার ক'রে তুলেছে। আলোচিত প্রসঙ্গ : নবজাগৃতি-কেন্দ্র কলিকাতা, বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতি-সমন্বয়, নবজাগৃতির ভাববিপ্লব, বাংলার নবজাগরণ—সমীক্ষা ও সমালোচনা, বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা। বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জীসহ। দাম ১৫ টাকা।

॥ লেখকের আরো বই ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

৩য় খণ্ডের একত্র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। ৩০ টাকা

মেট্রোপলিটন মন • মধ্যবিত্ত • বিদ্রোহ

দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৫ টাকা

ওরিয়েন্ট লংম্যান

১৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭২

বোম্বাই নয়াদিল্লী মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ বাঙ্গালোর পাটনা

সম্প্রতি প্রকাশিত

গীতাঞ্জলি • নৈবেদ্য

পকেট সংস্করণ দুটি বই একটি প্যাকেটে। মূল্য ৫.০০ টাকা

গীতাঞ্জলি ও নৈবেদ্য গ্রন্থ দু'টির পকেট সংস্করণ পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। তাঁদেরই আগ্রহে গ্রন্থ দুটি পুনরায় প্রকাশ করা হল। গ্রন্থ দু'টির মূল্য যতদূর সম্ভব কম ধার্য করা হয়েছে বলে সর্বসাধারণকে কোনো কমিশন দেওয়া সম্ভব হবে না—পুস্তকবিক্রেতারা শতকরা দশভাগ কমিশন পাবেন।

রাখী

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১২৯১) থেকে 'স্ফুলিঙ্গ' (১৩৫২) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল কাব্যভাণ্ডার থেকে নির্বাচিত প্রেমের কবিতা সংকলন। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই এবং একাধিক রঙীন চিত্রবিভূষিত এই সংকলন-গ্রন্থটি বিশেষভাবে উপহারোপযোগী। মূল্য ৩০.০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

বিক্রয়কেন্দ্র : ২, কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥

শূদ্রক-বিরচিত

মৃচ্ছকটিক ৯·০০

অনুবাদ : শ্রীসুকুমারী ভট্টাচার্য

Folk Tales of Bihar-এর বঙ্গানুবাদ

বিহারের লোককাহিনী ৯·০০

অনুবাদ . শ্রীপ্রদোষ চন্দ্র রায়চৌধুরী

উর্দু উপন্যাস 'এক চাদর মইলি সি'-এর বঙ্গানুবাদ

ময়লা চাদর ৫ ০০

অনুবাদ ' শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রীসুকুমার সেনের

বাংলার সাহিত্য ইতিহাস ১৫ ০০

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা ৭০০০২৯ ফোন : 46-1399

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য--ড. প্রভাময়ী দেবী। ৬ ৫০

বাঙ্গালীর সমাজচিন্তা—ড. ফুলরেণু গুহ। ৬ ০০

ভারতীয় বনৌষধি—ড. কালিপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ ॥ মুখ্য সম্পাদিকা ড: অসীমা চট্টোপাধ্যায়। প্রতি খণ্ড মূল্য। ৩০·০০

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২০·০০

লোকনাট্য ও যাত্রাগান—মন্মথ রায়। ৫ ০০

প্রাচীন কবিওয়ালার গান—ড প্রফুল্লচন্দ্র পাল। ১৫·০০

ঋষি কবি গুণী শিল্পী—দিলীপকুমার রায়। ৬·০০

প্রকাশন বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮, হাজরা রোড। কলিকাতা ৭০০ ০১৯

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা প্রকাশনা

লেখক	মূল্য	বই
রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতি সম্ভার	১২'০০	রবীন্দ্র সুভাষিত
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫ ৫০	দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
ড হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২০'০০	বিশ্ব-জিজ্ঞাসা
	৮'০০	রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব
	৪'৭৫	ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩ ৭৫	যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দ মীমাংসা
শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত	১০'০০	রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী
ড. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৯ ০০	শিব-ভাবনা
শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৩'০০	রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫'০০	সংগীত-চন্দ্রিকা
শার্ঙ্গদেব	১৮'০০	সংগীত রত্নাকর
হরিশচন্দ্র সান্যাল	২'৫০	চৈতন্যোদয়
	৩'০০	জ্ঞানদর্পণ
বেনিডেট্টো ক্রোচে	১৫'০০	শিল্পতত্ত্ব
ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬ ০০	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ড গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	১৬'৫০	বাংলা লোকনাট্য-সমীক্ষা
ড সুধীরকুমার নন্দী	১৪'০০	রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ
ড অরুণকুমার বসু	৪৫'০০	বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত
শ্রীঅমর ঘোষ	৫০'০০	পট-দীপ-ধ্বনি

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা ৭০০০০৭

এমারেল্ড বাওয়ার, ৫৬এ, বি. টি. রোড, কলকাতা ৭০০০৫০

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা, ১এ, কলেজ রো ও ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
প ত্রা ব লী
বঙ্গভাষায় এই প্রথম

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে লেখা যাবতীয় পত্র—সংখ্যায় দেড় শতের অধিক—এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। মাইকেল মধুসূদনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়ার এক আশ্চর্য উপকরণ।

প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজিত।

মূল ইংরেজি থেকে অনুদিত ও সম্পাদিত : **সুশীল রায়** ১৫·০০

দেবনারায়ণ গুপ্তে'র
উইংস-এর আড়ালে
(নট ও নটীদের বিচিত্র সব বিবরণ) মূল্য · দশ টাকা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
চক্রবাল
(প্রবন্ধ সংকলন) মূল্য : আট টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

উত্তরসূরি · নিয়মাবলী

১ লেখা কপি রেখে পাঠান।

২ প্রকাশনযোগ্য বিবেচিত হলে অবশ্যই ছাপা হবে। চিঠি লেখার প্রয়োজন নেই।

৩. উত্তরসূরি কোন দল বা মতে বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাস করে, লেখা 'হয়ে উঠেছে' কিনা তার ওপর। বিশ্বাস করে, চিরকালের শিল্পসাহিত্য রাজনীতি-দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

৪. কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন কোন অবস্থাতেই প্রকাশিত হয় না।

৫. ২১ বর্ষ থেকে গ্রাহক মূল্য সডাক বার্ষিক টা ১৫·০০। এম. ও. করে স্পষ্ট ঠিকানা লিখে পাঠান।

৬. সুস্থ কবিতা-আন্দোলনে সাহায্য করুন। প্রচার থেকে বিরত হ'ন।

সম্পাদক ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫০

ফোন : ৫২-২৪৫২

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

১ গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করুন।

২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখুন।

৩. শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন।

৪ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করুন।

৫. শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করুন। শিক্ষায় শ্রমজীবী জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

৬. ক্ষেতমজুর বর্গাদারসহ সমস্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করুন। কৃষির উন্নতি ও ভূমি সংস্কারের কাজ জোরদার করুন।

৭ এই রাজ্যের শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করুন।

৮. জনগণ ও সরকারের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করুন।

৯ প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আই. সি. এ. ৩৫৬৪।৮০

When a rolling stone gathers moss
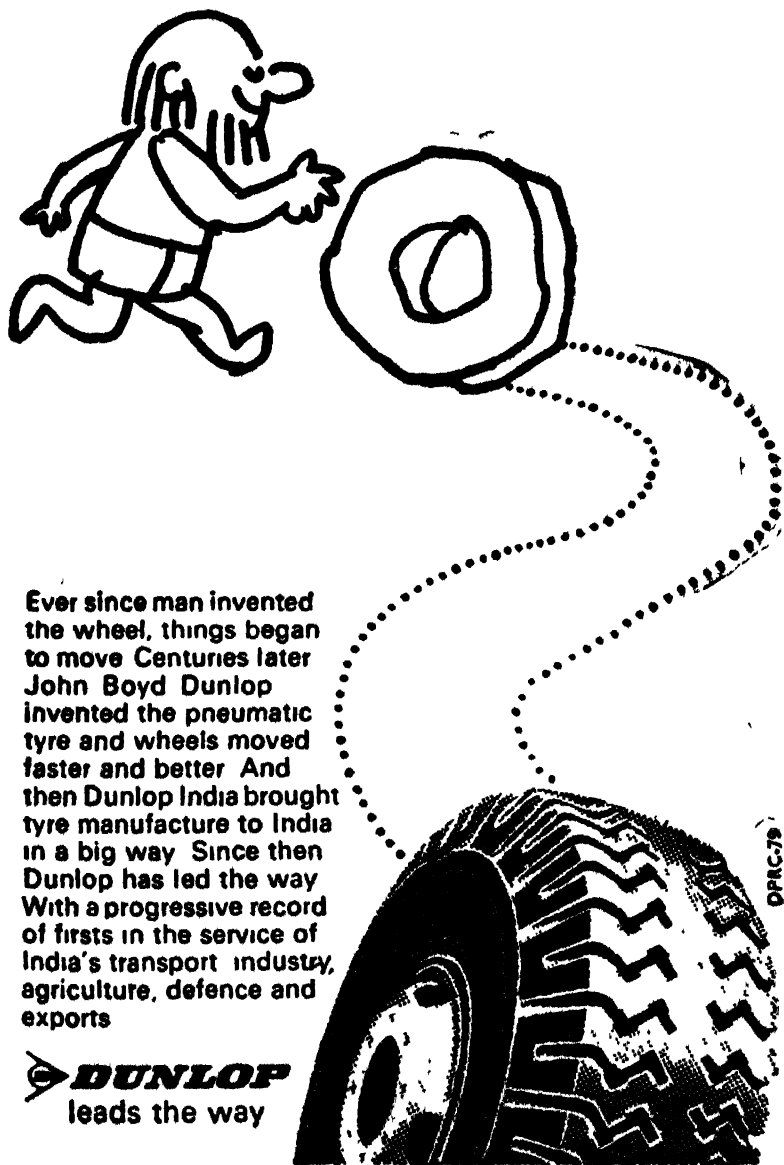
Ever since man invented the wheel, things began to move Centuries later John Boyd Dunlop invented the pneumatic tyre and wheels moved faster and better And then Dunlop India brought tyre manufacture to India in a big way Since then Dunlop has led the way With a progressive record of firsts in the service of India's transport industry, agriculture, defence and exports

DUNLOP
leads the way

এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা মেঘের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ। তরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। উন্মুক্ত, অবাধ। অথচ আমরা যারা এই কলকাতা শহরের মানুষ, তাদের চলার গতি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই দুরূহ সমস্যাটাকে মনে রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

যানবাহনের জগতে ভূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে এমন এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ হবে শরতের মেঘের মতই উন্মুক্ত, অবাধ আর বিঘ্নহীন। ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি।

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচুন

নিজের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করুন।

অন্যের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে পারতেন। ঝঞ্ঝাটের শেষ থাকত না;

পুরো ভাড়া এবং জরিমানা, মাঝ পথেই বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়া, ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস, ভাগ্য খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে।

অথৈ জলে শুধু শুধু ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন? মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে। পূর্ব রেলওয়েতে অন্যের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য লোক ধরা পড়ছেন।

টাকা দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন না। অনুমোদিত সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত । ৯বি-৮ কে. সি. রোড, কলকাতা ৫০

ফোন ৫২-২৪৫২

সকল কাজে সকল সাজে

'তন্তুজ'

বাংলার তাঁতের কাপড়

ন্যায্য দাম • সঠিক মাপ • পাকা রং • নিখুঁত বোনা

তন্তুজ দোকানে জনতা শাড়ী পাওয়া যায়।

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়:
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০০৪
ফোন: ৩৫ ৩৬৫৮

নগর কার্যালয়:
৪৫, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭২
ফোন ২৭-৮০১২

॥ জাতির সেবায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন ॥

নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থায় অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল সরবরাহে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশনের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নে আমাদের অক্লান্ত প্রয়াস এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের শিল্প উপনগরী আজ নূতন উদ্যোক্তাদের শিল্প ভাবনার প্রথম আশ্বাস। এই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সরকারী এবং মিশ্র উদ্যোগে অবিলম্বে একাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-সংস্থা গড়ে তোলার এক পরিকল্পনায় আমরা হাত দিয়েছি। কর্মসংস্থান ছাড়াও এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য নূতন উদ্যোক্তা তৈরী করা। বিপণন সহায়তায়ও আমরা সম্প্রতি এক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছি। রপ্তানীর ক্ষেত্রেও আমরা পিছিয়ে নেই। বাঁকুড়ার তৈরী বঁড়শি ইতিমধ্যেই পূর্ব ইউরোপে বিক্রি করা হয়েছে। চেষ্টা চলছে ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থায় উৎপাদিত আরও রপ্তানীযোগ্য জিনিষ খুঁজে বের করার।

॥ ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশে আমরা সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতাপ্রার্থী ॥

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন,
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, (৪র্থ তল) কলিকাতা ৭০০০১৩
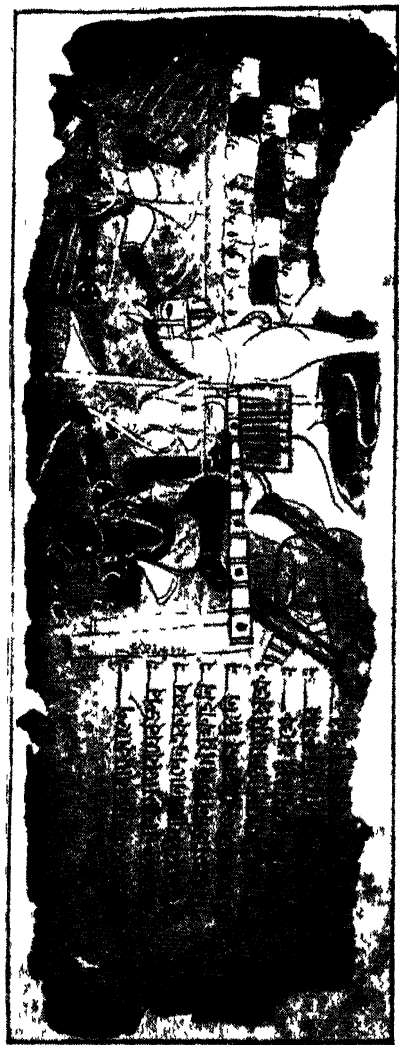
কবি পীতাম্বরের পুঁথি-র এক পৃষ্ঠা

সংগ্রহ : অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী

কবিতার জন্য আবেদন, ১৯৮০

"তরুণ তরুণতর কবিদের প্রতি ১৯৩০-৮০ পঞ্চাশ বছরের অস্থির দিনগুলি পার হয়েছে। বন্ধুগণ। এবার আপনারা র্যাঁবো বোদলেয়র অথবা এলুয়ার মায়াকভস্কি থেকে ফিরে আসুন মহাজন পদাবলী রামপ্রসাদের কবিতায়, শ্রীধর কথক নিধুবাবুর গানে। দেশের মাটির গন্ধ বুক ভরে নিন। ধর্মকে আবার স্ব-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। ধর্ম মানে কুসংস্কার নয়, ধর্ম মানে চিত্তের স্থিতির প্রতিবিম্ব, চৈতন্যের উন্মোচন। আসুন, একবার মা বলে তরী ভাসাই।"

উত্তরসূরির প্রচ্ছদে এবার থেকে এই কথাগুলি থাকছে। ইংরেজী ১৯৩০ এর কাছাকাছি সময় থেকে বাংলা কবিতায় 'আধুনিকতার সূত্রপাত বলে অনেকেই ধরে নিয়েছেন। 'আধুনিক' শব্দটি বহু বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, তথাপি এ বক্তব্যে বিতর্ক নেই যদি বলি জীবনানন্দ বা অমিয় চক্রবর্তী, বড় জোর মনীশ ঘটক বা সঞ্জয় ভট্টাচার্য ব্যতিরেকে আর যাঁরা প্রধান কবির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন বা করে আছেন তাঁদের অনেকেই মূলধন করেছিলেন তথাকথিত মননশীলতা, বলা যেতে পারে intellection—তাঁরা ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন, রুশ বা চিলির কবিতাকে মাথায় করে রেখেছিলেন, সেই সব কবিরা ছিলেন এঁদের আরাধ্য। কোনদিন তাঁদের আলোচনায় রামপ্রসাদ সেন বা নিধুবাবুর কথা জানা যায় নি। শ্রীচৈতন্য-পূর্ব এবং-উত্তর কবিগোষ্ঠীর কোন অস্তিত্ব ছিল না তাঁদের কাছে। জানা যায় নি বাংলাদেশের মাটির স্বাদ। অন্য একটি চরিত্র তাঁদের একদল গড়ে তুলেছিলেন, মানুষকে তাঁরা দুভাগে দেখাতে চেয়েছিলেন। শোষক, শোষিত। বিপ্লবের কথা বলেছেন কফি হাউসে বা বালিগঞ্জের ত্রিতল বাড়ির সোফায় বসে। যাঁরা ক্ষেত খামারে মাঠে ময়দানে বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁরা নমস্য, কিন্তু সাহিত্য করেন নি তাঁরা। মাটির স্বাদ পেয়েছিলেন একমাত্র মানিক, এই গোষ্ঠীর। কিন্তু আমি কবিতার কথা বলছি। উপন্যাস বা গল্পের নয়।

আসল কথা, আমরা মনের ভিতর তাকাই নি। চৈতন্যের যে বিরাট ব্যাপ্ত জগৎ তার অনুসন্ধান করি নি। ১৯৩০ থেকে ১৯৮০ এই পঞ্চাশবছর আমরা সাগরপারে তাকিয়েছি। দেশের বিপ্লবের যে কথা তারও পদ্ধতি সাগরপার

থেকে আমদানি করতে হয়েছে। 'বাংলার মুখ' জীবনানন্দের মত দু'চারজনই দেখেছিলেন—বাকি কবিগণ মানসজগতে র‍্যাঁবো বোদল্যের, এলুয়ার বা মায়াকভস্কি নিয়ে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। অবশ্যই তাঁদের কবিতা পড়ব, পড়ব হোমর, দান্তে শেকস্পীয়ার, ব্লেক কীটস বা ইয়েটস্, মালার্মে, রিল্‌কে অথবা পাউণ্ড। নাড়ীর টান থাকবে মাতৃভাষার সাহিত্যে। মহাজন পদাবলী বা নিধুবাবুকে স্মরণ করে ডুব দেবো অগাধ সরোবরে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের একালের শ্রেষ্ঠ স্থপতি, তবুও যেতে হবে শ্রীচৈতন্যের কাছে—যাঁর প্রত্যক্ষ লীলায় বঙ্গভূমিতে প্লাবন বয়েছিল ভক্তিরসের। মনে করব বাউল সাধকদের, এবং রামপ্রসাদকে, আমাদের যিনি মা-র কথা স্মরণ করিয়েছেন—মনের ভেতরে তাকাতে বলেছেন। পঞ্চাশ বছর কোন কবি সেকথা বলেন নি। তাঁরা শ্রীচৈতন্য বা রামপ্রসাদকে অচ্ছুৎ করে রেখেছিলেন। আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে বড় চরিত্রহনন এখানে হয়ে গিয়েছে।

যাঁরা শিল্পকে সমাজ-শিক্ষার হাতিয়ার মনে করেছেন তাঁরাও সেই মহাচিন্তানায়ক প্লেটোর মতই ভুল করছেন। কবিকে নির্বাসনে দেওয়া যায় না। কবির কাজ শিক্ষাদান নয়। শিক্ষার জন্য আমরা নানাবিধ পুস্তক পড়তে পারি, কবিতা নয়। সমাজ বিপ্লবের জন্য আমরা আন্দোলন করব, কবিতা লিখবো না॥ যুদ্ধে উত্তেজনার জন্য রণগীতি গাইতে পারি—তার দামামা আমাদের উত্তেজক মাদক দ্রব্যের কাজ করবে। কিন্তু বীণার ঝঙ্কারের প্রয়োজন পৃথক। আমরা কবিতাকে শিক্ষার বাহন হতে দিতে চাই না। কবিতা মানুষকে তার অন্তরের দীপ্তিকে ভাস্বর করবে—যদি শেখাতে হয় সেভাবেই সে আপনি শিখবে। শিক্ষাদানের জন্য কবিকে দিয়ে কবিতা লেখাবার দরকার হবে না। কবি একমাত্র নিজের রাজ্যে রাজা, অন্য কারো গোলাম নয়।

কবিতাকে সহজ এবং স্ফটিকস্বচ্ছ হতে হবে। স্থির দীঘিজলে যেন হাঁসের পালকের ভাঁজ দেখা যায়। কবিতা যুক্তি-নির্ভর নয়—কবিতা হৃদয়ের আর্তি-নির্ভর। কবিতা কবির দক্ষতা প্রমাণ করে না, কবিতা কবিকে হৃদয়বান হতে সাহায্য করে। কবিতা ধর্মের নামাবলীও নয়, কবিতা স্বয়ং ধর্ম। কবিতা মিস্টিক ভাবনাসঞ্জাত, কবিতার রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত। চিরকালই সে রহস্যাবৃত থাকবে মনে হয়।

কবিতা বাইরের কথা বলে না, অন্তরের ধ্বনি প্রকাশ করে। আমরা গত পঞ্চাশ বছরে বড বেশী চতুরালি শিখেছি। আসুন, চাতুর্য বাদ দিয়ে ভক্তির কথা নিবেদন করি। সংশয় বাদ দিয়ে বিশ্বাসের কথা বলি। প্রজ্ঞা থেকে স্বজ্ঞায় যাবার পথ খুঁজি। বিদেশী কবিদের 'ম্যানিফেস্টো' না ঘেঁটে জন্মভূমির ঘন গূঢ় গাঢ় রস আস্বাদন করি।

কেউ কেউ মাঝেমধ্যে বলে থাকেন, সাহিত্য শিল্পকে জীবনমুখী হতে হবে। কোন্ দেশের কোন্ প্রধান কবি জীবনবিমুখ? কোন্ বড সাহিত্য শিল্প জীবনবিমুখ? এমন কি বেতাল পঞ্চবিংশতি বা দৈত্যদানোর কাহিনী? তাই কি জীবনবিমুখ? যে কোন মহান ভাবনা-কল্পনাই মানব-চিন্তা থেকে সঞ্জাত। শিল্প বা কবিতা হিসেবে তা সুনীতি বা কুনীতিগ্রস্ত সেটা শিল্পের প্রশ্ন নয়। বিপ্লব আনছে কি না তাও প্রশ্ন নয়। শিল্পের প্রশ্ন সুন্দরের ধ্যানে আমরা নিবিষ্ট হতে পেরেছি কি না। কতদূর পেরেছি। সেই সুন্দরের কাছে কবিতা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কি না।—যে সুন্দর জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা, ঝড ঝঞ্ঝার সঙ্গে একাত্ম।

পণ্ডিত মশাইরা অনেক বড বড় কথা বলেছেন। এবার আসুন, আমরা নিজেদের অন্তরের ধ্বনি শুনি। শুভ চৈতন্যের কাছে আত্মনিবেদন করি। বুদ্ধিজীবীর বৈঠকখানা থেকে কবিতাকে উদ্ধার করে ঘাসফুলের ওপর দাঁড করাই। সাগরপারের স্তুতিগানে মুখর হয়ে যাঁরা বাংলা কবিতার ঐশ্বর্যকে একপাশে সরিয়ে রেখে নাক সিঁটকেছেন, মহাদেবের-জন্য তপস্যায়-নিরতা উমার কথাগুলি তাঁদের স্মরণ করতে বলি, যখন তিনি শিবের নিন্দাভাজন দুর্মুখকে বলেছিলেন

নিবার্য্যতামালি। কিমপ্যয়ং বটুঃ পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥

(কুমারসম্ভবম্ ৫।৮৩)

সখি, দুর্মুখকে নিরস্ত কর। স্ফুরিত ঠোঁট দেখে মনে হয় আরো কিছু পাপকথা বলবে। মহতের নিন্দা করে যে, সে তো পাপীই—যে শোনে তারও পাপ হয়।

স্বনামধন্য কালিপদ পাঠক নিধুবাবুর একটি গান শেখাবার সময় আমার গানের খাতায় নিজের হাতে এটি লিখে দিয়েছিলেন। খাম্বাজ রাগিণীতে,

যৎ তালে বাঁধা সেই বাংলা গানের অনুরণন অনুভব করুন। মিলিয়ে নিন বাংলাদেশের প্রগাঢ় প্রেমচৈতন্যের সঙ্গে

ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
(আমি) দেখতে বড় ভালবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি
দেখা দিতে আসি নে।

কবিতার কাছে শিল্পের কাছে সুন্দরের কাছে এই হচ্ছে আত্মনিবেদন। মহৎ কবিতার মধ্যে নিহিত আছে মন্ত্রশক্তি। তাঁর কাজ চৈতন্যের উন্মোচন। সেই মন্ত্রধ্বনি আবার ধ্যানচিত্তে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

অরুণ ভট্টাচার্য

মন্ত্রধ্বনি, কাব্যপাঠ এবং স্বররহস্য

অযোধ্যানাথ সান্যাল

লৌকিক ভাষায় যেরূপ বিভিন্ন স্বরশ্রবণে মনুষ্য হৃদয়ের ভাবাভিব্যক্তির গ্রহণ হয়—বৈদিক ভাষায়ও তদ্রূপ বৈদিক ঋষিগণের মনোভাব তদীয় স্বরের দ্বারা প্রকট হইয়া থাকে। বহুবৎসর পূর্বে বৈদিক ঋষিগণ সমাহিত অবস্থায় যে স্বর-ঝঙ্কার শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহারই নিদর্শন বেদে উপলব্ধ হয়। প্রাচীন ভারতে যাগের অনুষ্ঠানকালে সস্বর মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা অভীষ্ট দেবতাদের আহ্বান করা হইত। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই স্বরত্রয়েরই ব্যবহার বিশেষতঃ করা হইত। অধ্বর্যু আহবনীয় কুণ্ডে যখন দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবিষ্য প্রদান করিতেন, উহার পূর্বে হোতা-নামক ঋত্বিক্ যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা নামক ঋঙ্মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া দেবতাদের স্মরণ করিতেন। স্থলবিশেষে উদ্‌গাতা নামক সামবেদী ঋত্বিক্ কতকগুলি ঋঙ্মন্ত্রেই স্বর ও তাল যোগ সহকারে গান করিতেন। ঐরূপ গানকেই সামগান বলা হইত। যদ্যপি প্রত্যেক শ্রৌত অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মা, অধ্বর্যু, হোতা ও উদ্‌গাতা—এই চারিজন প্রধান ঋত্বিক্ বিদ্যমান থাকিতেন তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেবল হোতা ও উদ্‌গাতা—এই দুইজন ঋত্বিকেরই কার্য ছিল স্তোত্র পাঠ করা। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রৈস্বর্যযোগে মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া স্তোত্র পাঠ করিতেন। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বড় বড় যাগের অনুষ্ঠানে কেবল চারিজন ঋত্বিকের দ্বারাই কার্য সমাধা হইতে পারিত না, সেইজন্য তাহাতে আরও দ্বাদশটি সহায়ক ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত, যেমন ব্রহ্মার সহকারী—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নীৎ ও পোতা, অধ্বর্যুর সহকারী—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা, হোতার সহকারী—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ, উদ্‌গাতার সহকারী—প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্য। সুতরাং জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বৃহৎ যাগের অনুষ্ঠানকালে হোতা ও উদ্‌গাতার সহকারী ঋত্বিক্‌গণও সস্বর মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবতাদের আহ্বান করিতেন।

কিন্তু প্রতিকর্মেই ত্রৈস্বর্যের উচ্চারণ হয় না বরং একশ্রুতির দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণের ব্যবস্থা আছে। একশ্রুতি বলিতে যথেচ্ছ উচ্চারণ বুঝায় না, কিন্তু উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের উচ্চারণ করিতে যে প্রযত্নের প্রয়োজন হইয়া থাকে, উহার

যে কোন একটি প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারণ করাকে একশ্রুতি বলা হয়। আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—"উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাং পরঃসন্নিকর্ষ ঐকশ্রুত্যম্"– উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের যে অত্যন্ত সন্নিকর্ষ তাহাই একশ্রুতি। ইহার ব্যাখ্যায় নারায়ণী বৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে আয়াম বিস্রম্ভ ও আক্ষেপ নামক যে উদাত্তাদি স্বরের অভিব্যঞ্জক প্রযত্নবিশেষ আছে উহাদের মধ্যে অন্যতম প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারণ করিলেই একশ্রুতি হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয় যে উদাত্ত অনুদাত্ত অথবা স্বরিতের যে কোন একটির দ্বারা উচ্চারণ করাকে একশ্রুতি বলা হয়। কিন্তু প্রাতিশাখ্যে এইরূপ স্থলে উদাত্ত অথবা অনুদাত্তের উচ্চারণ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। আয়াম অর্থাৎ কণ্ঠের দৃঢ়তা ও অণুতা এবং অন্ববসর্গ অর্থাৎ কণ্ঠের মৃদুতা ও প্রসারতা—এই দুইটি যথাক্রমে উদাত্ত ও অনুদাত্তের প্রযত্ন, কিন্তু স্বরিতের আক্ষেপ নামক প্রযত্ন বলিতে উপরিউক্ত দুইটির সংমিশ্রণ বুঝায়। স্বরিতের উচ্চারণ করিতে কোন অতিরিক্ত ব্যাপার নাই বলিলেই হয় কারণ কোন স্থলে স্বরিতস্বরের উচ্চারণে উদাত্ত এবং কোন স্থলে অনুদাত্ত উচ্চারিত হয়—ইহা স্বরের নিরূপণকালে বিশেষরূপে ব্যক্ত করা হইবে।

মন্ত্র ত্রিবিধ—করণ মন্ত্র, ক্রিয়মাণানুবাদী মন্ত্র এবং জপমন্ত্র। কর্মানুষ্ঠানের পূর্বে যে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়, তাহাই করণ মন্ত্র। কর্মের অনুষ্ঠানকালেই যে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়, তাহা ক্রিয়মাণানুবাদী মন্ত্র এবং অদৃষ্টার্থ কর্মানুষ্ঠানকালেই যে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়, তাহা জপমন্ত্র। করণ মন্ত্র ও ক্রিয়মাণানুবাদী মন্ত্র অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার স্মারক বলিয়া এইগুলিকে দৃষ্টার্থ বলা হয় এবং জপমন্ত্রের কোন দৃষ্টপ্রয়োজন না থাকায় তাহাকে অদৃষ্টার্থ বলা হয়। এস্থলে লক্ষণীয় এই যে জপমন্ত্রগুলিকে ত্রৈস্বর্যযোগে উচ্চারণ করিতে হয় এবং অবশিষ্ট মন্ত্রগুলির উচ্চারণ একশ্রুতিস্বরে করিতে হয়। দর্শপৌর্ণমাসযাগে যজমান, ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু ও অগ্নীৎ নামক ঋত্বিক চতুষ্টয়ের উদ্দেশ্যে পুরোডাশের চারি ভাগ করিয়া, পুরোডাশগুলিকে স্পর্শ করেন ও "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমাবৃষায়ধ্বম্" (যজুঃ ২।৩১) এই মন্ত্রটির জপ করেন।

হোতার আশীর্বচন উচ্চারণ কালেও যজমানকে "ওঁ ময়ীদমিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্। অস্মাকং সন্ত্বাশিষঃ সত্যা নঃ সন্ত্বাশিষঃ"। —(যজুঃ ২।১০) জপমন্ত্রের উচ্চারণ করিতে হইলে ত্রৈস্বর্যযোগে উচ্চারণ করিতে

হইবে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন—একশ্রুতি দূরাৎসম্বুদ্ধৌ যজ্ঞকর্মণি-সুব্রহ্মণ্যা-সাম-জপ-ন্যূঙ্খ-যাজমানবর্জম্ (১।৮।১৯) অর্থাৎ সুব্রহ্মণ্যা নামক নিগদ, সামগান—জপ, ন্যূঙ্খ (সোমযোগে প্রাতরনুবাকসংজ্ঞক শস্ত্রের প্রত্যেকটি ঋকের অর্দ্ধর্চ ভাগের প্রথম স্বরটির বিশিষ্ট উচ্চারণ) ও যাজমান (যজমানের পঠনীয় মন্ত্র) মন্ত্র ব্যতীত সকল মন্ত্রগুলির একশ্রুতিতে পাঠ করিতে হইবে। সুতরাং জপ মন্ত্র ও যজমান পাঠ্যমন্ত্রের ত্রৈস্বর যোগেই উচ্চারণ করিতে হইবে।

যজ্ঞের অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্র জপের বিধান আছে যেমন ব্রহ্মার বরণ করিবার পরে ব্রহ্মা বৃত হইয়া "অহং ভূপতিরহং ভুবনপতিরহং মহতো ভূতস্য পতি ভূর্ভুর্বঃ স্বর্দেব সবিতরেতং ত্বা বৃণতে বৃহস্পতিং ব্রহ্মা। তদহং মনসে প্রব্রবীমি মনো গায়ত্র্যৈ ত্রিষ্টুভে ত্রিষ্টুপ্ জগত্যৈ জগত্যানুষ্টুভেঽনুষ্টুপ্ প্রজাপতয়ে প্রজাপতির্বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বৃহস্পতি দেবানাং ব্রহ্মাহং মনুষ্যাণাম্"—এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া থাকেন।

এই প্রকার আর একটি ব্রহ্মজপ' অর্থাৎ ব্রহ্মার জপমন্ত্র আশ্বলায়নে বিহিত হইয়াছে "দক্ষিণতশ্চ ব্রজন্নপতাশুঃ শিশান ইতি সূক্তম্" (১।১২)। ব্রহ্মা যখন বেদির দক্ষিণ দিক্ হইয়া যাইবেন তখন আশুঃ শিশান এই সূক্তটির জপ করিবেন। "আশুঃশিশানো বৃষভো ন ভীমঃ ঘনাঘনঃ ক্ষোভনশ্চর্ষণীনাম। সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ (১০-১০৩," এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩টি ঋঙ্মন্ত্র এই সূক্তে আছে—এই সমস্ত সূক্তের জপবিহিত হইয়াছে।

জপ তিন প্রকার—বাচিক, উপাংশু ও মানস। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রৈস্বরযোগে যে মন্ত্রের পদ ও অক্ষরের স্পষ্ট শ্রবণযোগ্য উচ্চারণ করা হয়, তাহাকেই বাচিক জপ বলা হয়।

যদুচ্চনীচোচ্চরিতৈঃ শব্দৈঃ স্পষ্টপদাক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ বাচা বাচিকোঽয়ং জপঃ স্মৃতঃ॥

(নৃসিংহ পু ৫৮ ৭৯)

উপাংশুজপে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয় বটে, কিন্তু সে উচ্চারণ অপর কেহ শুনিতে পারে না। যথা :

শনৈরুচ্চারযেন্ মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্।
অপরৈরশ্রুতঃ কিঞ্চিৎ স উপাংশুজপঃ স্মৃতঃ॥

(নৃসিংহ পু ৫৮-৮০)

শনৈঃ শনৈঃ মন্ত্রের উচ্চারণ করিতে হইবে যাহাতে ঈষৎ ওষ্ঠপ্রচারিত হইবে এবং কেহ উহা শ্রবণ করিতে পারিবে না।]

মানস জপে যদিও মন্ত্রবর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ করা হয় না তবুও মনে মনে মন্ত্রস্থ বর্ণ স্বর ও পদের অর্থ সংস্মরণপূর্বক উচ্চারণ করিতে হয়, যথা

ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্।
উচ্চরেদর্থসংস্মৃত্যা স উক্তো মানসো জপঃ॥

(নৃসিংহ পু ৫৮-৮১)

উপরি উক্ত ত্রিবিধ জপেই উচ্চারণ করিতে হয়, তবে বাচিকে স্পষ্ট এবং উপাংশু ও মানসে স্পষ্ট নয়, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে। সুতরাং প্রত্যেকটি জপেই উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্বরের নিঃসন্দেহ ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শ্রৌত যোগে যে জপের বিধান করা হইয়াছে উহা কেবল অদৃষ্টার্থ সেইজন্য বলিতে হইবে যে অদৃষ্টার্থ যে মন্ত্রের উচ্চারণ, উহাই জপ—এইরূপ জপ স্পষ্ট উচ্চারণ করিলেই সম্ভব। কিন্তু শ্রৌতযোগে যে স্থলে জপবিহিত হইয়াছে, উহা উপাংশু জপই বুঝিতে হইবে। যে স্থলে উপাংশুর বিধান করিতে ইচ্ছা করা হয়, সে স্থলে শ্রৌতসূত্রকারগণ উপাংশু শব্দের উল্লেখ করিয়া পাঠের বিধান করিয়াছেন। তাহাতেও যাহাতে স্বরব্যতীত পাঠের কিম্বা একশ্রুতির সন্দেহ হয় সেইজন্য স্পষ্টরূপে উদাত্ত প্রভৃতির স্বরযোগে উচ্চারণের কথা বলা হইয়াছে, যেমন

"তন্ত্রস্বরাস্ত্যপাংশোকচ্চানি" (২।১৬)। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে যে স্থলেই উপাংশুর উল্লেখ আছে সেই স্থলে "উচ্চ" শব্দের দ্বারা উচ্চারণ বিহিত হইয়াছে, কিন্তু উচ্চ অর্থে কেবল উদাত্ত বুঝায় না, তন্ত্র স্বরের প্রতীতি হয়। তন্ত্রস্বর বলিতে সংহিতাস্বর বুঝায়। সংহিতায় ত্রৈস্বর্যযোগে মন্ত্রের পাঠ আছে, সুতরাং তন্ত্রস্বরের অর্থ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর। সুতরাং জপমন্ত্র ত্রৈস্বর্য সহকারেই উচ্চারিত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে 'নিগদ'ও উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিনটি স্বর সহকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে যেমন—নিবিৎ নামক নিগদ দুটি চরণে গ্রথিত, উহার ত্রৈস্বর্য যোগে পাঠ করার বিধান পাওয়া যায়

উচ্চৈর্নিবিদিং যথা নিশান্তম গ্নির্দেবেদ্ধ ইতি। আশ্বঃ ৫।৯

এস্থলেও "উচ্চৈঃ" পদের[১] দ্বারা 'নিবিৎ'—এই নিগদটির পাঠ বিহিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহা যে ত্রৈস্বর্যের বোধক ইহা বুঝিতে হইবে। নারায়ণ বৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে "ঐকশ্রুত্যং তু শস্ত্রত্বাদেব প্রাপ্তম্" অর্থাৎ "নিবিৎ" পাঠটি শস্ত্র পাঠেরই সঙ্গে উচ্চারিত হইয়া থাকে বলিয়া, ইহা শস্ত্রেরই একটি অঙ্গ। শস্ত্রপাঠ একশ্রুতি স্বরে বিহিত হইয়াছে, সেইজন্য "নিবিৎ" পাঠের একশ্রুতি স্বরে উচ্চারণ প্রাপ্ত ছিল। উহার বাধক "উচ্চৈঃ" অর্থাৎ ত্রৈস্বর্যের দ্বারা উচ্চারণ বিহিত হইয়াছে। একশ্রুতি প্রাপ্ত ছিল—এইরূপ উক্তির দ্বারা মনে হয় একশ্রুতির বিপরীত ত্রৈস্বর্যের বিধান করা হইয়াছে। অগ্নির্দেবেদ্ধঃ, অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ, অগ্নিঃ সুষমিৎ, হোতা দেববৃতঃ হোতা মনুবৃতঃ, প্রণীর্যজ্ঞানাম্, রথীরধ্বরানাম, অতূর্তো হোতা, তূর্ণির্হব্যবাট্ আদেবো দেবান্ বক্ষৎ, যক্ষদগির্দেবো দেবান্ সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ—এই দ্বাদশটি পদযুক্ত নিবিৎ মন্ত্র আজ্য-শস্ত্রের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া পঠিত হয়। আজ্যশাস্ত্রের তিনটি পর্ব, প্রথমে শোংসাবোম্ এই আহাবযুক্ত ওঁ ভুবগির্জ্যোতিঃ জ্যোতিগ্নিঃ—এই তুষ্ণীশংস মনে মনে অবিরাম উচ্চারিত হয়, পরে নিবিৎ পাঠ এবং তৎপরে সূক্তপাঠ হইয়া থাকে। শ্রৌতসূত্রকারগণ নিগদকেও মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন

"ঋচো যজূংষি সামানি নিগদা মন্ত্রাঃ" (কা শ্রৌত কং ৩।১)

তাহা হইলে ইহাই এস্থলে প্রতিপন্ন হইল যে ঋক্, যজু, সাম ও নিগদ—এই মন্ত্র-চতুষ্টয়ের উচ্চারণে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রৈস্বর্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

মন্ত্রের উচ্চারণে উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিবার উপায় নাই, কারণ মন্ত্রের উল্লিখিত পদে যদি কোন একটি স্বরের স্থলে অন্য কোন স্বরের উচ্চারণ করা হয় তাহা হইলে সেই পদজনিত অর্থবোধেরও বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে।

এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় সংহিতার দ্বিতীয় কাণ্ডস্থ পঞ্চম প্রপাঠকে একটি বিশ্বরূপের আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে; উহা এই প্রকার. "ত্বষ্টার পুত্র ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপের তিনটি মুখ ছিল—একটি ভোজনাদির নিমিত্ত, একটি যজ্ঞে সোমপান করিবার নিমিত্ত এবং আর একটি গোপনে অসুরদের সঙ্গে সুরাপানের

১ জোরে ত্রৈস্বর্য সহকারে পাঠ।

নিমিত্ত। ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপের এইরূপ অসুর সাহচর্য সহ্য করিতে না পারিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাহার তিনটি মস্তকই ছিন্ন করিলেন। ইহাতে শোকবিহ্বল ত্বষ্টা কোপবশতঃ ইন্দ্রের আহ্বান না করিয়াই একটি সোমযাগের অনুষ্ঠান করিলেন। সেইজন্য অনাহূত ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক সমস্ত সোমরস পান করিলেন। ইন্দ্রের এইরূপ আচরণে ত্বষ্টা অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং ইন্দ্রকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র-নিধনকারী পুত্রের কামনা পূর্ব্বক সেই পীতোচ্ছিষ্ট সোমরস দ্বারা একটি আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞকালে "স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব"—এইরূপ একটি মন্ত্র উহিত হইল, যদ্দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হইবে। ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ শাতয়িতা (ঘাতক) হইবে, এইরূপ পুত্রের জন্ম হউক—এই উদ্দেশ্যে উক্ত মন্ত্রটির উহ করা হইল, কিন্তু "ইন্দ্রশত্রু" এই পদটি অন্তোদাত্ত স্থলে আদ্যুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়ায়, বিবক্ষিত অর্থের প্রতীতি হইল না। অন্তোদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের অর্থ প্রকাশ পায় এবং আদ্যুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইলে বহুব্রীহি সমাসের অর্থ বুঝায়। উক্ত "ইন্দ্রশত্রু" এই পদটিতে ষষ্ঠী তৎপুরুষ হইলে "ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ ঘাতক"—এইরূপ অভীষ্ট অর্থের বোধ হয়, কিন্তু বহুব্রীহি সমাস হইলে "ইন্দ্র শত্রু অর্থাৎ ঘাতক যাহার" এইরূপ অনভীষ্ট অর্থের বোধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রের ঘাতক পুত্রের জন্ম হ'ক—এই ইচ্ছায় আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। কিন্তু আদ্যুদাত্ত স্বরোচ্চারণের নিমিত্ত ইন্দ্র ঘাতক যাহার এইরূপ পুত্রের জন্ম হ'ক—এইরূপ অনভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি হইল, ফলে বৃত্রাসুরের জন্ম হইল বটে, কিন্তু ইন্দ্র কর্ত্তৃক সে নিহত হইয়াছিল।

একটি শ্লোকে উপরিউক্ত তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়া থাকে, সেই শ্লোকটি এই .

> দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
> মিথ্যাপ্রযুক্তঃ ন তমর্থমাহ।
> স বাগ্ বজ্রো যজমানং হিনস্তি
> যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

অর্থাৎ যাহা স্বর কিম্বা বর্ণের দ্বারা মিথ্যা প্রযুক্ত হয়—যদি অভীষ্ট স্বর অথবা বর্ণের পরিবর্ত্তে অনভীষ্ট স্বর অথবা বর্ণের প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে তাহা দুষ্ট শব্দ। এই দুষ্ট শব্দ অভিপ্রেত অর্থের প্রতিপাদন করে না বরং উহা বাগ্রূপ

বক্র হইয়া যজমানকে হনন করে। "যেমন ইন্দ্রশত্রুঃ" এই পদটিতে অন্তোদাত্ত আদ্যুদাত্ত, এইরূপে স্বরাপবাধবশতঃ বৃত্রাসুর নিহত হইয়াছিল। (শিক্ষায় দুষ্টঃ শব্দঃ স্থলে দুষ্টো মন্ত্রঃ এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু মহাভাষ্যে 'দুষ্টঃ শব্দঃ'—এইরূপ পাঠই আছে।)

প্রাচীনকালে হ্রস্ব দীর্ঘের ন্যায় উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণও বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, সেইজন্য তদানীংকালে স্বরের উচ্চারণ বুঝিতে কোন অসুবিধা হইত না। সম্প্রতি উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণ একেবারেই অপ্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং এইগুলির উচ্চারণ বুঝিতে হইলে কেবল সম্প্রদায়েরই শরণ লইতে হইবে। বৈদিক সম্প্রদায় ব্যতীত স্বরোচ্চারণের ধারা পাওয়া যায় না। উহাও অধুনা ক্রমশঃ দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে দুই একটি শাখার প্রচলন আছে, কিন্তু সমগ্র বৈদিক শাখার কোথাও প্রচলন নাই। যেমন সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চার দ্বারা রাগরাগিণীর কিছু জ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু ওস্তাদের সান্নিধ্য ব্যতীত উহার উচ্চারণ পটুতা লাভ করা যায় না, সেইরূপ সৌবর শাস্ত্রেরও অনুশীলনের দ্বারা স্বর জ্ঞান হইলেও স্বরোচ্চারণে দক্ষতা লাভ করা যায় না।

প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণে শরীরস্থ বায়ু ও তালু, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থান—এই দুইটির অভিঘাত সংযোগ আবশ্যক। প্রাণবায়ু ও তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানের সংযোগের দ্বারা প্রতিটি বর্ণ উচ্চারিত হয়। তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান-গুলি সাবয়ব বলিয়া উহাদের ঊর্দ্ধভাগ ও নিম্নভাগ সম্ভব। সুতরাং প্রাণবায়ুর সহিত যদি তালু প্রভৃতি স্থানে ঊর্দ্ধভাগ ও নিম্নভাগের সংযোগ হয় তাহা হইলে যথাক্রমে উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরের উচ্চারণ হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকটায় লক্ষ্য না করিয়াই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলে উদাত্ত এবং নিম্নস্বরে উচ্চারণ করিলে অনুদাত্ত শ্রুত হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা করার মূলে রহিয়াছে উদাত্ত ও অনুদাত্ত শব্দ দুইটির অবয়বার্থ। উৎ অর্থাৎ উচ্চস্বরে যাহা আত্ত অর্থাৎ উচ্চারিত তাহা উদাত্ত এবং যাহা উচ্চস্বরে উচ্চারিত হয় না, তাহা অনুদাত্ত (accented and unaccented)। কিন্তু স্বরিতের বেলায় কোন অবয়বার্থের দ্বারা উহার উচ্চারণ নিরূপণ করিতে না পারিয়া কেবল অনুমান

বলে উহার উচ্চারণ সমর্থন করা হইযাছে—উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্ত্তী উচ্চারণ স্বরিত। কোন স্বরের আরোহ অবস্থা হইতে অবরোহ করিবার সময় যে স্বরের উচ্চারণ হয়, তাহা স্বরিতস্বর অর্থাৎ falling accent। ম্যাকডনেল (Macdonell) এই স্বরগুলি সঙ্গীত সম্বন্ধী (musical) বলিয়াছেন। এই জন্যই এই গুলিকে (pitch) পিচ্ অর্থাৎ সুবের মাত্রা বা ডিগ্রী বলিয়াছেন। সুরেব মাত্রা তিন প্রকাব উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। উচ্চ (high pitch) উদাত্ত, মধ্য (middle pitch) স্বরিত এবং নিম্ন (low pitch) অনুদাত্ত। স্বরিতকে মধ্যবর্ত্তী স্বর বলিয়া ধ্বনিত (sounded) বলিয়াছেন। 'স্বৃ শব্দোপতাপযোঃ' এই ধাতু হইতে 'ইতচ্' প্রত্যয করিযা 'স্বরিত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয় বলিয়াই এইরূপ অর্থ বোধহয় করা হইয়াছে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী স্বরই শব্দিত হয় আর উচ্চস্বরও শব্দিত হয়—ইহা স্বীকাব কবা হয, তাহা হইলে আর মধ্যবর্ত্তী স্বরকে শব্দিত বলিবার কোন সমীচীন যুক্তি নাই।

উচ্চস্বরে উচ্চারণ কবিলেই যদি উদাত্তস্বব এবং নিম্নস্বরে উচ্চারণ কবিলেই যদি অনুদাত্ত স্বর হয় তাহা হইলে উদাত্ত আপেক্ষিক বলিয়া বাস্তবরূপে কোন্‌টি উদাত্ত ও কোন্‌টি অনুদাত্ত, তাহা বলিতে পাবা যাব না। কারণ, যে ব্যক্তির কণ্ঠের অধিক বল আছে তাহাব অপেক্ষা যাহাব কণ্ঠেব শক্তিব ন্যূনতা আছে, তাহাবই উচ্চাবণ অপেক্ষাকৃত অনুদাত্ত এবং কণ্ঠে যাহাব বলেব আধিক্য আছে তাহাব স্বব—অপেক্ষাকৃত উদাত্ত। গলাব জোব কাহারও অপেক্ষা বেশী অথবা কম হইতে পাবে, যাহাব অপেক্ষা বেশী, তাহাব অপেক্ষা উদাত্ত এবং যাহাব অপেক্ষা কম, তাহাব অপেক্ষা অনুদাত্ত—এইজন্য সেই স্বরটিকে উদাত্ত অথবা অনুদাত্ত কিরূপে বলা যাইতে পাবে? মহাভাষ্যকাব পতঞ্জলি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন [উচ্চৈরুদাত্তঃ—(১।২।২৯) এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য]। ঋক্ মন্ত্রেব উচ্চারণে ম্যাক্‌ডনেল আবার ইহাই স্বীকার করেন যে উদাত্তের অপেক্ষা স্বরিত স্বব অধিক উত্তোলিত হইয়া থাকে। এস্থলে উদাত্তের উচ্চাবণই মধ্যবর্ত্তী। স্বরিত লিখিবার সময় স্বরিতের উপরে ঊর্দ্ধগামী রেখা দেওয়া হয় বলিয়া এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে[2], এবং স্বরিতের পূর্ব্বার্দ্ধকে ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যে উদাত্ততর বলা

2. Vedic Grammar for Students p 419

হইয়াছে, এই জন্যও বোধ হয় ঋগ্বেদ মন্ত্রে স্বরিত স্বর উচ্চতর উচ্চারিত হয়, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে স্বরিতের পূর্ব্বার্দ্ধকে উদাত্ততররূপে ব্যবহার করিলেও উচ্চারণ করিবার সময় উদাত্ত শ্রুতিই হইয়া থাকে। উদাত্ত শ্রুতির অর্থ উদাত্তবৎ শ্রুতি অর্থাৎ উদাত্তের ন্যায় শ্রুতি এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা মনে হয় যে উদাত্ত যে ভাবে উচ্চারিত হয় সেই ভাবেই উচ্চারিত হইবে। যদি স্বরিতের স্বর উচ্চতর হইত, তাহা হইলে উহার শ্রুতি উদাত্তের ন্যায় হইত না বরং উদাত্ত অপেক্ষা অধিক হইত। ইহার কারণ এই যে উদাত্তের ন্যায় উচ্চারণ করিতে হইলে উদাত্ত যেভাবে উচ্চারিত হয় সেই রূপ প্রযত্ন করিতে হইবে। প্রাণ বায়ুর সহিত তালু, মূর্দ্ধা প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের ঊর্দ্ধ ভাগের সংযোগ করিলে তবে ঐরূপ উচ্চারণ হইবে। এইরূপ বায়ুসংযোগে কিছু তারতম্য থাকিলেও উহার অনুভব হয় না। এইজন্য উদাত্ততর বলিয়া কোন শ্রুতি স্বীকৃত হয় নাই। ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যে সুন্দররূপে ইহার নিরূপণ করা হইয়াছে:

তস্যোদাত্ততরোদাত্তাদর্দ্ধমাত্রার্দ্ধমেব বা
অনুদাত্তঃ পরঃ শেষঃ স উদাত্তশ্রুতির্নচেৎ।
উদাত্তং বোচ্যতে কিঞ্চিৎ স্বরিতং ক্ষরং পরম্।

ঋ প্রা ৩।৭-৬

স্বরিতের পূর্বার্দ্ধ ভাগ স্বতন্ত্র উদাত্তের অপেক্ষা উদাত্ততর, অবশিষ্ট উত্তরার্দ্ধ ভাগ অনুদাত্ত, কিন্তু উহা উদাত্তশ্রুতি হয় যদি উহার পরে উদাত্ত অথবা স্বরিত না থাকে।

ইহার দ্বারা স্বরিতের দুই প্রকার উচ্চারণ উপপাদিত হইয়াছে। স্বরিতের পরে যদি উদাত্ত অথবা অনুদাত্ত না থাকে সেই স্বরিতের উচ্চারণ উদাত্তের ন্যায় হইবে এবং স্বরিতের পরে যদি উদাত্ত অথবা অনুদাত্ত থাকে তাহা হইলে সেই স্বরিতের উচ্চারণ, অনুদাত্তের ন্যায় হইবে। যেমন "অগ্নিমী'লে" এই স্থলে মকারের পরবর্ত্তী ঈকারের স্বরিত উদাত্তশ্রুতি হয়, কারণ উহার পরে লের একার প্রচয়। এই প্রকার "র্তেহ'বর্ধস্ব "দিবী'ব চক্ষু," ইত্যাদি স্থলে অনুদাত্ত পরে বলিয়া স্বরিতের উদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে। 'ক বোহশ্বাঃ শতচক্রং যোহহ্যঃ' ইত্যাদিস্থলে যথাক্রমে উদাত্ত ও স্বরিত পরে থাকায় স্বরিতের উচ্চারণ অনুদাত্তের

ন্যা হইয়া থাকে। এইরূপে অনুদাত্তের ন্যায় স্বরিতের উচ্চারণ হইলে বহ্বৃচ শাখায় "কম্প" বলা হয়।

বাস্তব পক্ষে সামবেদের স্বর গেয়-গান করা হয় বলিয়া উহার উচ্চারণে আরোহ ও অবরোহের ক্রম আছে, কিন্তু ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদের স্বর গেয় নয় বলিয়া উহাদের স্বরে আরোহ ও অবরোহের ক্রম থাকা সম্ভব নয়, সেই জন্য সামবেদের স্বর, ধর্ম্মী এবং ঋগ্‌বেদ প্রভৃতির স্বর, ধর্মস্বরূপ। সামবেদের ঐরূপ ধর্ম্মী স্বরকে (pitch বা degree) মাত্রা বলিলে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ববেদের স্বরকে মাত্রা বা pitch বলা চলে না বরং ঝোঁক বা stress বলা যাইতে পারে। ম্যাকডনেল মহাশয় সামবেদ ও ঋগ্বেদ প্রভৃতির স্বরকে সমান দৃষ্টিকে দেখিয়াই ভুল করিয়াছেন। যদি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতির স্বরকে পিচ বা মাত্রা বলিয়া গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে উহার তারতম্যের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হওয়ায়, উদাত্তের উচ্চারণেরও সম্ভাবনা থাকিত।[৩] [তেরো পৃষ্ঠার নীচ থেকে ৩য় ও ৫ম পংক্তিতে রেখ্‌ চিহ্নগুলি প্রকৃতপক্ষে বৈদিক উচ্চারণে যতি ও ঝোঁক সম্বন্ধীয়।]

৩ পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সান্যাল ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের অগ্রণী ছিলেন। ড শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও ড শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কাশী থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তাঁর দেহান্তর হয়। তাঁর জীবিতকালে লেখাটি প্রকাশ করতে পারলে উত্তরস্থরি সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে আনন্দিত হতেন। 'বৈদিক স্বররহস্য' গ্রন্থের অংশস্বরূপ এই রচনাটি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের পক্ষে অপরিহার্য। : অরুণ ভট্টাচার্য

চিরদিনের কবিতা

[বিগত পঞ্চাশ বছরে—যে সময়ে আমরা 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র অভ্যুত্থান লক্ষ্য করেছি—বাঙ্গালীর প্রাণের কাব্যসম্পদকে অবহেলা করে বিদেশী কবিতা পাঠে অতিরিক্ত মনোনিবেশ করেছিলাম। আবার বোধহয় নিজের ভিতরে তাকাবার সময় এসেছে। আবার প্রাণভরে মা বলে ডাকতে পারি। মহাজন পদাবলী বা শাক্ত কাব্য, বাউল বা প্রেম সঙ্গীতে মগ্ন হতে পারি। বুক ভরে দেশের মাটির গন্ধ নিতে পারি। তবেই হয়ত সহজ জীবনে আবার প্রবেশাধিকার পাওয়া যেতে পারে। মাঝে মধ্যে কিছু কিছু এমত কবিতার সংকলন করছি। এই সংকলন বিদ্দজ্জনের জন্য নয়। তরুণ কবি ও পাঠককুল —যারা শুধু শহরের আনাচেকানাচে নয়, গ্রাম বাংলার দূর দূরান্তরে থাকেন— এই কবিতাগুচ্ছের মধ্য দিয়ে স্বদেশের বিরাট চৈতন্যপ্রবাহের সঙ্গে একত্রে গ্রথিত হয়ে নিজেদের প্রাণস্পন্দন শুনতে পাবেন।

সম্পাদক উত্তরসূরি]

১ আএল পাউস নিবিড অন্ধার।
সঘন নীর বরিস বরিস এ জলধার॥
ঘন ঘন দেখি অ বিঘটিত রঙ্গ।
পথ চলইত পথিকহু মন ভঙ্গ॥
কওনে পরি আওত বালভু মোর।
আগুন চলই অভিসারিনি পার॥
গুরুগৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাখি।
তথিহু বধূজন সঙ্গা আখি॥
নদিআ জোরা ভউ অথাহ।
ভীম ভুজঙ্গম পথ চললাহ॥

—বিদ্যাপতি

২ শুন শুন ওগো মরম সখি।

এ সব করুণ বিষের সমান

অতি বিপরীত দেখি॥

ক্ষণেক সেযেন্সে নাহি মন চিত

কি হল, শ্যামের নেহা।

ভাবিতে গুণিতে আন নাহি চিতে

কবে হারাইব দেহা॥

শয়ন ভোজনে জলিছি আগুনে

মুদিয়া নয়ন দুই

সে রূপমাধুরি ভাবি নিরবধি

কহিল তোমারে সই॥

কোথা না যাইব শ্যামের লাগিয়া

তাপেতে তাপিত হয়্যা।

কে আছে এমন বরয়ে শীতল

নন্দের নন্দন দিয়া॥

চণ্ডীদাস কহে সেই সে কালিয়া

কত না জানায়ে রঙ্গ

নিকট মিলন হব দরশন

হইব তাহার সঙ্গ॥

—চণ্ডীদাস

৩. বাসরে প্রবেশ করে এ কালনাগিনী।

"বেহুলা লখাইরূপ দেখিল আপনি॥

বেহুলা লখাই কোলে রূপে কলানিধি।

যেন বর তেন কন্যা মিলাইল বিধি॥

এ হেন সুন্দর গায় কোনখানে খাব।

দেবী জিজ্ঞাসিলে তাবে কি বোল বলিব॥

বিষম আরতি দেবী দিলা মোর তরে।
লখীন্দরে খাইতে মোর সর্ত নাহি পূরে॥
ছ কুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনী।
তে কারণেতে সুখদুঃখ হৃদয়েতে জানি॥"
আপনি তিতিল কালী লোচনের জলে।
হেরিলে বিদরে প্রাণ গেল পদতলে॥
হেনকালে পাশ মোড়া দিতে লখীন্দর।
পদাঘাত বাজে তার দন্তের উপর॥
তখন উঠিয়া কালী কহে সত্য কথা।
"চন্দ্র সূর্য সাক্ষী হৈও যতেক দেবতা॥
মোর দোষ নাহি দেবী দিলেন আরতি।
বিনি অপরাধে মোর দন্তে মারে লাথি॥"
বিষদন্ত দিয়া কালী দংশে তার পায়।
দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥

"জাগ জাগ, বেহুলা, সায় কন্যার ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি॥"
বেহুলা নাচনী জাগে শেষভাগ রাতি।
সাপিনীরে ফেল্যা মারে সুবর্ণের জাঁতি॥
পুচ্ছ কাটা গেল তাব আড়াই আঙ্গুল।
সাপিনী পলাইয়া যায় ব্যথায় আকুল॥
বাঁধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতের আঁচলে।
ব্যগ্র হৈয়া বেহুলা প্রভুরে করে কোলে॥
"শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া।
অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া॥
প্রভু কোলে করি কান্দে লোহার বাসরে।
রচিল কেতকাদাস মনসার বরে॥

—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

৪ হাওয়ায় আসা হাওয়ায় যাওয়া হাওয়ার খবর কেউ করলে না।
বার মাসের এই কাবখানা মনের মানুষ কেউ চিনলে না
ফকিরচাঁদ দরবেশে বলে হাওয়া ধরা গেলো না রে
যদি কেহ ধরতে পারে আপনারি শক্তি জোরে।

(সংগ্রহ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫. আমি আমাব করিস বে মন আমি কে তোব তাই চিনলি না
ও তোর ব্যর্থ হল কর্তাগিরি তবু কেন হার মানলি না।
অহংকারে মত্ত হয়ে ভূতের বোঝা মরলি বয়ে
ওরে হাল ছেড়ে পাল তুললে পরে মুক্ত হবি তাও জানলি না।

৬ কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথায় করে ছলো।
ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল॥
মা, খেলবি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে-খেলা খেলালে মাগো, আশা না পুরিল॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥

—রামপ্রসাদ সেন

৭ মন পবনের নৌকা বটে, বয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ;
সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নজর তোল্ দুর্গা কোয়ে
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে॥

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

৮. মনোহরা নয়ন তোমার বিধুমুখী প্রাণ
গগনশশী লজ্জা পাইলো হেরে তোর বিধুবয়ান।
দেখে তোর চঞ্চলতা খঞ্জন না তোলে মাথা
নলিনী লুকালো কোথা সে সলিলে না পেয়ে স্থান।

—রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)

৯. আমি ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি।
নয়ন মুদিলে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি॥
যখন থাকি শয়নে, তখন ঐ ভয় মনে,
না হেরে হারাই পাছে, চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি।

—কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)

১০ নবমী নিশি পোহাল, কি করি, কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না বিজয়া এল॥
বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা,
যায় কিসে দুঃখ-পশরা আমারে বল ,
নবমী নিশি প্রভাত একি দেখি বিপরীত,
উমা হ'য়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল।
(ওহে গিরি) বাণী শুনি বজ্রাঘাত, করি শিরে করাঘাত,
কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল।
পুত্র-শোকে জীর্ণ-জরা ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
হই যদি তারা-হারা জীবনে কি ফল বল॥
ওহে গিরিপুরবাসী, বৎসরাবধি পরে আসি,
ত্রিরাত্র বাস উমাশশীর করা কি ভাল।
পুরবাসী, করে ধ'রে, বুঝাও গিয়ে মহেশ্বরে,
উমা যাবেন দুদিন পরে, আজ্ঞা দেহ মহাকাল॥
মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেম অভয়া,
মা প্রকাশি' নিজ-মায়া হ'লেন চঞ্চল।

কহে দীন খগপতি, দুঃখিতা তব প্রসূতি,
মাযে ভুল না পার্ব্বতী, ত্যজ না মা হিমাচল ॥

—রূপচাঁদ পক্ষী

১১. কে তোমাবে শিখাযেছে এ প্রেম ছলনা,
যে তোমাবে শিখাযেছে সে বুঝি প্রেম জানে না।
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান
এমনি কবে কতজনাব বধেছ প্রাণ বল না।

—শ্রীধর কথক

১২. তুমি যা কর তা কব হবি
আমি তো চলিলাম জলে
বড লজ্জা পাবে হে শ্যাম
দাসী তব লজ্জা পেলে।
লযে বারি ছিদ্র ঘটে
যদি কোন ছিদ্র ঘটে
গলাতে ঘট বেঁধে ঘাটে
(আমি) ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।

—দাশরথি রায

১৩. শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমাবে।
অচলা হও আজকাব তরে, অচলাবে দয়া ক'বে।
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমাশশী, হিমালয় আঁধার ক'রে।
কি বল্‌বো তোমায যামিনি, তুমি ত অন্তর্যামিনী,
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে ॥

—হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)

মধ্যযুগের বাংলা কবিতা এবং মধুসূদন

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

রাজনারায়ণ-জাহ্নবীর পুত্র মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে 'মাইকেল' রূপেই বিশেষ পরিচিত। বস্তুতপক্ষে মধুসূদন দত্তের আগে 'মাইকেল' শব্দটি যোগ না করলে 'দত্ত কুলোদ্ভব কবি'র পরিচয় প্রদান যেন পূর্ণ হয় না। কবিও নাম সই করতেন ইংরেজীতে 'Michael M S. Dutt', বাংলায় 'শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত'। সাহিত্য সাধনায়ও 'মধুসূদনে'র ওপর টেক্কা দিয়েছে 'মাইকেল'। কবি বিশেষভাবে পাশ্চাত্যানুরাগী। আজ পর্যন্ত সমালোচকেরাও মধুসূদনের সাহিত্যালোচনা করতে গিয়ে কবির পাশ্চাত্যানুরাগের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন বেশি। মধুসূদন আলোচনায় সব সময় আমাদের সামনে এসে দাঁড়া। হোমার, দান্তে, তাসো, মিলটন, বায়রন, পেত্রার্ক, শেকস্‌পীয়র ইত্যাদি। আর এঁদের সঙ্গে দেশীয় যাঁরা আসেন তাঁরা হলেন বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস। বাংলা থেকে আসেন বড় জোর কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস। একথা ঠিক, বাঙালী মধুসূদন ইংরেজী ভাষার কবি হবার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কবিও ছিলেন বায়রন। মধুসূদন বায়রনের জীবনী পড়ে উদ্দীপ্তও হয়েছিলেন। —'I am reading Tom Moor's life of my favourite Byron a splendid book upon my word Oh! How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which I am almost sure, I shall be if I can go to England!' এই সব উক্তির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি পড়েছে বেশি। ফলে মধুসূদনের চেয়ে মাইকেলেরই জয়জয়কার।

মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্যের যথার্থ প্রথম কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের পালে হাওয়া লেগেছিল পাশ্চাত্যের। মধুসূদনের ভাবনা চিন্তা, সাজ-পোষাক, আহার-পানীয় এবং কাব্যসাধনায় পাশ্চাত্যের মাদকতা একটু বেশি। কিন্তু মধুসূদনের আগে যে-যুগটা কেটে গেল—সেই মধ্যযুগ—তার কি কিছু জের মধুসূদনে নেই? আরও সংক্ষিপ্তাকারে প্রশ্ন করা যায়—মধুসূদনের মধ্যে

মঙ্গলকাব্যের কি কোনো প্রভাব আছে? সংস্কৃত সাহিত্যের বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাসের কথা আগেই বলা হয়েছে। মধ্যযুগের আদি কবিগণ কৃত্তিবাস-কাশীরামের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছি। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব তো 'ব্রজাঙ্গনা' থেকে সহজেই উদ্ধার করা যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের প্রভাব? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা তিনটি সূত্রের সন্ধান করতে পারি। এক, মধুসূদনের জীবনে মঙ্গলকাব্যের কোনো প্রভাব আছে কিনা। দুই, চিঠিপত্রে মধুসূদন কোথাও মঙ্গলকাব্যের কথা বলেছেন কিনা। তিন, কাব্যসাধনায় মঙ্গলকাব্যের প্রভাব কতখানি।

এই সূত্রানুসন্ধানের পূর্বে একটা কথা বলে নিই। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব মধুসূদনে একটু বেশি। তাই আমাদের আলোচনায় কবিকঙ্কণের কথা একটু বেশি আসবে।

মধুসূদনের কাব্যানুরাগ আবাল্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'তাঁর জীবনের অন্যান্য অনেক গুণের ন্যায় এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্ধিত হইয়াছিল। সে সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবী দাসী তৎকালেও লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাংলা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন, আট দশ বৎসর বয়সের সময়ে, মাতাকে ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন।' বাল্যকালে মাতৃসান্নিধ্যে মধুসূদনের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে হাতেখড়ি হয়েছিল দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তী জীবনে মাইকেল হয়েও মধুসূদন কবিকঙ্কণ চণ্ডী ভোলেন নি। বাল্যের স্মৃতি মানুষের মন থেকে সহজে মুছে যায় না। ভাবপ্রবণ কবি নানাভাবে বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করেছেন। এই স্মৃতি-রোমন্থনের প্রমাণ রয়েছে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কোনো কোনো কবিতায়।

মধুসূদনের জীবনে আর একটি ঘটনা তাঁকে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রতি অনুরাগী ক'রে তুলেছিল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহে লিখেছিলেন, 'বাঙালি কবির মধ্যে কবিকঙ্কণকে

অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে।' শর্মিষ্ঠা-সমালোচনায় কবিকঙ্কণের উল্লেখ নিশ্চয়ই মধুসূদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো মনস্বী সমালোচকের প্রশংসা-বাক্য মধুসূদনকে কবিকঙ্কণ-অনুরাগী ক'রে তুলেছিল এটা অনুমান করা যেতে পারে।

'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার পূর্বে বাংলা ভাষায় মধুসূদনের জ্ঞান ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাই 'শর্মিষ্ঠা' রচনার আগে তিনি বাংলা পুস্তক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন-জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'গৌরদাসবাবুর সহিত এইরূপ কথোপকথনের পর দিনই তিনি (মধুসূদন) আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে সে সময়কার প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গলা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, এবং মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।' 'শর্মিষ্ঠা'র প্রকাশ কাল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। কবিকঙ্কণ চণ্ডী মুদ্রিত হয়েছিল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং অনুমান করতে পারি রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রশংসিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে স্থান লাভ করেছিল এবং মধুসূদন সে-কালের যে সব বাংলা পুস্তক পড়েছিলেন, তাঁর বাংলা জ্ঞান বাড়ানোর জন্যে তার মধ্যে সম্ভবত কবিকঙ্কণ চণ্ডীও ছিল।

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনে রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব অপরিসীম। রাজনারায়ণ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' বাংলা ভাষার যুগ-প্রবর্তক কবিদের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে পর পর তিন কবির উল্লেখ করেছেন। প্রথম বিদ্যাপতি, দ্বিতীয় কবিকঙ্কণ এবং তৃতীয় মধুসূদন। কবিকঙ্কণের পর মধুসূদনের উল্লেখ নিতান্ত আকস্মিক নয়। রাজনারায়ণ মধুসূদনের শুধু বন্ধু নন, সেকালের একজন বিদগ্ধ রসিক। মধুসূদনের পূর্বে তাঁর কবিকঙ্কণ স্মরণে আমরা অনুমান করতে পারি মধুসূদনের সঙ্গে কবিকঙ্কণের একটা যোগ ছিল।

এবার মধুসূদনের পত্রাবলীর কথায় আসা যাক্। মধুসূদন তাঁর চিঠিপত্রে মধ্যযুগের কবি ও কবিতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কবি মানস গঠনে মধ্যযুগের সাহিত্যের যে প্রভাব ছিল, বন্ধুদের লেখা চিঠিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের প্রতি কবি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। সুদূর ফ্রান্স থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠিতে মধুসূদন ভারতচন্দ্রের একটি পংক্তি উদ্ধার ক'রে পত্রে সরসতা এনেছেন। ৩রা নভেম্বর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা চিঠির

প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধার করছি। "We are on the eve of a winter which threatens to be severe, you can have no idea of a European winter This is still autumn and yet I have a fire in my room and have got clothes on me that would form a tolerable 'মোট' in our country ! It is about six times colder than the coldest day in our coldest month ! Do you remember the time of ভারতচন্দ্র ? 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।'" শুধু কবি নন, কবির মুদ্রাকরও ভারত-ভক্ত। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখেছেন—'my printer Babu J C Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends' etc সুতরাং কবি-পরিমণ্ডলে মধ্যযুগের সাহিত্য রসিকের অভাব ছিল না এটা বেশ দেখা যাচ্ছে। এবং এই রসালাপ ও রসিকসংসর্গ মধুসূদনের মধ্যযুগের সাহিত্যপ্রীতিরই নিদর্শন।

মধ্যযুগের অন্যতম দুই প্রধান কবি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের প্রতি মধুসূদনের আকর্ষণ আবাল্য। সে আকর্ষণ তাঁর মাদ্রাজ প্রবাসকালে আরও তীব্র হয়েছিল। কবির পুরনো বাংলা বই পড়ার আগ্রহ আগেই দেখানো হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে মধুসূদন গৌরদাস বসাককে চিঠি লিখে কৃত্তিবাস-কাশীদাস পাঠাতে লিখেছিলেন—'I say, old Gour Dass Bysack, can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharut of Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition' শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত হয়েছিল ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। মধুসূদন উপরোক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ের মধ্যে কৃত্তিবাসের গ্রন্থটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আশা করি। মধুসূদনও আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রতি। রামকথা, রামায়ণ গানের সঙ্গে বাল্যেই মধুসূদনের পরিচয় হয়েছিল। পরিণত বয়সে সে-প্রীতি আরও গাঢ় হয়েছিল।

চিঠিপত্রে মধুসূদন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কোনো উল্লেখ করেন নি। তবে মিথলজির প্রতি তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কমলে কামিনী

প্রসঙ্গে মিথলজির প্রভাব সম্পর্কে সুকুমার সেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (দ্র শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৬)। মধুসূদন কমলে কামিনীর ওপর একটি সনেটও লিখেছিলেন। সে কি মধুসূদনের মিথলজির প্রতি আগ্রহ-জনিত? হ'তে পারে। মধুসূদন যে মিথলজি অত্যন্ত ভালবাসতেন তা রাজ-নারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি। প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিলুম 'I love the grand mythology of our ancestors It is full of poetry A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it'

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য-উপাদান নিয়ে মধুসূদন ৮টি সনেট লিখেছিলেন। এগুলি হ'ল—'কমলে কামিনী', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি,' 'কাশীরাম দাস', 'কৃত্তিবাস,' 'ঈশ্বরী পাটনী, ও 'শ্রীমন্তের টোপর।' এ ছাড়া আর একটি সনেট লিখেছিলেন 'কউটিয়া সাপ'। মধুসূদনের সর্পপ্রীতি লক্ষণীয়। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিটি সর্গে কবি সর্পের উল্লেখ করেছেন। আমরা তার একটা হিসেব দিচ্ছি। মেঘনাদ-বধ কাব্যে মোট ৩৪ বার সর্প-প্রসঙ্গ আছে। ১ম সর্গে ৮ বার, ২য় সর্গে ৩ বার, ৩য় সর্গে ৫ বার, ৪র্থ সর্গে ৩ বার, ৫ম সর্গে ২ বার, ৬ষ্ঠ সর্গে ৬ বার, ৭ম সর্গে ২ বার, ৮ম সর্গে ৩ বার ও ৯ম সর্গে ২ বার।

আর কোনো বাঙালী কবির এমন সর্প প্রীতি দেখি না। মধুসূদনের আগের যুগে সর্প-দেবী মনসার কথা সুবিদিত। কবির জন্মও সর্পসঙ্কুল জেলায়। মনসার গান কবির সম্ভবত জানা ছিল। তাই বাল্যাবধি মধুসূদনের মনে সাপের ছাপ পড়েছিল বলে অনুমান করতে পারি। কবির সর্প-ভীতিও হয়ত সর্প-প্রীতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

চণ্ডীমঙ্গলের বিষয় নিয়ে মধুসূদন কবিতা লিখেছেন দুটি, অন্নদামঙ্গলের বিষয় নিয়েও দুটি। মধুসূদন চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুরো ছত্র উদ্ধার করেছেন আপন কবিতায়—

'শ্রীপতি—

শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।'

অন্নদামঙ্গলেরও একটি পুরো ছত্র উদ্ধার করেছেন 'ঈশ্বরী পাটনী' কবিতায়—'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।' এসব কবির মঙ্গলকাব্য প্রীতিরই প্রমাণ।

মধুসূদনের মানসলোক যতই বিদেশী ভাবে আচ্ছন্ন থাকুক না কেন তিনি কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভোলেন নি। তাঁর বঙ্গপ্রীতি ও বঙ্গীয় কবি প্রীতি দেশীয় ঐতিহ্যানুসরণের সাক্ষ্য বহন করে আছে। তাই মধ্যযুগের কবি ও কাব্য প্রসঙ্গে মধুসূদন যে কবিতাগুলি লিখেছেন তার বহু জায়গায় 'বঙ্গ' ভূমির উল্লেখ দেখছি :

কমলে কামিনী , কবিতা পঙ্কজ রবি শ্রীকবিকঙ্কণ ধন্য তুমি বঙ্গভূমে।

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি ' তব বংশ যশ ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল

যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।

কাশীরাম দাস , তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।

কৃত্তিবাস কৃত্তিবাস নাম তোমা। কীর্ত্তির বসতি

সতত তোমার নাম সুবঙ্গ ভবনে।

কবির এই বঙ্গভূমির প্রতি আকর্ষণ মেঘনাদবধ কাব্যের বহু জায়গায় লভ্য। সে-সব জায়গায় হোমার-মিলটন-বায়রন দীক্ষিত মাইকেলকে আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে মধ্যযুগের সাহিত্যানুরক্ত মধুসূদনকে বেশ চিনতে পারা যায়। অতঃপর মেঘনাদবধ কাব্য থেকে কয়েকটি ছবি তুলে ধরছি :

১ মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে স্বর্গের বর্ণনা দিচ্ছেন মাইকেল। স্বর্গে সুন্দরের সমারোহ। মলয় মারুতের অভাব নেই। পুষ্পিত উদ্যান। কিন্তু সে উদ্যানে কোন্ পাখী ডাকছে?—'ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত।' স্বর্গে ফিঙা পাখী। হোমার পরাভূত, কৃত্তিবাস মুকুন্দের অনুকূলেই রায় দিতে হয়।

২. প্রমীলা নারী বাহিনী নিয়ে লঙ্কাপুরীতে পৌঁছলেন। স্বর্ণ লঙ্কা, উজ্জ্বল রাজপুরী, স্বর্ণ দরজা বন্ধ এবং প্রহরী বেষ্টিত। নৃমুণ্ডমালিনী সেই আস্ফালন ক'রে উঠলো :

অমনি দুয়ারী

টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে ;

বজ্রশব্দে খুলে দ্বার।

স্বর্ণনির্মিত রাজদ্বারে 'হুড়ুকা'।

৩. দ্বিতীয় সর্গের দেবসভা বর্ণনা। 'হৈমাসনে দেবপতি', 'রাজছত্র

মণিময় আভা শোভিল দেবেন্দ্র শিরে।' 'বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী' ইত্যাদি। কিন্তু এই দেবীরাই সকালে ঘুম থেকে উঠে কি করেন ?

'বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে।'

স্বর্গের দেবী প্রভাতে ছড়া ঝাট দিচ্ছেন। একটি কি কিঙ্করীও নেই ? এমন চিত্র মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে লভ্য। দেবখণ্ডে পার্বতী স্বামী-সেবার নিমিত্ত প্রভাতে উঠেই গৃহকার্যে মন দেন। বলা বাহুল্য, মুকুন্দের পার্বতী কার্যত পৌরাণিক দেবী নন, বাঙালী বধূ। মধুসূদনও এই বাঙালী বধূকেই স্মরণে রেখেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্যোচিত ভাব ভাষা ছন্দে এ-সব চিত্র হয়ত গৌণ, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক।

মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে ইতস্তত লভ্য। খড়ি-পাতা, মন্ত্র পড়া, ওষুধ-করা—এ ধরনের আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড মঙ্গলকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। এটাকে মধ্যযুগীয় রীতি বলে অনেকে উপহাস করতে পারেন। কিন্তু মাইকেলও এই রীতি অনুসরণে আগ্রহী। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ থেকে এরকম দুটি চিত্র তুলে ধরছি। মর্ত্যে দেবী দুর্গার পূজা করছে কে—এই বৃত্তান্ত জানবার জন্যে বিজয়া সখী খড়ি পাতলেন।

মন্ত্র পড়ি খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী, "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।"

বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়' কাব্যে দেবী মনসা নেতোর সাহায্যে মর্তের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। নেতো খড়ি পেতে সে বৃত্তান্ত সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে

খড়ি পাতি ঝাট বল কোন জন আছে ভাল
আগে পূজা লব যার স্থান।
শুনিয়া পদ্মার বাণী করে নৈল খড়ি খানি
গণে নেতা এ তিন সংসার।..

মেঘনাদবধ কাব্যের দেবী শঙ্করী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নারীচরিত্রগুলির মতো ওষুধ ক'রে কাউকে রক্ষা করতে বা বশীভূত করতে পটু। শঙ্করী মদনকে তো ওষুধের সাহায্যেই রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শঙ্করী বলেছেন :

'আমার বরে চিরজয়ী তুমি।
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিস্তার কৌশলে।'

স্বামীকে বশ করবার জন্যে চণ্ডীমঙ্গলের লহনা দাসী দুবলার সাহায্যে ওষুধ করতে চেয়েছে। দুবলা আশ্বাস দিয়েছে

'মোর বোলে লহনা কর অবধান।
ঔষধ করিয়া তোর সাধিব সম্মান॥'

এবং এই ঔষধ করার তালিকা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মধুসূদন মঙ্গলকাব্যের এই রীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন, বরঞ্চ আকৃষ্ট। মেঘনাদবধ কাব্যের স্ত্রী দেবতা শঙ্করীর আচার-আচরণ অনেকটা মঙ্গলকাব্যীয়।

আর একটি ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক। মধুসূদনের একটি অত্যন্ত পরিচিত কবিতা হ'ল 'আত্মবিলাপ'। অনেকে মনে করেন, এই কবিতাটিই বাংলা কাব্যে কবির প্রথম আত্মসমালোচনা। কবিতাটিতে মধুসূদন অকপটে নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করেছেন এবং সেজন্য অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যে কি এ ধরনের আত্মসমালোচনা নেই? বিদ্যাপতির আত্ম-নিবেদনমূলক পদগুলি তো কবিরই আত্মসমালোচনা। সামান্য অংশ উদ্ধার করি

বিদ্যাপতি জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ
জুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পাবলুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি।

মধুসূদন প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণ সাধে,
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

মধুসূদনের বৈষ্ণবসাহিত্য প্রীতি সুবিদিত। 'ব্রজাঙ্গনা'র ক্ষেত্রে সে-কথা সকলেরই জানা। মেঘনাদবধ কাব্যের অনেক জায়গায় বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা এসেছে, বিশেষত আলঙ্কারিক প্রয়োজনে।

পাশ্চাত্য ভাববিলাসী মাইকেল জীবনের নানা পথ পরিক্রমা করে যখন ক্লান্ত, অবসন্ন তখন,

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।'

ঠিক এভাবেই দেবী চণ্ডী ক্লান্ত, অবসন্ন কবিকঙ্কণ মুকুন্দকেও স্বপ্ন দিয়েছিলেন—

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
মাতা করিল পরম দয়া দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব।

মনে হচ্ছে, মাইকেল নন, কবি মধুসূদনই শেষ পর্যন্ত বাঙালীর কাছে আপন হয়ে রইলেন।

পরমানন্দ সরস্বতী

কী যে মায়া আছে তোকে ঘিরে

১. কী ব্যঞ্জনা ধূলোর শরীরে
কী যে মায়া আছে তোকে ঘিরে
কী আনন্দ আদরের ক্ষীরে
তোর কাছে পাই ফিরে ফিরে
তেমন করে কি কেউ কেড়ে নেয় মন
তেমন বড় কি এই আকাশ ভুবন ॥

মধ্যরাতে গানের ভাসান

২ অনেক তার আঁছে জানা, যায় না জানা যার মানে
সুখের বুকে আগুন লেপে, সুখ নিয়ে সে খেলে প্রাণে।
মধ্যরাতে গানের ভাসান, সকাল বেলা আলোর ফুল
কত যে বঙ ধূলি ছড়ায়—সুখদুঃখের অনন্তমূল।
দিনের কুহক রাতের মায়া সবটুকু তার একটু রূপ
সুযোগ পেলেই টুপ করে সে বুকের মধ্যে দেয় ডুব।
রঙ্গনটীর সঙ্গিনী সে—ভোগের ঘরে পূজার দীপ,
সকল সুখের চাঁদ-কপালে পরিয়ে দেয় সোনার টিপ ॥

আগুন তোমার সই

৩. আগুন নিয়ে খেলা তোমার
আগুন তোমার সৈ,
তোমার বুকে জ্বলছে আগুন
ফোটে বিয়ের খৈ ॥

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন মায়া

৪ একলা পেয়ে ভালোবাসা
বুকটি যায় চিরে,
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন মায়া
শোকেব চুল ছিঁড়ে ॥

কে যেন কাঁদে বুকে

৫ যখন তোকে পাই
ফুলের গান গাই।
তোকে যখন চাই
আগুন-জলে নাই।
ভুলতে যখন যাই
কে যেন কাঁদে বুকে,
মড়ার মুখ দেখি
ভালোবাসার মুখে ॥

কবি পরিচিতি জন্ম ১৯১৫, গৌহাটি, আসাম। প্রথম প্রকাশিত কবিতা দীপালি'তে। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু -সম্পাদিত 'কবিতা' ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্ত'র নিয়মিত লেখক, মৃণালকান্তি নামে। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আকাশ'। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ 'বহুরূপী,' 'উত্তর মীমাংসা', 'ধুলোর প্রদীপে আলোর শিখা'। কবির বর্তমান ঠিকানা . শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন মন্দির, কামাল গাজি, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি যখন শূন্যে ঝুলতে থাকি

১. চোখে ধাঁধা লাগে
যখন বাইরের দিকে তাকাই।
চোখ পুড়ে যায়
যখন নিজের ঘরে ফিরে আসি।

২ ছোটবেলায় আমি ছিলাম
পরাধীন দেশের বোকা মানুষ,
তখন আমার মাথার ওপর
আকাশ বলতে কিছুই ছিল না।

বড় হয়ে এখন আমি
একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক ,
এখন আমি 'অ আ ক খ' পড়তে জানি
লিখতে জানি।

অথচ কোনো স্বাধীন দেশেই
আমার পা-রাখবার জায়গা নেই।

৩ যারা বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ
তারা বক্ক'ক সোনা
আর মানুষের হাত-পাকে
তাদের স্বর্গে-ওঠার সিঁড়ি মনে করে।

তারা অনেক আশ্চর্য ম্যাজিক জানে ·
আমাকে দেখলে তারা মজা পায়,
হাসে।

বোবারা কিন্তু এখনও
আমি সামনে গেলে উঠে দাঁড়ায়,

তাদের দুহাত বাড়িয়ে দেয়।
তাদের বুক চিরে তখন যে অদ্ভুত শব্দ বের হয়
তার মানে আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি

আমার কষ্ট হয় তাদেব দুঃখ দিতে
কেননা, তারা হাসতে জানে না।

আকাশ ছাড়া, মাটি ছাড়া
আমি যখন শূন্যে ঝুলতে থাকি
তারা ভাবে, আমি তাদের জন্য
একটি নিরাপদ, মানুষের পৃথিবী রচনা করছি।

৪ যেমন কথা দিয়েছিলাম।

৫ বৈশাখ, ১৩৮৭

কবি-পরিচিতি জন্ম ১৯২০, বিক্রমপুর, ঢাকা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অরণি'তে। শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দিবস রজনীর কবিতা'। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থের নাম কবি এখনো স্থির করেন নি, পাণ্ডুলিপি অবশ্য তৈরী রয়েছে। স্থায়ী ঠিকানা ১৪ স্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০ ০৩১।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

সময়

যখন বাতাস ঘুরে ঘুরে স্থির হয়ে যাবে
'মক্ষিকার আঁখিগোলকের মধ্যে
আমি তখন আসবো
তার আগে নয়—
যখন নদীর স্রোত
উতাল-পাতাল ছুঁয়ে
সমতল ভেঙে ভেঙে
সাপের বিবরে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে
তার আগে নয়—
এখন তোমার হৃদয় অশান্ত
সেখানে আমার ঠাঁই নেই
তোমার হৃদয় শান্ত হোক
হৃদয় শান্ত হলে
হৃদযেব গভীবে
এক গভীর অরণ্য খুঁজে পাবে
সেই গভীর অবণ্যের অভ্যন্তরে
চলে যাবে
সেখানে এক তমাল বৃক্ষ আছে
সেই তমাল বৃক্ষে একটি রাধা অঙ্গ
বাঁধা আছে
অপেক্ষা করতে থাকবে
কখন সেই রাধা অঙ্গ কেঁপে উঠে   সেই আমি।

লজ্জা

কবিতায় ঢেউ ওঠে পড়ে
তখনই তখনই ঢেউয়ের ওপর চড়ে বসতে

পারলে, পৌছলে
নচেৎ সংসারের মরু
সেই ঢেউকে গ্রাস করবে—
এরকম অনেকবার আমার হয়েছে।
সুন্দর সুন্দর কবিতার বীজ
মনে উদয় হবেই
আবার শিশিরের বিন্দুর মতোন
শুকিয়ে যায়
যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি
তখন আর সাতকাহন খুঁজেও
পাই না ঠিকানা
লজ্জায় মরি—
লজ্জা কার কাছে?
লজ্জা আমার ভিতরকার এক
অবগুণ্ঠনবতী নারীর কাছে
সে নিত্য ভোগ চায়
দেহের ভোগ নয়
সুরের ভোগ—
সেই সুরের তন্ত্রীতে বিশ্বহৃদয় বাঁধা।
ছেদ পড়লেই
অসুরের আমন্ত্রণ
মায়া-মরীচিকা যুদ্ধ-বিভীষিকা
সেই সুরের দেহকে ছিঁড়তে থাকে।

কবি-পরিচিতি জন্ম ১৯২২। বেহালা, কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা প্রভাতী, পাটনা। শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ : কদম্বতনু (আরতি চট্টোপাধ্যায় -সহ)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ : কোন পরিকল্পনা নেই। ঠিকানা : ১২।৩এ গ্রোভ লেন, কলকাতা ৭০০ ০২৬

অরুণ ভট্টাচার্য

এসো, অমানিশা

গাছপালা এবং মেঘরাশি ছড়িয়েছিটিয়ে
ঘনঘোর অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। অমানিশা,
তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছো না!
নিদারুণ অভিশাপ ডাইনী বুড়ীর দুই চোখে
অমানিশা, তুমি কি লক্ষ্য করো নি!
গ্রহচন্দ্র এবং অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তরালবর্তী হয়ে
কী বিভীষিকা আমাদের গ্রাস করতে আসছে, অমানিশা
তুমি কি তা এখনো বোঝ নি!

এসো, দুই আদিমতম মানবসন্তানের মত
এই সহস্র শীত-অতিক্রান্ত বোধিবৃক্ষের নীচে
আমরা দুজনে ঘুম যাই। ওপরে বহে যাক দুরন্ত ঝড়,
নীচে মরুভূমির অগ্নিবলয়।
সূর্যের বিকীর্ণ বিস্ফোটক রশ্মিরেখায়
আমাদের দেহ তেজোময় হোক। এসো অমানিশা।
৮ ৯ ৭৯.

সমুদ্রপারে

এক হাজার শকুনকে আমি স্থির দেখেছি
কাল রাত্রিবেলা পশ্চিমপ্রান্তরে, দূরে কাছে
সব ক'টি গাছের ডালে, যুথবদ্ধ।
তারা কি সব স্বপ্নে এসেছিল আমার কাছে!
কিছু কিছু সংবাদ দিয়ে গেল
আমাদের পৃথিবীর বিষয়ে।

আমি আগে কখনো এতো শকুন দেখি নি
ওদের উদ্ধত গ্রীবা, স্থির অবয়বে

নিটোল শালীনতা
ইত্যাদি মিলিয়ে আমাকে ওরা ভয়ানক আকর্ষণ করেছিল।

আমি পৃথিবীর বিষয়ে আরো কিছু গভীর সংবাদ আশা করেছিলাম।
ঠিক সে-মুহূর্তে ডানা ঝাপ্‌টিযে আকাশকালো মেঘ উড়িয়ে
এক হাজার শকুন সমুদ্রপাবে যাত্রা করল।
২৯ ১০ ৭৯

রৌদ্রপ্রতিমাব আড়াল

বাতাসপুর যেতে হলে পরপর দুটো দীঘি পার হতে হয়
প্রথমটি দুধসাগর, পরেরটি বুঝি ক্ষীরসায়র।

আমি বাতাসপুর কখনো যাই নি।
শুধু দূর থেকে দুধসাগরের কথা মনে পড়ে।
সেখানে সারাদিন উন্মত্ত হাওয়া, সাবাদিন
দুধসাগবের লুটোপুটি ঝড় ক্ষীরসমুদ্রের
বাতাসকে কাছে ডাকে।

আকাশদীর্ঘ প্রান্তরের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে, আমি
বাতাসপুর কখনো যাই নি। একবাব ভাবছি
দুধসাগর ক্ষীরসায়র পাব হয়ে বাতাসপুর যাবো।
সেখানে উদাসীন প্রান্তর জুড়ে রৌদ্রপ্রতিমার আড়াল,
সেখানে বাগী বাতাসেব উন্মনা দীর্ঘশ্বাস।
১০.৯ ৭৯.

বনহরিণীর গন্ধে

হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় যেন বাড়িটিকে আমি চিনি
এর খিলানগুলি, অন্ধকার সুরঙ্গপথ

আমার চিরপরিচিত। মনে হয় কোনদিন
চন্দ্রমল্লিকার হাত ধরে এই পথে অরণ্যের অন্ধকার পার হয়েছি।
যেন এই শালমহুয়ার দিগন্তে সেদিন গভীর নিস্তব্ধতা ছিল।

আজো হঠাৎ হঠাৎ চন্দ্রমল্লিকার কথা বড বেশী মনে পড়ে
ছাদের কার্নিশ ধরে টুপটাপ শিশিরের গন্ধে
মাতাল বনহরিণীর উন্মত্ততা যেন ঘিরে রাখে আমাকে।

আমি একদিন থাকবো না। কিন্তু এই প্রাসাদের অন্ধকার সুরঙ্গে
চন্দ্রমল্লিকার সাথে আমার মিলনের কাহিনীটি
ধরা থাকবে বহুদিন।

১.১.৭৯

এসো শব্দ এসো ঘুম

শব্দগুলিকে কাছে আসতে দাও।

যেমন ইচ্ছে রাস্তা করে আসুক
খালবিল ডিঙিয়ে, কাঁটাবন মাড়িয়ে
ঝোপঝাড় একপাশে সরিয়ে দিয়ে
আমার বুকের মাঝখানে
হাতুড়ির ঘায়ে
স্তব্ধ দেউলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলুক।

এসো শব্দ এসো ঘুম। তোমরা
দু'জনে পরস্পর
নিবিড় বাহুবন্ধে আমাকে
উদ্বেল করো।

১.৩.৮০.

জন্মদিনে

একটু স্থির হও। এখন
পিছন ফিরে তাকাবার সময়। এখন

মগ্নতার সন্ধ্যা। আকাশের
নক্ষত্রদীপ তোমারই জন্য, সূর্যের
দাহ নয়। এখন

ধীরে ধীরে চৈতন্যের
নিলীম জ্যোৎস্নায়
অবগাহন। এখন

প্রসন্ন আঁখি মেলে
সরোবরের স্থির পদ্মটির দিকে
তাকাও।

১৪.২ ৮০

কবি-পরিচিতি : জন্ম ১৯২৫, বাগবাজার, কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'পূর্বাশাতে'। শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'সময় অসময়ের কবিতা'। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্র, কাছে এসো', স্থায়ী ঠিকানা : ৮বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০।

মানস রায়চৌধুরী

কয়েকটি

এক

হেমন্তে কি বসন্তের পাতা ঝরে যায়
বাগানে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছি, আমার শরীর
অপর্যাপ্ত পাতার আশ্লেষ নেয় সারাদিন সারা রাত ধরে
কোনওখানে দাগ পড়ে নাকি ?
কার তাতে কতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়—

পাই নি বলেই মনে ভাবি
তুমি তো লুকোলে সেই ঝরাপাতা সাবা গায়ে মেখে
তোমার মুক্তিও ডোবে সম্পূর্ণের গোলক জড়িয়ে
চলে গেছে হাজার বছর যেন একটি চাদরে
শতকের চুন মশলা ঘাস ও সিমেণ্ট
প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখ এইসব ভালবাসা পাথরে পেয়েছে
কার তাতে কতো লাভ হয়েছিল বলো ?

তোমার সে অন্তর্ধান আমার সর্বাঙ্গে লেগে আছে
অন্তর্ধান অভিমানে নির্ঘুম শিশির
প্রতি হেমন্তেই লাগে ঘাসের শিকড়ে
আমি ভাবি তাকে ধরে রাখি এই ভঙ্গুর পয়াবে
যাও আসো সত্য কি মিথ্যার মত অমোঘ সংকেত
কতটুকু কার লাভ হলো ?

দুই ॥

নিসঙ্গতা আমার পিছনে ঘোরে যেন ভারি ছায়া
অন্ধকাব হলে ঠিক ধরেছে জড়িয়ে
অনুভব করি তার তীক্ষ্ণ দুই বুকের শিখর
রাত গাঢ় হলে ভাবি সে আমাব বিছানা পেতেছে।

নিসঙ্গতা আমাকে দিয়েছে তার উদ্দাম শরীর
শব্দ করে ভেঙে যায় তার বিহ্বলতা
নিঃসঙ্গতা আমার মুখের মধ্যে ঢালে তীব্র বিষ
অলীক আশ্লেষে ডাকে, বলে—এসো এই এইখানে
ছায়ার মাধুরী থেকে আমার প্রয়াস সঙ্গী নিসঙ্গতা·

তিন ॥

আমার বারান্দা দিয়ে সজল পৃথিবী দেখা যায়
সেই পৃথিবীর পারে সবুজ বনানী তা ও ঠিক দেখা যায়
ফেরিওলা চলে যায় দুপুর পেরিয়ে ডালা নিয়ে
আমার অসুখে সেই ম্লান আলো তীব্র লেগে থাকে।
অসুখের কথা শুনে ঘরণী মাথার কাছে আনে তালপাখা
হাওয়া পাই না তবু আসে হাওয়া

ভারী কম্বলের ভাঁজে ঘর্মতাপ নিঃশ্বাস বেঁধেছে
চোখ তুলে দুদণ্ড যে শান্তি পাবো তা-ও এই বিশাল দেওয়াল
একটু আগে জানলা ছিল সেখানে পাঁচিল দৃষ্টি জোড়া—

এখন ঈশ্বর তপ্ত আমার কপালে
দেবেন কি নীরোগ সুবাস, ঠাণ্ডা ওডিকলোনের।

কবি-পরিচিতি জন্ম ১৯৩৫, কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'ক্রান্তি'তে। শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সময় আবহ শিখা' প্রকাশিতব্য গ্রন্থ—জলচিত্র চলোচিত্র স্থায়ী ঠিকানা ১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ৭০০ ০২৫।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো

ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো মধ্যরাত্রে কারো কণ্ঠস্বর
নিয়ে যায় হাত ধরে ঝর্নার কাছাকাছি
চাঁদের আলোয় জলে ছায়া পড়ে আকাশের ,
নির্মেঘ আকাশ, বনবীথি শিহরিত অন্য এক হাওয়ার আগুনে
মধ্যরাত্রে কারো কণ্ঠস্বরে
ধ্রুপদী সঙ্গীতের রেশ, বুকের ভিতরে ঝড
তুলে দিয়ে
হাত ধরে নিয়ে যায়
আলোকিত সামুদ্রিক স্রোতে ॥

শব্দের আড়াল

এক এক দিন আলোয় পাশাপাশি বসে থাকতে থাকতেই অন্ধকার,
এক এক দিন অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতেই আলো।

এমনি করেই মুখোমুখি পাশাপাশি বসে থাকতে থাকতে দিন যায়
এমনি করেই বেলা বহে যায়
এমনি করেই আলো অন্ধকারের কাটাকুটি খেলার আমরা সাক্ষী হয়ে থাকি
এমনি করেই অনুচ্চারণে বুক যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে শব্দসম্ভারে
এমনি করেই শব্দের আড়ালে চলে যায় মানুষ।

এক এক দিন

তোমার শুভ নয়নে
জ্যোৎস্নার মায়া।

পূর্ণিমায়
চোখের তারায় বিহ্বলতা ,

মেঘে মেঘে
আলোর খুশি
আকাশকুসুম
চঞ্চলতায়

এক এক দিন
বিস্ময়
শিহরণ
জীঘাংসা

এক এক দিন
হারিয়ে
যেতে যেতে
আলোর
সীমারেখায়
অন্ধকার ॥

কবিতার জন্য

কবিতার জন্য নতুন কবিতা লেখা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ
মনের মধ্যে মনে নতুন করে চলেছে ভাবনার বিকীরণ
নতুনতর প্রয়াসে অক্ষর বিন্যাস।

এই মুহূর্তে মনের মধ্যে মনে শব্দের আলোড়নে
বর্ণের সুষমায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে ভালোবাসা
টুক্‌রো টুকরো হয়ে যাচ্ছে শব্দের কাঠিন্য
এতাবৎ জমে থাকা কবিতার নামে শব্দপুঞ্জ

স্তূপীকৃত বাক্‌ভঙ্গি কবিতার নামে প্রচলিত
পুরনো খাতার মূলধন। উড়ে যাচ্ছে ফিতে বাঁধা

সৌখীন ভাবনার ছবি। নতুন হাওয়ায় গন্ধ ভেসে আসছে
ঘাস মাটি মানবতা হৃদয়ের গান
মাটির সোহাগ মেখে স্বপ্নের সবুজ উদ্যান
কবিতার বার্তা বহে আনে॥

মা

মাটির মধ্যে শিকড ছড়িয়ে পড়ে,
বুকের মধ্যে ভালোবাসা।

তারপর একদিন মাটিব উপরে
ডালপালা ছড়িয়ে বনস্পতি
আকাশের কাছাকাছি মুখ রাখে।

বুকের ভালোবাসায স্নেহ প্রেমে
জন্ম নেয় অজস্র ভালোবাসা
দু'হাত জড়িযে চুমু খেতে খেতে
মা বুকে তুলে নেয় ভালোবাসার মানিক।

কবি-পরিচিতি: জন্ম ১৯৩৭, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'দেশ' পত্রিকাতে, শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'পাখি জানে'। প্রকাশিতব্য 'নৈঃশব্দের প্রতিধ্বনি'। স্থায়ী ঠিকানা ৫বি, জুবিলি পার্ক, কলকাতা ৩৩।

ঊষা-পরিণয় (ঊষা হরণ ?)

ঊষা-পরিণয় (ঊষা হরণ[১] ?)। কবি পীতাম্বর। দেশী তুলট কাগজে লেখা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯। ছিন্ন, কীটদষ্ট, জলে ভেজা। চিত্রিত পুঁথি। চিত্রিত পাটায় দশাবতার আঁকা। চিত্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪। আকার ১৩″×৫″। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি পীতাম্বরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বাধীন কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের পুত্র শুক্লধ্বজ। আকবরের সমসাময়িক কামতা-রাজ মহারাজ নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজ তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। শিবাজীর বহু পূর্বে ঐ অঞ্চলের খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, অরণ্য, পাহাড় এর সুযোগ নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে ক্ষিপ্র আক্রমণে শত্রু সেনা তছনছ করে দিতেন বলেই তার আর এক নাম চিলা রায়।[২] 'সংগ্রাম সিংহ' এবং 'সমর সিংহ' নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন।[৩]

ষোড়শ শতকে মহারাজ নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজই শুধু নন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত কোচবিহারের রাজ পরিবার শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ ও মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণ স্বয়ং গ্রন্থ রচনা করেছেন, অন্যান্যরা রামায়ণ, মহাভারত, ও ভাগবতের এবং বহু পুরাণের অনুবাদ করিয়েছেন।

দেবভাষা জানেন না যে সাধারণ মানুষ তাদের জন্যই নিজ দেশ-ভাষায় নানা পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করিয়েছিলেন কোচবিহার রাজপরিবার। শুক্লধ্বজের আদেশে মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ করেছিলেন পীতাম্বর, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদে পীতাম্বর লিখেছেন

"মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে
একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ

মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কায ॥

. ...

পুরাণাদি শাস্ত্রে জত রহস্য আছয়
পাণ্ডিত্যে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয
একারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার
নিজ দেশ ভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার"।

কোচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারের পুঁথিগুলির বর্ণনামূলক তালিকা তৈরী করার সময় পুঁথির কাষ্ঠ ফলকে লেখা "কামরূপীয় বাঙ্গলা ভাষায লিখিত পুঁথি" এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রদ্ধেয় ৺শশিভূষণ দাশগুপ্তের যথাযথ, সঠিক বিবরণ বলে মনে হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত "ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এখানে যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহা একটি বিশেষ ভাষায় লিখিত, সে ভাষাটি খাঁটি বাংলা ভাষাও নহে, তাহা খাঁটি আসামী ভাষাও নহে, তাহার যথার্থ পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয় ইহা 'কামরূপীয বাংলা ভাষা'। পীতাম্বরকেও খাঁটি বাঙালী কবি বলিয়া বাংলা সাহিত্যেই স্থান দিতে হইবে।" অধ্যাপক মহেশ্বর নেওগ অসমীয়া সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায যোড়শ শতকের তিন কবি সমব, দুর্গাবর কায়স্থ এবং পীতাম্বর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "তাঁহারা যে কাব্য রীতি গ্রহণ করেন উহা বাংলা দেশে সুপ্রচলিত পাঁচালি বা পাঞ্চালি।"

আলোচ্য পুঁথিতে পীতাম্বরের ভনিতা

"কহে কবি পিতাম্বর হরি পরসনে"
"কহে কবি পিতাম্বর নারায়ণ পরসনে"
"কবি পিতাম্বর ভনে"
"কহে কবি পিতাম্বর সঙ্গে চক্র পানি"

পীতাম্বর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেও ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ যেমন নিজ দেশ ভাষায় লিখেছিলেন, ভাগবতের উষা-অনিরুদ্ধ প্রণয়কাহিনীও তেমনি বৃহত্তর কামতা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় লিখেছেন।

আলোচ্য পুঁথির কয়েক পঙ্‌ক্তিতে তা স্পষ্ট হ'বে

"চিত্রলেখা বোলে উষা শুন প্রাণ সখি?

সাত দিন মন্তরে পট্ট দেখাইব লেখি।
এক পট্ট লিখিয়া দেখাইব বিগুমান।
ত্রিভুবন লিখিয়া করিব নির্মাণ।
তার মাঝে চিন সখি কেবা তোর স্বামি
তবে তাক সত্তরে য়ানিঞা দিব আমি
পরিহর সকল বিকলয় কারণ
য়াপোনাব কাজে সখি কহো [রো] গমন
সাতদিন ভিতরে য়াসিব পট্ট নয়া
এড মনস্তাপ সখি থাক সুস্থ হয়া।"

ভাগবতের এই প্রণয় কাহিনী, উত্তর কাহিনী ও চিত্র পরিচিতি—ভারতে এবং পূর্বভারতে খুবই জনপ্রিয়।[৫] দৈত্যরাজ বলির পুত্র বাণ মহাদেবের বরে শোণিতপুরে রাজধানী স্থাপন করে এমনকি দেবতাদেরও উৎপীড়ন করতে থাকেন। বাণের কন্যা উষা হর-পার্বতীর মিথুন দেখে আবিষ্ট হলে পার্বতী তাকে বর দেন, স্বপ্নে যে পুরুষের সঙ্গে তুমি মিলিত হ'বে, সেই তোমার স্বামী হবে। উষা স্বপ্নে অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হ'বার পর উষার সখী, বান-মন্ত্রীকন্যা চিত্রলেখা বহু পুরুষের চিত্র এঁকে এঁকে তাকে দেখান। কৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে উষা চিহ্নিত করলে চিত্রলেখা দ্বারকা নগরীতে যান এবং কুমার অনিরুদ্ধকে হরণ করেন। শোণিতপুরে উষা অনিরুদ্ধ গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। শিবভক্ত বাণ অনিরুদ্ধ-উষার বিবাহ মিলনের কাহিনী জানতে পেরে অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও অনিরুদ্ধ অবশেষে বন্দী হ'ন। নারদের কাছে খবর জেনে কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন শোণিতপুরে এলেন। (পুঁথির চিত্রে কৃষ্ণ বিষ্ণু অভিন্ন। যাদব বীরদের সাহায্য করছেন বিষ্ণুর বাহন গরুড)। বাণের পক্ষে মহাদেব স্বয়ং। সঙ্গে কার্তিক এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে কৃষ্ণ বাণকে পরাজিত করেন। সুদর্শন চক্র দিয়ে বাণের সহস্র বাহু ছেদন করেন। ভাগবতে স্বয়ং মহাদেবের কৃত স্তুতির কথা আছে। বলা বাহুল্য, উষা অনিরুদ্ধ এরপর দ্বারকায় রওনা হ'ন যদুবংশীয় বীরদের সঙ্গে।

ছিন্ন কীটদষ্ট এই চিত্রিত পুঁথির চিত্র-সংখ্যা এখন ২৪। উষা-অনিরুদ্ধ এবং

অনিরুদ্ধ বাণ যুদ্ধ-দৃশ্য আর শ্রীকৃষ্ণ-বাণ যুদ্ধ দৃশ্য প্রাধান্য পেয়েছে। চিত্রিত, কাহিনী, মুহূর্ত অনুসরণে, অঙ্কিত চিত্র পরিচয় : ব্যোমযানে চিত্রলেখা। নারদ চিত্রলেখা। দ্বারকা প্রাসাদ থেকে নিদ্রিত কুমার হরণ। শূন্যপথে চিত্রলেখা-অনিরুদ্ধ। শোনিতপুরে উষা, পরিচারিকাবৃন্দ, চিত্রলেখা-অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ চিত্রলেখা-উষা। উষা-অনিরুদ্ধ। উষা-অনিরুদ্ধের মিলন, সখীরা নিদ্রিত। শায়িতা উষা, উপবিষ্ট অনিরুদ্ধ এবং পরিচারিকাবৃন্দ। অন্তঃপুরে নিদ্রিত অনিরুদ্ধ, বাণের আগমন। বাণ-অনিরুদ্ধ সংগ্রাম দৃশ্য। নাগপাশে বাঁধা অনিরুদ্ধ। গরুড় মস্তকোপরি শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন—শোনিতপুরে। গণেশ, কার্তিকেয়, মহাদেব, অনুচরবৃন্দ। বাণ, ও গরুড়-শিরে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র মৃত সৈনিক, শকুন কাক, শিয়াল, রথে বাণ। গরুড়-শিরে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, মুখোমুখি শূল হস্তে শূলপানি, যুদ্ধ থামাতে মধ্যে চতুর্মুখ স্বয়ং। হস্তী ও অশ্বারূঢ় সৈনিকের সঙ্গে বলরামের যুদ্ধ দৃশ্য। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাণ-জননী বিবসনা কোটরা। যুদ্ধরত বাণ ও শ্রীকৃষ্ণের একাধিক চিত্র ইত্যাদি। অজন্তা ও বাঘ গুহা চিত্রে এবং দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের দেওয়াল-চিত্রে ভারতবর্ষের যে ধ্রুপদী চিত্র-রীতির পরিচয় মেলে, তারই শেষ উজ্জ্বল প্রতিনিধি ১০ম-১৩শ শতকের বাংলা ও নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ পুঁথি চিত্র। জৈন পুঁথি-চিত্রনের ভৌগোলিক এলাকা বঙ্গভূমি থেকে বহুদূর। মোগল রাজপুত চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ সময়ে নবম পলির দেশ বঙ্গভূমি পাল-সেন যুগের প্রস্তর ভাস্কর্য ছেড়ে পোড়া মাটির ভাস্কর্যে আশ্চর্য দক্ষতা দেখাচ্ছে। অবনীন্দ্র-হ্যাভেল বাংলার চিত্রকলায় যে নূতন যুগের সূচনা করলেন তার আগে অবশ্যই কালী-ঘাটের পট বাংলার নিজস্ব চিত্রকলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বৌদ্ধ পুঁথি চিত্র-কালীঘাট পট—অবনীন্দ্র তাঁর শিষ্যবৃন্দ—এই ক্রমে কিছু ফাঁক থেকে গেল। উড়িষ্যার চিত্রিত পুঁথিতে লোক-শিল্পকলার স্পষ্ট প্রভাব। আসামের চিত্রে ভাগবত, হস্তী বিদ্যার্ণব, শঙ্খচূড় বধ কাব্যের যে চিত্রিত পুঁথি আবিষ্কার হয়েছে তাতে রাজপুত মোগল চিত্রকলার ছাপ সুস্পষ্ট, অবশ্যই রাজপুত চিত্রকলা থেকে কোন কোন দিক থেকে পার্থক্যও আছে। বঙ্গভূমিতে চিত্রিত পুঁথি খুব কমই পাওয়া গেছে কিন্তু বিষ্ণুপুর ও কোচবিহার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় আঁকা পুঁথির চিত্রিত পাটা, উত্তর ভারতের মোগল, রাজপুত ধরার পূর্ব ভারতে

চুঁইয়ে নেমে আসা, অথচ হুবহু অনুকরণ বা অক্ষম, দুর্বল অনুকরণের দায়-মুক্ত চিত্রধারার এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ তেমনি পাল যুগের পর অবনীন্দ্রনাথ; কালীঘাটের পট কী করে সম্ভব (!), আচার-পন্থীদের মতে নিশ্চয়ই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে—এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে। বাংলার পুঁথির চিত্রিত পাটা। উড়িষ্যার চিত্রকলাতে লোক-চিত্রকলার প্রভাব সুস্পষ্ট। আসামের চিত্রিত পুঁথি ব্যাতীত লোক-চিত্রকলার বিশেষ কোন চিহ্ন বা প্রভাব আবিষ্কার হয় নি। বাংলার কালীঘাটের পটে জড়ানো পট, চৌকো পট এর পাশাপাশি পাটা-চিত্রণও দেখি—যাতে মোগল রাজপুত চিত্রকলার কিছু প্রভাব অবশ্যই আছে। পাল যুগ-অবনীন্দ্র যুগের 'মিসিং লিংক' অবশ্যই পুঁথির পাটা চিত্রণ। পূর্বভারতের চিত্রিত পুঁথি এবং পাটা চিত্র সেই নিরিখেই বিশেষ সমীক্ষা, গবেষণা দাবী করে।

১ শংকরদেবের সমসাময়িক কবি অনন্ত কন্দলী অনিরুদ্ধ-উষার প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে যে কাব্য রচনা করেন তার নাম 'কুমর হরণ'। বলা বাহুল্য উষাহরণ এর চাইতে 'কুমর হরণ' নামটি কাহিনীর ভিত্তিতে সঠিক।

২. কেউ কেউ মনে করেন অশ্বপৃষ্ঠে ভৈরবী নদী পার হয়েছিলেন বলে শুক্লধ্বজ 'চিলা রায়'। "He [নরনারায়ণ] appointed his brother Sukladhvaj to be his Commander-in-Chief. In this capacity Sukladhvaj displayed such dash and rapidity of movement that he was nick-named Chilarai or the kite-king"

[History of Assam · E.A.Gait]

৩. অভিনবপুর শে জে কামতা নগর। আছয় বিশ্ব সিংহ নৃপবর॥
তাহার তনয় জে শমর সিঙ্গ-নাম। কৃষ্ণর লীলাত তঞে অতি অভিরাম॥

[ভাগবত-এর অনুবাদে পীতাম্বর]

অন্যত্র: কুমার সমর সিংহ হরিপাদপদ্ম ভৃঙ্গ
নারায়ণে ভকতি সুজানে।

৪. চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মঙ্গলকাব্যের নানা পুঁথিতে যেমন, এ পুঁথিতেও তেমনি নানা রাগের উল্লেখ আছে। যেমন—রামগিরি, গুজরী।

৫. সাধারণ মানুষ, কী কবিরাই শুধু নন, চিত্রকরগণও এ কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন (অবশ্যই তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ইচ্ছা, চাহিদার কথা ভুলছি না)। **Boston Museum** এর সংগ্রহে এবং বরোদা চিত্রশালায় উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী চিত্র কাংড়া কলমের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত।

অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী

শেকস্‌পীয়ার-চিন্তা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -আয়োজিত স্বর্গত অধ্যাপক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, এককালীন ইংরাজী বিভাগীয় অধ্যক্ষ, স্মরণে ১৯৮০ সালের বক্তৃতামালার বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী এ. জি. স্টক (Amy Geraldine Stock) যিনি কিছুদিন আগে (১৯৫৬-৬১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রধান অধ্যাপকের কাজ করে গিয়েছেন—তাঁকে আমন্ত্রণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কেবল একজন প্রাক্তন অধ্যাপিকার প্রতি সকৃতজ্ঞ সম্মান প্রদর্শন করেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদুষী মহিলা, যিনি বয়সকে অগ্রাহ্য করে আজও পর্যন্ত সাহিত্যবিষয়ক নতুন চিন্তাভাবনা করে চলেছেন, এমন একজনকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে সংগ্রথিত করবার সুযোগ নিয়েছেন।

শ্রীমতী স্টকের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল শেকস্‌পীয়ার নাটকে বীরনায়কের সংজ্ঞা ও ব্যবহার (Heroism in Shakespeare)—শ্রীমতী স্টক তাঁর বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য তিনটি নাটক বেছে নিয়েছিলেন—ট্রয়লাস্ অ্যাণ্ড ক্রেসিডা, হ্যামলেট, অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা। এই তিনটি নাটকের তিন বীর নায়কসম্পর্কে তিনি তাঁর বক্তব্য স্থাপন করেছেন—ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডার হেক্টর, হ্যামলেট নাটকের হ্যামলেট এবং অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা নাটকের অ্যাণ্টনি মুখ্যতঃ তাঁর আলোচ্য।

শ্রীমতী স্টক তাঁর আলোচনায় তাঁর পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করেছেন, তিনি বলেছেন শেকস্‌পীয়ার পর্যটনের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের চেয়ে যা বেশী কার্যকরী তা হলো মরমী অনুভব (instinctive sympathy), অবশ্য এই মরমী অনুভব স্বনির্ভর নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, শেকস্‌পীয়র নাটক এবং নাটকের সন্ধিস্থল, ভাষা এবং উপমা ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে এই অনুভবের উৎপত্তি ঘটে—অর্থাৎ একমাত্র সৎ নিষ্ঠাবান পাঠকই এই দুর্লভ অভিজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। প্রায় একই রকমের কথা বলেছেন কবি অরুণ ভট্টাচার্য

তাঁর ইংরাজী সাহিত্য-বিষয়ক সাম্প্রতিক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭)। কেবল শ্রীমতী স্টক বা অরুণ ভট্টাচার্য নয়, এঁদের আগে অনেকেই একথা বলেছেন, তবে এঁদের মুখে সেই সত্যের পুনরুল্লেখ শুনে আমরা সাধারণ পাঠক আশ্বস্ত হলাম। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে শেকস্‌পীয়ার পঠনপাঠনে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী পাণ্ডিত্যের অনুশীলনের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয়, শ্রীমতী স্টক বা অরুণ ভট্টাচার্যের মত একজন কবির বক্তব্য এই, শেকস্‌পীয়ার মূলতঃ কবি এবং স্রষ্টা এবং তিনি নাটকের প্লটের প্রয়োজন অনুসরণে তাঁর চরিত্র পরিকল্পনা করেন নি, মঞ্চসফল নাটক তিনি লিখলেও চরিত্রের পরিকল্পনা এবং চরিত্রচিত্রণে তিনি আদি সৃষ্টিকর্তার মতনই তাঁর বিধিবর্জিত এবং অমোঘ সৃজনী শক্তিকেই ব্যবহার করেছেন। পাঠককেও অনুধ্যানের মাধ্যমে সেই অন্তর্গূঢ় ক্রিয়াশীল সৃজনীশক্তির যাথার্থ্যকে অনুভব করতে হবে, তবে চরিত্রগুলি পাঠকের মনশ্চক্ষে ঠিকঠিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

যেমন হেক্টর চরিত্রে শেকস্‌পীয়ার যে বীরবত্তার নিদর্শন রেখেছেন, গ্রীক কবি হোমারে হয়তো তার বীজ ছিল নিহিত—শেকস্‌পীয়ার হেক্টরকে একজন মার্জিত কবি, মানবীয় গুণসম্পন্ন, বীরোদাত্ত নাটক হিসাবে চিত্রিত করেছেন,—জীবন রঙ্গমঞ্চে যাকে পরাজয় এবং ধূলি চুম্বন করতে হলেও মানুষের মনোরাজ্যে যিনি অম্লান। ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডা নাটকে শেকস্‌পীয়ার গ্রীক এবং ট্রয়ের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আবরণ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন, প্রেম এবং বীরত্বের আদর্শের তথাকথিত মহিমা মহাকাব্যিক সংজ্ঞার সঙ্গে কতখানি বেমানান—কিন্তু মহিমার চ্যুতি ঘটে নি হেক্টরের চরিত্রে।

হ্যামলেটকে শ্রীমতী স্টক কিছুতেই অস্থিরপ্রতিজ্ঞ (irresolute)—এমন একজন যিনি কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারেন না, বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে পারেন না—এহেন একজন চিন্তান্বিত চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী নন—হ্যামলেটের চিন্তাশীলতা তাঁর চিত্তবিভ্রম ঘটায় নি এবং ঘটনাক্ষেত্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—কেবল তাৎক্ষণিক আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে একাধিকবার ঘটনা ঘটিয়েছেন, এইটুকুই তাঁর পরিচয় নয়—শ্রীমতী স্টকের মতে অস্থিরচিত্ততা নয়, চিন্তার বিস্তৃতি এবং সূক্ষ্ম তন্ময়তাই তাঁর একটি স্থূল সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার পথে মানসিক অন্তরায় সৃষ্টি করেছে—

চিন্তাশীলতা এবং পরিবেশ সচেতনতা এই দুই বিরোধী মানসিক শক্তির পরিণতি হ্যামলেটের ট্রাজেডি। বীরনায়কোচিত চরিত্রে একটি নতুন গুণারোপ।

শেকস্‌পীয়ার হেক্টর চরিত্রে রুচির শোভনতা এবং অমানুষিক ক্রুরতার অবর্তমানতা দেখিয়ে হিরোইজম্ এর সংজ্ঞার রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এবং হ্যামলেটের বীব নাযকোচিত চরিত্রে চিন্তাশীলতা ও পরিবেশ সচেতনতার নতুন গুণ আরোপ করেছেন। অ্যান্টনির প্রতি শেকস্‌পীয়াবের পক্ষপাতিত্ব বীরনায়ক সংজ্ঞার আব এক রূপান্তর সাধন করেছে। অ্যান্টনি চরিত্রের বীরবত্তা মহানুভবতা এবং তার ইন্দ্রিয় উপভোগের দক্ষতা—যা নাকি শেষপর্যন্ত পার্থিব সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠাকে তুচ্ছ করে আত্মঘাতী ভালোবাসায় চরিতার্থতা লাভ করেছে—ব্যক্তিমহিমাকে নতুন এক সমুন্নতি দান করেছে। হয়তো অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রা নাটকে শেকস্‌পীয়ারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অ্যান্টনি ক্লিওপ্যাট্রার যুগল রূপান্তর—অ্যান্টনি এবং ক্লিওপ্যাট্রা যেন পবস্পরেব প্রতিরূপ—শরীব, হৃদয়, এবং মনের বিকল্প—যে প্রতিরূপ এর বিকল্পের সঙ্গে মিলনই মানুষকে পূর্ণতার আস্বাদ দিতে পারে—এই নাটকে শেকস্‌পীয়ারেব প্রতিভা তাঁর চরিত্রসৃষ্টির মৌলিকত্বে যেমন প্রতিপাদিত, তেমনই তাঁর অসামান্য বাক্‌ব্যবহারে প্রমাণিত—কোলরিজ, যে রীতিকে বলেছেন 'a happy valiancy of style'।

শ্রীমতী স্টকের তিনদিনের (ফেব্রুয়ারী ১৪-১৬, ১৯৮০) ভাষণে আমরা শেকস্‌পীয়ারের মহান্ সাহিত্যের আস্বাদ অনুভব করলাম আর একবার—এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবং শ্রীমতী স্টককে ধন্যবাদ। শ্রীমতী স্টক বক্তৃতার প্রারম্ভেই শেকস্‌পীয়ারেব প্রতি বাঙালির ভালোবাসা এবং শেকস্‌পীয়ার-চর্চাব কথা উল্লেখ করেছেন—সত্যিই এই বিশ্বকীর্তি নাট্যকার এবং কবিকে স্বদেশীয় কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে আত্মার আত্মীয় করে নিতে পেরেছি বলে আমরা ধন্য। শেকস্‌পীয়ার-চর্চা ইংরাজী এবং বাঙলা ভাষাব মাধ্যমে যত বাড়বে ততই মঙ্গল॥

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে-র শব্দসন্ধান

সে কবে

সে কবে গেয়েছি আমি তোমার কীর্তনে
কৃতার্থ দোহার।
পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে ,
স্মৃতি আছে তার।
রৌদ্রে-জলে সেই স্মৃতি মরে না, আয়ু যে
জ্বলন্ত লোহার।
শুধু লেগে আছে মনে ব্যথার স্নায়ুতে
মরচের বাহার॥ : বিষ্ণু দে

১৯৬২ তে প্রকাশিত "বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত কবিতাটি প্রথম সংকলিত হয়। অবশ্য ভিন্ন শিরোনামে। পরবর্তী কালে, "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত" কাব্যগ্রন্থে পুনর্বার সংকলিত কবিতাটির "স্মৃতি" শিরোনাম বর্জন ক'রে প্রথম স্তবকের প্রথম পংক্তির 'সে কবে' শব্দ দুটি বেছে নেন বিষ্ণু দে। আরেকটি পরিবর্তন হ'লো, প্রথম স্তবকের তৃতীয় পংক্তির শেষে কমা-র বদলে সেমিকোলন চিহ্নের ব্যবহার। যিনি নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নায় কবিতা লেখেন না, সেই বিষ্ণু দে-র মতো বিদগ্ধ ও মননশীল কবির প্রসঙ্গে এই পরিবর্তনগুলিকে তাৎক্ষণিক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাঁর কবিতায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণের পরিমার্জনা সমালোচকের গভীর অভিনিবেশ দাবী করে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার দলবদ্ধ খামখেয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকরণ-চেতনা, বিষয়হিসেবে অস্পৃশ্য হনে হ'লেও, একথা মানতেই হয় যে, প্রকরণগত বৈচিত্র্য প্রসঙ্গবিচিত্রারই অবিকল্প প্রতিফলন, এবং তা একেবারেই শেক্‌সপীয়ার-কথিত ফুলবিশেষের পাপড়িতে রঙের প্রলেপ লাগানো নয়। কবিতার শিরোনামও প্রকরণগত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য কবিতায় শিরোনামগত পরিবর্তন গভীর অর্থবহ। মাত্র আটটি পংক্তিতে বিন্যস্ত কবিতাটির অন্তর্নিহিত

বিষয় হ'লো স্মৃতি, যার মৃত্যুহীন উপস্থিতি ও অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ একটি বাক্‌প্রতিমায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। আধুনিক কবিতার রীতি অনুযায়ী বাগ্‌ভঙ্গীর তির্যকতাই কবির অভিষ্ট। তাই "স্মৃতি"র স্পষ্ট বাচন পরিবর্তিত হ'য়ে যায় 'সে কবে' শব্দবন্ধের ইঙ্গিতপ্রসারী শিরোনামে। 'সে কবে' শব্দ দুটিতে পরপর দুবার 'এ' ধ্বনির ব্যবহারে স্থান ও কালের যে অনির্দেশ্য ধূসরতা আভাসিত, 'স্মৃতি' শব্দে, বোধহয় ব্যবহারে জীর্ণ বলেই সেই বিস্তারের ব্যঞ্জনা সংকুচিত হ'য়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হ'লো, কবিতার প্রথম পংক্তির 'তোমার' সর্বনামের উদ্দিষ্ট কে ? নিঃসন্দেহে, কবির প্রেমিকা, যাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বলেন, 'সে কবে গেয়েছি আমি তোমার কীর্তনে / কৃতার্থ দোহার'। 'কীর্তন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। গুণমুগ্ধ কবি প্রেমিকার বিহ্বল গুণকীর্তন করেছিলেন অতীতে কোনো একদিন, অথচ ঠিক কোথায় এবং কতো আগে, তা আর মনে পড়ে না। মনে পড়া তেমন জরুরিও নয় তাঁর কাছে, এমনকি প্রেমিকার রূপগুণের বিচারও তাঁর কাছে আজ অবান্তর। এই কীর্তন যতো না প্রেমিকার কথা বলে আমাদের কাছে, তার চেয়ে ঢের বেশী বলে কবির নিজের কথা, তাঁর আর্দ্র হৃদয়ের স্বরলিপি ব'য়ে নিয়ে আসে সময়ের প্রান্তর পেরিয়ে। 'কীর্তন' প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনার দরকার হ'তো না, যদি না পরবর্তী পংক্তিতে আমরা 'দোহার' শব্দটি আবিষ্কার করতাম। বৈষ্ণব সাহিত্যের, বিশেষ ক'রে গীতিকবিতার, অর্ধমনস্ক পাঠককেও ব'লে দিতে হ'বে না 'দোহার' বলতে কি বোঝায়। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীতে মূল গায়কের গানের ধুয়ো ধ'রে থাকেন যিনি, তাঁকেই আমরা 'দোহার' ব'লে জানি। এই বিশেষ ভূমিকার পরিচয়বহনকারী একটি শব্দও আমাদের অজ্ঞাত নয়. দোহার কি। প্রেমের প্রসঙ্গে 'কীর্তন' শব্দের ব্যবহার পদাবলী কীর্তনের আবহে গভীরতর ব্যঞ্জনায় দীপ্ত হ'য়ে উঠল। কবির ব্যক্তিগত বিরহ আশ্লিষ্ট হ'লো রাধাকৃষ্ণের বিরহের সঙ্গে। ঐতিহ্যের সার্বজন্যে প্রাতিস্বিকের বেদনাকে গাহন করালেন কবি, দেশজ আবহমানের মুকুরে তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা ব্যাপ্ত ও বিধৃত হ'লো। পাঠকের কল্পনাও উদ্বেজিত হ'য়ে উঠল অতীতের মধ্যে বর্তমান ও বর্তমানের মধ্যে অতীতের উপলব্ধিতে। 'দোহার' শব্দটি একদিকে যেমন কীর্তনের অনুষঙ্গে চেতনাপ্রসারী, অন্যদিকে

আভিধানিক অর্থে, ঈষৎ জটিলতার সঞ্চার করে। 'দোহার' শব্দের প্রচলিত অর্থ মেনে নিলে, প্রেম-কীর্তনে কবি-প্রেমিকের কোনো মুখ্য ভূমিকা থাকে না আর। হয়তো এমন ইঙ্গিত এখানে অস্পষ্ট নয় যে উদ্দিষ্ট নায়িকার কীর্তনে অনেক কণ্ঠই একদিন আবেগমুখর হ'য়ে উঠেছিল, সেই সমন্বয় নামকীর্তনে তিনি শুধু আপন মনের মাধুরীটুকুই মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, প্রেমিকার নয়, কবির নিজের কথাই এখানে বড়ো। সেই দিব্য প্রতিমার গুণকীর্তনে কবি যে নিজেকে একদিন ঢেলে দিতে পেরেছিলেন, একথা ভেবেই তিনি কৃতার্থ। ধ্যান এখানে ধ্যেয়কে অতিক্রম ক'রে গেছে এবং বৈষ্ণব কবিতার অনুষঙ্গে সেই আবিষ্ট ক্ষণটির নিরবয়ব স্মৃতি লিরিকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে অবয়ব পেয়েছে। তৃতীয় পংক্তির 'পদাবলী' একদিকে যেমন প্রেমিকাব গুণকীর্তনেব উল্লেখ বহন করছে অন্যদিকে তেমনি ব'য়ে আনছে বৈষ্ণব কবিতার ভাবানুষঙ্গ। 'অনেক শ্রাবণ' শব্দবন্ধে কি কেবলই কালাতিপাতের দ্যোতনা? শ্রাবণের বর্ষণকে প্রেমেব কবিতায় কতো ভাবেই না অভিষিক্ত করেছেন কবিরা। শ্রাবণে ভালোবাসাব যূথী মুঞ্জরিত হয়, ঘন বর্ষণে বন ও মন রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে এবং 'দেহে আর মনে এক হ'য়ে যায় যে বাঞ্ছিত'। কবির ক'ছে শ্রাবণ তাই বারবার তার বৈভব নিয়ে ফিরে আসে, যদিও প্রেমিকার মন থেকে 'অনেক শ্রাবণ' (শ্রবণসংক্রান্ত?) অর্থাৎ অন্য অনেক গুণমুগ্ধের নিবেদিত পদাবলী তাঁব ব্যক্তিগত পদাবলীকে ধুয়ে দেয়। 'ধুয়ে গেছে', মানে, কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি। শ্রাবণের বর্ষণপ্রসঙ্গে এই ক্রিয়াপদটির ব্যবহার অনিবার্য ছিল। 'গেছে' মনে আনে 'গেয়েছি' ক্রিয়াপদটিকে, যা আগের একটি মাত্রা হারিয়ে, রিক্ততার প্রতীক হ'য়ে দাড়াল। এছাড়াও ক্রিয়াটিতে ইঙ্গিত আছে এক চরম পরিণতির, এমন এক ঘড়ির কাঁটার, যাকে কোনোদিনই পিছনে ঠেলে দেওয়া যাবে না। সেই কারণেই দ্বিতীয় পাঠের পরিবর্তিত বিরাম-চিহ্ন প্রয়োগের দিক থেকে সার্থক। তৃতীয় পংক্তির চোদ্দমাত্রার বিস্তারের প্রতিতুলনায় চতুর্থ পংক্তির ছয় মাত্রার সংক্ষিপ্ততা ব্যঞ্জনার তীব্রতায় টানটান। পদাবলী ধুয়ে গেছে, এমন কি কবিরও হয়তো আর দোহারের বিহ্বলতা নেই, কিন্তু পদাবলীর স্মৃতি মুছে যায় নি তাঁর মন থেকে—যা'বেও না। 'স্মৃতি' শব্দের 'ব' ধ্বনি বিদ্ধতার যন্ত্রণায় সূচীমুখ হ'য়ে ওঠে 'তার' সর্বনামে সঞ্চারিত হ'য়ে। মাঝে 'আছে' ক্রিয়ার পর বিরামজনিত

ঝঙ্কৃতি 'তার'-র চীৎকৃত কম্পনে স্মৃতিজনিত বেদনাকে যেন বেহালার ছড় টেনে ব্যাপ্ত ক'রে দেয় কবির বর্তমান নিঃসঙ্গতায়। এছাড়াও, 'তার' কি কেবলই 'পদাবলী'র সর্বনাম? এর মধ্যে প্রেমিকার বধির উপস্থিতিও কি লক্ষ্য করি না আমরা?

'তার' শব্দের কম্পন দ্বিতীয় স্তবকের 'রৌদ্র' শব্দেব 'র' ধ্বনিব দ্বিত্বে বিবর্ধিত হ'যে ছড়িয়ে পড়ে। অপ্রতিহত তার প্রতাপ, অসংকুচিত তার বিস্তার। রৌদ্রে জলে' মরে না এই স্মৃতি। রৌদ্র ও জল, পবস্পরবিরোধ এই দুটি আঙ্গিভূতের সমাপতন ঘটিযে বিষ্ণু দে সময ও অভিজ্ঞতার উত্থান পতন বিচিত্রাকে মূর্ত ক'রে তুললেন। 'স্মৃতি'-ব আগে 'সেই' নিদর্শকের প্রয়োগ স্মৃতিতে বিশিষ্টতাব সঞ্চাব কবল। 'মরে না' শব্দবন্ধে যেমন স্মৃতিব মৃত্যুহীন উপস্থিতি আভাসিত, তেমনি 'স্মৃতি বড়ো বালাই'র মনোভাবও অস্পষ্ট নয়। স্মৃতি প্রসঙ্গে 'আয়ু'ব ব্যবহার প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং পববর্তী 'যে' মোটেই ছন্দ ও মিলের মুখ চেয়ে নয়। মরবে কি, তার আয়ু অর্থাৎ স্মৃতির পরমায়ু লোহার মতো- দীর্ঘস্থায়ী, কাচের মতো ক্ষণভঙ্গুর নয়। ভাবতে অবাক লাগে, স্মৃতিমদির এই কবিতায় কতো অনায়াসে বিষ্ণু দে 'লোহা'-র মতো একটি অকাব্যিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। ধাতু হিসেবে লোহা যেমন অপেক্ষাকৃত কম ক্ষয়শীল, তেমনি তা হ'লো পৃথিবীব প্রাচীনতম ধাতুসমূহের অন্যতম। স্মৃতি প্রসঙ্গে উভয় অর্থেই লোহা-র ব্যবহার সার্থক। এছাড়াও, 'পদাবলী' 'দোহার' 'শ্রাবণ' ইত্যাদি প্রথাসিদ্ধ রোম্যান্টিক অনুষঙ্গবহুল শব্দের সঙ্গে 'লোহা'ও 'মরচে'-র মতো গদ্যগন্ধী শব্দের সচেতন সংঘর্ষ ঘটিয়ে রচিত হ লো এমন এক বৈপরীত্য যা আধুনিক কবিতার কুললক্ষণ। আধুনিক কবিদের মধ্যে এলিয়টের উত্তরাধিকার সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে বিষ্ণু দে-র কবিতায়। 'দুরন্ত' বিশেষণে স্মৃতির ক্লান্তিহীন অপ্রতিরোধ্যতার ইঙ্গিত দেওয়া হ'লো। উপরন্তু, বৈষ্ণব কবিতার অনুষঙ্গে সেই চির কিশোরটির দুরন্তপনার স্মৃতিও শব্দটির মর্মে অনুপ্রবিষ্ট।

আমরা জানতে চাইতে পারি, স্মৃতির উপস্থিতি যদি এতোই তীব্র ও তার আক্রমণ এমনই অপ্রতিরোধ্য ব'লে মনে হয় কবির, তবে কী ক'রে তার দাহ নির্বাপিত হ'য়ে যায় কবিতার শেষ পংক্তির 'বাহার'-র চটুল ধ্বনিতে? তৃতীয়

পংক্তির 'শুধু' শব্দে এই প্রশ্নের উত্তর প্রচ্ছন্ন। 'শুধু লেগে আছে মনে ব্যথার স্নায়ুতে / মর্চের বাহার'। অর্থাৎ, অনেক শ্রাবণ অতিক্রম ক'রে স্মৃতির দহন নেই আর, শুধু চেতনার প্রান্তে তার সুরভিটুকু লেগে আছে। 'ব্যথার স্নায়ু' শব্দবন্ধ ইঙ্গিত করছে হৃদয়ের গভীর ক্ষতের। স্নায়ু যেহেতু সবচেয়ে সংবেদনশীল তন্তুজাল, স্পর্শের হাওয়াতেই তা ঝনঝনিয়ে উঠবে। শুরু হ'বে বেদনার রক্তপাত। স্মৃতিজনিত বেদনার সেই রক্তক্ষরণ আপাতত স্তব্ধ হ'য়ে আছে। কারণ এখন সমস্ত 'ব্যথার স্নায়ু' জুড়ে 'মর্চের বাহার। 'লোহা'র অনুষঙ্গে 'মর্চে'-র ব্যবহার চিত্রকল্পটিকে আরও ইন্দ্রিয়ময় ক'রে তুলেছে। লোহার আয়ু যতো দুরন্তই হোক্ না কেন, রৌদ্র ও জলের সংস্পর্শে তাতে মর্চের প্রলেপ লাগে। দৈনন্দিনের ধূলিমলিন স্পর্শে স্মৃতি ও সংরাগের প্রত্যক্ষতা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তার প্রাথমিক দীপ্তি ও দাহ হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য 'বাহার' শব্দের আপাত চমৎকারী ব্যঞ্জনার আড়ালে তির্যক ব্যঙ্গের হাসি এড়িয়ে যায় না পাঠককে। অন্তত আমার মনে হয়েছে, অন্তর্গত 'বাহা'-র ধিক্কার কবির নিজের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া। তবু 'লেগে আছে' শব্দ দুটিতে কোথাও যেন একটু দ্বিধা-কম্পন থেকে যায়। লেগে আছে, কিন্তু যদি হঠাৎ ঝ'রে যায়, তবে কী হ'বে? কী হ'বে?

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ মিত্র

মোহনগঞ্জের উপাখ্যান

মোহনগঞ্জে আবহাওয়া এক সময় পরিষ্কার,
রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ে ইটপাথরে কালো সাদা চামড়ায়
দুই দিক থেকে ট্রেন মোটরবাস এসে পৌঁছয়
এরোপ্লেনও ডানা ভাসিয়ে নামে।
খাসা মেলবার জায়গা,
নমস্কার পেন্নাম হই চমৎকার চমৎকার।

এটা বদলে যাওয়ারও জায়গা।

চিতোনো বুকে আকাশটাকে টেনে বিছিয়ে দেওয়া পিছটান ছিঁড়ে সীমানা ছাড়ানো এ-আলো থেকে সে-আলো জাহাজের একরাশ ঝলকসুদ্ধু সমুদ্দুরের তলা ছুঁয়ে দূরান্তরের ফোয়ারায় লাফিয়ে ওঠা আনকোরা নতুন এই তো এখানে বাসা কতকালের বাস এবার নতুন চমৎকার।

বুক ভরতি কথা কে আর ব'লে ফুরোবে সেগুলো গলার তারে টোকা দেয় আঙুলে চনমন করে চোখের খোলা পাতায় ছল্‌কায়। হুইসেল ভেঁপু ঝোম থামার পর আরেক আওয়াজ শরীর থেকে শরীরে ছড়িয়ে বাতাসে ফুরফুর। কেউ কাউকে আঁকড়ে নেই, তবু।

এখানে একটা মোনুমেন্ট তুলতে হবে। কথাটা আসেই মনে মনে। দুই মাথার উপর বাতি জ্বলবে বাতি বটে আনাচ কানাচ মুছে দিয়ে আপন ক'রে চেনানো তারপর রজনী প্রভাত হৈলো জাগো হে।

কতক্ষণ থাকে রোদ
কতক্ষণ মানুষ দেখবার আলো?
পায়ের নিচে ঝিমঝিমে হিম
হাড়বেহাড়ে শিরশির

কথাগুলো ক্রমে বরফের চৌকো
ক্রমে বুকের মধ্যে কে কোথায়
এগিয়ে গেলে বিভুঁই
পেছন ঘুরলে বাঁজা মাঠ
রেলগাড়ি সিটি দেয়
বাসের ঝাঁকরানি ওঠে এরোপ্লেনেব বোঁ-ঘুর
উল্টো দিকে সারাটা পথ অন্ধ হ'য়ে
কোথায় ?
গা বেড দিয়ে চোখমুখ ঝেঁপে কুয়াশা
মোহনগঞ্জে আবাব কুয়াশা।

চিত্ত ঘোষ

আমার মনে

তুমি একবাব হাত তুলে
পেছনের দিকে তাকিয়েছিলে
তোমার বাঁকানো ঘাডের রেখাগুলো
টনটন করে উঠেছিল।

একটা ঠিক্‌রানো পাথরের মতো
সেই লগ্নকে আমি ধাবণ করি।
সময়ের সেই চূর্ণগুলো
আমি গায়ে মাখি।

তোমার চুলের গন্ধ
আমার মনে আছে।
তোমার শরীরের কামিনী স্বাদ
আমার মনে আছে।

মাঝে মাঝে আমার আয়নায়
এখনো তোমার ছায়া পড়ে
তাতে কিছু আসে যায় না।
বিস্ময়ের দূর চিহ্ন আমি ছাড়িয়ে এসেছি।
তবু সাধ মরে না।

আমাব কাছে সম্ভব অসম্ভবের সীমানা বলে
কিছু নেই॥

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

ফর্ক

গোলাপফুলেব গায়ে
কতো জটিলতা,
যদি একবার চুপ করে থাকি।
তেমনই সঙ্কুল
দেশলাই কাঠি :
তুকারাম
সোনাব কটোরা।
না-থেকে
গুহাচিত্র,
দিল্লি মস্কৌ
লণ্ডন শহর
সারাদিন দপ দপ কলকাতা,
ভাবা যায় ?
ঐ কিন্তে—
ও কলিত জার,

তাকো তন্ময় তীরধনুক—
ইসাডোরা ডানকান ?
মগডালে সগুঞ্জন মাথার মৌচাক :
সুর তাল ধুন পয়ার ও অন্ত্যমিল,
রামকিঙ্করের নুয়ে-পড়া কঠোর ভাস্কর্য,
শেষরাতে
প্রভুমীশমনীশ ,
আর ঐ মেযে
সুমিষ্ট,
যে-বয়সে ফ্রক আর শাড়ি এই ফর্ক
তাকে বেঁধে , রঙ মাজা,
শামলাই বলা যায়—
কৃষ্ণের বাঁশিব মতো ।

গৌরকিশোর ঘোষ

হোকুসাই-এব কাঠখোদাই

(বুড়ুর জন্ম)

সাগরের তরঙ্গ সফেন
সামনেই ফুজি
উদয়াস্ত নিত্য জাল ফেলা
কোনদিন দান ওঠে
কোনদিন জলে যায় পুঁজি
সংসারেব নিত্যকার খেলা

সৌভাগ্যের দুর্ভাগ্যের
এই টানা ও পোড়েনে
নির্বিকার ফুজি

আলোক সরকার

অভিযোজনা

সম্পূর্ণ একটা বৈশাখমাস আর তার ভিতর দিয়ে
কোনো ছাতা নেই মাথায়
সাদা আর হলুদ মেশানো প্রান্তর অনপেক্ষ সপ্রতিষ্ঠ দুপুর
পা আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে পা ডিঙিয়ে যাচ্ছে শুকনো শিকড়

আর তার চোখ আড়াল না নিয়েও পাঁচ আঙুলের
ক্রমে বড় হয়ে উঠছে ঐ দেখাতে পাচ্ছে সেই সাদা আর হলুদ
যেখানে দেখাব মতন কিছুই নেই
দেখতে পাচ্ছে হয়ে উঠছে অলক্ষ্য যেমন তার হয়ে ওঠা

শিখাহীন অকম্প অগ্নিময় আর সেই প্রগাঢ় অন্তরাল
লাল রূপান্তরিত ধূসর অকম্পন মেঘময় একটা ধূসর
শাঁখ বাজছে এগিয়ে আসছে ববণডালা
এক দুই অপরিচিত আগন্তুক সে আরো এগিয়ে যাচ্ছে

ঘুরতে-ঘুরতে এগিয়ে আসছে হাওয়া থেকে থেকে পেঁচিয়ে ধরছে
অন্ধ করছে চোখ আর সেই জাদুকর
ছুঁড়ে মারছে উত্তপ্ত লৌহচূর্ণ আর তার পা
আরো আরো হয়ে উঠছে, জন্মান্তর, উৎসব হয়ে উঠছে চতুর্দিক।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আহুতি

জলমহিষের কলামাত্রিক শিং
তার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড দেখছিলাম
আমার ঘরণী তখনো জল নিয়ে ফেরে নি
দুর্ভাবনা আর কল্যাণের

সন্ধিক্ষণে
আমাকে অন্তঃকরণের প্রশান্তি
উপহার দিয়ে জলমহিষটা
আচম্‌কা এক জল্লাদের খুরের নিচে নেমে গেল !

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

মেঘমালা

আজ এখানে রোদনাচানো খেলা
কাল সেখানে বৃষ্টি ঝরাও
কত রকম খেলাই জান ?
প্রকৃতি তোমার নানানতর
মেঘনাচানো জলের খেলা।
ভালবাসার খেলার বেলা
শুরু হয় যাদুকরের হাতের মুঠি
ছুঃমন্তরে সরিয়ে দাও।
ভাসতে থাকে শূন্যে তখন ভালবাসা
মেঘ-জড়ানো।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

তন্ময়দা আমার প্রত্যাবর্তন অনিবার্য

তন্ময়দা আজ আমাদের জয় সুনিশ্চিত ছিল, অথচ পরাজয় হল। এটাই আমাব নিয়তি, নিশ্চিত জয়ের মুহূর্তেই বিপর্যয়। তন্ময়দা আমি তোমায় বলেছিলাম, আজ আর গোলে খেলব না তুমি শুনলে না, অতঃপর আমাব দুর্ভাগ্যেব উত্তাল তরঙ্গ দলের সৌভাগ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যখন, তখন আমার প্রত্যাবর্তন অনিবার্য।

আসলে কাল সকাল থেকেই সেই ভেঁপু—তালপাতার বাঁশীটা আব মাটির বেহালাটা বাজতে শুরু করেছিল, ওগুলো বাজলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না, কোথায় হারিয়ে যাই, হারিয়ে যাই মায়ের মায়াপুরে, মায়ের মায়ায় মাখা ১৫০ নম্বর এস আর ডি বোডের সেই বাড়ী আমাকে ডাকতে থাকে। আমাদের চিলেকোঠার ছাদের কার্নিশের ওপর এতক্ষণ হয়ত কাকেরা সভা বসিয়েছে সূর্যাস্তের কমলা আলো তাদের পাখায় পড়ে, আরও উজ্জ্বল তাবা বাসায় ঢোকার আগে। মা হয়ত, আমার গিরেবাজ মুখখী, লোটন সব পায়রাগুলোকেই আদর করে তাদেব বাসায় তুলে দিয়েছে, পায়রারা এখন অদ্ভুত নরম-গরম বক বকুম কুম শব্দ তুলেছে, আমাদের বাড়ীর সামনের মাঠের বটগাছটার ডালের পাতায় পাতায় বৃষ্টির জমা জল, হাওয়ার ধাক্কায় ঝরে ঝরে পড়ছে। বট গাছটা নিশ্চয়ই আরও বিরাট হয়েছে এখন আব বটের ঝুরিগুলোও। বাবার কুলগুরু একবার ওই বট-গাছটাকে দেখতে দেখতে আমাকে কি ভেবে বলেছিলেন জানি না "জানো পবিত্র মানুষের হাজার রকম সংস্কাব ঠিক ওই বটের ঝুরির মত, ক্রমশ বাড়তে থাকে আর মাটির তলায় নেমে গিয়ে কেবল গাছের সংসাব বাড়ায়। কিন্তু প্রথম থেকেই কেটে দাও কিছুটা রক্ষা পাবে।"

ওই। আবার সেই তালপাতার ভেঁপু—মাটির বেহালা তন্ময়দা আমি বলেছিলাম, আমার খেলা ভাল হবে না, তুমি শুনলে না, পরাজয়!—হ্যাঁ ভালই। এ খবব। মিলে গেছে বন্যার গাপন আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ পাত্র . "গাড়ী। বাড়ী। প্রচুব ভূসম্পত্তি, একমাত্র সুন্দরী পাত্রীই কাম্য", সুন্দরী পাত্রী রত্নাকে তার বাবা স্বর্ণাধারে রক্ষা করুক, আমি তার লক্ষ্যে পৌছনর জন্য যথেষ্ট দামী শাড়ী সৌখীন ব্লাউজ যুগিয়ে দিয়েছি। বন্যার আর আমাকে প্রয়োজন নেই। অথচ তন্ময়দা সত্যি আমাব কিছুই খারাপ লাগছে না। আমাব কখনও লোভ ছিল না, ক্ষোভও নেই।

নাঃ, আমাকে কোথাও বসতে দিচ্ছে না বাঁশী, লিখতেও দিচ্ছে না তোমাকে মাটির বেহালা, বেজেই চলেছে কোথা থেকে এসে জুটেছে আবার মাটির সরার চামড়া আঁটা খুদে ঢাক, মাটির চাকা ঘুরছে, কাঠি পরছে ডম্ ডম্ ডম্ ডম ডম্, যেন জয়যাত্রার জয় ঢাক। মিনিরা মিনি-জগন্নাথকে মিনি রথে টানছে, আমি হাঁটছি পাঁপড় ভাজা খেতে খেতে রাথর মেলা দেখতে দেখতে ঐ তো মাটির বিড়াল

মাছ মুখে বসে, রুপোলী ইলিশ মাছ ঝুলবে দেওয়ালে। আমি হাঁটছি ক্রুত আষাঢ়ের মেঘ দেখতে দেখতে কোনও চায়ের দোকানে ক্ষণিক, বা কোনও বাড়ীর দোবগোড়ায় বসে লিখতে লিখতে চলেছি, তন্ময়দা আমাকে ক্ষমা কোরো আমি প্রত্যাবৃত, মা আমাক ডাকছে। মা এখন ভাড়ার ঘরে ঢুকেছে, নবম শান্ত মায়ের মুখ ভাড়ার ঘরে ঢুকে মা সবচেয়ে বড় থালায় সিধে সাধাচ্ছে, চাল ডাল আলু কাঁচকলা, মাটির খুবিতে ঘি কাঁচা মশলা সন্দেশ পান পর্যন্ত, কেননা সেই তুলসী গোস্বামী বৈরাগীর গান মা শুনতে ভালবাসে সে তাব একতাবায় একই গান গায় বছবেব পর বছর যেন ঐ একটাই সত্য বর্তমান পৃথিবীতে সে শব্দ তুলেছে গুব গুব গুব্ গুব্ গুব গুব একতারার তারে হাত, মুখ ঊর্ধ্ব আকাশেব দিকে উদাসীন বৈরাগী-মা-মাটি-ভেঁপু বেহালা জয়ঢাক-জগন্নাথ আর গান।"

"দিন ফুবাল সময়ে চল, ইহকাল পরকাল হারায না
এসেছ একাকী, একাকী যেতে হবে কেহ ত সঙ্গে যাবে না।"

হ্যাঁ আমি একাকী এসেছিলাম একাকী চলে যাচ্ছি। পবিত্র।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

অনতিক্রম্য

ঘুম ভেঙ্গে তোলা ঠাকুমার সাজি ভ'রে বাশি বাশি ভোরের টগর।
যে-কোনা ছুতোয স্কুল ফাঁকি দিয়ে
দুপুরে কেবল এ-ঘব ও-ঘর।
সন্ধে হতে না হতে ঘন ঘুমে পার হয়ে প্রান্তর
নদীর ওপারে মেঘের ওপারে ছিল তার পথ চলা।

এখন যুবক, কাছেও আসে না, সান্দ্র কণ্ঠস্বর।
বেলা পড়ে আসে।
কানে শুধু বাজে রিনরিনে কচি গলা।

শিশিরকুমার দাশ

যাই

যাই।
স্থান হোল না তোমার মন্দিরে।
তখন কেন
থাকা।
আর কেন এই ফুলগুলিকে
রাখা।
এবার তবে মুখ লুকোলাম
ভীড়ে।

ছিল, আমার সঙ্গে ছিল
রাঙা
কয়েকটি ফুল,
তাদের এখন ফেলে দিলাম,
ভাঙা
ঘটের জলে তাই।
যাই।

বাতাসে থাক ফুলের
গন্ধ,
বাতাস ছুটুক
অন্ধ
চোখে,
আমিও অন্ধ অন্ধকারে যাই।
যাই
যাই ভুজঙ্গ প্রতীক্ষমান
নীড়ে॥

পরিমল চক্রবর্তী

নিসর্গ-পথিক

উত্তুরে হাওয়াও যখন তাকে ফিরিয়ে দিলো
তখনও সে দক্ষিণে গেলো না—
সে কেবল নৈঋত কোণের দিকে এগোতে থাকলো।
সেখানে ঝড়ের সংকেত ছিলো,
ছিলো ঝঞ্ঝার তাণ্ডব,
একটা বিপুল বাত্যাবহের সম্ভাবনায়
সে-দিকের স্বর্গ-মর্ত্য-চরাচর
বিস্ফারিত চক্ষু মেলে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত গুণছিলো।
তবুও সে বিরত হলো না
পথের গেরুয়া ধুলো
গেরুয়া ধুলোর পথ
অদৃশ্য মায়ায় বেঁধে
তাকে নিয়ে কেবলই ঘুরতে থাকলো
এদিকে ওদিকে, এপাশে ওপাশে, এখানে সেখানে
উঁচু নিচু, ভাঙাচোরা, এবড়ো-খেবড়ো মাটি,
রুক্ষ কাঁকর স্তূপ, খোয়াইয়ের অসমবিস্তার—
আর দূরে, বহুদূরে .
যেন দিকচক্রবাল রেখাকে ডিঙিয়ে,
উর্মিল জলের ঢল
কাশবন, ঝাউবন, সপ্তপর্ণীবন,
আর মায়া, ঘন মায়া· অবগাঢ় মায়া ·
তার তৃষিত দু'চোখের সামনে
যেন দু:খিনী মায়ের শীর্ণ শাড়ীর আঁচল বিছিয়ে দিলো।
তার অবিরাম পদধ্বনি শোনা যেতে থাকলো
নিসর্গেরই দিকে।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ম্যাজিক

পাথর ছিল এই মানুষটা, পুত্রশোকে পাথর।
আমি তাকে পুত্র দিলুম, মানে আমি পুত্র সাজলুম,
অমনি লোকটা তরল হল, উদ্বেলিত সাগর।

দেখুন দেখুন কাণ্ডটা কী! (কাণ্ডটা কী, কাণ্ডটা কী!)
আমি হলুম মনের দুঃখে হঠাৎ আত্মঘাতী।
সাগর নামের লোকটা হল চোখের সামনে পাথর।

সাগরটা কি, পাথরটা কি?
একটা থাকলে অন্যটা কি?
সমস্তটাই ভোজবাজি কি?
সমস্তটাই ভোজবাজি কি?

চতুর্দিকে হাজার হাজার পাথর এবং সাগর।

বিজয়কুমার দত্ত

অনধিকারীর নিবেদন

তুমি স্তুতি কিংবা অর্ঘ, কিছুই চাও নি
তবু দেশ-দেশান্তর থেকে শব্দ আর অক্ষরের
শিলালিপি খুঁজে ফিরতে হবে
আমাকেই।

তুমি চাও নি, একথা মানি
কিন্তু আমার ভূমিকা যে তীর্থযাত্রীর
একথাও জানি:

এই দ্বন্দ্বের ভিতর থেকেই গড়ে উঠছে
কত পাহাড় ও অরণ্যশীর্ষের চড়াই উৎরাই
তারই মধ্যে ভেসে উঠছে আমার প্রতিদিনের জন্ম
এবং প্রতিদিনের মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি
তুমি না চাইলেও আমাকে জানতে হবে
সেই অশ্রুত মন্ত্র
পৃথিবীর কোন কবির চেতনায়
এখনো হয় নি যার শিল্পিত নির্মাণ।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত ছাপিয়ে তবু বীতপত্র সাধ

আকাশের প্রসারিত হাতে নিমন্ত্রণের চিঠি
সঙ্গিনীর চোখে প্রিয়তম ভঙ্গীর আশ্বাস
ভবিষ্যতের করিডর জুড়ে
সাফল্যের সারিবদ্ধ ফোটোগ্রাফ
সমস্ত ছাপিয়ে তবু বীতপত্র সাধ।

অলক্ষ্যে কোথাও যেন বেড়ে যায়
চত্বরের ঘাস।
ক্যালেণ্ডার, জীবনবীমা এবং
সীমিত ত্রিভুজের
জটিল মানচিত্র ও বিবিধ হাতেমতাই
যা-কিছু ভুলিয়ে রাখে,
সমস্ত ছাপিয়ে ওঠে
দাম্ভিক পায়ের শব্দ,
বীতপত্র সাধ।

উত্তম দাশ

একটা গল্পের নাম

ভালোবাসা একটা গল্পের নাম
সেই গল্প আসলে একটা নদী
বালিহাঁসের বুকে মাতাল
দু'পাড়ে মেহেদী বনের লজ্জা
কাশের আকাশে আশ্বিন

ভালোবাসা একটা গল্পের নাম
সেই গল্প আসলে একটা নদী
নদীতে এখন প্রতিদিনের ড্রেজিং
মেহেদীর লজ্জা কাশের আকাশ
লতাপাতার সোঁদাগন্ধ
মেয়েরা শহরে বেচে আসে

ভাটির চড়ায় প্রতিদিন ড্রেজার
নদী আসলে একটা গল্প
সেই গল্পের নাম ভালোবাসা।

প্রদীপ মুন্সী

হিসেবের পরে

ধ্বনি বিনিময় শেষ হলে
হিসেবের পর
রাত্রির নির্জনে
সব আবরণ খুলে তোমার মুখোমুখি দাঁড়াই
কাজ কি হয় নি শেষ

কে নেবে এই দেহের ভার
ধ্বনিরা হেসে ওঠে
হাসে সংসার
নিষ্ফলা কর্ম আর যন্ত্রণা নিয়তি আমার

রাত্রির শিখা নক্ষত্রে বিলীন হয়ে আসে

জগত লাহা

জীবনজলের রেখা

(কতো দিন-যে কবিতা নেই মনে !)

গোষ্ঠে রাখাল—সূর্য বসল পাটে
সন্ধ্যা নামল আকাশমণির বনে
প্রিয় কোনো মুখ পড়ে না মনে

('কেমন আছেন' ? শুধোয় পড়শিজনে ।)

প্রকৃতি পটে ধেনু চরায় রাখাল
প্রেমও থাকে ?—কখন-যে আসে আকাল !
জলের শব্দে ফিরে আসবে না সকাল ?

তরু ছায়া—শিশুকালের হিম—
হাওয়ায় উড়ে ঘুরে বেড়ায় : নিম-
ফুলের গন্ধে স্মৃতির ডিম, ফেটে
গড়িয়ে যায় জীবনজলের রেখা

ঘুঙুর বাজাস্ কোথায় চন্দ্রলেখা ?

মনোরমা সিংহরায়

কখন তোমার দুয়ার খুলবে

তোমার সিংহদুয়ার খুলে দাও।
আমি বসে আছি অনেকক্ষণ ধরে
তোমাকে দেখবো বলে বসে আছি
কখন তোমার দুয়ার খুলবে ?

বেলা বহে যায়,
দুরন্ত দুপুরের খররৌদ্রে আমি অপেক্ষা করছি
এখন বেলা পড়ে এলো
পাখীরা নীড়ে ফিরে যায়
আকাশ রক্তিম আভায় সুন্দর হ'লো।
আর একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে
সমস্ত ভুবন।
তখন কি তোমার দুয়ার খুলবে।
অনেক আলো জ্বলবে
আর সেই আলোতে
আমি তোমাকে আকুল হয়ে দেখবো ?

তোমার সিংহদুয়ার খুলে দাও, খুলে দাও ॥

মুরারিশংকর ভট্টাচার্য

এখন বসন্তকাল

চৈত্রের হাওয়ায় ঝরে কৃষ্ণচূড়া'
ডালপালা ভেঙে যায় সামান্য আঘাতে
ঝড় উঠলেই তছনছ ফুলের বাগান
ফুলদানি পড়ে থাকে বড় নিরুত্তাপ।

অশোককুমার মহান্তী

স্বগোত্র সন্ধান

তোমাকে দেখেছি সত্যে   সত্যধামে   সর্বাঙ্গসুন্দর
মধুময় হাসো তুমি   বৃষ্টির মতন কাঁদো   যবে রণভূমি
স্বজন সুবাস শূন্য   প্রিয়জন দূরে যায়   দূরের আহ্বানে
আমারও তো ইচ্ছা নয়   পাড়শুদ্ধ ভেঙ্গে যাক   জীবনের জটিল পরিখা
বরং এমনি ভাবি   বিষে তনু নীল হোক   যাবৎ জীবন
তুমি আমাদেরই সুখ   আমাদের ভূমা তুমি   নিকট কর্কট
স্বগোত্র সন্ধান পাই   রক্তের নদীতে   নৌকা ভাসাবার পরে।

শম্ভু মিত্র

উন্মোচন

সরল বর্গীয় গাছ তোমার বাকল খুলে ফেলো,
কেননা বাকলে আঁকা নানান জটিল আঁকিবুঁকি,
দুহাতে সরাও, আমি তোমায় দেখে নেব রজস্বলা নারীর স্বরূপে,
লক্ষবর্ষ বল্কলের অন্তরালে দস্তুর পশুর দল মেতেছে খেলায়,
মনের ভেতর আজ স্মৃতির বাঘেরা নড়ে চড়ে
তোমার বাকল খোলো তোমাকে দেখব আমি শিশুর আদলে।

সরল বর্গীয় গাছ, আমার ভীষণ ইচ্ছে করে
শরীরের চর্মবর্ম সব খুলে ফেলে
সটান দাঁড়িয়ে যাই তোমারই মতো, উত্তরাস্য হ'য়ে
শরীরে পড়ুক এসে লক্ষবর্ষ সূর্যের ছোবল
আসন্নপ্রসবা হংসী এক ফোঁটা অম্বু দিয়ে পৃথিবীকে করুক উর্বর।

তুমি তো উলংগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছো কবে থেকে
তবু একটু জটিলতা গেলো না এখনো

অরণ্যে বাড়িয়ে বাহু কি গভীর ষড়যন্ত্রে সূর্যকে ঢাকো
অনেক ভেবেছি আমি উলংগ দাঁড়ালে বুঝি কেটে যাবে জটিলতা সব

বল্কল খুলে ফেলো, আমি
দেখাদেখি ত্বকমুক্ত হয়ে
দুইজনা বনের ভিতর
স্বপ্নে ত্রিভুবন ঘুরব সারারাত
ব্রত শেষে বাকল চামড়া সহযোগে
গড়ে নেবো করোটিতে অনুপম স্মৃতির বাসব ॥

হিমাংশুশেখর বাগচী

জীবন

জীবন মানেই বৃত্তের বাইরে
কিংবা বৃত্তস্থ কোনো শিল্পের কারিকুরি
যেমন সহজেই বটগাছের ঝুরি
মাটির আত্মীয়তার পরমমোহে বাড়িয়ে দেয় হাত
আর সমস্ত যন্ত্রণার
কালঘাম মুছে ছুটে যায় নক্ষত্র, ইতিহাস, সভ্যতা
শুধু ঈশ্বর থাকেন আপন ভাবে জেগে

সন্দীপ সরকার

শিয়রে চাঁদ

যেনবা কোনো ম্লান জবুথবু রমণী,
স্থির সরে যায় অন্তঃপুরে,
কলকাতার শিয়রে চাঁদ
পরিব্যাপ্ত আকাশে অদৃশ্য

তার হ্রাসবৃদ্ধি
ষোড়শী কলার
কোনো সংবাদ-ই রাখি না।

মাঝেমধ্যে গভীর রাতের অন্ধকারে
সে খোলা জানালার মধ্যে দিয়ে
নিঃশব্দে আসে
খাটের বাজু ধ'রে কপালে হাত রাখে
মৃদু অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে

হরপ্পা বরোবুদর অন্ত অনেক রাত
জনহীন প্রাচীর মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর্যের
বিস্মৃত পরিবেশ মনে আসে
নদীর ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ
যেন ধাকা মারে বুকের নৌকায়
তর্জনী তুলে সে বলে মিথ্যুক
তারপর হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায়

জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী

নিজেরই তো কাছে

বারবার ফিরে আসি নিজেরই তো কাছে
ফিরে আসি……
ফিরে আসি ঘরগুলো পার হয়ে।
সেখানে নির্জন চয়ে অভিনয় নেই,
আমারই নিজস্ব যেন সমস্ত ভুবন।

গভীর আকাশ থেকে সুনীল বিদ্যুৎ
ঘরেও শিউরে ওঠে!

এক প্রেম থেকে অন্য প্রেমে দেখি
চলে যাওয়া—শুধু চলে যাওয়া,
আগুনের ঘর থেকে হেঁটে চলে যাই
অন্য এক আগুনের ঘরে।

বারবার ফিরে ফিরে নিজেরই তো কাছে
ফিরে আসি।

বাসুদেব গুপ্ত

কি জানি

যে আমায় ঘূর্ণি নাচায়
আমি তার নাম জানি না
ধরতে গেলে প্রান্তসীমা এক পলকে বহুদ্দূর
খুঁজতে খুঁজতে আকাশ খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্দুর।
যে আমার ভাঙায় ঘুম
আমি তাকে দেখবো কি—
চোখ মেললে ঘুলন্ত জাল, ফুলের হাতে রোদের ঝাঁকা
রঙীনতা আঁকতে আঁকতে ছুটছে প্রজাপতির পাখা
শরীর ভোর ছায়ার ভীড় নষ্টনীড় নষ্টনীড়
ধুলোর সারা আত্মা ঢাকে নিরুদ্দেশ বোষ্টমীর।

যে আমায় দুঃখ শেখায়
সে হাসে একটি কোণে
বাদ্‌লা পোকা অন্যমনে ফেলছে ভরে শূন্য খাতা
নিঃস্ব আঙুল খুঁজছে একা শীতের ডালে কৈ কবিতা?

অনিমেষ রায়

এবং আমি

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার
পরীক্ষা করে নিলাম,
ভাঙা চোয়াল খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি ইতস্তত: চুল
চোখ দুটি কোটরে,
যেন প্রতিদিনকার ট্রাম বাস রাস্তাঘাটগুলির মতো
একটা বিধ্বস্ত চেহারা।
আয় বাবা, এদিকে আয়, মনে হল মা যেন ডাকছে
দাঁড়িওয়ালার ভয় দেখিয়ে দুধের বাটিটা এগিয়ে দেওয়া,
তারপর স্নান, ভাত খাওয়া, লক্ষ্মী ছেলের মতো
ঘুমিয়ে পড়া,
আয় ঘুম আয় ঘুম ঘুম আয়,

না মা! না দেখছো না, এখন আমি অনেক বড় হয়েছি, অনেক
রাত গভীর হচ্ছে, মনে হয় অনেক রাত,
শুতে যেতে হবে, বিছানাটা নেই মশারীটা টানানো,
না মা যেও না দেখ? আমি কত বড় হয়েছি
কত ·· ···।

কবিতার ভাবনা (১১)

অরুণকুমার সরকার-এর স্মৃতিতে

তখন রাত্রি একটা বেজে গেছে। নিমতলা শ্মশানের বাইরে গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে প্রবীন নবীন সন্ন্যাসীর দল ধুনি জালিয়ে কেউ কেউ বা গাঁজা এবং সিদ্ধি চরসের মিশ্রণজাত নেশায় রক্তবর্ণ চক্ষু মেলে আমাদের দিকে কৃপা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আমরা অর্থাৎ অরুণকুমার সরকার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আমি। একটি কবি সম্মেলনে আমাদের কিছু কবিতা টেপ্ করেছিলেন শিবনারায়ণ রায় মহাশয়, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ্ ডিপার্টমেণ্টের জন্য। যতদূর মনে পড়ছে অন্যান্য কবিদের মধ্যে সেদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মানস রায়চৌধুরী, শোভন সোম, কালীকৃষ্ণ গুহ, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, স্বদেশ দত্ত এঁরাও ছিলেন। কবিসভার শেষে আমরাই তিনজন একত্র হয়ে ফেরবার পথে বাড়ি না গিয়ে নিমতলা শ্মশানে এসেছিলুম। এবং কী এক আকর্ষণে রাত্রি একটা বেজে গেলেও আমরা কেউ বাড়ি ফেরবার তাগাদা অনুভব করি নি। শরৎকুমার একজন নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কী এক গভীর সমস্যার কথা আলোচনা করছিল। আমি এবং অরুণ গঙ্গার ধারে রেলিঙ-এ ভর দিয়ে গল্প করছিলুম। আমি বলছিলুম, 'দেখো, গঙ্গার জল কি আশ্চর্য স্থির, মনে হয় একটি প্রকাণ্ড চওড়া চাদর পাতা আছে, এপার থেকে ওপার স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায়।' অরুণ হঠাৎই বলে উঠলো, 'ঠিক বলেছো, একদিন তো ওপারেই যেতে হবে, এমনি সহজে যদি নদীপার হয়ে যাওয়া যেত।' একটুখানি থেমে আবার বললো ' 'গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতে কেমন মনে হচ্ছে যেন বহুযুগ আগে এমনিভাবেই আমরা তিনজন এখানে এসেছিলাম— যেন অনেকবার এই পৃথিবীতে এসেছি। মাঝেমধ্যে চমক লাগে, কত চির-পরিচিত এই পৃথিবী, নতুন ক'রে দেখছি।'

অরুণকুমার সরকার কি তখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন মনে মনে, ওপারে যাবার। এই ধরণের কথাবার্তা একজন বিজ্ঞান-বিশ্বাসী লোকের বলে মনে হয় না, কিন্তু একজন কবির কাছে এ জাতীয় অভিজ্ঞতা অসত্য নয়। হাতে-

কলমে প্রমাণ পেলেই তা সত্য, আর কিছু পৃথিবীতে সত্য নয়, এ তর্ক অবশ্যই একধরণের পণ্ডিতরা করে থাকেন। এরিখ ফ্রম মহাশয় অনেকটা এরকম বলেছিলেন, আমাদের জানার জগৎ এক ভাগ, যা জানি না সেই জগৎ নিরানব্বই ভাগ। তাই বলে কি সে জগৎ অসত্য। কিন্তু কবির জগৎ পণ্ডিতের জগৎ থেকে পৃথক—যদিও কোন কবিও অবশ্যই পণ্ডিত হতে পারেন। প্রকৃত সৎ কবিকে পাণ্ডিত্য আচ্ছন্ন করে না, প্রকৃত জ্ঞান তাকে সহজ হতে শেখায়, যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের জ্ঞান তাঁকে পণ্ডিতীপনার পথ থেকে দূরে সরিয়ে ভক্তির পথে এনেছিল। অরুণ যে খুব পড়াশুনো করতেন তা নয়, আড্ডা দেওয়াতেই তাঁর প্রধানতম আনন্দ ছিল। সে জানতো, গাদা গাদা বই পডলে পোকা বাছা হতে পারে, জ্ঞান সঞ্চয় হয় না। জ্ঞানের জন্য একধরণের বিশেষ দৃষ্টি দরকার। বই ঘাটলে তথ্য জানা যেতে পারে, কিন্তু একজন কবির প্রয়োজন তথ্যে নয়, তত্ত্বে। তাই দেখা যায়, অরুণকুমার সরকার যখন যে বিষয়ে সামান্য গদ্য আলোচনা করেছেন তখনই সেই গদ্যে একটি বিশেষ ছাপ পডেছিল। তা চট করে আর কারু লেখার সঙ্গে মিলত না। নিজের কিছু বক্তব্য থাকতো—যা তাঁরই উপলব্ধিতে বেড়ে-ওঠা। এমন লেখকও দেশে আছেন, নতুন কিছু বলে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় যাঁরা সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন। সম্ভবত নীরোদ সি. চৌধুরী এমন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত লেখক—যাঁর সম্বন্ধে অনেককেই এই মন্তব্য করতে শুনেছি। আরো দু'চারজন যে নেই তা নয়, এই দেশে। যাই হোক।

অরুণ এতো শীঘ্র চলে যাবে আমরা ভাবি নি, ভাবে নি তাঁর স্ত্রী বা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব। আর কি ভেবেছিল তাঁর পুত্র অভিরূপ? তাহলে কি সে দূরদেশে পড়তে যেতো? অরুণের স্ত্রীর কাছে শুনেছি, অভিরূপ বিদেশে যাবার পর থেকেই এক নিরাশা অরুণকে ঘিরে ধরে। সেই নিরাশাই কি তাঁকে টেনে নিয়ে গেলো! অভিরূপকে কি সে এতো ভালোবাসতো—যা অন্য কোন পিতা তার পুত্রের জন্য সঞ্চিত করে রাখে নি। হবে হয়তো। এই কবিতাটি পাঠক পড়ুন। হয়তো কবি নয়, প্রাবন্ধিক নয়, বন্ধুবৎসল প্রেমিকও নয়, পিতা অরুণকুমার সরকারকে চিনতে পারবেন:

> বাবা বহুদিন মৃত। ঠাকুর্দা তো স্মৃতিতে ধূসর।
> আমিও হয়েছি পিতা, প্রৌঢ় পিতা।

এই পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে নিঃসঙ্গ পিতাবা।
বেঁচে আছি মৃত পিতা, বৃদ্ধ পিতামহের জগতে।

আয় তো বালক তোর মুখখানি দেখি কাছে আয়।
আহা, এ যে আমাদেরই ছাঁচে গড়া মুখ।
বল্ তোর কোথার অসুখ
কী জ্বালা, কোথায় জ্বালা
কেন এই বিরাগী বিমুখ
ফিরে আয় পিতাব হৃদয়ে।
আমাকে পুড়িয়ে তুই কোথায় বা যাবি এই শীতে।
সেই তো ফিবতে হবে, যেমন ফিরেছি আমি,
একদিন বাপের বাড়িতে।

কবিরা সত্যদ্রষ্টা। কিন্তু কবি অরুণকুমাব সরকারের কথা সত্যি হল না। অভিরূপকে পিতার মুখাগ্নি করতে হয় নি, হয় নি দাউদাউ চিতার চারিদিক প্রদক্ষিণ কবতে বা নিভে গেলে সেই চিতায় কলসী ভবে জল ঢালতে। অরুণ, অভিরূপ তোমার সঙ্গে কি এতই শত্রুতা করেছিল।

অরুণ ভট্টাচার্য

নতুন কবিতা

[১৯৩০-৮০ এই পঞ্চাশ বছরের কবিতার পালাবদল শুরু হয়েছিল আরো কয়েকবছর পূর্বে। এবার পালাবদলেব কেন্দ্রভূমি ছিল না কলকাতা। আবার গ্রাম বাংলা, কাঁটাবন, নদীনালা, আকাশের বিস্তার ও সহজ জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের কবিব দল। একমাত্র "উত্তরসূরি" পত্রিকা সেই নতুন প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েছিল। পাঁচ বছর পূর্বে উত্তরসূরিতে এই কবিতার বিভাগটি, যা ছিল নেহাৎই পরীক্ষা, আজ তাই চৈতন্যেব গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে এসেছে তরুণ কবিদের শব্দের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে। এই "নিঃশব্দ বিপ্লব" কবিতার ইতিহাসে একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে থাকবে মনে হয়।]

অরুণকুমার চক্রবর্তী

রাজা:র, তুই কিসের লেগে

ভক্‌ভকাইন্‌ছে বিজলী বাতি, মুদের ঘরে কেবোসিন
তাও জুটে নাই—রাজারে, তুই কিসের লেগে
শহরগুলান্‌ টাকা উড়ায় মেজিক দেখায়
ভুইলে গেঁছি ঘরেব টান
বনকে ইবার যাবো নাই ?
গান ঘুরিছে চাকায় চাকায়
দেয়াল ভইরে ছবি নাচায়
মরদগুলান্‌ সিনেমা দেইখে
বাবুর পারা বুক ফুলায়
মদের কেনে মরণ নাই ?

রাজারে, তকে সিলাম সিলাম, ইমন শহর বেঁইচে থাক
তুয়াব বাবু তয়ার বিবি সগ্‌গে যাক
ইমন সুখে কাজ নাই ...

হাঁসপাহাড়ীর ছায়া দে, ডাকাইছনির আমলাবন
শালপিয়ালের মহুলবন ফিরাইন দে
ঘবেব বিটি ঘবকে যাই

রাজারে, তুই কিসের লেগে

জলধার। C/o সত্যসাধন চেল, বেলবনী, ধবনী, বাঁকুড়া।

অনির্বাণ লাহিড়ী

ইতস্ততঃ কবিতাগুচ্ছ

১. ডাকলে চমকে উঠি, কেউ যদি খুব ডাক দেয়—
আমার নির্জন তবে প্রকৃত নির্জন আজো নয়।

২ মাঝে-মাঝে মনে হয়, যেন কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে
মাঝে-মাঝে মনে হয়, দরজায় কড়া নেই আর

৩ আমি তো একাই আছি, ঝোলানো জামার মতো একা—
তবু এই বালিশটি প্রাণময় হয়ে ওঠে কেন।

৪. আগুন পোড়ায় সব, শুধু দগ্ধ ভস্মরাশি ছাড়া—
বাল্যকালে আমিও তো এই কথা বিশ্বাস করেছি।

৫. আজ স্থির বোঝা যায়, ঘুমিয়ে পড়েছে জনগণ
আজ স্থির বোঝা যায়, শীতরাত্রি নেমে আসছে দ্রুত
আজ স্থির বোঝা যায়, মানুষেরো ছিলো কিছু দান

কৃষ্ণপক্ষ। C/o সোমক দাশ। ২৩এ, এ কে মুখার্জি রোড, বরাহনগর। ৭০০০৩৬

প্রফুল্ল পাল

আকাশ থেকে মহাকাশে

গাছকে বলেছি চিল হয়ে যাও চিলকে বলেছি আকাশ হতে
মানুষকে বলেছি গাছ হয়ে মাটির নিচে শিকড় চালাতে,
এমনি করেই ভাবতে বলেছি জন্মদিনকেই মৃত্যুদিন।
জীবনযাত্রা শুরু হোক গাঢ় সন্ধ্যা থেকে শিশিরের শবের উপর
পড়ে থাক্, জীবন মৃত্যু মৈথুন ইত্যাদি ‥ ।

সময়ের কাঁটাগুলো উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে পাথরের ফুল
পাথরে পাষাণ হলো, তুর্কী সওয়ারের মত টগবগিয়ে ঘোড়ায় যেতে যেতে
কে যেন বলে গেল আমাদের নিয়ন্তা মারা গেছে।
দাবার ছকে চিৎ হয়ে পড়লো তরমুজ রঙের সব চিক্কন নারীরা
আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত সম্ভ্রমকে করলাম নিহত
সমস্ত ভুবন জুড়ে আমার একার ঐশ্বর্যে আমিই আমার ঈশ্বর হয়ে উঠলাম।
নতুন পৃথিবী মেলে দিলাম আমি, আকাশের পাখীদের জন্য,
গড়া হোল ছিটেবেড়ার মত অমসৃণ আস্তানা,
আমি একটি চিলের বাসায় সম্ভ্রমশূন্য এক রমণীকে নিয়ে
খড়কুটোয় গড়ে তুললাম আমার স্বাধীন আকাশ,

আমি আর ফিরে যাবো না মাটির রসে শস্যের ঘ্রাণ নিতে
কয়েক শতাব্দী পাখীর মত উড়ে উড়ে বেড়াব আকাশ থেকে মহাকাশে।

কবিতা সাময়িকী। c/o অসীমকুমার রায়, হাউর মেদিনীপুর।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিজয়া

সারাক্ষণ মনে হয় প্রতিমার ভাসানে চলেছি,
বিজয়া—বিজয়া—কিছু বিষাদ ধ্বনিত কথা তীব্র বাজে
ঢাকের কাঠিতে,
বিসর্জনে যায় সব স্বপ্নরাশি, ছিন্ন ফুলমালা,
জীবনের খণ্ড আয়ু প্রতিদিন চলে যায় নীল জলস্রোতে. .

পিছনে কে আছো? এসো, ধরো এই উজ্জ্বল সুন্দর গ্যাস বাতি:
শোভাযাত্রা অপরূপ, নগর অলিন্দে নবনারী।
মুগ্ধচোখে চেয়ে আছে পথ,
ওরা কি যাবে না? যাবে, সব যাবে বিসর্জনে। শুধু
নির্দিষ্ট সময় হতে দাও।

ভাসান চলেছে, তার আগে শুধু কিছুকাল প্রতিমা সাজাও।

প্রতিরোধ। C/o কালীপদ চক্রবর্তী, জয়বাগ, পোঃ খাসবাড় জেলা মেদিনীপুর

ঊর্ধ্বেন্দু দাস

ট্যাণ্টালাস

যতোবার বলি তাকে, ওরে চাঁদ, ফিরে যা, ফিরে যা—
যতোবার তার হাতে তুল্যমূল্যে ধরে দিই ধাতুমুদ্রা, পট্টবাস, তৈজস ও তণ্ডুল
আজান্‌-ত্রিভঁাজ হয়ে বলি, ওরে, এই নিয়ে তুষ্ট থাক্—
এর বেশি সাধ্যি নেই দেবার আমার, তুই চলে যা, চলে যা,—
আকর্ণ পাণ্ডুর-হিম, প্রত্যাশায় স্থিরচোখ, ভিখিরী শিশুটি তার আদিগন্ত
দীর্ঘ দুইহাত

বিশাল মুঠোয় বেঁধে প্রার্থনার নিহিত মুদ্রায়

মেলে রাখে নভোলীন জানালায় গ্রিলের ওপারে ;

কেঁপে ওঠে মধ্যরজনীর অন্ধকার , কাঁপে নিরালম্ব হর্ম্যবীথি, গম্বুজ, খিলান

আকণ্ঠ তৃষ্ণার বৃন্তে মগ্ন, সমাহিত শিশু, নীল-ওষ্ঠে শুষে নেয় তার-ই

অনমনীয় অশ্রুর প্রপাত।

তুলে নিই রাজমুদ্রা, তৈজস ও তণ্ডুল, পট্টবাস—

আমি তার হাতে দিই অকিঞ্চিৎ কাঁচপোকা, রঙমশাল, কাটা-ছবি,

লুকোনো ঝিনুক

মণিবন্ধে বেঁধে দিই রক্তছোপ স্মৃতির কুসুম , তার

হিরণ্ময় করপত্রে তুলে দিই প্রজ্বলন্ত আয়ুর সমিধ

আজানু-লম্বিত হয়ে বলি,　ওরে, সর্বস্ব দিলাম তোকে,

আরতো কিছুই নেই, চাঁদ তুই ফিরে যা চলে যা,

আকর্ণ পাণ্ডুর-চোখে হেসে ওঠে ভিখিরী বালক , কাঁপে নিরালম্ব মধ্যযাম,

গম্বুজ, খিলান

আদিগন্ত ব্যাপ্ত তার বিশাল অঞ্জলি হতে নেমে আসে কখন, সহসা

তিনমুষ্টি ধূলির প্রপাত।—

আ-নাভি ধুলোর রঙে অনির্বাণ জেগে আছি : অঞ্জলি নিয়ে চলে গেছে

ভিখিরী বালক।

মজলিশ। প্রিন্স অব ওয়েলস ক্যাম্পাস, জোড়হাট, ৭৮৫০০২, আসাম।

গৌতম চৌধুরী

শ্রাবণগাথা

১. অমন বৃষ্টির রাতে নিশান উড়িয়ে দিল কে

অত লাল নিশানের নীচে আজ দাঁড়ালেই বুক কেঁপে ওঠে

আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে চুল থেকে রোমকূপ থেকে

আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে ভুল থেকে ইতিহাস থেকে

নিশান, তাহ'লে তুমি অন্তত রাত্রির মত রক্তকরবী হ'য়ে গেলে

২. ওই দাঁতে বিষ নেই জানি আমি, আগামী দশকের জন্যে বিদ্যুৎ রয়েছে
তোমার দংশন তাই সহ্য করি, বলি, আরো তীব্র হও
ছিঁড়ে ফেল ভুল মাংস রক্তজাল স্নায়ু শিরা হে রক্তকরবী
শ্রাবণ, আমাকে যদি এতদূর নগ্ন কোরে দিলে
তোমাকেও নগ্ন করি এস আজ হে নিশান বারান্দার বৃষ্টিকাতরতা

অভিযান। ১।এ শশী ঘোষ লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৫

আলোক সোম

টিম্বার মার্ট

ট্রেনের মধ্য থেকে হঠাৎ পা রাখলাম আলেয়া জঙ্গলে, উড়ছে তুলো শিমুল কার্পাস
সুশীল গলার মন্ত্র নামছে—আমাকে নাও আমাকে নাও
আরো বেশি আলুথালু মাটির দিকে নেমে গেলাম, সত্যি ভূকম্পনপূর্ব!
চারদিকেই তো কাঠের মণ্ড, কাঠ গোলা, কিরকির শব্দ উঠছে করাত-কাঠে।

মানুষের কথাই—কাটা গোড়ালি লেপের আত্মগোপন সমাধিও ঢেকে আছে,
এসব বলার জন্য আমি-ই ব'সে আছি।

খুব ফুল তোল, ফুল তুলে দাও মালার দিকে, মালা মৃত্যুরও পরে—

আমি কাঠের গড়া কাকাতুয়া ছিমছাম বাঙালী গার্হস্থ্য, অথচ আলাফালা
এভাবেই নেমে যাই—স্টেশান মানে আগে ছিল এখনো আছে ব্রিটিশ,
কী সুন্দর উপহার! তার গঠন তো এরকম, কখনো আমার মতোও মধুরনাদী।

আবার নেমে পাক খাচ্ছি নিপুণ পাতার জলের ধার, এতক্ষণ অন্ধকার বল্লাম না,
না বরজের পানে ভোগ! মিহি শিরাগুলো লাউলতার মানুষ ছুঁয়ে যাচ্ছে—
গোগ্রাসে প্রশ্ন ওঠে: কাদের ছবি উঠলো সমুজ্জল, কোন্ মানুষের ভস্ম,
এগুলোও শিমুলের দিকেই—আমি তোমাদের বর্ম, কাঠ ও করাত।

ধ্বনি বেঁচে থাকবে আয়ে-কাগজে   আমি ফুঁ দিই আলেয়া জঙ্গলে
যেটুকু থাকে বিলিয়ে থাক. আশেপাশে—কতো কাজ, ঠিক চলে যাবে
সব ভিজে গভীরে-ই যাক ,   স্মৃতি ফুলের ফুল ঠোঁট, আমি না টিথার !

আজকাল । শ্রীদুর্গা প্রেস,, গরিফা, ২৪ পরগণা

কৃত্তিবাস চক্রবর্ত্তী

মাকড়শা

বাহির বাড়িতে জল ভাঙার শব্দ, ভেতরে শব্দ হাড় ভাঙার
ওপরে জাল বোনার শব্দ
নিজের খোলস কাটিয়ে চারপাশে ঘিরেছেন নিজেকেই
সময় সমুজ্জল, অনন্ত সামাজিক আলো—এইসব নিম হয়ে আসে,
আমাদের প্রেম বিনিময়ে
মাকড়শার প্রতিভা পেয়েছি, পারাপার আকাশজালিকা ঘিরে
স্বজন ভদ্র হয়ে আছি।

হাড় ভাঙার শব্দ হচ্ছে কেবল
আর পারাপার শুধু জাল বোনার শব্দ ।

শব্দস্নান । C/o সন্তোষ রায়, রামনগর সড়ক ৯ । আগরতলা ৭৯৯০০২

অজিত ভড়

চন্দন - চন্দন

'চন্দন - চন্দন'—বলে ডাকতেই, আমি
ঘর থেকে বেরিয়ে আসি
বলি, 'চন্দন তো ঘরে নেই, কি দরকার বলে যান
এলে আমি বলে দেবো',—

অনেকক্ষণ, ঘর বার আর আকাশ দেখে,
অবশেষে আমার হাতে 'চন্দন' শিরোনামী একটা কাগজ রেখে
লোকটা চলে গেল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নেমেছে। থরে থরে উপাচারে
মন্দিরে বেজেছে ঘণ্টা
গৃহবধূ প্রদীপ জ্বেলেছে রাতে
কিন্তু কোথায়, চন্দন তো এখনো এলো না।

তৃণাঙ্কুর। C/o দ্বিজেন আচার্য, শক্তিপুর, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

কল্যাণ ভৌমিক

গোলাপকাঠের বৌ

'ইকেবানা, ইকেবানা, ইকেবানা' রেলিংএর পাখিটি চেঁচিয়ে ওঠে।
— গোলাপকাঠের বৌ টেবিলে ফুল সাজায়।
'বনসাই, বনসাই, বনসাই' কার্নিশ দিয়ে হেঁটে যায় বেড়াল।
—গোলাপকাঠের বৌ টবের চারাটির যথোচিত আদরযত্ন করে।
'ওরিগামি, ওরিগামি, ওরিগামি' জানালা-ছোঁয়া কৃষ্ণচূড়া থেকে
উঁকি দ্যায় নীল প্রজাপতি।
—গোলাপকাঠের বৌ সারাদুপুর একা একা খেলতে থাকে ·
এ-ই কাগজ কেটে সাদাবাঘ, এ-ই কাগজ কেটে জেলখানা।
'কিউরিও, কিউরিও, কিউরিও' · প্রতিবেশীরা বলাবলি করতে থাকে।
—গোলাপকাঠের বর অফিস ফেরৎ বাড়ী এসে
টাই খোলে না, ঘড়ি খোলে না,
শুধু নির্ভেজাল আদর জানায়, 'তুমি একটা জাপানী-ই কিউরিও'—
গোলাপকাঠের বৌ বুকের ওপর থেকে তুলে নেয় বুক,
গোলাপকাঠের বৌ ঠোঁটের ওপর থেকে তুলে নেয় ঠোঁট,

গোলাপকাঠের বৌ হঠাৎ কোরে গোলাপী গাল সরিয়ে নিয়ে বলে ওঠে,
'কাল দুপুরে শপিং আছে, কাজেই কার-টা আমার চাই—।'
তারপর, অন্য ঘরে যেতে যেতে
ভীষণ সুখের গান ধরে, 'সায়োনারা, সায়োনারা, সায়োনারা' ‐

মজলিস। C/o উধ্বেন্দু দাশ, প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্যাম্পাস, জোড়হাট, ৭৮৫০০২, আসাম

ক্ষিতীশ সাঁতরা

বৃহস্পতিবার

আসার কি দিনক্ষণ থাকে। কে জানে—
সে এক বৃহস্পতিবার, আমার আসার শব্দ
বেজেছিল দুগ্ধধবল এক শঙ্খের নিনাদে।

তারপর বৃক্ষ, তোমার ডালপালার বিস্তার
ছায়ার আশ্রয়, শিকড়ের ভিতর দিয়ে
ছড়িয়ে পড়েছি বহুদূর।

যাওয়ার কি দিনক্ষণ থাকে। কে জানে—

হয়ত বা সামনের বৃহস্পতিবারে
আমার যাওয়ার শব্দ বেজে উঠবে
আকাঙ্ক্ষিত কোন মহানিমে।

কবিতা সাময়িকী। C/o অসীমকুমার রায়, হাউর, মেদিনীপুর

দীপক রায়

কার কাছে

আচম্‌কা কোনো বাতাস রাজহাঁসের মত ডানা মেলে
উত্তর মেরুর দিকে নিয়ে যায় না কেন
কতদিন শ্যাওলার ধারে প্রাচীন বটের নীচে দাঁড়িয়েছি
কতরাত গোপন অন্ধকারে পাতা ঝরার শব্দে কেঁদে উঠেছি

কার গানে নদী মাঠ ওলট্‌ পালট হয়ে যাবে বুকের ভেতর
কার পায়ের কাছে সাপের খোলসের মত নিঃশব্দে রেখে যাব সেই সব দুঃখ

শায়ক। C/o শ্যামলজিৎ সাহা, চৌমাথা, চুঁচুড়া, হুগলী।

প্রাচীন ও নবীন কবিতা বিষয়ক

১ চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ , সত্যকিঙ্কর সাহানা ॥ শ্রীধর প্রকাশন, জিজ্ঞাসা কার্যালয়, ৩৩ কজেল রো, কলিকাতা ৯ ।

২. রামপ্রসাদ, জীবনী ও রচনাসমগ্র ; সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ॥ গ্রন্থমেলা। ১/১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২ ॥

৩. কবিতা সংগ্রহ ১ম , অমিয় চক্রবর্তী ॥ সম্পাদনা নরেশ গুহ ॥ দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ৯ ॥

৪. Modernism : ed. Malcolm Bradbury and James McFarlane. Penguin Books Ltd , Harmondsworth, Middlessex, England/625 Madison Ave, New york 10022, U S.A.

যে কোন একটি গ্রন্থ নিয়েই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের সুযোগ ছিল। যেহেতু পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক এবং সর্বোপরি, লিটল্ ম্যাগাজিনের চরিত্র অনুযায়ী অনিয়মিত, ওপরের মূল্যবান গ্রন্থগুলির সামান্য পরিচয় দেওয়া ব্যতিরেকে এমুহূর্তে করণীয় কিছু নেই। অন্তত বাংলা পাঠক পাঠিকারা জানতে পারবেন, প্রাচীন ও নবীন কবিতা এবং কবিতা বিষয়ে কত বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী গ্রন্থ স্বদেশে ও বিদেশে প্রকাশিত হচ্ছে।

১. প্রায় কুড়ি বছর আগে—যখন আমরা বয়সে নবীন ছিলাম—বাঁকুড়া যাবার একটি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, সাহিত্যসভায়। আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তখনই প্রবীন সাহিত্যিক। সারা রাস্তা ট্রেনে কিছুটা অস্বোয়াস্তি বোধ করেছি, কিন্তু বাঁকুড়ায় যাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অবাক হলাম। তিনি অশীতিপর, কিন্তু তরুণ। জ্ঞানের আলোকে তাঁর মুখাবয়ব উদ্ভাসিত। সত্যকিঙ্কর সাহানা। সমস্ত জীবন যিনি যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ নামক বইটিতে তাঁর যে নিগূঢ় মনস্বিতার পরিচয় রয়েছে তা সহজলভ্য নয়। বইটির বিষয়ে সামান্য নিবেদন করি।

বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে যে বাসলীদেবীর মন্দির আছে এবং চণ্ডীদাসের অগ্রজের বংশকুল এখনো বিরাজ করেছেন আমার তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল সাহানা মহাশয়ের আনুকূল্যে। বাসলীপুকুর বা ধোবাপুকুর সম্পর্কিত কিম্বদন্তী তিনি উল্লেখ করেছিলেন তাঁর গ্রন্থে। দেবী মাহাত্ম্য বিষয়ক পুঁথিতে পাওয়া যাচ্ছে' ভরোদ্বাজকুলোদ্ভবঃ স জয়তু শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ ॥ পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়। পিতা মাতা ও ভ্রাতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে শ্লোকে। বাসলী-স্তুতিতে রয়েছে:

সগুণাং নির্গুণাং ধ্যেয়ামর্চিতাং সর্বসিদ্ধিদাম্।
বিদ্যাং সিদ্ধিপ্রদাং মায়াং বাসলীং প্রণমাম্যহম্ ॥

'বাশুলী' এবং 'বাসলী' এই দুই দেবীর রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় লিখেছিলেন : কেহ কেহ ঐ দুই শব্দকে সমার্থক বলেই ব্যবহার করেন। ইহা অনেকেরই সুবিদিত 'বাশুলী' শব্দ বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ, বিশালাক্ষী তন্ত্রোক্ত দেবতা আর 'বাসলী' 'বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেছেন বজ্রযানিপন্থী বৌদ্ধগণের দেবী বজ্রেশ্বরী থেকে বাসলী শব্দ এসেছে। বজ্রেশ্বরী—বজস্‌লী—বাসলী। চণ্ডীদাসের বিভিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে যে জট তৈরী হয়েছিল গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে লেখক তা মোচন করবার চেষ্টা করেছেন। কল্পনার সাহায্যে নয়, উদাহরণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস প্রসঙ্গেও তাঁর মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালের কিছু পরে দীন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ (পৃ ১০)। চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান অবশ্য নির্ভর করছে ভাষা, শব্দ-শৈলী, কবি-চিন্তা ইত্যাদি বিষয়ের পর এবং ভাষার সম্ভাব্য বিবর্তনের প্রেক্ষিতে। সত্যকিঙ্কর সাহানা অতি প্রয়োজনীয় একটি কাজ করে গিয়েছেন।

২. যে সাধক কবির গান রবীন্দ্রনাথের যৌবন এবং প্রাক্-পৌঢ় বয়সে তীব্র প্রভাব বিস্তার করেছিল তিনি হালিশহরের রামপ্রসাদ সেন। একদিকে উপনিষদের উত্তুঙ্গ দার্শনিকতা এবং অন্যপ্রান্তে নব্যন্যায়কে একপাশে রেখে যে 'সহজ সাধনা' শ্রীচৈতন্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণে এসে এক অপূর্ব সমন্বয়ী রূপ লাভ করেছে, রামপ্রসাদ সেন তার মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ। এরকম সাধক আর কজন ভারত-

ভূমে জন্মেছেন যিনি তাঁর আরাধ্যাকে বলতে পেরেছেন : মা, তুই আমাদের মত জন্মালি না, মরলিও না, কেমন করে বুঝবি আমাদের দেহ-ধারণের জীবন-যন্ত্রণা। আমি তো ভাবতে পারি না, উপলব্ধি এবং সহজ সাধনার কোন্ গভীর চৈতন্যলোকে পৌঁছোলে এমন কথা কবি অনায়াসে বলতে পারেন। এমন একটি প্রধান সাধক-কবির জীবনী ও রচনাসমগ্র সংকলন এবং সম্পাদনা করে সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অনেকটা এরকম আমি বহুস্থানেই বলেছি, বাংলা আধুনিক কবিতায় অতিরিক্ত বুদ্ধিজীবী ভূমিকা কবিতাকে একসময় জণ্ডিস্ রোগীতে পরিণত করবে। শব্দ ব্যবহারে চাতুর্য, এবং কথায় কথায় 'প্রগ্রেসিভ' (যেন ভারতবর্ষে এঁরা ছাড়া আর সবই প্রতিক্রিয়াশীল।) বুকনী সম্বল করে বাংলা কবিতার ধারাকে আর কতকাল জিইয়ে রাখা যাবে—কাগজে দেখছি, গঙ্গার চরা নৈহাটী থেকে বাগবাজার কুমারটুলী অবধি এসে গিয়েছে,—স্রোত এভাবেই শুকিয়ে যাবে। এ মুহূর্তে আমাদের তাই রামপ্রসাদের সহজ উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান একান্ত প্রয়োজন।

রামপ্রসাদের সময়কার বাংলাদেশ, বিশেষত গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল, রামপ্রসাদের জীবনী, শক্তি সাধনার সহজ সাধনায় রূপান্তর এবং গান (ও কবিতা) রচনার আনুপূর্ব ইতিহাস সত্যনারায়ণ বাবু অতি শ্রদ্ধাসহ নিবেদন করেছেন। আমরা এখন অনেক কিছু শিখে ফেলেছি, কিন্তু ভক্তির বড় অভাব। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। 'বিদ্যাসুন্দরের কবি' ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরাম দাস বিষয়ক তুলনামূলক আলোচনাটি অতি মনোরম করে লেখা। টেনে নিয়ে যায়। পদাবলী পর্যায়ে তিন শতাধিক কবিতা (৩১৫) শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নয়, বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ—এই বিপুল সংগ্রহ বাংলা কবিতার আধুনিকত্বকে আবার নতুন দিগন্তে নিয়ে যাবে মনে হয়।

৩. 'কবিতাসংগ্রহ' অর্থাৎ বাছাই কবিতার সংকলন নয়, আমরা পাচ্ছি অমিয় চক্রবর্তীর সমস্ত কবিতাগুলি বাংলা সন ১৩৩৫ এর কিছু পূর্ব থেকে যাদের রচনাকাল শুরু। যতদূর শুনেছি, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ডটি কবি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন, উপহারস্বরূপ। এই অংশে রয়েছে 'খসড়া' 'একমুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞানবসন্ত', 'দূরযানী,' 'পারাপার' থেকে

কবিতাবলীর সঙ্কলন। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে কিছু কবিতা যার রচনাকাল, সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীনরেশ গুহ নিশ্চিন্ত নন, (১৩৩২ ?) এবং 'উপহার' অংশে কিছু কবিতা। সম্পাদকের নিবেদন, জীবনীপঞ্জি, গ্রন্থপরিচয় ইত্যাদি আনুষংগিক তথ্যে কাব্যগ্রন্থখানি প্রয়োজনীয় মনে হবে। একজন রসিকের কবচে অবশ্য কবির ছোট্ট 'ভূমিকা' বেশী মূল্যবান। কবি কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ আশ্চর্য কথা আমাদের জানাচ্ছেন যা তাঁর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা এবং চৈতন্যের প্রদেশ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত : 'নিজেকে জড়িয়ে থাকা শিল্পীর পক্ষে শাস্তি, ছড়িয়ে যাওয়া ছাড়িয়ে চলাই তার ধর্ম। ·স্তবে স্তবে লোকালয়ের দান অন্তবর্জীবনে পূর্ণ হ'লো। আজ বেলাশেষে সেই পবিক্রমা একটিমাত্র মৃৎরেখায় পরিণত। উপরে আকাশ, পাশে দিগন্ত সংসারে একটি মৃন্ময়ী বাসা বেঁধেছিলাম সেই আমার জীবনেব শ্রেষ্ঠ কবিতা।'

অমিয় চক্রবর্তী বহু-আলোচিত কবি, বিশেষত উত্তরসূরির পাঠকবর্গেব কাছে। তথ্য এই, কবির প্রথম জীবনের কবিতাগুলি যেমন বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, বিগত পঁচিশ বছরের কবিতা-বলীর অধিকাংশই 'উত্তরসূরি'তে প্রকাশিত হয়েছে। নানা সময়েই আমি, কবি বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ ব্যতিরেকে, টুকরো আলোচনা করেছি। লক্ষ্যনীয়, আধুনিক কবিতার একজন প্রধান স্থপতি—যিনি প্রত্যক্ষত রবীন্দ্র-শিষ্য হয়েও, রবীন্দ্র প্রদর্শিত কাব্যপথে পরিভ্রমণ করেন নি, মধ্য জীবন থেকে ক্রমশ 'সহজ' হয়ে এসেছেন। 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থ সেই চিহ্ন বহন করছে। মেঘদূত, উর্বশী অথবা আটপৌরে নামক কবিতাগুলি থেকে 'পারাপার' এর অন্তর্ভুক্ত কবিতায় এসে আমরা যে-কবিকে পাই তাঁকে আর বিশেষভাবে 'আধুনিক' কবি বলে চিহ্নিত করাবার প্রয়োজন হয় না। এই বিশ্বনাগরিক বিশ্বপথিক কবির অন্তর রয়েছে প্রদীপ-হাতে-তুলসীতলায় কুলবধূর সলজ্জ চোখ দুটির দিকে নিবদ্ধ। 'অন্নদাতা' পুস্তিকার যামিনী রায়-কৃত প্রচ্ছদটির পুনর্মুদ্রনে প্রকাশকের রুচির পরিচয় মেলে।

৪. শুধু কবিতায় আধুনিকত্ব নয়, সামগ্রিক জীবনবোধের চেতনায় ১৮২০ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে যে নবীন চেতনা ও প্রাণস্পন্দন লক্ষ্য করা গেছে পৃথিবীর দেশে দেশে, বিশেষত ইউরোপে, তাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন দুজন বিদেশী,

ম্যালকম ব্রাডব্যারী এবং জেমস্ ম্যাকফারলেন। ইংলণ্ড বা আমেরিকাতে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, আধুনিক সাহিত্য নিয়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরেই তুমুল আলোচনা চলেছে। রেস্তরাঁ বা কফি হাউসে চারজন কবি মিলিত হলেই তর্কের তুফান উঠবে। এবং তাকে স্বাগত জানানোর অর্থ ই চলমান জীবনের প্রতি আস্থা রাখা। এই দুজন গবেষক মডার্নিজম্' বা 'আধুনিকত্ব' বিষয়টিকে কোন পৃথক দ্যোতনা মনে করেন নি। আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন, জীবনের সমগ্র পর্বে একটি নতুন চেতনা কাজ করেছে, বিশেষত সৃষ্টিশীল লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে। যে মূল সূত্র এই বিষয়ে কাজ করেছে তার অন্বেষণেই এই গ্রন্থের তাৎপর্য। আপলনিয়্যর বা ব্রেখ্ট, জয়স এবং কাফ্কা, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ ও ইয়েটস্ আমাদের চৈতন্যের দিগন্ত প্রসারিত করেছেন (এ ক'টি নামই সম্পাদকদ্বয় প্রচার সূত্রে জানাচ্ছেন যদিও আরো নাম আমরা জানাতে পারি)। স্বস্তির কথা, রবীন্দ্রনাথও অন্যতম উল্লেখ্য শিল্পী। এজরা পাউণ্ডের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় পরিচিতি লাভ করেন ১৯১২ সালেই। ইউরোপীয় রূপক নাট্য-প্রসঙ্গেও মেটারলিঙ্কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত হয়েছেন।

এই যে আধুনিক সাহিত্য, আধুনিকত্বেই যার প্রকাশ, তার লক্ষণগুলি কি?
১. It is characterized by a novelty that startles and disturbs.
২. Few have to such an extent broken down traditional national frontiers (preface) এই দুটি লক্ষণ সম্পাদকদ্বয় আমাদের সামনে রেখে সংকলনকার্যে এগিয়েছেন। আর একটি কথাও এঁরা জানিয়েছেন যে আধুনিকত্ব বিষয়টি যদিচ এখনও ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই আলোচ্য তথাপি আমাদের কাছে আধুনিকত্বর ধারণাটি এখনো রীতিমত 'perplexing' থেকে গিয়েছে।

বইটির সম্পাদকীয় পরিকল্পনায় একটি বৈশিষ্ট্য আছে। দুটি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে প্রথমে বিবৃত আছে তত্ত্বগত দিক, দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে আধুনিক কবিতা উপন্যাস ও নাটকের দিক্‌পাল প্রতিভূদের সৃষ্টিকর্মের পরিচয়। প্রথম পর্বের সবচেয়ে আকর্ষনীয় অধ্যায় হচ্ছে 'A Geography of Modernism', পৃথিবীর কোথায় কোন্ দেশে কোন শহরে 'আধুনিকত্ব' বিষয়টি একটি আন্দোলন হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার বিবরণ সত্যি যে কোন পাঠকের কাছে লোভনীয়।

'আধুনিকত্ব' বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে যেসব বিচ্ছিন্ন আন্দোলন, যথা সিম্বলিজম্, ডেকাডেন্স, ইম্প্রেশনিজম্, ইমেজিসম্, ভর্টিসিজম্, ফিউচারিজম্, দাদাইজম্ এবং স্যুররিয়ালিজম্—তাও আলোচিত হয়েছে স্বল্পপরিসর স্থানে। ক্লাইভ স্কট তাঁর প্রবন্ধে বোদেল্যেরকে প্রথম আধুনিক এবং 'ডেকাডেন্ট' বলতে চেয়েছেন যার শিল্পসৃষ্টির মূলে বোধহয় ছিল 'an overdeveloped nervous system', বিষয়টি ভেবে দেখবার। তবে 'ডেকাডেন্ট' শিল্পের প্রধান জনক হিসেবে মার্কুইস্ দ্য সাদ বা বায়রনকেও অভিষিক্ত করা যেতে পারে। রিচার্ড শেপার্ড লিখিত 'The Crisis of Language' নিবন্ধটি আমাদের শিল্পমাধ্যম বিষয়ে একটি মৌল সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছে। বিশেষ করে, টমাস মানের যে উদ্ধৃতি লেখক নিবন্ধের শেষে রেখেছেন তাই সম্ভবত আমাদের কাছে সমাধানের ইঙ্গিত: it will be the natural thing an art which exists in terms of the utmost familiarity with all mankind, শিল্প সম্বন্ধে এর চাইতে সহজ কথ আর কি হতে পারে।

অরুণ ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক ইংরেজী কবিতা

'আধুনিক' শব্দটি এত ব্যাপক এবং ব্যাপ্ত যে তার সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ প্রায় অসম্ভব, কখন কোথায় কিভাবে একটি দাঁড়ি টেনে দিলে মধ্যযুগপর্বের সমাপ্তি ঘোষিত হয় ও চিহ্নিত হয় আধুনিক যুগের সূচনা তা, বস্তুত, আমাদের অজানা। কিন্তু তবু, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশ্লেষণে দেখতে পাই যে বিবর্তনই প্রাকৃতিক নিয়ম, তার কোন ব্যত্যয় নেই। 'আধুনিকতাটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে' রবীন্দ্রনাথের সেই সুবিখ্যাত উক্তিটিই শিরোধার্য। অথবা, উপলব্ধির খাতিরে একটু বদলে নিয়ে বলি, সময়ের প্রভাবে মর্জির সাম্প্রতিক পরিবর্তনই আধুনিকতা। সাম্যবাদ, ফ্যাসীবাদ, ধনতন্ত্রবাবের প্রভাব, রাসেল, হোয়াইটহেড, হাক্সলে র দার্শনিক প্রাখর্য, মার্কসীয় ও ফ্রয়েডীয় সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক চেতনাব বিপ্লব, উপর্যুপরি দুটি কালক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ এবং এর থেকে প্রসূত শূন্যতা, ক্লান্তি, অনুর্বরতা ও বিপন্ন বিস্ময়েরই অপর নাম আধুনিকতা। ঘটনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিক ইংরেজী কবিতা চিত্রপট অবশ্য এত দ্রুত বদলায় নি। পতন ও অভ্যুদয়ে বন্ধুব এক সুদীর্ঘ পথে ইংলণ্ডীয় আধুনিক কাব্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল ভিক্টোরীয় যুগের শেষ পর্যায়ে। (মনে পড়ে এলিয়টের 'কনকনে ঠাণ্ডায় হল আমাদের যাত্রা, / ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, / সময়টা সবচেয়ে খারাপ, / রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট, / একেবারে দুর্জয় শীত')। এই অগ্রযাত্রায় সংশয়, দ্বিধা, একে একে প্রতিবন্ধক হয়েছে: আধুনিকতার প্রতিশ্রুত নন্দনের পথ বারবার মরুপ্রান্তরে দিশা হারিয়েছে, ধ্বংসের মহাপ্রলয়ে বিরাট ভাঙচুর হয়ে গেছে কবিতার শরীরে। আর রসের আশায় রসালুতার জয়গান নয়, প্রাণের পরিপূর্ণ লীলা দেখবে বলে কবিতা নিজের শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে, টান মেরে উপড়ে ফেলেছে উপত্যকার মমতাময় শিকড়। এজরা পাউণ্ড তৎকালীন মানসিকতার ব্যাখ্যা করলেন কবিতায়:

Daring as never before,
young blood and high blood,

fair cheeks, and fine bodies ,
fortitude as never before,
frankness as never before,
disillusion as never told in old days,
hysterias, trench confessions,
laughter out of dead bellies.

কবিরা তখন সমস্বরে বললেন, বিপদকে ভালোবাসো, বিপদের অভ্যাস এবং হঠকারী দুঃসাহসের গান আমরা গাইতে চাই, কবিতার মূল উপাদান ধর সাহস, অকুতোভয়তা, এবং বিদ্রোহ, চিন্তামগ্ন জড়তা আনন্দ এবং ঘুম এযাবৎ কবিতার এইসব পতিপাদ্য বদলে গিয়ে থাকবে শুধু আক্রমণ ও আচ্ছন্ন অনিদ্রা। ইংরেজী কবিতার স্টিফেন স্পেণ্ডার-এর 'দি এক্সপ্রেস', এলিয়ট-এর 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' এ চিত্রিত হ'ল প্রকট যুগলক্ষণ। স্বয়ংবশ, নিরাভরণ ও প্রাকৃত ছন্দে বলা হ'ল যে 'আর স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধানের মধ্যে যেখানে আছে সব অনাত্মীয় তাদের দেব-দেবী আঁকড়ে ধ'রে।' অনাবাদী, পোড়ো জমিটার চাষ চাই।

অডেন বললেন, 'The waste land is at last, to be cultivated The real importance comes from the undoubted fact that these poets accept life rather than curse or despise it." এটা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় আবার নতুন করে ভাঙচুর হ'ল। স্বৈরাচার, শক্তিসাম্যের ভাঙন, প্রবলতর অমানুষিক যুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীর মানুষিক হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল। কবির প্রতিপাদ্য হ'ল এই সর্বজনীন লজ্জা, ক্ষোভ, বেদনা, নিরাশ্বাস ও নিঃসঙ্গতা। এডিথ সিটওয়েল, ডব্লিউ. এইচ. অডেন, সি. ডে লুইস, ম্যাকনিস, ডিলান টমাস প্রমুখের কাজকর্মে এর সচেতন প্রভাব পরিলক্ষিত হ'ল।

Poets Of Our Time গ্রন্থটি আলোচনাকালে 'আধুনিক' শব্দটির পরিবর্তে 'সাম্প্রতিক' ব্যবহার করলে ভালো হয়। ব্রিটেনের সাম্প্রতিক কবিদের বাছাই-করা কবিতার একটি সঙ্কলন হাতে এসেছে। এই সঙ্কলন অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় যে মুখবন্ধের আলোচনাটি সমকালীন

ব্রিটেনের কবিতা অনুধাবনে প্রাসঙ্গিক, কেননা এইসব কবিগণ এখনও পূর্বোক্ত কবিদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাবে উদ্বুদ্ধ, এবং আধুনিকতার যে ধারা এই শতাব্দীর গোড়ায় সূচিত হয়েছিল, তারই প্রবহমানতা, এঁদের কবিতায়, দর্শনে, ছন্দে, রূপকল্পে স্পষ্টতই প্রতীয়মান। এক কথায়, এঁরা এখনো পর্যন্ত কোনো নতুন বাগান গড়ে তোলেন নি, যা, একটি পৃথক যুগ বলে পরিগণিত হতে পারে। তবে, পঞ্চাশের দশকের পর প্রায় দু দশক কেটে গেছে, জীবনের সূত্র আরও অনেক বেশী জটিলতর আকার ধরেছে, তারই প্রভাবে কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই এঁরা করেছেন, এবং অন্তর্ভুক্ত সকলের না হলেও, অনেকেরই মধ্যে আধুনিক ইংরেজী কবিতার চারিত্র্যগত মৌলিক সদ্গুণগুলি পর্যাপ্ত মাত্রায় বর্তমান। ভালো লাগে, কবিতার আঙ্গিকে কোন সেকেলেপনা নেই। এঁরা ভাবাপ্লুত নন, সংযত ও মননশীল এবং সচেতনভাবে আবেগের লাগামকে টেনে রাখতে জানেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন রয়েছে মন্ময়তা, তন্ময় দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চোখ রাখতেও এঁরা অপারগ নন।

নির্বাচিত কবিদের মধ্যে রয়েছেন জন বেটজেম্যান, চার্লস কসলে, প্যাট্রিক ডিকিনসন, ক্লিফোর্ড ডাইমেন্ট, টেড হিউজ (ইনি সাম্প্রতিককালের খুবই সুখ্যাত কবি), জেমস কার্কাপ, লরি লী, নর্মান নিকলসন, অ্যাল্যান রস ও আর. এস. টমাস, সঙ্কলক এফ. ই এস. ফ্লিন, পৃথিবীর সব কলঙ্ককদের মতই, ব্রিটেনের সাম্প্রতিক কাব্যজগতের সামগ্রিক প্রতিনিধিমূলক রূপটি তুলে ধরতে অসমর্থ হয়েছন, পক্ষপাত ব্যক্তিগত পছন্দ যাই হোক্ না কেন, ফিলিপ লার্কিন, টম গান, সিলভিয়া প্ল্যাথ, অ্যান স্টিভেনসন বা রুথ ফেইনলাইটের মত কবিরা এই সঙ্কলন-বহির্ভূত রয়ে গেছেন। যাই হোক্ আঙ্গিকের উচ্চমান, কবিতার শরীরের ভাস্কর্য এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার সাযুজ্য গ্রথিত কবিতাগুলিকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। শব্দার্থ, দ্যোতনা ধ্বনি, গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে অনেকেই সিদ্ধ। কেউ কেউ মিতবাক্ এবং জীবনের মতই শিল্পকর্মেও ভূষণবিমুখ (প্রতিটি কবির জন্যেই কবিতার আগে রয়েছে পরিচিতি, অধিকাংশক্ষেত্রেই কবি নিজেই তাঁর পরিচিতি দিয়েছেন)। আলোচ্য বইটির সব কবিতারই যে রসগ্রহণ করতে পেরেছি তা নয়। কিছু কিছু শব্দ ও ধ্বনি-মিশ্রিত দ্যোতনা যা সহজেই শ্রবণে ও বংমননে সরাসরি এসে আঘাত করে, তা ভাল লেগেছে, মুগ্ধ করেছে।

টেড হিউজ-এর 'দি হক ইন দি রেইন' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য প্রাণশক্তি ও মৃত্যুর যোযুধ্যমানতা। হিউজ বলেন "what excites my imagination is the war between vitality and death"। 'গ্রিফস্ ফর ডেড সোলজার্স' কবিতায় এই কবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হিংস্রতা ও বীরত্বের কথা বলেছেন তিন রকমের দুঃখের ব্যঞ্জনায়—'truest grief', 'secretest grief' ও 'mightiest grief'। গোপনতম দুঃখটি হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায়, মৃত সৈনিকের বিধবা স্ত্রীর কথা বলেছেন কবি .

Closer than thinking

The deadman hangs around her neck, but never
Close enough to be touched, or thanked even,
For being all that remains in a world smashed

এই পংক্তিগুলি ধমনীতে রক্তের গতি-স্রোত বৃদ্ধি করে, আত্মস্থ জীবনের সুস্থ প্রত্যয়কে সজোরে নাড়া দেয়। তাঁর 'হক রুষ্টিং' কবিতার কয়েকটি পংক্তি খর্ব পরিসরের দেহ গ্রন্থিল কবিতার উজ্জ্বল নিদর্শন

My feet are locked upon the rough bark
It took the whole of Creation
To produce my foot, my each feather
Now I hold Creation in my foot

শুধুমাত্র প্রকৃতিকেই ভালবাসেন এমন কবিদের মধ্যে অন্যতম লরি লী-র 'ফিল্ড অব অটাম' কবিতাব কয়েকটি পঙক্তি মগ্নচৈতন্য কবির বেদনাকে আমাদের প্রত্যন্ত হৃদয়ে পৌঁছে দেয়

Slow moves the hour that sucks our life,
slow drops the late wasp from the flower,
the rose tree's thread of scent draws thin—
and snaps upon the air.

প্যাট্রিক ডিকিনসন মনে করেন যে স্পষ্ট কবিতার চেয়ে অপেক্ষমান আগন্তুক

কবিতাই কবির কাছে বেশী কাঙ্ক্ষিত। তিনি বোধহয় জানেন যে কবিতার বীজ প্রথম যেদিন উড়ে এসে পড়ে আর তৈরী লেখাটি প্রকৃতই যেদিন বেরিয়ে আসে, তার মাঝখানে চলে নেপথ্যে অনেক বিপুল আয়োজন, অনেক নতুন সমন্বয় ও বিন্যাস (বুদ্ধদেব বসু-র 'অথচ আংটি যদি দিতে চাই, নানা ছলে ফেরাও তারিখ' মনে পড়ে)। কোনো এক বৈদ্যুতিক মুহূর্তে কখনো বা মিলে যায় সার্থকতা। যেমন ডিকিনসনের কয়েটি পংক্তিতে .

> Some of the trees are dead,
> Like huge cast antlers, gray and inert and naked,
> They pray dead prayers to the contemporary sun,
> Under whose light we move in living terror,
> They will all die soon

অ্যালান রসের সঙ্গে রক্তের টান অনুভব করি, তাঁর জন্ম কলকাতায়; বৈচিত্র্যপ্রিয় এই কবি রকপেণ্টিং থেকে আলজেরীয় শরণার্থী শিবির এবং গ্র্যাণ্ড কানাল থেকে ক্রিকেট খেলা পর্যন্ত তাঁর বিষয়াবস্তুকে বিস্তৃত রেখেছেন, একটু বড় কবিতা লেখার ঝোঁক থাকলেও বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের সুসমঞ্জস শব্দ এবং ছন্দের ব্যবহারে তিনি চমৎকার, 'রক পেন্টিংস ড্রাকেনসবার্গ', কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণীয় :

> Here walls of cave and sky converge ,
> Within the human primal urge.
> Brush-pigs scittle from cracked rocks,
> Bush girls thrust their weighted buttocks.

বস্তুত, আজকের ইংরেজী কবিতার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হ'ল দৃপ্ত অথচ নম্র সাহস। ব্রিটেনের সাম্প্রতিক কবিগণের উপলব্ধি যে, দুটি বিন্দুর মাঝখানকার হ্রস্বতর দূরত্বের নাম কবিতা। তবে সম্প্রতিকালে ইতালি, ফ্রান্স বা অন্যান্য ইওরোপীয় দেশে এবং আমাদের এই ছোট্ট বাংলাদেশে কবিতা নিয়ে যে বিপুল কর্মকাণ্ড, যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশাল আয়োজন চলেছে গত পাঁচ দশক ধরে, এইসব কবিদের কাব্য-অনুশীলনে সেই প্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। বাংলা কবিতায়

এখন অনেকেই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে-র মত শক্তিশালী কবিদের প্রভাব কাটিয়ে উঠছেন এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট ধারায় কবিতার জন্ম হচ্ছে প্রতিনিয়তই। আধুনিক ইংরেজ কবিদের অনেকেই কিন্তু এলিয়ট, ডিলান টমাস, রুপার্ট ব্রুক বা ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের মত পূর্বসূরিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারছেন না, বিশেষ করে, যুদ্ধ-প্রিয় কবিরা আওয়েন বা ব্রুকের প্রভাবের কথা অকপটেই স্বীকার করছেন। তাছাড়া, ব্যাপক অমঙ্গলবোধ ও সর্বগ্রাসী ঘৃণার যে 'ফ্যাশন' চল্লিশ দশক ছাড়িয়ে পঞ্চাশেই সংক্রামিত হয়েছিল, আলোচ্য কবিরা সেই মোহজাল কেউ কেউ এখনও ছিন্ন করতে পারে নি, কবিকে মূলত স্রষ্টা হতে হবে, সে শুধু ভবিষ্যৎই দেখবে না, দেখবে নিজের অন্তঃকরণ, ছায়া, মগ্ন চৈতন্য। মনীষার সঙ্গে চৈতন্যেব সম্মিলনেই সৎ কবিব জন্ম হবে।

তৎসত্ত্বেও আলোচ্য কাব্য-সঙ্কলনটি ইংরেজী কবিতাব সাম্প্রতিক প্রাণ-স্পন্দনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়ে দেয়, জানতে পারি যে ব্রিটেনের কিছু কবি তাঁদের জগতের পুনর্বিন্যাসের কাজে হাত লাগিয়েছেন। মনে পড়ে, টি. এস. এলিয়টেব 'অ্যাশ ওয়েডনেসডে' কবিতায জুনিপার গাছের নীচে কবির পড়ে থাকা বিকীর্ণ হাড়গুলিব কথা যেগুলি সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছিলেন, "এই হাডগুলি কি বাঁচবে?" এবং হাডগুলি কল্‌কল্‌ শব্দে জবাব দিয়েছিল, গানও গেযেছিল।[১]

অনুপ মতিলাল

১.POETS OF OUR TIME · Au anthology compiled by F. E. S. Finn.

১০

অরুণকুমার সরকারের একটি অপ্রকাশিত চিঠি

[শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত]

৪৫-এ রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা-২৬

১৭শে এপ্রিল ১৯৫০

বিশ্বনাথ বাবু,

গতকাল আমাদের আলোচনাটা আপাতবিচারে যতই বিক্ষিপ্ত এবং লক্ষ্যহীন বলে মনে হোক না কেন, আমার তো ধারণা, তার ফল মোটামুটি ভালোই হয়েছে, আর কিছু না হোক, আমরা আত্মসমালোচনায় ব্রতী হয়েছি। আর বলতে গেলে কালকেই প্রথম আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি যে কাব্য-সঙ্কলন প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট অভিমতে উপস্থিত হতে পারি নি এবং সম্ভবত ঝোঁকের মাথায় আমরা এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি যা প্রকৃতপ্রস্তাবে অত্যন্ত দায়িত্ববোধক। অথচ, বলাই বাহুল্য, আমাদের সামনে যদি একটা সুপরিকল্পিত চুক্তিবদ্ধ নক্সা না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে কাজের সময় পদে পদে বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা।

আমার মনে হয় সঙ্কলন প্রকাশের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: সাহিত্যিক এবং সামাজিক। কথাটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলব কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষায় সত্যিকারের ভালো কবিতা যেগুলি লেখা হয়েছে তা সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয়ত পাঠকের সামনে সেই সময়কার বিভিন্ন সাহিত্যপ্রচেষ্টা তথা আন্দোলনের একটা খাঁটি ছবি উপস্থাপিত করাই আমাদের অভিপ্রায়। এ-ধরণের সংগ্রহকার্য খুবই দুরূহ, কেননা এক্ষেত্রে সংগ্রহকারীকে যুগপৎ নির্দলীয় এবং সহৃদয় হতে হবে। ধরুন যদি বুদ্ধদেব বসু আজ কোনো সংকলন প্রকাশ করেন তাহলে তিনি হয়ত গোলাম কুদ্দুস এবং অসীম রায়ের কোনো কবিতা পঙ্‌ক্তিভুক্ত করতে রাজী হবেন না এবং পক্ষান্তরে বিমলচন্দ্র ঘোষ যদি সম্পাদনার ভার পান তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নরেশ গুহ বা

বিশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বীকার করবেন না। তাই আমার মনে হয় আমাদের স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার যে এই দুই একগুঁয়েমিকেই আমরা পরিহার করতে চাই। আমাদের সঙ্কলন প্রকাশের উদ্দেশ্য নিছক ললিতসাহিত্যবুদ্ধি প্রণোদিত নয়। আমাদের সঙ্কলন প্রকাশের উদ্দেশ্য সমাজতাত্ত্বিকের সুবিধার্থে সমকালীন সাহিত্য তথা ভাব আন্দোলনের একটা প্রামাণ্য দলিল উপস্থিত করাও নয়। আমাদের উদ্দেশ্য এতদুভয়ের মধ্যে একটা সুযৌক্তিক এবং কাব্যিক সেতু রচনা করা। মানে, আমাদের লক্ষ্য হল এমনতর রচনা সংগ্রহ করা যা একই সঙ্গে সাহিত্যপদবাচ্য এবং বর্তমান যুগজীবনের প্রতিভূ। ভাষান্তরে, আমাদের লক্ষ্য হল আধুনিক কবিরা কী-ভাবে, কেমন ক'রে বলছেন, তা-ও যেমন দেখানো, তেমনি কী তারা বলছেন এবং তাঁদের বক্তব্য অব্যবহিত পূর্বসূরীদের থেকে অভিন্ন কিনা তা-ও নির্দেশ করা। আঙ্গিক এবং বিষয়-বৈচিত্র্য, মুদ্রা এবং ধ্যানবস্তু—দুটোর উপরেই আমরা যথাবিহিত গুরুত্ব আরোপ করছি যদিচ প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করছি সাহিত্যিক রসবস্তুর উপরেই, অসার্থক কোনো রচনাকে কোনো অজুহাতেই আমরা বরদাস্ত করছি না।

(i) "The selection must offer a variegated panorama of contemporary Bengali poetry."

(ii) "It should claim to be a representative showing not only of what is best, but what is most characteristic of Bengali verse."

উপরের উদ্ধৃতিটা কোনো একটা ইংরিজি কবিতা সঙ্কলন থেকে নেওয়া। কেবল Bengali কথাটা আমার। সঙ্কলনকারী বলছেন representative হওয়াটাই বড়ো কথা এবং ভালো কবিতাই যে কেবল representative তা মনে করা ভুল, সত্যিকারের যুগবৈশিষ্ট্যকে রূপ দিতে হলে অনেক মাঝারি কবিতাকেও স্থান দিতে হবে, তা না হলে প্রতিনিধি হওয়া যায় না। "A nation's poetry dose not consist solely of masterpieces and a collection which contained only the most exalted or rarefied examples would be so exclusive and precious as to be unrepresentative."

আমারও মনে হয় representative হওয়াটাই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভালো কবিতা যদি সত্যি সত্যিই লেখা না হয়ে থাকে তাহলে মাঝারি কবিতা নিয়েই আমাদের কাজে নামতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে এই কটা গোষ্ঠী আছে. কবিতা, পূর্বাশা, সাহিত্যপত্র, পরিচয় এবং শান্তিনিকেতন। প্রধানত এই কয়টি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের রচনা সংগ্রহ করাই আমাদের লক্ষ্য হবে। তাছাড়া মুসলমান এবং মহিলা কবিরাও যাতে represented হন তা-ও লক্ষ্য রাখতে হবে। তদুপরি যদি আমরা কোনো নতুন কবিকে আবিষ্কার করতে পারি, ভালোই।

এর পর কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কাদের লেখা আমরা প্রকাশ করব? প্রকাশযোগ্য কবিতা লিখতে পারেন এমন কবির সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি এবং বলা বাহুল্য সকলের লেখা প্রকাশ করবার মতো আমাদের স্থান নেই। এমতাবস্থায় আমাদের একটা arbitrary নিয়ম মেনে চলাই বোধ হয় দরকার। আমার মনে হয় আমাদের আদি প্রস্তাবই এক্ষেত্রে কার্যকরী, অর্থাৎ ২১ থেকে ৩২ বছর বয়স্ক কবিদের রচনাই আমরা প্রকাশ করব। কিন্তু বয়সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই চলবে না, আমরা শুধুমাত্র সেই কবিদেরই রচনা প্রকাশ করব কবিতা রচনায় যাঁদের ধারাবাহিক নিষ্ঠা আছে, ভাষান্তরে, যাঁরা কবিতা লিখেছেন, কবিতা লিখছেন এবং কবিতা লিখবেন। দৈবক্রমে দু'একটি ভালো কবিতা লিখে ফেলেছেন এমন সৌখীন কবির রচনা তা সে যতই ভালো হোক না কেন আমরা প্রকাশ করতে রাজী নই। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করা যাক। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা, যদি তিনি তিরিশের এধারে হয়ে থাকেন, তাহলেও আমরা ছাপাবো না, কেননা প্রকৃতপক্ষে গল্প রচনা করাই তার নিষ্ঠা। তেমনি অরুণ সরকার, অশোক সেন, বিমল কর, শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, অনিল চক্রবর্তী ইত্যাদি বয়সের পরীক্ষায় পাশ করলেও যেহেতু নিষ্ঠাবান কবি নন সেই হেতু সঙ্কলন থেকে তাঁদের বাদ দেওয়াই সঙ্গত। তাছাড়া, সবেমাত্র লেখা শুরু করেছেন, এখনও অনুশীলনের সীমা পার হতে পারেন নি, এমন কবিকেও, তাদের ভালোর জন্যই, আমাদের বরবাদ করা উচিত। যেই আসবে সেই কল্কে পাবে এমন উদারনীতি শেষপর্যন্ত আমাদের খেলো বই আর কিছুই করবে না। একজন কবি বারো বছর ধরে অবিচলিত-

ভাবে কবিতা লিখে যাচ্ছেন এবং আর একজন তিন বছরে তিনটি কবিতা লিখেছেন—এই দুজনকে একচোখে দেখা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মুড়ি-মিছরির একদর হতে পারে না। যাঁদের সাধনা বেশিদিনের তাঁদের কবিতা সংখ্যাও অন্যান্যদের তুলনায় বেশি নেওয়া দরকার।

* অফিসে বসে আমার যা মনে এল তাড়াতাড়ি তাই লিপিবদ্ধ করলাম। আমি যা বললাম তা-ই যে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তা নয়। আসল কথা আমি একটা আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই যাতে করে ভবিষ্যতে আমাদের নির্বাচন কার্য সহজতর হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে অরুণ ভট্টাচার্য এবং গৌর ঘোষকেও ভেবে দেখতে অনুরোধ করবেন। তাঁরা যদি লিপিবদ্ধ অবস্থায় তাঁদের বক্তব্যকে উপস্থিত করেন তাহলে আরো সুবিধে হয়। আমরা কবে আমার meet করছি তাড়াতাড়ি জানাবেন। হাতের লেখার জন্য ক্ষমা করবেন।—ইতি

অরুণকুমার সরকার

['সমকালীন বাংলা কবিতা' নামে আমরা একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেছিলুম। তখন সকলেই আমরা কিছু কিছু লিখছি। সুহৃদ্ রুদ্র ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। এই সংকলনটির কি চেহারা হবে, কি হবে কবিতা বাছাই করার নীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর, ঘোষ, অরুণ কুমার সরকার এবং আমি প্রায়ই মিলিত হতাম। চিঠিটি এই পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা। চিঠিতে উল্লেখিত ৺নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিমল কর বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক। এঁরা দুজনেই সে সময় মাঝে মধ্যে কবিতা লিখতেন। অশোক সেন আমাদের ছাত্রজীবনের বন্ধু। বর্তমানে জামাসেদপুরে আর আই টি তে ইংরেজী এবং হিউম্যানিটিজ বিভাগের প্রধান। অশোকও কিছু কিছু কবিতা লিখত, স্যাটায়ার কবিতার হাত ভালো ছিল। শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ও আমাদের ছাত্র জীবনের বন্ধু। এবং ইংরেজীর অধ্যাপক। বর্তমানে কিন্তু শান্তিপ্রিয় রীতিমত নিষ্ঠাসহকারে কবিতা-চর্চা করে থাকেন এবং বহু ভালো কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন। অনিল চক্রবর্তী সে সময় 'পূর্বাশা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অরুণকুমার সরকার নিজের সম্বন্ধে বিনয় সহকারেই নিজের কবিতা বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংকলনে তাঁর কবিতা ছিল। বিশ্ব

বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, গৌরকিশোর ঘোষ প্রভৃতি বেশ কিছু কবিদের তিনচারটি করে কবিতা ওই সংকলনে অন্তর্ভূক্ত হয়। সেইটিই প্রথম কাব্য সংকলন যাতে আমাদের বয়েসী কবিরা সম্মানজনক একটি স্থান পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'চল্লিশ দশকের কবিতা' যখন আমি সংকলন করি তখন এই কবিরা সকলেই রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। অরুণ ভট্টাচার্য]

[অরুণ ভট্টাচার্যকে]

২.

শ্রদ্ধাভাজনেষু

'উত্তরস্বরি পেয়েছি। ১০৪ সংখ্যার মতো এতো বড়ো কাগজ যে কতো পরিশ্রমে বের করেন তা শুধু কল্পনা করাই সম্ভব। আমরা সম্প্রতি 'শতভিষা' পত্রিকাটি আবার (বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিলো) প্রকাশ করার কথা ভাবছি, শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে কিনা জানি না। আপনার সহযোগিতা পাবো আশা করি।

আপনাব 'সহজিয়া পথঘাট'এর কবিতাগুলি (১০৩-এর) আমাকে খুবই স্পর্শ করেছে। ১০৪ সংখ্যা পড়া এখনো শেষ হয় নি।

কালীকৃষ্ণ গুহ

৩

৪০/১৩বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯

১৫.৪.৮০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি আমার নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানবেন। আপনার পাঠানো উত্তরস্বরি দু'খানাই যথা সময়ে পেয়েছি। এই সুন্দর সৌজন্যটুকু আজকাল অন্যত্র ক্রমবিলীন বলেই, মনে একটি সকৃতজ্ঞ মধুর ছাপ রেখে যায়।

উত্তরস্বরিতে আপনার স্মৃতিকথায় (কবিতার ভাবনা) সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে শ্রীমতী ছবি দত্তর কথা যেটুকু আপনি জানিয়েছেন তা মর্মস্পর্শী, এবং এতদিন আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তার চেয়েও গভীরতরভাবে

মর্মস্পর্শী শ্মশানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রীর যে বর্ণনাটুকু আপনি দিয়েছেন। তথ্য ছাড়িয়েও, একটা প্রতিকারহীন মানবিক বেদনা বুকের নাড়ী ধরে যেন হঠাৎ টান দেয়।

মণীন্দ্র গুপ্ত

৪.

১২ মুখার্জী পাড়া লেন/ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা

১লা বৈশাখ ৮৩

অরুণদা,

কদিন আগে উত্তরসূরি পেয়েছি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং নারায়ণ গাঙ্গুলীর স্ত্রী-প্রসঙ্গটি আমাকে দারুণ স্পর্শ করেছে। ইতি স্নেহধন্য

রবীন সুর

৫.

শ্রীযুক্ত অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক উত্তরসূরি,

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গত ১০.৭.৮০ তারিখে আমি উত্তরসূরির '১০৩' ও '১০৪' সংখ্যা দুটি কলেজের ঠিকানায় পেয়েছি। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। ১০৪ সংখ্যায় আমার একটি কবিতাকে আপনি স্থান দিয়েছেন, এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পুনশ্চ জানাই।

আপনার কবিতাগুলি পড়তে বড ভাল লাগলো (১০৩ সংখ্যার একগুচ্ছ কবিতা বিশেষ করে)। আর খুব ভাল লাগছে আপনার "কবিতার ভাবনা।" ১০৪ সংখ্যার লেখাটি এত আন্তরিক হ'য়েছে যে চোখে জল রাখা যায় না। এখানেই কি শেষ করে দিলেন? ক্রমশঃ না দেখে ভাল লাগলো না।

আপনার পত্রিকায় কবিতা লিখবো এ ইচ্ছে অনেককালের, এতদিনে আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হ'ল। সময় ও সুযোগ হলে উত্তর দেবেন। খুবই আনন্দ পাবো। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩৮৭

সশ্রদ্ধ নমস্কার সহ

রায়গঞ্জ কলেজ বাংলা বিভাগ

ব্রততী ঘোষ রায়

সাম্প্রতিক গ্রন্থপ্রকাশ

কালিদাসের মেঘদূত—(বহু আর্ট প্লেট-সমন্বিত, অনুবাদ) দাম : ২০'০০ এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি. ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কেতকী কুশারী ডাইসন এর "সবীজ পৃথিবী" কাব্যগ্রন্থ, দাম ৬'০০। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

গোবিন্দ চন্দ্র দাস (কাব্য গ্রন্থাবলী) দাম . ৪০ ০০। ১৯৭৭ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা লি. প্রকাশিত ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১৩

অমল চক্রবর্তী (কাব্যগ্রন্থ) ১. নীলিমার কাছে—৫'০০॥ ২. স্বদেশের প্রতিমা ভাসাতে—৬'০০ প্রগতি শিবির। প্রাপ্তিস্থান ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা. লি. ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, চেনা আয়না। দাম ৫'০০ ন্যাশন্যাল।

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য। দশকের রক্তিম বসন্তে। দাম ৪'০০॥ প্রাপ্তিস্থান ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী

নির্মল গুপ্ত-র রুবাইয়াৎ-ইওমর খৈয়াম। টা ৩'০০ মুণ্ডারি কবিতা: বাক্‌সাহিত্য প্রা. লি. ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্ সম্পাদিত বাতিল-কবিতা॥ দাম ২'০০। কল্পনা প্রকাশনী, ৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড (জরুরী অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাতিল করা কবিতার সংকলন)।

বৈষ্ণব পদাবলী : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত। প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ, বহু পদের টীকা সম্বলিত। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ। দাম—১৫'৫০ সাহিত্য সংসদ।

শ্যামল সেন। কবিতার অভিনয়—দাম—৩'০০ ক্রান্তিক প্রকাশনী ৬৩/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

হিমাদ্রি দত্ত। সন্নিকটে যাবো কবে—দাম ২ টাকা। প্রকাশিকা : পত্রলেখা সিন্‌হা, গ্রেটার কৈলাস। নয়াদিল্লী-১১০০৫৮।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত : ছন্দ যতি ভঙ্গ। দাম : ৫·০০ করুণা প্রকাশনী ১৮এ, টেমার লেন। কলিকাতা-৯

অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব—সত্যজিৎ চৌধুরী ॥ সান্যাল প্রকাশনী, কলিকাতা-৭ পৃ: ২২৪। মূল্য—১৫·০০

The Collected Poems of Edward Thomas · P 518, Clarendon Press Oxford University Press. £ 15

The Double Witness Poems · 1970 1976 ·Guilford Ben Belitt 71 p · Princeton University Press. £ 5 50

সংকলন · রীনা রায়

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টস্মিথ ১১৬ বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা ৬ (৩৫-১০৮৭ ফোন নং) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রবীন্দ্রসংগীতের
নতুন লং প্লে রেকর্ড ১৯৮০

এল. পি (স্টিরিও)

আশা ভোঁসলে ECSD 2606

জগতে আনন্দযজ্ঞে/বড়ো আশা করে এসেছি গো/দহে না যাতনা/স্বপ্নে আমার মনে হল/কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন/ডেকো না আমারে ডেকো না ইত্যাদি

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
ECSD 2607

রোদনভরা এ বসন্ত/বনে যদি ফুটল কুসুম/ও যে মানে না মানা/বড়ো বিস্ময় লাগে/দূরে কোথায় দূরে দূরে ইত্যাদি

সুচিত্রা মিত্র ECSD 2604

নূতন প্রাণ দাও/আজ তালের বনের করতালি/মম মন-উপবনে/গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে ইত্যাদি

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
S/33 ESX 4266

বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল/মনে হল, যেন পেরিয়ে এলেম/আমি চঞ্চল হে/দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় ইত্যাদি

৪৫-এল. পি (স্টিরিও)

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
S/45 NLP 2027

কাছে ছিলে দূরে গেলে/নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ/আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে/পাত্রখানা যায় যদি যাক ইত্যাদি

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
S/45 NLP 2026

কোন্ সে ঝড়ের ভুল/এপারে মুখর হল কেকা ওই/ওই জানালার কাছে বসে আছে/চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে ইত্যাদি

সাগর সেন S/45 NLP 2025

ওই ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে/আমি কী গান গাব যে/আমায় থাকতে দে-না/তারে দেখাতে পারি নে ইত্যাদি

রঞ্জত নন্দী ও দিলীপ রায়

গীটার ও বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর
S/45 NLP 2028

আমার সকল রসের ধারা/স্বপ্নে আমার মনে হল/হে নূতন, দেখা দিক ইত্যাদি

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত

রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

স্বরবিতানের নিম্নলিখিত খণ্ডগুলিতে পর্যায়ক্রমে সংকলিত সব কয়টি গানের স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত

খণ্ড	মূল্য	খণ্ড	মূল্য
৫৩	৫.৫০ টাকা	৫৯	৮.০০ টাকা
৫৮	৭.০০	৬০	৫.০০

খণ্ড ৬১ মূল্য ৫.০০ টাকা

এবং ১৭শ খণ্ড (নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা)। যন্ত্রস্থ

স্বরবিতানের নিম্নলিখিত খণ্ডগুলিতেও শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কৃত অনেকগুলি স্বরলিপি সংকলিত আছে

খণ্ড	মূল্য	খণ্ড	মূল্য
১	১৬.০০ টাকা	২৮	৫.০০ টাকা
৩	১২.৫০	৪২	১১.০০
৫	১২.০০	৪৪	৭.৫০
৭	৮.৫০	৪৬	৮.০০
১৮	৯.৫০	৪৭	১০.৫০

খণ্ড ৫৫ মূল্য ৭.০০ টাকা

স্বরবিতানের উপরোক্ত খণ্ডগুলি ব্যতীত শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কৃত রবীন্দ্রসংগীতের আরও কিছু স্বরলিপি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু স্বরবিতানে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

স্বরবিতানের ৩, ৪, ৫, ১৮ ও ৩০ (২য় সংস্করণ) খণ্ড শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

বিক্রয়কেন্দ্র ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

অরুণ ভট্টাচার্য প্রণীত

নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা

●

আশু প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'শিল্পতত্ত্ব', 'সৌন্দর্যদর্শন' এবং 'সঙ্গীতে সুন্দরের ধারণা' বিষয়ক তিনটি বিভিন্ন পর্বে অতি দুরূহ বিষয় আলোচিত হয়েছে। স্বচ্ছ ও সহজ ভাষায় কাব্য নাটক সংগীত নৃত্য ও চিত্রকলা থেকে উদাহরণ সহ পরিকল্পিত এই গ্রন্থ লেখকের দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এক বিচিত্র আত্ম-আবিষ্কার। ভারতীয় রসতত্ত্ব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র অধ্যায় এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পী সাহিত্যিক স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য।

সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ

১ সংগীতচিন্তা — ১ম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়
২ রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক — ১ম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়
৩ রবীন্দ্রসংগীতে স্বর সংগতি ও সুরবৈচিত্র্য
৪ লৌকিক ও রাগসংগীতের উৎসসন্ধানে এস এন. রতনজংকার প্রণীত। (অনু কৃষ্ণা বসু) ভূমিকা ও সম্পাদনা অরুণ ভট্টাচার্য
5 A Treatise on Ancient Hindu Music (published simultaneously from India and U S A)
6 Dimensions Philosophical Essays on the Nature of Music and Poetry
7 Structure and Integration of Ragas (In Press)

কাব্যসাহিত্য সমালোচনা

১ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস
২ কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল (১ম সং নিঃশেষিতপ্রায়)
৩ আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ (প্রেসে)
৪ Tagore and the Moderns
৫ The Romantic Design (shortly to be published)

কাব্যগ্রন্থ

১ সমর্পিত শৈশবে ২. হাওয়া দেয় (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ) ৩ ঈশ্বরপ্রতিমা ৪ সময় অসময়ের কবিতা ৫ সমুদ্র কাছে এসো (প্রকাশিতব্য) ৬ বারো বছরের বাংলা কবিতা (সম্পাদনা) ৭ চল্লিশ দশকের কবিতা (সম্পাদনা)

●

উত্তরসূরি প্রকাশনী · কলকাতা ৫০ ॥ ইণ্ডিয়ানা কলকাতা ৭৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

পদার্থের ধর্ম (২য় সংস্করণ)	ড দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০ ০০
পরমাণু ও কেন্দ্রীন	ড দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২১ ০০
পরমাণু ও কেন্দ্রক গঠন পরিচয়	ড সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	৩৩ ০০
জ্যামিতীয় আলোক বিজ্ঞান	শ্রী অরবিন্দ নাগ	১৯ ০০
পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা	ড দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০ ০০
আলোকের সমবর্তন	শ্রী সুহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২ ০০
গ্যাসের আণবিকতত্ত্ব	শ্রী প্রতীপকুমার চৌধুরী	১২ ০০
নিম্নতাপমাত্রা বিজ্ঞান	ড দিলীপকুমার চক্রবর্তী	১২·০০
ইলেকট্রনিক্স	ড অনাদিনাথ দাঁ	১৫ ০০
বৈশ্লেষিক রসায়ন	ড অনিলকুমার দে, ড অসিতকুমার সেন	১৭ ০০
ভৌত রসায়ন	ড নিত্যানন্দ কুণ্ডু	২২ ০০
ইউরেনিয়ামের ওপারে	ড অনিলকুমার দে	৯ ০০
দ্বিমাত্রিক স্থানাংক জ্যামিতি	শ্রী অশোককুমার রায়	২১ ৫০
গতিবিদ্যা	ড প্রদীপ নিয়োগী	১২ ০০
প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা	শ্রী অপূর্বকুমার চক্রবর্তী	১৫ ০০
সংখ্যাতত্ত্ব	ড রাজকুমার সেন	১১ ০০
প্রতীকী ন্যায়	শ্রী ইন্দ্রকুমার রায়	৭ ০০
সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান	শ্রী রমাপ্রসাদ দাস	২৬ ০০
পরিপাক, বিপাক ও পুষ্টি	শ্রী দেবজ্যোতি দাশ	৩০ ০০
রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস	শ্রী নির্মলকুমার সেন	১২ ০০

আরো অন্যান্য বইয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ৭০০ ০১৩

আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায়?

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়ের স্কুলের টাকা জোগাড় করার সমস্যাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। এখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আপনি অন্ততঃ নিশ্চিন্ত। টানাপোড়েন সরকারেরও। টাকা নেই সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে। এই কারণেই যাতে অল্প-বিত্তবান পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হোন। আমরা এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সমস্যা এখনও আছে অনেক। তবু আমরা চাই শিক্ষার আঙিনায় জনসাধারণের প্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি ১১৩৭৩ (আই. সি এ.)।৮০
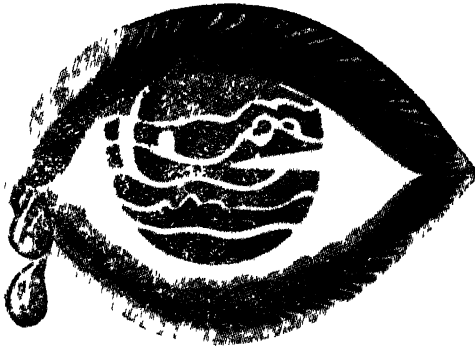
দামোদরের বানের সাথে
তখন কেবল চোখের জলের বান ডেকেছে
ডুবে গেছে মাঠের ফসল
গ্রাম গঞ্জ গোলাবাড়ী
স্বপ্ন এবং স্বপ্নে ঘেরা কুটীরগুলো

ঝোড়ো হাওয়ার রাতের শেষে
সূর্যোদয়ের মতন যেদিন জীবন জুড়ে সকাল হলো
বেঁচে থাকা মানে তখন
ভয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে মরাই সার কথা নয়।

সুখ কি এখন শুকপাখী যে
পালিয়ে যাবে শেকল ছিঁড়ে?

বুকের খাঁচায় সুখের বাসা
সামনে সবুজ স্বপ্ন হয়ে ক্ষেতের ফসল
অন্ধকারের সঙ্গে এখন পাঞ্জা কষে আলো জ্বালা

অশ্রু নদীর পারে যেন
স্বপ্ন দেখার নৌকো বাঁধা

পুরস্কার যখন নিজেই সম্মানিত হয়

আর্তজননী টেবেসাকে বিশ্বেব শ্রেষ্ঠ পুরস্কাবে ভূষিত করে 'নোবেল' পুবস্কাব এবাব নিজেই সম্মানিত।

আর সম্মানিত হ'ল এই পশ্চিমবাঙ্গলা, যেখানে এক নিবেদিতপ্রাণা অষ্টাদশী তাঁব জীবনব দুশ্চব ব্রত সুরু কবেছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আর্তেব সেবায়। যার আব এক নাম ভালবাসা। অনাথ ও আতুরেব প্রতি স্নেহময়ী জননীব অনাবিল, নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

যে সমাহিত তাপসীব হৃদয়ে ঈশ্বব ও ভালবাসা অভিন্ন, যিনি এই রাজ্যকে মানবতা ও শান্তিব মানচিত্রে চিবকালেব জন্য চিহ্নিত কবে গেলেন, সেই মহাপ্রাণকে আমাদের প্রণাম।

পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

With Best Compliments of

THE ALKALI AND CHEMICAL CORPORATION OF INDIA LTD.

CALCUTTA ● BOMBAY ● MADRAS ● NEW DELHI

দেশে বিদেশে পথ চলার আনন্দ
Bata
দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে
এযুগে আর পায়ে হেঁটে যেতে
হয় না। যান্ত্রিক যান ইচ্ছে
মতো পৌঁছে দেয় বাঞ্ছিত
গন্তব্যের সীমানায়॥
তবে, বেড়াবার চরম আনন্দটুকু
কিন্তু আসে চরণ চালনায়।
পায়ে হেঁটে পথ চলার সেই
আনন্দময় মুহূর্তগুলি সার্থক
করে তুলবে বাটার জুতো॥

মামনের স্বপ্ন

গালে হাত দিয়ে পাকা গিন্নীর মতো তাতু বলল : দেখেছিস ? বাড়ীর সামনেটা কি রকম করে ফেলেছে টিন দিয়ে ঘিরে রাস্তাঘাট খুঁড়ে একাকার।

পাশে বসেছিল মামন, বলল : বলছিস কি ? ওতো পাতাল রেল তৈরী হচ্ছে।

পাতাল রেল না হাতি। বাবা বলেছে, ওই পাতাল রেল-টেল এ জন্মেও হবে না।

মামন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল : কাল নেনো পাতাল রেল এর গল্প বলছিল। মামাকে নেনো বলে ডাকে মামন।

কি বলছিল ?

বলছিল কি এই তো আর কটা বছর মাত্র। তার মধ্যেই পাতাল রেল এর কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন মামনকে আর বাসে করে স্কুলে যেতে হবেনা। সামনের মোড় থেকে উঠবে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে স্কুলে গিয়ে নামবে। গুঁতোগুঁতি ভীড় নেই। নিশ্চিন্তি

তাতু চোখ বড় বড় করে মামনের কথা শুনছিল [illegible]।
স্কুলের বাস কি বিচ্ছিরি বাবা সেই সকালে বাসে ৬.৩০ [illegible] স্কুলের শেষে বাড়ী ফিরতে বিকেল পেরিয়ে যায়।

তাতু বলে উঠল : বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি।

medium

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

" [illegible]

[illegible]

[illegible]

করিয়া ঘুম হইতেছিল না — [illegible] মাথার উপর

আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম, ঘুম যখন

হইতেছে না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা

গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার বৃথা চেষ্টার

টানে গল্প আসিলনা, ঘুম আসিয়া পড়িল।

স্বপ্ন দেখিলাম, কোন-এক মন্দিরের সিঁড়ির

উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা

অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে

জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, একী! এ-যে রক্ত!"

বালিকার এই ব্যাকুলতায় তাহার বাপ অন্তরে

ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান

করিয়া কোন মতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে

চেষ্টা করিতেছে — জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল

এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।"

— "জীবনস্মৃতি"

পূর্ব রেলওয়ের পূর্বসূরী ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের

কোন একটি গাড়িতে এই স্বপ্নলব্ধ গল্পেরই 'জন্ম',

STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

উত্তরসূরি ॥ ১০৬

আচার্য শৈলজারঞ্জনকে নিবেদিত বিশেষ রবীন্দ্রসংগীত সংখ্যা

●

●

উত্তরসূরি ॥ ১০৭

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর ৯বি-৮ কে সি ঘোষ রোড কলকাতা ৫০ ॥ ৫২ ২৪৫২

উত্তরসূরি · নিয়মাবলী

১ লেখা কপি রেখে পাঠান। অমনোনীত লেখা কোন অবস্থাতেই ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

২. প্রকাশনযোগ্য বিবেচিত হলে অবশ্যই ছাপা হবে। চিঠি লেখার প্রয়োজন নেই। সম্পাদকের পক্ষে সব চিঠির উত্তর দেওয়া সত্যি সম্ভব নয়।

৩ উত্তরসূরি বিশেষ কোন দল বা মতে বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাস করে, লেখা 'হয়ে উঠেছে' কিনা তার ওপর। বিশ্বাস করে, চিরকালের শিল্পসাহিত্য বিশেষ রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

৪ কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন কোন অবস্থাতেই প্রকাশিত হয় না।

৫ ২৭ বর্ষ থেকে গ্রাহক মূল্য সডাক বার্ষিক ১৫ ০০। এম ও করে স্পষ্ট ঠিকানা লিখে পাঠান। আর কোন নিয়ম নেই।

৬. সুস্থ কবিতা-আন্দোলনে সাহায্য করুন।

৭ একসঙ্গে দশ কপি নিলে এজেন্টদের ২৫% কমিশন দেওয়া হয়, ডাকখরচ পত্রিকার। বই ভি পি -তে পাঠানো হয়।

সম্পাদক ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫০
ফোন ৫২-২৪৫২

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিণ্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রেসের ফোন · ৩৫-১০৮৭

রবীন্দ্রনাথের গান কেমন করে গাইতে হবে

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

'আমার গান আপন মনের গান—তাতে আনন্দ পাই, শুনলে আনন্দ হয়। গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে, বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্যে নয়। আমার গান যদি শিখতে চাও নিরালায়, স্বগত, নাওয়ার ঘরে কিংবা এমনি সব জায়গায়, গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত—এর বেশি ambition মনে নাই রাখলে।' ১৩৪৭ সালে 'গীতালি' সঙ্গীত সংঘে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মর্মার্থটুকু ভালো করে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, তাঁর গানের আদর্শ কি ছিল। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৮।৭৯ হবে। সুতরাং জীবনের প্রান্তে এসে পরিণত চিন্তার ফসল আমরা পেয়েছি বললে অত্যুক্তি হবে না। সেসময় তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে চেয়েছেন কিন্তু সামান্যই। চেয়েছেন, তাঁর গান হৈ হৈ করে বিরাট সভামণ্ডপে গাওয়ার চেয়ে নিরালা ঘরের কোণে যেন গাওয়া হয়। অর্থাৎ, আমরা সহজেই বুঝতে পারি, তিনি তাঁর গানের মধ্যে যে আত্মগত গভীর ভাবলোকের স্পর্শ আছে তার ওপরই জোর দিয়েছেন। গায়ক বা শিল্পী এই তদ্‌গত ভাবলোকটির অনুসন্ধান করুন, এই গানের গভীরে ডুবে যান, এইটেই ছিল তাঁর সামান্যতম বাসনা।

দ্বিতীয়ত, তিনি চেয়েছিলেন, যাঁরা শ্রোতা তাঁরা প্রকৃত রসিক হবেন। 'রস' বস্তুটি বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই রস-আহরণ সকলের সমান অধিকারে নেই—এটি সহজ সত্য। গোড়াতেই এই সত্যটিকে মেনে নিলে কোন অসুবিধে হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলছেন যেখানে আর্টের উৎকর্ষ সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না—সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে উঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়,

উপবকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের স্রষ্টিকর্তা তাদের ওপর যদি হাটের ফর্মাশ চালানো যায়, তা হলেই সর্বনাশ ঘটে। ফর্মাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফর্মাশ-অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তা হলে আপনিই তাব উপরে সর্বলোকেব অধিকার হবে। কিন্তু, সকলেব অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে, ভালো জিনিস এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলেব জন্যে কিন্তু সকলেই তাব মর্যাদা সমান বোঝে একথা কেমন করে বলব?' এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে শিল্পী, রসিক, জনসাধাবণ এবং শিল্পবস্তুতে বস বিষযে রবীন্দ্রনাথের ধাবণা খুবই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অধিকারীভেদের প্রশ্নটিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, শিল্পী এবং রসিক এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ের অতি মূল্যবান কথা বলেছেন। এবং এই বক্তব্যেব মধ্য দিয়েই শিল্প প্রকবণের বিষযটিকে স্পষ্ট কবে তুলেছেন। তিনি বলছেন 'কাব্যকলা এবং চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে লইযা যে মানুষ রচনা করে আব যে মানুষ ভোগ করে। গীতিকলায় আরো একজন প্রবেশ করিয়াছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার মাঝখানে আছে ওস্তাদ। বসেব স্রষ্টা এবং রসের ভোক্তা এই দুয়ের উপযুক্তমত সমাবেশ, সংসারে এইই তো যথেষ্ট দুর্লভ, তাব উপবে আবার বসেব বাহনটি—ত্রৈগুণ্যেব এমন পবিপূর্ণ সম্মিলন বড়ো কঠিন। ইংবেজিতে একটা প্রবাদ আছে—দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনেব যোগে গোলযোগ।' এই বক্তব্যে ববীন্দ্রনাথ বড় স্পষ্ট করে শিল্পে communication তত্ত্বটির ওপব জোর দিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে ববীন্দ্রনাথ তাঁর গান সম্বন্ধে খুব সহজ করে সর্বসাধাবণের কাছে নির্দেশ দিযে গেছেন। তাঁব রচিত গান-এব শ্রোতা কি ধরণের হবে—অথবা তিনি কী ধরণের শ্রোতা চান বা পেলে খুশি হ'ন তাবও নিশানা আছে। তাঁব গানের আবেদন এতই সহজ ও সোজাসুজি যে তিনি কোনরকম মধ্যবর্তী তৃতীয় সত্তাকে সেখানে চান না। সেটি হচ্ছে ওস্তাদী। ওস্তাদী অর্থে স্বরমালিকা বা সুরপ্রযোগরীতিব অযথা 'টেকনিক্যালিটি।' ওস্তাদী বিষয়টি বলতে তিনি রাগরাগিণীব কঠোব বিধিনিষেধকে মনে কবেছেন, এও মনে হতে পারে। কেননা, তিনি একদা বলেছিলেন যে স্বরলিপি বইতে 'রাগরাগিণীর নির্দেশ না থাকাই

ভালো।' অর্থাৎ রাগ বা রাগিণীর অন্তর্নিহিত ভাবসুষমা তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু উচ্চাঙ্গসংগীতের গায়নরীতিতে যে 'কালোয়াতী' আছে তা তিনি অপছন্দ করেছেন। এ থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে তিনি সহজ সুরের সহজ প্রকাশ পছন্দ করেছেন—সেইমত শিল্পীকে নির্দেশ দিয়েছেন গাইবার জন্য, একথা মনে করা যেতে পারে এবং এই গানের মুষ্টিমেয় শ্রোতা যথার্থই রসিক হবেন এটুকু আশা করেছেন।

এখানে, এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের গানকে মনের ভিতরে গ্রহণ করলে প্রাসঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়ের ওপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে, তাঁরই মানসিকতা বিচার করে দেখতে পাচ্ছি, একটি পরিশীলিত রুচি জড়িত আছে। সেই রুচির প্রশ্নটিকে যদি যথোচিত মর্যাদা দিতে হয় তবে কতগুলি বিষয়কে অবশ্যই সবিশেষ গুরুত্ব দান করতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে আবহ যন্ত্রসংগীত বাজে, তা ইদানীং বড় উৎকট হয়ে আমাদের কানে বাজে। এস্রাজ মন্দিরা এবং বাঁশী থাকলেই সুরসহযোগ হিসেবে যথেষ্ট। এবং রুচিবান পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে বলেই আমার ধারণা। রবীন্দ্রনাথও এস্রাজের আবহ সুরটিকে মূল্য দিতেন। সেতারকে কোনদিনই তিনি আবহসংগীতের সহযোগী মনে করেন নি। অথচ ইদানীং সেতারটি সমস্ত আসরে রীতিমত রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে বাজছে। তবলা বাজালে ক্ষতি নেই, কিন্তু তবলার কাজটি খোল এবং মৃদঙ্গতে আরো সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের গান পরিবেশন কালে সজ্জা এবং পোষাকের পরও একটু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন—যার মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর রুচি ফুটে উঠতে পারে। এই সব মিলিয়ে একটি সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠলে রবীন্দ্রসংগীত আরো স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

শেষ কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান নিয়ে যা একেবারেই চান নি, ইদানীং তাই হচ্ছে—অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত একটি বাণিজ্যিক মাল-মশলায় পরিণত হয়েছে। জলসা, রেডিও, রেকর্ড, মেলা, সম্মিলন—যেখানেই রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশিত হচ্ছে সেখানেই উদ্যোক্তাদের একটি বাণিজ্যিক মনোভাব কাজ করছে। স্থানে স্থানে তা এতো দৃষ্টিকটু এবং কুরুচিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, যে কোন রবীন্দ্রানুরাগী তাতে

ব্যথিত হবেন। আমার মনে হয়, এই অবস্থা এবং পরিবেশ বেশীদিন চলতে থাকলে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গান—যা বাঙ্গালীরই নয়, সারা ভারতবাসীরই গৌরব,—অচিরে তার মর্যাদা নষ্ট করবে। এই অমূল্য সম্পদকে আমরা অনাদরে অবহেলায় হারিয়ে ফেলব। তখন আর সময় থাকবে না।

২

রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে যে তর্কবিতর্ক ও নানা মত আজকাল পোষণ করা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমানে রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহ্য ও তার মূল ধারাকে রূঢ়ভাবে খণ্ডন করা হচ্ছে, তার সংগীতের যে একটি বিশিষ্ট রূপ আছে তাকে তার পূর্তির রূপ দান না করে অনেকটা পেষণই করা হচ্ছে, এটা দুঃখদায়ক। রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়, অথচ রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার তিনি নিজেই। নিজেই তিনি তাঁর গান ও নাটকের আদর্শ রূপায়ন করেছেন। তাঁর ভাবধারাগুলি তিনি নিবদ্ধ করেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধের মধ্যে, বক্তব্যরূপে। তিনি রচনা করেই তা অন্যদের হাতে তুলে দেন নি শুধু, গানে সুরারোপ করে গেযেছেন এবং নিজে গাইয়েছেনও তা নানা অনুষ্ঠানে, নাটকে নিজে অভিনয় করেছেন মঞ্চে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির যথার্থ রূপ তাঁরই হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর মাধ্যমে।

তাঁরই আদর্শ, তাঁরই রচনা এবং তার প্রকাশের দিকটি তিনি স্বয়ং চিহ্নিত করে গেছেন। সেগুলিকে শ্রদ্ধা করলেই, তাঁকে বুঝতে সচেষ্ট হলেই কিন্তু রবীন্দ্রগানে ঐ বিশৃঙ্খলতা এতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের গানের বিশুদ্ধ রূপটি এ কারণেই আজকাল প্রায় দুর্লভ।

গীতালির উদ্বোধনী ভাষণে ওই কথাটি বলেছিলেন, "আমার গান আমার মত করে গেও"। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আমাকে তিনি স্বয়ং যখন শান্তি-নিকেতনে সংগীতভবনের অধ্যক্ষের কাজে ব্রতী করেন তখন এই কথাটি আমাকে বিশেষভাবে বারবার বুঝিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর অন্যান্য বিভাগে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হোত, তাই সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু সংগীত বিভাগে তাঁরই রচিত গান শেখানো হোত তাই সেই জায়গায় তিনি

নিজে আমাকেই বলেছেন, তাঁর গান যেন তাঁরই আদর্শ মতো করে শেখানো হয়। আজকাল মনে হয় এখন কি তার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি? বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কি সে দায়িত্ব নেবেন না? এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেন গুরুদেবেরই আদর্শে পরিবেশন করার দায়িত্ব নেন, তাঁদের কাছে আমার এই আবেদন রইল। আজকাল প্রায় সমস্ত পাড়ায় রবীন্দ্রসংগীতের একটি করে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—সবাই রবীন্দ্রসংগীত শিখছেন, গাইছেন এটা আনন্দের কথা। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই রবীন্দ্রনাথের গানের বিশুদ্ধতার দিকে দৃষ্টি না রেখে ব্যবসায়িক মূল্যকে মর্যাদা দিচ্ছেন বেশী। তাঁরা গুরুদেবের কোন আদর্শেই আদর্শবান নন। শ্রোতৃবর্গও আজকাল কেমন সেসব বিকৃত রুচিতে মোহগ্রস্থ হয়ে সাড়া দিয়ে বাহবা দিচ্ছেন। শ্রোতারা কত অল্পে তৃপ্ত থাকছেন। কিন্তু শুধু শ্রোতার দোষ দেওয়া যায় না, এজন্য দায়ী সংগীত-পরিবেশনকারী। তারা নামতে নামতে এমন পর্যায়ে এসেছেন সেখান থেকে উদ্ধারকার্য সম্ভব নয়। বাজারের পণ্যসামগ্রী হিসেবেই রবীন্দ্রসংগীত আজকাল পরিচিত।

কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অবশ্য রবীন্দ্রসংগীতের 'গ্র্যামাটিকাল' দিকটির প্রতি বেশী মনোযোগ দেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান ভাব, রস, মাধুর্য, সর্বোপরি শিল্প সৃষ্টি না হয়ে তার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করে' খড়ের কাঠামোতে তৃপ্ত থাকছেন। আমার দীর্ঘ জীবনের শিক্ষকতায় এই ধরণের পরিবেশন আমাকে দুঃখ দেয়। এতো কথা বললাম তার মূল কথাটি আমার নয়, স্বয়ং গুরুদেবের। তিনি নিজেই আমাকে শিক্ষাদান করার গুরুভার অর্পণ করে গিয়েছেন। তাঁরই আদর্শ শিরোধার্য করে চলেছি, কতটা সফল হ'য়েছি জানি না, তাই আজকাল যখন তাঁর গানের আদর্শচ্যুতি দেখি, তখন মনে হয় আমার শিক্ষাদান হয়তো অসমাপ্ত থেকে গেছে। তাই শেষ করার আগে স্বয়ং তাঁর কথাই বলি, "আমার গান আমার মতো করে গেও।"

আত্মস্মৃতি

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

[শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন অরুণ ভট্টাচার্য। দিল্লী আকাশবাণীর স্থায়ী সংগ্রহশালার জন্য। সম্পাদক উত্তরসূরি]

অ. শৈলজাদা আজ আমরা আপনার কিছু মূল্যবান সময় নেব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ। সংগীত ভবনে শান্তিনিকেতনের দিনগুলি এবং গুরুদেবের গানের যথাযথ শিক্ষা প্রচার এবং স্বরলিপির মাধ্যমে এইসব অমূল্য গানগুলির সংরক্ষণ বিষয়ে আপনার মন্তব্য বাঙালী সংগীতরসিকের কাছে প্রচণ্ড আকর্ষণের ব্যাপার। আচ্ছা, আপনি তো ছোটবেলায় বাড়ির সাংগীতিক পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু সুদূর নেত্রকোনায় তখন রবীন্দ্রসংগীত তো পৌঁছায় নি। কি করে আপনি গুরুদেবের গানের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হলেন ?

শৈ. অরুণবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার জন্ম হয়েছিল পাড়াগ্রামে সেখানে আমার ঠাকুরমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলাম আমি, স্নেহের পাত্র ছিলাম আমি। তিনি বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। সবসময় কীর্তন, বাউল গান বাড়ি মুখরিত করে রাখত। সেই সময়ে আমার ভিতরে সেসব গানের একেবারে ছাপ কেটে গিয়েছিল। পাঠশালা যেতাম মাঠ পেরিয়ে বাঁশবন পেরিয়ে, সেই মাঠের গান শুনতাম। সে গান, যে গান শুনতাম সে গানই ভাল লাগত, গলায় তুলে নিতাম। একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল আমার সে গলার যেন পাখির মত গান করে উঠত গলা।

গান. কানাই নিল কুল মান, বাঁশি নিল প্রাণ রে
আমার এই কলঙ্কে জগৎ ভাসিল রে, সখি

[শৈলজাদা গানটি আকাশবাণীতে গেয়ে শুনিয়েছিলেন]

গান গাইতে গাইতে পাঠশালার পরে এসে বাড়ি ঢুকছি আমার ঠাকুরমা আমাকে আদর করে বললেন—দ্যাখো, তুমি তো ছেলেমানুষ তোমার কিন্তু

এখনই এ গান গলায় শোভা পায় না। তোমাকে তোমার মত ঠিক গান আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি আমাকে ধরে নিয়ে 'কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বাঁচে না, পাই কোথায় তারে' গানটি আমাকে শিখিয়ে দিলেন। [এ গানটিও শৈলজারঞ্জন শুনিয়েছিলেন] তারপরে পাঠশালার পড়া সমাপ্ত করে আমি শহরে গেলাম, নেত্রকোনায। দত্ত হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। সেখানে গান আমার বন্ধ হয়ে গেল। সেখানে ইস্কুলে পড়াটাই মুখ্য হল। ইস্কুলে আমার একটু পড়াশুনায় নাম ছিল, মাস্টারমশাইরা সবসময়ে আমাকে সতর্ক প্রহরীর মত আগলে রাখতেন—গান গেযে যেন আমি বকে না যাই। আমার বাড়িতে সব সময় খবর পাঠিযে দিতেন ঠিক সময়ে আমি যেন বাড়িতে থাকি, পড়াশুনা করি। কেবল তবু আমার মন একেবারে গানের জন্য ব্যাকুল হযে থাকত। ওটা নিযেই যেন আমার জন্ম। এর জন্যই যেন আমার জন্ম। কখন ভিখারি বৈষ্ণবের কণ্ঠের গান ভেসে আসত আমার কানে, তাই আমার গলায় বাসা বাঁধত। এইরকম একটা কঠিন পাশের মধ্যে থেকে মানুষ হচ্ছি। তখন আমার চারটি জ্ঞাতি খুড়তুতো কাকা--শৈলেশ, সুরেশ,জ্যোতিষ, ভবেশ— এই চারটি আমার জ্ঞাতি কাকা—তাঁরা বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ছাত্র ছিলেন—পাঠভবনের—তাঁরা যখন বাড়িতে আসতেন ছুটিতে কিম্বা ছুটির পরে বাড়ির থেকে ওখানে যেতেন—তখন গাঁয়ের বাড়ির থেকে যাওয়ার পথে হয়তো আমাদের বাড়িতে দু-একদিন থেকে যেতেন। তখন তাঁদের দেখতে আমাদের সুযোগ হ'ত। আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগত, ভাল লাগত তাঁদের। তাঁদের বেশভূষা, তাঁদের চলন, তাঁদের বলন। তাদের গান-গাওয়া, তাদের গলার সুর, তাঁদের কথাবার্তা, তাঁদের কথায় গুরুদেব, তাঁদের কথায় আশ্রম তাঁদের গুরুদেবের গান এসব কথাবার্তা শুনতে আমার খুব ভাল লাগত। আমার মনে যেন একটা স্বপ্নের কল্পনালোকের সৃষ্টি করে দিত। এরকম করে তো আমি মানুষ হয়েছি। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম যে এই নেত্রকোনা দত্ত হাইস্কুল থেকে আমাকে অন্য একটা দূরের বেশ ভাল স্কুলে, লেখাপড়ার স্কুলে পাঠিযে দেওয়া হবে। তার মধ্যে দুটি স্কুলের নাম শুনলাম। একটি নাম শুনলাম, বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, আর একটা হচ্ছে জামতাড়া জঙ্ বাহাদুর হাই করোনেশান স্কুল। আমি মনে মনে ভগবানের আশীর্বাদ চাইলাম যে জামতাড়ায় না গিয়ে

আমি যেন বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কাকাদের সঙ্গে যাই। আমার বাবা এত রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন যে কিছুতেই যেতে দিলেন না। সকলের মত অগ্রাহ্য করে তিনি জোর করে আমাকে জামতাড়া হাইস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে আমি ম্যাট্রিক পড়তে গেলাম। তারপর আমি আবার দেশে এসে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এলাম। কলকাতায় এসে আবার—সেটা, কলকাতার জীবনটা আমি পরে বলব। তা নেত্রকোনাতে এই যে রবীন্দ্রনাথের একটা স্পর্শ পেলাম শান্তিনিকেতনের একটা স্পর্শ কিম্বা একটা আমেজ পেলাম সেটাই যেন আমার জীবনে রেখাপাত করে দিল। সেই যে আমার অবচেতন মন থেকে সেটা সরতে চায় না। যখনই একলা থাকি, আমার মনে হয় যেন সেটাই প্রতিধ্বনি করে। রবীন্দ্রসংগীত কোন্‌টা, রবীন্দ্রসংগীত কোন্‌টা না সেগুলি তো সেই কালে কোন বুদ্ধি বিচারের ব্যাপারের ছিল না—গান গান—কার গান কার লেখা সেসব লোকের কোন রকম বাছবিচার ছিল না। সেই রবীন্দ্রসংগীত বলে চিনি না, কিছু না কিছু যখন বুঝতে পারি যে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' সে পাড়াগাঁয়ের লোকের কাছে শুনেছি কিন্তু সেটা যে রবীন্দ্র-সংগীত তা জানতাম না। সেইরকম রবীন্দ্রসংগীত বলতে যে ঠিক নেত্রকোনায় থাকতে পরিচিত হয়েছি খুব জানি না। তবে শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্বন্ধে খানিকটা জল্পনা-কল্পনা আমার কাকাদের ভেতর থেকে আমি পেয়েছিলাম—সেইটুকুই আমার মনে রেখাপাত করেছিল।

অ তাহলে আমাদের তো মনে হয়, কলকাতায় যখন পড়তে এলেন, সেই সময়ে তো কলকাতার সংস্কৃতি, শান্তিনিকেতনের কথাবার্তা আরো বেশী করে আপনি শুনতে পেলেন। তা তখন বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার একটা সুযোগ ঘটেছিল যোগাযোগ ঘটবার। সেটি কি করে হ'ল?

শৈ কলকাতায় যখন আমি কলেজে পড়তে এলাম, তখন সেই কাকাদের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল কলকাতায়। তখন শুনলাম, ঠাকুরবাড়ি জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রসংগীত এই কথাগুলো বিশেষ করে আমার কানে এল। তখনকার দিনে অতুলপ্রসাদের গানও খুব জনপ্রিয় ছিল। মণ্টু রায়, দিলীপ রায় তখন নানান জায়গায় গান গেয়ে বেড়াতেন, আমাদের ছাত্রাবস্থায় সেসময় দুটো গানই খুব বেশী হ'ত। রবীন্দ্রসংগীত আর অতুলপ্রসাদের গান। সেই আমার

কাকাদের কল্যাণে আমি যখনই ঠাকুরবাড়িতে কোন উৎসব হোত, কিম্বা এ বোই মাঘে সাধারণ উপাসনা হোত তার টিকিট সংগ্রহ করে সেখানে যেতাম। সে গান ১১ই মাঘের উপাসনার গান বুঁদ হয়ে শুনতাম। আমার মনে পড়ে, ১৯১৪ সাল বোধহয় সেই বারে, যে সাহানা দেবী 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' গানটি যেন উপাসনায় গেয়েছিলেন। সে আমার এত ভাল লেগেছিল ছেলে বয়সে, আমার এখনও সেটা মনে পড়ে। এরকম ভাবে আস্তে আস্তে রবীন্দ্রসংগীতের, ঠাকুরবাড়ির, কাছাকাছি যেতে আরম্ভ করলাম। রবীন্দ্রনাথকে দেখি নি তখনও, রবীন্দ্রনাথের কথা কেবল শুনেইছি।

অ কিন্তু কবে ওঁর সঙ্গে আপনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ'ল, সেটা কি

শৈ যদ্দুর মনে পড়ে, সেটা সত্যি কথা বলতে গেলে ১৯২১ সালে যখন শান্তিনিকেতনের থেকে রবীন্দ্রনাথ এসে বর্ষামঙ্গল করলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে ১৯২১ সালে, সেইবারে আমার কাকাদের মাধ্যমে কার্ড সংগ্রহ করে আমি বর্ষামঙ্গল দেখতে গেলাম ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে কাছে দেখে সামনাসামনি বসে তাঁকে দেখলাম ঋষিতুল্য লোক, তাঁর কণ্ঠে সুরভি কণ্ঠে শুনলাম 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', আবৃত্তি শুনলাম 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে'। তখন এমন এক রেখাপাত করল আমার মনে রবীন্দ্রনাথ—আমায় এসে জুড়ে বসলেন আর কোন কিছুই এর পর থেকে আমার আর মনে ধরে না। আমার মনে পড়ছে না ভালবেসে আর কিছু ই'চ্ছে কার সখ করে, আদর করে কোন গান এমন করে গেয়েছি। তারপর থেকে রবীন্দ্রসংগীত একেবারে আমাকে জাপটে ধরেছে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কোন গানই আমার মনে দাগ কাটে নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ তখনো হয় নি কিন্তু সামনে বসে তাঁকে দেখেছি। পরের বছর ১৯২২ সালে আবার বর্ষামঙ্গল হ'ল রামমোহন লাইব্রেরিতে। সেখানে শান্তিনিকেতনের দল গান গাইতে এলেন দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায়। সেসময় আমি এম এস সি পড়ি—বাদুড়বাগান লেনের মেসে থাকি কাছাকাছি—সারাদিন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে—কোনমতে গা ঢাকা দিয়ে সেই বর্ষামঙ্গলে একরকম জোর করে ঢুকলাম—সব গানগুলি শিখতে চেষ্টা করাম—বই কিনলাম। তারপরে যখন সভা ভাঙল, তখন যখন বেরিয়ে এলাম তখন রবীন্দ্রনাথ মটরগাড়িতে উঠছেন—ভীড়

ঠেলে মরণপণ করে, ভীড় ঠেলে গিয়ে ফুটবোর্ডে উঠে ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম তিনি একটু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, একটু আশীর্বাদ করলেন যেন। এই তাকে স্পর্শ করলাম আমি প্রথম। প্রথম স্পর্শ করলাম এইদিন। সেদিনের মত ভরপুর হয়ে আমি হস্টেলে ফিরে গেলাম।

অ আচ্ছা শৈলজাদা, তারপরে আপনি তো আস্তে আস্তে রসায়নশাস্ত্রে এম এস সি পাশ করলেন, তারপর আপনার বাবা ছিলেন তো ডাকসাইটে উকিল। তাঁর ইচ্ছে মতন ওকালতিও পাশ করলেন। কিন্তু এই রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা, ওকালতি সব ছেড়ে আপনি এই দুটিকেই অনায়াসে পাশ কাটালেন। চলে গেলেন রবীন্দ্রসংগীতের ভাবরাজ্যে। এটা কি করে ঘটল?

শৈ রবীন্দ্রসংগীতই ছিল যেন আমার বীজমন্ত্র। আমার লেখাপড়ার দিকে মন ছিল না তা নয় কিন্তু গানে আমার মন একেবারে উদাস করে ফেলত। এইটা নিয়েই আমি জন্মেছিলাম। রবীন্দ্রসংগীত কিম্বা অন্য সংগীতের কথা আমি বলছি না। রবীন্দ্রসংগীতটাকে একটু বেশী বয়সে গিয়ে আমি বেছে নিলাম। কিন্তু আমার ছেলেবয়স থেকে সংগীতের দিকে একটা প্রবণতা ছিল। লেখাপড়ায় আমি কেন জানি না ভাল ছিলাম, আমার সহজেই হয়ে যেত। সেইজন্য আমার অভিভাবকবৃন্দ আমাকে ডাক্তারি পড়াতে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে কিম্বা বিজ্ঞান পড়াতে খুব উৎসাহবোধ করেছিলেন এবং সেইভাবেই ভর্ত্তি করেছিলেন। আমি কর্ত্তব্য করে গেছি, পরীক্ষায় পাশ করে গেছি। কিন্তু গান আমি ছাড়ি নি। সেই সময়, এইসব ঘটনাগুলি যখন নাকি আমি ভাবি চারদিক মিলিয়ে, তখন আমার একটা কথাই মনে হয় যে এইটেই যেন আমার নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল। আমার কপালে এইটাই যেন পূর্বজন্মের লেখা ছিল। না হলে এই যে ঘটনাগুলির সমাবেশ দেখছি সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলে মনে হয়, এসব হবে কেন। সবই রবীন্দ্রসংগীত, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথের দিকে আমাকে এই পাড়াগেঁয়ে ভূতকে টেনে নিয়ে যাবে কেন? কেমিস্ট্রি পরীক্ষায় পাশ করেছি, এর মধ্যে আমার মাতৃবিয়োগ ঘটল। আমার বাবা উকিল ছিলেন, তিনি ওকালতি আর করবেন না। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, তুমি ওকালতি পড়ো, পড়ে পাশ করে আমার চেয়ারে এসে আমার গদীতে এসে বোস। আমার বাবার এত প্রভাব ছিল আমাদের

ওপরে, আমরা না বলতে কিছুতেই পারতাম না। রাতারাতি করে ওকালতি পাশ করে আমি গিয়ে নেত্রকোনাতে তাঁর আসনে বসলাম। ওকালতি করতে, বলতে দ্বিধা নাই, তিনমাস কোনমতে সাজগোজ করলাম বোটে। সেখানে যাবার মুখে আমি একবার কলকাতায় এলাম যে আমার বড়াচূড়া কিনবার জন্য। সে সময় কলকাতায় আমার যে বন্ধু প্রভাত গুপ্ত, তাঁর বাড়িতে গিয়ে, তাঁর ও পরিবারের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শুনলাম যে প্রভাত গুপ্ত শান্তিনিকেতনের Economics-এর প্রোফেসর, তিনি এসেছেন, আমাকে ধরলেন সেই ট্রেনে নিয়ে শান্তিনিকেতন যাবার জন্য আর কি, সে এইরকম ভাবে ঘটনাগুলি। আর যখন নাকি পেয়েছিলাম, M Sc পাশ করে Research Scholar ছিলাম তখন সেখান থেকে ছিনিয়ে আমার বাবা আমাকে ওকালতি পড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন, যখন নাকি ড এইচ কে. সেনের আণ্ডারে Sign Ascetic Condensation সম্বন্ধে আমি রিসার্চ করছিলাম। যখন আমার বস্ ড এইচ কে সেন শুনলেন যে শৈলজা কেমিষ্ট্রি টেমিষ্ট্রি সব ছেড়ে দিয়ে, ওকালতি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেছে, তখন তিনি একটি মন্তব্যই করেছিলেন, 'যেখাকার জল সেখাই গড়িয়েছে, ঠিক জায়গার জল ঠিক জায়গায় গড়িয়ে পড়েছে গিয়ে'। তা সেজন্যই বলছি আমি, এইটাই যেন আমার নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল। স্পষ্ট কিন্তু। এই যে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে এস্রাজ বাজনা—এস্রাজ বাজনাটা—কোথাও কোন যন্ত্রেতে আমি কোনদিন হাত দিই নাই, তা শুধু শুধু এই এস্রাজটা আমি শিখতে গেলাম কি জন্যে, হঠাৎ সেটা আবার কি করে ঘটল? ঘটল মানে ঐ যে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গৌরীপুরের জমিদার—তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। তাঁর বাড়িতে যাওয়া আসা করতাম। তা খোকাবাবু, বীরেন্দ্রকিশোর তিনি এস্রাজ শিখতেন—ওস্তাদ শীতল মুখার্জীর কাছে। তাঁর বাবা ব্রজেন্দ্রকিশোর বসিয়ে দিলেন এস্রাজ হাতে, 'তুইও বসে যা ওর সঙ্গে শিখতে।' সে তাঁর কাছে তামিল নিলাম, তিনি একেবারে যে নাম করা। সেইটা গিয়ে পরবর্তী জীবনে আমার রবীন্দ্রস গীতের অনুষঙ্গ হিসেবে কাজে লেগে গেল, এগুলি আমি খুব জোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে মজা করে গল্প করে শুনিয়েছি। আমি ঠিক বলতে পারব না আমি কি করে

রবীন্দ্রসংগীতে গেলাম, আমার একমাত্র বক্তব্য যে এইটেই আমার জন্য যেন নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল।

অ. আচ্ছা, শৈলজাদা, সত্যিই আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার সারা জীবনটাই যেন সেই সমুদ্রের কাছে পৌঁছোবার জন্যই সব কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল। যখন গুরুদেবের কাছে প্রথম গেলেন, প্রথম তাঁর পাশে বসে তাঁর স্নেহ পেলেন, গান শিখতে আরম্ভ করলেন, আপনার কি মনে পড়ে কোন্ গানটি প্রথম শিখিয়েছিলেন তিনি আপনাকে?

শৈ তার আগে আমি একটু বলতে ইচ্ছে করি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দিলাম তখনই কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল। আমরা এক পরিবারের, এক আশ্রমের বাসী হলাম, তখনকার রীতি ছিল যে, যে বিভাগের কর্ম্মী আর কি, সেই বিভাগীয় অধ্যক্ষ নতুন কর্ম্মীকে নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তা আমাকে তদানীন্তন আমার কলেজের অধ্যক্ষ নেপাল রায় আমাকে নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে যাচ্ছেন। তা আমি এটা বলে নি আগে। যে কলকাতায় আমি যখন ছিলাম, চাকরি নেবার আগে ল' পড়তাম যখন তখন আমি সৌম্যবাবুর দলে গান করতাম ঠাকুরবাড়িতে। সেই সময় পাগলাঝোরা একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের নিজের উপস্থিত থাকার কথা ছিল শান্তিনিকেতন থেকে এসে। তিনি কয়েকদিন আগে এসেও ছিলেন কিন্তু এসে থাকতে পারেন নি, কাজের তাড়ায় আবার ফিরে যেতে হয়েছিল, এই যে দু-একদিন থেকে গিয়েছিলেন তার মধ্যেই আমাদের পাগলাঝোরার দলকে তিনটি গান উনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

এ তিনটি হচ্ছে 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে' 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে,' 'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি'—এই তিনটি গান তিনি খুটু দি—দুজনে অনেকক্ষণ ধরে গেয়ে গেয়ে আমাদের গানের দলকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। একথাটা বললাম এই জন্য যে এখন এই জিনিসটার আমার দরকার হবে, আমি যখন গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেলাম তখন আমার রাস্তায় খালি মনে হ'ল যে সেই যে কলকাতাতে ওঁর সামনে বসে গান শিখেছিলাম যদি তিনি মনে করতে পারতেন যে আমি তাঁর গান করি কোনমতে তাঁর মনে হয়

তাহলে আমি ধন্য হব, আবার মনে হ'ল এ তো বামনের চাঁদের আশা। এতো বড়লোকের এতো একটা সাধারণ লোকের কথা মনে পড়বে কি। হ'ল কিন্তু তাই। আমি গিয়ে তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম, নেপালবাবু বললেন, এই আমাদের রসায়নের অধ্যাপক এসেছেন, শৈলজারঞ্জন মজুমদার আপনার সঙ্গে পরিচয় করাতে এনেছি। তা আমি পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মুখ তুলছি ওপরের দিকে, বলছেন, 'দেখি দেখি, তোমাকে তো আমি চিনি, তুমি তো আমার গান করো।' আমি বললাম 'হ্যাঁ, আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে। গানের টানেই আমি এসেছি।' 'হ্যাঁ, ও তুমি আমার গানের টানেই এসেছো, তুমি এখানে থাকো।' এই করেই কিন্তু প্রথম দিন একটা, কিরকম একটা বাণী প্রকাশ করলেন, তুমি এখানেই থাকো, তুমি আমার গান করো। সেদিনে আমি খুব খুশি হয়ে ফিরে গেলাম। সেদিনই সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। তার কিছুদিন পরে আবার সাপ্তাহিক একটা উৎসব—অনুষ্ঠানে বর্ষার স গীত দিয়ে একটা অনুষ্ঠান হল, নুটুদি সেটা পরিচালনা করিয়েছিলেন। তাতে দিনুদা আমাকে একটা একলা গান করিয়েছিলেন—'গগনে গগনে আপনার মনে' গানটি করিয়েছিলেন। পরের দিনে সকাল বেলা যখন লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে নুটুদির দেখা, নুটুদি হাসিমুখে বললেন, 'শৈলজাবাবু আপনি মেরে দিয়েছেন।' 'কেন কি হয়েছে?' 'আপনার গান গুরুদেবের খুব ভাল লেগেছে'। সেই দেখেই মনে হয় আমি যে ওখানে গেছি, আমাকে ওঁর ভাল লেগেছে, আমি তো ভালই বেসেছি—এ যেন আমাদের দুজনের যোগাযোগ যে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এর থেকেই আমি খানিকটা প্রমাণ এর আভাস পেয়েছিলাম।

অ. আচ্ছা আপনার কাছেই শুনেছি শৈলজাদা, কয়েকটি বিশেষ গানের ওপর গুরুদেবের নিজেরই মমতা ছিল, নিজেরই লেখার ওপরে।

শৈ না, তার পরেতে যখন দুবছর পরে দিনেন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় গিয়ে দেহ রাখলেন তখন আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গানটান কেমন চলছে।' তা আমি বললাম, 'আমার গানটান তো আর চলছে না, দিনুদাই চলে গেছেন, আমি তো আর কারো কাছে' 'না,' তুমি তো গানের টানেই আমার এখানে এসেছ তুমি আমার কাছে

এসো। আমি তোমাদের গান শেখাব।' প্রতিদিন বেলা তিনটের সময় গীত-বিতানটা নিয়ে তাঁর কাছে যেতাম। আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন সে তখন আমাকে প্রথম

অ. প্রথম কোন গানটি .

শৈ প্রথম গানটি 'মায়ার খেলার' প্রথম গানটি 'পথহারা তুমি পথিক যেন গো' এ গানটি আমায় প্রথম শিখিয়েছিলেন। তারপরে রোজ গান শিখিয়ে যেতেন নানারকম। মজার গল্প বলতেন, তা কিছুদিন পরে আবার বললেন, 'তুমি ছোটদের একটা ক্লাস নাও'। আমি একবারে জিভ কেটে লজ্জায় পালিয়ে যেতাম। যে নিজে কিছু জানি না, বিদ্যা বুদ্ধি নাই, আঙাল বাঙাল মানুষ উচ্চারণ ঠিক নাই আমাকে আবার ক্লাস নিতে বলছেন। তা উনি বললেন যে 'এমন করছ কেন, তোমার শিক্ষা নিজের শিক্ষা, দেখাতে দেখাতে গিয়ে পাকা হবে। তুমি লেগে যাও।' তারপর আমাকে শিশুদের একটা ক্লাস দিলেন। 'হ্যাদে গো নন্দরানী' টা শিখিয়ে দিলেন। একদিন আমাকে বললেন যে তোমার জন্য আমি একটা খুব ভাল গান ঠিক করে রেখেছি। তুমি যত্ন করে শিখে নাও' আমি খুব যত্ন করে শিখতেই বসলাম, খুব ধারে খুব পাশে গিয়ে বসে শিখলাম। 'ওলো সই ওলো সই' বললে আমি আপত্তি করলাম, 'ওলো সই ওলো সই গান আমি শিখব না, আপনি মেয়েদের শিখিয়ে দিন, ও মেয়েদের গান' বললেন, না না না, শুনে ছ্যাগো না, ওটা ছেলেমেয়ে-না, কিছু না, এমনিই ভাল। সকলের জন্যই ভাল।' তার পরে এমন জোর করে গেয়ে আমার কান ফাটিয়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন। আমি পাগলের মত ভালবেসে গানটাকে শিখে নিয়ে গেলাম, এই সমস্ত ঘটনাগুলি আমার এখন মনে পড়ছে।

অ শৈলজাদা, এমন একটা গান আপনার কাছেই শুনেছিলাম যে গুরুদেব ভীষণ পছন্দ করতেন 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'।

শৈ হ্যাঁ, এ গানটি তো পছন্দ করতেন মানে এ গানটি উচ্চারণ করলেই গাইতে আরম্ভ করতেন। একদিন একটা অনুষ্ঠানে এমনি হয়েছিল যে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা কতগুলি আইটেম সংগ্রহ করেছিলাম যেমন দিনুদা গান দিয়েছেন, গুরুদেব আবৃত্তি দিয়েছেন, অমুকে প্রবন্ধ দিয়েছে, গুরুদেব শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষের কণ্ঠে এ গানটি শিখিয়ে তিনি সভার জন্য পাঠিয়েছিলেন—মরি

লো মরি। যথারীতি সময়ে গানটি ইন্দুলেখা দেবী সভায় ষ্টেজে বসে গান করতে আরম্ভ করলেন—উনি সামনে বসে শ্রোতা হিসেবে। তাঁর গানের অর্ধেকটি হ'ল তখন তিনি ঐ শ্রোতাদের ভিতর থেকে চিৎকার করে গাইতে আরম্ভ করলেন। রবীন্দ্রনাথ ইন্দুলেখাদেবীর সঙ্গে সঙ্গেই গাইতে আরম্ভ করলেন। ইন্দুলেখা দেবী অনন্যোপায় হয়ে লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন—শেষকালে শেষ অর্ধেকটা রবীন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে শেষ করে দিলেন। এরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল। যখন গানটির নাম করা যেত তখনই তিনি গুন গুন গুন গুন করে চোখ বুঁজে একেবারে মশ্‌গুল হয়ে গানটি গাইতেন। আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যে শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর আর অজিন ঠাকুর—এঁরা শান্তিনিকেতনে তখন বাস করছিলেন। তা অমিতা ঠাকুর একমাসের জন্য কলকাতায় আসবেন কোন একটা কাজে। তখন তাঁকে আমি বলেছিলাম যে শ্রীমতি অমিতা ঠাকুরের কণ্ঠে 'মরি লো মরি' গানটি খুব জনপ্রিয় হ'তো শুনেছি, আমরা যখন কলেজ স্টুডেন্ট ছিলাম। আমাকে গুরুদেব ঐ গানটা শিখিয়েছেন আমার খুব ভাল লেগেছে—আপনি—কৌতূহলবশতঃ আমি ওঁকে বলেছিলাম যে—আপনি একমাসের মধ্যে কোন সময়ে গিয়ে—আপনারা পাশাপাশি তো থাকেন—ওঁর কণ্ঠের থেকে এই গানটির সুরটি তুলে আনবেন না।' তা উনি সেটা নিয়ে গেলেন। মাস কাল প্রায় উত্তীর্ণ হয় সে সময় আমি আর একটা—সেটা মনে করিয়ে, মনে জাগিয়ে দেবার জন্য আবার চিঠি লিখলাম একটা। সেই চিঠির ব্যাপারটা কি করে গুরুদেবের কানে গেল আর কি। গুরুদেব কলকাতা হয়ে যখন শান্তিনিকেতন ফিরে আসছেন তখন এইটা ওর কানে গেল। তা তখন উনি শান্তিনিকেতন ফিরে এলেন, আমরা প্রণাম করতে গেছি—খুব গম্ভীর চেহারা—খুব চটে গিয়ে বলছেন, 'তুমি কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াও,' 'কেন বলছেন আপনি? আপনি তো কলকাতা থেকে এলেন আমি তো কলকাতা যাই নি আমি তো এখানেই ছিলাম।' 'না, তুমি নাকি অমিতাকে চিঠি লিখেছ যে আমার মরি লো মরি গানটির জন্য।' আমি বললাম হ্যাঁ, চিঠি লিখেছি তো। চিঠি লিখছি ঐ গানটা খুব সুখ্যাতি সেজন্য কৌতূহলবশতঃ খালি বলেছি যে ঐটা একটু সুরে গলায় তুলে আনতে।' 'না, না, তুমি কক্ষনো করবে না—তুমি বলে দিও বাংলাদেশকে যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছাড়া

আর কেউ এই গান শেখাতে পারে না। এ গান তিনি নিজে তোমাকে শিখিয়েছেন, তুমি অলি গলিতে ঘুরবে না। এ গান তুমি সে ভাবে গাইবে এবং সেইভাবে শেখাবে।' সেই এই গানটি। এই গানটির জন্য ওঁর মন এত নরম ছিল যে এ গানটি শুনলেই গাইতেন এবং এখন আরও বলতে ইচ্ছে করে যে সেই সুরের থেকে যখন অন্যরকম শুনি তখন আমার একটু মনে লাগে বৈকি।

অ শৈলজাদা, তাহলে এই গানটা একটু শুনতে ইচ্ছে করছে আপনার কাছে—

শৈ আমার তো সেই বয়স নেই এখন। তা আমার কিছুদিন আগে দিল্লীতে আমার এক পরিবারে ওরা জোর করে আমার কতগুলি রেকর্ড করে রেখেছিল, টেপ করে রেখেছিল। তার থেকে যদি কোনরকমে উদ্ধার করে শোনানো যায় তাহলেই কাজ হবে, নাহলে

অ না, সেটা আমরা

শৈ আমার তো গান শুনিয়ে অভ্যাস নেই, গান শিখিয়ে অভ্যাস কেবল।

অ না, সে গানটি আমরা ব্যবস্থা করেছি। আচ্ছা শ্রোতাদের আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে ঐ গানটি শোনোচ্ছি।

শৈ কি জানি ভাল লাগবে কিনা জানি না। গান [গানটি শৈলজারঞ্জন গেয়েছিলেন আগেই। টেপ বাজিয়ে শোনান হল]

অ. ভারি সুন্দর হয়েছে গানটি আপনার শৈলজাদা, আপনার এত বয়সেও যে কি করে এরকম একটি কঠিন গান আপনি আমাদের উপহার দিলেন, সত্যি ভাবতে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। ভবিষ্যৎকাল আপনাকে গায়ক হিসেবেও নিশ্চয়ই মনে রাখবে। এখানে আর দু একটা কথা একটু বলি— আমাদের সময় তো আর নেই বেশী—স্বরলিপি সম্বন্ধে। আপনি তো স্বরলিপিকার হিসেবে সকলেরই শ্রদ্ধেয়। তা এই যে, রবীন্দ্রনাথের এক একটা গানের আমরা দুটো স্বরলিপি পেয়েছি। কিছু কিছু গানের এমনও বা হয়েছে স্বরলিপি একভাবে প্রকাশিত হয়েছে কোন গানের, আবার রেকর্ডে আমরা নামকরা শিল্পীদের একটু অন্যরকমভাবে শুনেছি। তা এসব সমস্যা যাঁরা নবীন শিল্পী তাঁদের কাছে কিভাবে এগুলো দেবেন—তাঁরা কোন্ রাস্তায় চলবেন? তাঁরা কোন্‌টাকে ঠিকমত গ্রহণ করবেন। আপনার কাছে এজন্য এইটুকু আমাদের জিজ্ঞাস্য।

শৈ এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর বাইরের থেকে নেওয়ার চেয়ে নিজের ভেতর থেকে উত্তর নেওয়াই ভাল আর কি, এটা বুদ্ধি বিচার দিয়ে করা ভাল। সবচেয়ে ভাল হোত রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি স্বরলিপিকার হতেন তাঁর নিজের গানের। মূল কথা হচ্ছে সেটাই, অন্যেরা যখন স্বরলিপি করেছেন তখন একটু হাত বদল হয়েছে—প্রথমে স্বরলিপিকার হিসেবে একটু হাত বদল হয়েছে—আমি কথাটা বলছি এজন্য—আমি অনেকগুলি গানের স্বরলিপি করেছি এবং আমি যে স্বরলিপিতে বামকে বহিম করেছি কিনা কিম্বা অন্য কিছু করেছি কিনা, সেটা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোন পুলিশ বসান নি। আমি সেটাও ছাপিয়ে বিশ্বভারতীতে publish করেছি। তা আমার মত কেউ করছেন কি না, কিন্তু সেটা জানতে অজানতে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটুকুর ভয় বিপদ ছিল না যদি নিজেই তিনি স্বরলিপিকার হতেন। সেইজন্য আমি এখন সবচেয়ে প্রামাণ্য স্বরলিপি মনে করি যেগুলি রবীন্দ্রযুগে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোনরকম প্রশ্ন দাঁড়ায় নি এবং সেইগুলিই প্রাধান্য পাবে এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেগুলি রেকর্ড হয়েছে, সেগুলিই কিম্বা সেই তৎকালীন সমস্ত স্বরলিপি ব্যবহার হয়েছে কোন প্রশ্ন উঠে নাই, এখন এমন সব প্রশ্ন, এমন সব স্বরলিপি পরবর্তী edition এ বেরিয়েছে যেগুলি রবীন্দ্রযুগের পরকালে ব্যবহৃত। কিন্তু সেগুলি পরজন্মের মনে হয়। আমি নিজের দুটো জন্ম আলাদা করে ফেলেছি, আমি নিজে কখনো modern এই দিকের গানের সুরের ব্যবহার পছন্দ করি না, আমি রবীন্দ্রনাথ যেটা শুনে গেছেন, তাঁর টেবিলে যে গানের বইয়ের স্বরলিপিগুলি গড়াগড়ি করত সেই স্বরলিপিগুলিই উনি ব্যবহার করেছেন, আপত্তি করেন নাই, মন্তব্য করেন নাই সেগুলিই ব্যবহার করি। যেমন 'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী' আমি যেখানেই সেই মূল গানটি করাচ্ছি—সকলেই কিরকম বলেন—ভুল গাইছে ভুল গাইছে। এই যে একটা কথা আছে না—দশচক্রে ভগবান্ ভূত।—আর রেকর্ডের কথা তো আলাদা—ওটা তো একটা পণ্যদ্রব্য—ওটার মধ্যে তো জবড়জং বাজনাটাজনা দিয়ে তাকে এটা ওটা করে জনপ্রিয় করার জন্য আর তাদের বিক্রী বাড়াবার জন্য তাদের করতেই হয়, দোকানদারি তো। ওটার সঙ্গে বই কিম্বা গ্রন্থাগার যদিও ছাপ একই—বইয়ের ওপর ছাপ থাকে, রেকর্ডের ওপরে ছাপ

থাকে কিন্তু দুটোকেই আমি সমান মূল্য দিই না। মোট কথা হচ্ছে আমি নিজের একটা conscience খাটাই, যে বিচারবুদ্ধিতে খাটিয়ে যেটাকে উচিত মনে করি সেটাই করি—কোন এক সাধারণ নিয়ম আমি বলতে পারব না। আমি সেটা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি যে রবীন্দ্রনাথ থাকতে যেসব স্বরলিপি ব্যবহার করেছেন, আটপৌরে স্বরলিপি, সেসব স্বরলিপির যদি কোন ব্যতিক্রম হয়, তা সেই ব্যতিক্রমগুলি আমি এখনও করি না, আমি সেগুলি করি রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ কিম্বা বেশী কাছাকাছি স্বরলিপি যেগুলি আছে, উৎসের কাছে যে সুর আছে সেটাই বেশী প্রাধান্য দিই। সে আমি কারও নাম করতে চাই না, কিন্তু আমি কিছু কিছু জানি এইরকম যে কোন কোন স্বরলিপিকার নিজের সুরটা ঢুকিয়ে দেবার জন্য চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু আমি কিন্তু সেটাও আপত্তি করি নি। আমি বলেছি, অন্য স্বরলিপিকারের সুরটা ঢুকিয়ে দিন না, কিন্তু সেটা সুরান্তর হিসেবে দিন। যেটা অধুনা প্রচলিত সুর, সেটাকে তুলে দিয়ে, উৎক্ষিপ্ত করে—তার জায়গায় সেটাকেই একমাত্র সুর করে দেবেন, সে কিছুতেই হয় না। এই নিয়ে আমার সঙ্গে খুব মন কষাকষি হয়েছে কিন্তু সেটা বিশ্বভারতী রক্ষা করেন নি কিন্তু, সেসব জায়গায় আমার এখনও আপত্তি, সেজন্য আমি প্রথমেই বলেছি যে এইটার সোজা উত্তর আমি দিতে পারব না কিছু। আমার উত্তর হচ্ছে আমার নিজের conscience এবং নিজের শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা, প্রীতি রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আনুগত্য, এই দিয়ে আমি বিচার করে যেটা বলি সেটাই বলতে আমি চেষ্টা করলাম।

অ ঠিকই বলেছেন শৈলজাদা, কেননা এই বিষয়টাতো খুবই জটিল। তবুও আপনি যা বলবেন তা আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা সেটা শুনে নেব। আচ্ছা এখন আবার আর একটা অন্য জিনিষে আসি, আপনি তো এস্রাজ বাজিয়ে গান শিখেছেন চিরকাল এবং নিজে অত্যন্ত ভাল এস্রাজ বাজাতেনও। কাজেই আপনার কাছ থেকে একটু এস্রাজ বাজনা আমরা শুনতে চাই। আশা করি আপনি আমাদের নিরাশ করবেন না।

শৈ এস্রাজ তো আমি ঠিক ক্ল্যাসিকাল এস্রাজ বাজিয়ে নই। রবীন্দ্রসংগীতকে অনুসরণ করেই করি আর কি। সেরকমভাবে কিছু যদি চলে তাহলে

সেটা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমার বয়স এখন হয়ে গেছে তো, তবে রবীন্দ্রসংগীতেব ঢঙ্টা আসবে হয়তো এই আর কি।

অ. না, ঐ গানটা আমরা আপনার কাছে শুনেছিলাম একবার, 'রোদন-ভরা এ বসন্ত', সেটাই আমবা শুনতে চাইছি।

শৈ 'রোদনভরা এ বসন্ত' গানটা সেটাই আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি।

[শৈলজাবঞ্জন গানটি এস্রাজে বাজিয়ে শোনালেন]

অ. আব, শেষে, আব একটাই প্রশ্ন, আর সময় অনেক নেব না, আমাদের সময় হযেই গেছে। শিল্পীরা খুব সোজা সোজা গানেও আজকাল দেখতে পাই খুব একটা অলঙ্করণেব কাজ করেন, কোথাও কোথাও অতিরিক্ত ভাবের আবেগ এসে পড়ে, আবার যেখানে সেখানে টপ্পাও ব্যবহার করেন। এগুলো সম্বন্ধে আপনার একটু মতামত চাই কেননা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে খুব সহজ পথের পথিক ছিলেন, সংযমেব কথাটা বাববাব উনি বলে গিযেছেন। কাজেই অতিবিক্ত অলঙ্কার বাহুল্য কি রবীন্দ্রনাথেব গানকে পীড়িত করে না?

শৈ. রবীন্দ্রনাথ বরাববই বলেছেন, কলা-কৌশলই হচ্ছে কলার শত্রু, সেজন্য ওঁর গান হচ্ছে বাণীপ্রধান, কাব্যশৈলী, তার সঙ্গে, এব সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুষঙ্গ কথাটা আনব, এই যে নানারকম পাঁচমিশেলি যন্ত্রেব সমাহাব হচ্ছে তাতে একে জডাখিচুড়ি কবে ফেলেছে আব কি, তেমনি কণ্ঠ যখন নাকি কাঁপে কিম্বা কণ্ঠেব intricacies কিম্বা নানাবকম কারুকার্য বেশী ঢোকে আব কি, তখন কথাগুলি নাড়া খেয়ে যায়, যেমন স্থির জলেব উপবে চাঁদেব প্রতিবিম্ব পড়ে, যে জন্য সমগ্র সৃষ্টিটা ব্যাহত হয়। আব টপ্পাব ঐ যে গলা কাঁপানো, যে ধ্রুপদাঙ্গেব গান যে সোজা সোজা ঢালা সুবেব কথাগুলি পরিষ্কাব খুব বড বড় কথাগুলি সুন্দব সুবের পরিষ্কাব স্পষ্ট কথা—যেমন ঠুংরি, ঠুংরিতে স্বরকম্পন—কারুকার্যতে কথাগুলি ঘুরে বেড়ায় বেশী পাক খায়, মোচড় খায় বেশী। সেজন্য রবীন্দ্রসংগীতে, যেহেতু এটা বাণীপ্রধান, তাতে সোজা সোজা কণ্ঠস্বর যদ্দুব সম্ভব রেখে যদি সেটাকে গাওয়া যায় সুরটাকে বযে নিয়ে যায তাহলে তার ওপরে কথাটা ভাসবে ভাল আর কি, নাহলে নাডা খেযে যাবে আর কি। সেজন্য আমাব মনে হয়, সংযমী হওয়া দরকাব আর টপ্পার অলঙ্করণ, বেশী অলঙ্করণ-কবা তো লোকের একটা সংযমের অভাব থেকেই। যে

যত বেশী সাজে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় ঠাট্টা করে বলতেন, যে মানুষ দেহটাকে সাজায়, দেহটাকে দোকান করেছি যে, সেজন্য যার গলায় যত কণ্ঠস্বরের কায়দা আছে সেগুলি দেখিয়ে দেবে এক গানেই, সবরকম display করিয়ে দেবে। যেসব আজকাল হয়েছে, টপ্পা গান নিয়ে একটা ম্যানিয়া হয়েছে, যেখানে সেখানে টপ্পার জনপ্রিয়তার জন্য যেমন, 'তুমি কিছু দিয়ে যাও।' 'ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,' অংশটির ব্যাখ্যা। আর্টের সবচেয়ে বড় কথা সংযম। রবীন্দ্রসংগীতে সংযমটি খুব দরকার। সেখানে কিন্তু যিনি গান গাইবেন—তাঁর সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত, সেটা কে কতটুকু রাখতে পারবে। সেটা তাঁর নিজের ওপরে, শিক্ষা দীক্ষা স্বভাবচরিত্রের ওপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আর কিছু বলতে পারি না।

অ ঠিক কথাই বলছেন শৈলজাদা, আমার মনে হয়, ভবিষ্যৎকালের শিল্পীরা যদি আপনার নির্দেশ মেনে চলেন তাহলে রবীন্দ্রসংগীত আমরা আরও সুন্দর ভাবে শুনতে পাব। শুধু আজ শেষ করবার আগে আপনার আর একটি গান আমাদের শুনতে ইচ্ছে ছিল—যে গানটি সম্পর্কে আপনি অনেক সময় বলেছেন—'আমার যেতে সরে না মন'—সে গানটি কিন্তু আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা বাজাব।

শৈ গানটি রচনার একটা মজার ঘটনা আছে। সেটা একটু বলে নিচ্ছি। গরমের ছুটির পর আমরা সব জড়ো হয়েছি শান্তিনিকেতনে, গুরুদেব তখন শ্রীনিকেতনে গিয়ে বসে আছেন, শান্তিনিকেতনে ফেরেন নি। সকলেই গিয়ে শ্রীনিকেতনে প্রণাম করে গেছেন, আমি কিন্তু যাই নি।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছেন, আপনি গেলেন না প্রণাম করতে? না, আমরা অত দূর থেকে এসেছি, আর উনি এত কাছে আছেন, উনি আসুন তারপর প্রণাম করব। সেসময় বায়না ধরলাম যাব না ওখানে, তারপর অনিলবাবু ছিলেন, অজিন ঠাকুর, তাঁর একটা মটরগাড়ি ছিল, যে-গাড়িটাতে চেপে আমরা মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম। একদিন ওর মধ্যে হঠাৎ কিরকম করে জোর করে নিয়ে ওখানে ফেলে দিলেন আমাকে। তা গেলাম যখন সেখান পর্যন্ত তখন তাঁর সঙ্গে দেখা না করে ফিরে আসি কি করে। তখন তাঁর

সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করলাম। কিছুই বলি নি কিন্তু। 'যেতে সবে না মন' এ গানটি তক্ষুনি লিখে আমায় শিখিয়ে দিলেন এ গানটি।

অ আচ্ছা শৈলজাদা, আপনাকে আজ খুব কষ্ট দিলুম। আমাদের এই আকাশবাণীর অনুষ্ঠানটিতে আপনি যে দয়া করে এসেছেন, এর জন্য আপনাকে সবাই আমরা খুব আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।

অনুলেখন অনুপ মতিলাল

সূত্র·

১. সুটুদি রমা কর সুরেন করের স্ত্রী।

২ অনিল অনিলকুমার চন্দ, বিশ্বভারতীর কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

৩ অমিয়া ঠাকুর অমিতা ঠাকুর· ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার· কলকাতা আকাশবাণীর তৎকালীন সহ-অধিকর্তা শ্রীকিরণশংকর মৈত্রের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং শ্রীসুনীত চট্টোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে শৈলজারঞ্জনের আশি-ঊর্ধ্ব বয়সেও এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

· অরুণ ভট্টাচার্য

শৈলজারঞ্জনের কাছে বাঙ্গালীর ঋণের শেষ নেই

একটি সংকলন

নেত্রকোণায় আমার সৃষ্টির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ আমাকে রূপ দিয়ে আমার স্মৃতির যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কবির পক্ষে সেই অভিনন্দন আরো অনেক বেশী সত্য। তুমি না থাকলে এত উপকরণ সংগ্রহ করত কে?

• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিদাদামশায়ের গান শিক্ষা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রচার ও শিক্ষাদান সব মিলিয়ে তাঁর (শৈলজা বাবুর) যে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় পেয়েছি তার জন্য আমি তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি। শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ অনেককেই আবিষ্কার করেছেন--শৈলজারঞ্জন তাঁদের অন্যতম। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের সুর-তালাদি আয়ত্ত করেন এবং যক্ষের ধনের মতো আগ্‌লিয়ে না রেখে প্রচার করেন একে একে। রবীন্দ্রনাথের কত গানের যে তিনি স্বরলিপিকার, সে কথা আজ রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীদের অবিদিত নয়। বহু রবীন্দ্রসংগীতের সুর তাল লুপ্ত হয়ে যেত, যদি না শৈলজারঞ্জন তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি বলে সেসব ধারণ করে রাখতেন। : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীতকে শৈলজারঞ্জন তাঁর জীবনে সাধনার বস্তুরূপে নিয়েছেন। কোন সাধনার পথই কুসুমাস্তীর্ণ ও সহজগম্য হয় না। অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের বজ্রক্ষরণে অবশ্যই তাঁকে সাধনার পথকে বিধৌত ও বিশুদ্ধ করে চলতে হয়েছে, অনেক বাধা বিঘ্ন ও প্রলোভনকে দমন করে একনিষ্ঠ তপস্যায় তাকে অভ্যস্ত হতে হয়েছে, তবেই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা সিদ্ধির অর্গলকে মুক্ত করতে পেরেছে। বলতে পারি রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর সাধনা আজ সিদ্ধির পরিণতিতে পৌঁছেছে।

: শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

শৈলজাদা ভাগ্যবান। অগণিত ছাত্রছাত্রীদের, অনুরাগী বন্ধু ও সতীর্থদের স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, আজও পাচ্ছেন। তিনি দিয়েছেন

বিস্তর, পেয়েছেন এবং পাচ্ছেনও বিস্তর। তার চেয়েও বড়ো কথা, শৈলজাদা বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে, আর যে অগণিত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি লিখন তিনি করেছেন সেই লিখনের মালায়। আমৃত্যু শৈলজা-দা সুস্থ থাকুন, নীরোগ থাকুন, তাঁর কণ্ঠে, তাঁর এস্‌রাজের তারে জেগে থাকুক রবীন্দ্রনাথের গান, এই প্রার্থনা করি। শ্রী নীহাররঞ্জন রায়

শৈলজাবাবু সেই অনন্য প্রকৃতির মানুষ, অনন্য বলেই নিঃসঙ্গ। তিনি একলা পথের মানুষ। তাঁর অনুচর (শিষ্য শিষ্যা) যদি বা আছে, সহচর নেই। আজকের দিনে যে গুণটির একান্ত অভাব শৈলজাবাবু সেই বিরল গুণের অধিকারী। সে গুণটি হল নিষ্ঠা। নিষ্ঠাবান মানুষের মন একস্থানে নিবদ্ধ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

একদিন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে শৈলজাদা যে-রসতীর্থের পথে যাত্রা করেছিলেন সে পথে তিনি অনেককে টেনে এনেছেন। তাঁদের অনেকের কণ্ঠের গান আছে। কিন্তু যাঁদের কণ্ঠে গান নেই অথচ কানে রবীন্দ্রসংগীতের তৃষ্ণা আছে, তাঁদেরও অনেককে শৈলজাদা এপথে আসতে প্রলুব্ধ করেছেন।

অমিয়কুমার সেন

রবীন্দ্রসংগীতে গায়কীর যথার্থ ঘরানা তাকেই বলব যা রবীন্দ্রনাথের ঈপ্সিত গীত-রীতির এবং তাঁর উন্নত ও মার্জিত শিল্পরুচির স্বাক্ষর বহন করে। এই বিচারে একবাক্যে স্বীকার করব যে শৈলজাদা সেই অভিজাত ঘরানার প্রবর্তক, ধারক ও বাহক। শ্রীসুবিনয় রায়

শ্রদ্ধেয় শৈলজাদা সম্পর্কে কিছু লেখা আমার পক্ষে কঠিন। কেননা তাঁর কথা ভাবতে বা লিখতে গেলে চিন্তা ভাবনা আবেগ অনুভূতি এত ভীড় করে আসে যে কী লিখব কী লিখব না, কোনটা আগে লিখব কোনটা পরে তা স্থির করতে পারি না। তিনি আমার এতই কাছের মানুষ যে তাঁর কথা নিয়ে বাক্য রচনা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই, বলতে গেলে জ্ঞান হবার পর থেকেই তাঁকে দেখেছি আমাদের পরিবারেরই একজন হিসেবে। নিজের বাবার থেকে তাঁকে কখনও আলাদা বলে ভাবতে হয় নি,

ভাবতে শিখি নি। · আমি আজ শিল্পী হিসেবে যতটুকুই স্বীকৃতি পাচ্ছি তার মূলে আছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ এবং শৈলজাদার প্রেরণা ও পরিচালনা—এই কথা আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে আছে প্রথম প্রভাতে শংকিতচিত্তে যখন সংগীতভবনে এলাম তখন প্রথমেই যাঁর স্মিত হাসি আমার ভয় দ্বিধা ঘুচিয়ে দিল তিনিই শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার—আমাদের শৈলজাদা। সংগীতভবনের তখন তিনি অধ্যক্ষ। বাড়ীর স্নেহচ্ছায়া ছেড়ে প্রথম হস্টেলে এলে আমার বয়সী ছেলে-মেয়েদের মানসিক অবস্থা কেমন হয় তা তিনি তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সহজ সরল ব্যবহারে নিজেকে আমার বয়সে নিয়ে এসে এক মুহূর্তের মধ্যে তিনি এক বন্ধুত্বের আবহাওয়া গড়ে তুললেন। প্রাণখোলা হাসি আর ছোটো ছোটো হাল্কা গল্পে তিনি এক জমাট আসর বসিয়ে ছিলেন। সেই একটি ঘটনাতে আমার পারিপার্শ্বিক—আমার বোকচ্ছমান মানসিক অবস্থার রূপান্তর ঘটল। কিন্তু কাজের সময় তিনি যেমনই নিয়মানুগ তেমনই কঠিন। শৈলজাদা 'রাগ করবেন', এই চিন্তাটি সব সময়ে মনের মধ্যে সজাগ থাকত। শিক্ষকতা করতে বসে আজ বুঝি এটি কতবড় গুণ। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, গায়ে কল্লিদার পানজাবী, গলায় চাদর, হাতে মন্দিরা। শৈলজাদার এই ছবিই আমার চোখে বেশি ভাসে। হাতে মন্দিরা, তার কারণ ছবিটা শান্তিনিকেতনের শ্রাবণ-পূর্ণিমার বা বসন্ত-পূর্ণিমার, বৈতালিকের পুরোভাগে থাকতেন মন্দিরা হাতে শৈলজাদা।

সত্যি কথা বলতে গেলে, শৈলজাদা নিজেই বৈতালিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন দীর্ঘদিন এবং শান্তিনিকেতনের হাটে মাঠে ঘাটে গানের পর গান ছড়িয়েছেন। · বার্ধক্যের ছাপ তাঁর মুখে লেগেছে বটে, কিন্তু ধুতি পানজাবি চাদর চটিতে আমার দেখা সেই ত্রিশ বছর আগেকার তাঁর সেই ছবিটির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। শুধু হাতে সেই মন্দিরাটি নেই। শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

আজ দীর্ঘদিন ধরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে যে দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখতে শিখেছি, সেই দৃষ্টি আমার সমস্ত জীবনকে যদি সুন্দর ও সার্থক করে থাকে তবে এই সার্থকতার মূলে রয়েছে শৈলজাদার অশেষ স্নেহ ও যত্ন। কোনোদিন যদি রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতে কথা ও সুরের উপলব্ধি হঠাৎ আমার মনকে উদ্ভাসিত করেছে সেদিন মনে হয়েছে আমার প্রণাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পায়ে পৌঁছেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটি প্রণামও পৌঁছেছে আমার রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষাগুরু পিতৃকল্প শৈলজাদার পায়ে।

শ্রীমতী নীলিমা সেন।

রবীন্দ্রসংগীতে শৈলজাদার গুরুভাগ্য যেমন প্রসন্ন, তাঁর শিষ্য-শিষ্যাপরম্পরার দিক থেকেও তিনি গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। শান্তিনিকেতনে ও তাঁর বাইরে কত ছাত্রছাত্রী যে রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন তার সব সন্ধান পাওয়াই এক বিরাট ব্যাপার। শিক্ষাব্রতী গুরু এখন গুরুর গুরু—তাঁর অনেক শিষ্য শিষ্যা গুরুর পদে আসীন। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতে তিনি গুরুর গুরু হয়েও আজও শিক্ষাব্রতী—রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর চিন্তা ও মননের অবধি নেই।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্রসংগীত বাঙালীর সবচেয়ে অন্তরতম, অন্তরঙ্গ। এই গানের প্রধানতম ভাণ্ডারী শৈলজারঞ্জনের কাছে বাঙালীর ঋণের শেষ নেই। শৈলজারঞ্জনের সামনে বসে গান গাইতে বুক কেঁপে ওঠে না এমন শিল্পী বাংলাদেশের এপার ওপারে নেই। তার কারণ একটিই। রবীন্দ্রসংগীত বলতে এই গানের যে রুচিপূর্ণ, শুদ্ধতম এবং বিশিষ্ট গায়কীর ধারা, তাকে তিনিই ধরে রেখেছেন শত প্রতি-কূলতার মধ্য দিয়েও। বাঙালীর এই যে 'আপন গান' এর অতন্দ্র প্রহরী শৈলজাদা। একদিন, যেদিন তিনি থাকবেন না, প্রতিটি শিল্পীকে এই নির্মম অথচ শিশুর মত সরল শিক্ষকটির জন্য চোখের জল ফেলতে হবে।

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য

শৈলজারঞ্জন -কৃত রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি

সম্পূর্ণ তালিকা

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির তালিকা

স্বরবিতান ১ (ভাদ্র ১৩৪২)

১। কাছে থেকে দূর রচিল

২। কোন গহন অরণ্যে

৩। মম মন-উপবনে

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (বৈশাখ ১৩৪৩)

সমস্ত গানের স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত।

স্বরবিতান ৩ (বৈশাখ ১৩৪৫)

৪। নীলাঞ্জনছায়া [১]

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (বৈশাখ ১৩৪৫)

এই গ্রন্থের মোট সাতটি গান ছাড়া সমস্ত গানের স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত।

নৃত্যনাট্য শ্যামা (ভাদ্র ১৩৪৬), সম্পাদনা শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

৫। হে বিরহী হায়

স্বরবিতান ৫ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯)

৬। ফাগুনের নবীন আনন্দে

৭। বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

(৪ + ৪ মাত্রা -ছন্দে)

বিসর্জন[২] (চৈত্র ১৩৪৯)

৮। উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে

৯। থাকতে আর তো

১০। আমি একলা চলেছি

১১। ওগো পুরবাসী

১২। আমারে কে নিবি ভাই[৩]

স্বরবিতান ৭ (শ্রাবণ ১৩৫৫)

১৩। আর নাই যে দেরি
১৪। বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
১৫। এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
১৬। এবার তো যৌবনের কাছে

স্ববিতান ৪২ (আশ্বিন ১৩৬২)

১৭। আমি যখন ছিলেম অন্ধ
১৮। প্রভু বলো বলো কবে
১৯। আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
২০। ওগো, পথের সাথি, নমি বার'বার

স্বরবিতান ৪৪ (পৌষ ১৩৬২)

২১। তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
২২। লক্ষ্মী যখন আসবে [৪] (৩ + ৩ মাত্রা -ছন্দে)

স্বরবিতান ৪৬ (পৌষ ১৩৬২)

২৩। এখন আর দেরি নয়

স্বরবিতান ৪৭ (শ্রাবণ ১৩৬৩)

২৪। ওরে নূতন যুগের ভোরে
২৫। চলো যাই চলো

স্ববিতান ৫৩ (ফাল্গুন ১৩৬৪)

২৬। আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণ-রাতি
২৭। আমার যেদিন ভেসে গেছে
২৮। আমি তখন ছিলেম মগন
২৯। আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ
৩০। একদিন চিনে নেবে তারে
৩১। ওগো সাঁওতালি ছেলে
৩২। কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম
৩৩। চিনিলে না আমারে কি
৩৪। ধূসর জীবনের গোধূলিতে

৩৫। নমো নমো শচীচিতরঞ্জন
৩৬। প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে
৩৭। ফিরে ফিরে আমায় মিছে ডাক'
৩৮। ফুরালো ফুরালো এবার
৩৯। বসন্ত সে যায় তো হেসে
৪০। বারতা পেয়েছি মনে মনে
৪১। মুখখানি কর মলিন বিধুর
৪২। মন মোর মেঘের সঙ্গী
৪৩। শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে
৪৪। শ্রাবণের গগনের গায়
৪৫। শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
৪৬। হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে।

স্বরবিতান ৫৫ (ফাল্গুন ১৩৬৪)

৪৭। আমাদের শান্তিনিকেতন
৪৮। একদিন যারা মেরেছিল
৪৯। তোমায় সাজাব যতনে
৫০। নবজীবনের যাত্রাপথে
৫১। প্রেমের মিলনদিনে
৫২। বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ
৫৩। সবারে করি আহ্বান
৫৪। সমুখে শান্তিপারাবার

স্বরবিতান ৫৮ (২৫ বৈশাখ ১৩৬৮)

৫৫। আজি গোধূলিলগনে
৫৬। আজি তোমায় আবার
৫৭। আমার প্রিয়ার ছায়া
৫৮। এসেছিলে তবু আস নাই
৫৯। এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও
৬০। ওগো তুমি পঞ্চদশী

৬১। গোধূলিগগনে মেঘে
৬২। জানি জানি তুমি এসেছ
৬৩। তোমার মনের একটি কথা
৬৪। থামাও রিমিকিঝিমিকি বরিষন
৬৫। পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
৬৬। বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে
৬৭। বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল
৬৮। মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে
৬৯। মেঘছায়ে সজল বায়ে
৭০। মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো
৭১। রিমিকি ঝিমিকি ঝরে
৭২। সঘন গহন রাত্রি
৭৩। স্বপ্নে আমার মনে হল
৭৪। হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে

স্বরবিতান ৫৯ (২৫ বৈশাখ ১৩৭১)

৭৫। আজি ঝরো ঝরো মুখর (২ + ২ মাত্রা -ছন্দে)
৭৬। আজি মেঘ কেটে গেছে
৭৭। আমার আপন গান আমার অগোচরে
৭৮। আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে
৭৯। আমার মন কেমন করে
৮০। আমি আশায় আশায় থাকি
৮১। আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই
৮২। আমি তোমারই মাটির কন্যা
৮৩। আমি যে গান গাই, জানি নে
৮৪। উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে সে
৮৫। এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে
৮৬। ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী
৮৭। তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে

৮৮। দিনান্তবেলায় শেষের ফসল
৮৯। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
৯০। নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে
৯১। নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর
৯২। পিনাকেতে লাগে টঙ্কার
৯৩। প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
৯৪। মম দুঃখের সাধন
৯৫। যদি হায় জীবন পূরণ নাই
৯৬। যারে নিজে তুমি ভাসিয়ে দিলে
৯৭। শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও
৯৮। সখী, তোরা দেখে যা এবার
৯৯। হে নিরুপমা গানে যদি
১০০। আজি ঝরো ঝরো মুখর (২ + ৪ মাত্রা -ছন্দে। সুরান্তর)

স্বরবিতান ৬০ (ফাল্গুন ১৩৭৯)

১০১। অসুন্দরের পরম বেদনায়
১০২। আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়
১০৩। আজি কোন সুরে বাঁধিব
১০৪। আপনহারা মাতোয়ারা
১০৫। আমার যেতে সরে না মন
১০৬। ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
১০৭। ওগো পড়োশিনি, শুনি বনপথে
১০৮। ওরে জাগায়ো না
১০৯। তুমি এ-পার ও-পার কর কে গো
১১০। তুমি যে আমারে চাও
১১১। তোমার হাতের রাখীখানি
১১২। দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে
১১৩। দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
১১৪। বাহিরে হলেম আমি

১১৫। হৃদয়ে হৃদয় আসি

স্বরবিতান ৬১ (অগ্রহায়ণ, ১৩৮২)

১১৬। আর নহে, আর নহে

১১৭। আমার নিখিল ভুবন হারালেম

১১৮। কাছে ছিলে, দূরে গেলে। (পরিশিষ্ট)

১১৯। কোন্ সে ঝড়ের ভুল

১২০। ছি ছি, মরি লাজে

১২১। ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে

১২২। ডেকো না আমারে ডেকো না

১২৩। দুঃখের-যজ্ঞ-অনল জ্বলনে

১২৪। না না, ভুল কোরো না গো

১২৫। যাক্ ছিঁড়ে, যাক্ ছিঁড়ে যাক্

১২৬। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

১২৭। শুভমিলন লগনে বাজুক বাঁশি

১২৮। হায় হতভাগিনী

১২৯। যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরলিপি যা আজও গ্রন্থভুক্ত হয় নি

১ অধরা মাধুরী। বিশ্বভারতী : ১০-১২।১৩৭৪।২৩৮

২ আজি দক্ষিণপবনে। বিশ্বভারতী : ১-৩।১৩৭৪।৩৫৪

৩ আমরা দূর আকাশের। উত্তরসূরী : ১-৩।১৩৬৬।২৬৩

৪ এসেছিনু দ্বারে তব। বিশ্বভারতী : ১০-১২।১৩৭১।২৮০

৫ ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী। বিশ্বভারতী : ১০-১২।১৩৭৬।৩৩৪

৬ নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে। বিশ্বভারতী : ১-৩।১৩৭৮।৪০৬

৭ বাণী মোর নাহি। বিশ্বভারতী : ১০-১২।১৩৭২।২৮৯

৮ সকল-কলুষ-তামস হর। বিশ্বভারতী : ৬।১৩৪৯

সম্পাদিত স্বরলিপি গ্রন্থ :

স্বরবিতান ৩॥ বৈশাখ ১৩৪৫

৪॥ ভাদ্র ১৩৪৬

৫ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

১৮ ॥ ভাদ্র ১৩৪৬

৩০ ॥ ভাদ্র ১৩৪৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

স্ববিতান ৭ ও ১৬ খণ্ড প্রকাশে সম্পাদককে শ্রীশৈলজাবঞ্জন মজুমদার বিশেষ সহাযতা করেন।

এই তালিকা প্রণযনে শ্রীপ্রফুল্লকুমাব দাসেব উপদেশে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

সংকলন স্থভায চৌধুবী

[1] গানটিব দিনেন্দ্রনাথ -কৃত স্ববলিপি স্ববিতান তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংস্ববণে (বৈশাখ ১৩৪৫) মুদ্রিত। গানটিব অপেক্ষাকৃত অলংকৃত একটি রূপেব শৈলজারঞ্জন-কৃত স্ববলিপি আষাঢ ১৩৫৯ সংস্কবণে সংযোজিত।

[2] বিসর্জন গ্রন্থেব চৈত্র ১৮৭৯ সংস্কবণে গানগুলির স্ববলিপি মুদ্রিত, পবে স্বরবিতান ২৮ খণ্ডে মুদ্রিত হওযায বিসর্জন গ্রন্থে বর্জিত।

[3]গানটির স্বরলিপি প্রণযনে স্ববলিপিকাব কবিকণ্ঠের গ্রামোফোন রেকর্ডেব সাহায্য নিযেছেন।

[4] শিশিবকুমাব ভাদুড়ীর পবিচালনায় ববীন্দ্রনাথের নাট্যরূপী -কৃত 'যোগাযোগ' কাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, সেই সময ববীন্দ্রনাথ গানটিতে নূতন স্থর দিয়ে স্ববলিপিবাবকে শিখিয়েছিলেন।

প্রাক্তনী 'সুরঙ্গমা' প্রকাশিত 'সংবর্ধনা পুস্তিকা' থেকে দুটি সংকলন পরিমার্জিত রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। : সম্পাদক উত্তরস্থরি

আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রসংগীতের নির্বাচিত তালিকা

[শৈলজারঞ্জন একদা গায়ক হিসেবে ববীন্দ্রনাথেরও প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু এই আদর্শবাদী মানুষটি শিক্ষকতাব আদর্শেব কাছেই শিল্পী-জীবনকে স্বেচ্ছায পরিত্যাগ করলেন। কাবণ, শিল্পী এদেশে কিছু বযেছেন, শিক্ষক নেই, দীর্ঘকাল পূর্বে তাঁর ছাত্রী কবি মুখোপাধ্যায়েব অক্লান্ত চেষ্টায় কিছু গান ধবে রাখা হয়েছিল। তিনি আমাদেবও একটি সেট পাঠিযেছেন। জানা গেছে, ববীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিযমে গানগুলি সযত্নে বক্ষিত হবে। আকাশবাণী থেকেও প্রচাবিত হযেছে। ববীন্দ্রস গীতেব সঠিক গাযকীর জন্য শিল্পীদের এই গানগুলি শুনতেই হবে কোনদিন। ভাবীকালের শিল্পী ও গবেষকদেব জন্য বইল এই গানগুলি সম্পাদক উত্তবসূবি]

১৯৬৬

১. বডো বিস্ময লাগে (অক্টো ১৯৬৬), স্বব— /প্রেম-প্রকৃতি-৫৭/গী-৩য,থ।

২ আছো অন্তবে চিবদিন (অক্টো ১৯৬৬), স্বব—২২/পূজা-৪২২/গী-১ম, খ।

১৯৬৭

৩ বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল (৮ ১১ ৬৭), স্বর—৫৮/প্রকৃতি (বর্ষা) ১২৬/গী-২য, খ।

৪ মবি লো মবি, আমায বাঁশিতে ডেকেছে কে (৮ ১১. ৬৭), স্বর— ৫০/প্রেম-৫০/গী-২য, খ।

৫ বাজো বে বাঁশবি, বাজো (৮ ১১.৬৭), স্বব— /নাট্যগীতি-১০ /গী-৩য, খ।

৬ মম দুঃখেব সাধন যবে কবিনু নিবেদন (৮ ১১. ৬৭), স্বর- ৫৯/প্রেম-২২৫/গী-২য়, খ।

৭. আজি যে বজনী যায ফিবাইব তায় (৮. ১১. ৬৭), স্বর—৫০/প্রেম-১৪৭ গী ২য়, খ।

৮. আজি দক্ষিণপবনে (৮ ১১ ৬৭), স্বর—বিশ্ব-পত্রিকা/প্রেম-২২৭/গী-২য়, খ।

৯ শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে (৮. ১১. ৬৭), স্বর—৫৫/পূজা-৮২/গী ৩য়, খ।

১৯৬৮

১০ কেহ কারো মন বোঝে না (.২. ১০. ৬৮), স্বর—৩২/প্রেম-৩৯২/গী-২য়, খ।

১১ শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা, প্রাণেশ্বর (১২ ১০. ৬৮), স্বর—৪৫/পূজা-৪৩৮/গী ১ম, খ।

১২ আমার আপন গান আমার অগোচরে (.২ ১০ ৬৮), স্বর—৫৯/প্রেম-২২৯/গী-২য়, খ।

১৩ এ পরবাসে রবে কে হায় (১৯ ১০ ৬৮), স্বর—৮/পূজা-৪৩৫/গী-১ম, খ।

১৪. দিনান্তবেলায় শেষের ফসল (১৯ ১০. ৬৮), স্বর—৫৯/প্রেম-২৩৫/গী-২য়, খ।

১৫ প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে (১৯ ১০ ৬৮), স্বর—৫৩/প্রেম-২৬/গী-৩য়, খ।

১৯৬৯

১৬. ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার (১৭ ৩ ৬৯), স্বর—১/প্রেম-৪০২/গী-২য়, খ।

১৭ হৃদয় আমার প্রকাশ হল (১৭ ৩. ৬৯), স্বর—৪৩/পূজা-২০৮/গী ১ম, খ।

১৮ শুধু তোমার বাণী নয় গো (১৭. ৩ ৬৯), স্বর—৪৬/পূজা-৩৭/গী-১ম, খ।

১৯ আরো আঘাত সইবে আমার (১৭ ৩ ৬৯), স্বর—৩৭/পূজা-২২৪/গী ২য়, খ।

২০ তোমায় নতুন ক'রে পাব বলে (১৭, ৩. ৬৯), স্বর—৭/পূজা-৪৫/গী ২য়, খ।

২১ শুধু যাওয়া আসা (১৯. ৩ ৬৯), স্বর—১০/বিচিত্র-৬৯/গী-২য়, খ।

২২. ওলো সই, ওলো সই (১৯. ৩. ৬৯), স্বর—৩৫/প্রেম-৮১/গী-২য়, খ।

২৩. হ্যাদে গো নন্দরাণী (১৯. ৩ ৬৯), স্বর—২০/বিচিত্র-৮৮/গী-২য়, খ।

২৪ দিনের পরে দিন যে গেলো (১৯ ৩. ৬৯), স্বর—৫৭/প্রেম-২৬০/গী-২য়, খ।

১৯৭০

২৫ মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে (২৯. ১০ ৭০), স্বর—৫৮/প্রেম-২৭৭/গী-২য়, খ।

২৬ শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে (২৯. ১০ ৭০), স্বর—৫৯/প্রকৃতি ১৩২/গী-২য়, খ।

২৭ গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা (২৯ ১০ ৭০), স্বর—৫৮/প্রেম-১০৯/গী-২য়, খ।

২৮ আমি আশায় আশায় থাকি (৯ ১০, ৭০), স্বর—৫৯/প্রেম-২০০/গী ২য়, খ।

২৯. দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে (২৯. ১০ ৭০), স্বর—৬০/প্রেম-২৩৮/গী-২য়, খ।

৩০ আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে (২৯ ১০ ৭০), স্বর—৫৮/প্রকৃতি- ২৪/গী-২য়, খ।

৩১ চিত্ত পিপাসিত রে (৪ ১১ ৭০), স্বর—১০/প্রেম-১/গী-৩য়, খ।

৩২ অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে (৪ ১১ ৭০), স্বর—/ প্রেম-২৩০/গী ৩য়, খ।

৩৩ ডেকোনা আমারে ডেকোনা (৪ ১১. ৭০), স্বর— /নৃত্যনাট্য/গী-৩য়, খ।

৩৪. যে ছিল আমার স্বপনচারিনী (৪ ১১ ৭০), স্বর—৬১/প্রেম-২০৫/গী-২য়, খ।

৩৫ মহারাজ, একি সাজে এলে (৪ ১১. ৭০), স্বর ৩৬/পূজা-৫২২/গী-১ম, খ।

৩৬. চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না (৪. ১১. ১০), স্বর—৪/পূজা-৪১৩/গী-১ম, খ।

৩৭. নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে (৫ ১১ ১০), স্বর—৫৯/প্রকৃতি ১৩৫/গী-২য়, খ।

৩৮. পিপাসা হায় নাহি মিটিল (৫ ১১ ১০), স্বর—২৫/পূজা-৪৪১/গী-২য় খ।

৩৯ আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে (৮ ১১ ১০), স্বর—৫৮/প্রকৃতি-১ ৭/গী-২য়, খ।

৪০ আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে (৮ ১১ ১০), স্বর—৫৯/প্রকৃতি (বর্ষা)-১২৯/গী-২য়, খ।

৪১ এবার নীরব করে দাও হে (৮ ১১ ১০), স্বর—৩৭/পূজা-২৫৪/গী-১ম, খ।

১৯১১

৪২ ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় (৮ ১০ ১১), স্বর—৫৩/প্রেম-২৫৬/গী-২য়, খ।

৪৩ আমার যেতে সরে না মন (৩ ১০ ১১), স্বর—৬০/প্রেম-৩৩৫/গী-২য়, খ।

৪৪ আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা (৫ ১০ ১১), স্বর—৪২/প্রেম ৮৮/(অরূপরতন)/গী ২য়, খ।

৪৫. যা হবার তা হবে (৯. ১০ ১১), স্বর—৫২/পূজা-৮৩/গী-১ম, খ।

৪৬ ডুবে কোথায় ডুবে ডুবে (৯ ১০ ১) [illegible] পূজা ৪৪০/গী-১ম খ।

১৯১৪

৪৭ তুমি যে আমারে চাও (৬ ১১. ১৪), স্বর—৬০/পূজা-২৯৮/গী-১ম, খ।

৪৮ অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া (৭ ১১ ১৪), স্বর—৮/

১৯১৫

৪৯ শুকনো পাতা কে-যে ছড়ায় ওই দূরে (৫ ১১ ১৪), স্বর—৬/প্রকৃতি-২৪৪/গী-২য়, খ।

সংকলন নির্মল দে

তরঙ্গিত স্মৃতি   রবীন্দ্রসংগীতে সিম্ফনি

অম্লানজ্যোতি মজুমদার

অনুচ্ছেদ ১ মালার্মের "ল' আপ্রে মিদি দ' উন ফন" কবিতাটির প্রেরণা ছিল Bonche এর একটি ছবি, মালার্মের কবিতাটি দেবুসিকে তাঁর প্রেলুডটি রচনা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাংলা কবিতায় এমন একটি দৃষ্টান্ত হল রবীন্দ্রনাথের ছবি (বলাকা) কবিতাটি। প্রশান্ত মহলানবীশ লিখেছেন, এলাহাবাদে অবস্থানকালে (১৩২১) কাদম্বরী দেবীর একখানি পুরানো ফোটো রবীন্দ্রনাথকে 'ছবি' কবিতাটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'উত্তরসূরি'র 'রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা'য় রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রেরণাজাত সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন "এই রচনাটি সরাসরিই চিত্রপ্রেরণাজাত, অর্থাৎ এলাহাবাদে ঐ ছবিটি না দেখলে রচনাটি আদৌ সংসাধিত হত না।" তুলনাটিকে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে, 'ছবি' কবিতাটি অবলম্বনে ১৩৩৮ সালে "তুমি কি কেবলি ছবি" শীর্ষক গানটি রচিত হয় যা ১৩৩৯ সালে "শাপমোচন" গীতিনাট্যে প্রযুক্ত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ২ কিন্তু কোন তুলনাই নিখুঁত হয় না। মালার্মে-দৃষ্ট Bonche এর ছবি আর রবীন্দ্রনাথ-দৃষ্ট ফোটো শিল্প হিসাবে অবশ্যই তুল্যমূল্য নয় বা দেবুসি-কৃত সংগীত এবং উক্ত রবীন্দ্রসংগীতটি। এ সমস্ত তথ্য থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প কি ভাবে একে অন্যকে প্রভাবিত করে। কিন্তু পরস্পরকে অনুপ্রেরিত করা বা পরস্পরের উপাদান যোগান দেওয়া ছাড়াও এক শিল্পকে আরেকটিকে অন্যভাবেও প্রভাবিত করতে পারে—তা হল, সেই উপাদান সমূহের বিন্যাসে বা নির্মাণ কৌশলে। রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতাটি সেইদিক থেকে আমাদের মনোযোগ দাবী করে, কেন না এটি এমনি এক দৃষ্টান্ত যা কবিতা আর সংগীতের যোগে এক অভিনব সৃষ্টিতে রূপান্তরিত। এখানে অবশ্য 'ছবি' কবিতাটির কথাই বলা হচ্ছে, তার গীতিময় রূপটি নয়। বস্তুতঃ গীতিময় রূপটি খণ্ডিত, কবিতাটির সমগ্র অংশে সুর দেওয়া হয় নি, কেবল স্মৃতিপ্রসঙ্গটুকুই গানে ধরা পড়েছে। আর গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হবার ফলে তা মূল কবিতাটির অনুষঙ্গ থেকেও বিযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংগীতের যোগ বলতে কি বোঝাচ্ছে তা এখানে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের মনে সুর আর কবিতা পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সম্ভবতঃ তিনি আমাদের একমাত্র গীতিকবি যাঁর সমান অধিকার ছিল এই দুই বিষয়ে, যাঁর গানে বাণী অকুণ্ঠ, বস্তুতঃ বাণীকে অনন্তে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর সাধনা। অপরপক্ষে সুরের বাঁধনে বাঁধা বলে তাঁর বহু কবিতাই গাওযার যোগ্য। এমন অনেক কবিতার নাম সহজেই করা যায় যেগুলি মূলতঃ গান হিসাবে লেখা হয় নি, পরে সুর সংযুক্ত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩ সুর ব্যতিরেকে কাব্য যে উপায়ে সংগীতের সাযুজ্য লাভ করে তা হল শব্দঝংকারে। সাধারণতঃ কাব্যের সংগীত (music of poetry) বলতে যা বোঝায় তা হল ভাষার non-semantic তথা অর্থনিরপেক্ষ ধ্বনি সম্পদের ব্যবহার। (দ্র ১) যন্ত্র সংগীত যেমন শব্দার্থ ছাড়াই শ্রোতাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম, কবিতাও তেমনি কেবল শব্দের ধ্বনির সাহায্যে আবেগ সৃষ্টি করতে পারে। ভেরলেনের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যিনি শব্দার্থের উপরে স্থান দিয়েছিলেন ধ্বনিকে, কিন্তু মনে রাখতে হবে কবিতা সংগীতের বিকল্প বা অপকৃষ্ট সংগীত নয়। কোনো রচনায় শব্দের ধ্বনি যদি তার অর্থ গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকে কবিতা বলা যাবে কি না ভাববার বিষয়। এ প্রসঙ্গে জজ হোয়ালীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য "anything that tends to undermine or destroy the verbal character of words in a poem strikes a blow to the heart of poetry by destroying the medium of poetic" (দ্র ২)

অনুচ্ছেদ ৪ কাব্যের সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে টি এস এলিয়ট বলেছেন সংগীতের যে দুটি বৈশিষ্ট্য একজন কবিকে আকৃষ্ট করে সেগুলি হল ছন্দ-চেতনা আর বিন্যাস-কৌশল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বিশেষ একটি সাংগীতিক বিন্যাস যেমন সিম্ফনি বা কোয়ারটেটের আদলে একটি কবিতাকে বিন্যাস করা সম্ভব। (দ্র ৩)

ফলতঃ এলিয়েটের অনেক কবিতাই সাংগীতিক বিন্যাসের ব্যবহারে বিশিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ এখানে ফোর কোয়ারটেট কাব্যটির উল্লেখ করা

যেতে পারে যার নামই তার সংগীত সম্পর্কের ইঙ্গিত করছে। অ কিন্তু জে ডব্লু এন সুলিভান বীথোফেনের ওপাস ১৩০ (বি. ফ্ল্যাট), ১৩১ (সি মাইনর), এবং ওপাস ১৩২ (এ মাইনর) কোয়ারটেটগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাকে স্বচ্ছন্দে এলিয়টের ফোর কোয়ারটেট এর বর্ণনা হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। (দ্র ৪)

কিন্তু এলিয়টের আগে থেকেই ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় কাব্যে এ জাতীয় সাংগীতিক বিন্যাসের ব্যবহার প্রচলিত ছিলো। জে এম রোহেন উল্লেখ করেছেন এলিয়টের কাব্যরচনার অনেক আগেই সংগীতের আদলে লেখা হয়েছিলো টেনিসনের 'মড', টমসনের 'সিটি অব ড্রেডফুল নাইট', আর প্রবন্ধের সুরুতে যে কবিতাটি উল্লেখ করেছি তারও বিন্যাস সাংগীতিক। (দ্র ৫)

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে এ জাতীয় সাংগীতিক বিন্যাস বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

অনুচ্ছেদ ৫ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার সেই অতুলনীয় প্রতিভার পরিক্রমা সুরু হয়েছিল উনবিংশ শতকে, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ভিক্টোরিয়ান যুগে। এবং ঐ যুগের ইংরেজী কবিতা, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এসবই তাঁকে স্পর্শ করেছিল। অন্ততঃ একথা ভরসা করে বলা যায় তাঁর সামনে ছিলো টেনিসনের 'মড', ব্রাউনিংএর 'জেমস্ লী'জ ওয়াইফ'—কাব্যে সাংগীতিক বিন্যাসের এমন সব দৃষ্টান্তগুলি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ইংরেজী তথা অভারতীয় কোনো কিছুর কথা বলার বিপদ আছে, সাধারণ্যে এমন এক ধারণা প্রচলিত এতে রবীন্দ্রনাথের মহিমা খর্ব হয়। এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন কিনা সন্দেহ আছে, কেন না তাঁর প্রতিভা তো দ্বিতীয়স্তরের নয় যা শুভমার্গে বিচরণ করে আপনার অস্তিত্ব বাঁচাতে ব্যাকুল। বরং তিনি শেকসপীয়রের সগোত্র, ঋণী, কিন্তু তাঁর মতো ধনীই থাকে।

(৩) শুধু ইংরেজী কবিতাই নয়, ইংরেজী তথা পাশ্চাত্ত্য সংগীতও তাঁর শ্রবণে ঝংকৃত ছিলো। রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের গভীর অনুশীলন করেছিলেন (এখানে রিয়াজ করার থেকে বড়ো কিছুর কথা বলা হচ্ছে) তার অজস্র প্রমাণ অল্প আয়াসেই সংগ্রহ করা যায়, "At seventeen, when I first came to Europe, I came to know it intimately, but even

before that time I had heard European music in our household, I had heard the music of Chopin and others at an early stage."

"য়ুরোপে কবি যখনই আসিয়াছেন, পাশ্চাত্য সংগীত শুনিবার ও অভিনয় দেখিবার সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন"—লিখছেন জীবনীকার। তিনি শোনেন বাখ বা হ্বাগনার, পদ্মার অবিরাম কল্লোল তাঁকে মনে করিয়ে দেয় শোপাঁর সোনাটার কথা। ইন্দিরা দেবীকে লেখেন হাতের কাছে শোঁপার রচনা থাকলে ভালো হত। (দ্র ৬) এ সব থেকেই পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, যা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে যায়। আরও জানা যায় রবীন্দ্রনাথের অধিকতর পছন্দ ছিল হ্বাগনারের সাহিত্যাশ্রয়ী 'পার্সিফাল" প্রভৃতি অপেরা কেন না তা যুক্ত করেছে সাহিত্য এবং সংগীত ওই সংগীত যা বলতে চেয়েছে তা বাণীর সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্ত হতেই পারে না। ওই সকল অপেরার সাহিত্য বিষয়ও পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য সংগীতের অপেক্ষা করেছে।" (দ্র ৭) আশ্চর্য্য কি, কাব্যের প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করবেন সাংগীতিক বিন্যাস।

অনুচ্ছেদ ৬ "ছবি" কবিতাটিতে যে সাংগীতিক বিন্যাস ব্যবহৃত হয়েছে তা হল সিম্ফনি। প্রায়শই চার, কখনো বা ততোধিক (বীথোফেনের আছে পাঁচ পর্ব সিম্ফনি পাস্টোরাল, আন্তন রুবিনস্টাইনের আছে সাত পর্ব), পর্বে (movement) রচিত যন্ত্রসংগীত যা লয় এবং ভাবের পারম্পর্যে গ্রথিত। একটি পর্বের সঙ্গে অপরটির ভাব এবং লয়ের বৈপরীত্য, কখনো কখনো একটি পর্বের মধ্যেই বিরোধী ভাববস্তুর ব্যবহার, সিম্ফনিকে তার বৈশিষ্ট্য দান করে। ফলে একটি ভাববস্তু ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়ে একটি সামগ্রিক রূপ পায়।

লিরিক কাব্যের ক্ষেত্রে এই সাংগীতিক বিন্যাসের উপযোগিতা সহজেই অনুমেয়। প্রচলিত লিরিক আঙ্গিক—একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা যা একটিমাত্র সরল এবং অবিমিশ্র আবেগে গ্রথিত যখন আর বহন করতে পারছে না নবজাগ্রত অনুভূতিমালা, একটিমাত্র আবেগ নয়, আবেগপুঞ্জ, তখনি ভিক্টোরিয়ান লিরিকে সাংগীতিক বিন্যাস দেখা দিয়েছিলো। কেন না এই বিন্যাস লিরিককে বৃহৎ পরিসরে চলে ফিরবার স্বাধীনতা দিলো। এখানে দুটি কথা মনে রাখা দরকার
১. কোনো সাংগীতিক বিন্যাসকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার দায় নেই কবিতার।

২ সাংগীতিক বিন্যাস বলতে ধ্বনিগত মূর্চ্ছনাকেও বোঝাচ্ছে না। এ বিষয়ে সুজান ল্যাঙ্গারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"The tension which music achieves through dissonance and the reorientation in each revolution to harmony find their equivalents in the suspensions and periodic decisions of propositional sense in poetry Literal sense, not euphony, is the 'harmonic structure in poetry "

গদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন করে সাজান যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আনন্দের অন্তরে।

যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে-ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই, অনেক সময়ে এ কথা ভুলে যাই যে, ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম করে আমাদের মনকে বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাস নৈপুণ্যে। সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা" র র/১৪/৮১৯ (দ্র ৮)

সংগীতিক বিন্যাস মূলতঃ এবম্বিধ ভাবের বিন্যাস। এ কথা মনে রেখে ছবি কবিতাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

অনু ৭ ১০৭ পংক্তিতে রচিত 'ছবি' পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত পঞ্চমপর্বের পর চার পংক্তির একটি কোডা (coda)। পর্ব পাঁচটির বিস্তার সমান নয়, সিম্‌ফনির ক্ষেত্রেও পর্ব বিভাগ ভাবের বিস্তার অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। প্রথম পর্বটি সংক্ষিপ্ত, এর ৯ পংক্তিতে উপস্থাপিত এক দ্বিমাত্রিক প্রতিমা, অবিরাম চলার মাঝখানে গতিহীন এবং গতিহীন বলেই সত্য নয়। যা আছে তা স্মৃতিমাত্র—"শুধু পটে লেখা।" পটের স্তব্ধতার পাশাপাশি বেগবান গ্রহ তারা-রবির শোভাযাত্রা ভাবের বৈপরীত্য সূচিত করছে। দ্বিতীয় পর্বে (দশ থেকে আটাশ পংক্তি) বৈপরীত্য সূচক শব্দগুলির—চঞ্চল এবং শান্ত, স্থির এবং অস্থির—প্রয়োগে সেই বৈপরীত্য সম্প্রসারিত হ'ল। নিখিল বিশ্বের জঙ্গমতা

পটের স্তব্ধতাকে প্রকট করছে। রাত থেকে দিন, গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত বিচিত্র পরিক্রমায় চলমান এই পৃথিবীর ধূলি।

তৃতীয় পর্বে (উনত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ) এক নতুন বক্তব্য উপস্থাপিত। আজ যা গতিহীন পটমাত্র একদা সচল ছিল এবং সত্য। বিশ্বের অবিরাম চলার সঙ্গে সেও ছিল নৃত্যপরা। তার চলার মধ্যে বিশ্বের চলার বাণী ধ্বনিত হ'ত।

এই পর্বগুলি ক্রমান্বয়ে পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সাংগীতিক বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলিও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেনই বা রবীন্দ্রনাথ সাংগীতিক বিন্যাসের ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হলেন তাও। একটি সবল লিরিকে এভাবে ক্রমাগত ভরবিস্তার সম্ভব ছিলো না। কেন না ভাবের বৈচিত্র্য এবং বিরোধাভাস লিরিকের ইউনিটির (unity) পক্ষে ক্ষতিকারক বলেই বিবেচিত। অপর পক্ষে, লিরিক আবেগ (impulse) যখন উদ্বেল হয়ে ওঠে তাকে বৃহৎপরিসরে মুক্তি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। লিরিক অনুপ্রেরণা এবং লিরিকের সংক্ষিপ্ত আয়তন রোমান্টিক কাব্যের কয়েকটি মহৎ ব্যর্থতার জন্য দায়ী। কাদম্বরী দেবীর ছবি রবীন্দ্রনাথের মনে যে আবেগ সঞ্চার করেছিল তাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ছিল সন্দেহ নেই। সাংগীতিক বিন্যাস ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা সমাধান করতে পেরেছেন।

চতুর্থ পর্বে (পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেষট্টি পংক্তি পর্যন্ত) পূর্বের সমস্তগুলি বক্তব্য ভিন্নরূপে দেখা দিচ্ছে। এখানে সাংগীতিক বিন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। পর্ব থেকে পর্বান্তরে একটি ভাবসূত্র ঘুরে ঘুরে আসছে কিন্তু প্রতিবারই নতুন অনুষঙ্গে, নতুন রূপে। প্রথম পর্বে বিশ্বের গতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল সচল গ্রহ-তারা রবির উল্লেখ ক'রে দ্বিতীয় পর্বে ঋতুপরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের বেগ সূচিত হয়েছিল, চতুর্থ পর্বে সেই চলার বাণী নতুনতর রূপে বর্ণিত। আলো থেকে আঁধারে, জানা থেকে অজানায়, মৃত্যুকে অতিক্রম করে এই সজীব বিশ্ব কেবলই অগ্রসর। আর এই চলার বেগ প্রতিনিয়ত ছবির সঙ্গে (কবিতায় ছবি/স্মৃতি তুল্যমূল্য, আমরা মুহূর্তের জন্যও 'ছবিটিকে প্রত্যক্ষ করি না) বিশ্বের ব্যবধান রচনা করছে।

'এই তৃণ, এই ধূলি, ওই তারা, ওই শশীরবি,

সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।"

অনুচ্ছেদ ৮ পঞ্চমপর্বে (সাতষট্টি থেকে একশো তিন পংক্তি) সম্পূর্ণ এক বিপরীত বক্তব্য—'নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি" নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূচনা করেছে। সিম্‌ফনির অপর বৈশিষ্ট্য তার নাটকীয়তা the feeling that the music presses onward through conflict of solution" অপ্রত্যাশিতভাবে গতিহীন পটে সঞ্চারিত হচ্ছে বেগ। স্মৃতি যদি সচল না হয় তবে তো সে বিস্মৃতি, বিশ্বের গতির সঙ্গে যুক্ত থাকে বলেই তো স্মৃতি থাকে। এই ধূলি, এই নীলিমা, নদীর তরঙ্গভঙ্গ তাকে নিয়ত বহন করে চলে। প্রয়াত প্রেম অগোচরে রক্তে বাসা বাঁধে। শেষ পর্বে স্থির। অস্থির, শান্ত। চঞ্চল, জীবন। মৃত্যু—এই বিরোধীভাবগুলির দ্বন্দ্বের অবসান হবার পর গভীর প্রশান্তিতে একটি "কোডা" বাজে

"তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পর হারায়েছি রাতে।
তারপর অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি
নয় ছবি, নও তুমি ছবি॥"

অনুচ্ছেদ ৯ কোনো কোনো সমালোচক 'ছবি' কবিতাটিতে বের্গস বর্ণিত গতির তত্ত্ব আবিষ্কার করে ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু 'বিশ্বের সত্য হল গতি' এই একটিমাত্র সরল বাক্য এই কবিতাটির উৎকর্ষের সামান্যতম পরিচয় বহন করে না। দৃষ্টি এড়িয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটিতে কি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সমস্যা কেবলমাত্র লিরিক কবিতার আয়তনের সমস্যামাত্র নয়, এই সমস্যা কবিতার ভাববস্তুতেই নিহিত ছিল। যে স্মৃতি কবিতার উৎসে তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছিল বেদনাদায়ক এবং একান্ত ব্যক্তিগত। সেই ব্যক্তিগত থেকে ধীরে ধীরে নৈর্ব্যক্তিকতাতে উত্তরণেই কবিতাটির সিদ্ধি। আমরা কবিতাটি পড়ে যে বিধুরতা অনুভব করি তা কাদম্বরী দেবীর জন্য রবীন্দ্রনাথের শোক থাকে না, বরং সেই প্রয়াত প্রেম যা আমাদের প্রত্যেকের বুকের নীচে বাসা বাঁধে

এবং অগোচরে আমাদের পরিবর্তনশীল জীবনকে স্পর্শ করে যায়। 'আবেগের উচ্ছ্বাস নয়, কবিতা হল আবেগ থেকে মুক্তি', এলিয়ট-উক্ত এই প্রবাদতুল্য বচনের এমন সার্থক দৃষ্টান্ত অল্পই আছে।

সূত্র

১. Music of Poetry জন হল্যাণ্ডার/JAAC (15) 1956.

২ Poetic Process : জর্জ হোয়ালী/দশম অধ্যায় পৃঃ ১৯০—২২১, R K P

৩. Music of Poetry টি এস এলিয়ট, On Poetry and Poets/ Faber & Faber

৪ Sound and Form in Modern Poetry হার্ভে গ্রস, য়ুনিভার্সিটী অব মিশিগান প্রেস

৫ Poetry of this Age জে এম কোহেন, পৃঃ ১৩৬

৬ ছিন্নপত্রাবলী ১০৭, ১১৯, ১৪২, ১৮২

৭ গদ্যছন্দ রবীন্দ্র রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৬৬৬

৮ A short History of Western Music আর্থার জ্যাকবস্, ১৮শ অধ্যায়, পৃঃ ২০৪, এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জ্যাকবস্ বীঠোফেনের পঞ্চম সিম্ফনি এবং পাঁচ সংখ্যক পিয়ানো কনচের্টোর উল্লেখ করেছেন।

৯ Tradition and Individual Talent টি এস এলিয়ট

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বিতীয় সেতু

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তায় কীর্ত্তনের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। অথচ এটা লক্ষণীয় যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ লালিত-পালিত। তখনকার অভিজাত সমাজে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তৎক্ষণে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উচ্চবিত্তদের মধ্যে অনেকেই বৈঠকখানায় ওস্তাদ গায়ক-বাদকের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সঙ্গীতে বা নাটকে বাংলার সুর কিছু কিছু স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু তখনকার নব্য সংস্কৃতি সম্পন্ন উচ্চবিত্ত সমাজে প্রচলিত সঙ্গীতের মূল ধারাটি ছিল উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-ভিত্তিক। সেই ধারাটি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল সাধারণ্যে।

এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পড়েছে। প্রথম যুগের সঙ্গীত রচনায় তাই তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বিশেষ করে, ধ্রুপদের আদর্শে অজস্র গান রচনা করেছেন। এই সময়ে তাঁর রচিত বেশীর ভাগ গানই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের থেকে নেওয়া। আর যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে সঙ্গীত রচনা করেছেন, হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত পদ্ধতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। তবে সেটা আরো পরে। শিলাইদহ আর শান্তিনিকেতনে তাঁর গানে এনে দিয়েছে মাটির ছাপ। বাংলার নিজস্ব গান—কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতির ছোঁয়া যখন লাগল তাঁর গানে, বাংলা গানের নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হল।

রবীন্দ্রনাথ এটা বুঝেছিলেন যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে, আর যাই হোক বাঙালির হৃদয়ের সংযোগ ঘটে নি। আবেগপ্রবণ বাঙালী সঙ্গীতে নিছক কলাকৌশলের কারুকৃতি চাইতে পারে না। তার আসল লক্ষ্য হল হৃদয়াবেগের কোমল করুণ বহিঃপ্রকাশ। রুচির এই বৈশিষ্ট্যই বাঙালীর ঘরে কীর্ত্তনকে এনে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালী স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে। সেই কারণে সর্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতরীতির একান্ত অনুগত হতে পারে নি। সেই জন্যেই কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালীকে কীর্ত্তন সৃষ্টি করতে

হয়েছে। গানকে ভালবেসেছে বলেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে। তিনি বলেছেন—বাংলা-দেশের একটা বিশেষত্ব আছে, বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। সমস্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পিছনে ফেলে বাঙালীর প্রাণ আপনার সঙ্গীতকে উদ্ভাসিত করেছে, যেহেতু তার ভেতরের হৃদয়াবেগ সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না করে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, কীর্ত্তন বাঙালীর নিজস্ব এক সৃষ্টি যা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিভাস। অন্য কোনো গানেই বাঙালীহৃদয় এমন করে আর প্রতিবিম্বিত হয় না। তিনি বলেছেন বাংলা কি গান গায় নি? বাংলা এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্ত্তন। বাংলার সঙ্গীত যাবতীয় প্রথা—সঙ্গীতসম্বন্ধীয় চিরাগত প্রথার নিগড় ছিন্ন করেছিল। দশকুশী, বিশকুশী, কত তালই বেরোল, হিন্দুস্থানী তালের সঙ্গে যার কোনো যোগই নেই। খোল একটা বেরোল, যার সঙ্গে পাখোয়াজের কোনো মিল নেই। কিন্তু কেউ বললে না এটা গ্রাম্য বা অসাধু। একেবারে মেতে গেল সব নেচে কুঁদে হেসে ভাসিয়ে দিলে। কত বড় কথা। অন্য প্রদেশে তো এমন হয় নি। সেখানে হাজার বছর আগেকার পাথরে গাঁথা কীর্তিসমূহ যেমন আকাশের আলোককে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তেমনি সংগীত সম্বন্ধেও সজীব চিন্তা প্রতিহত হয়েছে।

কীর্ত্তনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা তাই অকৃত্রিম। তিনি লিখেছেন: কীর্ত্তন সঙ্গীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকারের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়। কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পুনরাবৃত্তি চান নি, চেয়েছেন তাকে আত্মসাৎ করে তারই প্রেরণায় নতুন সৃষ্টির বৈচিত্র্য। এক্ষেত্রেও কীর্ত্তন তাঁর কাছে প্রেরণাস্বরূপ। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কখনো কখনো কীর্ত্তনেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যোগাযোগ ঘটেছে, কিন্তু সেই প্রভাব শুধুমাত্র দৈহিক, আত্মিক নয়। তিনি

লিখেছেন কখনো কখনো কীর্ত্তনে ভৈঁরবী প্রভৃতি সুরের আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে, রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক।

কীর্ত্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার সামগ্রিকতা। তাঁর মতে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আছে এক একটি রত্নের কৌটো। ওস্তাদ জহুরী ঘটা করে প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে তার ঢাকা খোলে। আলোর ছটায় ছটায় তান লাগিয়ে দিকে দিকে তাকে ঘুরিয়ে দেখায়। সমঝদার তার জাত মিলিয়ে দেখে, তার দান যাচাই করে। বলে দিতে পারে, এটা হীরে না নীলা, চুনি না পান্না। কীর্ত্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যেজন রসিক, প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না—দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার বিষয়।

কীর্ত্তনের সার্বজনীনতাও কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো কীর্ত্তন সমজদারের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে কোনোদিনই বন্দীদশা যাপন করে নি। রবীন্দ্রনাথ তাই দিলীপকুমার রায়কে বলেছেন বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রেসীর যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্ত্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।

কিন্তু, কীর্ত্তনের যে দিকটা তাকে সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট করেছে, তা হল কীর্ত্তনের মধ্যেকার কথা ও সুরের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ। তাঁর মতে, বাণীর প্রাণ ত বাঙালীর অন্তরের টান। সেইজন্যই ভারতের এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশী হয়েছে। কিন্তু বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের সম্পূর্ণতা হয় না, এইজন্যই বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পঙক্তি না, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কীর্ত্তনে। তিনি বলেছেন, কীর্ত্তন অপরূপ সঙ্গীত, যুগল ভাবে-গড়া পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা, পদাবলীর সঙ্গেই তার রাস-লীলা, স্বাতন্ত্র্য সে সইতে পারে না। কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয়েই কীর্ত্তনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর গান বইতে পারে শুধু এই ধারাকে অবলম্বন করেই।

দিলীপকুমার রায়কে তিনি বলেছেন : বাংলার সঙ্গীতের বিশেষত্ব যে কী, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্ত্তনে পাওয়া যায়। কীর্ত্তনে আমরা যে আনন্দ পাই, সে তো অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।

বাংলার গান যে যৌগিক সৃষ্টি-কথা আর সুরের সার্থক সমন্বয় এ কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে তিনি একথাও বলেছেন বাঙালীর কীর্ত্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে প্রিমিটিভ্ এবং ফোক্ মিউজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত এই আদর্শেরই অনুসারী।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাবই বেশী। কিন্তু আগেই বলেছি, এটা সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতিপর্ব। এই সময় মাত্র একটা গানে তিনি কীর্ত্তনের সুর প্রয়োগ করেছেন—সেটা হল ভানুসিংহের পদাবলীর 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' গানটি। কীর্ত্তনে প্রতি তার প্রীতি পরবর্তীকালে বেড়েছে বটে, কিন্তু তাঁর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কীর্ত্তনাঙ্গ গানের সংখ্যা ছিল মাত্র বারো-তেরোটি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি স্বদেশীগান রচনা করেছেন কীর্ত্তনের সুরে। পরবর্তীকালে তিনি কীর্ত্তনের সুরকে প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন গানে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানগুলিতে একদিকে যেমন প্রাচীন কীর্ত্তনরীতি রক্ষা করেছেন, তেমনি আবার নিজস্বতাও দেখিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই। এদিক থেকে বিচার করলে, তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়—আখরযুক্ত ও আখরহীন।

প্রচলিত কীর্ত্তনগানে গায়কেরা মূলগানের সঙ্গে অতিরিক্ত কথা জুড়ে দিয়ে সুরবিস্তার করে থাকেন। একেই বলে আখর। রবীন্দ্রনাথ আখরকে বলেছেন

'কথার তান'। কিছু কিছু কীর্তনাঙ্গ গানে রবীন্দ্রনাথ আখর যুক্ত করেছেন যাতে সুরবিহার করা চলে অথচ গায়ক স্বাধীনভাবে সুরবিস্তার করতে পারেন না। এগুলি হল :

১. ওহে জীবনবল্লভ। ২ আমি জেনেশুনে তবু ভুলে আছি। ৩. আমি সংসারে মন দিয়েছিনু। ৪. কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে। ৫ তুমি কাছে নাই বলে। ৬ নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে। ৭. মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।

আখরহীন কীর্তনাঙ্গ গানই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন বেশী। তার মধ্যে অনেক গানেই কীর্তনের সুর স্পষ্ট। কোথাও কোথাও আবার কীর্তনের সুরের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে। এর মধ্যে পূজা, প্রেম এবং প্রকৃতি—এই তিন পর্যায়েরই গান রয়েছে। যেমন

পূজা আমি যখন ছিলেম অন্ধ। এই তো তোমার প্রেম ওগো। ওই আসনতলে মাটির 'পরে। তোমার সুরের ধারা। লহ লহ তুলে লহ।

প্রেম : আজি এ নিরালা কুঞ্জে। আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে। এসো আমার ঘরে এসো। দে পড়ে দে আমায় তোরা। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। পুরানো জানিয়া চেয়ো না। ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে। ফিরে ফিরে ডাক্ দেখিরে। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী। লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা। হৃদয়ের একূল-ওকূল।

প্রকৃতি : আমার মল্লিকাবনে। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে। আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে। ফাল্গুনের শুরু হতেই।

বলা বাহুল্য, এটা সম্পূর্ণ তালিকা নয়। অপেক্ষাকৃত প্রচলিত গানগুলিকেই উদাহরণস্বরূপ বেছে নেওয়া হয়েছে।

জমিদারীর কাজে রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ায় যাবার পরই তাঁর সঙ্গে বাংলার দেশী সুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটল। এরপরেই তাঁর গানে লাগ্‌ল বাউল-কীর্তনের ছোঁয়া। কিন্তু এই সময়কার কীর্তনাঙ্গ গানের বিষয়বস্তু ছিল পূজা আর প্রেম, সুরেও ছিল অবিমিশ্র কীর্তনের আনন্দ-যন্ত্রণা। কিন্তু তিনি শান্তি-নিকেতনে যাওয়ার পরেই তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে প্রকৃতিরও প্রবেশাধিকার ঘটেছে। বিষয়বস্তুর ঘটেছে বিপুল বিস্তার। এই সময়েই রচিত হয়েছে—'আমার

মল্লিকাবনে', 'তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক,' 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে,' 'আমি তখন ছিলেম মগন', প্রভৃতি গানগুলি।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানে বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনাবিলাসে। তাঁর অনেক গানেই তিনি বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে একাত্মতার আভাস দিয়েছেন যদিও বিষয়বস্তু ঠিক রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক নয়। 'আর নাই রে বেলা,' সখী ওই বুঝি বাঁশী বাজে,' 'এখনো তারে চোখে দেখি নি' প্রভৃতি গানগুলি অতি অনায়াসেই বৈষ্ণব পদাবলীর সেই অপার্থিব জগতের সঙ্গে আমাদেব সম্পৃক্ত করে তোলে। তবু এটা সত্যি যে, শান্তিনিকেতন পর্বেই কীর্ত্তনাঙ্গ গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছে। বিষযবস্তুতে, সুরে, ছন্দে কীর্ত্তনাঙ্গ গানের পবিপূর্ণ ব্যাপ্তি ঘটেছে এই সময়ে।

কীর্ত্তনেব মধ্যে যে ববীন্দ্রনাথ নাট্যরসেব সন্ধান পেয়েছিলেন, এটা তারই স্বীকাবোক্তি। হযাতো সেইজন্যই তাঁব কোনো কোনো নাটকে তিনি কীর্ত্তনাঙ্গ সুর প্রয়োগ কবেছেন। 'মায়াব খেলা' গীতিনাট্যে 'সখী বহে গেল বেলা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে 'রোদনভরা এ বসন্ত' গান দুটিব প্রাসঙ্গিকতা এবং গীতিমূল্য নিশ্চিন্তভাবেই অসাধারণ।

৩.

প্রচলিত কীর্ত্তনগানেব একমাত্র বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণেব প্রেমলীলা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কীর্ত্তনসুরের বহুল প্রয়োগ করে এর সীমা বিস্তৃত করে দিযেছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়েই তিনি কীর্ত্তনাঙ্গ গান রচনা করেছেন। প্রেম, পূজা এবং প্রকৃতি ছাড়াও তিনি দেশাত্মবোধক ('একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্'), এবং উপাসনা-সঙ্গীত ('প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত') প্রভৃতি রচনা করেছেন কীর্ত্তনের সুরে।

অন্যান্য ধরণের গানে যেমন, কীর্ত্তনাঙ্গ গানেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌলিকত্বকে স্বীয় প্রতিভায় বজায় রেখেছেন। কীর্ত্তনের করুণ-মধুর সুরকে তিনি প্রয়োগ করেছেন নিজস্ব পদ্ধতিতেই। তাই কোনো কোনো গানে যেমন কীর্ত্তনের সুর স্পষ্ট, কোথাও আবার কীর্ত্তনের সুর এমন ভাবে মিশে আছে যে, এক নতুন ধরণের সঙ্গীতের উদ্ভব ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ কথনো কথনো রাগাশ্রয়ী গানের সঙ্গে কীর্ত্তনের সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। 'বকুলগন্ধে বন্যা এল' (আড়ানা, বাহার ও কীর্ত্তন), 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' (বাহার, পঞ্চম ও কীর্ত্তন)' 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও (হাম্বীর, কেদারা ও কীর্ত্তন), 'শীতের হাওয়াব লাগ্‌ল নাচন' (নট ও কীর্ত্তন) প্রভৃতি গান তাঁর বৈচিত্র্যপ্রিয়তার স্পষ্ট স্বাক্ষর। তেমনি, বাউলেব সঙ্গে মাঝে মাঝে কীর্ত্তনের সুর মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই,' 'এই তো ভাল লেগেছিল,' 'তুমি কোন্ পথে যে এলে,' 'আমাব অঙ্গে অঙ্গে হবষ জাগায়' 'স্বপনপাবের ডাক শুনেছি' প্রভৃতি গানগুলি রবীন্দ্রনাথেব বিচিত্র সঙ্গীত-প্রতিভার স্বাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুতঃ, এই ধরণের গানগুলিই রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তনাঙ্গ গানেব সত্যিকাবের প্রতিনিধি। এছাড়া, বাউল কীর্ত্তনেব সঙ্গে তিনি 'পূরবী' মিশিয়ে তৈরী করেছেন 'এ বেলা ডাক পড়েছে' গানটি। খাম্বাজের সঙ্গে কীর্ত্তনের সুব মিশিয়ে রচনা করেছেন কোথা বাইবে দূরে যায় রে, উড়ে' গানটি। পিলুর সঙ্গে কীর্ত্তনের মিলনে গড়ে উঠেছে 'তোমাব আনন্দ ওই এলো দ্বারে' গানটির কাঠামো। কীর্ত্তনাঙ্গ বিষববস্তু নিয়ে বচিত 'হৃদয়ক সাধ' গানটির যদিও ভৈঁরোব পর্দায়ই রচিত, সূক্ষ্ম এক ধরণের কীর্ত্তনের আমেজ কিন্তু এতে পাওয যায়।

রবীন্দ্রনাথেব কীর্ত্তনাঙ্গ গানেরও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ বেয়েই শান্তিনিকেতন পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তনাঙ্গ গান তার পরিণতিকে খুঁজে পেয়েছে। নতুন এক ধরণের গানে সমৃদ্ধ হযে উঠেছে বাংলা-গানের সম্পদ ভাণ্ডাব। সেক্ষেত্রে কীর্তন প্রেবণামাত্র, নিছক অনুকৃতিব বিষয নয।

তালের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ সহজ হতে চেয়েছেন। ছয় মাত্রা, আট মাত্রা এবং দশ মাত্রার সহজ ছন্দই তিনি ব্যবহার করেছেন এই ধরণের গানে। সাধারণ কীর্ত্তনের তাল-ফেরতাও রবীন্দ্রনাথ সতর্কতাব সঙ্গে বর্জন করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটা কীর্ত্তনাঙ্গ গানেই তাই একই ছন্দের ঠাসবুনন রয়েছে।

সঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত ছিলেন বলেই, তাঁর কীর্ত্তনাঙ্গ গানেও অভিনবত্বের সৃষ্টি হযেছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই। তিনি অনেক

সময় একই গানে শুদ্ধ ও কোমল ধৈবত এবং নিষাদের প্রয়োগ করেছেন। 'তবু মনে রেখো, 'আমার মল্লিকাবনে', 'তোমরা যা বল তাই বল' প্রভৃতি গানেই এর প্রমাণ রয়েছে। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গান 'তবু মনে রেখো' কীর্তনের সুরেই রচিত। অথচ, সুরবিস্তারের পর 'স্থায়ী'তে এসে দাঁড়ানোর সময় কেমন যেন টপ্পার আভাস লাগে। আবার কীর্ত্তনাঙ্গ গানে আখর লাগানোটা রপ্ত হয়ে যাওয়ায় অন্য ধরণের কোনো কোনো গানেও তিনি আখরযুক্ত করেছেন—যেমন, 'তোমরা আনন্দ ওই এল দ্বারে,' 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ' প্রভৃতি গান।

রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা সত্যিই বিস্ময়কর। নিত্যনূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তিনি যেন সারাজীবনই সংস্কার মুক্তির অভিসারে মগ্ন। তাঁর বেশীর ভাগ গানই হিন্দুস্থানী ধ্রপদের মতো চারটি তুকে বিভক্ত। অন্তরা ও আভোগে মোটামুটি একই সুর থাকে। তাঁর প্রথম যুগের কীর্ত্তনাঙ্গ গানেও এই সাধারণ নিয়মটি অনুসৃত। কিন্তু পরবর্তীকালে সুর সংযোজনায় আরো বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে', 'পুরোনো জানিয়া চেয়ো না', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', প্রভৃতি কীর্ত্তনাঙ্গ গানের প্রত্যেক কলিতেই সুরের বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। 'আমার মল্লিকা বনে' গানটির অন্তরা এবং আভোগের সুর বিশ্লেষণ করলেও আমার বক্তব্যটা পরিস্কার হবে।

৪.

বাণী ও সুরের সার্থক সমন্বয়ে কাব্যসঙ্গীত রচনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের সাধনা। বাংলা গানের ধারার মধ্যেই তিনি এর প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কীর্ত্তনের মধ্যেই তিনি তাঁর আদর্শকে যেন প্রমূর্ত্ত হতে দেখেছিলেন। প্রথম যুগে কীর্ত্তনের সুরকে তিনি গান রচনায় ব্যবহার করলেও, এর ব্যপকতর প্রয়োগ ঘটে তার সাঙ্গীতিক জীবনের পরিণত অধ্যায়ে। কীর্ত্তনের সুর ও গীতিরীতিকে তিনি বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেছেন তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিশালায়।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের কূটকৌশলে আগ্রহী হন। তাঁর সাধনা সহজের সাধনা। তিনি আবেগপ্রবণ বাঙালীর হৃদয় যন্ত্রণারই রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রচলিত ধারাতে সেক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত তার ছায়া ফেলেছে বটে, কিন্তু তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভা যতই পরিণতির দিকে এগিয়েছে, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ততই গেছে দূরে সরে। নিবিড় করে, তিনি গ্রহণ করেছেন বাঙালীর নিজস্ব গানের

ধারাগুলিকেই। কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, সারি প্রভৃতি গানই হয়ে উঠেছে তাঁর প্রধান অবলম্বন। অবিমিশ্র সঙ্গীত তাই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি।

কীর্ত্তনের প্রভাব তার গানে আরো আছে। কীর্ত্তনগানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা এবং প্রেম পর্য্যায়ের গানে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই ধারাটি রক্ষা করেছেন। পূর্বরাগ, মান, বিরহ, অভিসার প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রেম-পর্যায়ের গানের মতো রবীন্দ্রনাথও লৌকিক প্রেমের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও পর্যায় নিয়ে গান রচনা করেছেন।

কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, কীর্ত্তনাঙ্গ গান রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন আদ্যন্ত। প্রচলিত কীর্ত্তনকে তিনি অনুকরণ করেন নি। নিজস্ব সঙ্গীতরুচি অনুসারে কীর্ত্তনের প্রয়োগ করেছেন তাঁর গানে।

রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রসংগীত

একটি প্রতিবেদন

"পৃথিবীতে সব চেয়ে যেখানে আমাব যথার্থ পরিচয় ও আমার রচনার আলোচনা কম সে হচ্ছে শান্তিনিকেতন।" এই কথাগুলি আক্ষেপ ভবে রবীন্দ্রনাথ কবি অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ১৯২৯ এ।

ভাবতে অবাক লাগে, যে-বাঙালীর গর্ব রবীন্দ্রনাথ, যে-ববীন্দ্রনাথ আমাদের বর্মে জ্ঞানে ধ্যানে রূপান্তব ঘটিযেছেন, যে-ববীন্দ্রনাথের নাম নিযে যে কোন ভাবতবাসী পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শ্রদ্ধা না হোক অভ্যর্থনা লাভ করেন (—রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতেই বলছেন, 'এই শান্তিনিকেতনেব কোন লোক যখন য়ুরোপে যাবে তখন তাদেবি কাছ থেকে আদব পাবে যারা তাদের চেয়ে যথাযথ-ভাবে আমাকে শ্রদ্ধা কবে এবং ভালো করে জানে।" —) সে-ববীন্দ্রনাথের কোন স্থাযী আলোচনা তাঁরই স্থাপিত বিশ্বভাবতীব প্রাঙ্গনে বিশেষ অনুষ্ঠিত হয় না। এ যে কত বড বেদনাব তা কবিব থেকে বহুদূব সমযে বাস করে আমবাও অনুভব করতে পারি। বিশ্বভাবতীতে দেশ বিদেশেব পণ্ডিত আসেন, চারিদিকে বড় বড বাডি উঠছে— নানা 'কমপ্লেক্স' তৈরী হচ্ছে, কত কত অধ্যাপক কত জটিল বিষয় পডাচ্ছেন! আব যে মানুষটি এই কর্মযজ্ঞেব অন্তবালে— তিনি অন্তরালেই রযে গেলেন। তাঁব অনুযোগ যে মুদ্রিত। খণ্ডন করবার কোন উপায় বিশ্বভাবতীর নেই, নেই ভাবীকালের। যতদূর মনে পডছে কবিব জন্মশতবার্ষিক বছবে বিরাট উৎসব হয়েছিল। আমবা তখন তরুণ কবি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম উৎসবে যোগ দিতে, সংগীত বিষযেও আলোচনা হযেছিল—কিছু বলবাব সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হযেছিল। কিন্তু সেই ক'দিনের আলোকসজ্জা —সে তো শুধু উৎসব। কবিকে নিযে তা তো কোন স্থায়ী আলোচনা নয়। [বেসরবারী ভাবে শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্তর কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে, ১৯৩০এর পর থেকে, কি উল্লেখযোগ্য আলোচনা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হয়েছে। কিছু যে হয় নি তা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

১৯৪৬ সাল থেকে রবীন্দ্র-সপ্তাহ হিসেবে ৭ থেকে ১৪ অগস্ট ধবে আলোচনা-চক্র নিয়মিত শুরু হয। অনেক অনেক নামী বক্তাও এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।]
এই সঙ্গে অবশ্য একটি বড কাজও কবছেন বিশ্বভারতী "রবীন্দ্রবীক্ষা" প্রকাশ ক'বে। পঞ্চম সংকলন হাতে এলো শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের আনুকূল্যে, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যাযের সঙ্গে তিনি যুগ্ম-সম্পদদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। পঞ্চম সংকলনটি 'যোগাযোগ'-এব নাট্যীকৃত রূপ,—১৯৩৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর শিশিরকুমাব ভাদুডির প্রযোজনায ও পরিচালনায় প্রথম অভিনয় হয় নবনাট্য-মন্দিরে। এর আগেব চবটি সংকলনের মধ্যে ২ নম্ববে 'অরূপবতন' এর অসম্পূর্ণ রূপান্তর এবং ৪ নম্বরে 'তাসের দেশ' এব প্রাথমিক খসডা রবীন্দ্রচর্চায় উৎসাহী ব্যক্তিদেব কাছে আকর্ষণীয়। শ্রীপুলিনবিহাবী সেন, শ্রীকানাই সামন্তর মত গবেষকেব প্রত্যক্ষ এবং পবোক্ষ নির্দেশে বিশ্বভাবতীব গবেষণা প্রকাশনেব এই দিকটি উল্লেখেব দাবী রাখে। তাছাডা এখনো কর্মক্ষম রযেছেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। কিন্তু ওই যে বলেছি, স্থাযী কাজ অর্থাৎ যে কাজ দিয়ে ভারতে এবং বহির্ভারতে রবীন্দ্র-আলোচনা একটি গবেষণা-ধর্মী অথচ লোকপ্রিয় পর্যাযে পৌছুতে পাবে, তা কি নিয়মিতভাবে হযেছে, যেমন শেকসপীযারকে নিযে হযে থাকে, (এখন ধাবণা ববীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য ও গানই লিখেছেন—যে গান শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ দ্বিতীয শ্রেণীব শিল্পীরাই পবিবেশন কবে থাকেন।) রবীন্দ্র নামাঙ্কিত কত যে-সংস্থা আছে বাংলাদেশে, বাংলাব বাইবে, ভাবতের বাইরে। এ বঙ্গে সবকারী প্রতিষ্ঠান 'ববীন্দ্র সদন'এর 'হল' ভাডা দেওয়াই তো প্রধানতম কাজ। এক মাস ধরে গানবাজনা হয়। ভালো কথা। কিন্তু সে-গানের রূপ তো 'জলসা'। কিছু কিছু তরুণ শিল্পী আবিষ্কৃত হন, মন্দেব ভালো। কিন্তু 'অ্যাকাডেমিক' চর্চা তো সেখানে হয না। কবি বীরেন্দ্র চাটুজ্যে, অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচাযের শত আবেদন সত্ত্বেও রবীন্দ্র-গবেষণার জন্য একটি ছোটখাট গ্রন্থাগারও সেখানে এখন পর্যন্ত করা গেল না। অথচ প্রতি সপ্তাহে কমিটি বসছে। বাঘা বাঘা সদস্যবা টেবিল ফাটাচ্ছেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামকে নতুন করে সাজাচ্ছেন। কিছু গানের রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন। দশ বারো বছব পূর্বে এই গানের সংগ্রহ নিয়ে

আমি 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম—তাতে কিছু গুরুতর বিষয়ও ছিল। এই অমূল্য সম্পদ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে তো উদাসীন বলেই মনে হয়। যাই হোক এগুলি মূল্যবান কাজ। কিন্তু আরো অনেক করবার আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে বাংলা বিভাগ কিছুদিন আগে একটি আলোচনা-চক্র করেছিলেন। সেই গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীত নিয়ে এযাবৎ এখানে কিছুই হয় নি। না কোন আলোচনাচক্র। রবীন্দ্রসংগীতের পৃথক বিভাগ সবে শুরু হয়েছে। তাঁদের কাছে কি এই আশা অন্যায় হবে? না, গানের স্কুলের মত কিছু গান শিখিয়েই তাঁরা শুধু দায় শেষ করবেন। তাহলে গীতবিতান, বৈতানিক, দক্ষিণী, রবিতীর্থ, সুরঙ্গমা থাকতে রবীন্দ্রভারতীর বিশেষ দরকার ছিল কি? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, সামগ্রিকভাবে "আন্তরিক এবং তন্নিষ্ঠ" আলোচনা দেশবিদেশের পণ্ডিতদের নিয়ে—সে কাজ তো রবীন্দ্রভারতীও করেন নি। এখন পর্যন্ত রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে কোন মৌলিক গ্রন্থ তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যে পত্রিকা প্রকাশ করেন তা "বিশ্বভারতী" পত্রিকারই কনিষ্ঠ সংস্করণ। একটু নতুন করে ভাবা যায় না কি (হ্যালহেড সংখ্যার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ)? বিশ্বভারতী পত্রিকাও তো কোল্ড স্টোরেজে। এহ বাহ্য। আমার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রসংগীত। সকলেই জানেন, শেষ জীবনে কবিগুরুর সবচেয়ে প্রিয় এবং গোপন দুর্বলতম স্থান ছিল তাঁর গান। তাঁর ধারণা জন্মেছিল, আর সব সৃষ্টি যদি মুছেও যায়, গান চিরকাল থেকে যাবে। কিন্তু উনি কি শুনতে পাচ্ছেন, কী গান এখন গাওয়া হচ্ছে।

কিছুদিন আকাশবাণী 'অডিশন বোর্ডের' সঙ্গে যুক্ত থাকায় এবং বারো চোদ্দ বছর একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় কিছু কিছু লেখবার সুযোগে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের গান শোনবার বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। সেটা বেশীর ভাগ সময়ে সৌভাগ্য না হয়ে দুর্ভাগ্যেই পর্যবসিত হয়েছে। আকাশবাণীতে প্রায় দু'শত শিল্পীর গান শুনে আমি বোধহয় মাত্র দুজনকে পাশ করাতে পেরেছি। শেষ পর্যন্ত 'অডিশন বোর্ড' ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি রবীন্দ্রসংগীতকে কর্তৃপক্ষ 'লাইট মিউজিকে'র নামাবলী চড়িয়ে রেখেছেন, সেকারণে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর রবীন্দ্রসংগীত শোনবার পর এবং দীর্ঘদিন গান শেখবার অভিজ্ঞতায় ঠিক

পনেবোজন শিল্পীর গান আমার আগ্রহ করে এখনও শুনতে ইচ্ছে করে। (কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর সংখ্যা কবিদের সংখ্যার থেকে কম নয়। আমার কাছে দুদলেরই মোটামুটি স্ট্যাটিস্‌টিকস্ আছে। কম করে তাঁরা পাঁচশত হবেন।) এঁরা হলেন সর্বশ্রী সুবিনয় রায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, তড়িৎ চৌধুরী, কমলা বসু, নীলিমা সেন, সুশীল চট্টোপাধ্যায় মায়া সেন, গীতা ঘটক, প্রসাদ সেন, ঋতু গুহ, বনানী ঘোষ, পুরবী মুখোপাধ্যায়, বুলবুল সেনগুপ্ত, এবং রনো গুহঠাকুরতা। রবীন্দ্রনাথের জীবন আদর্শ, রুচিবোধ ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তাঁর যে ছবিটি আমার মনে ভাসে তার সঙ্গে মিলিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চাই। এই ক'জন শিল্পী সেই আভাস মাঝেমধ্যে দিয়ে থাকেন। দু'চারজন হয়তো আরো আছেন। এ মুহূর্তে মনে আসেছে না। এর বাইরে যাঁরা রইলেন, তাঁদের গান কানে এলে শুনি, আগ্রহ করে শুনি নে। শতকরা ৯৫ ভাগ্য অশ্রাব্য।

এই তালিকায় আমি বাদ নিয়েছি তাঁদের যারা সত্তর-উর্ধ্ব—যেমন শৈলজারঞ্জন (মূলত শিক্ষক, কিন্তু একদা শান্তিনিকেতনে গাইতেন), সাহানা দেবী, অমিয়া ঠাকুর, মালতী ঘোষাল, শান্তিদেব ঘোষ, ইন্দুলেখা ঘোষ প্রভৃতিদের। বাদ দিয়েছি জর্জদা (দেবব্রত বিশ্বাস) এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে, যাঁরা প্রকৃত অর্থেই শিল্পী—কিন্তু বিগত দশ বছরে এঁদের গান-এর স্বাভাবিক মাধুর্য নঃ হয়েছে। আর যাঁরা গান ছেড়ে দিয়েছিলেন যেমন বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রায় দশ পনেরো বছর পূর্বেই গান গাইতেন, একবার কি দুবার লোকের মাঝে গেয়েছেন বছর আট আগে) অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, গীতা রক্ষিত, চিত্রা মজুমদার, বেলা ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

আর নাম করি নি তাঁদের যাঁরা নবীন। যাঁদের ওপর আমাদের ভরসা করতে হবে। বলতে দ্বিধা নেই, কুড়ি থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে বহু নবীনা আছেন যাঁরা সুরে, ছন্দে, গায়কীতে, রবীন্দ্রভাবনার আত্মীকরণে অনেক 'তথাকথিত জনপ্রিয়' শিল্পীদের লজ্জা দেবেন। এঁদের বিষয়ে এখনই বলা উচিত হবে না। লক্ষ্য করা যাক—ধীরে ধীরে এঁরা কতটা 'আত্মস্থ শিল্পী'তে পরিণত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে সমুচিত মর্যাদা দান করতে পারেন। মুস্কিল এই, এঁদের বেশীর ভাগ এরই মধ্যে খবরের কাগজের সমালোচকদের খাতির করতে শুরু করেছেন। যদিচ এঁরাই আমাদের শেষ আশা।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় এই তালিকা থেকে যে, সারা বছর জলসায় যে সব 'তথাকথিত জনপ্রিয়' শিল্পীরা গান করে থাকেন তাঁদের প্রায় কারুর নামই আমি করি নি। আমার ভালো লাগে না তাঁদের পরিবেশনের কায়দা, ভালো লাগে না তাঁদের 'অ-রাবীন্দ্রিক চাল-চলন' (অর্থাৎ শুদ্ধতা এবং রুচি মিলিয়ে একপ্রকার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের অভাব)। তাঁদের কারো গলা বেসুরো জোরে জোরে হারমনিয়মের শব্দে যা ঢাকতে হয়, গলায় স্থির (অচলপ্রতিষ্ঠ) সুর নেই, এমন ট্রেমেলো, যেন পপ্‌ সংগীত মনে করিয়ে দেয়, কণ্ঠ অমার্জিত, কখনো ভাবে-গদগদ, কখনো অসহ্য ন্যাকামি, অথবা অতিরিক্ত মেকানিক্যাল, কেউ বা আড়ষ্ট, 'স্টিফ'। উচ্চারণ-দুষ্টতা (একজন 'তথাকথিত জনপ্রিয়' শিল্পী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিন সকালে গান শুনিয়েছেন, 'আব্বার যদি ইচ্ছা কর আব্বার আসি ফিরে',) কারু কণ্ঠের ধ্বনি নাসিকা-নির্ভর, কারু শব্দ ভুল, বাক্যবন্ধ ভুল, কেউ স্থায়ী অংশ গাইবার পর অন্তরা গাইবেন দুবার, আসর জমাবার জন্য তিনবার, কেউ এমন টপ্পা ব্যবহার করবেন, যা বাণীপদ পাঠককেও হার মানাবে। কোন কোন শিল্পীর সাথে একই সঙ্গে ৮টি যন্ত্র বাজে, সেতার, বেহালা, এস্রাজ, বাঁশী, জলতরঙ্গ, গীটার এবং দু'জোড়া তবলা-বাযা। পাখোয়াজও রেখেছেন তাঁরা, যদিচ স্বচক্ষে দেখেছি, ধামার গাইবার সময় চোদ্দটি মাত্রা কর গুণছেন। পাঠক, বলতে পারেন, কেন এই সব শিল্পীদের বেসুরো গান আমরা শুনবো দিনের পর দিন—কেন এঁদের নাম শোনামাত্র 'রেডিও' বন্ধ করব না অথবা দূরদর্শনের সুইচ অফ্‌ করব না? পাঠক বলতে পারেন, অরুণ ভট্টাচার্যের কথায় কী আসে যায়। কিন্তু আমি জনে জনে কথা বলে দেখেছি। এই আক্ষেপ আমার একলার নয়, বহু বিদগ্ধ রবীন্দ্রসংগীত-শ্রোতার। বড় বড় কাগজগুলিও নানা কারণেই এসব কথা বলবেন না, আমি নিশ্চিত জানি। সাধারণ মানুষের বলবার জায়গা নেই হয়তো লেখার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে থাকলেও হয়তো কারু মনে আঘাত দিতে চান না। আমিও চাই না, কিন্তু এগুলি নীরবে সহ্য করে গেলে যাঁর গান গেয়ে তথাকথিত জনপ্রিয় শিল্পীরা বাড়ি গাড়ি করছেন, সেই ঋষিপ্রতিম মানুষটির মনে যে এখনও আঘাত পৌঁছাচ্ছে, তা আমি বিশ্বাস করি।

এবারে আসল কথায় আসা যাক্‌। এই যে অবস্থা এর জন্য বিশেষ কোন

সংস্থাকে দায়ী করা যায় না। তবু, যদি দায়ী করতে হয়, করব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং শিক্ষকদের। তাঁরা আদর্শচ্যুত হয়েছেন। অথবা রবীন্দ্র-আদর্শ বিষয়ে কোন পরোয়া করেন না, অথবা জানেন না রবীন্দ্র-আদর্শ ব্যাপারটা কি। 'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্র-বিষয়ে সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান। লাঠি-ঘোরানো বিশ্বভারতীর কাজ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করবার সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব বিশ্বভারতীর। কেন 'মিউজিক বোর্ডে'র মাননীয় সদস্যগণ উদার হস্তে গান পাশ করেন?—তাঁরা কেন জনপ্রিয়তার মোহে পড়ে কঠোর হতে পারেন না। যে তিনজনের নাম শুনেছি সদস্য হিসেবে, তাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পী। আমারও শ্রদ্ধেয়। তাঁদের কাকে ভয়? শিল্পীদের ভয়। রেকর্ড কোম্পানীকে ভয়। না ভক্তের ভয়? কেন তাঁরা রাম শ্যাম যদু মধুর রেকর্ড দিনের পর দিন পাশ করেন? শুধুমাত্র স্বরলিপি ঠিক রেখে গাইলেই পাশ করাতে হবে? (কোন কোন ক্ষেত্রে তাও হয় না এমন মৌখিক অনুযোগ করেছেন শৈলজারঞ্জন—তাঁরই স্বরলিপি-করা কয়েকটি গানের ক্ষেত্রে) 'কোয়ালিটি' বলে কি কোন বস্তু নেই, রুচিবান শ্রোতাদের কথা কি তাঁদের মনে আসে না একবারও? তাঁরা কি শুধুই সররাবী বিচারক, শ্রোতা নন? তাঁদের কানে কি গলা-কাঁপানো সুর ধরা পড়ে না? হরেক রকম বাজনা কি তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় না?

এবার ফিরে আসি প্রথম কথায়। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আলোচনা-সভা ডাকুন বিশ্বভারতী। সারা দেশের গুণীজন আসুন। শিল্পীদের গানের উৎকর্ষ বিচার করুন। একবার নয়, মাঝেমধ্যেই রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষত, সংগীততত্ত্ব এবং সংগীত-ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গবেষণামূলক কেন্দ্র গড়ে তুলুন বিশ্বভারতী। প্রাণ সঞ্চার করুন। যেভাবে রবীন্দ্রসংগীত অতিক্রান্ত 'আধুনিক' সংগীতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাকে রোধ করুন। সংবাদপত্রেরও একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রাম শ্যাম যদু মধুকে দিয়ে গানের সমালোচনা না করিয়ে এমন লেখক খুঁজুন যাঁরা দীর্ঘদিন সদ্‌গুরুর কাছে নিষ্ঠাভরে গান শিখেছেন, 'কাব্য' না করে সহজ গদ্যে সমালোচনা করতে পারেন। তাঁরাও আসুন রবীন্দ্র-আলোচনায়। তাঁদের বক্তব্য রাখুন। শেষ কথা, বিশ্বভারতী আবার আমাদের রবীন্দ্র-আলোচনার পীঠস্থান হোক। আমি জানি, শৈলজারঞ্জনের

কাছে এখনো গানের ভাণ্ডার শূন্য হয় নি। সম্প্রতি, 'আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি' (আখর যুক্ত) রবীন্দ্রসংগীতটি সুরঙ্গমা পত্রিকা রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক সম্মেলন বিশেষ সংখ্যায় (১৯৮০) প্রকাশিত হয়েছে। বাকি গানগুলি যা যা আছে শৈলজারঞ্জনের কাছ থেকে নিয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশ করুন। শৈলজারঞ্জনের অনেক বয়স হয়েছে, এটা মনে রাখা দরকার।

২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি-প্রাঙ্গণে যে অনুষ্ঠান হয়, তা ক্রমশ 'জলসা'য় পরিণত হচ্ছে। কবিগুরুর সামান্য ইচ্ছাটা কি অন্তত একদিনের জন্যও পালন করা যায় না? নিবেদন এই

১. শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী নীলিমা সেন এবং শ্রীমতী মায়া সেনের মত অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিল্পী দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাতেও কর্তৃপক্ষ তাঁদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শিল্পী নির্বাচন করেন কি?

২ বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয় নিজে ২৫শে বৈশাখ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি-সভাগুলিতে আসেন না কেন?

৩ 'রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি'তে একজনও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ নেই—যতদূর জানি। অথচ তারাই পুরো ব্যাপারটি 'ম্যানেজ' করেন। বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ তা নীরবে সহ্য করেন কেন?

৪. রবীন্দ্রসংগীত বিভাগে চারটি তানপুরা কেনা হয়েছে। গতবছর একটি তানপুরাও দেখি নি কেন? সম্মেলক গানে হারমনিয়ম থাকলে হয়তো সুবিধে হতে পারে, কিন্তু একক সংগীতে তানপুরা থাকবে না কেন? এস্রাজ ক্রমশ বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে কেন? রবীন্দ্রনাথের গানের আসর ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গনেই একটি 'আধুনিক গানের আসর'এর রূপ নিচ্ছে কেন? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর গানের পরিবেশন চেয়েছিলেন অন্তত তাঁর জন্মদিনে তাঁরই বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাঁর সে সামান্যতম ইচ্ছাটা পূরণ হবে না কেন?

৫ বছরের পর বছর কবিতা পাঠ করেন কারা? কবিগুরুর আসরে তাঁরা কি কোন কবি? তাঁরা হয়ত জনপ্রিয় আবৃত্তিকার, আমাদের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু কবির জন্মোৎসবে কবিরা উপস্থিত থাকলে ব্যাপারটা শোভন হয় না কি? কেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীর লক্ষ্য থাকবে কয়েকজন 'তথাকথিত জনপ্রিয়'

আবৃত্তিকারদের ওপর ? সর্বশ্রী বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ প্রভৃতি কবিরা এক এক বার করে কেন কবিগুরুর জন্মোৎসবে কবিতা পড়বেন না ? জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, মনীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিরা যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর জন্মদিনে জোড়াসাঁকোয় পড়তেন তবে ব্যাপারটা কি খুব নিন্দনীয় হোত ?

২৫শে বৈশাখের ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গণে প্রভাতী অনুষ্ঠানটিকে 'জলসা'র পরিবর্তে একটি মার্জিত রুচি-শুভ্র পুণ্য উৎসবে পরিণত করুন।

বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়ের কাছে এই সব প্রশ্ন ও নিবেদন রইল। রবীন্দ্রভারতীর শ্রদ্ধেয় উপাচার্যও নিশ্চয়ই এসব ভাবছেন।

অরুণ ভট্টাচার্য

শুদ্ধ চৈতন্যের কবি রামপ্রসাদ সেন

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

১.

হিউয়েন সিয়াঙের সময় থেকে আরম্ভ করে যে সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের ধারা বঙ্গভূমিতে প্রবাহমান, বৌদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবের মধ্য দিয়ে নানা ভাঙা-গড়ার যে প্রবাহ সর্বদা বাঙালী মননে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি করে এসেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা শেষবারের মত মোর ফিরেছে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবে। সেই অভিনব ধারারই সৃষ্টিধর্মী গতিশীলতার প্রকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই নবচেতনার প্রথম রূপকার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। জীর্ণমৃত পুরাতন ধারা লুপ্ত হ'য়ে কিভাবে নতুন ধাবামান ঘটলো রামপ্রসাদ জীবনী-আবিষ্কার প্রধানতঃ এই ইতিহাস।

সঙ্গীতরচয়িতা ও সাধকরূপেই রামপ্রসাদ সাধারণ জনসমক্ষে পরিচিত। তিনি যে 'কালীকীর্তনে'র রচয়িতা ছিলেন, তার খবর অনেকে রাখেন না। আবার তিনি যে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন, এ সংবাদটি অনেকের কাছে যেমন অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর। এই বিস্ময়ের সূত্র ধরেই সম্ভবতঃ 'পদাবলী'র রামপ্রসাদ ও 'বিদ্যাসুন্দরে'র রামপ্রসাদকে বিভিন্ন জন ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উভয় রামপ্রসাদই এক এবং 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থেই রামপ্রসাদ-জীবনীর অধিকাংশ উপকরণ রয়েছে। রামপ্রসাদের পদে তাঁর আধ্যাত্মিক মননের ক্রমোন্নতির ছাপ সুস্পষ্ট, পদে অধ্যাত্ম সচেতনতা যতই পরিস্ফুট হয়েছে, পার্থিব সুখ সুবিধার উল্লেখ পদ থেকে ততই অপসৃত হয়েছে। মায়ের অলৌকিকরূপের নানা পরিকল্পনায় কবি তখন বিভোর ; এরপর আর এক জাতীয় অতৃপ্তি ও গ্লানির প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ করে, কবির কণ্ঠে মাকে না পাওয়ার জন্য বেদনা সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত, সাধক রামপ্রসাদ এই অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে সাধনার অনেক উচ্চ সোপানে অসীম। কিন্তু সিদ্ধি তখনও হয় নি, তখন পর্যন্ত প্রাপ্তির জন্য

আকুলতা, অপ্রাপ্তির জন্য ক্রন্দন, সাধক ও কবির মেশামেশি রূপ তখন। একেবারে শেষ স্তরের পদ সাধকরূপেই সুস্পষ্ট, এখানে শুধু মায়ের জয়গান, মায়ের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা। মায়ের রূপ উদার সমন্বয়বাদী; কিভাবে সার্থক রূপে সহজে মাকে পাওয়া যায়, তারই নির্দেশ পাওয়া যায় পদগুলিতে। এই পদগুলি পড়ে অনেকে নির্দ্বিধায় রামপ্রসাদকে একেশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, পৌত্তলিকতা-বিরোধী প্রভৃতি বলে ফেলেছেন। এ প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্যের 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের "বাহ্য পূজা" উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদের পদে 'তারা আমার নিরাকারা যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার' 'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি' জাতীয় কথাগুলি পূর্বোক্ত মন্তব্যের কারণ।

সাধক শিবচন্দ্র এই মন্তব্যকারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'তিনি সাকার ব্রহ্ম মানিতেন কিনা, সাকার উপাসনা করিতেন কিনা, মৃত্যুর পূর্ব রাত্রিতেও পূজা করিয়া মৃত্যুকালে মায়ের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া সিদ্ধ সাধক মাহাত্মা তাহার জলন্ত প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবনে ত গানে গানে প্রাণে-প্রাণে মূর্তিমতী মায়ের নৃত্য। ইহার পরেও রামপ্রসাদের সাকার উপাসনা ছিল না—ইহা যিনি বলিতে পারেন রামপ্রসাদের আত্মা ছিল না, এ কথাও তাঁহার মুখেই শোভা পায়। 'মন। তোমার এই ভ্রম গেল না।' পদে মৃন্ময়ী মূর্তিনির্মাণের অসারতার কথা আছে। এই পদটি সম্বন্ধে সাধক শিবচন্দ্রের অভিমত হল —'উল্লিখিত গানটি যে রামপ্রসাদের অতি অপক্কাবস্থার আমরা ক্রমে তার পরিচয় দিতেছি। এখন প্রথমতঃ এটুকু বুঝিবার কথা যে, যে সময়ে রামপ্রসাদের এই গান সেই সময়ে তিনি জ্ঞান রাজ্যের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যস্তরে অবতীর্ণ, শেষস্তরে অপ্রবিষ্ট এবং সাধনা রাজ্যে নব প্রবিষ্ট মাত্র, তাই ভক্তিতত্ত্ব নিরপেক্ষ কেবল জ্ঞানের সহিত সাধনাকে সম্মিলিত করিতে গিয়াই উপক্রম উপসংহার স্থির রাখিতে পারেন নাই।'

২

শ্রীরামপুরে মিশনারি সাহেব W Ward-এর 'A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos' গ্রন্থখানি অষ্টাদশ ও গোড়াকার ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, ইতিহাস ও ধর্মের একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথম খণ্ডের ৫১৯ পৃষ্ঠায় কালিকামঙ্গল রচয়িতা 'শূদ্র' কৃষ্ণরাম

এবং 'ব্রাহ্মণ' কবিবল্লভ, অন্নদামঙ্গলরচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়, পঞ্চানন গীতরচয়িতা অযোধ্যারাম, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী-রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদের উল্লেখ আছে। দেশীয় কবি শুধু এই ক'জন। কবি বা সাধকরূপে রামপ্রসাদের উল্লেখ এই সংস্করণের দুটি খণ্ডের কোথাও নাই। ১৮২২ এ লণ্ডন থেকে এই গ্রন্থের যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে বামপ্রসাদের উল্লেখ আছে 'কালিকামঙ্গল' রচয়িতা একজন শূদ্র বলে। রামপ্রসাদ জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু প্রথম সংস্করণে তাঁর উল্লেখ হল না কেন? Ward সাহেবের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদেব কাছে তাঁর অপরিচিতিটুকু বিস্ময় উদ্রেক করে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'রামপ্রসাদ' প্রবন্ধে রামপ্রসাদের প্রথম জীবনে জমিদারী সেরেস্তায় খাতা লেখা ও মাসিক তের টাকা বৃত্তিলাভ প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখেছেন—"এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতাস্থ নববঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচবণ মিত্রেব নিকট মুহুরিগিবি কর্ম করিতেন। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী—ড ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, পৃঃ ৫০)

গোকুলচন্দ্র ঘোষালের বাড়ি রামপ্রসাদ খাতা লিখলে এবং তাঁব নিকট থেকে বৃত্তিলাভ করলে ঘটনাটি ঘোষাল পরিবাবে সাধকরূপে বামপ্রসাদকে সুবিদিত করে বেখেছিল। তখনকাব দিনের ধনী দরিদ্র সকলের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলা চলে, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পক্ষে ভাইয়ের আশ্রিত সাধক-কবিটিকে এড়িয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। রামপ্রসাদের সাধক বা কবিখ্যাতি হয়তো তেমন প্রসারিত বা আকর্ষণীয় হযে ওঠে নি, কিন্তু তিনি যে কোনদিন গোকুলচন্দ্র ঘোষালের বাড়ি খাতা লেখেন নি নিশ্চিতভাবে তা ধরে নেওয়া যায়।

লোকনাথ ঘোষের The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars &c (১৮৮১ খৃঃ) গ্রন্থটি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর নতুন সৃষ্ট রাজা জমিদাবদেব কুলজী গ্রন্থ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কৃষ্ণনগর রাজবংশের পরিচয় বিস্তৃতভাবে বিবৃত হযেছে। এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নানা কীর্তিব বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর সভাস্থ পণ্ডিত ও কবিদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে লেখক রামপ্রসাদেব উল্লেখ করেছেন। "Ramprasad Sen

a Sanskrit Scholar" (২য় খণ্ড পৃঃ ৩৬০)—রামপ্রসাদের শুধু এই পরিচয়টুকু পাওয়া যায়। দয়ালচন্দ্র ঘোষের "প্রসাদ-প্রসঙ্গে"র প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর দয়ালচন্দ্র ঘোষকেই রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ গবেষক বলা হয়। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বিজ্ঞাপনে লেখক লিখেছেন ' "তিন বৎসরেরও অধিককালের পরিশ্রমের আজ্ঞ পরিসমাপ্তি হইল।' অর্থাৎ লেখক ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম রামপ্রসাদ অনুসন্ধানরত হলেও তাঁর সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাচ্ছিলেন না। শেষে এক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকের কাছে তিনটি তথ্য পেলেন। ১ রামপ্রসাদ বৈদ্য ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক, ২ তিনি শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক, ৩ তার বাড়ি কুমারহট্টে। এরপর রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হওয়ায় আরও তথ্য ও কিছু পদ পেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় 'কালীকীর্তন" প্রকাশিত করেন। ১২৬০ বঙ্গাব্দের পৌষ অর্থাৎ ১৮৫৩তে "সংবাদপ্রভাকরে" রামপ্রসাদ-জীবনী প্রকাশিত হয়েছে এবং আগে ও পরের সংখ্যায় আরও পদ এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

অথচ ঢাকায় বসে দয়ালচন্দ্র ঘোষকে ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে এতখানি অন্ধকার হাতড়াতে হয়েছিল জেনে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রসারতার দৈন্য দেখে দুঃখিত হতে হয়। 'সংবাদপ্রভাকর' জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত পত্রিকা ছিল এবং ঢাকায় অবশ্যই শিক্ষিত সাধারণের কাছে তার প্রচার ছিল। অথচ দয়ালচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকায় রামপ্রসাদকে পৌঁছে দিতে পারেন নি। রামপ্রসাদই সম্ভবতঃ এমনি গমনভীরু প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাঁর সময়ে জীবনীকারেরা কি করে কুমারহট্ট কলকাতায় তাঁর অগাধ যোগাযোগের কথা বলেন বোঝা যায় না। দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম একবারও করেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সাধককবি রামপ্রসাদের প্রথম জীবনীকার। পরবর্তী সকল জীবনী তার ওপর ভিত্তি করে রচিত। অনেক অনুসন্ধানে দু-একটি দলিল-টলিল কেউ বা পেয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জীবনীগ্রন্থ বিপুলকায় হয়েছে কল্পিত কাহিনীর ভারে।

১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দীননাথ

গঙ্গোপাধ্যায লিখেছেন, "যে ভূমি-খণ্ডের উপর রামপ্রসাদের বাসগৃহ ছিল, তাহা দেখিলে মনে বড দুঃখ হয়। বহুকাল তাহা জঙ্গলপূর্ণ ছিল। সম্প্রতি হালিসহর বাসিগণ এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিযা সেই পবিত্র স্থানটির প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। স্থানীয পূর্ণিমা-ব্রত সামিতির সভ্যগণের যত্নে গত দশ বৎসর হইতে মহাত্মা রামপ্রসাদের স্মরণার্থে একটি মেলা হইতেছে। ইহা প্রসাদ মেলা নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর কালীপূজা হইয়া থাকে। হালিশহরের হিতৈষিণী সভা একটি 'প্রসাদ প্রাসাদ' নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।"

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ জীবনীর শেষের দিকে বলেছেন, "৬০ বৎসর বযসের কিঞ্চিত পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবেক না। প্রাচীন লোকেরা কহেন 'তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জনের সময় পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইযা আমাদের সঙ্গে আইস। আমি পদব্রজে চলিলাম" এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দিনেশচন্দ্র ভট্টাচায রামপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুর সময় যথাক্রমে ১১২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭২০ খৃঃ এবং ১১৮৮ বঙ্গাব্দের ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার বা ১৬ অক্টোবর ১৭৮১ খৃঃ বলে নিরূপণ করেছেন।

রামপ্রসাদের জীবিকার্জনের স্থান ও মনিবব্যক্তিটি এখনও সমস্যা হ'যে আছে, তাঁর লেখা প্রথম পদ বলে উল্লিখিত পদটিও (দাও মা আমায় তবিলদারী) কি এই সমস্যার মধ্যে গিযে পড়ে না? স্থান ও পাত্র নির্দিষ্ট না হলে পদটির নির্দিষ্ট মর্যাদাই বা দেওয়া যায় কি করে? রামপ্রসাদ-জীবনী রচনা করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্তই এই সব সমস্যার সৃষ্টি করে গিযেছেন। সমাধান কিছুই দিযে যান নি। অবশ্য এই সমস্যা সৃষ্টি করেও তিনি চিরকালের জন্য রামপ্রসাদকে বাঁচিযে গেছেন। রামপ্রসাদ যে জীবিকার্জনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন তাঁর পদেই তার প্রমাণ রয়েছে,

কাজ হারালেম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে॥

যখন তার ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমাব বশে।।
এখন আমার ধন উপার্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দাবা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে।।

৩.

বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম বাংলাদেশে ঐতিহাসিক যুগে বিশেষ করে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, দুটি ধারার প্রাধান্য সব সময় লক্ষ্য করা গেছে। ১৪৮৬ খৃঃ নবদ্বীপে নরদেহে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বের ধর্মচিত্র বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে বিধৃত। আমরা পূর্বের একটি উল্লেখে দেখেছি শাক্ত প্রভাব তখন অত্যন্ত বেশী। বৈষ্ণব যে ছিলেন তারও প্রমাণ দেখেছি। অদ্বৈত আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরী সবচেয়ে বড দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানগত বৈষ্ণবধর্ম তখন এখানে ছিল না। ছিল চতুর্দিকে শাক্তেব ছড়াছড়ি, বৃন্দাবনদাস লিখেছেন

সকল সংসার মত্ত ব্যাবহাব-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নেই বাসে।।
বাসুলী পূজায়ে কেহ নানা উপহারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা কবে।

বৃন্দাবনদাসেব 'চৈতন্যভাগবত' পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলাদেশের একখানি প্রামাণিক তথ্য গ্রন্থ। নবদ্বীপ সর্বপ্রকারে তখন বাঙালী হিন্দু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সুতবাং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা থেকে আমরা তৎকালীন বাঙালী হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্য-নির্ভর চিত্র পাই। এই চিত্রটি সংক্ষেপে হল সমাজেব সর্বস্তরে শাক্তধর্মের প্রাধান্য এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাহীনতা। শ্রীচৈতন্য দেহরক্ষা করেন ১৫৩৩ খৃঃ-তে। তাঁর বৈষ্ণবীয় লীলাভূমি ছিল নীলাচল। সন্ন্যাসগ্রহণের পরই তিনি নীলাচলে চলে যান। ভক্তরা অবিরত সেখানে যাতায়াত করেন। এবং প্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে থাকার নির্দেশ দেন বাণী প্রচারের জন্য।

কিন্তু তত্ত্বগত শিক্ষা দিলেন যাঁদের তাঁরা তাঁর তিরোধানের পর রইলেন বৃন্দাবনে। সেখান থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ

বাহিত হয়ে বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি গৌড়ে এলো এবং খেতুরি উৎসবের পরে আনুমানিক ১৫৮২ খৃঃ তাই বাঙ্গালীর বৈষ্ণবরসের আচরণবিধিতে পরিণত হল। জাহ্নবীদেবী ও বীরভদ্রও বৃন্দাবন ঘুরে এসে বিধিমতে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠায় ব্রত হলেন। শ্রীচৈতন্য-সময়কালে বৈষ্ণবধর্মের যে জোয়ার বাংলাদেশকে অধিকার করেছিল তাঁর তিরোধানের পর উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে তা স্তিমিত হয়ে আসে। শ্রীনিবাসাদির কার্য, এই অভাবকে দূর করে ধর্ম হিসেবে বৈষ্ণবতাকে শাক্ত কাঠামোয় স্থাপন করে।

শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় মহাসত্তার কথা মনে রেখেও বলা চলে বাংলাদেশের প্রথম এবং সার্থক সমাজ সংস্কারকরূপে তাঁর নামোল্লেখ করা যায়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ রদ, সতীদাহ প্রথা দমন প্রভৃতি সামাজিক প্রতিটি আন্দোলনের প্রাথমিক যে কটি সামাজিক আন্দোলন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনকে আলোড়িত করেছে তার সবগুলিরই অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় নানা আচরণ ও উপদেশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

শাক্ত ধর্মের প্রবল প্রসার যেমন শ্রীচৈতন্য সময়ে বর্তমান ছিল, শ্রীচৈতন্য প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যে তার প্রসার কিছুমাত্র কমে নি ষোড়শ শতাব্দীর থেকে রচিত তন্ত্রগুলি তার প্রমাণ দেয়। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত রামানুজ প্রেমধর্ম তান্ত্রিকতার একটি সহজ ও ভদ্র সংস্করণে পরিণত হল তার তিরোধানের অল্প পরেই, কারণ তার পরেই বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এজাতীয় জাগরণের পরিচয় আছে। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবকে স্থানবিশেষে কমিয়ে দিলেও এবং এর প্রকাশকে কিছু পরিমাণে সাত্বিকতামণ্ডিত করলেও শাক্তধর্ম আপন অস্তিত্বে শুধু বলীয়ান ছিল না, বৈষ্ণবধর্মকে ম্লান করবারও আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছিল। তবে মধ্যযুগীয় বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে শাক্তধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের ব্যাপারটি কোন ক্রমেই ছোট করা যায় না।

একসময় বৌদ্ধধর্মের সারটুকু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধকে হিন্দুর অবতারে প্রমাণ করে ভারতে এক অপূর্ব ধর্মসমন্বয় ঘটায়। হিন্দুধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব এবং শেষে হিন্দুধর্মের সঙ্গেই তার সমন্বয়প্রচেষ্টা অনুরূপ পরিচয়ই পাওয়া যায় বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রে। শাক্ত ধর্মের প্রবল

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যুগ প্রয়োজনেই বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব, অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত কবি রামপ্রসাদ গাইলেন

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে—
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে একথা বিষম ভারী॥

অন্যত্র

ও মন, তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত,
হরি-হর তোর এক হ'লো না।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল কথা মনে বোঝেনা।
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে,
ক'রে আত্ম প্রতারণা।

শ্যামার উদ্দেশ্যে বললেন

ব্রজেতে বালিকা হ'য়ে যশোদাকে মা বলিলি
আবার কৃষ্ণ হয়ে মাটি খেয়ে
মুখে ত্রিভুবন দেখালি॥

কবি বেদ আগম, পুরাণগ্রন্থ অনুসন্ধান করে শ্যামার কি রূপের পরিচয় পেলেন?

কালি ব্রহ্মময়ি গো।
বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজতালাসি
মহাকালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥

রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার একটি কারণ যেমন মানব মনের সর্বাবস্থার রূপসাজের মধ্যে রয়েছে তেমনি আর কারণটি তাঁর ধর্মীয় উদারতা। তিনি চিরকালের জন্য সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিলেন। তিনি বাংলার চির-প্রসিদ্ধ ধর্মধারাগুলির মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছেন। "আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে" বলে ঘোষণার মধ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিদ্বেষের

অবসান ঘটিয়েছেন। তাঁব ধর্মদৃষ্টির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এই পদটিব মধ্যে নিহিত—

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে
ওবে উন্মত্ত, আঁধাব ঘরে॥
সে যে ভাবেব বিষয ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্তে পাবে
মন অগ্রে শশী বশীভূত,
কর তোমার শক্তিসারে
প্রসাদ বলে আমি মাতৃভাবে তত্ত্ব কবি যাঁবে
সেটা চাতবে কি ভাঙ্‌বে। হাঁড়ি বুঝবে মন ঠারে ঠোরে॥

মাতৃভাবে সাধনা এই ভাবেরই সাধনা। প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরারাধনা উপলব্ধির বিষয়। তাই শাস্ত্র বা পূজার উপকবণ তাঁব কাছে তুচ্ছ তাই তিনি বলেন

জাঁক জমক কবলে পূজা অহঙ্কাব হয মনে মনে
তুমি লুকিয়ে তাঁবে কববে পূজা,
জানবে না বে জগজ্জনে।

সাধক কবি বামপ্রসাদেব করুণাপূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁব সাধক বিষয়ক পদগুলির অন্তর্নিহিত ভাববস্তু। তাঁব জনপ্রিয়তার মূলেও এই উদাব দৃষ্টিভঙ্গি।

রামপ্রসাদের কয়েকটি কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মবণ করা যেতে পাবে

১ (প্রসাদী সুব, তাল—একতালা)

মন রে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন বৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
(মন রে আমাব)
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তাব কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা বাজে আপ্ত হবে জান না
(মন বে আমার)
আছে একতারে মন এই বেলা, তুই চুটিযে ফসল কেটে নে না॥
গুরুবীজ রোপণ করে বীজ, ভক্তিবারি তায সেচ না।

২. (প্রসাদী সুর তাল—একতালা)

মন তোমারে করি মানা

তুমি পবের আশা আর কবো না॥

তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে মর কার ভাবনা।

ওবে তোর ভাবনা কেউ ভাবে না, ভাব দেখে কি যায় না জানা।

সুখের ভাগ অনেকে হয, দুঃখেব ভাগী কেউ হবে না।

যখন শমন এসে ধরবে কেশে তখন কেবল ত্রিনয়না।

সুদিন দেখে অধীন জনে করবে কত উপাসনা।

সেদিন কুদিন হবে বলে প্রসাদ বলে,

সেদিন অধীন কেউ রয় না॥

৩ (প্রসাদী সুব—তাল একতালা)

মরলেম্ ভূতেব বেগাব খেটে।

আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে॥

নিজে হই সরকারী মুটে মিছে মরি বেগাব খেটে

আমি দিন মজুরী—নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায গো বেঁটে॥

পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।

তারা কাব কথা কেও শুনে না, দিন তো আমাব কেটে

যেমন অন্ধজনে হাবা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে।

আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা, কর্মদোযে যায় গো ছুটে॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মমযী কর্মডুরি দেনা কেটে।

প্রাণ যাবার বেলা এই কব মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায যেন ফেটে

(প্রসাদী সুর, তাল—একতালা)

৪. মা আমায় ঘুরাবে কত।

কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥

ভবের গাছে জুড়ে দিযে মা, পাক দিতেছ অবিরত

তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত ॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত।
মা শব্দ মমতাযুত কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে মা চোখের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয়পদ ॥
কুপুত্র হয় অনেক গো মা কুমাতা নয় কখনও
প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার, করে রেখো পদানত ॥

৫. মহাকালের মনোমোহিনী সদানন্দময়ী কালী ॥
তুমি আপনি নাচ আপন সুখে
আপনি দাও মা করতালি ॥
আদিরূপা সনাতনী প্রকৃতি পরমা কালী
মা গো। ব্রহ্মাণ্ড না ছিল যখন
মুণ্ড মালা কোথায় পালি ॥
ব্রজেতে বালিকা হয়ে যশোদাকে মা বলিলি।
আবার কৃষ্ণ হয় মাটি খেয়ে
মুখে ত্রিভুবন দেখালি।
মনের সাধে রামপ্রসাদে দেখে দিচ্ছে গালাগালি
ওলো সর্বনাশী এবে অসি
ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটা থালি।

(প্রসাদী সুর—একতালা)

৬. শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভব সংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে, মন ঘুড়ি, আশা বায়ু বাঁধা পথে মায়া-দড়ি

কাক গণ্ডী-মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে হেসে দেও মা হাত চাপড়ি
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়বে খেয়ে তাড়াতাড়ি।

৭ (রাগিণী যোগিয়া, তাল—একতালা)

(আমার) সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না।
যেথা আছে শুধু ভালোবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি।
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না
আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা ॥

৮ সাবাস্ মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি।
(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি
এমন বাজিকরের মেয়ে, বাখলি বাবারে পাগল সাজায়ে,
নিজে গুণময়ী—হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায় নি ত্রিপুরারি।
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি? তুইও বুঝি পাগল হলি।

[কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের পাঠক এবং রসিকের কাছে অতি-পরিচিত। তবু নতুন করে সংযোজনের কারণ বলে আমি মনে করি দুটি বিষয়ে। প্রথমত, রামপ্রসাদের কবিতায় 'মন' নামক বিষয়টি যে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতীক তা বারবার পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আজকাল আমরা কবিতায় যে ধরণের শব্দ ব্যবহার করে থাকি, সহজ, আটপৌরে অথচ সাবলীল, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রামপ্রসাদ দু'শ বছরেরও পূর্বে কত অনায়াসে সেইসব শব্দ এবং ইডিয়ম্ ব্যবহার করেছেন।

সম্পাদক উত্তরস্থবি]

বটকৃষ্ণ দাস

হে বৃক্ষ, হে বৃক্ষরাজি

যে কোনো মুহূর্তে সেই অলৌকিক পাখি আসতে পারে
আমি তাই সমস্ত বৃক্ষকে
সজাগ রেখেছি, যেন টু শব্দ না ক'রে
তারা সব স্থির থাকে। নিকচ্ছার প্রান্তরে এখন
ধীর পায়ে হেঁটে যায় হেমন্তের বনেদী রোদ্দুর।
শীতের মলিদা গায়ে দিয়ে
হে বৃক্ষ, হে বৃক্ষরাজি, হে আমার দুঃস্থ বনস্থলী
এবার সুস্থির হও, নিজের ছায়ায় চ'লে এসো।

আদিগন্ত রৌদ্রে ঢের দুলিয়েছো শাখা ও প্রশাখা—
বাচাল বাতাস খেলা ক'রে গেছে পাতায় পাতায়,
এখন বিগত দিন। রৌদ্র নেই। ক্রমশ নীলিমা
নিটোল দ্রাক্ষার মতো অন্ধকারে গাঢ় হ'য়ে আসে।
হে বৃক্ষ, হে বৃক্ষরাজি, সময়ের মনিবন্ধে ঘড়ি
তীব্র রেডিয়মে জ্বলে। অতএব আমূল শরীর
এবার সংহত ক'রে প্রার্থনায় নতজানু হও
দূরের মন্দিরে বাজে আরতির শেষ ঘণ্টাধ্বনি।

হে বৃক্ষ, হে বৃক্ষরাজি, এবার সমিধ হ'য়ে ওঠো।
যে কোনো মুহূর্তে সেই অলৌকিক পাখি আসতে পারে॥

বাড়ি ফেরা

[অবনীভূষণ রায়, বন্ধুবরেষু]

কিছু দুঃখ থাকে। কিছু রমণীয় দুঃখ চিরকাল
থেকে যায়। কে আর দুহাত ভ'রে অমল আকাশ
নিয়ে বাড়ি যেতে পাবে? মাঝপথে বৃষ্টি আসে ঝেঁপে—
প্রিয় পরিচিত মুখ, মুখের জ্যোৎস্না মুছে যায়।
বৃষ্টি আসে। তমালের নীলাঞ্জন ছায়া গাঢ় হ'লে
যমুনায় বাঁশি বাজে। বৃষ্টি নামে বুকেব ভিতর।

কিছু দুঃখ থাকে। কিছু রমণীয় দুঃখ চিরকাল
থেকে যায়। ভোরের শিশির, রোদ, রোদেব ভিতব
মাঠের সবুজ খুশি, নিরিবিলি নদীব আহ্লাদ
সব শেষ হ'লে পর অতর্কিতে বৃষ্টি নেমে আসে।
কোথায় কদম ফোটে। হু-হু হাওয়া কেঁদে উঠে বুকে
শখের ফুলদানি, ছবি, বাতিঝাড়, জাপানী পুতুল
চুরমার ক'রে ভাঙে। বেলোয়াবী দিন চ'লে গেলে
বুকের ভিতর ব'সে সুন্দবীরা কোমল নিখাদে
উজ্জ্বল বিষাদগুলি নিয়ে জলতরঙ্গ বাজায়।
অমল আকাশ নিয়ে কেউ বাড়ি ফেরে না কখনো॥

ঈশ্বরীকে

ঈশ্বরী, আমাকে তুমি সর্বস্বান্ত করেছো কৌশলে।
এবার গুটিয়ে নাও ঠাণ্ডা হিম করুণার হাত,
ফিরে নাও রাজ্যপাট, সিংহাসন যা কিছু বৈভব—
এই সুখ এই শান্তি, যাবতীয় নোংরা আবর্জনা।

আকণ্ঠ সুখের বিষে জর্জরিত সমস্ত শরীর।
অযাচিত দাক্ষিণ্যের ভারে বাঁকছে আমূল শিরদাঁড়া
তোর কাছে কোনোদিন এ-প্রার্থনা করি নি ঈশ্বরী—
তবু কেন এতো সুখ। এমন সুখের বিড়ম্বনা।

তোমার প্রেমিক আমি। প্রেমের অপর নাম যদি
দুঃখ হয়, তাহলে তো দুঃখই আমার প্রাপ্য। তুমি
আমাকে আমার প্রাপ্য দাও। আমি কঠিন অসুখে
নিজেকে অঙ্গার গ'ড়ে তুলি তোমার প্রতিমা।

ঈশ্বরী, আমার রক্তে বেণী বাঁধো। তৎপূর্বে আমায়
মুগ্ধ দুঃশাসন করো। তুমি হও শিল্পের দ্রৌপদী।

একটি শব্দের জন্যে

একটি শব্দের জন্যে হাহাকার কিছুতে থামে না।
অথচ স্ত্রীপুত্রকন্যা ঘরবাড়ি সমস্ত সংসার
রীতিমতো জমজমাট। ভোরে চা। বাজার। ট্যুইশন।
নাকে মুখে গুঁজে স্কুল। বিকেল চারটেয় বাড়ি ফিরে
জলখাবার। রাত্রে তাস। তারপর সাড়ে বারোটায়
বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে এপাশ ওপাশ—
ঘুমের প্রার্থনা, ঘুম। হঠাৎ দুঃস্বপ্নে জেগে ওঠা।
সব যথারীতি চলে। কিঞ্চিদপি ব্যতিক্রম নেই।

দারাপুত্রপরিবারবান্ধববেষ্টিত দিনগুলি
স্বাভাবিক কেটে যায়। সুখদুঃখ আনন্দবেদনা
হাত জড়াজড়ি ক'রে চলে ফেরে বুকের ভিতর।
অথচ একটি শব্দ, একটি শব্দের জন্যে শুধু

আমূল উৎকর্ণ থাকে সমস্ত শরীর। ধুলো জমে—
ধুলো জমে অকৃতার্থ দীর্ঘ দিনপঞ্জীর পাতায়,
শরীরে, ফুসফুসে, মনে। শয়নে স্বপনে জাগরণে
একটি শব্দের জন্যে হাহাকার যেহেতু থামে না।

জন্ম ১৯২৫। জন্মস্থান হাওড়া। প্রথম কবিতা 'স্বদেশ'।
শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ পাথনা। প্রকাশিতব্য শাস্তশ সিঁড়িতে।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

ছুঁয়ে থাকা

মাঠের মধ্যে যে-পথ সারাদিন একলা শুয়ে থাকে
তার দীর্ঘশ্বাসে নিজেকে কেমন ছন্নছাড়া লাগে।
গাছতলায় যে-বাছুরটা নিঃসাড়ে ভিজছে
তার জন্য মায়া হয়।
নিঝুম স্টেশনে চা খেয়ে মাটির ভাঁড়টা
লাইনের ধারে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম
সেটাও যে কেন এত করুণভাবে তাকিয়েছিল।

যা কিছু নিঃসঙ্গ, উদাস
তার পাশে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়।
মেঠো রাস্তা, বোবা বাছুর, তুচ্ছ মাটির ভাঁড়—
সবই বোধ হয় মুখিয়ে থাকে মানুষের উষ্ণতার জন্য।
অনেকগুলো বাছুর পেছনে পড়ে রইল,
সামনে আর ক'টাই বা দিন।
মনে হচ্ছে বেঁচে থাকার একটাই শুধু অর্থ
শেষ দিন অব্দি সবকিছুকে দূর থেকে হলেও
মনে মনে একটুখানি ছুঁয়ে থাকা।

ফেলে আসা

যেখানেই যায় লোকটা কিছু না কিছু
ভুল করে ফেলে আসে।
হয়তো কোথাও যেতে না যেতেই
বাঁধা পড়ে। এত মায়া।

যত মায়া হোক ঝাপ্‌সা দু-চোখ
ফিরেও আসতে হয়।
ছেঁড়া মাদুরের মতন নিজেকে
পেতে রেখে চলে আসে।

অস্তিত্ব

[অমিয় চক্রবর্তীকে নিবেদিত]

একসারি খুদে পিঁপড়ে কি জানে মহাপৃথিবীর
বিশাল বুকের ওঠানামা? জানে সৌরঝঞ্ঝা, আকাশপ্রপাত?
পাহাড়ের ধসে হাজার বনস্পতির ধ্বংস, জন্মান্তর?

একসারি খুদে পিঁপড়ের শুধু
দেয়ালে যে-কোনো গোপন রন্ধ্র
থেকে নেমে আসা
নিঝুম দুপুরে
ফাঁকা উঠোনের
ধুলোর ভিতর।

উঠোনের ইউক্যালিপ্‌টাস

যেখানেই যাও রোদে জ্যোৎস্নায় একলা পথিক
ঘুরে ফিরে সেই বাড়ির পথে পা ফেলতে হবে।

তোমাকে যে উঁচু মিনারের মত লক্ষ্য করে
দীর্ঘ সরল বৃক্ষ নিকোনো উঠোন থেকে
সুদূরব্যাপ্ত তার ছায়া ধরে ফেলবে তোমায়,
নিয়তির মত নিশ্চিত জাল গুটিয়ে নেবে।
মৃদু টানে ধীরে ফিরতে হবে।

তুমি অস্থির, ধাবমান বলে দীঘল তরু
বাড়ির উঠোনে সুস্থির হয়ে প্রোথিত আছে,
তুমি সব ছুঁয়ে কিছুই করো না করস্থিত
ব'লে সে-বৃক্ষ মাটির গর্ভ আঁকড়ে ধরে।
তুমি উজানের সঙ্গী, ভাঁটায় ফিরবে জেনে
শুভ্র সবুজ বৃক্ষ আকাশে ঋদ্ধ, একা॥

জন্ম : ১৯২৯। জন্মস্থান : আরারিয়া (পূর্ণিয়া)

প্রথম প্রকাশিত কবিতা. ১৯৪৫-এ নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত পাঠশালা' পত্রিকায়।

কাব্যগ্রন্থ : একটি বই প্রকাশের ইচ্ছে আছে। তবে তৎপরতার অভাব, কবে [illegible] হবে জানি না।

অরুণ ভট্টাচার্য

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

তাহলে আমার কুটীরের প্রাঙ্গণে এসো।
শীতল পাটি বিছিয়ে দেব, দেবো
সুস্বাদু নারকোল এবং ঠাণ্ডা পানীয়।
তুমি বিশ্রাম যাও।

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

তাহলে আমার ঘরে এসো, আমার
নতুন বস্ত্র পরিধান করে সুবেশ হও,
আমার গন্ধ তেল তোমাব অবাধ্য চুলে বিলি কাটুক।
তুমি দীঘিতে অবগাহন করে
শরীরের আরামকে আহ্বান করো।
আমার ঘরে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত। তুমি সংকোচ কোরো না।

পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

আমায় পালঙ্কে সুখনিদ্রা যাও। আমি
ব্যজন হাতে তোমার কাছে বসি।
তোমার হাতখানি আমার জানুতে রাখো।
পথিক, তুমি লজ্জা কোরো না, ঘুম যাও। আমি
তোমার মুখমণ্ডলের শোভা নিরীক্ষণ করি।

৪. ৩. ৭৯

বড় বিপন্ন বোধ করছি

[রাজনৈতিক দাদাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে]

আমি বড় বেকায়দায় পড়েছি। অনেকটা
প্রাণান্তকর অবস্থা বলতে পারো।

আমার বাড়ির চারপাশে বাঁশগাছ, তারপর
সারি সারি বাড়ি।
এই সব বাড়িগুলির প্রত্যেকটিতেই জোড়াজোড়া
ভূতপেত্নী। প্রেতেদের নিশ্চিন্ত আস্তানা।

বাড়ির যে সরু রাস্তাটা দিয়ে আমাকে শহরে যেতে হয়
তা প্রায় ধানক্ষেতে আলের মত,
একটু বেমক্কা হলেই টাল খেয়ে
পড়বো কোন ভূতেদের ঘাড়ে।

ওরা আমাকে চেনে। সুতরাং জ্যান্ত ঘাড়
মটকাবে না, এটুকু বিশ্বাস রাখি। কিন্তু
ওদের নিঃশ্বাস বড় সাংঘাতিক।
সারা রাত্তির ঘুমোতে দেবে না। জানালার ধারে
রাত্রিভর বসে থাকবে। মশারির ভেতর অবধি
ওদের রাঙাজবা চোখ দু'টি
আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করবে।

কোথায় পালাবো!
সমস্ত শহরময় ভূতেদের বাসা, গ্রামগঞ্জ ছড়িয়ে।
শুনছি নাকি, দূর দূরান্তর থেকে, এমনকি ভূটান পাহাড়
ছাড়িয়ে ওরা দলে দলে আসছে
শহরটি দখল করবে বলে।

একমাত্র উপায়, ভেবে দেখলুম, আমিও
ওদের দলে নাম লেখাবো, বাড়িটাতে একটা
মস্ত তালা ঝুলিয়ে।

আমার পুরনো বন্ধু অরোরা বোরিয়ালিসের
কিছুটা দুঃখ হবে, তা জানি।
কিন্তু আমি একান্ত নিরুপায়।

২৮.৭.৭৮

ঘুমোবার পর

কাল বেশ বাত্তিরে কারা যেন আমার
বিছানার পাশে এসে বসলো।
গগন ঠাকুর, বিলটুমাসী, ওপাড়ার
রামধন মিস্ত্রী আর যে-ছেলেটা দিনরাতের কাজ করত,—
সবাই উপুর হয়ে আমাব মুখেব দিকে
চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।
মজার ব্যাপার, কেউ কোন কথা বলল না এবং
এঁবা যে কেউ কাউকে চেনেন এমন বোধ হল না।

আমি তো সবাইকে জানি। কতদিন বাদে সব
দেখাশোনা। ভাবলুম, খবরাখবর
জিজ্ঞেস করব। ভাবতে ভাবতেই মুহূর্তে
গগন ঠাকুর আর বিলটু মাসী আর
রামধন মিস্ত্রী আর ছেলেটা
সব যেন লাইন দিয়ে চলে যেতে শুরু করল।

আশ্চর্য, ঘর বন্ধ, তথাপি সবাই চলে গেল,
পষ্ট দেখলুম।

২৭.৩.৭৮

সুশীলকুমার গুপ্ত

বন্যা

বন্যা, তুমি দুর্বার গতিতে
অক্লেশে শিকার কর দীপ্ত জনপদ।
ভেঙে ফেল ঘরবাড়ি, শস্যাগার, পাঁচিল, ব্যারেজ,
ছিন্নমূল মানুষকে নিয়ে
উন্মত্ত গেণ্ডুয়া খেল, লোফালুফি কর গাছপশু।
লক্ষ হাতে মুছে দাও
আলিম্পনা, বসুধারা, কাজলের রেখা। ভেসে যায়
লক্ষ্মীঝাঁপি, পাণ্ডুলিপি, হাঁড়িকুড়ি, পুতুল, লাঙল।
তুমি এত শক্তি ধর। কিন্তু কিছুতেই
পার না ভাসিয়ে নিতে একতিলও পৃথিবীর হিংসা লোলুপতা,
তোমার অক্ষম হাত যায় না যেখানে স্বার্থ স্বৈরতান্ত্রিকতা
মূল গেড়ে সমাসীন, ধ্বংস করে মানুষের শান্তি ঋদ্ধি কৃষ্টির আশ্রয়।
লুটপাট ক'রে তুমি যত আন পলি
তা শুধু নূতনভাবে বৃদ্ধি করে লোভক্ষুধাপাপের ফসল।
তুমি ব্যর্থ, যাও
জন্ম নিক শ্রেষ্ঠ পল্লী মানুষ নদীর শান্ত সুস্থ সহবাসে।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

স্ট্রেস-১

হালকা গোলাপী আলোয় আঙুল তুলে আমার সঙ্গে কথা বলো কেন। তোমার অস্বাভাবিক উঁচু নাক আমায় তাড়া করে ঘুমের মধ্যে। তর্ক করি না, তবু তোমার অকরুণ প্রশ্ন, উচিত কথাগুলো আমি বলেছি, সত্যি? না ভিতু কাপুরুষ, চুপ করে মেনে নিয়েছি

অপমান? বিব্রত করো কেন শংকরপ্রসাদ, আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যাই।
রাজগীরে নিসর্গ সামনে, আমার অতীত নোটবুক খুলে দেখাও। তুচ্ছ দানখয়রাতের তালিকা মেলে ধরো। বই কিনি, পড়ি না, শুধু পেজমার্ক দিয়ে রাখি কেন তুমি জানতে চাও। কতকাল আগে খেলতে খেলতে আমার ভাইয়ের সামনের দাঁত—মনে হয় পেছন থেকে ঠেলেছিলাম। আমি ভুলতে চাই।

কাত হয়ে শুয়ে থাকি, তুমি আমার ওপর তারের খাঁচা চেপে ধরো। শিক দিয়ে খোঁচাও। শান্তি নষ্ট হয়। চোখ বাঁচাতে ল্যাজ বেরিয়ে পড়ে আমার কষ্ট হয়। লোম ফুলিয়ে ভয় দেখাতে চাই, কিন্তু গলার কাছে ধুকধুক করে প্রাণ।
সাম্রাজ্য ফিরে পাবার আশায় কত শাহেনশা পালিয়ে বেড়ায়। সাম্রাজ্যের লোভ নেই আমার। ঘুমোতে দাও শংকরপ্রসাদ। আমি মহৎ নই, সাহসী নই। আমি লেখাপড়া কিছু শিখি নি।
নারকোলগাছের ওপর মলমের মতো জ্যোৎস্না পড়েছে। ব্যানডেজ বাঁধা শাদা বাড়িটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, একলা। তুমি যাও। আর একটু পরে আলো ফুটলে শান্তি। বসিরহাট বারুইপুর থেকে কলকাতায় ঢুকবে সারি সারি ট্রাক বোঝাই সবুজ।

দেবী রায়

আগুন, ওরে আগুন

সুচতুর ভাগ্যের সঙ্গে একদিন দেখা হবে—
অ-দেখায়, কেটেছে বহুমাস, অযুতবছর, অবিরত
সফলকাম নয়, যে জীবন, হবে নাকি সার্থকতর
যদি হয়, হোক—কোনো একদিন। শহরের-বিজ্ঞাপনের-

প্রাচুর্যের ফাঁস থেকে মাথা তোলে, স্ফীত-আশা
যেন অধীর-অবুঝ শিশুর মতন :
গোপন ফাঁদে পা দিস্ নে—আগুন, ওরে আগুন·· ··· ॥

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

একটি অশ্বতরের স্বপ্ন

কোনো অজ্ঞাত কারণে বাতাসের ঘনত্ব কমে আসছে। দিনের আলো
দ্রুত তার লোমশ শরীর গুটিয়ে নিয়ে এখন এই ঝোপের ভেতর ঢুকবে।

এই রকম কোনো এক সময় দেহ-ধারণ করে রহস্য—লম্বা, চ্যাপ্টা
একটা ধূসর নলের মত বেরিয়ে আসছে জঙ্গলের প্রায়ান্ধকারে
ছোট্ট ধোঁয়ার জানলা ফুটে উঠল ধীরে ধীরে
জটিল হতে থাকে তার দেহবোধ।

লেনা নদীর ধারে শুয়ে শুয়ে এই আশ্চর্য প্রাজ্ঞ স্বপ্নের থেকে জেগে ওঠে
মধ্য প্রাচ্যের কোনো এক শ্রেষ্ঠীর অশ্বতর। আখরোট গাছের নীচে
নদীব জলে মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়ে আছে
তার মনিবের ঈষৎ ছায়া। থির থির করে কাঁপছে। সে অনুভব করে
কেমন বেঢপ লম্বা হয়ে যাচ্ছে তার পেছনের পা দু'টো।

নারায়ণ ঘোষ

নেই

কেউ ডাকতে এলে বলে দিও আমি বাড়ি নেই
আমার দুর্বোধ্য ক্ষত কাউকে দেখাতে চাই না
দেখো, যেন কেউ ঢুকে না পড়ে
যেন দেখে না ফেলে টেবিল ল্যাম্পের বাল্‌বটা ফিউজ

এখন কবিতা লেখা বন্ধ আছে
তাছাড়া এখন আলো নেই। মোমবাতি নেই। তেল নেই। নেই।
কেউ ডাকতে এলে বলে দিও আমি ভালো নেই।
আমি বাড়ি নেই।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধিক্কার

কষ্ট ক'রে জোগাড় করি
শুকনো পাতা, বাঁশের কুঁচো,
খড়-কুটো, মাটির হাঁড়ি।
কোথেকে তুই ছুটে আসিস,
আগুন দিস।
আগুন দিয়ে রঙিন মুখে
খুব হাসিস!
বাহবা তোর মেড়াপোড়া,
নিলাজ হাসি।
দূর হ'য়ে যা সামনে থেকে
দূর হ রে সর্বনাশী।

গৌতম বাগচি

আকাঙ্ক্ষা

বুকে জেগে ওঠে ভীষণ বিজন
প্রথম দুপুরে আমার স্বজন
ভুল করে হও প্রিয়।

ক্রমাগত ভুল ভাঙার খেলায়
ভরা ফসলের ঋতুর পাড়ায়

ইচ্ছের ঠোঁটে বলো—
অভিলাষী এই সিঁথির বীথিতে
সিঁদূর ভিক্ষা দিও।

প্রভাত মিশ্র

বরাকর

জেগে আছে বরাকর এপ্রিলের রাতে, রূঢ় আরশোলা
আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমাকে একলা দেখে, ভুল বোঝে আরো।
ফুলের ঘাসের গন্ধ,হায় হায় ক'রে ওঠে সঙ্গীটির খোঁজে।
যেন কে উদাসী নারী হাই তোলে, ঢলে ঢলে মৃদু চোখ বোঁজে।
সে গন্ধ জানে না আজো আরশোলা কোনদিন সঙ্গী নয় কারো।
নড়ে ওঠে মহুয়াগাছ, চাঁদের শরীর ঘিরে কেন অবিরত।

আমাদের জীবনের অর্ধেক গিয়েছে পুড়ে কয়লার গ্রামে।
ওগো এত আঁখিজল, টলটল করো রোদে, রাত্রির রোদে।
ভেঙে গুঁড়ো হয় কিছু, কিছু ওড়ে মহাশূন্যে, ওড়ে—।
শাদা কাচে সংসারেব মুখখানি ম্লান হ'যে কিরকম পড়ে।
জল যায় পরবাসে, বরাকব দেখে আর কেঁদে ওঠে ক্রোধে।
মানুষও কালো কালো সমাজের দিকে চেয়ে হাত রাখে হাতে।

বিপ্লব বিশ্বাস

কয়েকটি কবিতা

রূপ

কে জ্বলছে প্রখর তপনে?
বর্ষার নদীর তীরে
তাকে দেখে এসো
সূর্য্যস্নাত 'রূপ'।

যুদ্ধশেষে

যুদ্ধশেষে
ঘরের খোটায় ঘোড়া বেঁধে
উন্মুখ তাকায় সৈনিক।
বউটাকে ডাকত 'মালতীফুল,
ছেলেটাকে—একটা পাকা আঙুর।'
"তোমরা আছো তো ঘরের মধ্যে,
নাকি, আমার বাগানে মিশে।"

বসন্ত আসবে

তার চাইতে ঘুমিয়ে পড়া যাক
কোনো শরতের শেষে।
যথাসম্ভব প্রত্যেকের হিসাব-নিকাশ
মিটিয়ে ফেলা যাক।
কারও সহানুভূতি নয়, ভালবাসা নয়
এমন কেউ কিছুতেই কাছে থাকবে না
যে বলতে পারে,
"এ বছরেও বসন্ত আসবে।"

সুকমল বসু

পরিচয়

তার কোর পরিচয়
আজও শব্দ দিয়ে বানানো গেল না
গাছের মধ্যে তার
অদ্ভুত ছবিগুলি নিতান্ত মলিন
হাওয়ার মধ্যে তার

গন্ধের স্বাদ পাওয়া অনেক জটিল
ফুলের গোপন অর্থে
বাসা বেঁধে থাকে তার নিজস্ব ছায়া
কোন এক রমণীয়
সুসম মাটির বুকে নবম চিবুক

অথচ সমস্ত কিছু
মিলে মিশে গিয়েও সে পরিচয়হীন

'জেন্' কবি শিনকিচি তাকাহাসি

জাপানের শিকোকু দ্বীপে ১৯০১ সালে শিনকিচি তাকাহাসির জন্ম। কিশোর বয়সে রাজধানী তোকিওতে গেলেন পটু কবি বনতে। তাকাহাসি জাপানে প্রথম 'দাদা'বাদী (Dadaism) কবি। আধুনিক জাপানী কবিমহলে এঁর লেখা খুবই মনোরম ও অগুণতি। মনেপ্রাণে প্রথম থেকেই কিছুটা বৌদ্ধ ছিলেন। তবে পরে যখন 'রীন্জাই' সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা গুরু শীজান আশিকাগা-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়, তখনই আরম্ভ হয় 'জেন্' (Zen) মার্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর অচল-অটল ভক্তি। শীজান্ নিজেই তাকাহাসিব ধ্যানী শিক্ষা ও দীক্ষার বিরাটত্বের কথা অনেকবার বলেছেন।

তাকাহাসির বেশীর ভাগ কবিতাই 'জেন্' চেতনায় ভরা। কবিতা ছাড়াও এঁর অনেক গদ্য রচনা আছে। ধ্যানী বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে আছে নানান্ উল্লেখযোগ্য রচনাবলী।

শিনকিচি তাকাহাসি এই শতাব্দীর পয়লা নম্বর 'জেন্' কবি, আর বোধহয় একমাত্র 'সাতোরি' কবি। 'সাতোরি' কথাটার মানে হল জাগরণ। কবির জীবন ও 'জেন্' গুরুর জীবনের মধ্যে আছে আপাতবিরোধী এক সত্য। দুটির মাঝে সামঞ্জস্য আনা সোজা কথা নয়। তবু তাকাহাসির কবিতায় পাওয়া যায় সনাতনী 'জেন্' ভাবনার সবচেয়ে ভাল দিকটা—তার কথার স্বল্পতা, শৃঙ্খলাভরা মনোযোগ আর সূক্ষ্মতা। সেই সঙ্গে মিশিয়েছেন কবির চোখে দেখা আর শোনা কথার অসীম অস্তিত্বকে—বৌদ্ধ ধর্মের মহাসাগরে এক চমৎকার শরীরী পট। তাকাহাসির জমাট-বাঁধা চিত্রাবলীর মধ্যে দেখা যায় ভাবনার তীক্ষ্ণতা। পাওয়া যায় সমসাময়িক সমস্যার কথা আর অভিজ্ঞতা—সেটাও আবার সেই সনাতনী ভাবে এগিয়ে চলেছে এক সর্বসমন্বয়তা ও অনন্যতার তীরে, যাকে বলা যায় শর্তশূন্য নিষ্কৃতি।

নীচের কবিতাগুলি মূল থেকে বাংলায় অনুবাদ। প্রতি কবিতাই শর্তশূন্য দুনিয়ার সঙ্গে ভাব পাতিয়েছে 'জেন্'এর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, বৌদ্ধ ধর্মের ভাব ও চেতনার অনবদ্য সমতানের কাব্যিক চালচিত্র এঁকে।

সাগরকোলে রামধনু

কুয়াশাভরা ঢেউয়েব ঝাঁট-না-জানা
শঙ্খ ঘুমায়।
বালি ঢাকা, জোয়ার জলের সরা বালিতে দোলা,
উত্তাল তরঙ্গের বাজ-পড়া বাজনা না-শোনা,
ঢলে পড়ে শঙ্খ।
একদিন এই বালিয়াড়িটাও
পৃথিবীর আস্তরণ সরিয়ে হবে ফসলভরা মাঠ
কিংবা হয়তো সামুদ্রিক মেঝে।
দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবে না শঙ্খ,
চায় না আকাশে ভাসা মেঘের মত হতে,
মৃত্যু কিছু দিতে পাবে, আব কোন চাহিদা নেই তার
কুচেমিতে ভবা, অশ্রুহীন, নেই তাড়াহুড়ো,
প্রকৃতির নমনীয দেহকান্তি,
দুঃখ-বাগহীন, নিঝুম ভেসে চলা।

ঝড়ে পেতে কান।
জ্বলন্ত ববিব তাপে বালিতে ভাজা,
দিবাস্বপ্নে উদাসীন।
শঙ্খ,
সাগরকোলেব রামধনু,
দেখে চল তোমাব সুখ স্বপ্ন।

জন্ম

এ হাতে ছুঁয়েছি কি তোমার চুল?
এ হাতে ছুঁয়েছি কি তোমার কোমল দেহ?

সদাই তো তোমার-আমার মাঝে নেমেছে শীতের হিম,
গ্রীষ্মের ভাপা-কুয়াশার পর্দা, নয় কি ?

তবু তোমার মধ্যে আসন্ন শিশু
ছমড়িয়ে ওঠে, কেঁপে ওঠে জীবনস্পন্দনে।
এক চাদরে মুড়ে শুয়েছি আমরা, তবু
জানি না তুমি কে।
প্রসব করবে যে শিশু হযতো সে তুমি
আমিও হতে পারি।

সারাদিন ধরে বৃষ্টি

সেদিন বৃষ্টি সারাক্ষণ
কেটেছিলাম আঙুলটাকে।
বৃষ্টির হিম শুভ্রতা
যেন থামতে চায় না।

আঙুলটা, ডাকিনীর লাল চোখের মত,
রক্ত ঝরায়।
ভবিষ্যৎ কি ঝরছে আঙুল বয়ে।

সন্ধ্যার মেঘ

মেঘের মত কি যেন কিছুতে আকাশটা ভরা,
পৃথিবীও যেন মেঘেরই মত।
সোনালী রাংতা ছাড়ানো আঙুলগুলো,
পৃথিবী ছেয়েছে, মেঘের কালো ছায়ার মত।
সূর্যাস্তে, যখন আগুন লাগে মেঘে,
আঙুলগুলো নড়তে সুরু করে।

বাতাস

কথা দাও,
শরীর বিছিয়ে দাও,
তবু অস্তিত্বের বদল নেই।
কিন্তু বাতাস—

বাঁচব আমি শান্তভাবে
বাতাসের মত, উড়ে
শহরের উপব দিয়ে,
আমার বুকে পায়রায় উড়ে যাওয়াব শব্দ।

পাইন্ গাছের হাওয়া

পাইনগুলোর মাঝ বরাবর বইছে বেজায় হাওয়া
অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি—
হাতে তার জলের কুঁজো
তাতে সে কিছু তো ভরে নি।
নেই জীবনানন্দ কিংবা মদিরা—
শুধুমাত্র অযুত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

পাইন্‌গুলোর মাঝ বরাবর হাওয়া বইছে।

মূল থেকে সটীক স্বচ্ছন্দ অনুবাদ :
সন্দীপ ঠাকুর

নতুন কবিতা

[শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীসুব্রত রুদ্র, একটি বিজ্ঞপ্তিতে চোখে পড়ল, অতি সম্প্রতি 'নতুন কবিতা'র কাব্য-সংকলন প্রকাশ করছেন অথবা করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, নানা লিটল্ ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা কবিতা নিয়েই এই সংকলন। বলা বাহুল্য, এবং কবিতা পাঠকদের কাছে অজানা নয়, গত চার-পাঁচ বছর ধরে উত্তরসূরির প্রতিটি সংখ্যা নীরবে এবং নিঃশব্দে এই কাজটিই করে যাচ্ছিল 'নতুন কবিতা' বিভাগে। ইতিমধ্যেই আমরা গ্রামবাংলা এবং কলকাতা শহরের প্রায় শতাধিক লিটল ম্যাগাজিন থেকে বাছাই করে কবিদের একশটিরও বেশী কবিতা প্রকাশ করেছি—এবং এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তীর মত প্রবীন কবি থেকে তরুণতম কবিরা প্রায় সবাই।

আমরা নিশ্চিত জানতাম, উত্তরসূরির এই বিভাগটি একদিন কবিতার ইতিহাস তৈরী করবে। আমরা আনন্দিত যে একজন প্রতিষ্ঠিত কবি এবং একজন তরুণ উৎসাহী কবি—দুজনে মিলে উত্তরসূরির শুরু-করা-কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের জন্য আমার সাধুবাদ রইল। সম্পাদক : উত্তরসূরি]

অমিত ভট্টাচার্য

আত্মপরিক্রমা

আন্তরিক ছিপ নিয়ে জলঘেরা সবুজ মাচানে বসে আছি।
প্রিয় মাছ ধরা কি দেবে না? হাতের উন্মুক্ত প্রাণ তোমাকেই ধরিবারে চায়—
হৃদয়ের কোল বেয়ে ভেসে যায় নদী, গেরুয়া পালের নৌকা
দিনান্তের ছায়া নিয়ে পরিক্রমা করে, আর শাদারং সেতুটি দূরগমনের কালে
প্রতিভাস হয়।

আমার চামড়ায় লাগে রোদ, ধুলো, বিদ্বেষ, ব্যর্থতা :

অন্ধ হ'য়ে পড়ি; অন্ধকারে প্রবল হাওয়ায় আপন শিখাটি প্রাণপণ আঁকড়ে ধ'রে থাকি।

অল্প আলোয় প্রোফাইল বড দীর্ঘ মনে হয়,
মনে হয় আমি দেওদার, শিরিষ . দীর্ঘতায় আকাশকে ছুঁয়ে দিতে পারি।
আস্তে আস্তে আলো কমে যায়, আসে নিভৃতি, সারারাত তার সঙ্গে যুদ্ধ চলে।
ভোর হ'লে পদচিহ্ন খুঁজেও পাই না, আবার চামড়ায় লাগে ে াদ।
হৃদয়েব কোল বেয়ে ভেসে যায় নদী, গেরুয়া পালের নৌকা।

অক্ষক্রীড়া। C/o অমিত নাথ, শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা, ২৪ পরগণা।

অরূপ চৌধুরী

ডিসেম্বর

এইবার তবে এইবার,
ঐ হলুদ বাড়ীটাব দিকে চলে যাওযা চাই, চাই সনেটেব বিকল্পে কিছু অনুপম অক্ষবেব মালা।
চাই ঘনভাব দুঃখের পাশে থেকে যাক কিছু কিছু বেদনামাধুরী,
ভাষাব ভেতরে শুভ্র প্রণযেব স্মরণীয় গান, নাহলে শিল্পেব ঐ মেঘমালিনীকে নিয়ে
কীভাবে সে একটানা লিখে যাবে দীর্ঘ কবিতা, শব্দের আড়ালে তার জমাবে পরম অনুরাগ।
পদ্মভুক মানুষেব হিংশাদা নখেব আঘাতে কেঁপে ওঠে কুসুমকুমাবী, কাঁপে তার গন্ধপরিখা।
একাকী বাতাস ছুঁযে এলোমেলো উড়ে যায় স্তব্ধদুপুর, উড়ে যায় পাতা ও পালক।
হলুদ পরাগ কিছু পড়ে থাকে পাথরেব বিজন প্রদেশে

এসব জানে না ঐ পরাগ শিকারী সব হিমশাদা কলংকিত নখ, জানে না কুসুম
মানে প্রিয়সুধা ··
উপমা শিল্পের ··

তাদের প্রণয় নেই, পূজা নেই, স্বপ্নের ভেতর তারা পুষে রাখে নীলবর্ণ সাপ,
আর কুসুমকুমারী ক্রমে থরোথরো কেঁপে ওঠে তামসিক চুম্বনের বিষে,
দু'চোখ ঝাপসা হয় বোবাক্রোধে, স্বেচ্ছাচারে, শিরার ভেতরে জাগে নীলঘৃণা
জলে ওঠে লোহিত আগুন,

অবশেষে দু চোখে জলের চিক মুছে গেলে মনে পড়ে অনলের সুধা
পাঁচমুড়ো পাহাড়ের তলে, মনে পড়ে, সানলী নদীটি,
চলে যায় ডিসেম্বর, গোধূলীর পৃথিবী ছাড়িয়ে, দূরে, ছায়াপথে,
আর প্রস্তুত হয়, যেন সে বন্দুক হবে এইবার
একজন রোগা কবি তাকে
শান্ত আঙুলে তুলে নেবে মুঠোর ভেতরে, তারপর টিপে দেবে
ঠাণ্ডা ট্রিগার ·

শব্দ-শাব্দিক। C/o কৃষ্ণেন্দু দে, ১১/২এ মোহনলাল মিত্র ষ্ট্রীট কলিকাতা ৪

·

সুতপা সেনগুপ্ত

শিরোনামহীন কবিতা

নতুন বছর আমায় দিও সর্বনাশা খিদে
তোমায় আমি সাজিয়ে দেবো ডালায়
বেলেল্লা চুল, সন্ধ্যা-বকুল, প্রখর ভালোবাসা
দুপুর রোদে অন্ধ বুড়িবালাম

আমায় দিও উল্কি-তোলা হাতের খর ভাষা
জাহাজ দিও এবং প্রিয় নারী
তিনভুবনের একটি দিও, শাসন পাখির ডানায়
শর্তে দিও বন্যা, খরার ঋণ

বাতাসে পাল তুলল কেন অগ্রদানের ঘোড়া
আজকে আমি সবার অধীনতার
শেকল ছিঁড়ে দেখিয়ে দেব দশ আঙুলের দিগ্বলয়ে
কন্টিকারীর বিজন লীনতাপ
নতুন বছর, স্বর্গে রেখো অশ্লেষা রাক্ষসী,

সুধীন্দ্রনাথ এবং কিছু কবি
তোমার আমি শরীর ভরে শোনাবো দ্বৈরথে
ললিত টোড়ি পূরবী ভৈরবী

অভিমান। ১।এ শশী ঘোষ লেন। কলিকাতা ৫

রাজকল্যাণ চেল

আপনার চিঠি

সেই শহর থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পর এক সকালে
আমি আপনার চিঠি পাই। বলা বাহুল্য, আমার জীবনে সেই আপনার প্রথম চিঠি।
একথা আপনি জানতেন, পড়তে গিয়ে দেখি আমার চারপাশে
আর একটিও দেওয়াল নেই। এক আকাশ তলে শেষ নেই নেই শব্দে—
উধাও হয়ে গেছে যে পথ বিশ্বে, সে পথের উপর দাঁড়িয়ে আছি
একথা কি আপনি জানতেন? এ কাহিনী আমি কোনদিন কাউকে লিখে জানাই নি।
সেদিন মেঘ করে এসেছিল আকাশে চতুর্দিক অন্ধকার আর ঐ অন্ধকারে
আমি দেখতে পেয়েছিলাম জাগ্রত ফসলের গানের রচনা
যত হাওয়া আসে সব এসে লাগে মর্মে যত বৃষ্টি সব এসে পড়ে চেতনায়,
এভাবে প্রতিটি মুহূর্ত তার হয়ে উঠেছিল শিকার। আপনি আর তারপর

এমন চিঠি কোনোদিন লেখেন নি, তবু সেই যে পথে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন,
সেই যে আপনার ভাষ্য খুলে দিয়েছিল, মেলে দিয়েছিল আমাকে,
এরপর পৃথিবীর সমস্ত ঘরের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখেছি আমারই ঘর।
একথা আপনাকে আমি কোনদিন লিখে জানাই নি, যা জানানো উচিত ছিল।

কলঘাস। C/o সত্যসাধন চেল, বেলবনী, ধবনী, বাঁকুড়া।

আলিঙ্গন চক্রবর্তী
তৃতীয় ফুসফুস্

ডান ফুসফুস আব বাম ফুসফুসের মাঝখানে একটা গোলপোষ্ট আছে, অবিরাম একটা লাল বল গড়িয়ে গড়িয়ে ঢুকে যাচ্ছে গোলপোষ্টে। ছিঁড়ে দিচ্ছে জাল। অসহায় গোলকিপার ঝাঁপিয়ে পড়ছে কখনো ডানদিকে। কখনো বামদিকে। লাল বলটা গড়িয়েই যাচ্ছে। অবিরাম। ছিঁড়ে দিচ্ছে জাল। গোলকিপার বলের নিশানা বোঝে না। ফুসফুসের সঙ্কেত বোঝে। গোলকিপার জানে না মানুষের তৃতীয় ফুসফুস লুকোনো আছে বলের ভেতরে। অবিরাম লাথি খেতে খেতে লাল বলটা গড়িয়ে যায়। কিছুতেই ধরা দেয় না কোন নিপুণ হাতে। ঘুরতে ঘুরতে বল্গাহীন বলটা সমস্ত জাল ছিঁড়ে কাঠের গোলপোষ্ট ভেঙ্গে মাটি থেকে আকাশে হঠাৎ লাফিয়ে স্থির হবে সূর্যেব পাশে। একদিন গোলকিপার সকালে উঠে দেখবে সূর্যের স্থানে স্থির হয়ে গেছে সেই অনিয়ন্ত্রিত ফুসফুস।

এবং এবং কবিতা। C/o অজিত দেব, ৮।৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

নিশীথ ভড়
কেমন আছি

এবার তুমি হয়ে উঠবে ব্যক্তিগত চিঠির মতো তুচ্ছ কিন্তু স্মরণযোগ্য
অনিদ্রার রোগীর কাছে ঘুমের মতো প্রার্থনীয়, সুদূর

এই যে একটু আড়াল পেলাম, ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম
জানতাম না আগে
ভিড়ের ভিতর বেশি সুযোগ তোমায় নিরভিমানী পাওয়ার, এসো
রাস্তা সব খোঁড়া হয়েছে, আর
সহজ রাস্তা পাওয়াব যথন বালাই নেইকো সহজ রাস্তা পাওয়ার কোনো উপায়ই
নেই, তাই
অল্পে অল্পে কাছে এসে আলতো স্বরে কী উদাসীন বলো
পায়ের তলায় সব রাস্তাই বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে বদলাতে বদলাতে
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে এই রহস্যবার্তাটিব ঋণ
কেমন ছিলাম, কেমন ছিলাম, আমরা কেমন ছিলাম।

অভিমান। ১।এ শশী ঘোষ লেন। কলিকাতা ৫

বাপী সমাদ্দার

অলৌকিক

আমি শূন্য থেকে এক-লহমায় ফসল ফলাই
ইচ্ছেমত ঘুন্টি টিপে বৃষ্টি পাড়ি যখন তখন ,
অসুখ তাড়াই, মন্ত্র জানি, আমার ফুঁয়ে ঘা শুকোবে ,
দৈত্য নেই দানো নেই এই দ্বীপে দেদার হরিণ—
মাছের বাগান, ফলের পুকুর, আমি চাইলে সমাজ গাভিন।
তুমি সব পার ?
আত্মা বলতে পার ? রক্তমাংস ?
মনের কুলুপ খুলে ব'লে দিতে পার সত্যমিথ্যা ?
তুমি কি মায়াজাল জান ? তুক্‌তাক্ ? জলপড়া ?
হাজারো কাঁকর দিলে জুদা করতে পার ?
আমি কিছু ভেলকি জানি না।
তেমন দশম বিদ্যা জানা নেই যে-অশ্রুমোচন হবে ,

রোমকূপ ভ'রে দেখি বিশ্বচরাচর :
আমি এ-বাতাসে জবুথবু—কোনো কাজেই আসি না।
বিচ্ছিন্ন ব-দ্বীপ যেন-সব দেখছেন :
চোখ ঢালি অন্ধকারে,
কুয়াশায়,
যাতে একবার দেখা যায়
দেখা যায় না, চোখে পট্টি, তবু দেখি, রোমকূপ ভ'রে দেখি :
ঠাণ্ডা জমি—নিচেই গোক্ষুর

আজকাল। শ্রীদুর্গা প্রেস গরিফা, ২৪ পরগণা॥

কবিতা এবং শুদ্ধ চৈতন্যের উন্মোচন

[উত্তরসূরি ১০৫ (২৭ বর্ষ ১ম) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী পাঠক মহলে যে উত্তেজনা, উৎসাহ, বিরক্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করেছি, ইদানীং সাহিত্যের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। বহু বছর এরকম আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি সেই 'আরো কবিতা পড়ুন' এর যুগ থেকে। প্রতিদিন অজস্র চিঠি আসছে দপ্তরে। মাত্র কয়েকটি পত্র প্রকাশ করা হল। পাঠকদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানা যাবে 'তরুণ কবিদের প্রতি আবেদনে'। সম্পাদক ' উত্তরসূরি]

১.

কল্যাণীয়,

অরুণ, তোমার ১০৫ সংখ্যক উত্তরসূরি পেলুম। ঐ কাগজের মারফৎ তোমার সঙ্গে যোগসূত্র এখনও টিঁকে আছে। অনেক দিন হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে দেখাশুনো আর হয় না। আমারও শরীর দ্রুত ভাঙছে, বড় অবসন্ন ও নিঃসঙ্গ বোধ করি। তার ওপর একে একে পুরানো, বহু দিনের বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে যাচ্ছেন। মনীশদা অজিত গেলেন, তাঁদের বয়স হয়েছিল কিন্তু অরুণের চলে যাওয়া যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি মর্মান্তিক। 'অরুণ' বললেই তোমাদের দু'জনের কথা এক সঙ্গে মনে উদয় হয়। তবু তুমি আছো, এটুকুই সান্ত্বনা, অরুণের সঙ্গে ইদানীং কালে ভদ্রে দেখা হত। কিন্তু গত 'প্রতিশ্রুতি সংসদের' বার্ষিক অনুষ্ঠানে এবং তার আগের বছরেও তাকে অনেকটা কাছে পেয়েছিলুম। আমাকে অনুযোগ করে বলেছিল—'লেখা ছেড়ে দিলেন, আপনি? আর কবিতা যা দিয়ে সাহিত্য-জীবন সুরু করেন ?' বলেছিলুম, '১৯৭১ সালে শেষ কবিতা লিখেছি। এখন খুবই কম।' অরুণ বলেছিল, 'আপনার বইগুলি থেকে এবং ষাট-সত্তরের দশকে লেখা ইতস্ততঃ ছড়ানো কবিতাগুলি থেকে নির্বাচিত একটি সংকলন প্রকাশ করুন।' আমি জবাব দিয়েছিলুম, 'অরুণ, 'আমি Retired', সে বলেছিল, 'আচ্ছা আমি দেখছি আপনি বলুন…কে, এ

বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।' করেও ছিলুম কিন্তু তাঁর সেই কবির আগ্রহ ও response পাই নি। সুতরাং ও সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়েছি। তোমাকে বলে রাখছি—যদি কেউ উদ্যোগী হয়ে প্রকাশ করেন, জানিও। কবিতাই আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। ১৯৫৬-৫৭তে 'সম্ভবা' আমার শেষ বই। তার পরেও অনেক কবিতা কাগজপত্রে বেরিয়েছে। কিন্তু সে সবই চিতাশয্যার সামগ্রী।

উত্তরস্মৃতিতে "কবিতার জন্য আবেদন" লেখাটি আমার বিশেষ ভালো লাগল। তোমার সময়োচিত বক্তব্য আমার মনে ধরেছে। তুমি যা হোক 'কবিতা' বাঁচিয়ে রেখেছ। এবং তারই মাধ্যমে তুমি সমধর্মী ও সংবেদনশীল হৃদয়কে স্পর্শ করে থাকো। সেটা বড় কথা।

বিজ্ঞাপনে তোমার 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' নাম দেখি। যদি অসুবিধা না থাকে আমাকে এক কপি দিও, আমি তো মুখ্যত. ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, ইতিহাস তার পরে। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা অরুণের চিঠিখানা তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের চমৎকার reveal করেছে। এ লেখাটি তাঁর ঋজু মনের ও honestyর একটি দলিল বলা চলে। তোমার "কবিতার ভাবনা" ১১ খুব touching। তুমি এক দিন ফোনে, কার্ড লিখে জানিয়ে আমার কাছে এসো। সত্যি খুশি হব। স্নেহাশীষ সহ

১৯/১ ব্রড ষ্ট্রীট, কলকাতা। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২.

শান্তিনিকেতন

১১-৭-৮০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার 'আবেদন' সম্পূর্ণ স্পর্শ করলো। আপনাদের

শিশির

ইংরেজী বিভাগ, (অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ)

বিশ্বভারতী।

৩.

প্রীতিভ জনেষু,

অরুণবাবু, উত্তরসূরি ১০৫ (২১ বর্ষ ১ম সংখ্যা) গতকল্যের ডাকে পেয়েছি।

তরুণ ও তরুণতর কবিদের প্রতি বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভাবে যে আহ্বান জানিয়েছেন সেজন্যে সাধুবাদ দিই ও ধন্যবাদ জানাই। এঁকে বলা চলে পথ-ভ্রষ্টদের ঘরের পথ দেখিয়ে নিজ আঙিনায় ফেরার ডাক।

বহুকাল থেকে এই রকম মনোভাব নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক খুচরো কথা বলেছি। সেসব হয়তো কেউ দেখেন নি, দেখে থাকলেও উপেক্ষা করেছেন।

কিন্তু আপনি এবার যেন জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ভালো করেছেন। আপনার জয় হোক। প্রীতি নেবেন। আপনাদের

সুশীল রায়

(প্রাক্তন সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা। সম্পাদক, ধ্রুপদী)

৪.

শ্রদ্ধেয় অরুণদা

আমার অনেক নিন্দনীয় অভ্যাসের মধ্যে সময়মতো চিঠি না-লেখার অভ্যাস অন্যতম। অন্তর্নিহিত অনুযোগ ও আলসেমিই এর প্রধান কারণ। তবু 'উত্তরসূরি'র ১০৫ সংখ্যাটি পেয়ে আপনাকে চিঠি না লিখে পারলাম না। বিশেষ করে আপনার 'কবিতার জন্য আবেদন, ১৯৮০' আমাব জড়তাকে আঘাত করেছে। এই আবেদন প্রকাশ করে, আমার মনে হয়, উত্তরসূরিকে আপনি বাংলা কবিতা বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন, শুধু কবিতার জন্য বাংলা পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। যা আছে তা যেমন অনিয়মিত এবং তেমনি লক্ষ্যের দিক থেকে সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ বলছি এই মর্মে যে, যায় ধরণের অধিকাংশ পত্রিকায় বাংলা কবিতা সম্পর্কে যে আলোচনা পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই কবিতার তথাকথিত আধুনিকতা নিয়ে। কিন্তু যা প্রকৃতই কবিতা তার একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে 'কবিতা', তাঁকে 'আধুনিক' বা 'প্রাচীন' এই ধরণের আখ্যায় বিশেষিত করা রসিকের পক্ষে অবান্তর বলে মনে হয়। আমার

বিশ্বাস 'আধুনিক' 'পৌরাণিক' ইত্যাদি বিশেষণ কবিতার চরিত্র নয়, কবিতার জ্যাকেট মাত্র। ওপরে জ্যাকেট যা-ই থাক ভেতরের চরিত্র যদি কবিতার না হয় তবে নিছক জ্যাকেট কোন রচনাকে 'কবিতা' করে তুলতে পারে না। এই সহজ কথাটা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হয়ে আমাদের ভাষার অনেক পুরনো কবিকে আমরা অবহেলা করে থাকি—অথচ এই সব কবি যুগধর্মে পুরনো হলেও কালধর্মে শাশ্বত। আপনার আবেদনে আপনি একালে আত্মবিস্মৃত কাব্যপাঠককে যে এ ব্যাপারে কর্তব্য-সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন এজন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকৃতপক্ষে যে কাগজ কবিতাব্রত, তাতে আধুনিক অনাধুনিকের শুচিবায়ু থাকবে কেন? নির্বিশেষে যে কোন কালের 'কবিতা' নিয়েই তাতে আলোচনা ও অনুশীলনের অবকাশ থাকা দরকার। 'উত্তরসূরি'তে তার প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি বলেই মনে হচ্ছে উত্তরসূরি এখন বাংলা কবিতার মুখপত্র হিসেবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি রচনার কথা উল্লেখ করি, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণু দে-র শব্দ সন্ধান', রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা কবিতা এবং মধুসূদন' এবং অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী'র 'উষা-পরিণয়' (পুথি-পরিচয়)। বিশ্ববাবু ও রবিবাবুর লেখা দুটির আস্বাদভঙ্গী আলাদা হলেও দুজনে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন—তাঁরা দুই শতকেব দুজন প্রবল পাশ্চাত্ত্য-প্রবণ কবিকে বাংলা কাব্যের আবহমান পরম্পরার মধ্যে রূঢ়মূল করে দেখিয়েছেন। এর ফলে আমরা পুনর্বার বুঝতে পারি, একমাত্র পৌবাণিক ঈশ্বর ছাড়া এ সংসারে আর কেউ স্বয়ম্ভু নয়। আব এই কারণেই অগ্নিবর্ণ বাবুর লেখাটি আমার দৃষ্টি টেনে নিয়েছে। এই লেখা আমাদের আর এক পরম্পরার সন্ধান দেয়। মধ্যযুগের বাংলা পুথিচিত্র সম্পর্কে এর আগে অল্পস্বল্প আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তা প্রায় সবই রাঢবঙ্গ বা পূর্বাঙ্গের পুথি নিয়ে। উত্তরবঙ্গের পুথিশিল্পীরাও যে এ ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, অগ্নিবর্ণবাবুর লেখায় তার পরিচয় পেয়ে উত্তরবঙ্গের সন্তান হিসেবে আমি মনে মনে গোপন সুখ অনুভব করছি। অগ্নিবর্ণবাবুর লেখা পড়ে মনে হলো তাঁর ভাণ্ডারে আরও অনেক মালমশলা মজুত আছে, কিন্তু স্থানাভাব বা সময়াভাবে (না কি আমারই মতো জড়তা-বোধে?) পুরোপুরি প্রকাশ করেন নি। সম্পাদক হিসাবে আপনার কাছে

আমার আবেদন, এই লেখককে আপনি আরও জায়গা দিন এবং উত্তরহরির মাধ্যমে লেখকের কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আরও লিখুন।

যাই হোক অযাচিত ভাবে অনেক কথা বলে ফেললাম, ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে।

নির্মল দাস

১৮ ৭ ৮০

বাংলা বিভাগ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা ৫০

৫

প্রিয় অরুণদা,

পত্রিকা হাতে এলো। কিন্তু মনের ভিতর থেকে আপনার আবেদনে সাড়া দিতে পারছি না। এটা কী সত্যিই গর্বের কথা নয় যে, বাংলা-কবিতা ৩০-এর থেকে সমস্ত পৃথিবীর কবিতা-চর্চার উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করতে পেরেছে? মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে যোগ্য পরিণতি দিচ্ছিলেন, তাঁরাও তো আধুনিক (তৎকালীন) বিশ্বের কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন মননের পদ্ধতি, শিক্ষা, নতুন নতুন মানবিক মূল্যবোধ। তারপর তিরিশের কবিরা (জীবনানন্দ সহ) আবার বিশ্বের দিকে নতুন ক'রে মুখ ফিরিয়েই বাংলা কবিতায় এক সর্বাঙ্গীন ব্যাপ্তি এনেছেন। এর আগে বাংলা-কবিতা তো শুধুই ভক্তিরসের কবিতা, শুধুই গান ও কীর্তন। মননহীন বিশ্লেষণহীন, ব্যাপকতর জীবনের বোধহীন, জটিলতাহীন পদ মাত্র। খুবই সুন্দর নিশ্চয়, কিন্তু যথেষ্ট নয়। আজকের কবিদের কাজ (যেমন কোনো আধুনিক মানুষেরই নয়) নয় আত্মনিবেদন ও ভক্তির রসে ডুবে থাকা। তার কাজ সর্বব্যাপক দেখা, বিশ্লেষণ করা, প্রতিবাদ করা, চিন্তাভাবনা করা, সত্যের মুখোমুখি হওয়া। পাপপুণ্যহীন তার জীবন এবং বেঁচে থাকা। তার আছে সারা বিশ্বের ভাবনা-চেতনার উত্তরাধিকার। কেউ কি মা বলে তরী ভাসাবে?

আশা করি, আপনার আবেদন পুনর্বিবেচনা করবেন। শ্রদ্ধা জানবেন।

১০. ৭. ৮০

ফ্ল্যাট RC/1, ODRC হাউজিং এস্টেট কালীকৃষ্ণ গুহ

কলিকাতা ৬৪

৬.

মাননীয়, সম্পাদক
উত্তরসূরি, সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

কবিতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত। আপনার সম্পাদিত বর্তমান সংখ্যাটি সুনাম ও দুর্নাম—উভয়েরই সম্মুখীন হয়েছে বলে আপনি জানালেন। পত্রিকাটি তখনই হাতে নিয়েছি।

আমি আগেই স্বীকার করেছি, কবিতার জ্ঞান আমার সামান্য, কিন্তু পত্রিকা সম্পাদকের প্রবন্ধের মূল বক্তব্য, যেটি প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হয়েছে, ঐটিই পত্রিকাব মূল্যায়ন সম্পর্কে যথেষ্ট। শ্রীমধুসূদনের আপন মাতৃক্রোড়ে ফিরে আসার মত 'উত্তরসূরি'র নবজাগ্রত মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানাই, অভিনন্দন করি, নবতর বিপ্লবসাধনাকে।

৫.৭.৮০ নমস্কারান্তে

গ্রন্থন বিভাগ শিবানী চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭.

'উত্তরসূরি'—সম্পাদক সমীপেষু,

১০৫ ক্রমিক সংখ্যক 'উত্তরসূরি' হাতে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তন্ময়চিত্তে পাঠ ক'রে শেষ ক'রে ফেলেছি এবং ভেতরে ভেতরে যুগপৎ উৎফুল্ল ও উদ্দীপিত বোধ করছি। এ-সংখ্যা থেকে 'উত্তরসূরি'-র অঙ্গসজ্জা ও বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন সম্পাদক হিসেবে আপনার সদাজাগ্রত পরীক্ষামনস্কতার পরিচায়ক। আলোচ্য সংখ্যাটি সম্পর্কে সাধারণভাবে জানাবার কিছু নেই, কেননা 'উত্তরসূরি'র যে কোনো সংখ্যার মতোই বর্তমান সংখ্যাটিও একটি অসাধারণ সংখ্যা। তবু তন্নিষ্ঠ পাঠকের তাৎক্ষণিক মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় প্রচ্ছদপৃষ্ঠার সম্পাদকীয় আবেদন ও অন্তিম পৃষ্ঠার 'স্মৃতিতর্পণ' অংশে এবং এই দুই পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী কোনো-কোনো রচনায়, যার অন্তত কয়েকটি বিস্তারিত· বিশ্লেষণের

অপেক্ষা রাখে। অরুণকুমার সরকারের স্মৃতিতে রচিত 'কবিতার ভাবনা' যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই আন্তরিক। অরুণকুমার সরকারের অপ্রকাশিত চিঠিটি কবির আন্তর-ভাবনার আবরণ-উন্মোচক। এবং সর্বোপরি, গ্রামবাংলায় অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবিদের কবিতার দ্বিতীয় মুদ্রণ 'কবিতা কবিতা' বিভাগটি বাংলা কাব্যে নবাগতদের পক্ষে প্রচণ্ডভাবে আশাব্যঞ্জক ও উদ্দীপক।

১০. ৮. ৮০ পরিমল চক্রবর্তী

৪৩৪ পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা ৩০

৮.

প্রিয় অরুণবাবু,

আপনাকে চিঠি লেখার সঙ্কল্প অনেকদিনের, আজ হাতে কিছুটা সময় পেয়েছি, এই সুযোগটুকু সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছি চিঠি লিখে। আলোচ্য বিষয় অরুণ ভট্টাচার্য কৃত অন্তরঙ্গ আলোচনা কবিতার ভাবনা (১১)। বেশ কয়েকবার পড়েছি 'উত্তরসূরি' ২৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (১০৪)। এমন রসসিক্ত মায়াভরা স্মৃতিকথা যার মধ্যে সাহিত্যের সমীক্ষাও রয়েছে সমান্তরালভাবে, আমি এর আগে পড়ি নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে লেখা অংশটুকু অনবদ্য, জুলাই, ১৯৬০ উত্তরসূরি বিশেষ সংখ্যায় কবির যে স্মৃতিচিত্রটি আপনি লিখেছিলেন সেটি আবার এখানে পড়তে পেরে খুবই উপকৃত হয়েছি। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে যথার্থ সমালোচনার জন্য আপনি সবচেয়ে উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন, আমি মনে করি। তাঁর মনের বিশেষ কতগুলো দিক আপনি খুব বেশী করেই জানতেন, নিরঞ্জন হালদার ও অন্যান্য রেনেশাঁস ক্লাবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও বটে। "বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর যে আকর্ষণ ছিল তা সচরাচর অন্য কবিদের মধ্যে দেখতে পাই নি।"—এবিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

'কবিতার ভাবনা' আলোচনার প্রথম অংশে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পর্কে মিছরীর মত মিষ্টি আপনার লেখা পড়তে পড়তে হঠাৎ ধাক্কা খেলাম যেখানে একটি গানের আসরে বোধ হয় (রামরিক ইনস্টিট্যুশনে) রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড বাজানো সুর হতেই 'রবীন্দ্র কালচারের নামাবলী-জড়ানো তথাকথিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভদ্র ও ভদ্রাগণ হাসাহাসি শুরু করেন। চমকে ওঠার মত।

এমন ঘটনা এখানে সেখানে আরো ঘটেছে ও ঘটছে। বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতা, অত্যন্ত কাঁচা ভিত্তির ওপর বড় কিছু গড়ে তোলার হুজুগ, প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা এসব মিলে কোন্ অধঃপতনের দিকে আমাদের নিয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ জেনারেশন সম্পর্কে এখন নৈরাশ্য জন্মাচ্ছে। সিরিয়সনেস্-এর অভাবে জাতটা ডুবতে যাচ্ছে। আপনি এ্যানেক্‌ডোট্‌টি এই আলোচনায় উল্লেখ করে খুব উপকার করেছেন, এর মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। চিন্তা করবার কিছু লোক এখনো আছেন, নইলে সমাজটা আছে বা চলছে কি করে।

৬ ৭. ৮০ ইতি

২৭৬ লেক গার্ডেনস্, কলকাতা ৪৫ অমূল্য চক্রবর্তী

৭.

'উত্তরসূরি'-র এ সংখ্যাটি শুধু যে আয়তনেই বিরাট, তা নয়—আয়োজনেও বিশাল। এতো কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, গুচ্ছ-কবিতা,—এ-তো একদিনে পড়ে ওঠার ব্যাপার নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্বি-মত থাকলেও, সামগ্রিকভাবে আপনার সম্পাদকীয় বক্তব্য আমার ভালো লেগেছে। ভিন্নমত তিনটি ক্ষেত্রে ১ কবিতাকে অবিশ্যি দেশজ ভিত (base) এ দাঁড়াতে হবে, কিন্তু রূপারোপ (superstructure)-এর ব্যাপারে তার আন্তর্জাতিক হতে বাধা কোথায়? ২. কবিতার পাঠক হবার দাবি যেমন একজন আলোকপ্রাপ্ত কাব্যবিশারদের আছে, তেম্নি একজন শ্রমিক, প্রযুক্তিবিদ, ডিপ্লোম্যাট, চিকিৎসক অথবা নাবিকেরও রয়েছে, সে হিসেবে কবিতার থিমেটিক বা স্ট্রাক্‌চার্যাল বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। ৩. যুগ ও সমাজগত বিবর্তনের সাথে সাথে কবিতার চরিত্রগত পরিবর্তন (দৃষ্টিভংগীর ক্ষেত্রে) ঘটেছে কিন্তু কবি যেমন নিছক টাইম-সারভার নন, তেম্নি চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতার বার্থ-রাইটও তার নেই। সততা এবং শুভ বোধের সাথে সাথে এখানে এক অলিখিত সামাজিক দায়বদ্ধতাও জড়িত রয়েছে। সশ্রদ্ধ প্রীতির সংগে।

২৩. ৭ ৮০ ঊর্ধ্বেন্দু দাশ

প্রিন্স অব ওয়েলস্ ক্যাম্পাস

জোড়হাট, আসাম

১০.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কাগজ খুব ভালো হয়েছে। শ্রীরমেন্দ্রকুমারেরও (আচার্যচৌধুরী) সেই মত। তবে উত্তরসূরির ম্যানিফেস্টো (?) সম্বন্ধে কিছু বলার আছে আমার। আমবা বর্জন করব না মেলাবো দেশজ ও বিদেশী ঐতিহ্যকে ? নেহাৎ অনুকবণের বিরুদ্ধে বলেন নি এসব কথা নিশ্চয়ই ? তাহ'লে ব্যাপারটা তো খুবই অব ভিয়াস হয়ে যায়। শক্তিমান কবিদের কছে পশ্চিমী সতীর্থরা তো এখন ঘরের লোক। সাক্ষা'ত বিস্তারিত আলোচনা করার বাসনা রইল। স্নেহার্থী

২৭. ৭. ৮০ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজী বিভাগ

চন্দননগর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ

১১

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরুণদা,

১০৫ সংখ্যা উত্তরসূরিতে কবিতার জন্য নতুন ১৯৮০ সম্পাদকীয় আবেদন পড়ে উদ্দীপিত হলাম। বিবেকবান বিচক্ষণ আপনার উপদেশ তরুণ কবিতা রচনা চর্চাকারীদের কতটা প্রণিধানযোগ্য হবে জানি না, আত্মজিজ্ঞাসার একটা সূত্রপাত যদি করে দেয় সেও তো অনেকখানি।

মধুসূদনের পরধন-লোভে-মত্ত অনুতাপী চতুর্দশপদীর সমটুকু যেন ফিরে আসছে আপনার কণ্ঠে, কিন্তু মাতৃভাষাব পুরোনো ধনের দিকে আপনি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে কি এখন আর গুপ্তধনই আছে, সে তো লুপ্তধন। আপনি লিখেছেন ১৯৩০ থেকে ১৯৮০ এই পঞ্চাশ বছব আমরা সাগরপারে তাকিয়ে আছি। ১৯৩০ তো নয়, ১৮৩০—না হোক দেড়শ বছর।[১] নতুন সন্ততিদের যে বেশ-ভাষা-আচার যে ভাবনা-লক্ষ্য তাদের সামনে, তারা কি চিনতে পারবে, গ্রহণ করতে পারবে যদি লুপ্ত রত্নোদ্ধারই কেউ করতে বসেন। বড়জোর গ্রাহক হয়ে মাসে মাসে নিয়ে গিয়ে ঘর সাজানোর উৎসাহ হতে পারে—সে এক ধরনের আত্মসচেতনতা বটে, কিন্তু মর্মান্তিক লাগে। আসলে বিবর্তনের এই ভবিতব্যটুকু মেনে নিলেই হয়তো বা স্বস্তি। পুরোনো আদি মানুষদের

আমাদের ধারার উন্নতির সন্নিকর্ষে আনতে গিয়ে কতবার দেখা গেল সেই ওয়েলফেয়ার ভোগ করার চাইতে তারা আত্মনিপাত বরণীয় মেনেছে। এখনো তো দেখছি আকছারই। বিষ্ণু দে তো পুরোনো কবিতার স্মৃতি তাঁর লেখার অনেক খুঁজে এনেছেন, জানি না কেমন লাগে—সৌখিনতার চেয়ে অন্তরকম কিনা। যদি বলেন, চারপাশে যে ইমারত খাড়া করছি, আমরা থাপ খাচ্ছি না তার ভেতর, যদি বলেন যেমন আমাদের রক্তের সংস্কার—গরিব একটুকরো মেটে ঘরের পাশে ঝোপঝাপের পাশে গিয়ে বসে কবি-টবি আলগা করে স্বাভাবিক হই একটা দণ্ড—জায়গাটুকুর আঁচ জানতে পারলেই তো টি টি পড়ে যাবে—আগাম চাঁদা ডাকা ওনারশিপ ফ্ল্যাট বাড়ির বিজ্ঞাপনে খবরকাগজের পাতা ভর্তি হয়ে উঠবে। তা ছাড়া, সেই জায়গা, সেই গাঁদেশ এদেশে আছে আর? মুক্তির দশক সত্তরের দশকের আগে, ষাটের শেষ দিয়েও মানুষের মুখে যে বিশ্বাস, দারিদ্র্যশ্রী চোখে পড়েছে, কোথায় গেল? দুঃস্থ হতদরিদ্র কুটোপাতাছাওয়া যে গাঁকে বিভূতিভূষণ ভালোবাসার লাবণ্য দিয়ে ভরে তুলেছিলেন, জীবনানন্দ যাকে দিয়েছেন কবিতার অমরতা—সে তো আমাদের মনের ইচ্ছে ধার করেই। পুরোনো জিনিশপত্র তার কোথাও যদি ঈষৎ সম্পদ ভাববার কিছু থাকে সে জানছি বিদেশী ট্যুরিস্টকে দেখাবার, মিউজিয়াম ভেঙে পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশের মিউজিয়ামে—কৃত্তিবাসের কাছাকাছি আসল লেখাটা পড়তেও তো হ্যালহেডের নিয়ে যাওয়া পুঁথি ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে জেরক্স্ করে আনতে হয়। মহাজন পদাবলী নিধুবাবুর গান এখন সোফিস্টিকেশন দেখাতে হয়তো বা কেউ কেউ চর্চা করেন, করবেনও, কিন্তু তার ভেতরে বসে সুখনিশ্বাস নেবে বাঙালি সন্তান! হালে পানি না পাওয়া, বাইশ বাজারে অকৃতার্থ, নিষ্কিঞ্চন-না-শিক্ষিত আমার মতন কেউ যদি হন পেতে পারেন বা, জানি না। তেমনি নির্বুদ্ধি তো এত বছর ধরে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিত্য সঙ্গ করছি, চোখে পড়ে না।

অরুণদা, আপনি নিশ্চয় নতুন ফ্যাশন প্রবর্তন করতে চাইছেন না, যা গভীর অনুতাপে বুঝেছেন তাই বলেছেন। এত দিন ব্যর্থ চাতুরির শিক্ষাতে কাল কাটল, প্রাণের লেখা তো কোথাও পড়তে পেলাম না। এর সঙ্গে যোগ করতে পারেন 'সেই পুরোনো লেখার পরে' কিন্তু সে যে জানে, জানে। তা ছাড়া

কাউকে অনুজ্ঞা করলেই বোঝানো যাবে। লেখা কি জীবন পদ্ধতির বাইরেকার? আপনি লেখা হাতে নিয়ে বলুন, এই লেখা ভালো। ছেলে বুঝবে, শেক্‌সপীয়র দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ মহাজন পদাবলী ভালো। এই নিশ্চয় আপনার বলবার নয়, প্রত্যাশারও নয়। আপনি বিদেশী সাহিত্যের ছাত্র, হাজারটা দৃষ্টান্ত টেনে বলবেন কত আন্দোলন পটবদল পুনরুজ্জীবন ঘটে গেছে নানা দেশে নিজের দেশের জাতের পুরোনো লেখা নতুন চোখে পড়ে, তার আগে না দেখতে-পাওয়া প্রাণ-আবেগ নতুন করে রক্তে স্পন্দিত করে তুলে। কিন্তু আপনি তো জানেন —সেই শিক্ষা কি শিখতে পেয়েছি নতুন শিক্ষা সূচীর বশবর্তী হয়ে। আর পাঁচটা উন্নয়নশীল দেশের মতন আমরা শেখবার গোড়ার পাঠ থেকে শিখেছি নিজের জাতজ্ঞাত, নিজের পুরোনো ছায়া, নিজের পুরোনো পোষাকটাকে অবধি ঘেন্না করতে, এখন তাকে খুঁজে মিলবে আর? তাকে চিনতে পারব সহজ বলে? মুক্তি আশ্রয় আরাম আনন্দ—সত্যি সত্যি কিছু বোধ করতে পারবো তার ভেতর?

সাত কথার মধ্যে এক কথা। প্রায় বছর দশ আগে একটা সামান্য লেখা আমি লিখেছিলুম 'পুরোনো বাঙলা কবিতা ও আধুনিক কান' বলে, একআধ-জনেরও তা চোখে পড়ে নি, বিশ্বাস হয় না। ঈষৎ তথ্য ঈষৎ মনস্তাপ দুইই তো ছিল, তবে কি গদ্য-লেখা পত্র সৌকর্যের বা গ্রন্থ সৌকর্যের নিছক-লেখা বলেই নেওয়া এখন চল? হয়তো ভালো করে লিখতে পারি নি। সম্ভব। পুরোনো কবিতার একটা সংকলনও করেছিলাম। আমার দুঃখ-বিশ্বাস—যা ভেবেছিলাম আমার মতন আরো আছে কারোর কারোর—সেই ছিল আমার খোঁজ-বাতি। ভেবেছিলাম সাজগোছ করা পাণ্ডিত্যের বাইরে সহজ সত্যেরও একটা কোথাও জায়গা নিশ্চয় আছে—আমাদের এইখানেও। এক যুগ ধরে বারো হাতে ধর্ষিত হয়ে সে আমার ফেলা-কাগজের চুবড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে।

আপনার লেখা পড়ে আমার নির্বুদ্ধি হতাশার, প্রত্যাহারের সুখটুকু একটুখানি ফিরে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। একদমে এতটা তাই অনায়াসে লিখে ফেলতে পারলাম। নিজের কথাই তো কত বললাম সব সংবরণ আলগা করে। আশা করি, প্রগল্‌ভতার জন্য মার্জনা করবেন।

একটা কথা কিন্তু স্বীকার করতে বাধছে। আপনি লিখেছেন,* কবিতাকে

হতে হবে কেবল সহজ স্ফটিকস্বচ্ছ হৃদয়বান, কেবল তাই? এবারেই একটি কবিতায় আপনি ছেপেছেন

গোলাপফুলের গায়ে
কতো জটিলতা

এইটুকু আছে বলেই না এত টান। এই জটিলতাটুকু জমে না উঠলে গোলাপ কি গোলাপ হয়, কবিতা কবিতা?

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩ ৭ ৮০
বাংলা বিভাগ
গোয়েঙ্কা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ

[১ শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীঅরুণ মিত্রও মৌখিক আলোচনায় আমাকে এবারকার আবেদন সম্পর্কে এই তারিফটিই জানিয়েছেন। অরুণ ভট্টাচার্য]

১২

অরুণদা,

নতুন কবিদের উদ্দেশ্যে লেখা আপনার প্রবন্ধের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। অরুণকুমার সরকারের চিঠিটি খুবই মূল্যবান।

১৬ ৭ ৮০
৫৩ বিধান পল্লী, কলকাতা ৩২

আশিস সান্যাল

১৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরুণদা, উত্তরস্বরির বর্তমান সংখ্যাটি এতো ভালো হয়েছে যে কি বলব। প্রাচীন কবিতার সংযোজন যেমন অভিনব, সংকলন তেমনি অসাধারণ পুরনো হয় চিরনূতন আপনি তা আবার দেখালেন। সবচেয়ে আমাকে বিস্মিত করেছে তরুণতর কবিদের কবিতাগুলি। সবচেয়ে 'গোলাপ কাঠের বৌ' আমাকে আকৃষ্ট করেছে, আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি। এছাড়া বিভিন্ন আলোচনা অরুণ সরকারকে নিয়ে, কবিতার ভাবনা—বিশেষ করে কবির কবিতাসহ আপনার স্মৃতিচারণের বেদনা,—আমাকে ভীষণভাবে বিদ্ধ করেছে। গুচ্ছ কবিতার সঙ্গে

পরিচিতি নতুনত্বের আর এক চিত্র। সব মিলিয়ে জমজমাট, দারুণ। কবিতা যে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে তার অন্যতম কারণ উত্তরসূরি এবং আপনার প্রচেষ্টা। আবার গভীর অভিনন্দন গ্রহণ করুণ।

আপনার স্নেহধন্য

১৪ ৭ ৮০ জগৎ লাহা

বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

১৪

অরুণদা,

উত্তরসূরি ১০৫ পেয়েছি, ধন্যবাদ। বৈচিত্র্যের জন্য উত্তরসূরির একটা আলাদা মর্যাদা তৈরি হয়েছে। এই সংখ্যাটি সেই ধারার সার্থক অনুসরণ।

প্রচ্ছদে আপনার আবেদন অভিনব। বাংলাদেশের জল মাটি আমাদের হৃদ্‌পিণ্ড খামচে রয়েছে, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে সেই রক্তের দাগ গূঢ় সঞ্চারী। শত অস্থিরতায় আমরা আমাদের রক্তস্পন্দনকে ভুলব কি করে? তবু আপনার এই আবেদনের প্রয়োজন ছিল।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা— উত্তম দাস

১৪ ৭ ৮০

বারুইপুর/২৪পরগণা

১৫.

শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য,

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

'উত্তরসূরি' বরাবর আমার কাছে মর্যাদার, আকর্ষণের। তার সাম্প্রতিক 'নতুন কবিতা' বিভাগটি সেই আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে।

আর বর্তমান (১০৫) সংখ্যার 'কবিতার জন্য আবেদন, ১৯৮০'—এই নিবন্ধটি নানান দিক থেকে বিশিষ্ট। অবশ্যই, আমি আপনার সব অভিমতের সংগে একমত হতে পারছি না। কিন্তু নিহিত অভিপ্রায়টি অভিনব ও মূল্যবান। বলতে ইচ্ছে করে, চমকপ্রদ।

এমন করে ইদানীং কেউ কথা বলেন নি। অথবা সেই দুঃসাহস কারু নেই। 'কবিতা আর কারব গোলাম নয', কোন নীতিব বা দাদার চামচা নয়, একথা এদেশে বড শুনি নি। ববং উল্টোটাই শুনে আসছি—কবিতা হবে অমুকের এজেণ্ট আপনার একথা খুব মানি, 'কবিতা মিষ্টিক ভাবন'সঞ্জাত, কবিতার বহস্য আজও অনাবিষ্কৃত'। 'মহৎ কবিতাব মধ্যে নিহিত আছে মন্ত্রশক্তি। তার কাজ চৈতন্যের উন্মোচন।'

কবিতা যে আপনার কাছে সখেব জিনিষ নয পার্টটাইম ব্যবসা নয়, তা সহজেই বোঝা যায। এব' জানতে পাবি—একটি নিবেদনেব স্তব আপনার বিশ্বাসকে কী প্রসন্নতায আত্মমুখী ও স্বকীয কবতে চায।

১০ ৭. ৮০ স্নেহধন্য

পযলাডাঙ্গা, বারুইপুর, ৭৪৩ ৩০২ পরেশ মণ্ডল

১৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'উত্তবসূরি'র সাম্প্রতিক স'খ্যাটি (১০৫) পেযে খুব ভাল লাগল। তাব কাবণ সংখ্যাটিব বিষয-বৈচিত্র্য। অবশ্য ইদানীং লক্ষ্য কবছি, আপনার পত্রিকাব বিগত কয়েক সংখ্যাব প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলি সাহিত্য ও স'স্কৃতিব মৌল প্রশ্ন সম্পর্কে সজাগ পাঠককে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত কবে। সে সম্পর্কে লিখব লিখব কবে শেষ পযন্ত আব লেখা হ'বে ওঠে নি।

কিন্তু আপনার কবিতা-বিষয়ক আবেদন-এর জন্য সাম্প্রতিক সংখ্যাটি এমন জরুরী যে এ বিষয়ে স'শ্লিষ্ট সকলকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য কবেবে। বিষয়টি সম্ভবতঃ অনেকেবই ইতিপূর্বে মনে হয়েছে। কিন্তু সাহসী উচ্চারণে ও আত্মপ্রত্যযের দৃঢতায় আপনার আগে এমনভাবে কেউ বলেন নি। তার চেয়েও বড কথা (যা কবিতা সম্পর্কে আপনার বক্তব্যের পরিপূরক) ববীন্দ্রনাথেব অব্যবহিত পবে বিশেষ বিশেষ কযেকজন মাত্রই কবিতা লিখেছেন (আব কেউই লিখতে পারেন নি) এই বহুঘোষিত ও বহু-উচ্চারিত দম্ভোক্তিব পুনর্মূল্যায়নও আজ একান্ত জরুরী।

সাহিত্যের আলোচনায় দেখা যায়, কিছু কবিকে সুপরিকল্পিতভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেবার কুশলী চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে দিনের পর দিন। আপনি নিজে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন—সুতরাং এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সেই সাহিত্যের ইতিহাসেও এ ধরণের ঘটনার নজির রয়েছে অজস্র। এ প্রসঙ্গে বাংলা কবিতার আসরে কিছু কবিকে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা চলেছে, সেই বহুঘোষিত তিরিশের যুগ থেকেই। সেই মহান ঐতিহ্যের (?) পতাকা ধারণ করেই এ যুগে কবি ও কবিতার মূল্যায়নের জের এখনো চলেছে পুরোদমে।

আপনার স্পষ্ট ও নির্ভীক আলোচনা, বাংলা কবিতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগ্‌দর্শন সূচিত করবে কি না, তা আগামীকালের ইতিহাস প্রমাণ করবে।

এ সংখ্যায় আপনার কবিতার ভাবনা শীর্ষক আলোচনাটি স্মৃতিচারণের অতিরিক্ত এক অর্থ বহন করে, এবং তা কবিতা-জীবন-মৃত্যু, তথা অস্তিত্বের গভীরে আমাদের স্পর্শ করে।

৩৬বি, বকুল বাগান রোড
ক'লকাতা-৭০০০২৫ বিজয়কুমার দত্ত
১৯ ৭ ৮০

সাম্প্রতিক গ্রন্থপ্রকাশ

কবিতা এবং শিল্পচর্চা

Tennyson and His Publishers—by June Steffensen Hagen 266p Illus Ref Bibl Index Price £ 12 Macmillan, 1979.

African Poetry in English—by S H Burton & C J H Chackshield 168 p. Bibl Price £ 5 95 £ 1 95 Pbk, Macmillan 1980

Twelve Poems—Sylvia Townsend Warner 28 p Price £ 3 50, Chatto & Windus 1980

Sonnets from the Spanish,—by Morrison, R H. (ed & tr) 50 p Rs 50 00 (Hard bound) Rs 30 00 (Ordinary) Writers' Workshop Calcutta, 1980

Lyrics and Idylls—M M Dileep 44 p Rs 25 00 (Hard bound) Rs 10 00 (Ordinary) Writers' Workshop. 1979

Poets of the Tamil Anthologies Ancient Poems of love and war,—by George L Hart III p 212, Princeton University Press 1979 Price not stated (A selection from the Tamil Sangam Classics)

W H Auden The Poet, by R N. Srivastava. p 144, Doaba House 1979 Rs 14 00

Sap-Wood Dyson, Ketaki Kushari 64 p. Rs 50 00 (H. B) Rs 15 00 (Ordinary) Writers' Workshop Calcutta, 1978 translated from Bengali by the poet

T. S. Eliot's Theory of Poetry by Rajnath. p p 208, Arnold Heinemann, Rs. 55 00, 1980

Time and Poetry in Eliot's Four Quartets —by Rajendra Verma XI, 201 P Rs 55 00 Macmillan Delhi, 1979

The Fifth (poems)—Gopal Honnalgere. 49 p Rs 6 00 Hyderabad, Bromstick Publications 1980

British Poetry Since 1979 A Critical Survey —by Schmidt, Michael & Jones, Peter (eds) £ 9 95 Carcanet Press 1980 (Essays by Critics and Poets identifying current trends and tendencies

Thomas Gray His Life and Works —by Sells, A L Lytton Allen & Unwin Illus £ 12 95 1980 (Biography of the 18th Century English Poet)

Conversations with Menuhin —Robin Daniels 192 p Illus £ 7 95 Macdonald & Janes, 1979

The Story of Modern Art —by Lynton, N Price £ 7 95 (pbk) Price £ 13 95 Phaidon (over 300 Illus 85 in colour) (Analysis of continuity and change in art from 1900)

An Approach to Indian Art,—Niharranjan Ray, Panjab University, Chandigarh Rs 40 00

Aesthetics (An anthology) ed Harold Osborne, Oxford University Press

রীণা রায়

কবিতা পড়ুন

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র :

তবুও এখানে এক আরণ্যক সন্ধ্যাব তিমিরে
শান্তি নামে পাহাড়ে পাহাড়ে।
তারই অনুবাদে যেন পৃথিবীর ও প্রান্তেও নেমে পড়ে ঘুম।
শুধু জ্বলে বনেব আগুন এক অন্ধকার মসৃণ শরীর—
শিকারী চিতার স্তব্ধ চোখের গভীর
পত্র-ঝরা রাত্রির ফাল্গুন ॥

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় :

থেমে গেছে অন্ধ ঝড়, শান্ত হল গ্রহ স্বস্ত্যয়নে,
হৃদপিণ্ড কাঁপিছে তবু ধরিত্রীর শঙ্কায় আহত।
তুমি যেন মাতরিশ্বা, অন্তরীক্ষে আমার জীবনে
কামনার বনস্পতি মুহুর্মুহু নাড় অবিরত।
প্রশান্তি দিয়েছে যেন হৃদয়ের দীর্ঘ আশীর্বাদ।

দিনেশ দাস :

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো!
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে!

সমর সেন :

অনেক অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রির নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপর ঝরুক মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ

●

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতু ॥

যে ঋষি দিব্যজ্ঞানে দেবীব পরমাশক্তি কল্পনা করেছিলেন, অন্যত্র তিনিই দেবী-আরাধনায় মানব-আত্মার পরম আকুতি নিবেদন করে বলেছিলেন, আমাকে অনন্ত রূপ দান করো, অনন্ত জয়, অনন্ত যশ। পূর্ণ করো আমাকে। যাঁর মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির বীজ নিহিত তিনিই দান করবেন মুক্তির অভযবাণী।

দেবী-পূজার মধ্য দিয়েই যুগে যুগে এই পূর্ণতাকে আবাহন করেছে ভারতবর্ষ।

●

কে. সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ● ব্যাঙ্গালোর

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি (১ম)	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৫·০০
পুঁথি-পরিচয় ১ম-৪র্থ	পঞ্চানন মণ্ডল	৯২·০০
রবীন্দ্র-রচনা-কোষ	চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি	২১·৫০
রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন	সান্ত্বনা মজুমদার	২৩·০০
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ	অমিয়কুমার সেন	৩·০০
স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য	পশুপতি শাশমল	৩৪·০০
রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা	নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১২ ০০
পরশুরামের মাধবসংগীত	অমিতাভ চৌধুরী	১৫·০০
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ১-২	পঞ্চানন মণ্ডল	২৯·০০
আধুনিক ওড়িয়া কাব্যধারা · নবজাগরণযুগ	নরেন্দ্রনাথ মিশ্র	৪২ ০০
চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা	ভি. ভি. ওয়াজেলওয়ার	১২·০০
Indıan Art & Aesthetıcs	H Mıtra	35·00
Problem of Land Transfer	K Mukherjee	10 00
Poetry of Yeats	S. C Sen	12 00
Charyagıtıkosha	P C Bagchı & S B Sastrı	15 00
Urban Growth ın Rural Area	C P Mukherjee	51·00
A Study of Unıversals	S. Sen	30.00
Asvaghosa A Crıtıcal Study	B. N. Bhattacharya	60 00
Language, Structure & Meanıng	S Sen Gupta	46·00
Rasachandrıka I-II	S. N Ghosal	42·50
Tagore's Educatıonal Phılosophy	S C Sarkar	7 50
Descriptıve Catalogue of Sanskrıt Manuscrıpts	S. N. Ghosal	27·00
Enquıry ınto the Existence of God	S. C Sen Gupta	10·00
Philosophy of Srimadbhagavata II	S Bhattacharya	21·00

RESEARCH PUBLICATIONS SECTION
VISVA-BHARATI SANTINIKETAN WEST BENGAL

New Additions:

Title	Author	Price
Asvaghosa as a Poet & a Dramatist	Samir Kumar Datta	15·00
Concept & Iconography of the Goddess of Abundance & Fortune in Three Religions of India	Niranjan Ghosh	25·00
Virginia Woolf . The Emerging Reality	Laxmi Parasuram	10 00
Sartre's Ontology of Consciousness	Mrinal Kanti Bhadra	15 00
Geomorphology of the Subarnarekha Basin	S C Mukhopadhyay	50 00
Values & their Significance	Karabi Sen	25 00
Suniti Chatterjee Commemoration Volume	B P Mallik (Ed.)	(Press)

THE UNIVERSITY OF BURDWAN Rajbati, Burdwan

প্রকাশিত হচ্ছে

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের

কাব্যগ্রন্থ

পাখি জানে

দ্বিতীয় সংস্করণ ৬·০০

এক দশক বাদে এই কাব্যগ্রন্থ আবার প্রকাশিত হচ্ছে

প্রচ্ছদ রঘুনাথ গোস্বামী

মোহিনী প্রকাশনী / ২৮ স্ট্র্যাণ্ড রোড। কলকাতা ১ ॥ ফোন ২২-২৭৭০

Oxford titles on Indian Society and Culture

KETAKI KUSHARI DYSON
A Various Universe :
A Study of the Journals and Memoirs of British Men and Women in the Indian Subcontinent 1765—1856 Rs 90

PARTHA MITTER
Much Maligned Monsters :
History of European Reactions to Indian Art Rs 170

BIMAL KRISHNA MATILAL
The Logical Illumination of Indian Mysticism Rs 7

BARBARA STOLER MILLER
Jayadeva's Gitagovinda Rs 35

RAIMUNDO PANIKKAR
The Vedic Experience :
An Anthology of the Vedas for Modern Man Rs 310

SUDHIR KAKAR, *ed*
Identity and Adulthood
with an Introductory lecture by Erik. H. Erikson Rs 35

MYRON WEINER
Sons of the Soil :
Migration and Ethnic Conflict in India Rs 150

OXFORD UNIVERSITY PRESS
P 17 Mission Row Extension
Calcutta 700 013
DELHI BOMBAY MADRAS

সমুদ্র কাছে এসো

অরুণ ভট্টাচার্যের শেষতম কাব্যগ্রন্থে প্রতীকী ভাবনা এক অনিঃশেষ আত্ম-উন্মোচনের সহজ সারল্যে আবিষ্কৃত হয়েছে।

অরুণ ভট্টাচার্য প্রণীত . **নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা**

আশু-প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'শিল্পতত্ত্ব', 'সৌন্দর্যদর্শন' এবং 'সঙ্গীতে সুন্দরের ধারণা' বিষয়ক তিনটি বিভিন্ন পর্বে অতি দুরূহ বিষয় আলোচিত হয়েছে। স্বচ্ছ ও সহজ ভাষায় কাব্য নাটক সংগীত নৃত্য ও চিত্রকলা থেকে উদাহরণ সহ পরিকল্পিত এই গ্রন্থ লেখকের দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এক বিচিত্র আত্ম-আবিষ্কার। ভারতীয় রসতত্ত্ব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র অধ্যায় এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পী-সাহিত্যিক স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য।

সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থ

১. সংগীতচিন্তা ২ রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক ৩. রবীন্দ্রসংগীতে স্বর সংগতি ও সুরবৈচিত্র্য ৪. লৌকিক ও রাগসংগীতের উৎসসন্ধানে : এস এন রতনজংকার প্রণীত। অনু . কৃষ্ণা বসু ভূমিকা ও সম্পাদনা : অরুণ ভট্টাচার্য
5. A Treatise on Ancient Hindu Music (Published simultaneously from India and U S A.). 6. Dimensions · Philosophical Essays on the Nature of Music and Poetry. 7 Structure and Integration of Ragas (In Press).

কাব্য-সাহিত্য সমালোচনা

১. ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ২ কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল (১ম সং নিঃশেষিতপ্রায়) ৩ আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ (প্রেসে) ৪. Tagore and the Moderns ৫. The Romantic Design (shortly to be published)

কাব্যগ্রন্থ

১. সমর্পিত শৈশবে ২. হাওয়া দেয় (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ) ৩. ঈশ্বরপ্রতিমা ৪. সময় অসময়ের কবিতা ৫. বারো বছরের বাংলা কবিতা (সম্পাদনা) ৬. চল্লিশ দশকের কবিতা (সম্পাদনা)

উত্তরসূরি প্রকাশনী : কলকাতা ৫০ ॥ ইণ্ডিয়ানা : কলকাতা ৭৩

Rabindranath Tagore

In English Translation

BROKEN NEST
Rs 8·50
CHITRA
Rs. 6 50
COLLECTED STORIES
Rs 10·00
THE GARDENER
Rs. 8 65
CRESCENT MOON
Rs. 8 50
GITANJALI
(with an introduction by W B Yeats)
Rs. 6 00
HUNGRY STONES
Rs. 8 65
LOVER'S GIFT AND CROSSING
Rs. 8 00
NATIONALISM
Rs 6 50
POEMS OF KABIR
Rs 7·00
THE POST OFFICE
Rs. 6·50
RED OLEANDERS
Rs 7·55
STRAY BIRDS
Rs. 7 05

CREATIVE UNITY
Rs 10 00
FRUIT GATHERING
Rs 8 00
GLIMPSES OF BENGAL
Rs 11 00
GORA
Rs 15 00
HOME AND THE WORLD
Rs 7 55
THE KING OF THE DARK CHAMBER
Rs 10 00
LECTURES AND ADDRESSES
Rs 11·00
MASHI
Rs. 10 00
PERSONALITY
Rs. 11 00
REMINISCENCES
Rs. 12 00
SACRIFICE
Rs 12 00
SADHANA
Rs 9 70
THE WRECK
Rs 15 00

To order your copies by V P P, write to the office located closest :

THE MACMILLAN COMPANY OF INDIA LIMITED

Marketing and Editorial Office :
4 Community Centre, Naraina Industrial Area,
Phase I, New Delhi 110 028

Branches
Bombay . Mercantile House, Magazine Street, Reay Road, Bombay 400 010
Calcutta : 294 Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta 700 012
Madras : 21 Patullo Road, Madras 600 002
New Delhi : 2/10 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110 002

ছোটদের ও বড়দের উপহার দেবার মনের মত কয়েকটি বই

অন্নদাশঙ্কর রায়

রাঙাধানের খৈ (ছড়া) ৩.০০ আতা গাছে তোতা (ছড়া) ৪.০০
রাঙা মাথায় চিরুনি ৫.০০ ক্ষীর নদীর কূলে ১০.০০
কথা (৪০টি গল্পের সংকলন) ১৫.০০ চক্রবাল (প্রবন্ধ) ৮.০০
পাহাড়ী ৫.০০ পথেপ্রবাসে ৬.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নির্বাচিতা (গল্প সংকলন) ২০.০০ অথবা কিন্নর (কবিতা) ৩.৫০

ডঃ সুশীল রায় অনূদিত

মধুসূদনের পত্রাবলী ১৫.০০ টিপু সুলতানের তরবারি ২৫.০০

হেমেন্দ্রকুমার রায়

যকের ধন ৬.০০ নীলসায়রের অচীনপুরে ৬.০০

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রীব ৪.০০ যূথপতি ৪.০০

উৎপল দত্ত

শেকসপীয়ারের সমাজচেতনা ২৫.০০ চীনযাত্রী ২০.০০

ডাঃ নির্মল সরকার

প্রাথমিক চিকিৎসা ৫.০০ চিকিৎসা অভিধান ২০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত — শিশু কবিতা ২.০০

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র — ইদানিং আমি (কবিতা) ৫.০০

দাশরথি সোম

মানব জীবনের দিক্‌যন্ত্র জ্যোতিষ ৮.০০ উপনিষদের সরল তত্ত্বকথা ৬.০০

দেবনারায়ণ গুপ্ত

উইংস-এর আড়ালে (সুদীর্ঘ থিয়েটার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা) ১০.০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

অভয়ামঙ্গল — সম্পাদিত ডঃ আশুতোষ দাস। ৭·০০

বৌদ্ধসাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা—ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫·০০

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়—ডঃ যোগীন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ। ২ ৫০

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২০·০০

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা—ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত। ৭ ৫০

নরোত্তম দাস ও তাঁহার গ্রন্থাবলী—ডঃ নীরোদপ্রসাদ নাথ। ৪০ ০০

শাক্ত পদাবলী, সম্পাদিত—অমরেন্দ্রনাথ রায়। ৪ ০০

An Enquiry into the Nature and Function of Art
—Dr S K Nandi 10 00

Critical and Comparative study of Mahimabhatta
Amiyakumar Chakravorty 35 00

Introduction to Tantric Buddhism—Dr. S B Dasgupta. 16 00

Indegenous states of Northern India—Dr Bela Lahiri. 50 00

Pauranic and Tantric Religion —Dr. J N Banerjee 12·50

Religious Experiences of Mankind—Sobharani Basu. 20·00

World Food Crisis (Kamala Lecture)—Dr. Nilratan Dhar. 15 00

★

প্রকাশন বিভাগ

৪৮, হাজরা রোড। কলিকাতা ৭০০০১৯

সম্প্রতি প্রকাশিত নূতন সংস্করণ

রবীন্দ্রসংগীত

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের গান এবং তা নিয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের আলোচনা একটি দুর্লভ সমন্বয়। তথ্যের সমাবেশে উজ্জ্বল এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রসংগীত-রসপিপাসু এবং গুণীজনের কাছে গত তিন দশক ধরে যেভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে আজও তা অব্যাহত। মূল্য ২০·০০ টাকা

সংগীত-সংরক্ষণ-গ্রন্থমালা

সংকলন ও সম্পাদনা · শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

প্রথম খণ্ড বিবিধ রচয়িতার ২৫টি স্বদেশী গান ও স্বরলিপি। ৭·০০

দ্বিতীয় খণ্ড : বিভিন্ন রচয়িতার ২৫টি প্রাচীন গান ও স্বরলিপি। ৪·৫০

তৃতীয় খণ্ড : বিভিন্ন রচয়িতার ২৫টি প্রাচীন বাংলা গান ও স্বরলিপি। ৬·০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় . ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

বিক্রয়কেন্দ্র · ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রপৌত্রের দৃষ্টিতে প্রপিতামহের জীবনী। টা ৫.৫০

যুক্তিবাদ, আধুনিকতা ও আনন্দমীমাংসা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, আধুনিকতা ও সমকালীনতা (জীবনে ও সাহিত্যে), রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা এই তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। টা ৩.৭৫

শিল্পতত্ত্ব বেনিডেট্টো ক্রোচে
ড সাধনকুমার ভট্টাচার্য-অনূদিত ক্রোচের 'শিল্পতত্ত্ব' ও 'শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়ের একত্র প্রকাশ। টা ১৫.০০

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)
ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
সনাতন শাস্ত্রীয় দৃষ্টি ও অধুনাতন কবিদৃষ্টির আলোকে বৈষ্ণব-পদাবলীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণ এবং রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভায় তার প্রতিফলন বিষয়ে আলোচনা। টা ১০.০০

রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব ড হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, নাটকে, নৃত্যে ও চিত্রে শিল্প-তাত্ত্বিক অনুভূতির রসবিচার। টা. ৮.০০

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা · শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দিকের মনোজ্ঞ আলোচনা। টা ২.০০

সংগীতরত্নাকর : শার্ঙ্গদেব
ড সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক মূল সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। টা. ১৮.০০

বাংলা লোকনাট-সমীক্ষা ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
বাংলা লোকনাট্য বা যাত্রার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। টা. ১৬.০০

রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ (২য় সং) ড সুধীরকুমার নন্দী
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা। টা. ১৪.০০

বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত ড অরুণকুমার বসু টা. ৪৫.০০

পট-দীপ-ধ্বনি · শ্রীঅমর ঘোষ। টা. ৫০.০০

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা : ১৭শ বর্ষ ॥

গ্রন্থাবলীর জন্য লিখুন·

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় :এমারেল্ড বাওয়ার, কলিকাতা ৫০
জোড়াসাঁকো ভবন, ঠাকুরবাড়ী, কলিকাতা ৭০০ ০০৭

পুরোনো কলকাতার সঙ্গে যে-নামটি অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে তা হচ্ছে ভীমচন্দ্র নাগ। একসময়ে বহুবাজার বা বউবাজার অঞ্চলকে বনেদী মনে করা হ'ত। ভীমচন্দ্র নাগ সেই প্রাচীন উত্তরাধিকারকে এখনো ধরে রেখেছে।

মিষ্টান্ন শিল্পে অগ্রণী ভীমচন্দ্র নাগ তার ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি।

ভীমচন্দ্র নাগ

৪৬ স্ট্রাণ্ড রোড কলকাতা-৭০০ ০০৭

হাওড়া ॥ উত্তরপাড়া

খাল-বিল-নদীর ভরা যৌবন।
শিশিরে ভেজা মাটিতে এখন পুজোর গন্ধ।
কাঠামো, খড়, মাটি ও ছাঁচ।
তার উপর তুলির রঙে আব ঘামে অপরূপ প্রতিমা।
তার বোধনের আর কত দেরী?

কলকাতাও এমনি এক অপরূপ প্রতিমা।
তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই তিলোত্তমা।
তার চাল-চিত্র রচনায় আমরা দিন-রাত ব্যস্ত।
বোধনের আর দেরী নেই।

medium

মেট্রো রেলওয়ে

শারদ শুভেচ্ছা

বাংলার দুঃস্থ তাঁতশিল্পীদের সেবায় এবং অনুরাগী ক্রেতাসাধারণের স্বার্থে—

কম দামে, সেরাগুণমান, কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্পে তৈরী সকল রকম রেশম ও তাঁতবস্ত্রের বিচিত্র সমাবোহ। তন্তশ্রীর বস্ত্রসম্ভারে আপনার উৎসবের দিন মুখরিত হোক।

বিক্রয়কেন্দ্র: পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, নয়াদিল্লী, ব্যাঙ্গালোর এবং আগরতলা (ত্রিপুরা)

ওয়েষ্টবেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম অ্যাণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,

কলিকাতা ৭০০০১৩

বাতাসে
শিউলি
ফুলের গন্ধ...
বাতাসে শিউলির গন্ধ।
আকাশ হলো নীল।
এমন দিনে মন থাকে না
বন্ধ ঘরে।
দিগন্তে আজ ছুটির আমন্ত্রণ।
পূর্ব রেলওয়ে
EASTERN RAILWAY

জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য

যত দিন যাচ্ছে বাজারে জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করাই এখন দুরূহ কাজ। প্রতিদিন সব কিছুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই তো আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এর কি কোনই প্রতিকার নেই?

খাদ্যশস্য, চিনি, তেল, কেরোসিন, ডিজেল, সার, কয়লা, কাপড় ইত্যাদি ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দিয়ে সেগুলি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা কি একেবারেই সম্ভব নয়? আমরা মনে করি সম্ভব। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দায়িত্ব নিতে পারেন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করতে পারেন। কারণ রাজ্য সরকারের হাতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করার ক্ষমতা নেই— এমনকি কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া অন্য রাজ্য থেকে তাঁরা কোন কিছু কিনতেও পারেন না। কাজেই সারা দেশ জুড়ে এ ধরণের বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের। একমাত্র তাঁরাই দেশের যেখানে যে জিনিস পাওয়া যায় কিনে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ এর জন্যে যে বিরাট সম্পদ ও বিশাল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন—সে সবই তো তাঁদের হাতেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এ দায়িত্ব পালন করে রাজ্যে রাজ্যে জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, রাজ্য সরকারগুলির তখন দায়িত্ব হবে সেইসব জিনিস সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একমাত্র এইভাবেই মজুতদার মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ১৫৫৭৫।৮০
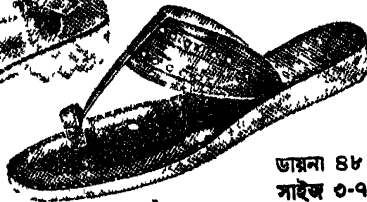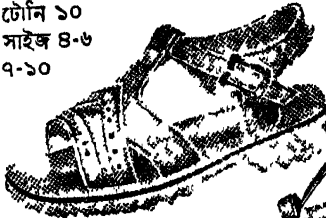
পূজোয় চাই
নতুন জুতো
টোনি ১০
সাইজ ৪-৬
৭-১০
ডায়না ৪৮
সাইজ ৩-৭
এস্কোয়ার ৫০
সাইজ ৬-১০
Bata
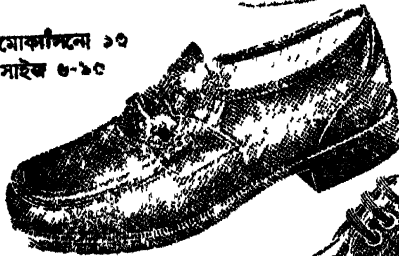
With Best Compliments of :

THE ALKALI AND CHEMICAL CORPORATION OF INDIA LTD.

CALCUTTA ● BOMBAY ● MADRAS ● NEW DELHI

সবারে করি আহ্বান

সম্পুট

হাওড়া সুড়ঙ্গ পথের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত বাজারের একটি অভিনব বিপনি।

আপনার সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনে

কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল আয়োজন॥

* ন্যায্য মূল্য * সুন্দর ছিমছাম পরিবেশ * নিশ্চিন্তে কেনাকাটার জায়গা

সম্পুট

★ এখানে পাবেন

জ্যাম ★ 'জলী ★ চাটনী ★ তালা-চাবি ★ বঁড়শি ★ লৌহজাত দ্রব্য ★ পরচুলা ★ ধূপকাঠি ★ মোমবাতি ★ মাদুর ★ ছাতা ★ বেতের তৈরী সামগ্রী ★ প্লাস্টিক ও পলিথিন জাত দ্রব্য ★খেলাধূলার সামগ্রী ★ আরও অসংখ্য কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প উৎপাদিত রকমারী সম্ভার।

* পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম * পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ॥ কলিকাতা-১৩

পঃ বঃ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত॥

তিন সঙ্গী

এইচ. এম. ভি'র তিনটি অবিস্মরণীয় এল-পি রেকর্ড

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান

ECSD 2535 স্টিরিও

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সংগীতগুরু অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সুরের অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছিল। ব্রহ্মসংগীত, স্বদেশী ও প্রেম পর্যায়ের ১৫টি সুনির্বাচিত গানের এই অনবদ্য স্টিরিও এল-পি রেকর্ডে জনপ্রিয় শিল্পীরা হলেন হেমন্ত, সুচিত্রা, কণিকা, নীলিমা, অর্ঘ্য, ঋতু, অশোকতরু, সুপূর্ণা, ভি ভি ওয়াঝালওয়ার, প্রসূন দাশগুপ্ত ও ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী।

উপাসনার গান

ECSD 2570 স্টিরিও

বাংলা কাব্যসংগীতের ঐতিহ্যে ব্রহ্মসংগীতের অবদান উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মসংগীতের সুবিপুল ভাণ্ডার থেকে ১৫টি গান চয়ন করে পরিবেশিত হয়েছে এই স্টিরিও রেকর্ডটিতে। শিল্পীরা হলেন দেবব্রত বিশ্বাস, ভি ভি. ওয়াঝালওয়ার, ঋতু, কণিকা, প্রসূন দাশগুপ্ত, নীলিমা, হেমন্ত, সুপর্ণা, অর্ঘ্য, সুচিত্রা, ধনঞ্জয় ও ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী।

অবিস্মরণীয় উমা বসু (হাসি)

ECLP 2546

গান্ধীজীর ভাষায় 'বাংলার বুলবুল', সুধাকণ্ঠী উমা বসুর কণ্ঠ অকালে চিরস্তব্ধ হয়ে গেলেও রেকর্ডে পরিবেশিত তাঁর অসংখ্য গান চিরকাল আমাদের তন্ময় করে রাখে। রামপ্রসাদ, কবি-সুরকার দিলীপকুমার রায় জ্যোতির্মালা দেবী ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রচিত ১৪টি বিচিত্র মধুর গানের এই রেকর্ডটি সংগীতরসিকদের কাছে অমূল্যসম্পদ হয়ে থাকবে।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

ওরা চিরকাল

টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,

ওরা মঠে মাঠে

বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—

ওরা কাজ করে

নগরে প্রান্তরে।…

ওরা কাজ করে

দেশে দেশান্তরে,

৩৩০০০ মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসেই সম্ভব হয়েছে পশ্চিমবাংলার গ্রামে শহরে বিদ্যুতের আশীর্বাদ পৌঁছে দেওয়া। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, নতুন নতুন প্রকল্প আর বিদ্যুৎ পরিবহণে বিশাল প্রয়াসের পিছনে রয়েছে হাজার হাজার কর্মীর রাত্রি দিনের বিনিদ্র, অবিচ্ছিন্ন, নিরলস প্রয়াস।

হাজারো মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আগামীদিনের যে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছেন তার উপরই দাঁড়িয়ে আছে—

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

● সকল কাজে ● ● সকল সাজে ●

"তন্তুজ"

বাংলার তাঁতের কাপড়

সঠিক মাপ ঃ পাকারঙ ঃ নিখুঁত বুনন ঃ সর্ব্বাধুনিক রুচিসম্মত ও

তুলনামূলক দামে সস্তা

প্রধান কার্য্যালয় ঃ
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৪
ফোন : ৩৫-৬৬৫৮

নগর কার্য্যালয় ঃ
৪৫, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭২
ফোন : ২৭-৮০১২

তন্তুজ দোকানে জনতা শাড়ী পাওয়া যায়

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।"

মার্টিন্ বার্ন্
কলকাতা ৭০০ ০০১

আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক—
এই আমাদের প্রচেষ্টা...
ফার্মাসিউটিক্যাল
কাজ করে যাচ্ছে
স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় চাহিদা
মেটানোই আমাদের ব্রত।
এরই জন্যে উঁচুমানের
নানাধরনের ওষুধ তৈরি করা।
এই প্রয়াস এগিয়ে চলেছে—
প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।
ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস লিমিটেড
৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭১
ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস—
মানুষটিকে ঘিরে রয়েছে
নির্ভরতা, চার দশক পেরিয়ে
EIPW/CAS-2/80 BEN
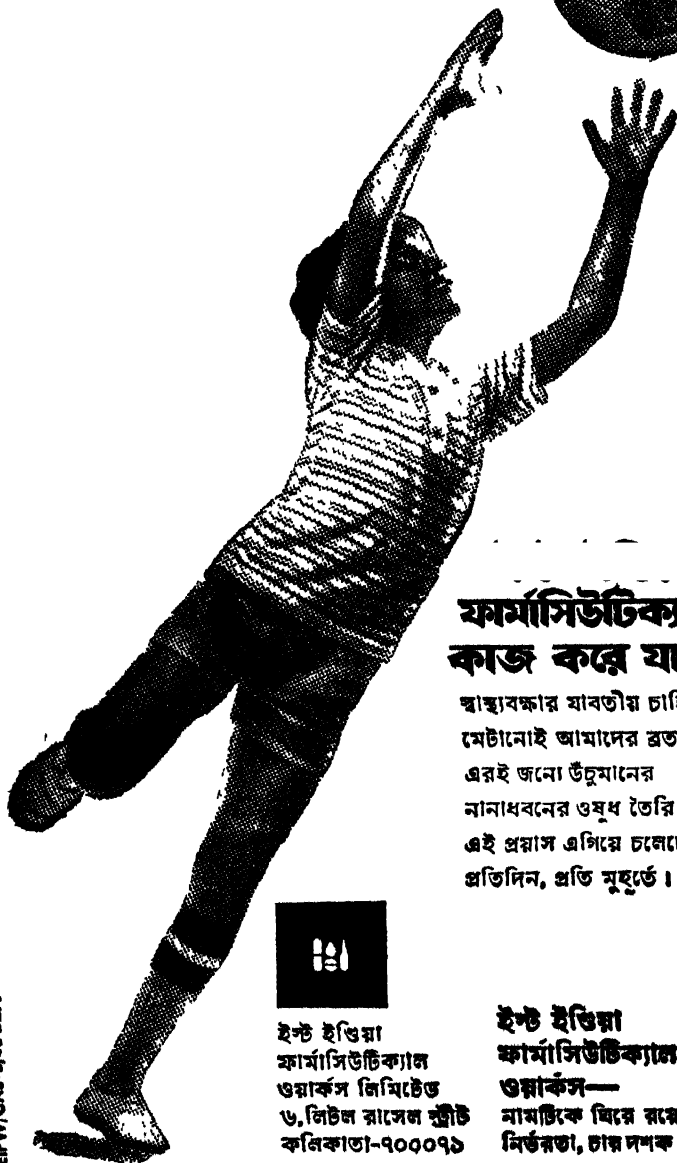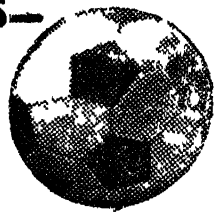
দশের কল্যাণে
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

সম্পাদনা : অরুণ ভট্টাচার্য । ২বি৮ কে. সি. ঘোষ রোড, কলকাতা ৫০ । ৫২-২৪৫২

সংসার সুখে বাড়ুক সংখ্যায় নয়

মানুষ যদি করতে হয়
দুটির বেশী মোটেই নয়

মাস মিডিয়া
রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর • পঃ বঃ সরকার

শিল্পী গোপাল ঘোষ

প্রভাত গুহ-র সৌজন্যে

অন্তরঙ্গ অনুভবে তিন কবি

ক. অতুলপ্রসাদ সেন

১.

কবি অতুলপ্রসাদ সেনকে যে আমরা ভুলতে বসেছি রেডিও মারফৎ প্রচারিত গুটি কয় গান ছাড়া, এ আমাদের বাঙালি জীবনের পরম দুর্ভাগ্যের ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। অথচ অতুলপ্রসাদের মতো একজন সার্থকজন্মা মানুষকে ভুলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে বলে তো ভুলেও মনে হয় না, তবু, তাঁকে যে আমরা ভুলতে বসেছি এ-সম্পর্কে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। আজ আমরা যাঁদের স্মৃতির প্রতি যত্নশীল হয়েছি এবং যাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে মাতামাতি পর্যন্ত করছি, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের দান তাঁদের কারো চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। বাস্তবিক, অতুলপ্রসাদের স্মৃতির প্রতি আমাদের এই শীতল ঔদাসীন্য অনেক সময়ই অন্তরে দুঃখের সঞ্চার করে, স্মরণে আনে গবেষক-সাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অমোঘ উচ্চারণ 'বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।'

অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি এখনো অনেকাংশেই সীমিত, আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে বহু শত মাইল দূরে সুদূর লক্ষ্ণৌ শহরে অতুলপ্রসাদ সেন নামে একজন কবি ও গায়ক একদা বাস করতেন কিংবা তিনি ছিলেন সেখানকার একজন বিখ্যাত আইনজীবী, আমাদের অধিকাংশের কাছেই তো এইটুকুই তাঁর পরিচিতি। আর তাঁর সৃষ্টির স্মৃতি হিসেবে রয়েছে কোনো-কোনো স্কুলপাঠ্য শিশুসেব্য পুস্তকে কিছু কিছু কবিতা এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে গুটিকতক গান। তাঁর সমস্ত গানের কোনো নির্ভরযোগ্য সংকলন কিংবা তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ আজ আর সহজলভ্য নয়, হয়তো বিলুপ্তপ্রায়। তাঁর কোনো প্রামাণ্য জীবনী নেই, নেই তাঁর নামে কোনো স্মৃতি-প্রতীক, পালিত হয় না সামান্য সমারোহেও তাঁর আবির্ভাব কিংবা তিরোভাব দিবস, থাকার মধ্যে একমাত্র আছে তাঁর নামে একটি সরণী, তা-ও বাংলাদেশে নয়, বাংলার বহুদূরে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে।

কিন্তু এইটুকুই তো তাঁর শেষ পরিচিতি নয় কিংবা এটাই তো তাঁর স্মৃতি-রক্ষার ব্যাপারে আমাদের শেষ দায়িত্ব বা কর্তব্য নয়। আইন-আদালতে, দেশ সেবায়, দানেধ্যানে অথবা অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অতৃপ্ত ও বহুমুখী জীবনের ছোটোবড়ো কতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সে-খবর আমরা ক'জন রাখি? ক'জন জানি লক্ষ্ণৌ শহরের ঐতিহাসিক মোঘল প্রাসাদের আদালত কক্ষে কতো বাদী-বিবাদী অতুলপ্রসাদের কাছে একদিন ছুটে এসেছিলেন সুবিচারের আশায়, নিজেদের বিপদ থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে। সেদিনের সেই প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার তাঁর অতুলনীয় বাকচাতুর্যে ও আইনের সুগভীর পাণ্ডিত্যে তাঁর সমসাময়িক আপামর আইনজীবীকেই পেছনে ফেলেছিলেন অতি সহজে। আর সেই আইনের আঙিনায় কতো অভিজ্ঞতাই না তিনি অর্জন করেছেন। কে জানে, হয়তো সে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতাও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলে রসসিঞ্চন করেছিলো। কিন্তু তাঁর জীবনের অতীতে-বিলুপ্ত-হওয়া সেই সব দিনগুলির বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার কাহিনী বাংলা সাহিত্যের কোনো অলক্ষ্য প্রকোষ্ঠেও স্থান পেয়েছে ব'লে জানি না, এবং তার চেয়েও ঢের পরিতাপের বিষয়, আমরা, এই বাংলাদেশে, তাঁর যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে এখনো নির্মমভাবে উদাসীন হয়ে রয়েছি।

২

অতুলপ্রসাদ তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের একটি বৃহৎ অংশ কাটিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে, কাজেই তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন প্রবাসী বাঙালি। কিন্তু তাঁর বড়ো আদরের বাংলাদেশে, বাঙালি জাতি আর বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ছিলো অকৃত্রিম প্রাণের টান। প্রবাস-জীবন তাঁর বঙ্গপ্রীতির পথে এতোটুকু বাধাও সৃষ্টি করতে পারে নি, বরং আরো গভীর করেছে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর প্রীতিবোধকে। কালক্রমে, একজন প্রবাসী হওয়া সত্ত্বেও এই শহরের সমাজজীবনের সর্ববিধ স্তরে নিজেকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কাব্যে, সঙ্গীতে, ধনে, মানে ও অন্যান্য বহুবিধ দিকে। লক্ষ্ণৌ শহরের এই বিখ্যাত মানুষটির গানের প্লাবনে এককালে সমগ্র উত্তরপ্রদেশ প্লাবিত হবার উপক্রম হয়েছিলো। তাঁর গানের শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণে সুরের আগুন তিনি যে কতোখানি তীব্রতায় জ্বালিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, এর

থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। একজন সুদক্ষ আইনজীবী হিসেবে তিনি ছিলেন সব ক'টি দিক দিয়েই প্রথম শ্রেণীর—আইনশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যে, আইনবিদ্ হিসেবে সুদূরব্যাপ্ত খ্যাতিতে এবং এই ব্যবসায়ের পসারে ও প্রভূত অর্থোপার্জনে। এ-প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে একটি কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, এমন সফল পুরুষের সংখ্যা আমাদের দেশে অঙ্গুলীমেয় নয়, কিন্তু এই ব্যবসাসূত্রে উপার্জিত অর্থকে বিবিধ জনহিতকর কাজে অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করেছেন, নিয়োজিত করার মতো মহানুভবতা দেখিয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা, (দু'এক জনের বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া) অদ্যাবধি নেহাৎই নগণ্য এবং অতুলপ্রসাদ সেই দু'একটি বিরল ব্যতিক্রমেরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর তাঁর দানশীলতা? তারই কি অজস্র তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে একদা-ঐশ্বর্যশালিনী অধুনা-ঐশ্বর্যহীনা আমাদের এই দেশে? নিজের যথাসর্বস্ব দান ক'রে একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হবার এমন মহৎ উদাহরণ আমাদের দেশে বাস্তবিকই বিরল। দানের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সার্থকভাবে তুলনা করা চলে এমন বাঙালি আর মাত্র একজনই ছিলেন যাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম 'চিত্তরঞ্জন' আর আপামর দেশবাসীপ্রদত্ত বিশেষণ-মুকুট 'দেশবন্ধু'। না, একটু ভুল হ'লো সত্যকথনে, এমন বাঙালি আরো একজন ছিলেন আমাদের দেশে, তিনি বীরসিংহের সিংহশিশু ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর', ঈশ্বরচন্দ্র 'করুণাসাগর', ঈশ্বরচন্দ্র 'দানসাগর'। আইন ব্যবসায়ে অতুলপ্রসাদ একদিকে যেমন উপার্জন করেছেন প্রচুর, তেমনি অন্যদিকে দানও করেছেন খ্যাতি-প্রাপ্তি-প্রচার-বিচার নিরপেক্ষভাবে। তাঁর দানের অনেক অজ্ঞাত কাহিনী লক্ষ্ণৌ শহরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, এমন কি শেষ জীবনে তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট সম্পত্তি নিজস্ব বসতবাড়ীটি পর্যন্ত তিনি দান ক'রে গেছেন। অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য দিকের কথা বাদ দিলেও তাঁর চরিত্রের শুধুমাত্র এই বিশেষ দিকটিই পরার্থ-পরতার পরাকাষ্ঠা হিসেবে আমাদের জাতীয় জীবনে পরিগণিত হওয়া উচিত।

তাঁর প্রবাস জীবনের লীলাভূমি লক্ষ্ণৌ শহর আর সেই শহরের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আশ্রয় করেই অতুলপ্রসাদের সামাজিক সত্তা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো, সেই শহরের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে, নানা সামাজিক

ব্যাপারে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন গভীরভাবে। সেখানে এখনো যে বাঙালি চক্র বা 'বেঙ্গলী ক্লাব' আছে সেটি তাঁর উৎসাহেই একদা স্থাপিত হয়েছিলো সুদূর অতীতে, তা ছাড়া তখনকার দিনে লক্ষ্ণৌতে 'যুবক সমিতি' নামে আরো একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও ছিলো। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ লক্ষ্য করেছিলেন যে লক্ষ্ণৌ শহরের প্রবাসী বাঙালিদের এ-দু'টি সংস্থা নিজেদের সীমিত শক্তিকে অনর্থক অপব্যয় করছিলো পরস্পর সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন ক'রে তুলছিলো পারস্পরিক মিত্রতার পরিবর্তে অহেতুক বৈরিতায়। তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রবাসী বাঙালিদের এ দু'টি সংস্থাকে এক হ'তে হবে, ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান হ'তে হবে। সেই কারণেই উনিশ শ' উনত্রিশ সালে মূলত তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পরস্পর বিবাদমান এ-দু'টি সংস্থা সংযুক্ত হ'য়ে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভাবতে আনন্দ পাই যে আজ এই মিলিত প্রতিষ্ঠানটিই লক্ষ্ণৌর প্রবাসী বাঙালি সমাজের সর্বপ্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হ'তে পেরেছে, তৃপ্তি বিধান করতে পেরেছে তাঁর অন্তরলালিত অপূর্ণ ইচ্ছার। আরো দৃষ্টান্ত আছে তাঁর সহৃদয় সামাজিকতার। লক্ষ্ণৌ শহরের অন্যতম প্রধান সড়ক 'হিউয়েট রোড'-এর 'গোপাল নিকেতন'-নামক ভবনে বর্তমানে যে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার এককণা জমিও কেনা সম্ভব হ'তো না যদি এ-ব্যাপারে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে না আসতেন। কিন্তু এ-ও যথেষ্ট নয়, জমি সংগ্রহ করেই তিনি তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে বলে ভাবতে পারলেন না কিছুতেই যতোদিন পর্যন্ত না তিনি সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এই সেবাশ্রমের 'লাইব্রেরী' ও 'ডিস্পেন্সারী'র তিনখানি সুবৃহৎ কক্ষ নির্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন। এমনই ছিলো আমাদের অতুলপ্রসাদের বিপুল দানশীলতা, এমনই ছিলো তাঁর উদার, ব্যাপ্ত ও সহৃদয় সামাজিক সচেতনতা।

৩.

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন অতি চমৎকার লোক। ভারী অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি, নিজে খেতে যতো না ভালোবাসতেন, অন্যকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন তার চেয়ে অনেক বেশী। যেমন রসিক ছিলেন, স্বভাব ছিলো তেমনি লাজুক আর মনটি ছিলো শিশুর মতোই সরল ও

অমায়িক। স্রেফ হাসি ও গল্পের সাহায্যে আসর জমাতে তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই অদ্বিতীয়। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ফিটফাট থাকতেন, কথা বলতেন কম, আর ছিলেন (যা তাঁর কথাবার্তাকে আরো মাধুর্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে) সামান্য একটু তোতলা। উর্দুভাষায় অতি চমৎকার দখল ছিলো তাঁর, লক্ষ্ণৌর অবাঙালী মহলেও তিনি ছিলেন একজন রীতিমতো বিখ্যাত মানুষ। আর যাকে আমরা বলি জনপ্রিয়তা, তারও শীর্ষে তিনি আরোহণ করতে পেরেছিলেন নিজের অন্তরের স্বাভাবিক মাধুর্যের গুণে। সাহিত্যগতপ্রাণ একজন মানুষ ছিলেন তিনি। একবার নয়, বেশ কয়েকবার প্রাক্তন 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বা বর্তমান 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, শুধু তা-ই নয়, ইংরেজী উনিশ শ' পঁচিশ সালে কানপুরে এবং উনিশ শ' তেত্রিশ সালে গোরক্ষপুরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেছিলেন। তাছাড়া উনিশ শ' একত্রিশ সালে এলাহাবাদ শহরে যে বিরাট, প্রায়-ঐতিহাসিক রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, অতুলপ্রসাদই ছিলেন তার প্রধানতম উদ্যোক্তা। সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আজ যে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, এই সম্মেলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন বিস্তু কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও কানপুরের একনিষ্ঠ সাহিত্যপ্রেমিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলুম শুধু এই কারণে যে সম্প্রতি যে-সমস্ত তরুণ সাহিত্য যশোপ্রার্থী 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন তাঁদের কারো-কারো পক্ষে এটি একটি বহুলাংশে অপরিজ্ঞাত অথচ অপরিহার্য তথ্য বিশেষ।

অতুলপ্রসাদ নিজেকে বলতেন 'কবি-বাউল', তিনি অবশ্য অসংখ্য নদনদী -বিধৌত গাঙ্গেয় উপত্যকার শস্যশ্যামল প্রান্তরের বিবাগী বাউল নন, তিনি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের গোমতীর ধূসর উষর রুক্ষ দগ্ধ প্রান্তরের আত্মভোলা নিঃসঙ্গ বাউল। পল্লীবাংলার মালতী-বকুলের শ্বেত উত্তরীয় তাঁর অঙ্গে ছিলো না ঠিকই, কিন্তু তাঁর অঙ্গে ছিলো শিমুল পলাশের রক্তবর্ণ উত্তরীয়। বাংলাদেশের তথাকথিত পেশাদার বাউলদের সঙ্গে এই বিশিষ্ট ভাবতন্ময় কবি বাউলের মূলগত কিছু-কিছু পার্থক্য ছিলো অবশ্যই, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই তাঁর

অনন্ত বাউল গানের তন্ময় ভক্তদের নিয়ে একটি একান্ত নিজস্ব ভাবজগৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সারাজীবন ধরে অনন্যচিত্তে সাধনা ক'রে গেছেন গভীরতর রূপে, অন্তরতর রূপে সেই ভাবজগতে ডুবে থাকতে।

পারিবারিক জীবন কিন্তু মোটেও সুখের ছিলো না এই উদাস মানুষটির। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিবাহিত জীবনে অসুখী হ'যে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সারাজীবনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, এজন্য আয়ুর অন্তিমে পৌছানো পর্যন্ত তাঁর পরিতাপের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না, এবং এ-ধারণা পোষণ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে এই সুতীব্র অন্তর্বেদনাই তাঁর অন্তঃকরণে গানের ঝর্নাধারাকে উৎসারিত ক'রে দিয়েছিলো। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা তো আমরা কতোজনই কতোভাবে পেয়ে থাকি, আমাদের পেতে হয়, কিন্তু ক'জন পারি সেই যন্ত্রণার বিষকে সৃষ্টির অমৃতে রূপান্তরিত করতে? অতুলপ্রসাদ ছিলেন মনেপ্রাণে একজন যথার্থ কবি, কাজেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি পেরেছিলেন তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত দুঃখবেদনাকে আমাদের সকলের জন্য সর্বগত আনন্দে রূপান্তরিত করতে। এ-প্রসঙ্গে হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মতো মনে পড়ছে একজন বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকের (খুব সম্ভবত জর্ম্যান কুলীন গ্যয়টের) একটি অমর উক্তি, যার ভাবের অনুবাদ করলে অনেকটা এ-রকম দাঁড়ায়: দুঃখ পাওয়া সার্থক, যদি সে দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে অন্ধকার আকাশের বুকে নিঃসঙ্গ তারার মতো। কবি অতুলপ্রসাদের জীবন-সাধনায় এই বাণী আশ্চর্যজনক সার্থকতালাভ করেছিলো।

৪.

বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশে আধুনিক রাগপ্রধান গানের প্রথম সার্থক স্রষ্টা অতুলপ্রসাদ—এ-স্বীকৃতিটি আজ তাঁর গানের অসংখ্য অনুরাগী-অনুরাগিনীদের মুখে-মুখে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে নির্দ্বিধায় উচ্চারিত হওয়া দরকার। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী নানা রাগরাগিণীর সূক্ষ্ম কলাকৌশলের অপরূপ বিন্যাস সাধন ক'রে তিনি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে বাংলা গানের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গীতিধারার সূত্রপাত ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গানের মৌলিক পার্থক্যের কথা সচেতনভাবে স্মরণে রেখেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ-গীতির গভীর আত্মিক যোগও সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

অতুলপ্রসাদ নিজেই সঙ্গীত রচনা করতেন, তাতে সুর দিতেন এবং গাইতেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তাঁর অসংখ্য স্বদেশপ্রীতির গানের মধ্যে 'ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী' কিংবা 'হও ধরমেতে ধীর' অথবা 'বল বল বল সবে' এই গানগুলির আবেদন একেবারেই মর্ম-ছোঁয়া, নানাভাবে এই সব গান প্রতিদিনের জীবনে আমাদের সুপ্ত আত্মচেতনা ও স্বদেশানুরাগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগিয়ে তুলছে। বাংলাভাষার প্রতি তাঁর দরদী মনের আর্তি তাঁর অগণিত গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে শিল্পসঙ্গত হয়ে চিত্রসুলভ স্পষ্টতায় পরিব্যাক্ত হয়েছে। তিনি যে দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ডে ছিলেন এবং সেখানে থাকাকালে যে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা ও চিত্রবিদ্যার চর্চা করেছিলেন, তাঁর জীবনী রচনার উপাদান হিসেবে এ তথ্যটি আমাদের অনেকেরই জানা, কিন্তু তাঁর পক্ষে কৃতিত্বের বিষয়টি হচ্ছে এই যে তাঁর গানের মধ্যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য কোনো সুরের প্রভাব এমন কি আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা ও সঙ্গীতের অমৃতরস আকণ্ঠ পান করা সত্ত্বেও তাঁর গান একেবারেই খাঁটি স্বদেশী জিনিষ, এবং আমার বিনীত বিবেচনায়, এটাই হচ্ছে অতুলপ্রসাদের গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, এটাই হচ্ছে তাঁর গানের অন্তঃশীলা। মনে পড়ছে প্রখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল, যিনি নিজে একজন বিশিষ্ট অতুলপ্রসাদ-ভক্ত ও অতুলপ্রসাদী গানের খ্যাতনামা গায়ক, একবার কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে অতুলপ্রসাদ তাঁর লণ্ডন প্রবাস থেকে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরে ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় একটি অতি উচ্চস্তরের গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে গুণীজনদের একটি সমাবেশে (সেখানে সান্যাল মশাই উপস্থিত ছিলেন) পাঠ করেছিলেন, সেই প্রবন্ধে পরিস্ফুট তাঁর যুক্তির গভীরতা সেদিন অনেক পাশ্চাত্ত্যসঙ্গীত বিশারদদেরও মুগ্ধ করেছিলো।

অন্যান্য অনেক প্রতিভাবানদের মতো অতুলপ্রসাদকেও প্রথমে অনেকেই চিনতে পারেন নি, একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতকার হিশেবে তাঁকে স্বীকার করেন নি অথবা স্বীকার করতে চান নি। তিনি যে কতো বড়ো একজন সঙ্গীতবিদ্, কী অন্তহীন গভীর তাঁর সৃষ্টি, কতো বিচিত্রমুখী যে তাঁর প্রতিভা— এ-সমস্তই স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছে অনেক, তবু, সৌভাগ্যের বিষয়,

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মাহেন্দ্র-মুহূর্ত থেকেই অন্তত দু'জন সঙ্গীত-রসিক তাঁকে নির্ভুলভাবে চিনতে পেরেছিলেন কিংবা বলা চলে পরম অনুসন্ধিৎসায় তাঁকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, এঁরা হচ্ছেন বিদগ্ধ পণ্ডিত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্র-তনয় দিলীপকুমার রায়। অতুলপ্রসাদের গানের সত্যিকারের মূল্যায়নের ও প্রচারের ব্যাপারে এঁদের দু'জনেরই দান অসামান্য। আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্বে যখন প্রায় কেউই অতুলপ্রসাদকে চিনতেন না বা জানতেন না তখন দিলীপকুমার তাঁর দলের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে নানা 'কনসার্টে' দিনের পর দিন এবং অবস্থাবিশেষে সম্ভব হ'লে নিয়মিতভাবে অতুলপ্রসাদের গান গাওয়াতেন এবং প্রচার করতেন। এভাবেই ক্রমে ক্রমে প্রধানত দিলীপকুমারের অসীম নিষ্ঠায় ও প্রায় একক চেষ্টায় অতুলপ্রসাদের গান সাধারণ্যে স্বীকৃতিলাভ করে। দিনের পর দিন দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদের গান শুধু যে গেয়েই বেরিয়েছেন, তা-ই নয়, কোথায় অতুলপ্রসাদের গানের মাধুর্য আর কোথায়ই বা তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য—এ-সমস্তই তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছেন অনেক সভাসমিতিতে। এ সম্পর্কে তাঁর রচিত 'স্মৃতিচারণ' নামক সুখপাঠ্য রম্যগ্রন্থে দিলীপকুমার রায় এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মূলেও ছিলো অতুলপ্রসাদের গানের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সপ্রীতি আকর্ষণ। তাছাড়া খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিক শরৎ-মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা, চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু প্রভৃতিও অতুলপ্রসাদের গানের মর্ম উপলব্ধি করতে উৎসুক থাকতেন ব'লে জনৈক বর্ষীয়ান অতুলপ্রসাদ ভক্তের উক্তি থেকে জানতে পেরেছি।

৫

এখনো মাঝে মাঝে ক্ষণিকের অবকাশের মন্থর মুহূর্তে অতুলপ্রসাদের নির্জন স্মৃতি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র হ'য়ে মনের আকাশে জ্বলে ওঠে—মধ্য-ফাল্গুনের বিহ্বল রাত্রির মদির লগ্নে যেন বহুদিনের ওপার হ'তে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে আসে তাঁর গানের কলি 'বধূ আমার আর কতকাল রইব চেয়ে' কিংবা 'আমিও একাকী, তুমিও একাকী'। রেডিওতে যখন তাঁর সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মপরিচিতি-সঙ্গীত 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা' শুনি,

তখন হঠাৎ, কেন জানি না, কী-এক অজানা অনুভূতিতে সমস্ত দেহমন অবশ হয়ে আসে, সমগ্র অস্তিত্ব মথিত হতে থাকে। হায়, তবু তাঁর সেই অতুলন চারুকণ্ঠ আর শোনা যাবে না কোনদিন, মৃত্যুর নিঃশব্দ তর্জনী চিরতরে সে কণ্ঠকে নীরব ক'রে দিয়েছে। লক্ষ্ণৌ শহরের সুন্দর একটি রাস্তা তাঁর নামেই পরিচিত হয়েছে—এ পি সেন রোড, কিন্তু যাঁর স্মৃতিতে সেই রাস্তার নামকরণ, তিনি আর কোনোদিনো সে রাস্তার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবেন না, এ-কথা ভাবতেই মন বিষণ্ণ হয়ে যায়, দু'চোখের পাতা ভারী হ'য়ে আসে। তবু, আমরা যদি তাঁকে ভালোবেসে তাঁর স্মৃতিকে আমাদের জীবনের অনুধ্যানে চিরজাগ্রত ক'রে রাখতে পারি, তবে তা-ই হবে আমাদের শোকের সান্ত্বনাস্বরূপ প্রাপ্ত মৃত্যুর অতিকৃপণ মুষ্টি হ'তে স্খলিত দুর্লভ উপহার।

প্রতিভার প্রতি অহৈতুক ঔদাসীন্য পৃথিবীর কোনো দেশেই অভিনব ঘটনা নয়, আমাদের এই হতভাগ্য দেশে তো নয়ই। তবু, শুধু এই কথা উচ্চারণ ক'রে আমাদের ত্রুটির স্খালন হয় না এতটুকু কিংবা আমাদের কৃতকর্মের অনুশোচনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না বিন্দুমাত্র, বিশেষ ক'রে অতুলপ্রসাদের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কালের করালগ্রাস থেকে তাঁর স্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদেরই গ্রহণ ও পালন করতে হবে। অতুলপ্রসাদ সেনের একটি স্থায়ী স্মৃতিফলক স্থাপন করা বাঙালি-সমাজের একটি জাতীয় কর্তব্য, এ কথা বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। আর প্রয়োজন তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার। এ-বিষয়ে আমি বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ গবেষক ও প্রখ্যাত অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অবশ্য এ-ব্যাপারে বোধ হয় খুবই মূল্যবান সাহায্য করতে পারেন লক্ষ্ণৌর 'বেঙ্গলী ক্লাব'-এর দায়িত্বশীল প্রবীণ সদস্যরা, কারণ তাঁরা অনেকেই হয়তো প্রতিদিনের অতুলপ্রসাদকে দেখেছেন, জেনেছেন আর চিনেছেন আমাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশী। আর প্রয়োজন নির্ভুল স্বরলিপিসহ তাঁর রচিত সমস্ত গানের এবং ঘনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ পরিচিতিসহ তাঁর সমগ্র কবিতার একক সংকলনের। এ-সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার কোনো অতুলপ্রসাদ-ভক্ত বিশিষ্ট প্রকাশন-সংস্থাকে অবিলম্বে উদ্যোগী হবার জন্য অনুরোধ করতে পারি আমরা। পরিশেষে আবারও বলি আমরা যেন ভুলে না যাই, যেন মনে রাখি শয়নে-স্বপনে

যে অতুলপ্রসাদের স্মৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের পূত লগ্ন এসে গেছে, কোনো মতেই আর দেরী করা চলে না, এক মুহূর্তও না।[১]

পরিমল চক্রবর্তী

খ জীবনানন্দ দাশ রূপকল্প প্রসঙ্গ

বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হবার উপক্রম করেছে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই উত্তরণপ্রয়াস লক্ষ্য করেছিলেন। পুনশ্চের যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার রূপরীতিকে কবিসত্তার ভিন্ন এক প্রেরণায় অন্ত পথচারী করলেন। তাঁর উত্তর-কাব্যপাঠক স্বতঃই উপলব্ধি করবেন সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলালের মত শক্তিমান সমকালীনরাও মুহূর্তে কতকটা পিছিয়ে গেলেন সূর্যকরোজ্জ্বলে সমাচ্ছন্ন হয়ে। এই আধুনিক রবীন্দ্রনাথকেও জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে উত্তর-তিরিশের অরবীন্দ্রিক আধুনিকতায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারলেন কবি ব্যক্তিত্বের জোরে। জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' বইখানির প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৩৪৫ থেকে '৬০-এর মধ্যে। উত্তর-বৈদিক বাংলা কবিতার চরিত্র শরীর ও হৃৎস্পন্দনটা কী কী বলতে চাইছেন ভিন্ন এক সময়ের কবি তার বিশ্লেষণের দরকার ছিল, আর এই আয়োজনের নান্দীমুখ রবীন্দ্রনাথ দেখেও গেছেন তাঁর সৃষ্টির প্রান্তসীমায় পৌঁছে। যুগকাল ও কবিস্বভাবের দিক থেকে জীবনানন্দের স্থিতপ্রজ্ঞাও অনাহত স্থায়ীত্ব আজ প্রশ্নাতীত। কেননা তাঁর অনুগামিতা ও মূল্যায়ন পঞ্চাশ কি তার আগে থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত ঐতিহ্যসূত্রে বাংলা কবিতায় বহমান। বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দকে চিনলেন, চেনালেন। কল্লোল যুগের উত্তাল প্রাণস্রোতে কবি জীবনানন্দ একলা মানুষটি হয়েও সন্নিহিত আপন হলেন, একথা অচিন্ত্যকুমার জানিয়েছেন। এদিকে হয়ত রবীন্দ্রপন্থী বৈশিষ্ট্যশূন্য অসম-স্বভাব কাব্যপাঠক এবং কবিরা জীবনানন্দের আধুনিকতার পরিপন্থী হয়েছেন বৈজ্ঞানিক নিয়মেই।

[১][ইতিমধ্যেই আমরা তিনজন অতুলপ্রসাদ-ভক্ত ও ঘনিষ্ঠজনকে হারিয়েছি, ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপ রায় এবং পাহাড়ী সান্যাল। আর যে দু'চারজন এখনো আছেন—তাঁরাই বা আর কতদিন! আর দেরী নয় তাঁর জীবনচরিত রচনায়। সম্পাদক . উত্তরস্মৃতি]

প্রতিবাদ যখন প্রগতির নিকষ-নিরীক্ষা, জীবনানন্দের কাব্যসমালোচনা যখন রস থেকে ব্যক্তিত্বহননের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল বুদ্ধদেবই তখন সর্বপ্রথম তাঁর অনন্য আধুনিকতার ধৃপারতি করলেন। স্থির বিশ্বাসে তাঁকে উত্তরকালের সারথি বলে অভিনন্দিত করলেন। জীবনানন্দের জীবিতকালেই বুদ্ধদেব-কৃত ধূসর পাণ্ডুলিপি ও বনলতা সেনের ন্যায়নিষ্ঠ সরস সমালোচনা জীবনানন্দের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কবিতার মহত্ত্ব ও গৌরবকে তুলে ধরলেন। জীবনানন্দ নিজেও ছিলেন দেশ বিদেশের সাহিত্যে বিদগ্ধ অথচ আশ্চর্যভাবে বুদ্ধদেবের মত তাঁর শিক্ষাবৃত্তি তাঁকে বিরস পাণ্ডিত্যের অভিমানে কলালক্ষ্মীর আসন থেকে দূরে সরায় নি। অগ্রজের আশীর্বচনে তিনি ধন্য নন যথার্থ, কিন্তু সত্যিই তাঁর কবিতা 'চিত্ররূপময়।' আবার কবিতার ও কবিস্বভাবের 'টেন্‌শন' বা কল্পনাশক্তির তুরীয় আততি (বিষ্ণু দে টেন্‌শনের বাংলা করেছেন "আততি") সৃষ্টিমার্গের অন্তরায় কিনা এই বিতর্কে জীবনানন্দ পত্রালাপে রবীন্দ্র বিপরীত।

তিরিশের দশকে যখন এক এক করে আমাদের পরবশ জাতীয় জীবন প্রতিহত হচ্ছিল অর্থনীতি রাজনীতি সমাজ বৈষম্য—এক কথায় গোটা জীবনটার বিবিধ লাঞ্ছনায়, নেতা পিতা পুরোহিত এই ত্রিকালজ্ঞে যখন বিভ্রান্ত ভ্রষ্ট তখন কালের কুটিল কটাক্ষের সামনে প্রশ্ন জাগছিল, ততঃ কিম্? আশ্বাস-প্রিয় রবীন্দ্রনাথ বারবার শুনিয়েছেন 'ঐ মহামানব আসে'—জীবনের উপান্তে পৌঁছে লিখলেন 'নবজাতক'। ১৯৩৮-এর অগস্টে বলছেন "মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী—/নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো বুঝি-বা দিতেছে আনি"—ক্ষোভ প্রায়শ্চিত্ত ও সমকালের অ-মানবিক যুদ্ধোন্মাদনাকে ধিক্‌কার দিয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথ আত্মশুদ্ধি ও বিশ্বাসের আয়োজন করেও ক্ষণে ক্ষণে ক্লান্ত সন্ত্রস্ত এবং নৈরাশ্যে বিষণ্ণ—"জটিল রেখার দলে শুভ অশুভের আলপনা" আবার যুগের আদর্শের আড়ালে অভ্যন্তরে এক বিষণ্ণ-বিবেক ব্যক্তিসত্তা—খণ্ডিত নিরালম্ব শূন্য একটি কবিমন। যে তার বিপুল সৃষ্টিসম্ভারকে বাণী-বিলাস বলতেও কুণ্ঠিত নয়। রোমান্টিসিজমের বর্ণাঢ্য বনবাসর থেকে বেরিয়ে মহাজাগতিক অট্টহাস্যে সেই মহান কবিও কী নিদারুণভাবে বিক্ষত এবং প্রশ্নাধীন—"রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে / চলে যাবে বহুকোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে ?/ উজাড় করিয়া দিবে তার / পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—/ ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের

ভাঙা ভাণ্ড হেন ?/ কিন্তু কেন।" তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্থৈর্য থেকে সহসা উৎকেন্দ্রিক হতে পারেন না। তাঁর জীবন তাঁর পরিবেশ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাঁর আদর্শলিপ্সা তাঁর জীবনের উত্তরকাব্যের বন্ধুরতা ও ক্লান্তিকে দমিত রেখে আমাদের তুঙ্গস্পর্শ করতে চাইছে। অথচ দেখি তিরিশ থেকেই সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা জটিল আত্মবৈপরীত্যের বেগ। ব্যক্তিসত্তার মধ্যে নারকীয় বীভৎসতা নৈতিচারণা ও মৃত্যুর বিষণ্ণ ছায়া—পরাভবের ভেতর থেকে জাগছে অনাশক্তি বা অবিশ্বাস। এই লক্ষণটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের কবিতায় সেদিন ছিল নূতন। ত্রয়ীর নাম একসঙ্গে কালনির্দেশে উচ্চারিত হলেও আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা ঠিক করে কি সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-কে সমবেশায় আনা যাবে ? এর উত্তর আমার প্রবন্ধে থাকবে না। আমি বলতে চাইছি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তখন বিশ শতকের গোড়া থেকেই একটা নতুন বিশ্বাস আসছিল। হার্ডি হিউম-য়েট্‌স্ লরেন্স-পাউণ্ড-জয়েস্-এলিয়ট এঁরা কবিতার ও গদ্যের ভাষায় ও ভাবে যখন জার্মান ফরাসী কাব্য ও শিল্প রচনার আরো সব প্রশাখার ভেতর নতুন নতুন ক্যাক্টাসের দুরূহ জীবনপিপাসার সন্ধান পাচ্ছিলেন। দুই দশকের দুটো আকাশ জল-মাটি-তোলপাড় যুদ্ধ, রুশবিপ্লব-বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ও ধনতান্ত্রিকতার শীর্ষাশ্রয়ী শিল্প-সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ ভাবাক্রান্ত মানুষ তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশক ব্যাপী যে কবিতার মুখোমুখি হল তা রোমান্টিক নয়, দারুণ বাস্তব জিজ্ঞাসায় তার তিনভুবন উত্তাল বিপর্যস্ত ও একটা নবমহাদেশ পৌঁছবার জন্য আর্ত। এ কবিতা আবেগাশ্রিত বুদ্ধির অথবা বুদ্ধি সঙ্গতি সংহত আবেগ ও সংরাগের। এর ভাষা এর ছন্দ এর রূপকল্প (ইমেজ) ও শব্দানুপ্রাণনা স্বতন্ত্র অনন্যপূর্ব বলেই জীবনানন্দ এসেছিলেন, 'সকল লোকের মাঝে বসে / আমার মুদ্রাদোষে / আমি একা হতেছি আলাদা।' অথবা আধুনিক যুগটাই যেন তাঁর সেই অমোঘ উচ্চারণে চিহ্নিত হয়েছিল "মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে।' এই বোধ, আগের থেকে মানুষের এই জটিলতা এবং দুনিয়া-জোড়া বিশাল রূপরাশি অজস্র ঘটনা এবং উন্নয়নমুখী নিদারুণ দ্বন্দ্বের মাঝখানে থেকেও মৃত্যুর নৈঃসঙ্গ কবি বুঝতে পারেন। এই প্রজ্ঞা নচিকেতার এই ধ্যান খ্যাতিবিমুখ ঋষির এই শিল্পচেতনা যথার্থ নিরাসক্তের। কত সহজ স্বপ্নপ্রতিম স্বচ্ছতায় তিনি বলতে পারলেন "মৃত্যু আর জীবনের 'কালো আর

শাদা / হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ / এসেছে এ পৃথিবীর দেশে।" কাব্যগ্রন্থ ধরে কালানুক্রমিকভাবে জীবনানন্দের কবিমনের বিকাশটিকে ধরবার হয়ত কিছু অসুবিধা আছে। কেননা জীবনানন্দের কবিতাগুলি রচনার ক্রম-অনুসারে প্রকাশিত হয় নি, হয়ত রচনাকালের মধ্যে ব্যবধানও কখনও দীর্ঘ। সবচেয়ে বড় কথা জীবনানন্দ অবশ্যই পরিণত উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন এই বাসনায় কবিতা লেখেন নি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে রাত্রিনীরব এক অচেতন স্বপ্ন উচ্চারণ "দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ" আবার রূপসী বাংলাতেও তেমনি একটানা প্রবহমান পয়ারে—"এখানে আকাশ নীল— নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল / ফুটে থাকে হিম শাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন।" আবার 'সাতটি তারার তিমির'এও তাঁর নদী নারী ফুল মাঠ ও ঋতুর চিত্রগুলিই যেন নস্‌টালজিয়ার মত স্মৃতির পাখনায় উড়ে এসে যায় সেই প্রবাহের মধ্যে ভাসতে ভাসতে—'এর নাম ধানসিড়ি বুঝি?' / মাছরাঙাদের বললাম / গভীর মেয়েটি এসে দিয়েছিল নাম / আগে আমি মেয়েটিকে খুঁজি।"

কিন্তু এতটা হঠাৎ-ক'রে জীবনানন্দের মূল্যায়ন সম্ভব বলে আমার মনে হয় নি। ছন্দের দিক থেকে তাঁর কাব্যপর্বের বিকাশ খুব সূক্ষ্ম। সেটি লক্ষণীয় শাব্দিক সংহতি ও ধ্বনির প্রগাঢ়তার মধ্যে। 'ঝরাপালকে'র মত দীর্ঘ দীর্ঘতর কবিতার জের তাঁর শেষপর্বের রচনাতেও নিঃশেষিত নয়। বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুল' বইতে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'তিনজন আধুনিক কবি' নামক ছোট বইখানিতে ও পরে অম্বুজ বসু দীর্ঘ বিস্তৃততর গ্রন্থে জীবনানন্দের কবিমানস ও কাব্য-রূপরীতির বিষয়ে মূল্যবান কথা বলেছেন। অমলেন্দু বসু, অরুণ ভট্টাচার্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দীপ্তি ত্রিপাঠী অশ্রুকুমার সিকদার কবির মূল্যায়ন করেছেন। তবু আমার কাছে আজ ত্রিশ বছরের জীবনানন্দ পাঠ সমান রসপিপাসায় অক্লান্তির। রবীন্দ্রনাথের সৃজন বিস্তার জীবনানন্দর বোধকে ম্লান করে দেয় নি। এর কারণ হল জীবনানন্দের ঐকান্তিক কবিসত্তা। কবিতা ছাড়া আর কোনো মাধ্যম তাঁকে টানল না। যশ অথবা ইনস্টিট্যুশন কিছুই তিনি চাইলেন না। শুধু দেখলেন, "একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে।" কী নিঃশব্দতায় ছুঁয়ে থাকলেন "হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে / শুধু

শিশিরের জল, / অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে / হিম হয়ে আসে / বাঁশপাতা—মরাঘাস—আকাশের তারা।" এইসব জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা একটা স্বপ্ন-অতিশায়ী বিহ্বল মানসিক অবস্থা— ট্রান্স—এর ধ্যান ও দর্শন যে কবির শরীর ও মনের ওপর ভর করেছিল বাস্তবিকতার একমুঠো খতিয়ান বেশ শক্ত। কেন, এই 'bliss of solitude' কি ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ অথবা রবীন্দ্রনাথে ছিল না—এই রূপতন্ময় শৈল্পিক ইন্দ্রিয়সংরাগ কি কীট্‌সেরও কাম্য নয়? অবশ্যই। কিন্তু তথাপি জীবনানন্দ একক। যেমন প্রতীতিতে তেমনই রূপরীতিতে। এটাও অধ্যাপকোচিত গবেষণার কীটবৃত্তিবসে বলে বসলাম। বাস্তবিক কবিতার শরীর ও আত্মা অবিশ্লেষ্য, অন্তত আমি যখন সমালোচক নই, কবিতার রসলিপ্সু পাঠকমাত্র। কিন্তু অভিজ্ঞতার কথা বিজ্ঞাপিত করারও একটা আকর্ষণ আছে। চিনতে চাই চেনাতে চাই জীবনানন্দের জীবনবোধটি কি? তাঁর মৃত্যুচেতনার অতল নীল রেখা থেকে উঠে কণ্ঠের কোথায় স্থিরাশ্রয়ী? তাঁর প্রেম সুরঞ্জনা মদিরাক্ষী বিহগ-নীড় নয়নাদের ভেতর থেকে কোন্ নাটোরে কোন্ বনলতার মুখোমুখি অন্ধকারে একা? তিনি কি শুধু রূপসী বাংলার স্মৃতি-বিস্মৃতির? হিজলের জানলা থেকে চোখ সরে এসে কি শব্দ বিমান নাগরিক আকাশে বিক্ষত নয়? "যেখানে সূর্যের আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই / সেইখানে অন্ধকার।" এই অদ্ভুত আঁধারের আবার শিশুর গালের মত নরম আলোয় আমি জীবনানন্দ দাশকে দেখতে পাচ্ছি। দেখছি স্মরণাতীত কাল থেকে এক সৌরসংক্রান্তির অবিনশ্বর পথিক কাল ও ইতিহাসের ভেতর দিয়ে চিরবর্তমান চিরাতীত ও চিরায়ত ভবিষ্যের মধ্যে থেকে গেলেন। আত্মার এই অবিনশ্বর অভিযানকেই বলব বিকাশ। সকল কবির বেলায় সকল কবিতার বেলায় এই বিকাশ এক অঙ্ক মিলিয়ে হয় না। হলে কবিতা হ'ত ডায়েরী। চিত্র হত মরা খড়ের মত রেখার বিস্তার। গান হত প্রলাপের মত একঘেঁয়ে আর পাঠকের জীবন যেত হারিয়ে ভীড়ের ভেতর জনতার তাণ্ডবে। এই ভীড়টাকেই ছিল জীবনানন্দের সবচেয়ে ভয়। তাই কি তিনি বিশশতকের অভিশাপে আশঙ্কিত হয়ে বললেন শেষ কালে: "কোথাও সার্থককাম কেউ নয়, / আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটো বড় সফলতা সব / মুষ্টিমেয় মানুষের যার-যার নিজের জিনিস, কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা

নয়।" শুনতে পাচ্ছেন যথার্থ আত্মভূমির ডাক "নিজের স্বদেশে এসো।" অথবা এক অমোঘ জিজ্ঞাসা পলে স্বকর্মে কালের প্রত্যাঘাত থেকে—"সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে' 'নদী,/ নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে?"

২

ব্যাপকভাবে হয়ত জীবনানন্দ রোমান্টিক। যদি রোমান্টিসিজ্‌মের সুপ্রচুর বনেদী ব্যাখ্যার মধ্যে 'হেথা নয়, হেথা নয়' এরকম একটা সুদূরপ্রিয়তার ব্যঞ্জনা থাকে। থেকে যায় কোনো একটা ভিন্নতর জীবনাস্বাদনের আর্তি। কিন্তু কন্‌ভেনশনের ভয়ে আমি এই মহামানসের মননশীল কবিকে উন-আশিতে বসে রোমান্টিক বলতে চাই না, ভালবাসি না। আর তিনি য়েট্‌সের সহচর না এলিয়টের, এসব অস্থিসন্ধি প্রভাব-অনুভবের এইসব গোত্রলিখন ঠিক সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে না, যদি সেটা আত্যন্তিক হয়ে যায়। কবির অনন্যতা তাতে ঘা খায় যদিও কৌতূহল বেচা যায় প্রচুর। আর সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে তিনজনেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিদগ্ধ। তাদের প্রবণতা ও আনুকূল্য কোন বিদেশী কবির মমতাময়ী রূপরীতির দিকে এটা খুঁজব প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ লিখে, না তুলে আনব তাঁর সাধনার ফসল? বিংশশতকের মধ্যলগ্ন পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছরের একটা ঘটনাবহুল সময় বাংলার ইতিহাসে নিদারুণভাবে চিহ্নিত। এই কালের গল্প কবিতা নাটক ছবি এমন জটিল ঘূর্ণাবর্তে আমাদের সামনে উদ্‌ভাসিত যে একটা সঞ্চয়ী আবার অবক্ষয়ী যুগমানসই যেন মহাকবি মহাস্থবিরের রূপ ধরে গঙ্গা-পদ্মার জলাধারকে উত্তাল করে তুলেছে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে মহাকাব্যোচিত ধ্যাননিমীল যুগমানস প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতার প্রত্যয় রূপরীতি ভাষা ও আত্মার উন্মোচনের মধ্যেই। এছাড়া গত দশবছর ধরে তাঁর জীবনালেখ্য চিঠি স্মৃতিচারণ প্রকাশ পেয়েছে 'কবিতা', 'উত্তরসূরি' এবং 'ময়ূখ' পত্রিকা তিনটির জীবনানন্দ সংখ্যায়, 'অমৃত'তে শেষ ক'বছরের জীবনস্মৃতিও উপাদানবহুল।

৩

জীবনানন্দ কাব্য-সমালোচনায় উপাদান ঔচিত্যবোধ এসব প্রসঙ্গ এখন থাক। প্রসঙ্গে আসি, 'রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প' বইতে আমি অনেকদিন আগেই

আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে কবিকল্পনার উৎস বিস্তার ও পরিণতি শব্দ ও কবি ভাষাসৃষ্ট রূপকল্প বা ইমেজের বৈচিত্র্যে। রূপকল্প কবিতার কোরকের জিনিস, বহিরাবরণ নয়। অলঙ্কার ব্যাখ্যাতেই এর সৌরভটুকু ফুরোয় না। একালে অমলেন্দু বসু অশোকবিজয় রাহা সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণে সেটা আমাদের বোঝবার পথ খুলে দিয়েছিলেন। এই কবি-ভাষা-সৃষ্ট রূপকল্প গীতিকবিতার বেলাতেও স্বতন্ত্র আবার অখণ্ড। অর্থাৎ একজন কবি বিচিত্র সাদৃশ্য কল্পনায় যেমন তাঁর ভাবনার চিত্র টানেন তেমনি আবার তাঁর অখণ্ড কবিসত্তাটি ব্যাপকভাবে রূপকল্পের অক্ষমালা তৈরি করে একটি সামগ্রিক পৃথিবীর ভেতর আমাদের নিয়ে যেতে পারে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও ছিন্ন আবার অবিচ্ছিন্ন রূপকল্প বিচারের সুযোগ আছে। এমন কি 'ঝরাপালক'-এর যুগেও জীবনানন্দ কোথাও সত্যেন্দ্রনাথ থেকে স্ব-ভুবনচারী। "দেউটি নিভায়ে গেছে—চলে গেছে দেউল ত্যজিয়া, / চ'লে গেছে প্রিয়তম—চলে গেছে প্রিয়া"—সমালোচক বলতে পারেন 'পিরামিডের' এই ছবিগুলো ভাষা ক্রিয়াপদ একটু আনুষ্ঠানিক বা রবীন্দ্রানুসারী। 'দেউটি' শব্দটিতে রবীন্দ্রনাথের খেয়া'র 'অনাবশ্যক' কবিতার অনুষঙ্গ জড়ানো না কি? 'ত্যজিয়া যুগলস্বর্গ' ইত্যাদি রবীন্দ্রানুসৃত বা মাইকেলীয় পুরানো ক্রিয়াপদের প্রয়োগে অনুজ্জ্বল হয়ত বা। কিন্তু নিরাশ হই না, ঐ কবিতাতেই দেখি যখন—"জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি—প্রেমের প্রহরা / মোদের জীবনে কবে জাগে পাতাঝরা / হেমন্তের বিদায় কুহেলি—/ অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি / গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান / দু'দিনের তরে শুধু।" এখানে প্রচলিত শব্দের ভেতর থেকে একটা ছবি তৈরি হয়ে গেছে যেটা, সত্যেন্দ্রীয় বা মোহিতলালীয় নয়, জীবনানন্দীয়। এই শব্দ রূপকল্প একটা শুকনো মাঠের দীর্ঘশ্বাস ও আবহাওয়ায় আমাদের নিয়ে যায় ঐ কবির একান্ত আপনার। আর পিরামিডকে তিনি চেয়েছিলেন রূপকল্পনার চিত্র হিসাবে, সেখানে পাই তাঁর কালাতিক্রান্তির বা ইতিহাসচেতনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। "হেমন্তের বিদায় কুহেলি" তাঁর প্রিয় ঋতুপরিবেশ পরিচয়ে অনন্য। ঐ কাব্যগ্রন্থের আর একটি কবিতা "সেদিন এ ধরণীর'—এখানেও "উতরোল তরঙ্গের ভিড়" "ঢেকেছিলো ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিমমাস—জোনাকির ঝাড়" "মাটির বাঁটের চুমো শিহরি উঠিল মোর ঠোঁটে, রোমপুটে"—এসব চিত্র বা

রূপকল্প আস্বাদনের অভিজ্ঞতা আমাদের আগে ছিল না। দেশজ শব্দচিত্রের জীবনানন্দীয় প্রয়োগ অভূতপূর্ব।

ধূসর পাণ্ডুলিপিতে কবি শব্দানুভববেদ্যতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ। রূপকল্পের হাত আরো খুলে গেছে। প্রেম-মৃত্যু-প্রকৃতি এই ত্রিবৃত্তের সমাবর্তনে কবি একটা সত্তায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় সুরের আলাপটা আরম্ভ হয়েছে প্রকৃতিকে ভালবেসে আসবার একটা গ্রামীণ অনুভব দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, চিত্রা, ছিন্নপত্র ও ছোটগল্প রচনার যুগে এরকম একটা প্রকৃতি প্রেম আঁকলেও এই পার্থিব প্রীতি স্মৃতি ও বিযোগের স্বরূপটা অন্যধাতের। এখানে মৃত্যুর কথা মনে রেখে বলা হচ্ছে "আমরা বেসেছি সারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো" এই শীতের রাতে কবির জবানিতে আমরা পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ পেয়েছি "বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ" "আমরা বুঝেছি সারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক"—এমনি করে এক ভীড় চিত্ররূপের ঘ্রাণে দৃশ্যে আস্বাদের উপাদান নিয়ে গড়ে-ওঠা গোটা একটা মানবজীবনী। এই জীবনের শেষ পাতাটা খুলে গেছে কবির চোখে "আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর?" না আর কিছু বোঝবার নেই। বসুন্ধরার দিকে চেয়ে চেয়ে ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল তার মুখে চিরকালের 'কোন এক সুদূরব্যাপী বিষাদ' লেগে আছে। সুধীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দের মৃত্যু-প্রেম-প্রকৃতি-বোধের স্বরূপ কমমাত্রায় তত্ত্বান্বেষী বা যুক্তিতে প্রখর। রূপকল্পের ভাষা, রূপ-কল্পের ছন্দ, রূপকল্পের শব্দ, স্বপ্নের কবি কি তিনি? তবে কেন বললেন "স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে।" তা সে বোধ হোক বুদ্ধি হোক আর স্বপ্ন হ'ক—এমন অচেষ্ট প্রয়াসে জীবনানন্দের কবিতার ফিল্টারে রূপকল্পগুলি স্বতঃ প্রবাহে ছেঁকে উঠে আসে যে তার আঁশ ছাড়াতে ভয় হয়, নষ্ট হবে। তাঁর দীর্ঘান্বয়ী বাক্যগুলি গদ্য পদ্য সংলাপ ও সুরের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রকে একাকারে বুনে চলে। "হাতে তুলে দেখিনি কি চাষীর লাঙল? / বালতিতে টানিনি কি জল? / কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে?" / "ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে / অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে / ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে।" ভালবাসা অবহেলা ঘৃণা মনের অবস্থাই দৃশ্যমাত্রে একাত্ম গ্রথিত। জীবনানন্দ কি সমদর্শী? তাঁর রূপকল্পগুলি ভেদ

ছন্দ বৈষম্য এদের সংগঠনী উপাদান থেকে সৃষ্ট নয়? বোধহয় না, কেন না তিনি স্থিতপ্রজ্ঞাব কবি তিনি সমদর্শী বেদোক্ত ঋষি। এক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে সন্নিহিত সমকালিন বিভূতিভূষণ, তাঁরও পদচারণা আলোর প্রান্তরে মমতার কুটীরে আর মৃত্যু অজ্ঞাতির আরণ্য অন্ধকারে। রহস্য না থাকলে কবিতা হয় না, শিল্প বিবস সংবাদে বিনষ্ট হয়। প্রেম হয় নিছক মেদচর্চার স্থূল মৃত্যু। রেখে যায় না অবিনষ্টির দাগ। 'সাতটি তারার তিমিরের' আগে পর্যন্ত কবি জীবনানন্দের মৌল রূপকল্প মাঠ ঘাস পাখি ছায়া কেবলই রূপান্তরিত দৃশ্যান্তরিত হয়ে চলেছে মাঠের যৌবন চোঁয়ানো ভাঁড়ের গল্প কথাকলিতে—"অলস গেঁয়োর মত এইখানে কার্তিকের খেতে" কবি সমাসীন শান্ত। 'অবসরের গান' একটি দীর্ঘায়ত কবিতা। দীর্ঘ কবিতা লিখব বলে ভেবে ঠিক করে কবি বলেন নি। সুপ্রচুর-ভাবে আসতে দিয়েছেন রূপকল্পগুলিকে। রসের ভিয়েন যখন চাপিয়েছেন— "মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ" "রোদের নরম রং শিশুর গালের মত লাল" "আজো তবু ফুরায় নি বৎসরের নতুন বয়স" "মাটির ভিতর থেকে চলে গেছে চাষা" "প্রেম আর পিপাসার গান আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন" "শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধরে" "অবসর আছে তার—অবোধের মতন আহ্লাদ" তিনটি অধ্যায়ের এইসব অভিজ্ঞতার বিস্তার ক্ষণে ক্ষণে নূতনত্বের মাইলস্টোন ছুঁয়ে যাচ্ছে। শহরবাসী প্রবাসী এই কবিচোখে তাঁর জন্মভূমি গ্রামবাংলা কী নিদারুণ স্মৃতিতেই না আলোড়িত হত। ল্যান্সডাউন রোডের সেই মর্মান্তিক ঘটনার আগের দিনই আমি তাঁকে দেশপ্রিয় পার্কের ধার ঘেঁষে অন্যমনস্কের মত যেতে দেখেছিলাম। সঞ্জয়বাবুর ভাইপো আমার বন্ধু বিনয় ভট্টাচার্য চিনিয়েছিল, ঐ ত জীবনানন্দ যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে একটি বিপরীতচারী অবসরকে দেখেছিলেন বুঝি বা ভীড়ের ভেতর একা। এই একাকীত্ব তাঁর মৃত্যু মুহূর্তে ছলছলিয়ে ওঠা শব পার্থিব ছবি—চোখের ওপর এ রূপকল্প অলিখিত। তাই সবচেয়ে স্পষ্ট। "বিয়োগের – বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব / ঐ মৃত মৃগদের মতো। প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই , / পাই না কি?" প্রলম্বিত বাক্যবন্ধ। প্রসারিত ছন্দ। শব্দগুলি ক্লান্তির পায়ে মূর্ছা যায়। শব্দান্ত 'এ' স্বরধ্বনি কবির অনেক কবিতায় ক্লান্তিতে শয়ান। স্মৃতি

স্বপ্ন অনুষঙ্গ মগ্ন অবচেতন থেকে তুলে আনে রূপকল্পগুলিকে। "কোথাও ফড়িঙে-কীটে—মানুষের বুকের ভিতরে / আমাদের সবের জীবনে।" অধিকরণ কারকে থাকে ব্যাপ্তি কাল ও আধারের বিস্তৃতি, কখনও দ্বিত্ব প্রয়োগে পৌনঃ-পুনিক জীবনাচরণের আবেগ—"খেতে খেতে লাঙলের ধার/মুছে গেছে কতোবার —কতবার ফসল কাটার সময় আসিয়া গিযাছে, চলে গেছে কবে।" 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত সাধুক্রিয়া শব্দ প্রয়োগে আধুনিক জীবনানন্দ নির্দ্বিধ। নিঃশব্দ ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে জীবনানন্দ শব্দকে টান দেন কবিতার আত্মা ধ্বনির চিরাযত চেতনার লোকে "ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে দেখে / মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে / জাগে একা অঘ্রানের রাতে / সেই পাখি।" অথবা "মাঠে মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর / কার্তিক কি অঘ্রানের রাত্রির দুপুর।" কোন বোধিক্রম থেকে তাঁর কবিতার শব্দ চিত্রগুলি সমাহৃত? অবশ্যই সেগুলি এমন সব অভিজ্ঞতা ঘটনা বা অন্তর্দৃষ্টির ফুল ফল যার জন্য একটা 'ইমোশনল লজিক' বা আবেগানুভূতিজাত ন্যায়-ক্রম ছাড়া অন্য রাস্তায় পাঠক যেতে পারেন না। কে বলবে কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতার প্রতীক হিসাবে কেমন করে জীবনানন্দ শকুন চিল ধানসিড়ি নদী এই সব রূপকল্পের প্রেরণা পেয়েছেন? তাঁর দেখা মাঠ পৃথিবী বাংলার পরিকীর্ণ পরিপার্শ্ব নিমেষে অক্লেশে আদিঅন্তহীন একটা কাল ও ইতিহাসের চেতনায় রূপান্তরিত হয়। "কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন"—যারা "এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন" ঘিরে কেঁদে ওঠে—আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সড়ক দিগ্‌বিজয়ী রিরংসার একটি চিত্র তিনি একটানে সমাধা করে দেন—"কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেইসব হূন।" কবির চোখের সামনে সমস্ত দুপুর ধরে এশিয়ার আকাশে আকাশে যেসব শকুন চরছিল তারা অবশ্যই কবির একটা ভাব অভিজ্ঞতা বা ঘটনার প্রতীক। আর সেইখানেই জীবনানন্দ যুগ সচেতন সমাজ-সচেতন জন-সচেতন। কিন্তু এই বাস্তবতার সাধনায় তিনি নজরুল কি সমর সেন অথবা সুকান্তর অনুপন্থী নন। তিনি তাঁরই মতন। রূপসী বাংলার রূপকল্পগুলি নিটোল রসফলভারনত আবার উদাস, বাৎসল্যে নম্রসাতুর আবার মিলনোৎকণ্ঠায় ও আরতির প্রতীক্ষায় লজ্জারুণ।

জীবনানন্দ সমতার কবি নন। হয়ত কোনো বড় কবিই তা নন। বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সত্যের আসল রূপ। কালো কদর্য কুৎসিৎ আর

শান্ত সুষম সুন্দর এই দুই কোটিতে চলে তাঁর পদচারণা। কবি জ্ঞানী অথবা তাত্ত্বিক হতেও পারেন কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও তত্ত্বের অভিপ্রায় ঠিক সমাজকর্মী রাষ্ট্রবিদ্ কি দার্শনিকের মত নয়। তাঁর সমকালিক সমস্যার মর্মস্পর্শী অভিঘাত কোনো একটা নিটোল সত্যে সারাক্ষণ ধ্রুবাচল না থাকতেও পারে। জীবনানন্দ আত্মসংলাপী, পরীক্ষা-সমীক্ষা স্বীয় রচনার সমালোচনা ব্যাখ্যায় তৎপর হতে তাঁকে দেখি না। অথচ সম-বিষয়ে আশা নিরাশা জীবনে-মরণে তিনি ক্রম-বর্দ্ধমান। তাঁর কবিতার শব্দগুলি এমন একটা ওতপ্রোত বেগে আন্দোলিত— inertia র গতিতে সঞ্চালিত যে তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান কবিসত্তা শেষ পর্যন্ত 'বিপ্লবিনী নদীর বাঁধার মতো" আত্মসম্বরণের সমাকর্ষে তার মস্তক পর্যন্ত সুর চড়াতেও সক্ষম ও সবল। তাঁর কালেই তিনি দেখছেন নাৎসী বাহিনীর শিরোভূষণ হিটলারীয় যুদ্ধ। পারমানবিক বিধ্বংসের মর্মন্তুদ নাগাশাকি আবার মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী জ. যুদ্ধের সাম্যবাদী বিপ্লব, তাঁর অবস্থান কেমন বেত ফলের নির্বেদে সমাধিস্থ তেমনি আবার নাবিকী তরঙ্গে কি ভূমিকম্পে দোলায়মান। যুদ্ধ দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ-ক্ষুব্ধ াঁর ভারতবর্ষে আর থুৎথুরে এক মহাজ্ঞানী প্রাচীন পেঁচকের ললাট-লিখন সমীক্ষার স্তব্ধ প্রহর ঘোষণায় তিনি উপলব্ধি করেন মায়াবী জীবন বেশী মৃত্যুর পদসঞ্চার আবার পাড়াগাঁর ভাঁড়দের সরল মেঠো গল্প অথবা গন্ধ পান বাদ্য স্তন্যে সঞ্চারিত এক অসম্ভব জীবনসুধার। এইজন্য মনে হয় জীবনানন্দ রূপরীতির কবি। রূপকল্পের উভয় মেরুতে তাঁর অধিবাস।

তাই তিনি আত্মহনন ও আত্ম-উজ্জীবন এই দুই ধারাশ্রয়ী বাস্তবতার জন্য অনুজের চোখে যুগাচার্যের যথার্থ প্রভায় সুদস্তরী। রবীন্দ্রনাথের নিঃশেষ সৃষ্টির অস্পর্শী জগতে জীবনানন্দের বিস্তার। আবার রবীন্দ্রনাথের মত উত্তরসাধকের কাছে তিনি কাব্যকলার মায়ামারিচি। তাই তাঁকে দৃষ্টান্ত শিরোধার্য করা বিপজ্জনক। যদি না অনুশীলনে এই মহাকবি সম্যক আত্মীকৃত হন কোনো নতুন লেখকের শ্রমে ও নিষ্ঠায়। জীবনানন্দের রূপকল্প নির্মাণের জন্য কবি ভাষা ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তরণের শীর্ষ বস-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কানের সঙ্গে চোখের, চৈতন্যের সঙ্গে স্বপ্নের, ঘ্রাণের সঙ্গে স্বাদের বা স্পর্শের মিশ্রণে (যাকে ইংরেজিতে সিনেস্থেসিয়া বলা হয়) তাঁর কারিগরির জোড়া নেই। একটির বেশি উদাহরণ দেবার যায়গা নেই—'হৃদয়

ভবে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে/দিগন্ত প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে / মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট/ সজীব রোমশ উল্লাসে। জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায় " "১৯৪৬-৪৭" কবিতায় জীবনানন্দর লক্ষ কলকাতা-বিমুখ হওয়া স্বাভাবিক "বাংলার লক্ষ গ্রাস নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।" অবক্ষয়ের সামনে বসে আশাবাদের বাতিক তাঁর চাপে নি। তত্ত্বের বাহাদুরি নেবার মোহ ছিল না, বললেন—"মৃত্যু আর জীবনের কালো আর সাদা হৃদয়ে বাড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ এসেছে এ পৃথিবীর দেশে।"

এইটি ভারতীয় জীবনবোধ ও দর্শনলব্ধ প্রজ্ঞার কথা। যুগের দর্শন কবির প্রভায় যখন শব্দচিত্রাশ্রয়ী একটা মূর্তিতে শরীর হয়ে ওঠে তখন কবির রূপ-কল্পের মধ্যেই তাঁর ব্যবহৃত শিল্পের ঐতিহ্যকে পাই। তিনি মতবাদের দ্বারা চালিত হবেন না, হন না—যুগচেতনা মানবিক বোধ ঘটনাহত দ্বান্দ্বিকতা তাঁর মধ্যে কবিতা হয়ে জন্মলাভ করে। মহাদেশ কি এক বিপুল ভূ-খণ্ড রচনা করে। কেউ কেউ এই শিল্প সার সৃজনের সঙ্গে সমকালিক পরিপার্শ্বের সহযোগিকে social context বা সমাজচেতনা বলতে চেয়েছেন। তিরিশ চল্লিশের ইতিহাস ও যুগসন্ধি জীবনানন্দের "মহাপৃথিবী"র কবিতাগুলির মধ্যে ক্রমশ প্রখর উজ্জ্বল হয়ে উঠতে উঠতে একটা মহাকবিত্বের প্রভায় সুদৃঢ় হতে পেরেছে। একটি মাত্র দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আধুনিক বাংলা কবিতায় কবিপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাস্মৃতি নিবেদন ক'রে

"এই নগরী যে কোনো দেশ, যে কোনো পরিচয়ে
আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের বলয়ে
অন্তবিহীন ফ্যাক্টরি ক্রেন ট্রাকের শব্দে ট্রাফিক কোলাহলে
হৃদয়ে যা হারিয়ে গেছে মেশিনকণ্ঠে তাকে
শূন্য অবলেহন থেকে ডাকে।
তুমি কি গ্রীস পোল্যাণ্ড চেক প্যারিস মিউনিক
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলাণ্টিক
লণ্ডন চীন দিল্লী মিশর করাচী প্যালেস্টাইন?
একটি মৃত্যু এক ভূমিকা, একটি শুধু আইন।'

বলছে মেশিন। মেশিনপ্রতিম অধিনায়ক বলে :
'সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন করে গড়ে
আমার হাতে গড়া ইতিহাসের ভেতরে,
নতুন সময় সীমাবলয় সবই তো আজ আমি
ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আমার সত্ত্বাধিকারকামী,
আমি সংঘ জাতি রীতি রক্ত হলুদ নীল,
সবুজ সাদা মেরুন অশ্লীল
নিয়মগুলো বাতিল করি কালো কোর্তা দিয়ে
ওদের ধূসর পাটকিলে বফ্ কোর্তা তাড়িয়ে
আমার অনুচরবৃন্দ অন্ধকারের পার
আলোক করে কী অবিনাশ দ্বৈপ-পরিবার।
এই দ্বীপই দেশ : এ দ্বীপ নিখিল ভরে।
অন্য সকল দ্বীপের হতে হবে
আমার মতো—আমার অনুচরের মতো ধ্রুব।
হে রক্তবীজ, তুমি হবে আমার আঘাত পেয়ে
অনবুতল আমির মত শুভ।' ('সাতটি তারার তিমির।')

—প্রতিটি বড় কবির শ্রেষ্ঠ প্রোজ্জ্বল রূপকল্প কবির নিজের সত্তা নিজের আত্মা।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

৩. মনীশ ঘটক

১.

নির্বাচনের কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। সপ্তম লোকসভা নির্বাচন। ধূলোয় তাকানো যায় না। শব্দে কান পাতা যায় না। এর মধ্যে মনীশ ঘটক আমাদের ছেড়ে গেলেন। খবরটা কোথাও পৌঁছুলো, কোথাও পৌঁছুলো না। মনীশ ঘটক একটি ছ'অক্ষরের বানান নয়, মনীশ ঘটক জীবনের পুরুষ-অভিজ্ঞান। মনীশ ঘটক 'একটি বিশাল গাছ, মাথা যার আকাশে ঠেকেছে'।

২

ক্যালেণ্ডারের লেখতথ্যে মনীশ ঘটক

জন্ম—১৯০২, ৯ই ফেব্রুয়ারী, রাজসাহী

মৃত্যু—১৯৭৯, ২৭শে ডিসেম্বর, বহরমপুর

পড়াশুনা—১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রবেশিকা পাশ

১৯২৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক হন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়েছিলেন।

জীবিকা—আয়কর বিভাগের ব্যবহারজীবী (১৯২৭ থেকে)

আয়কর বিভাগে চাকরী ১৯২৭ থেকে ১৯৫৯

তারপর স্বাধীনভাবে ঐ বিভাগে ব্যবহারজীবীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্র—বহরমপুর ও কৃষ্ণনগর।

সাহিত্যসাধনা শুরু—১৯২৩-২৪এ কল্লোল পত্রিকায় 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে গল্প লেখা দিয়ে। পরে স্বনামে কবিতা লিখতে থাকেন।

প্রকাশিত কাব্য—শিলালিপি — ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

যদিও সন্ধ্যা — ১৩৭৫ ”

বিদুষী বাক্ — ১৩৭৮ ”

এক চক্রা — ১৩৮২ ”

গদ্য—পটলডাঙ্গার পাঁচালী (যুবনাশ্ব ছদ্মনামে) ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

কনখল (উপন্যাস) ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

মান্ধাতার বাবার আমল (আত্মজীবনীমূলক) ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

অনুবাদ—যুবনাশ্বের নেরুদা ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

সম্পাদনা—অতিথি (১৯২৪, ঢাকা থেকে ত্রৈমাসিক)

বর্তিকা (১৯৫৫ থেকে আমৃত্যু। বহরমপুর। ত্রৈমাসিক।)

৩

নানা সাক্ষ্যচিত্রে শ্রীমনীশ ঘটক

ঢাকায়—যখন আমি তরুণ ছাত্র তিনি কালো চশমা আর ডোরা কাটা সিল্কের শার্ট পরে মোটরবাইকে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছেন : বুদ্ধদেব বসু।

কলকাতায় কল্লোলে

মনীশ দুর্ধর্ষ উদ্দাম। মনীশ নির্বারিত। ছ' ফুটের বেশি লম্বা। প্রস্থে কিছুটা দুঃস্থ হলেও বলশালিতার দীপ্তি আছে তাঁর চেহারায়। অতখানি দৈর্ঘ্যই তো একটা শক্তি . অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

ছাত্র জীবনে থেমে থাকলে দাঁড়ি—হাঁটলে চিমটে—এ কৌতুকুক্তি স্বয়ং মনীশ ঘটকের।

বহরমপুরে ওই কে যায়। অমন প্রসারিত বাদশা বাদশা উজ্জ্বলতা নিয়ে - মনীশ ঘটক না? মনীষীমোহন রায়।

বহরমপুরে এখন তাঁর বয়স আশী ছুঁই ছুঁই। একটি (৫-৪-৭৯) বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে। পিতামহ ভীষ্মের মতো অসুস্থতার ভাবে শয্যাশায়ী। টানটান শুয়ে আছেন বহরমপুর লালদিঘির পূর্বপাড়ে নিজের বাড়ীতে। মেরুদণ্ডসার দীর্ঘ চেহারা। লম্বা দু'খানি হাত দু'পাশে শুয়ে আছে। শোক, নির্জনতা, শয্যাশায়িত্ব, লোডশেডিং বিকেলের শেষ পড়তি আবছাকে হারিয়ে দিয়ে এখনও সেই ঘরটিতে একটি চরিত্রবান আগ্রহ, সমস্ত মানুষের জন্য একটি বলবান শুভেচ্ছা বিরাজিত।

—জঙ্গীপুর বইমেলা ১৯৭৯, স্মারক গ্রন্থ।

বহরমপুর—আরো অবাস্তব রাত দুটোর বাইরের ঘর, পথজুড়ে স্তব্ধ মানুষের ভিড়, চেয়ারে বসে মা, পাশে শায়িতা বাবা। : মহাশ্বেতা দেবী জনমত

॥ ২১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা ॥

বহরমপুরে মনীশদা তখনো হেমকান্তি, দীর্ঘদেহী, (১৯৬৮/৬৯ আনুমানিক) দুরন্তপনা ভরা উজ্জ্বল দু'চোখে কী আনন্দের প্রকাশ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

৪

মনীশ ঘটক ॥ স্বজন পরিচয়

A man is known by the company he keeps, ইংরেজী প্রবাদটা যদি একটু বদলে relatives he keeps করা হয় তবে কখনো কখনো মন্দ হয় না। কোনো কোনো প্রতিভার স্বজন পরিচয় নিতে গেলে মনে হয় প্রতিভার উদ্যানে প্রবেশ করলুম। যেমন—রবীন্দ্রনাথ,—যেমন সুকুমার রায়, যেমন—মনীশ ঘটক। বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক (ডি. এম.) ছিলেন। মা

ইন্দুমতী দেবী। মনীশরা পাঁচ ভাই। মনীশ জ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠ ৺ঋত্বিক। ঋত্বিক মানে ঋত্বিক ঘটক। মেঘে ঢাকা তারা—সুবর্ণরেখা—অযান্ত্রিক—তিতাস একটি নদীর নাম। ছেলেরা ৺অবু ঘটক, ৺অনীশ ঘটক, শমীশ ঘটক, মৈত্রেয় ঘটক। মেয়েরা মহাশ্বেতা, শাশ্বতী, অপালা, সোমা, শারী। মহাশ্বেতা মানে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। বিবেকের গণগণে আগুনে বাংলা গল্প আর উপন্যাসকে যিনি রক্ষা করছেন আজও। মহাশ্বেতা মানে অরণ্যের অধিকার, গুরু, হাজার চুরাশীর মা। মহাশ্বেতার স্বামী ৺বিজন ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য অর্থাৎ নবান্ন, নবনাট্য আন্দোলন। শিশির ভাদুড়ী যাঁর নাটক শ্রীরঙ্গমে সাত রাত দেখে প্রশ্ন করেছিলেন 'কোথায় শিখেছিলেন?' বলতে গেলে বাংলায় সমাজসচেতন সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাটিকে নানা দিক দিয়ে মনীশ ঘটকের পরিবার বহন করে চলেছেন যেন। মহাশ্বেতা লিখেছেন "বাবার ঋণ শোধ হয় না।"

৫

মনীশ ঘটক ॥ পত্র পত্রিকা

ব্যাসদেব যদি মহাভারত লিখবেন তবে তার যোগ্য লিখিয়ে চাই। গঙ্গা স্বর্গ থেকে নামবেন যদি মহাদেব তার প্রথম ধাক্কা সামলাতে রাজী থাকেন। "মনীশ দুর্ধর্ষ, উদ্দাম মনীশ নির্বাচিত"—এই প্রতিভার প্রথম বেগ ধারণ করার জন্য যোগ্য পত্রিকাও একটা বিবেচ্য প্রশ্ন। প্রস্তুত ছিল অথবা প্রচণ্ড ছিল 'কল্লোল'। কল্লোল শুধু একটা পত্রিকা নয় 'কল্লোল' একটা আন্দোলনের নাম। রবীন্দ্রনাথের বৃত্ত-ভাঙ্গা আন্দোলন। ১৯২৩-২৪-এ কল্লোলে এলেন যুবনাশ্ব নামে। 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' নামে বহু পরে গ্রন্থিত দুর্ধর্ষ গল্পগুলো কল্লোলে বেরিয়েছিল। ১৯৩০-৩১-এ কবিতায় স্বনামে আত্মপ্রকাশ। অজিত দত্তের প্রগতি, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় ছাড়া প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী, উত্তরসূরি, নাচঘর, বিষাণ, বসুমতীতে লিখেছেন কবিতা ও গল্প। বিষাণ পত্রিকায় বৈঠকী শিরোনামে গদ্য লিখতেন। ১৯৩৮-এ ১২ই সেপ্টেম্বর মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত দোস্ত তাদের জাগাও, এদিকে আন্দামান কবিতা দুটির জন্য কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের নজরে পড়েছিলেন।

গল্পে ভাঁটা পড়লেও কবিতা থামে নি। অনুজ কবি সাহিত্যিকদের সম্পাদিত

পত্রিকার আমন্ত্রণ বারবার রক্ষা করেছেন। না লিখতে পারার যন্ত্রণাও জানাতেন, কৃত্তিবাসে তা প্রকাশিত হয়েছে। শারদীয়া ১৩৮৫ র এখানে প্রকাশিত 'সে এক বুড়ো' সম্ভবতঃ তাঁর শেষ সিরিয়াস কবিতা।

পঁচিশ বছর ধরে প্রকাশিত স্ব সম্পাদিত বর্ত্তিকা ত্রৈমাসিকের দাবীতে প্রায় প্রতি সংখ্যায় একটি করে কবিতা বেরিয়েছে। জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ কবিতার গৌরব সম্ভবতঃ বর্ত্তিকারই।

৬ মনীশ ঘটক ॥ সম্পাদক

পত্রিকা একালের সাহিত্যিকদের রাজসভা। জহুরী সম্পাদক কি না করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো মনীশ ঘটক সে মানুষ নন। জহুরী বা গুণগ্রাহী নন তা নয়। যে পরিকল্পিত একাগ্রতা ও সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণেচ্ছা থাকলে বুদ্ধদেব বসু হওয়া যায় তা তাঁর ছিল না, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়াটিই তা আমাদের বলে দেয়—

এমন মানুষ পাওয়া শক্ত লেখার রাজ্য ঢুঁড়ে
এই নিচ্ছেন কলম আর এই ফেলছেন ছুঁড়ে।

তবে কি পাবো এই সম্পাদকের কাছ থেকে? গদ্যের বা গল্পের যে অপেক্ষিত বিবর্ত্তন তাঁর কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য ছিল তা তিনি মেটান নি। সময়ের বেহিসেবী পটে কিছু নিশ্চিত আঁচড় তাকে দিতে হয়েছে এই সম্পাদকীয় কলমেই। আরোপিত দায়িত্বে বাধ্য হয়ে ইতস্ততঃ সম্পাদকীয়তে মণি-মাণিক্যের মতো ছড়িয়ে গিয়েছেন শোকের প্রস্তাব—উৎকীর্ণ সমস্যা-দুঃসময়ের চাপ—আনন্দ-গ্লানি—প্রত্যাশা আর ক্রমশঃ অক্ষম শরীরের ক্লান্তি।—সেই আমাদের লাভ।

(১) 'অতিথি'র তথ্য আমাদের আয়ত্তে নেই। কেউ স্মৃতিচারণা করলে জানা যেতো বাইশ বছরের সম্পাদক কেমন ছিলেন।

(২) 'বর্ত্তিকা' সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষে জবানি পাচ্ছি ১৩৮৬র শারদ সংখ্যায়। বহরমপুর ভ্রাতৃসঙ্ঘে কৃষ্টি শাখার হাতে লেখা বর্ত্তিকা প্রথম বের হয় ১৯৫৪। ১৯৫৫ সালে ছাপা বর্ত্তিকার শুরু। বন্ধু জরাসন্ধর পুত্র তরুণ ও প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ঠেলতে না পেরে তিনি শেষ পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

"তিন মাস অন্তর একটা কবিতা এবং দু' তিনপাতা সম্পাদকীয় মতামত লেখা শুরু হল। সেই পদ্ধতি আজও অব্যাহত যদিও গত সংখ্যায় আমি বিদায় চেয়েছিলাম। বিজনের অনুরোধে অসুস্থ অবস্থায় রোগশয্যায় শুয়ে এই কথাগুলি লিখছি।"

সম্পাদকীয়ব উপবে লেখা অন্তিম॥ মনীশ ঘটক। কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যাক ইতস্তত ‧

১ সুবোধ ঘোষেব আবির্ভাব বিস্ময়কর, পরিণতি গতানুগতিক।

২. বড দুঃখেব মৃত্যু আমার অনুজ ঋত্বিকের। সে আমাদের পাঁচ ভাযের মধ্যে কনিষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ, আমাব থেকে ২৩ বছরের ছোট ছিল সে, মোমবাতিব দুধারেব পলতেয় আগুন দিয়ে দিক উজ্জ্বল করে নি ‧ শেষ হয়ে গেল সে। ভালোবাসার কাঙাল ছিল সে জীবনভোব, ভালোবাসার সন্ধানে ফিরেছে বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথে। —১৩৮৩ (নববর্ষ-বর্ত্তিকা)

৩ আমি আশাবাদী। আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। মনন ভাবাক্রান্ত, কর্মক্ষমতালুপ্ত, তবু আজও আমি অনাগত ভবিষ্যৎকে অপদেবতা বলে স্বীকার করতে বাজী নই। —১৪ ৩ ৭৮ (বর্ত্তিকা)

৪ আনন্দবাজাব গ্রুপ বাংলা সাহিত্যের তথা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে 'বই মেলা ও দু'শো বছরের মুদ্রণযন্ত্রেব ইতিহাস' উপলক্ষ করে যে দৃষ্টান্তস্থাপন করলেন তা সমযের পটে জ্বাজল্যমান আক্ষবে লেখা থাকবে।

—৬.৩.৭৯ (বর্ত্তিকা)

৫ আমার শেষ প্রার্থনা এই যে যাঁব লিখবার কিছু ক্ষমতা আছে তিনি অন্ততঃ দিনে তিনঘণ্টা আপনমনে লিখে যাবেন, রাতারাতি বডলোক হবাব আশা ত্যাগ করে। —১৩৮৫ (শারদীয়া বর্ত্তিকা)

৬ অথচ স্বাধীনতা লাভের আগে যা স্বপ্ন ছিল সে স্বপ্ন যে এমনভাবে ভণ্ডুল হয়ে যাবে ভাবি নি। শিক্ষায়, চিকিৎসায়, সামাজিকতার নৈতিক চরিত্র-গঠনে কিংবা ভারতীয় সংবিধানে যে সুস্থ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিল তা গঠিত হলো না। পৃথিবী কাছে এসে গেলো, আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেললাম।

এই পর্যন্ত লিখেই অসীম ক্লান্তি—

১৩৮৬ (শারদীয়া বর্ত্তিকা)

৭ মনীশ ঘটক ॥ গল্পচর্চা

'শৈল্পিক রিয়ালিজম-ধারণার কোনো আলোচনাই যেমন গোর্কিকে বাদ দিযে হয় না বাংলা সাহিত্যেও তেমনি যুবনাশ্বকে বাদ দিয়ে হয় না'—এ মন্তব্য শ্রীঅমলেন্দু বসুর। জীবন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কেব ব্যাপারে মনীশ ঘটকেব স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁব নিজের উক্তি—"সুন্দব কুৎসিত একসঙ্গে বসবাস করছে।— শিল্প সাহিত্য সুন্দরকে খুঁজছে দৈন্যের মাঝ থেকে দৈন্যকে বাদ দিয়ে। কিন্তু কেন? গায়ে ঠেস দেওয়া দরদ দেখানো হয় নি তা নয়। কিন্তু যাদেব জন্য লেখা তাদের মুখ দিয়ে বলাতে অল্প লোকই এগিযেছে।" 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'তে গ্রন্থিত গল্পগুলো কল্লোলে যখন বেরুচ্ছিলো তখন শুধু পত্রিকার অন্দোলন নয় বাংলা গল্পের আন্দোলনেও একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যুক্ত হযেছিল। অমলেন্দু বসুর মন্তব্যে সেই মাত্রার কথাই ব্যক্ত। উদাহরণ তুলে কবিতা চেনানো যায়, গল্পের মহিমা টাঙানো মুশকিল। তবু অংশ বিশেষ উদ্ধার করি :

"খেঁদি বললো, সত্যি করে বল তুই, ও মাগী তোর কে? আমি কেন, দশ-জনে দেকেচে, ওই তোকে মারচে, ও কে তোর?

বঙ্কু মুখ তুলে দেখলো, সেও এসেছে তাব দিকে তাকিযে স্পষ্ট করে বললো, "ও, আমার বোন। দলেব মধ্যে দু'জনা পট পট করে মরে গেলেও কেউ অত আশ্চর্য হতো না। বোন! খেঁদিব দলে বোন?"

—মৃত্যুঞ্জয/পটলডাঙ্গাব পাঁচালী

'মান্ধাতার বাবাব আমল' আত্মজীবনীমূলক রচনা। জীবনের নানান আস্তানার মধ্যে তিনি ভিড়ছেন। পকেটমার ফজল, লেংড়িবিবি, দাগী চোরদের সঙ্গে ঢের দহরম করার সূত্রে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন মানুষের যে প্রকৃত ভাঙ্গা-চোরা জীবনচর্চা তার অদ্ভুত রসচিত্রে গ্রন্থটি অনন্য হয়ে থাকবে।

'কনখল' উপন্যাসও যেন কৈশোর আব বাবা মা'র স্মৃতির ফ্রেমে বাঁধানো ক্রমোন্মোচিত স্বানুভূত জীবন। কে কনখল? যে "বিষাদ সিন্ধু পড়ে কেঁদেছে, কঙ্কাবতী পড়ে মুগ্ধ হয়েছে, ইন্দিরা পড়ে স্বপ্নের জাল বুনেছে-'ধানেব ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, বাঁশ তলাতে জল—আয় আয় সই জল আনিগে চল।' নিজের অগোচরে এ বোধ ওর মনে উঁকি দিয়েছে যে কথা দিয়েও ছবি আঁকা যায়।"

৮ মনীশ ঘটক ॥ কবি

১৯৬৭ সালে ডিসেম্বর মাসে হায়দারাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৫তম অধিবেশনে কাব্য সঙ্গীত নাটক শাখার মূল সভাপতি হিসাবে মনীশ ঘটক যা বলেছিলেন তা তাঁর কবিতা ভাবনার ভালো গৌরচন্দ্রিকা

'বিস্ময়ের হৃদ্য শাব্দিক অনুবাদই কবিতা, কখনো প্রেমে বিস্ময় কখনও দুঃখে বিস্ময়, কখনও শোভাতে বিস্ময়, কখনো অসুন্দরে বিস্ময়। আজীবনের বাসভূমি এই পৃথিবী কখনো প্রাচীন হয় না, বহু পরিচয়ের ফলে মানুষ কখনো কবির চোখে তার অস্তিত্বের মোহ হারায় না।'

অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কে বিস্ময়বোধ তাঁর কাব্য দর্শনের মূলে। কবি হিসেবে আত্মকৈফিয়ৎ দিয়েছেন

'আমার মনে হয়েছিল মানুষ বলেই আমার কবিতা না লিখে উপায় নেই। কবিতা আমার মনুষ্যত্বের পূর্ণতার একটি সোপান।'

একজন যথার্থ ভারতীয় কবির পক্ষেই এ কথা বলা সম্ভব। এখন অনুধাবন করে দেখতে হবে মানুষ সম্পর্কে তাঁর বিস্ময় কিভাবে তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। আর কিভাবেই বা মনুষ্যত্বের পূর্ণতার দিকে তিনি এগিয়ে গেছেন কবিতার সোপানে পা ফেলে।

১৯৬৭ সালে উক্ত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেই কাব্যশাখার প্রধান বক্তা ছিলেন অরুণ ভট্টাচার্য। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি যেতে পারেন নি শেষ মুহূর্তে, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে প্রেরিত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে মনীশ ঘটক সম্বন্ধে কবি অরুণ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয় : Both Premendra Mitra and Manish Ghatak represent freshness and vitality that were so needed at that time Manish Ghatak does not care so much for sensibility as for directness The appeal of his poetry is more to the body and flesh than to the spirit and there he tries to unearth subdued human emotion The dreadful and the aweful are twin experiences in his poetry, but characteristically woven into parallel textures of crudity and softness.

(from Dimensions by Arun Bhattacharya)

মনীশ ঘটক পৌরুষের কবি। তাঁর কবিতা তেজের কবিতা। তাঁর কবিতার সুর দৃপ্ত, দীপ্ত, বলিষ্ঠ, সোচ্চার, উচ্চকণ্ঠ ও গম্ভীর। তাঁব ভাষাব প্রধান গুণ স্পষ্ট সমারোহ ও ব্যাপ্ত গাম্ভীর্য। মনীশ ঘটকের কবিতা অন্যমনস্ক বাঙালীর বিবশ চেতনাকে আক্রমণ করতে সক্ষম। শ্রীবার্ণিক রায় তাঁর কবিতা সম্পর্কে উদ্ধারেব যোগ্য একটি মন্তব্য করেছেন

'আমি নিশ্চিত করে বলতে পাবছি না লেখকেব শরীরের বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখায় পড়ে কিনা, কিন্তু মনীশ ঘটকের লেখায় তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য মুদ্রাঙ্কিত। তাঁব ভাষার দৃঢ়তা, শব্দেব দৃপ্ত ঝঙ্কাব, বক্তব্যের সাবলীলতা, প্রকাশের অকুণ্ঠভঙ্গি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপেব শানিত দীপ্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ, আত্মবিশ্লেষণের উদার স্বীকারোক্তি এ সবই তাঁব আর্য শরীবেব বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করায়।'

বিষয়বস্তু এবং বাণীভঙ্গী উভয় দিক থেকেই তাঁর দ্বিচারিতা লক্ষণীয় ছিল। সমকালীন জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ কিংবা যে কোনো সুপরিচিত কবির মতো মাত্র একটি স্বায়ত্ত রীতিতে তিনি লিখতে চান নি। বিষয়বস্তুর দুটি বত্ত, বাণী-ভঙ্গিব দুটি ধারা তিনি আজীবন রক্ষা করে গেছেন। এ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মতো। কোথাও তিনি অনুভবময় শান্ত গম্ভীর কোথাও বা তীব্র, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে কণ্টকিত। ঝরঝরে সহজ অথবা ব্যাপ্ত গাম্ভীর্যে কখনো তাঁব কবিতা শুদ্ধসুন্দব কখনো অসুন্দরের বিস্মিত ও দুঃসাহসিক প্রকাশে অকপট। স্পষ্টতা আর বাক্‌রীতির স্বচ্ছন্দ প্রযোজনায় মনীশ ঘটকেব কবিতার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য।

রসের দিক থেকে বাংলা কবিতার ভূগোলে তাঁর অবদান বৈচিত্র্যময়। কবিতার মানচিত্রে শৃঙ্গার করুণ, অদ্ভুত, শান্তই একমাত্র নয়, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস এরাও জীবনকে ঘিরে রাখে মনীশ ঘটক তা দেখালেন।

গদ্য বা গল্প চর্চার অতি অপেক্ষিত ধারাবাহিকতা তিনি রক্ষা করেন নি। রিয়ালিস্টিক গল্পের দ্বারা তিনি বাঙালী পাঠকদের যে ভাবে সচকিত করেছিলেন সেই পরিমাণে নিরাশ করেছিলেন পরে না লিখে। হয়তো রিয়ালিস্টিক প্রতিভার মধ্যেই উপ্ত থাকে এই ছেদের বীজ। অভিজ্ঞতা-নির্ভর লেখকদের আবির্ভাব এই বিপদ শিরোধার্য করে। মনীশ ঘটকের গল্প না-লেখার পেছনে এই কারণটি চিন্তার যোগ্য বলে আমাদের মনে হয়। মাঝে কিছুদিনের জন্যে কাব্য সাধনায় ছেদ পড়লেও মোটামুটি

ধারাবাহিকতা রেখে গেছেন কবিতাতেই। কেননা মানুষ বলে কবিতা না লিখে তাঁর উপায় নেই। শুধু ধারাবাহিকতা নয় প্রতিভার দ্বিচারিতা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যচর্চায় একটা স্পষ্ট বিবর্তন ধরা পড়ে। সেই বিবর্তনের রূপরেখাটি অনুধাবনীয়। প্রথম জীবনে কবিতার উপজীব্য ছিল প্রেম। অনুভূতির ঋজুতা তার সঙ্গে তীব্র প্যাশনের ঝঙ্কার তাঁর প্রেমের কবিতায়। ১৯৩৭ এর পর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় বলা যেতে পারে। কবিতা এখানে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হয়েছে সমাজ-চেতনার দিকে। চারপাশের ঘটনার মুখোমুখি করে দিলেন কবিতাকে। দেখা গেল ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শানিত দীপ্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ। পাবলো নেরুদার অনুবাদ তাঁর পক্ষে সঙ্গত মনে হলো। গল্পের চর্চা ছেড়ে দিলেন বলেই হয়তো তাঁর কবিতা একটা বিশিষ্টতা পেয়ে গেলো। গল্পে যে সব ব্যাপারে মোকাবিলা করা অপেক্ষিত ছিল তাদের দেখা গেলো কবিতার ফ্রন্টে। এই পরিপার্শ্ব মনস্বতার ভেতরেই হাঁটছিলেন আর এক মনীশ ঘটক। সেই যথার্থ ভারতীয় কবি কবিতা যাঁর কাছে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার একটি সোপান। তাঁর উত্তরণ ঘটলো বিদূষী বাক্'-এ। দেখা গেলো ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনার গম্ভীর রসপ্রকাশ।

এবারে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রেখে উদাহরণের নির্বাচনে আসা যাক.

প্রেমের কবিতা

১ যৌবন গৌরবে

বন্ধ্যা শাসনমুক্ত তীব্র স্তনদ্বয়

সহসা উদ্বেল হলো শুভ্র বক্ষময়

শিহরিল প্রবাল অধর

[পরমা]

ছুটিতে ফিরিলে দেশে, কুড়ানি-জননী

আশীর্ব্বাদ বরষিয়া কন—"শোন মণি,

কুড়ানি উনিশে পরে, আর রাহি কত ?

হইযা উঠছে মাইয়া পাহার পর্বত।"

"সুপাত্র দেহুম" কহি দিলাম আশ্বাস

চোরাচোখে মিলিল না দরশ আভাস

ম্লানমুখ, হতবাক, ফিরি ভাঙা বুকে—
হঠাৎ শুনিনু হাসি। তীক্ষ্ণ সকৌতুকে
কে কহিছে,—"মা তোমার বুদ্ধি তো জবর!
নিজের বৌয়ের লাইগা কে বিস্‌রায় বর?"

সহসা থামিয় গেল সৌর আবর্তন,
সহসা সহস্র পক্ষী তুলিল গুঞ্জন
সহসা দক্ষিণা বায়ু শাখা দুলাইয়া
সবকটি চাঁপা ফুল দিল ফুটাইয়া॥

—কুড়ানি

একটা নিখুঁত গল্প শেষ চার লাইনের ফলে কি অপরূপ কবিতা হয়ে গেলো।

রৌদ্ররসের উদাহরণ:

৩. লাফ দেবার প্রাক্কালে হিংস্র চিতার মতো
পতনোন্মুখ না পড়া বাজের মতো কী দেখতে পাচ্ছ
হে প্রবঞ্চক, ওহে আত্মপ্রবঞ্চক, কী সব দেখতে পাচ্ছ?

বীররসাত্মক যে কবিতাটি তাঁর মতে প্রতিনিধিস্থানীয:

৪. প্রভঞ্জন হার মানে। গোঙায় নিষ্ফল রোষে
বিদ্যুৎগর্ভ বারিবাহ। সুতীক্ষ্ণ ফলকাঘাতে
দীর্ণ করে দিগঙ্গন লক্ষজিহ্ব শাণিত বিজলী।
অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু আত্মঘাতী পরিক্রমা শেষে
অন্তরীক্ষে হয় অন্তর্ধান। এত রঙ্গ, কে সে দেখেছে
একটি বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে।

—একটি বিশাল গাছ

ব্যঙ্গে:

৫. আত্মস্তুতি কড়া মাল, আকণ্ঠ সে চিজ করে পান
জি হুজুর গা ঢালেন। নাস্ত্য পন্থা ভেড়িয়া সাধন

—ভেড়িয়া সাধন

৬. রবীন্দ্র শতবর্ষে লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতার অংশ বিশেষ

ফুচকা খাও নি বসে সদর রাস্তায়
একটানা কলকের ফাটাও নি নল
নেতা হয়ে দেখাও নি খইনির কল
বিলিতি থ্রিলার টুকে ঝাড়ো নি সস্তায়
করো নি অনেক কিছু, ফর্দে কাজ নাই
মানে মানে সবে গেছ, বেঁচে গেছ তাই।

যুবনাশ্বের দুঃসাহস

৭ বন্ধু মরেছে, সান্ত্বনা তার স্ত্রীকে দিচ্ছিলে
আত্তি দেখিয়ে বুকে পিঠে হাত বুলোচ্ছিলে
হাতটা হঠাৎ জায়গা বিশেষে রইল থেমে
সদ্যবিধবা শোকাবেগ ভুলে উঠল ঘেমে।

—সে লোহার স্বাদ

তির্যক আত্মসংলাপ :

৮. আরে কে ও যুবনাশ্ব না ?
এসো এসো স্যাঙাৎ ঢেদ্দিন পর। তোমাব আমলের
কোনো শালা আর বেঁচে নেই এই আমি ছাড়া
নরক গুলজার করে একা আমিই থেকে গেছি
কি করে যে আজও টি়কে আছি,
দেবা ন জানন্তি—

যুবনাশ্ব, না ?

নিয়তি-চেতনা

৯. জাতক মাত্র বলি ঘাতকের অদৃশ্য খড়্গের।

অধ্যাত্ম-চেতনার স্থির প্রশান্তি '

১০. যেন কোনো ঢেউ না ওঠা মহাসমুদ্রের
গোপন অতল মণিকোঠায়

আমার অনেক ঘরের
অনেক ছড়ানো নির্জনতায়
আবার আমি পূর্ণ হয়ে উঠি

—সন্ততি

অনুবাদ

১১. ওই রামধনু যেখানে গিয়ে মিলিয়ে গেছে
সেইখানে কোনো জায়গা খুঁজিগে চলো
যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সবাই
খুশীমতো গান গাইতে পারবে,
সেইখানে চলো ব্রাদার একসাথে
গান ধরিগে দু'জনে, সাদা আর কালো,
তুমি আর আমি।
গানটা হয়তো হবে বিষাদের
কারণ কখন কি গান গাইতে হয়
তুমি জানো না, আমিও না

—রিচার্ড রিং (দক্ষিণ আফ্রিকা)

বর্তিকা বা অন্যান্য পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে আরো বহু কবিতা যা কোনো দিন গ্রন্থিত প্রকাশ লাভ করবে। শেষ দিকের সেরকম দু' একটি কবিতা

১২. হায় আফশোষ

ফুটন্ত খৈয়ের মত লেখা যখন ফুটছিল
গরম বালুর তপ্ত মাটির খোলায়
উড়ন্ত ফুলের মতো মাছ লাফিয়ে উঠছিল
টান পড়া বেড়া জালের দ্রুত দোলায়
বেহিসেবি ওরে লেখক খেয়াল তখন করিস নি
খৈ জমিয়ে মাছ কুড়িয়ে তখন কোঁচড় ভরিস্ নি।
ভিজে খোলায় খৈ ফোটে না
মাছ ওঠে না ছেঁড়া জালে

হায় আফশোষ করে মরাই
লেখা ছিল তোর কপালে।

৪.৮.৭৭ (বর্ত্তিকা)

১৩৮৬র বর্ত্তিকা শারদ সংখ্যার কবিতাটি সম্ভবতঃ তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ কবিতা। রোগ-শোক-বেদনার ক্রমান্বয়ী স্রোতে বিধৌত হতে হতে তিরিশের দুর্দান্ত যুবনাশ্ব কিরকম শিশুর সারল্যে লগ্ন হয়ে গেছেন কবিতাটি তার বিশুদ্ধ নিদর্শন হতে পারে,

১৩. ফুটন্ত বকুল

সাত সকালে ঘুম ভেঙেছে
দেখব বলে ফুল
ঝরার আগে গাছের ডালে
ফুটন্ত বকুল
বিকেল থেকে সমস্ত রাত
গন্ধে ম' ম' করে
দেখে ফেলার আগেই তারা
রোজ পড়ছে ঝরে
পেয়ে গেছি আজকে দেখা
ফুটতে পাতার ফাঁকে
দিনটা আমার এমনি যেন
খুশী মনেই কাটে॥

কবিতা তাঁর কাছে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার সোপান। পূর্ণতা কি তিনি পেয়েছিলেন? অতৃপ্তি ছিল, আফশোষ ছিল। 'যা লিখতে চাই লেখা হয়ে উঠলো না।'

হয়তো পরবর্তী জন্মেও তিনি কবিতা লেখার আকুলতা পোষণ করে গেছেন। 'ফুটন্ত বকুল' কি সেই অন্তর্গত আকুলতারই স্বাক্ষর। পরের জীবনের লেখা কি এই জীবনেই আরম্ভ করে গেলে মনীশ ঘটক। কে জানে?

মনীশ ঘটক পর্যাপ্ত লেখেন নি। অনুবাদ নিয়ে খান পাঁচেক কাব্য; উপন্যাস,

আত্ম-জীবনী ১টা করে। গল্পের বই ১টা। মফঃস্বলে থাকতেন মুর্শিদাবাদের মত একটা ডেফিসিট ডিস্ট্রিক্ট থেকে পত্রিকা করতেন একটা। আজ-কালকার প্রতিভাবানরা যে রকম দশ হাতে লেখেন প্রায় আশি বছর বেঁচে থেকে মনীশ ঘটক এমন কি আর করেছেন? তাই তাঁকে যথার্থ সম্মানিত করার দায় কারো ছিল না। একটি ইংরেজী দৈনিকে চোখে পড়লো—"He was honoured by the State Government with the Rabindra Award"-মারাত্মক ভুল খবর। এ খবরে বাঙালীর লজ্জা ত্রি-গুণ হয়, পিতার মৃত্যুতে মহাশ্বেতা লিখেছেন—"পেশাদারী সাহিত্য জগত যে নির্মম ঔদাসীন্যে বাবার সাহিত্যকৃতিকে উপেক্ষা করে চলত প্রতি পূজায় পুরস্কার ও পদক বিতরণে, সেজন্যে আর আমার বুকের স্নায়ু বেদনায ছিঁড়ে যাবে না।"

অনেক সোনার ধান ঝরে যায়। অনেক গহন মতি ঘটে যায় নিরুপদ্রবে। তাঁর মৃত্যু আজ লাভ-ক্ষতির বাইরের ঘটনা। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান শিরোধার্য হয়ে থাকবে। রসতীর্থের পথিকদের কাছে যে শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছেন সোনার ইনাম তুচ্ছ তাব কাছে। তবু ঋণ ঋণই। অপরিশোধের লজ্জা থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় রইলো না। মনীশদা বেপরোয়া। কোনো কিছুর তোযাক্কা না করে চলে গেলেন তিনি।

সূর্য ডুবু ডুবু দেখে
হঠাৎ বুড়ো গেল থামি
তারপরেতেই টেউয়ের ওপর
হনহনিয়ে পা চালিয়ে
মুখটি বুঁজে রওনা দিল
আমার দিকে না তাকিযে
সেই যেখানে দিগন্তরে
শেষ অবধি সাগর জালে
পড়ন্ত দিন তলিয়ে গেল
সেইখানে সে গেল চলে ॥

—সে এক বুড়ো 'এক্ষণ', ১৩৮৫ ॥ শারদীয়া

লেখা যখন দেরাজে তুলে রাখি নি তখন জবাব দেবার দায়টুকু স্বীকার করে নিই। এ লেখার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমি পূর্ণ সচেতন। মনীশ ঘটক সম্পর্কে লেখার যোগ্য অধিকারী আমি নই। শ্রদ্ধা জানানোর উপায় হিসেবে এই লেখা আমার। লিখতে গিয়ে পরোক্ষে জানা শোনা হলো অনেকের সঙ্গে। মনীশ ঘটকের মুখোমুখি বসে ছিলাম ক'দিন যেন। আমার লাভ সেই-টুকু। চেষ্টা করেছি তথ্যগুলো সামনে রাখার। তথ্য আড়াল করে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করি নি। যদি ভুল হয় সে আমার অজ্ঞতা। সংশোধনের রাস্তা তো খোলাই রইলো। পরিগ্রহণের ঋণ স্বীকার করি—বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, জঙ্গীপুর পুস্তক মেলা স্মারক গ্রন্থ (১৯৭৬), মনীষীমোহন রায়, শান্তনু দাস, অমলেন্দু বসু, সুধীর চক্রবর্ত্তী, শান্তি লাহিড়ী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বার্ণিক রায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য, বিজন ভট্টাচার্য্য, চন্দনা সেনগুপ্ত, জনমত, জঙ্গিপুর সংবাদ, কৃত্তিবাস, এক্ষণ, দি স্টেটসম্যান, বর্ত্তিকা এবং মনীশ ঘটক।

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভালবাসা এখন

যেসব ছেলে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ধরা পড়েছে
আজকে তারাই চোর-পুলিসের বুড়ি ছুঁয়ে সভা করেছে আলো।
অথবা তারা কেউরাজা কেউ মন্ত্রী চারদিকের ভাল থাকার সমারোহে ,

কেননা বয়েস নদীর জলে ভেসে গিয়েছে অনেকদিন,
তা-ছাড়া ভালবাসা তো এখন মুখোস।

২৪ আগস্ট, ১৯৮০

বৃষ্টি এলে

বৃষ্টি যেন সোনা, যেন মাণিক
ঝরছে, পড়ছে গাছের পাতায়

ছাতা-মাথায় বাবুটি, তুই একটু দাঁড়া।
একটুখানি বৃষ্টিতে ভেজ।

আহা, বৃষ্টি। শীতল বৃষ্টি। সারা শরীরে শীতল সোনা
মাখছে পথ, মাখছে মাঠ। গাছের পাতায় মাণিক ঝরছে ,

বৃষ্টি ঝরছে, বৃষ্টি পড়ছে—
চারদিকে তাব মাদল বাজে।

চারদিকে তার মাদল বাজে। হেই বাবু, তুই
একটুখানি বৃষ্টিতে ভেজ।

১২ জুলাই, ১৯৮০

জগন্নাথ চক্রবর্তী

ত্রিকোণমিতিক

১ ত্রিকোণমিতি

বাহু আর কোন খোঁজে
ভালবাসা এই তার রীতি
প্রেমের গণিতবিদ্
পাঠ নেয় ত্রিকোণমিতির।

২, সূক্ষ্মকোণ

সারসের চঞ্চু এসে
বিদ্ধ করে বুক
কেবলি কৌণিক হয়
যাবতীয় সুখ।
একদিকে তীক্ষ্ণ ফলা
অন্যদিকে অনন্ত বিস্তার
মুক্তির আকাশে বেঁধা
সূক্ষ্ম মনোভার।

৩ অতিভুজ

একটি আয়তক্ষেত্রে রয়েছি দাঁড়িয়ে
কোনাকুনি দীর্ঘ বাহু দিয়েছি বাড়িয়ে
ব্যাকুল বুকের মধ্যে নিতান্ত অবুঝ
যৌথ আকাংক্ষার নাম বুঝি অতিভুজ।

৪. সমবাহু ত্রিভুজ

সমদ্বিবাহু থেকে সমবাহু
কিংবা সমকোণী
বালিকার সজ্জা ছেড়ে
নবোদ্ভিন্ন প্রথম রমণী

জগন্নাথ চক্রবর্তী. জন্ম ১৯২৪, প্রথম প্রকাশিত কবিতা বসুমতীতে। জন্মস্থান : যশোহরে।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ . নগরসন্ধ্যা। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ মৌনী । মালয়, শুদ্ধ আঙ্গুল।

সমবাহু ত্রিভুজটি
সমদ্বিবাহু থেকে টানা
কিছু আরো প্রস্ফুটিত
কিছু আরো হরিণ নয়না।

৫. অসমব'হু ত্রিভুজ

দুহাত মেলাতে যাই
ব্যথা পাই অমিল দুহাতে
অসমবাহুর মধ্যে
চাঁদ ডোবে অন্ধকার রাতে।

৬. ঊর্মিরেখা

প্লাংকের গণিতে তুমি
তেজের দর্পণ
সমুদ্রে নদীতে ঢেউ
আবেগে অর্পণ
উদ্বেল মুহূর্তগুলি
বড়ো আঁকাবাঁকা
ওঠানামা ওঠানামা
সবি ঊর্মিরেখা।

বৃত্ত

বৃত্ত বড়ো সমদর্শী
বৃত্ত সাম্যবাদী
অনন্ত এখানে সান্ত
চক্রান্ত অনাদি
আকাশ বৃত্তেরি অংশ
মাটি তথৈবচ
অসংগতি চারিদিকে
একমাত্র বৃত্তই সংগত।

৮. সমকেন্দ্রিক বৃত্ত

ক্ষুধা বলো সুধা বলো
নিবৃত্ত কোথায় ?
বৃত্তের ভেতরে বৃত্ত
যায় আসে যায়।

৯. সমকোণী চতুর্ভুজ

উত্তরে প্রবাহ যদি
দক্ষিণেও তাই
পুবে ও পশ্চিমে তেমনি
একই রোশনাই
মিলনান্ত এই নাট্যে
দুই প্রান্তে সমান বাঁধুনি
সমান পুরুষ নারী
গৃহকর্তা তিনিও রাঁধুনি।

১০. সমান্তরাল চতুর্ভুজ

তুমি যদি হুয়ে পড়ো
আমি তথৈবচ
সমান দূরত্বে গড়ি
সম উচ্চাবচ
সর্বদা কৌণিক তাই
সর্বদা সন্দেহ
সম-অন্তরালে থাকে
আত্মা আর দেহ।

১১. সমকোণ

চেয়ারে সমান পিঠ
চক্ষুরোগী অথবা মাস্টার
বড়ো বেশি ঋজু তুমি

বড়ো বেশি যেন অহংকার
পা মুড়ে সারাটা ক্ষণ
বসে থাকো কি যে সুখ পাও
পেছনের দায় নেই
বিস্ফারিত সম্মুখে তাকাও।

১২. স্পর্শক (১)

তোমাব চৌদিক ঘেরা
বাহুর উঠোনে
মুহূর্ত-অতিথি এসে
গেছে পরক্ষণে
মুহূর্তের জন্য আসে
মুহূর্ত-অতিথি
ফেরে না যে ফিরে যায়
ফেরে শুধু স্মৃতি।

১৩ স্পর্শক (২)

বৃত্তের ভেতরে খুব সুখ আছে জেনে
আগন্তুক আসি খুব কাছে
মসৃণ চৌকাঠে এসে খুব ভালবেসে
স্পর্শ করি বিম্বোষ্ঠ আলগোছে
তখনি প্রলয় ঘটে
বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যাই
ফেলে রেখে নহবত
ফেলে রেখে সন্ধ্যার সানাই
বিদ্যুতের স্পর্শ নিয়ে
স্মৃতি নিয়ে
দূরান্ত গগনে—
বৃত্তের ভেতরে খুব সুখ আছে জেনে।

১৫. সমান্তরাল রেখা

দুজনই উদ্‌ভ্রান্ত ছোটে
দিনে রাত্রে সকালে দুপুরে
দুজনই নিকটে তবু
ঠিক সমদূরে
যেন দুই বঙ্গভূমি
চলে যুগ্ম সংযোগ বিয়োগে
রেডিও রটায় মিথ্যা
যোগসূত্র শুধু প্রতিযোগে
বস্তু ও ছায়ার মতো
এক যেন অন্যের নিয়তি
যুগল তবুও লক্ষ্য
দুর্নিবার মুগ্ধ আত্মরতি।

১৬. সমান্তরাল ক্ষেত্র

সূক্ষ্ম আর স্থূল মিলে
আমি কোনাকুনি
আমাকে চ্যাপ্‌টানো সোজা
টেনে তুললে উঠবো তখ্‌খুনি।
আমি বড়ো নমনীয়
সমান দূরত্ব দুই দিক
কখনো ভীষণ ঋজু
আয়তক্ষেত্রেব রূপ ঠিক।
আমাব স্বপ্নের মধ্যে
বর্গক্ষেত্র অনিন্দ্য অপ্সরা
কিন্তু সে আমারি দেবী
অন্যদের দূরেব অধরা।

১৩. বিন্দু

সিন্ধুর ভেতরে আমি
আমি বৃষ্টিজলে
ঘাসের ওপরে আমি
শিশিরের ছলে।
অস্তিত্বের মূলে আমি
করি অশ্রুপাত
আমি অস্তি আমি নাস্তি
ধনী ও অনাথ
পরস্পর ছেদ করে
প্রেমে ও ঘৃণায়
স্পর্শের মুহূর্তে আমি
থাকি সেই ঠাঁই।

অরুণ ভট্টাচার্য

নির্জন বারান্দা থেকে কবিতাগুচ্ছ

১. বাইরে আকাশ-জোড়া আলো। ঘরে ঢুকলে
নিশীথিনী অন্ধকার। অন্ধকার
নির্জনতা দেয়। হরিণীর নিঃসঙ্গতা
অন্ধকারকে গাঢ় করে। গাঢ়তর
রৌদ্রের দুপুরে
ঘরে ঢুকলে কী যে এক অপাপবিদ্ধতায়
আমাকেও শান্তি দেয়।
ঘর আলো অন্ধকার, হরিণীর
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, এই সব
অপরূপ নীলিমার কাছে
হয়তো বা একদিন স্থির নিয়ে যাবে। ১০ই জুলাই। ১৯৮০

২. তোমাকে দেখতে যাবো, প্রায়ই ভাবি,
যাওয়া হয় না।
তোমার সঙ্গে দেখা হলে কি কি বলবো, তাও ভাবি,
কিছু বলা হয় না।
তোমার কাছে কতকাল থেকে কত কী যে চাইব ভাবি,
আমার কিছুই চাওয়া হয় না।

এই সব ভাবনা নিয়ে আমি
তোমাব প্রতিমা গড়ি, ভাঙ্গি, আবার গড়ি।
ইচ্ছামত খেলা করি,
খেলা করতে ভালবাসি।

১৮ অগষ্ট। ১৯৮০

৩. কোন্ গভীর থেকে উঠে আসছে তোমার মুখ
মুখের কালিমা, শীতল
দীঘির চেযেও শীতল, মস্থন
পাথবের চেয়েও মসৃন, যেন
খোদাই-করা মিশরীয় মূর্তির ঘন রহস্য।

আমি কি তা জানতে পারি না।

এটুকু জানি, ওই দুটি কালো আঁখির অন্তরালে
রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবন। বয়ে চলেছে আদিম রসধারা।

২৮ অগষ্ট। ১৯৮০

৪ তোমার ঠিকানা রয়েছে আমার কাছে। বৃথা
ঘুরো না এদিক ওদিক।
শূন্য রাস্তাঘাট, ঝোপঝাড়,
কাঁটাবন। কোথায় আটকে যাবে
শাড়ির আঁচল, কোথায় খসে পড়বে

রত্নহার।
বরং নিশ্চিন্ত হয়ে বোসো। ক্রমশ
অন্ধকার গাঢ় হবে, তারা ফুটবে, ফুটপাথের
কেয়ারী-করা শিশুগাছের কিশোর হাওয়া
তোমার উড়াল খোপায় ইতস্তত
বিলি কাটবে।

এমনই যাবে দিন। বৃথা
ঘুরো না এদিক ওদিক।
তোমার একান্ত ঠিকানা রয়েছে আমারই কাছে।

২৮ অগষ্ট। ১৯৮০

৫

কিছু কিছু কথা থেকে যায়, কিছু
ছবি, কোন গোপন বেদনার।
সরে যায় স্থির জলের ওপর
হরিতকী পাতার ছায়া
ইতস্তত নির্জন হাওয়ায়।

একদিন অন্ধকার বারান্দায় তুমি ছিলে,
তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাস ছিল,
ছিল পুকুরপাড়ের গাঢ় প্রতিবিম্ব।

আজ সেই বারান্দায় তোমার
বেদনার ঘনানো কান্না, তোমার
স্ফূরিত অধর। তোমার
অবাধ্য চূর্ণকুন্তল।

এই দুটি দ্বীপের ব্যবধানে আমি,
একলা দাঁড়িয়ে,
আমার নৌকো ভাসাবো মনে করছি।

৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৮০

৬. একটি সাদা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম
একটিমাত্র সাদা ফুল।
সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি একটি কামিনী ফুলের।
শ্বেতশুভ্র। হালকা মেঘের পালক। যেন
গভীর জলে শ্বেতপদ্ম। যেন
সমুদ্রচূড়ায় শঙ্খমালা।
সারা জীবন ধরে একটিমাত্র সাদা ফুল তুলতে চেয়েছিলাম,
একটি কামিনীফুল।
আজও তোলা হয় নি।

কামিনী ফুল হাত থেকে শুধু ঝরে ঝরে যায়।

[illegible] সেপ্টেম্বর। ১৯৮০

৭. মনে পড়ছে, কাক-ভিজে ভিজে বাড়ি-ফেরা
এক ছাতায় বৃষ্টির জল তোমার
শাড়ির আঁচলে, ব্লাউজের চিকণ উক্তিতে,
বেলভেডিয়ারে মসৃণ-পীচ রাস্তায়
ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেবদারুর উতল হাওয়ায়
মনে পড়ছে, লাইব্রেরীর সবুজ বাগান থেকে
বাড়ি-ফেরা।

মাঝখানে থমকে দাঁড়ানো
কয়েকটি দুরন্ত রাত্রির মুহূর্ত। তোমার
উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। তোমার
উদ্ধত তর্জনী। তোমার
নির্মম তিরস্কার।

দিন যায়, দিন যাবে। যেমন
সূর্য-ওঠা, যেমন গঙ্গার ওপারে পশ্চিমদিগন্তে

অস্থির আকাশে সূর্য-ডোবা।

বাড়ি ফিরে আসি। নিঃসঙ্গ
পথের দুধারে দেবদারুর পাতা ঝরে যায়, ব্যাকুল
বকুলের নিঃশ্বাসে তোমার গ্রীবার সুগন্ধ
মনে পড়ে।

এখনো বৃষ্টির দিনে।

১৯ ৯ ৮০

এই নাও ধারালো অস্ত্র, উজ্জ্বল
তরবারি। এই নাও
মুহূর্ত সময় তোমার হাতের মুঠোয়।

আমি প্রস্তুত। আমি
দেহ রেখেছি শয়ান। তোমার
তরবারি নামুক আমার
নিষ্পাপ দেহে।

এই শোণিতে তুমি স্নান করবে ভেবেছিলে।

স্নান করে বুঝি পবিত্র হতে চাও, রমণী।
তবে জেনে রেখো, এই শোণিতে
শুধুমাত্র দেবতার উৎসর্গ হতে পারে।

১৯. ৯. ৮০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সিন্ধুতীরে

রাত হল খুব বালুর খেতে
এবার তবে অন্যরকম শস্য হবে
সন্ন্যাসীদের ডাক পড়েছে সে-উৎসবে
রাত বিরেতে

কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এসো সন্ন্যাসীরা
বালুর মধ্যে ফলাও বাগান
আপনারা কি শূন্যতা চান
বলতে বলতে ঝাউ খেলেছে চন্দ্র-হীরা
যবন হরিদাসের শ্মশান
মন্দিরাতে ডাক দিয়েছে ওইখেনেতে ॥

দহরাকাশ

দহরাকাশ বইল ভেসে আর্শি-ঘাসে
দহরাকাশ রইল বিঁধে ঘর-আকাশে

তাই তো অকূল ভালোবাসায় ঘর ভরিল
তা নইলে কি বেঁচে ওঠার অর্থ ছিল

আজ সকালে গিয়েছিলাম তার সকাশে
এখন ভাসে দহরাকাশ আর্শি-ঘাসে

তুমি

পুরবাসীরা জেগেছে ঐদিকে
তার করেছে দুরূহ বৈরীকে

নির্বোধেরা ঘৃণ্য অভিচারে
খুন করেছে প্রেমের কবিতারে

দুয়ের মধ্যে উদাসীন প্রদোষে
চুল এলিয়ে রয়েছো তুমি বসে ॥

জন্মসন ১৯৩৩। জন্মস্থান কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ যৌবনবাউল। প্রথম প্রকাশিত কবিতা ৭ বছর বয়সে, বীরভূমবার্তায়। ১০ বছর বয়সে বসুমতীতে। শেষ কাব্যগ্রন্থ বন্ধুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে।

মানস রায়চৌধুরী

সমাপ্তির ছবি

জলে তার মুখ, দেখি মুখে তার জল
এই ছন্ন সংসারের অলীক শিকল
আমাকে জলের দিকে টানে
সন্ধ্যায় পানীয় দুঃখ যায় অন্তর্ধানে,

কতদিন ভেবেছি এবার হবো সম্পূর্ণ গৃহস্থ
অথবা তুলসীমঞ্চে আনত প্রদীপ
নির্ঘুম ছুটির দিনে জলে ফেলব ছিপ
ভাবনা আমাকে করে এমনই বিধ্বস্ত !

'তাই হোক তবে তাই হোক'
নীলিমার পরপারে আমার আবাস জ্যোতির্লোক
সেখানে আশ্রম গড়ে পাবো স্থির নিশ্চিন্ত আশ্রয়—
চারিদিকে চেয়ে দেখে প্রেক্ষাপটে ক্ষয় শুধু ক্ষয়

জলে তার মুখ আর মুখে তার জল
আমাদের সুখদুঃখ প্রসাধন সুন্দর কাজল
যাকে ভাবি স্নেহশীল সে-ও তো নির্মম
একটি কুঠারে হানে মৃত্যুর চরম।

মানব জীবন

মানুষের দিকে চেয়ে আছি
যে মানুষ মাটি থেকে শস্য খুঁটে খায়
যে মানুষ খায় না আপেল কিংবা ফ্রিজ খুলে নিটোল আঙুর
যে মানুষ মাটি থেকে ভাত খুঁটে খায়।

মাধবপুরের কাছে আসতেই ঝুপ্ করে সূর্য ডুবে গেল
এক পশলা অন্ধকার চতুর্দিক অদ্ভুত ঢেকেছে
কেরাসিন নেই তাই কোন হারিকেন নেই
অথবা থাকলেও তারা জ্বলে নি আঁধারে
কয়েকটি মোমবাতি শুধু দূর থেকে আমাদের চোখে এসে লাগে
মাধবপুরের কাছে এসে মনে হলো
মানুষের খুব কাছাকাছি এসে গেছি
এখানে ইস্কুল আছে পড়ুয়া নেই, এখানে দেখেছি
হাসপাতাল নেই, আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র শুধু—
ওষুধ ও চিকিৎসক ডাকযোগে পৌছোয় নি এসে
মাধবপুরের কাছে এসে মনে হলো
মানুষের বুক জোড়া অন্ধকারে দুএকটি মোমবাতি
জ্বলে শুধু জ্বলে—
মানুষের কাছ থেকে চলে যাবো এই কথা কখনো বলি নি
এই কথা কখনো ভাবি নি আমি মানুষের এত কাছে এসে
দেখাশুনো না করেই দূরে ফিরে যাবো

কতদূরে জনতাবহুল শহরের শেষ বাস দ্রুত চলে গেছে
আমি অন্ধকারে বসে ভাবি এই মানুষের উজ্জ্বল বসতি
যেখানে দিনের বেলা ধান হয় গম হয়
কোন কোন পালা পার্বন কিছু গান হয়
তারপর সব নিভে এই অন্ধকার
সারি সারি বন্ধ দরজা
হাটের ওপাশ থেকে ফিরে আসা দুর্জয় গরুর গাড়ী
ঘণ্টার টুং টাং
মানুষের এত দুঃখ তবু আমি মানুষেরই কাছে ফিরে আসি।
কত কথা জানা হয় তবু বহু কথা থেকে গিয়েছে অজানা
রাত্রির মশারী হাওয়া ছিঁড়ে দেয়
ভিতরে আমার মত ঘুম্-কাতর পর্যটক বসে বসে ভাবে—
কাল ভোরে ফিরে যাবো ওখানে, শহরে
কিন্তু সেই মানুষের দেখা আমি পাবো ?
শহরে কচিৎ আমি দেখেছি তাদেব—
মাধবপুরের অন্ধকারে
আমি আছি মানুষেরই কাছে
যে মানুষ মাটি থেকে মুড়ির দানার মতন
শুকনো ভাত খুঁটে খুটে খায়।

কথায় শুধু

কথায় শুধু কথাই বাড়ে
কপালে জমে ঘাম
সকাল বলে, সন্ধে হলে
পাবে তোমার দাম
শ্যাওলাগুলি পুকুরটিকে

সবুজ করে রাখে
একটি ছাদের তলায় থেকেও
চেনা হলো না তাকে।

সুখে আমার সুখ লাগে না
কেমন তরো বাঁচা
গ্রীষ্ম আতপ গায়ে মেখেও
ফল থেকে যায় কাঁচা
আমিও ভাবি আমার মধ্যে
আনত ডালপালা
ঝড় ওঠে নি তবু কাঁপছে
সাতটি তারে ঝালা।

তর্ক এখন তর্কাতীত
বুকে শ্মশান চিতা
দুঃখে নিবিড় সুখ মিশেছে
প্রখর মনস্বিতা
তোমার আমার বাঁচার মধ্যে
একটি শিথিল ছন্দ
উঠতে বসতে মনে পড়ছে
লেবু পাতার গন্ধ
এ বয়েসেও সাত সতেরো
সাধ থেকে যায় সূক্ষ্ম
কি করে যাই জ্যোৎস্না রাতে
পা ছড়ানো দুঃখ।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কোন কোন অন্ধকার

কোন কোন অন্ধকার দেখতে নেই
কোন কোন নিঃশব্দ পেঁচাকে
কেউ সেখানে হাঁকে না ডাকে না
শুধু তার দৃষ্টি থেকে লোভাতুর তারল্য গড়ায়
দ্বিস্রোত মানুষ তার আলোঅন্ধকার নিয়ে আছে
একটি দেউড়ির জানালা অন্যটি খিড়কির
অন্ধকারের দিকে মুখ
কোন কোন মানুষ একাকী
জন্মজন্ম স্বরের সেই নাম-না-জানা
হারানো এক পাখি।

যখন বুঝি নি

যখন বুঝি নি সেইসব তখনই ত শুরু হয়েছিল
পথে পথে বকুল ছড়ানো
কে একজন জেগে বলে—হিসেব মেলে নি
একে একে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়লো
খসে গেল রঙের রঙিন
গন্ধ কোন্‌কালে অপহৃত
দিনগুলি দ্রুত চলে যায়
বোঝা যায় পিছনে তাকালে
সব কিছু ফিরে পাওয়া যায়
ফিরে পাওয়া যায় নাকো দিন
মোটামুটি সবই ঠিক থাকে

মুখের আদল, কথা বলা
শুধু টিমে হয়ে আসে হাসি
এক পোঁচ ম্লানতার কালি
এই নিয়ে বসে থাকা দায়
তাই জন্যে ডাকা হয় পথ
পথই আজ মস্ত রাজবাড়ি
পথসভায় অনন্ত জোয়ার।

একটি পাখিকে আমি

পাখিগুলি উড়ে যাচ্ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে
একটি পাখিকে আমি তার সঙ্গে উড়িয়ে দিলাম
দূরে শূন্যে আকাশের গা ঘেঁষে যাতে চলে যেতে পারে
পাখি শুধু গায়ের পালক রোম, চোখে জল নিয়ে গিয়েছিল
এখন শহরে বৃষ্টিপাত হলেও আর ক্লেদ ধুয়ে যায় না
কুয়াশা কমে না
তার চেয়ে সুদূর অম্বিষ্ট সেই অজানার হাতছানি
ডাক দিতে তাকে
পাখি উড়লো মহাশূন্যে দিকচিহ্নহীন দূর বাতাসপ্রবাহে
তার শেষ ডাক কিন্তু ভেঙে পড়েছিল ঠিক মেলাবার আগে
দেওদারের উত্তুঙ্গ শীর্ষে
ভাঙা একটা মন্দিরচূড়ায়।

সে একজন

আমি হাহাকারের বাইরে যেতে চাইছিলাম
মুষ্ট মেয় রঙিন স্বপ্ন এবং দিনগুলি একে একে পাশ ফিরছিল

যেমন পাখিরা হঠাৎ হঠাৎ উড়ে যায়
যেমন কুয়াশা এসে পড়ে হিলস্টেশনে
তেমনি সেই চিন্তাগুলি উড়ে যায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়
জোড় লাগে, 'আমি আমি' বলে ডাকে
এবং হাহাকার কমে না
এরই মধ্যে কে একজন সজোরে দরজা খুলে
ভেতরে ঢুকে যায়
নিষেধ মানে না
ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে দাগ কাটে, অথবা
কাগজে বুকের রক্তে অক্ষর সাজায়
কবিতার রূপবন্ধে বুক খুলে দাঁড়ায়
আর ঠিক তখনই
হাহাকার হা-হা হাসি নিয়ে ঝরে পড়ে ঝরে পড়ে
পর্দা কাঁপা ঘরের ভিতরে।

জন্ম: ১৯৩২। স্থান, কলকাতা। প্রথম কবিতা 'হিন্দু' পত্রিকায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ [illegible]। প্রকাশিতব্য: ভারতবর্ষ তুমি কার।

শান্তিকুমার ঘোষ

নিউ ইয়র্কে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলি

এক

পাহাড়-চূড়া নয়, সৌধ আর অট্টালিকা বেড়ে উঠছে আকাশ ফুঁড়ে
পাথুরে দ্বীপ এই ম্যানহাটানে
হায়, সূর্য অস্ত যায় প্রাসাদ-ঘেরা টাইম স্কোয়ারে
স্বর্ণ কলসে ছায় হর্ম্যচূড়া
ছায়া ঘনায় উপত্যকায়
পাষাণ-বাঁধা চত্বরে বন্দী তরু
সেখানে ভিড় জমিয়েছে পায়রা

গভীর খাত বেয়ে হাড্‌সন্ নদী থেকে উঠে আসে বাতাস
সজোরে ঘোরায় ভাঙা টিন, ছেঁড়াপাতা, ইস্তাহার
স্রোত উচ্ছ্রিত হ'য়ে পড়ে মানবতা
ঢোকে আর বেরোয় আলো-আঁধারি সুড়ঙ্গ থেকে

দুই দিকে আমার রাজপথের বিরামহীন প্রবাহ
পায়ের তলায় গর্জে ছুটছে ভূগর্ভট্রেন
আছি দাঁড়িয়ে ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার দ্বীপে
ফেনা হ'য়ে সময় ভাঙছে তটে

দুই

ভাখো, ঘোড়-সওয়ার ঘুরছে টাইম স্কোয়ারে
বেহালা-বাদক পার হ'য়ে যায় স্রোত
একি লাবণ্যে রাঙিয়ে গেল আজকের মতো সূর্য
এখন সন্ধ্যা ভরিয়ে তোলে চতুষ্ক
হর্ম্যসারির খাঁজে-খাঁজে ঘিরল নীলিমা
পুচ্ছে-পুচ্ছে জ্ব'লে ওঠে অপূর্ব ময়ূর
জ্ব'লে উঠলো য়ুরোপীয় যুবতীর তৃতীয় নয়ন

জন্ম ১৯২৯। জন্মস্থান কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা বঙ্গদর্শনে (মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত)। প্রথম কাব্যগ্রন্থ মিত্রায় জন্ম রোমান্টিক কবিতা। প্রকাশিতব্য পরিকল্পনা নেই।

কালীকৃষ্ণ গুহ

অমিতাদি

কবিতায় আপনাকে অমরতা দিতে চেয়েছিলাম, অমিতাদি।
আপনি বলেছিলেন, 'মানুষের অনুভূতি নষ্ট হয় না কখনো'।
কিন্তু, অমিতাদি, মানুষের মাথায় জড়তা থাকে,
আর থাকে, অক্ষম পঙ্গু হাত।

অনুভূতি-প্রবণ মানুষ তার পঙ্গু হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
একদিন বুড়ো হ য়ে যায়।

তোমার পাশে রাত্রি ঘুম

তোমাকে ঘিরে রচিত হয় যে রাত্রি তার কাছে একদিন যাবো।
তোমাকে ঘিরে রচিত হয় যে ঘুম তার কাছে একদিন যাবো।
পুরোনো হলুদ পাতা পরিপ্রেক্ষিতের অন্ধকারে ঝ'রে পড়বে।
চুলের স্পর্শ নিয়ে
ঝ'রে পড়বে অন্ধকার স্মৃতি।

রাত্রি ঘুমের কাছে নিয়ে যায়, ব্যর্থতার বোধ সহ, মানুষের শরীর ও মাথা—
এই কথা জেনে নিয়ে একদিন শহর-তলিতে তোমার
রাত্রিব কাছে যেতে চাই আমি।

আকস্মিক প্রেম

তোমাকে এখন আর দেখতে পাই না।
বহুদিন হ'য়ে গেল। কতোদিন হ'লো? দ-'বছর?
আর তো দশবছর পরে প্রৌঢ় হ'য়ে যাবো—
পৃথিবীকে মহাপৃথিবীর অর্থে ভাবতে শিখবো।
তখন কি মনে পড়বে আমাদের আকস্মিক প্রেম ছিলো
স্পর্শাতুর, অর্ধ-শারীরিক?

উদ্যান ও হ্রদ

তোমার হ্রদের কাছে একা একা কিভাবে দাঁড়াবো?
তোমার হ্রদের পাশে প্রকৃত সুন্দর এক উদ্যান রয়েছে।
'উদ্যান' ও 'হ্রদ' জানি, বাংলা কবিতার থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে এই
আশির দশকে—

তবু এরা, কখনো-কখনো, হয়তো খুব কার্যকর যৌন-প্রতিচ্ছবি।
তবে, আমি কি তোমার কাছে যৌনতা চেয়েছি?
যৌনতার বোধ থেকে আমি কবে অক্ষরবৃত্তের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে
নেমে যাবো, একা, মৃত্যুবোধে?

জন্মসাল. ১৯৪৪, ৩ সেপ্টেম্বর। ২ স্থান. বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি থানার ছাইবাড়িয়া গ্রাম। ৩ কাব্যগ্রন্থ (১) রক্তাক্ত বেদীর পাশে (১৯৬৭) (২) নির্বাসন নাম ডাকনাম (১৯৭২) প্রস্তাবিত গ্রন্থ, হস্টেল থেকে লেখা কবিতা। প্রথম এবং দ্বিতীয় কবিতা প্রকাশিত হয় (যতোদূর মনে পড়ছে) যথাক্রমে গঙ্গোত্রী' এবং উত্তরসূরিতে।

প্রদীপ মুন্সী

ফেরা

দেরাজের পাল্লা খুলে যায়
ব্যবহৃত আসবাব
চিঠি
পুরোনো স্মৃতির ঘ্রাণ
যেন গোলাভরা ধান ছুঁয়ে থাকা
প্রবাসীরা ঘরে ফেরে
মৃতরাও ফিরে আসে
শরীর গড়িয়ে বৃষ্টি নামে
বুকের গোপন গুহায়
হিরন্ময় নীরবতা জ্বলে

যে যার মতন

যে যার মতন
যে যার মতন
যে যার মতন নিজের অতলে
এ শুধু নিছক শরীর
অন্য এক ধূসর ভূগোল
জানাহীন বাঁক
টেনে রাখে
অতল বিষাদে
বৃত্ত বুনে কেবলি পাক খাওয়া
শুধু
চোখ দিয়ে জানা
চোখ দিয়ে দেখা
এ শুধু নিছক শরীর

রংটং

দূরে রংটং
গুম্ফার উর্দ্ধশিখা
জানাশোনা পথ
বনের ভিতরে গাড়ি
মাটি চিরে কুয়াশা উঠে আসছে
গাড়ির ভিতরে হিম
মদের বোতল হিম
গাড়ি জড়িয়ে ঝুপসি অন্ধকার
নেমে আসছে!
দূরে রং টং
অস্থির শিখা

পাহাড়ের গায়ে

পাহাড়ের গায়ে বিষণ্ণ
গুম্ফার কাঠে ঘুণ ধরে
সারাদিন সারারাত
পোকা কাটে

বুদ্ধকে স্মরণ করে যাই
তিস্তার জল জানে
মদের দোকানে ভীড
ওঠা আর নামা
সবুজের পাড ভাঙে
তিস্তাব জল জানে
টারবাইন ঘুরছে ঘুরছে ঘুরে যাচ্ছে

যাওয়া

নিজের সাথে নীচু গলায়
কথা বলতে বলতে
সকলের থেকে চলে গেলেন দূরে
এখন কঠিন খরার দিন
শাবলে মাটিতে
ঘাত
প্রতিঘাত
জল শতখান
গ্রাম শতখান
নির্বিবাদে দূবে দাঁড়িয়ে এদের কথা লিখুন
নিজের সাথে নীচু গলায়
কথা বলতে বলতে
নিজেকে ছাড়িয়ে চলে গেলেন দূরে

জন্ম : ১৯৩৬, স্থান : রাজশাহী। প্রথম কবিতা উত্তরসূরিতে।

পুরানো কথা : কাউন্ট কেসলারের ডায়েরী

ভূমিকা অনুসরণ ও টীকা কমলেশ চক্রবর্তী

[কাউন্ট হ্যারি কেসলার ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। ক্রমান্বয়ে ফ্রান্স, জর্মনি ও ইংলণ্ডে পাঠ্য জীবন কাটান। ফলে কেবল যে বেশ কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষায় দক্ষ হ'য়ে ওঠেন তাই নয়, য়ুরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর অনুরাগ প্রগাঢ় হয়। মা ছিলেন সমকালীন বিচারে সুন্দরীতম আইরিশ মহিলা। এবং নানা কারণে পটস্‌ডাম এর হোহেনজোর্লান রাজসভায় মধ্যমণি। জন্মদাতা পিতা সম্ভবত ছিলেন কহিনীব প্রথম উলহেলম। এই অর্ধ-আইরিশ অর্ধ-জর্মন অভিজাত পুরুষ সে-সময় স্বদেশে ও বিদেশে প্রায় অধিকাংশ খ্যাতিমানদের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন রেড কাউন্ট নামে। সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি তাঁর গভীরতর ভালোবাসার ফলে তিনি জীবনে প্রকাশনাকেই উপজীবিকা হিসেবে নির্বাচন করলেন। সমকালীন উৎকৃষ্টতম পাণ্ডুলিপিগুলো তাঁকে পেতে কখনোই তেমন বেগ পেতে হয় নি। হ্বাইমারে তাঁর ক্রানাক প্রেস থেকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন—ম্যালোল, গ্যেয়র্গে গ্রসৎ, এরিক গীল, আঁদ্রে জিদ, ফন হফমানস্তাল ও পোল ভালেরির রচনা। সংবন্ধ হৃদ্যতা থাকা সত্ত্বেও যেসব বরেণ্য লেখক ও মনীষীদের কোনো রচনা তিনি প্রকাশ করেন নি তাঁদের মধ্যে আছেন—বার্নার্ড শ, জঁা ককতো, বেরটোল্ড ব্রেশ্‌ট, হপ্টমান, ডিয়াঘীলেফ, ও আইনস্টাইন। মানসিক দিক থেকে কেসলার ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবনার অধিকারী। যে জন্য তিনি যেমন অপছন্দ করতেন উলহেলম-মিনিয়ন রাজতন্ত্র—তেমনি সপ্রশংস ছিলেন রিপাবলিকানদের বৈপ্লবিক কাজকর্মে ও ভাবনায়। নাৎসীদের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল সে যুগে। ফলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশ ত্যাগ ক'রে পারী চলে এলেন পরবাসে জীবন যাপন করার জন্য এবং এখানেই সত্তর বৎসর বয়সে এই বিত্তশালী অথচ ঝকঝকে বুদ্ধিমান সুরুচিসম্পন্ন মানুষটি মারা গেলেন।

কেসলারের মৃত্যুর এতদিন পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল তাঁর সযত্ন

লিখিত বত্রিশ খণ্ডে চামড়ায় বাঁধানো নোটবুক। তাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন বিশ দশকের দীপ্রমান য়ুরোপীয় প্রত্যেক প্রতিভার কথা—রাজনৈতিক উত্থানপতন ও সর্বনাশের কথা। এই ডায়েরি সমকালীন সাহিত্য বা রাজনীতি দুয়েরই পঠন-পাঠনের পক্ষে এক অমূল্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছে। ডায়েরির অনেক অংশ ইংরিজিতেও সম্ভবত অনুবাদিত হয় নি। যে সব অংশ ইংরিজিতে আমি পেয়েছি এবং যেসব অংশ আমাদের জ্ঞানসীমার অন্তর্গত বলে আমার মনে হয়েছে শুধুমাত্র সেইসব অংশেরই অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল।

যেহেতু এই ডায়েরির পশ্চাৎপট সমকালীন জর্মনির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সেহেতু বিশ শতকের প্রথম দুই তিন দশকের জর্মন রাজনীতি ও সাহিত্যের ইতিহাস এরই সঙ্গে যুক্ত কবার প্রয়াশ পেয়েছি যাতে কেসলারের কোনো অনুভূতিই অপ্রাসঙ্গিক বা সূত্রচ্ছিন্ন মনে না হয়। ডায়েরীর যে বৃহৎ অংশ এখানে অনুবাদ করা হয় নি সেখানে রাজনীতির অনেক চমকপ্রদ উত্থান পতনের অন্তরঙ্গ ইতিবৃত্ত রয়েছে—যা বাঙলা ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হ'লে অন্তত পাঠসুখের কারণ হ'তো।

৯১৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কাইজার উইলহেলম্-এর পরিচালনায় জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে। ১৯১৮-তে চার বছরের যুদ্ধে বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রায় সব উপনিবেশ হারিয়ে জর্মনি মিত্রশক্তির হাতে নিশ্চিতভাবে পরাজিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জর্মনির রিপাব্লিক (হ্বাইমার রিপাব্লিক) ঘোষিত হ'ল। তখন থেকে পরবর্তি ১৪ বছর পর্যন্ত জর্মনরা অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যই কাটিয়েছে। অর্থ-নৈতিক অবস্তা ভগ্নপ্রায়, সরকার অস্থায়ী এবং জনসাধারণ জীবন কাটাচ্ছিল এক যুদ্ধোপরাধের মানসিক কালো মেঘের ছায়ায়। এডলফ হিটলার চেষ্টা করলেন ক্ষমতা অধিগ্রহণ করার—যার নাম ইতিহাসে মিউনিকের "বীয়র হাউস পুট্‌শ্চ" নামে বিখ্যাত। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যার্থ হলেও, হিটলার ক্রমাগত ক্ষমতা লাভ করতে লাগলেন এবং অবশেষে সরকারের নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জর্মনির পুরোপুরি ক্ষমতা অধিগ্রহণ করলেন চ্যানচেলর হিসেবে। তারপরই ক্ষমতাসীন হ'য়েই তিনি হ্বাইমার রিপাব্লিক ভেঙ্গে দিলেন এবং নিজে ডিকটেটর হিসেবে থার্ড রেইখ স্থাপন করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিলো যে ভার্সাঈ চুক্তিতে তা ভেঙ্গে দিলেন, জাতিগত বিশুদ্ধতার জন্য

প্রচার শুরু করলেন—আর্যদের পক্ষে ও সিমিটিকদের বিপক্ষে। ১৯৩৭-এ অস্ট্রিয়া ,' ৩৮-এ চেকস্লোভাকিয়া জর্মনির সঙ্গে সংযুক্ত করে পরের বছর পোলাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে সুরু করলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এমনি করেই ঘটে চলল জর্মনিতে।

কাব্য সাহিত্যের পশ্চাৎপট : যেমন উনবিংশ শতকে তেমনি বিংশ শতকেও জর্মান সাহিত্য মূলতঃ ফরাসী সাহিত্যের অনুরূপ ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রকৃতিবাদের দিন শেষ হ'য়ে আরম্ভ হয়েছে বাস্তবতাবাদ ও নব্যরোমান্টিকতার ধারায় সাহিত্য সৃষ্টির যুগ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিছু সংখ্যক স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ কবিতা ও বাস্তবমুখীন নাটক ও উপন্যাসের জন্ম দিয়েছিল। এই সাহিত্য প্রচেষ্টার অধিকাংশই অবশ্য ক্ষণজীবী কিন্তু এসবের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। হিটলারের সর্বগ্রাসী শাসনতন্ত্র বস্তুত জর্মনির সব নান্দনিক ও দার্শনিক সৃষ্টির অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক, লেখক ও দার্শনিক স্বদেশ ত্যাগ ক'রে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে আত্মগোপন করলেন , যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন—ফ্রান্সৎ ভের্‌ফেল, এরিক রেমার্কে (ক্রামের), টোমাস মান এবং এলবার্ট আইনষ্টেইন।

বিংশ শতকের প্রথমদিকে গীতিকবিতার পুনর্জন্ম ঘটল। প্রকৃতিবাদ বিষয়ক কবিতা থেকে বিষয়ান্তর হ'ল প্রতীকবাদে এবং অভিব্যক্তিবাদে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর কবিতা হয়ে উঠেছিল ক্রমশ শান্ত, গভীরতর ও অধিকভাবে আধ্যাত্মিক। এই শতাব্দীর প্রধান কবিদের মধ্যে আছেন : রিচার্ড দেহ্‌মেল (১৮৬৩-১৯২০)—যিনি প্রকৃতপক্ষে নীৎসের একজন অনুগামী, যাঁর কবিতার প্রধান তিনটি বিষয় হচ্ছে—যৌনজীবন, পরাজাগতিক জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের যোগ, এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ।

স্টেফান গেয়র্গে (১৮৬৮-১৯৩৩)—চরিত্রগত ভাবে একজন অভিজাত। কাব্যচেতনার দেহ্‌মেল-এর ঠিক বিপরীত মেরুবাসী। তাঁর কবিতা প্রকৃতপক্ষে হিমেল, পরিমিত, রহস্যময়, নৈর্ব্যক্তিক এবং নব্যধ্রুপদী। তিনি প্রচার করেছেন কাব্যে—নৈতিক আদর্শবাদ, সৌন্দর্য, পরম সত্য আলোক এবং সহজিয়া মতাদর্শ।

হুগো ফন হফমানস্তাল (১৮৭৪-১৯২৯)—জাতিগতভাবে অষ্ট্রিয়ান। জর্মন প্রতীকবাদের হোতাদের মধ্যে অন্যতম। যদিও গোেয়র্গের কাছে অনেকাংশে ঋণী তথাপি তাঁর কবিতা অনেক বেশি উত্তাপিত এবং অনেক সহজেই অনুধাবন-যোগ্য। হয়ত বা তিনি বিচার্ড ষ্ট্রোসের নাটকের সংলাপ রচয়িতা হিসেবে অনেক বেশি পরিচিত। স্ট্রোসের প্রায় সব নাটকেরই সংলাপ অংশ তাঁরই রচিত।

রাইনের মারিয়া রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬)—ইনি প্রাগ শহরে জন্মেছিলেন। কবি হিসেবে স্টেফান গোেয়র্গে, শার্ল বোদলেয়ার এবং রুশীয় উপন্যাসকারদের অনুগামী। গোেয়র্গের থেকে অনেক বেশি দরিদ্র মানুষ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি আস্থাবান। বস্তুত কবিতায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নিরত।

কবিরা ভিন্ন উপন্যাস ও নাটকে এই সময় যাঁরা প্রখ্যাত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে—রিকার্ডা হাক্, হেরমান স্টের, হাইনরিশ মান, হানস গ্রীম, হেরমান হেসে, ফ্রানৎস কাফ্‌কা, আর্নষ্ট ভিচার্ট, এরিখ মারিয়া রেমার্কে, ইযাকব ভাসেরমান, টোমাস মান, ফ্রানৎস হেবরফেল ইত্যাদি।]

১ বের্লিন, জানুয়ারী ২৮, ১৯১৯

আজকে মধ্যাহ্নভোজে ভাইলাণ্ড হের্জফেল্ড-এর কাছে শুনলাম তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যার কথা। কাগজের নাম এভরিম্যান হিজ ওন ফুটবল। গোেয়র্গে গ্রৎস ছবি আঁকবেন। প্রথম সংখ্যা—সুন্দর অশ্বশকট ও মোটরগাড়ীর ভ্রমণরত সৈনিক ও ছাত্রদের মধ্যে হকারদের দিয়ে বিলি করা হবে। খানিকটা অদ্ভুত ও খানিকটা গভীর। পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ হবেন গোেয়র্গে গ্রৎস। তিনি একটা সিরিজ ছবির পরিকল্পনাও করেছেন 'সুদর্শন জর্মান পুরুষকুল' নামে। হের্জফেল্ড-এর বর্ণনায় তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য "এতকাল যা কিছু জর্মনরা নিজেদের প্রিয়তম ব'লে জ্ঞান করেছেন সেই সবকিছু ধূলায় লুণ্ঠিত ক'রে দিতে হবে।" অন্যভাবে বলা যায় একটু খোলা হাওয়ার দমক লাগিয়ে দেওয়া আর সব গৃহীত আদর্শকে নাড়া দেওয়া। যেহেতু তিনি বিদেশনীতি বিষয়ে তেমন ওয়াকিবহাল নন তাই খানিকটা নির্দেশ চেয়েছিলেন। আমি যখন একটা মোটামুটি চেহারা

বর্ণনা করলাম তখন মনে হল সে সব কথা তাঁর কাছে গ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বুদ্ধিবৃত্তিকে সচল রাখার জন্য আবিস্তফেনিসের কর্মকৌশল। রীয়র হাউস বুদ্ধিজীবীদের যেমন, তেমনি ঘুণে ধরা ঐতিহ্য, মহৎ মানবতার অস্পর্শনীয় ব্যাপ্তি, অলঙ্ঘনীয় মূর্খতা ও জড়ত্ব—পুরনোদের এমনকি, র‍্যাডিক্যালদের পর্যন্ত শত্রু হ'য়ে উঠবে। 'নাকে কার্ল মার্ক্স'—নামক তাঁর নিবন্ধ তো কেবল সূচনা। হয়তো বা কিছুটা ছেলেমানুষীও আছে তবু এই কাগজ এক অচলায়তন ভাঙার হাওয়া প্রবাহিত করবে ব'লে মনে হয়।

২ ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯১৯

গ্যেয়র্গে গ্রৎস এর বিশাল রাজনৈতিক চিত্র—'জর্মনি এক শীতকালীন গল্প' দেখতে গিয়েছিলাম। এ চিত্রে তিনি পূর্বতন শাসকশ্রেণীকে ব্যঙ্গ করেছেন যেন বুর্জোয়া সমাজের অতিভোজী ঘৃণ্য জীবদের সহযোগী হিসেবে। তিনি যেন জর্মন হোগার্থ, সচেতনভাবে সোচ্চার ও নীতিবাগীশ—বলতে চান দীক্ষিত, উন্নত ও পরিবর্তিত। বিমূর্ত শিল্পের প্রতি তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। তাঁর বাসনা এই চিত্রটি স্কুলগুলোর দেয়ালে শোভা পাক। আমার অভিমত প্রকাশ করলাম এই ব'লে—সম্ভবত শিল্পীর পক্ষে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ না করেও, হয়তো আরো ভালোভাবে, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারে যা তিনি করতে চান। এই প্রচার কার্যের জন্য হয়তো বা শিল্প বেশ কিছুটা অতিরিক্ত মূল্যবান মাধ্যম। যদিও এমন কিছু কিছু জটিল নৈতিক অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব যা কেবলমাত্র কোনো শিল্পসম্মত মাধ্যমেই অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। গ্রৎস তারপর তাঁর মত ব্যক্ত করলেন এই বলে—সব শিল্পই বস্তুত অবাস্তব, এক রকমের অসুস্থতা। শিল্পী একজন ভূতেপাওয়া, বাতিকগ্রস্থ মানুষ। শিল্পের কোনো প্রয়োজন এই ভূমগুলের নেই। শিল্প ছাড়াও মানুষ জীবন ধারণ করতে পারবে।

বস্তুত গ্রৎস শিল্পের ক্ষেত্রে একজন বলশেভিক। চিরাচরিত চিত্রশিল্পের প্রতি, আজ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যহীনতার প্রতি তাঁর ঘৃণা অপরিমেয়। তিনি যেন কোনো কিছু একেবারে নূতন, ঠিক ভাবে বললে, এমন কিছু চিত্রশিল্প, যা একদা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলো (যেমন হোগার্থের

ধর্মীয় চিত্রমালা) অথচ যা গত উনিশ শতকেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে—তেমন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি একধারে প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লবী ' এই বর্তমান সময়ের এক প্রতীক।

৩ মার্চ ১৬, ১৯১৯

আমি যে চিত্রটি ক্রয় করেছিলাম তার মূল্য দিতেই গিয়েছিলাম গোয়র্গে গ্রস-এর গৃহে। আমাকে বসতে বলে তিনি ষ্টুডিওর ভেতরে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর এক বন্ধু যিনি গত রাতে তাঁর ওখানেই ছিলেন তিনিও চলে গেলেন। মনে হয় পলায়নপর কোনো কমিউনিস্ট বন্ধু।

গ্রস বললেন অনেক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা—এমন কী আইনস্টেইন পর্যন্ত এক আবাস থেকে অন্য আবাসে পলায়নপর। যদিও তিনি নিজে এখন আবার কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। এমন কী তিনি আর এক সংখ্যা 'প্লেইৎ' (দেউলিয়া) পত্রিকাটি প্রকাশের তোড়জোড় করছেন। যাতে আরো গভীরতর ব্যাঙ্গ চিত্র অধিক সংখ্যায় দেবেন। গত কয়েকদিনের এমন কিছু ঘটনা তিনি বর্ণনা করলেন যা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। গোঁড়া স্পার্টাসিষ্টরা[১] এক অবিশ্বাস্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করছে। এইসব ঘটনা থেকে এই কর্মীদের সম্পর্কে তাঁর মনে এক নবতম ভাবনার জন্ম হয়েছে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই এদের দলের দ্বিতীয় সারিতে সামিল হ'তে হবে। যে ঘটনাটি সবচেয়ে তাঁর মনে রেখাপাত করেছে তা হচ্ছে—ইডেন হোটেল এলাকার একজন লেপ্‌টেন্যান্টকে যখন একজন সৈনিক সামান্য কর্কশভাবে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলো তখন সে সৈনিকটিকে গুলি ক'রে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। সৈনিকটির সঙ্গীরা দুঃখে ও ক্ষোভে কেবল চোখের জলই ফেলেছিলো। গ্রস স্পার্টাকাস দলের মতাবলম্বী হ'য়ে গেলেন। কোনো ধারণা-ভাবনার জন্য এমন কি হিংস্রতারও প্রয়োজন। বুর্জোয়া প্রতি-বোধের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ করার অন্যকোনো পদ্ধতি আর নেই। আমি প্রতিবাদ করলাম। যে কোনো ধ্যানধারণাই হীনতাপ্রাপ্তি হয় যদি তা অভিসিক্ত হয় হিংসার দ্বারা। তাঁর মতে আস্থাহীনতা ও রক্তের ছোপ লাগালে এই

[১] ১৯১৮ সালের চরমপন্থী বিপ্লবী জর্মান স্পার্টাকাস দল।

সরকার আর বেশিদিন চলতে পারবে না। কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে কমিউনিষ্টদের মধ্যে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না যিনি শাসনবিদ হ'তে পারেন। কমিউনিষ্ট পার্টিতে কেবলমাত্র রোজা লুক্সেমবর্গই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সম্ভবত জর্মনির শাসক হ'তে সমর্থ।

৪ মার্চ ১৬, ১৯১৯

ডোবলার নামক একজন কবির সঙ্গে গিয়েছিলাম আইনবিদ ভেরথোর-এর কাছে উইলাণ্ড হেরৎফেল্ড এর মামলাটা নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে। হেরৎফেল্ড ৭ই মার্চ বন্দী হয়েছে—মোযাবিট থেকে তাকে প্লোয়েৎজেনসি কয়েদখানায় নিয়ে গেছে। গেয়র্গে গ্রৎস এর সৈনিকদের হাতে তাঁর গৃহেই ধরা পড়ার কথা। তিনি আসলে অন্য একজনের পরিচয়পত্র প্রদর্শন ক'রে পালিয়ে যান। সেই থেকে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আজ রাতে এখানে কাল আবার অন্যখানে—যেমন আমি করেছিলাম ওযরশতে এখনো সেই ২৪ জন ফোক্স্মারিন বিভাগের নাবিকদের গুলি ক'রে হত্যার দৃশ্য ভুলতে পারি না। ওরা গিয়েছিলো ওদের মাসকাবারি মাইনে আনতে অথচ উঠোনেই ওদের উপর সামনে থেকে গুলি করা হ'লো। গৃহযুদ্ধ এর চেয়ে বীভৎস অন্য কোনো অপরাধ তো আমি মনে করতে পারি না। সন্ধ্যাবেলা ম্যাকস রেইনহার্ট এর এস য্ লাইক ইট দেখতে গিয়ে বসেছিলাম কিন্তু মানসিক অবস্থা তেমন ছিলো না ব'লে আর ব'সে থাকা গেল না। আজকের বের্লিনে এই যে অসংখ্য হত্যা ও সরকারী জল্লাদদের দৌরাত্ম্য যা নৈমিত্তিক হ'য়ে উঠছে তা' আর কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

আজ গ্রৎস-এর চিঠি পেলাম। লিখেছেন "যেহেতু এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধায় রয়েছি তাই আপনি কি দয়া করে জানাবেন, যে ছবিটি আপনি নেবেন ব'লে স্থির করেছেন তার বিনিময়ে কিছু অর্থ আমি পাবার আশা করতে পারি।" চিঠির ঠিকানা তাঁর স্টুডিও। ফলে মনে হয় তিনি আবার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আমি একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানালাম আমি রবিবার বারোটা থেকে একটার মধ্যে তাঁর ওখানে যাবো এবং ব্যাপারটা মিটিয়ে আসবো।

৫ হ্বাইমার, ১৩ মে ১৯২০

ফ্রাউ ফোরস্টের-নীৎসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দাবী করলেন —তিনি একজন জাতীয়তাবাদী—অর্থাৎ রাজতন্ত্রবাদী। এবং তাঁর ভ্রাতা নিজেকে জর্মন বলেই মানতে রাজি নন—নিজেকে মনে করেন পোল। এইসব কাউন্টেস ও মহামহিমদের দেখে তাঁর মাথাটা একেবারে ঘুরে গেছে।

৬. ১০-১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২১

একটি প্যাসিফিস্ট দলের প্রতিভূ হিসেবে আমাকে এলবার্ট আইনস্টেইনের সঙ্গে আমস্টারডম যেতে বলা হয়েছে। সেখানে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে পাবীর পুনর্গঠনের কাজ বিষয়ে আলোচনা করতে। এই বিষয়টিব পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন এডুয়ার্ড বার্নস্টেইন, হ্বালথের রাথেনো ইত্যাদি ।

আজ খুব ভোরে বেনথেম-এর কাছে সীমান্ত পার হলাম। মনে হ'লো যেন জীবনে প্রথম একটা ঘুমবার সুব্যবস্থা আছে এমনি শকটে চেপেছেন আইনস্টেইন। সব কিছুই দেখে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে উঠছিলেন। পথে আমি তাকে জিগ্‌গেস করলাম—তাঁর থিযরী অব রিলেটিভিটির জ্যোতির্বিদ্যা সম্ভূত অনুমিতি কি জ্যোতির্বিদ্যাবিধেয় গঠিত অণুর সম্পর্কেও মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য হ'তে পাবে? আইনস্টেইন বললেন—না, তা সম্ভব নয়। কারণ অণুর আয়তন ও সূক্ষ্মতাই এখানে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। বললাম—তবে আয়তন ও পরিমাপ – বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব—একটাকে অবশ্যই সত্য হ'তে হবে—হয়তবা এই হবে একমাত্র সত্যের নিদর্শন। আইনস্টেইনও স্বীকার করলেন—আয়তন হচ্ছে সব সত্যের শেষতম যার থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই। এই বিষয়টির আরো বিশ্লেষণ হওয়া উচিত—কারণ পদার্থ বিদ্যার গভীরতম রহস্যই হচ্ছে—আয়তনের ব্যাখ্যাহীনতা ও দূরত্ব। একটি লৌহ অণু অন্য একটি লৌহ অণুর সমপরিমাপের—তা বিশ্বের যেখানেই তার অস্তিত্ব থাকুক না কেন। তথাপি মানুষ সেটা নানা পরিমাপের অণুব কল্পনা করতেও সমর্থ।

ঠাট্টা ক'রে বললাম, তবে তো মানুষ ঈশ্বরের তুলনায় অধিক চতুর ব'লে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্পর্কে এটাই নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে তাঁর

মধ্যে মানবিক চাতুর্যের অভাব রয়েছে। মানুষ তার অপরিসীম জটিল কল্পনা ও চাতুর্য নিয়ে ঈশ্বরের উপর আস্থাশীল হয়েছে—যেন মুক্তোটা রয়েছে ঝিনুকের ভেতর। ঈশ্বর বস্তুত এতোই প্রাচীন যে তাঁর পক্ষে কোনোরূপ চাতুর্যেরই আর প্রয়োজন নেই। আইনস্টেইন বললেন, অপরপক্ষে, প্রকৃতির ভেতর যত বেশি একজন অন্তর্লীন হ'তে পারবেন ততো বেশি তাঁর ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য জন্মাবে।

৭. বের্লিন, মার্চ ১০, ১৯২১

আইনস্টেইনদের সঙ্গে নৈশভোজ। বেশ মনোরম এপার্টমেণ্ট—প্রভূত ও রাজসিক খাদ্যের আয়োজন। নৈশভোজের আনুষ্ঠানিকতা যেন এই অমায়িক শিশুসুলভ দম্পতিকে এক সাবল্যে ঘিরে রেখেছিল। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন —বিত্তবান শিল্পপতি কোপেল, আমানতব্যবসায়ী মেনডেলশন ও হ্লারবুর্গ, (যথারীতি আলুথালু বেশে) পুরনো উপনিবেশিক মন্ত্রীসভার ডার্নবুর্গ। ... আমি আইনস্টেইন ও তাঁর পত্নীর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার সময় থেকে তাঁদের দেখি নি। জিগগেস করলাম—মার্কিনমুলুক ও ইংলণ্ডে তাঁদের কেমন অভ্যর্থনা দেওয়া হ'ল। উত্তরে বললেন—প্রায় একটা বিজয়উৎসবের মতো। যদিও আইনস্টেইন এইসব ব্যাপারে কণ্ঠে একটু ব্যঙ্গ ও দ্বিধা প্রকাশ করলেন, তিনি নিজে অনুধাবন করতে পারছেন না কেন মানুষ তাঁর থিয়োরী-বিষয়ে এতটা উৎসাহী, তাঁর স্ত্রী বললেন—তিনি নাকি প্রায়ই বলেন, নিজেকে তাঁর প্রতারক ব'লে মনে হয়, মনে হয়, বিশ্বাস-হন্তা। যেন মানুষ যা তাঁর কাছে চেয়েছিল তা তিনি তাদের দিতে পারেন নি। খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্যারী যাবেন, তারপর হেমন্তে টোকিও এবং পিকীং-এ বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণও রয়েছে। তিনি নাকি তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন—যতদিন এই মজার খেলা চলবে ততদিন হয়ত প্রাচ্যের কিছুটা দেখার সুযোগ মিলবে।

অন্য সবাই বিদায় নেবার পর তিনি ও তাঁর পত্নী আমাকে একটু অপেক্ষা ক'রে যেতে বললেন। আমরা একটা কোনায় ব'সে আড্ডা জমালাম। আড্ডায় ক্রমশ আলোচনা তাঁর তত্ত্ব-ঘেঁষা হ'য়ে উঠলে আমি জানালাম তাঁর তত্ত্বটি পুরোপুরি অনুধাবন না করতে পারলেও কিছু একটা ধারণা করতে পারি। হেসে

বললেন, আসলে এগুলো খুবই সহজ এবং তিনি এর এমন ব্যাখ্যা দিতে পারেন যা আমার পক্ষে বোধগম্য হবে। আমাকে কল্পনা করতে হবে আমাদের সামনে একটা টেবলে একটা কাঁচের গোলক রয়েছে যার ঠিক মাঝখানে একটা আলো রাখা আছে। গোলকটির ওপরের অংশে কী দেখা যাবে—দেখা যাবে চ্যাপটা কয়েকটা রেখা অর্থাৎ দুইতল বিশিষ্ট রেখা বলয়। এই পর্যন্ত সহজ। গোলকটি দুইতল, অসীম তথা সসীম তলবিশিষ্ট। এখন কল্পনা করুন টেবলের উপর গোলকের রেখা-বলয়গুলো ভেতরের আলোর প্রভাবে যে সব ছায়া ফেলছে, ছায়াগুলো এবং টেবলের উপরে সবদিকে তার বিস্তৃতি প্রকৃতপক্ষে অসীম অথচ সসীম ধারণা, অর্থাৎ ছায়ার সংখ্যা অথবা ছায়ার অংশগুলো যা টেবলের উপর প্রলম্বিত হ'য়ে আছে তা নির্ধারণ করা যাবে রেখা বলয়ের সংখ্যাদ্বারা এবং যেহেতু রেখা বলয়ের সংখ্যা সীমিত সেইহেতু ছায়ার সংখ্যাও সীমিত। এখানে আমাদের ধারণায় এমন একটি তল পাওয়া গেল যা অসীম হওয়া সত্ত্বেও সসীম। এখন কল্পনা করা যাক, চ্যাপটা দুই তল বিশিষ্ট রেখা-বলয় এর স্থানে এমন একটি কাঁচের গোলক যা ত্রিতল বিশিষ্ট এককেন্দ্রিক এবং পুনরায় ওই ছায়া বিস্তারের ঘটনাটা কল্পন। এবং তখনি পাবেন, অসীম অথচ সসীম তল-এর ধারণা অর্থাৎ দুই তলের পরিবর্তে ত্রিতল বিশিষ্ট স্থান। আইনস্টেইন বললেন, আসলে এই ধারণাটা হচ্ছে তাঁর তত্ত্বের একটা ছবিমাত্র, তত্ত্বের অর্থ নয়। তত্ত্বের অর্থ নিহীত রয়েছে বস্তু, তল ও কালের পারস্পারিক সম্পর্কের মধ্যে। এর কোনেটির মধ্যে কোনো একটির একক অস্তিত্ব নেই, অন্য দুটির সম্পর্কেই এর অস্তিত্ব। বস্তু, তল ও কালের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই কেবলমাত্র রিলেটিভিটি তত্ত্বের নবসংযোজিত অংশমাত্র। তাই তিনি এখনও বুঝতে পারেন না কেন এই তত্ত্ব মানুষের মনে এতো উত্তেজনার সঞ্চার করেছে। যখন কোপারনিকাস প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী সব সৃষ্টির মধ্যস্থলে নেই তখন তাঁর আবিষ্কার যে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলো তার কারণ বোধগম্য হয়। এই আবিষ্কার নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পর্কে সমস্ত প্রচল ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু আইনস্টেইনের তত্ত্ব সে হিসেবে মানুষের নিজের সম্পর্কের ধারণার কতটুকু পরিবর্তন ঘটাবে। পৃথিবীর সম্পর্কে যে কোনো ধারণা, যে কোনো দর্শন, এই তত্ত্বের সঙ্গে সহজেই পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এমন কি একজন আদর্শবাদী থাকেন আদর্শবাদী হয়েই,

যেমন বস্তুতান্ত্রিক থাকবেন বস্তুতান্ত্রিক অথবা প্র্যাগমাটিস্ট থাকবেন প্র্যাগমাটিস্ট।

৮ ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

রবি ভোলমোয়েলার, এখনো তেমনি মজাদার, পাগলাটে ও তীক্ষ্ণধী রয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন কবি দানানৎজিও'র মুসোলিনি সম্পর্কে কী ধারণা। দানানৎজিও বিশ্বাস করেন যে মুসোলিনি তাঁকে হত্যা করাবার জন্য নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এমন কী যে স্ত্রীলোকটি দানানৎজিওকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলো সেও মুসোলিনির দ্বারাই প্রেরিত হয়েছিলো তাঁকে খতম করার জন্য।

৯. স্বাইমার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

আজ সন্ধ্যায় আমি যখন ফ্রাউ কোযেরস্টার নীটসের সঙ্গে দেখা করতে যাই—তখন আমাকে দেখে উত্তেজনায় টগ্‌বগ ক'রে বললেন তাঁর সঙ্গে মুসোলিনির বন্ধুভাব কথা। আমি বললাম, আমি শুনেছি এবং শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছি। বিশেষত তাঁর ভ্রাতার কথা ভেবে। মুসোলিনি সমস্ত যুরোপের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি। যে যুরোপ, তাঁর ভ্রাতার কল্পনায় সমস্ত 'সাধু যুরোপবাসীর' জন্য। বেচারি বৃদ্ধা একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লেন কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে বিষয়ান্তরে এলেন আলাপচারিতা স্বাভাবিক করবার জন্য। তিনি প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই, এবং চেহারায় তা বেশ লক্ষ্যণীয় হ'য়ে উঠেছে।

১০. ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

আইনস্টেইনরা আমার সঙ্গে নৈশভোজে এলেন। ফ্রাউ আইনস্টেইন জানালেন যে তাঁর স্বামী শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিদেশমন্ত্রক দপ্তর থেকে তাঁর দুটো স্বর্ণপদক নিয়ে এসেছেন—যে দুটো তাঁকে দিয়েছিলো রয়েল সোসাইটি এবং জ্যোতির্বিদ সমাজ। পরে যখন তিনি তাঁকে জিগ্‌গেস করলেন, পদকদুটো কেমন দেখতে তখন দেখলেন আইনস্টেইন ওগুলোর মোরক পর্যন্ত খুলে দেখেন নি। এইসব সামান্য ব্যাপারে মনোনিবেশ করবার মতো সময় তাঁর নেই। আকাদেমির গত সভায় যখন একজন তাঁকে বললেন যে তিনি তাঁর পদকগুলো গলায় ঝোলান নি—হয়তো বা তাঁর পত্নী তাঁকে ওগুলো দিতেই ভুলে গিয়েছেন,

শুনে আইনস্টেইন প্রবল প্রতিবাদে জানালেন, "না না ভুলে যান নি। আমিই পড়তে চাই নি।"

১১ পারী, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

হতভাগ্য ইসাডোরা ডানকান গতকাল মারা গেছে। তাঁর শালের একপ্রান্ত একটা গাড়ীর পেছনের চাকায় আটকে যায়--অন্য প্রান্তটা তাঁর গলায় জড়ানো ছিলো, ফাঁস লেগে মারা গেছে ইসাডোরা। কী নির্মম ভাগ্য! যে শাল তাঁর নৃত্যের অন্যতম উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হ'তো এতকাল তাই তার জীবন-হানির কারণ হ'ল। যেন নৃত্যমঞ্চের এই উপকরণ তাঁর উপর এক নির্মম প্রতিশোধ নিল সুযোগ পেয়ে। ইসাডোরার জীবনটাই ঘিরে ছিল নানা বেদনা। তাঁর ছোট ছোট দুটি শিশু মারা গেছে মটোর দুর্ঘটনায়। তাঁর স্বামী ইসেনীন আত্মহত্যা করেছিলেন। এবং এখন যা তাঁর শিল্পকীর্তির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাই কারণ হলো তাঁর অপঘাত মৃত্যুর। তাঁর শিশু সন্তানদের মৃত্যুর আগের দিন আমি বার্শিয়ান ব্যালের তাঁরই নির্দিষ্ট আসনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে পরের দিন মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল তাঁর সন্তানদের নৃত্য দেখাবেন। কিন্তু আমি সময়াভাবে যেতে পারি নি। সব সময় আমার মনে হয় যদি সেদিন আমি মধ্যাহ্নভোজনে যেতে সক্ষম হতাম তবে হয়তো বা ঐ দুই শিশুর মৃত্যু হ'তো না। হায় ইসাডোরা। তাঁর প্রথম জীবনের নৃত্য বিষয়ে আমার তেমন একটা বিশেষ উঁচু ধারণা ছিল না। তখন তিনি ছিলেন কেমন যেন আগোছালো, পেশাদার, এবং অমার্জিত। কিন্তু পরে তিনি গোর্ডোন ক্রেইগ এর কাছে অনেক কিছু শিখেছেন। এবং তিনি আমাকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেছেন তাঁর নৃত্য দেখতে। আমি আমার বিষয় জানালে তিনি মার্কিনী-ঘেঁষা ফরাসীতে বলতেন—'আপনি যখন আগে আমার নাচ দেখেছেন তখনও আমার নৃত্যের কলাকৌশল তেমন ক'রে রপ্ত হয় নি, বস্তুত আমি সত্যিকারের নাচ বিষয়ে কিছুই প্রায় জানতাম না, কিন্তু এখন '।

আমি তাঁকে প্রথম বের্লিনে দেখি। শহরে তখন অবিরাম তুষারপাত চলছিল। রাস্তাঘাট কাদা প্যাচপেচে। আমি প্রথম তাঁকে দেখলাম একটা হলঘরে—আমি ঢুকছি তিনি বেরুচ্ছেন। চওড়া লালচে রংয়ের ভূমিচুম্বিত

আলথাল্লা আর তারপর পাদুকাবিহীন দু পা—যদিও দু পায়ে ছিলো গালোশ ; সেখানে দাঁড়িয়ে পা থেকে গালোশ জোড়া খুলে নিলেন এবং আমার বিস্মিত চোখের সামনেই খালিপায়ে প্রবেশ করলেন সালোঁতে। কাউন্টেস হারাক তখনকার দিনের বের্লিন রাজসভায় সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা এবং স্বয়ং আভিজাত্যবিলাসিনী সম্রাজ্ঞীর সখী। সেই কাউন্টেস হারাক হচ্ছেন সালোঁর অধিকর্ত্রী। আর ইসাডোরা তাঁরই নয়নের মণি। সম্রাজ্ঞীকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো—কোনো মহিলা যদি খালি পায় বিচরণ করেন তবে কি তা অনৈতিক ব'লে বিবেচিত হবে। সম্রাজ্ঞীর পরিচারিকা তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন অভয়-বাণীতে। (এ ঘটনাটি আমি অন্যদিন পরিচারিকার মুখেই শুনি।) এই ঘটনা থেকেই ইসাডোরার সমর্থনে এক খ্রীষ্টিয় মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছিল। ইসাডোরার এই রবরবা বেশ কিছুদিন চললো। যতদিন না পর্যন্ত একথা অগ্রাহ্য করা গিয়েছিল—এই অক্ষতযোনি ইসাডোরা খুব শিগগিরি একটি সন্তান লাভ করবেন। সেই মুহূর্তে এই মহিলা সমিতি ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল, আর ইসাডোরা হঠাৎ একদিন বের্লিন ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

হায় ইসাডোরা, সারা জীবনে তুমি যা কিছু প্রথাসিদ্ধ, যা কিছু বিশ্বাসঘাতী-নীয়, অনেক প্রযত্ন সত্ত্বেও কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হ'লে। চেষ্টা করেছিলে ক্ষুদ্র নীতিবাগীশ মার্কিনতাকে তোমার শিল্প থেকে বাদ দিতে—মুক্ত প্রেমে আস্থা রেখে, এমন কি নিজের সন্তানের জনক নিজেই বেছে নিয়ে। অথচ তিনি ছিলেন, এতৎসত্ত্বেও সত্যিকারের একজন শিল্পী। এবং তাঁর শিল্প ও বেদনা-ব্যর্থতা ছিলো তাঁর ক্যালিফোর্নিয়ার মফঃস্বল শহরে মানুষ হ'য়ে তাঁরই চরিত্রের অঙ্গ। যে নৃত্য আজ আমরা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত বলে স্বীকার করেছি এবং এমন কি রাশিয়ান ব্যালে পর্যন্ত—সম্ভবত এই পর্যায়ে পৌঁছুতে পারতো না ইসাডোরা না থাকলে। এই সব কিছুই পরিবর্তিত হয়েছিল তাঁরই দ্বারা।

১২. পারী, সেপ্টেম্বর ৬, ১৯২৮

গিয়েছিলাম পোল ভালেরির কাছে—আমার জন্য ভজিলের গেয় গীকস্ অনুবাদ করার অনুরোধ করতে। ভালেরি, সযত্নে সিঁথি কাটা রুপোলী চুল, সম্ভ্রান্ত কালো পোষাক, সম্মানার্থে পরিহিত নবল গোলাপ—সব নিয়ে ঠিক যেন

একজন অভিজাত রাজপুরুষ। তখন তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন নানা অনুবাদ কর্মে এবং গেয়র্গীক্‌স্‌ অনুবাদে ছিল তাঁর একান্তই অনীহা। বললেন, গ্রাম্য-জীবন বিষয়ে তিনি প্রায় কিছুই জ্ঞাত নন—কেবল জানেন সমুদ্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কথা। এমন কী একদিন মালার্মেকে পর্যন্ত তাঁকে বোঝাতে হয়েছিল—কাকে বলে গোধূম। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মালার্মে তাঁর এক অন্যতম স্মরণীয় বাক্যবন্ধ রচনা করেছিলেন এই প্রসঙ্গে। ভালেরি গেছেন মালার্মের গ্রামের আবাসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—তখন গ্রীষ্মের শেষাশেষি, যখন মাঠে মাঠে সাজানো রয়েছে স্বর্ণবর্ণ গোধূম। দুই কবি মাঠের আলপথে চলছেন—ভালেরি জানতে চাইলেন এইসব ঘাসের নাম। মালার্মে বললেন, "ম্যা, মঁশের, সেৎ দ্যু ব্লে"।[২] ভালেরি হয়তো তখন সেই সোনালি ফসলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন তাঁর নিকট যা অনেক বেশি আকর্ষণীয়, প্যারীর আগামী কনসার্ট সীজনের কথা। মালার্মে বললেন, "C'est le premier coup de cymbales de l'automne"।[৩] ভালেরি অবশ্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আঁদ্রে জিদের কাছে গেয়র্গীক্‌স্‌ অনুবাদের জন্য—কারণ সে চিরদিন চাষবাসে খুবই উৎসাহী।

নিজের রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন—গত পাঁচ বছরে তিনি এমন কিছুই রচনা করেন নি যাতে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল—যা কিছু লিখেছেন সবই কোনো না কোন অনুরোধ সাপেক্ষে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত কেউ তাঁর কোনো রচনার প্রতি মনোযোগ অনুভব করে নি। তারপর তিনি হঠাৎ একদিন হয়ে উঠলেন সকলের আদর্শ - সকলের অভীষ্ট—আর সেই থেকে তিনি নন নিজের নিয়ন্তা। তাঁকে চাটুকারিতার জন্যই বললাম · 'এটাই তো খ্যাতির বিড়ম্বনা।' 'একথা প্রত্যেকে আমাকে বলে আর প্রতিবার আমি প্রতীক্ষা করি পরবর্তী চাটুকারকে আমি গলা টিপে হত্যা করবো।'

ভালেরি সম্পর্কে আমার ধারণা, তিনি একজন পুরানো আমলের অভিজাত দার্শনিক ও বাণিজ্যিক—এগুলো সব তাঁর মধ্যে সমভাবে মিশে গেছে আর তা অলঙ্কৃত করেছে বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্বেষ। মানসিক গঠন ও দূরদৃষ্টি তাঁর অপরিচ্ছন্ন গভীরতার উপর একটা চমৎকার আবরণ সৃষ্টি করেছে। এই আবরণ আসলে বর্ণনসাধ্য নয় এবং সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে ছদ্মবেশী।

২. বন্ধু, এর নাম গোধূম। ৩ এ হচ্ছে বিদায়ী হেমন্তের শেষ ঘণ্টাধ্বনি।

১৩. বের্লিন, ২৯ অক্টোবর

ফার্দিনান্দ ব্রাকনার-এর 'অপরাধী' দেখলাম। বিষয় হ'চ্ছে—আমরা প্রত্যেকে একএকজন অপরাধী অথবা, পক্ষান্তরে কোনো অপরাধীর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা—রুশোর ধারণা অনুযায়ী, অপরাধীর সৃষ্টি করে। তেমন কিছু ভালো হয়েছে তা বলা যায় না। কেবলমাত্র বিশাল মঞ্চকে ছয় ভাগে ভাগ করে ছয়টি দৃশ্যের অবতারণা ও যেভাবে সমকালীনতার বিষয় মঞ্চে উপস্থাপনা করা হয়েছে তা নাটকটিকে সত্যিকারের অভিনবত্ব দিয়েছে। নাটকের এই সমকামীনতা বিষয় অবশ্যই হেইনরিখ মান-এর 'বিবি' নাটকের তুলনায় সোচ্চার অথচ দর্শকরা একবারও কোনো অসন্তোষের কারণ খুঁজে পান নি। যে দৃশ্যটিকে কোনো কিছুই ঢেকেঢুকে নেই, যেমন একটি দৃশ্য যা মহিলাদের নিজস্ব ঘরের মতো ক'রে সজ্জিত, সেখানে একজন মার্জিত চেহারার যুবক বছর ১৬ বয়সের একজন বালককে কোলে বসিয়ে তাকে চুম্বন করছে—তাতেও দর্শকরা কোনো আপত্তিকর কিছু পান নি। দর্শকদের কাছে যেন সব ব্যাপারটা সহজভাবে বোধগম্য—নূতন ক'রে বোঝাব কিছুই নেই। দুইজন রমণীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ, কিংবা একজন পুরুষ ও একজন বালকের মধ্যে সমকাম দৃশ্য যেমন প্রাচীন গ্রীসে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করা হতো তেমনি এরাও গ্রহণ করছেন—যদিও ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত নাটকের ক্ষেত্রেই কেবল সীমাবদ্ধ।

১৪ বের্লিন ২২ জানুয়ারী ১৯২৯

শ্রীমতী হ্যারল্ড নিকলসন, সঙ্গে ভার্জিনিয়া ও লিওনার্ড উল্ফ্, আমার গৃহে চায়ে এসেছিলেন। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ দীর্ঘাঙ্গী, একটু রুক্ষদর্শন, হৃতযৌবন এবং চেহারায় কেমন যেন একটা ক্ষয়িষ্ণুতার ছাপ প্রতীয়মান। অথচ যথার্থ অভিজাত ইংরেজ মহিলাসুলভ মিষ্ট স্বভাব। লিওনার্ড উল্ফ্—অত্যন্ত অসপ্রতিভ, আলাপচারিতার সময় কেঁপেঝেপে অস্থির, চতুর, কল্পনাপ্রবণ মানুষ। আমরা আমার ক্রানাক প্রেসের জন্য শ্রীমতী নিকলসন-কৃত রিল্‌কের অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করলাম। অধ্যাপক-দুহিতা ভার্জিনিয়া উল্ফ্ যথার্থভাবে একজন উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিভূ। এবং শ্রীমতী নিকলসনও যথার্থই একজন ভদ্রমহিলা, সম্ভ্রান্ত, দীর্ঘাঙ্গী ও মেদহীন, সহজসরল স্বভাব যা তাঁর প্রত্যেকটি আচরণে

প্রকাশ পায়। উনি যেন জীবনে কোনোদিন কোনো অবস্থায়ই হতভম্ব হন না অথবা কোনো সামাজিক বেড়া ডিঙাতেও তার অসুবিধা হয় না।

১৫.   বের্লিন, ১৩ এপ্রিল, ১৯২৯

তরুণ ইহুদি মেনুহিন-এর কনসার্ট ছিলো। এই তরুণ ছেলেটি সত্যিই আশ্চর্য। ওর বাজনার মধ্যে যেন ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিভার স্ফুরণ ও শিশুর সারল্যময় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তাঁর অভূতপূর্ব আঙ্গিক কিন্তু স্বাভাবিক-ভাবেই গৌণ হয়ে যায়। একটা আশ্চর্য অনুভূতি হয় তার সঙ্গীতশৈলীর জন্য, যাতে বিন্দুমাত্র অশুদ্ধতা নেই নেই কণামাত্র ভাবপ্রবণতা। পক্ষান্তরে এক অমলিন, গভীর সূক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়। বিটোফেনের "রোমাস ইন এফ ডুর" বাজাল সেদিন—যা আমি ইতিপূর্বে একমাত্র যোসেফ যোটিংকে বাজাতে শুনেছি।

১৬.   বের্লিন ১৫-১৬ জুলাই ১৯২৯

সংবাদপত্রে পড়লুম হুগো ফন হফ্মানসথাল-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রান্সং, নিজেকে গুলি ক'রে আত্মহত্যা করেছে। আমি একটা তার পাঠিয়ে দিলাম। সন্ধ্যায় এরিখ ফন স্ট্রোহেইম এর যুদ্ধের পূর্ববর্তী ভিয়েনা বিষয়ে ছবি 'ওয়েডিং মার্চ' দেখতে গেলাম। ছবিটি একজন প্রতিভাধর ব্যক্তির সৃষ্টি।

পুত্রের পারলৌকিক ক্রিয়ার সময় তাঁর আত্মহননের আঘাতে হফ্মানসথাল মারা গেলেন। আমি সম্পূর্ণ বিমূঢ়। আমাদের এই সময়—আমাদের এই দুঃখময় বন্ধুবর্গ ওয়াল্টার রাথেনো, পোল কাসিরের, ফন হফ্মানসথাল

১৭   ভিয়েনা, ১৮ জুলাই, ১৯২৯

বেচারি হুগোর অন্ত্যেষ্টির জন্য খুব ভোরে এখানে পৌঁছেছি। বিকেল ৩টায় রোডাউন-এর প্যারিস চার্চে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। শবাধার, বেদী ও বেদীর বেড়া সব গোলাপের সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। হয়তবা ভিয়েনার প্রত্যেকটি বাগান শূন্য ক'রে এই গোলাপ এসেছে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে। ছোট্ট গীর্জাটি যেন উপচে পড়ছিলো মানুষের চাপে। রিচার্ড স্ট্রস্-এর পুত্রের ঠিক পেছনেই আমি বসেছিলাম। স্ট্রস ও ম্যাক্স রেইনহার্ট-এর অনুপস্থিতি খুবই চোখে

পড়ছিলো। একটিমাত্র নিঃসঙ্গ বীণের অপূর্ব বাজনা সত্ত্বেও সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল। ভিয়েনার প্রায় সব কৌতূহলী মানুষই পুরো ঘিরে রেখেছে গীর্জেটা। হালকা গ্রীষ্মের পোষাকে মহিলাবৃন্দ, কিছু মার্কিনী, এছাড়া আশপাশ থেকে এসেছে অনেক চাষী ও ব্যবসায়ীরা। শবযাত্রায় বেশ কয়েক হাজার মানুষ যোগ দিলেও শেষপর্যন্ত গরম আবহাওয়াই যেন মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাটুকু হরণ করে নিল। আমি হুগোর আরেকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম কবরখানার দিকে। আমাদের গভীরতম বন্ধু বিয়োগব্যথা সত্ত্বেও গরম যেন তাঁকেও বেশ কাবু ক'রে দিল। কবরখানার দরোজায় এক লজ্জাজনক পরিস্থিতি তৈরি হ'ল। শোকগ্রস্ত মানুষ ও কৌতূহলী দর্শক উভয়েই হাতাহাতি আরম্ভ করল পুলিশের বেড়া ভেঙ্গে ভেতরে যাবার জন্য। অবশেষে আমাদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হ'লেও আর কোনো বিস্ময় আমাদের অবশিষ্ট রইল না—কারণ ততক্ষণে এটা একটা দারুণ গরমে অনুষ্ঠিত মেলার রূপ নিল। কফিনে একমুঠো মাটি দেবার সময় এক ঝলক কবরটার দিকে তাকিয়ে কফিনের সংক্ষিপ্ত প্রসার ও ক্ষুদ্রতা দেখে চমকে গেলাম। এখনো এরই নিচে আত্ম-হত্যাকারী পুত্রের কফিনটা দেখা যাচ্ছে। তারপর সব শেষ হ'য়ে গেল।

হুগো ফন হফ্‌মানসস্তালের সঙ্গে আমার জীবনের একটা অংশও যেন চ'লে গেল। এইতো মাত্র এক সপ্তাহ আগে উনি আমাদের দু'জনের দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুতার কথা লিখেছেন আমাদেরই বন্ধু গ্রোৎস্‌কে। ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা গতবছর জুনে সেই আবিল ও দুঃখপূর্ণ ভোজসভায় যেখানে রিচার্ড স্ট্রস এমন সব কটূক্তি করেছিলেন যে পরে হফ্‌মানসস্তালকে পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে লিখতে হয়েছিল।

১৮. ভিয়েনা, ১৭ জুলাই, ১৯২৯

গাড়ি ক'রে স্কোনব্রান গেলাম, ব'সে ব'সে পড়ছিলাম হফ্‌মানসস্তালের 'এভরিম্যান'। দুপুরের আহারের পর রোডাউন গিয়ে দেখি গার্টি হফমানসস্তাল (ফ্রাউ ফন হফমানসস্তাল), রাইমুন্ড ও পরিবারের অন্য সবাই—সকলেই বেশ উৎফুল্ল। গার্টি বললেন (নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মতো ক'রে) 'হুগোর মৃত্যুর কারণ অবশ্য পুত্রের আত্মহত্যার সংবাদ নয়, কারণ বছর তিনেক আগেই

চিকিৎসকরা ওঁর মূল ধমনী শক্ত হ'যে গিয়েছিল ব'লে ওঁর জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। ফ্রানৎস্-এর মৃত্যুর পর উনি বেশ শান্ত হয়েই ছিলেন, প্রাত্যহিক কাজকর্মও সব করলেন, অনেকগুলো চিঠি লিখলেন, রাইমুন্ড ও আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করলেন—পুত্রের মৃত্যুর বিষয়ে অনেক কথা বললেন—আশ্চর্য সুন্দর সব কথা। তেমনি, অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর ক্রন্দনও অত্যন্ত তীব্র ছিলো। সোমবার সকালে রোজকার মতোই ঘুম থেকে উঠলেন, খাবার খেলেন নিয়ম মতোই। তিনটের সময় ফ্রানৎস-এর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে যাবার কথা, মাথায় টুপিটা পড়লেন—হঠাৎ বললেন, কেমন আচ্ছন্নের মতো লাগছে—বলতে বলতে ব'সে পড়লেন একটা চেয়ারে। গার্টি ওঁর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে গেলেন ওঁর পড়ার ঘরে। যাবার পথে হাত থেকে খসে পড়া গ্লাবসটা নিচু হ'যে নিজেই তুলে নিলেন। পড়ার ঘরে ব'সে পড়ার পর ওঁর স্ত্রী জিগ্গেস করলেন জামার গলাবন্ধটা খুলে নেবেন কিনা, কিন্তু কেমন যেন জড়িয়ে একটা অপরিষ্কার উত্তর দিলেন। তারপরই ওঁর মুখটা কেমন যেন বেঁকে গেছে দেখে ওঁর স্ত্রী ভয় পেলেন। অথচ স্ত্রীকে নিজের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিগ্গেস করলেন, "অমন ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?" তিনি এরকম ক্ষেত্রে সচরাচর যা করেন—অর্থাৎ উঠে যান আয়নার সামনে কী হয়েছে দেখতে—তা কিছু করলেন না। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তিনি ধীরে ওঁকে আরামকেদারায় শুইয়ে দিলেন এবং ক্রমশ ওঁর সংজ্ঞা লোপ পেতে লাগলো।

ততক্ষণে কিন্তু পুত্রের অন্ত্যেষ্টির কাজ শুরু হ'য়ে গেছে। রাইমুণ্ড বলছিলো, দ্রুত ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিতে যেতে যেতে সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিলো ফিরে এসে আর পিতাকে জীবিত দেখতে পাবে না। এমন কী সে নিজে ও তাঁর মা দুজনেই মনে মনে চাইছিলো যেন পিতা তাঁর এই অচৈতন্যদশা থেকে ফিরে এসে দীর্ঘ রোগ-যন্ত্রণার দশা ভোগ না করেন। এ রোগ তো সারবার নয়। গার্টির দুঃখ, হুগো 'আঁরাবেলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক পরিমার্জনা ক'রে যে রিচার্ড ষ্ট্রসের কাছে তাকে পাঠিয়েছিলেন তার প্রাপ্তি সংবাদ তখনো পান নি। অথবা স্ট্রোস যে পরিমার্জিত অংশ পাঠ ক'রে খুসি হয়েছেন তাও জানতে পারছেন না।

হফমানসস্তাল ব্যারোক কবিকুলের সর্বশেষ। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে

যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে আছেন—শেকস্পীয়র ও সারভেন্তেস্। ব্যারোক—সত্যিকারের অনুভূতির শিল্প যা অবাস্তব বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে সচেতনভাবে সংযোজিত। কতই না জাঁকজমক ক'রে হফ্‌মানসস্তাল তাঁর রচনার বিষয়-গুলোর পরিচর্যা করতেন, যেন কোনো অনুষ্ঠানের তিনিই পুরোহিত, তিনিই গৃহকর্তা—তাই তাঁর গদ্য ভাষা এক আনুষ্ঠানিক, ঐন্দ্রজালিক অর্থবহতা লাভ করতো। কোনো কিছু বিষয় সরাসরি উন্মোচন তাঁর চরিত্রের পক্ষে অসম্ভব। তাঁর কাছে তেমন কোনো কাজ—এমন কি রচনাও ছিলো যেমন অসম্মানজনক তেমনি অসৃজনশীল। হফমানসস্তাল বিষয় বেছে নিতেন যাতে তাঁর অনুভূতি কেবল একটা অবলম্বন পায়—অথচ তার অস্তিত্ব বাস্তবে অলীকও হ'তে পারে। সুতরাং হয় তিনি তাঁর রচনার বিষয় সৃষ্টি ক'রে নিতেন নতুবা অবাস্তবতার অবলম্বন করতেন তাঁর রচনার প্রয়োজনে। আর সেই জন্যই তিনি বস্তুত শেষতম ব্যারোকধর্মী লেখক ব'লে চিহ্নিত।

১৯ বের্লিন, ৩০ আগস্ট, ১৯২৯

প্রকাশক হাচিনসন এরিখ মারিয়া রেমার্কে কে আমার কাছে পাঠিয়েছিলো ওঁর চুক্তিপত্র বিষয়ে আলোচনার জন্য। মাথাটা যেন একজন সোয়াবেন চাষীর ছেলের মতো, মুখে গভীর রেখার ছড়াছড়ি, নীল চোখ, মাথার চুল এমন কী ভ্রূ পর্যন্ত সোনালি। কথা বলার ঢং বেশ দৃঢ় কিন্তু কবিত্বপূর্ণ। বলছিলো, বিস্তারিত ভাবে, এমন কি না থেমে—কী ক'রে ওস্নাব্রুকে কোনো উপদেশ, কোনো সাহায্য ছাড়াই সে তাঁর বেদনাময় শৈশব পেরিয়ে এখানে এসে আজ পৌঁছেছে। সে যে বেঁচে আছে আজও—এটাই তাঁর কাছে একটা অসম্ভব ঘটনা ব'লে মনে হয়। যখন যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরলো তখন তার মা মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালে শায়িত মৃত মাকে দেখে সে চিনতে পর্যন্ত পারে নি। যুদ্ধের সময় তাদের মনে হ'তো—যুদ্ধ শেষে যখন শান্তি স্থাপিত হবে তখন সব কিছুই ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন বোঝা গেল ওরা কত অসহায়। জীবনে যে কী করবে সে সম্পর্কে তার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। 'কনটিনেনটাল-রবার' কোম্পানিতে কিছুদিন চাকুরি করলো। সেখানে বিজ্ঞাপনের কপি লেখা ও বিজ্ঞাপনের জন্য ছোটোছোটো গান বাঁধাই তার কাজ ছিলো। নাকউঁচু

সাহিত্যের কাগজগুলোর পাতায় একদিন উপস্থিত থাকতে পারবে এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে এরপর বেলিনের একটা খবরের কাগজে খেলাধূলার সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিল রেমাকে। সাহিত্যকর্মেব প্রচেষ্টা হিসাবে তখন লিখতে শুরু করেছে "অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট"। ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই রচনাটা শেষ হ'য়ে গেল, লেখা বেশ তরতরিয়ে এগলো, কোনো অসুবিধা নেই। "আসলে লেখা তখনই সহজ হ'য়ে ওঠে যখন রচনার বিষয়ের ওপর সত্যিকারের দখল থাকে······কখনো হয়ত অপনি রেলগাড়ি চ'ড়ে কোথাও যাচ্ছেন হঠাৎ বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় দেখলেন দূরে একজন মানুষ পার হ'য়ে যাচ্ছেন বিস্তারিত নিঃসঙ্গ এক মাঠ। দিগন্তে নেমে আসা আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে যেন মনে হ'ল অসম্ভব দীর্ঘকায়। এমনি করেই আমার লোকেদের আকাশের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে তার পেছনের ইতিহাস, তবেই অহেতুক বিস্তৃতি অথবা করুণরস ছাড়াই আপনার লোকেরা হ'য়ে উঠবে স্মরণীয়····." সঠিক বলতে গেলে রেমার্কেও তাই করার চেষ্টা করেছে। তাঁর চরিত্রদের স্থাপন করেছে অসীমের প্রেক্ষাপটে এবং যখনি তা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়েছে—রচনাকার্য হ'য়ে উঠেছে সরলতম। হয়ত বা তার বাক্যগুলো যতখানি একজন লেখকের কাছে আশা করা যায় ততটা পটু নয়, কিন্তু তা অনেক বেশি ক'রে হৃদয়ের দূরতম গভীরে প্রবেশ করে সহজে।

আর্নল্ড ৎসাইগ ওকে বলেছে 'বেপরোয়া', ৎসাইগের নিজের রচনা পুস্তক ও পাঠকের মাঝখানে দোদুল্যমান, রেমার্কে চেয়েছিলেন পাঠকের আরো কাছাকাছি পৌছুতে। যদি তার রচনাশৈলী ৎসাইগ-এর তুলনায় হ'য়ে থাকে অপরিশীলিত তথাপি রেমার্কে যা করতে পেরেছে তা অনেকখানি। কিন্তু "অল কোয়ায়েট"-এর সাফল্য তেমন কিছু উৎসাহজনক হয় নি। এর পুর্বে অবশ্য তাঁর মনে হয়েছিল সফলতাই তাঁর একমাত্র কাম্য—কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পেরেছে সাফল্য কখনো মানুষকে পরিপূর্ণতা দেয় না। এমন কি পুস্তকটি প্রকাশের পর প্রথম কয়েকমাস সে প্রায় আত্মহত্যাই সমীচীন বলে ভাবতে আরম্ভ করেছিল; কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হয়ত গ্রন্থটি কোথাও কারো কোনো প্রয়োজনে লাগবে, আর তাই তাঁকে আত্মহনন থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। এটাই একমাত্র

জরুরি। কোনো একটা কারণের জন্ত শাস্তি অথবা মাত্র একজন মানুষের প্রয়োজনে, এই ইচ্ছে প্রকৃত সার্থকতা। পরবর্তী জীবনে সে কিছু একটা করতে চায়, এমন মানুষের জন্যে যে পৃথিবীতে একান্ত নিঃসঙ্গ, হয়ত বা পথভ্রান্ত— তাদের জন্ত নির্মাণ করা যেতে পারে একটা যৌথ আবাস যেখনে তরুণ লেখকরা নিশ্চিন্তে বসবাস ও রচনাকর্ম করতে পারবেন। রেমার্কে বলছিল, "অল কোয়ায়েট" বস্তুত ভালো গ্রন্থ কিনা তা সে জানে না। সে জানে, সে কেবল তাঁর কবজির সব শক্তি দিয়ে রচনা করেছে এই গ্রন্থ।

সন্ধ্যায় ভোজে আর্নল্ড ৎসাইগ এসে ধূর্ততার সঙ্গে রেমার্কের বিরুদ্ধে আমার কানে বিষ ঢালছিল। যখন সকলেই রেমার্কে-কে প্রশংসা করছে তখন যেন মাত্র একজন কেউ তাঁর নিন্দা করেছে—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বললো: "না না, বইটা খুব ভালো। রেমার্কে আসলে রেন-এর ন্যায় একজন উৎকৃষ্ট অপেশাদার ঔপন্যাসিক। 'অল কোয়ায়েট'-এর মতো একটা মহৎ উপন্যাস অবশ্যই সে হঠাৎ ক'রে লিখে ফেলতে পারে—আর ঠিক এই কারণেই তাঁকে অপেশাদার বলা হয়েছে। যে বীজ থেকে মহৎ উপন্যাসের জন্ম হয় তা সে জানে না—অথচ না জেনে সেই বীজ সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, ব্যবহার করেছে অন্ধভাবে। উপন্যাসে যেখানে সেই চাষীর ছেলেটি গাছের ফুলকোটা দেখে হঠাৎ বুঝতে পারলো যুদ্ধ ব্যাপারটাই আর সহ্য করা যাচ্ছে না—আমি হ'লে ঠিক সেখানেই গল্পের আরম্ভ করতাম এবং অন্যসব চরিত্র ও ঘটনা এই চাষী বালকটিকে ঘিরেই গ'ড়ে তুলতাম। তবেই না এই কাহিনী এক মহৎ উপন্যাসে রূপান্তরিত হ'ত।" আসলে, সেই সন্ধ্যায় ৎসাইগ ঈর্ষাপ্রণোদিত হ'য়ে কিছু ধূর্ত কথা বলছিলো, যাতে না ছিলো কোনো বুদ্ধির চমক বা সহৃদয়তা, ফলে সমস্ত সন্ধ্যাটাই একটা ক্লান্তিকর সাহিত্যসম্পর্কিত গালগল্পে নষ্ট হ'লো।

২০. পারী, ৩-৪ অক্টোবর, ১৯২৯

আমি তখন নাপিতের চেয়ারে ব'সে ছিলাম—যখন স্ট্রেসমান-এর মৃত্যু-সংবাদ এলো। চেয়ারটা মনে হ'ল যেন গরম কবলা। তিনি কাল হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন—এই খবর আজ 'পারী মিদি' কাগজে সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ওঁর মৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, যা তার

ফলাফল যা হবে তা কল্পনাও করা যাচ্ছে না। পরে আমি আমাদের দূতাবাসে গিয়ে কাউনসেলারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম—তিনি বললেন, স্ট্রেস্‌মানের মৃত্যুতে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত ভবিষ্যত বিষয়ে। আমার অবশ্য মনে হয়—স্ট্রেস্‌মানের মৃত্যুর ফলে প্রথম যা হবে তা হচ্ছে জর্মনির আভ্যন্তরিন রাজনৈতিক অস্থিরতা। যার ফলে জাতীয়তাবাদীরা আরো বেশি দক্ষিণপন্থী-ঘেঁষা হবে এবং কোয়ালিশন হয়ত বা ভেঙ্গে যাবে—এর পরিণতি হিসাবে সুগম হবে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ।

এই মৃত্যুর বেদনা ফরাসীদেশেও এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যাতে মনে হ'তে পারে হয়ত বা একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ফরাসী নেতাই মারা গেছেন। মনে হচ্ছিল, যেন সমস্ত য়ুরোপ এক জাতি হ'য়ে উঠেছে। ফরাসীরা স্ট্রেস মানকে য়ুরোপীয় বিসমার্ক হিসেবে ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, গত যুদ্ধে পরবর্তিদিনে যাঁরা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই জর্মন—আইনস্টেইন, একেনার, কোহ্‌ল, রেমার্কে, স্ট্রেস্‌মান। অন্য যাঁরা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—লিণ্ডবার্গ, লেনিন, প্রুস্ত।

২১. লণ্ডন, ১৪ নভেম্বর, ১৯২৯

অপরাহ্নে ট্যাভিষ্টক স্কোয়ারে গেলাম লিওনার্ড ও ভার্জিনিয়া উলফ্‌দের সঙ্গে চা পানে। লিওনার্ড বেশ সহৃদয়তার সঙ্গে আমার গ্রন্থ বিষয়ে বললেন। জানালেন, ওর কৃত আলোচনাটি পরের দিন 'নেশনে' বেরুবে। ভার্জিনিয়া অভিযোগ করলেন, "জানেন, আমার স্বামী গত সপ্তাহের প্রায় প্রত্যেক রাতে আমাকে ঘুমুতে দেন নি আপনার বই থেকে নানা অংশ প'ড়ে প'ড়ে শুনিয়ে।" এরপর আমরা রাথেনো ও স্ট্রেস্‌মান বিষয়ে নানা আলোচনা করলাম। পরে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি আজকাল আর এডেলফি টেরাসে থাকেন না, বাসস্থান পরিবর্তন ক'রে গিয়েছেন হোয়ায়েটহল কোর্টে। বাসস্থানটি বিলাসবহুল ও সেখান থেকে টেমস্‌-এর মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শনীয়। ওঁর স্ত্রীর স্বভাব যেমন অত্যন্ত মধুর, তেমনি সহজসরল। একটু মুটিয়েছেন সত্যি তবু এখনো তন্বী ও তরুণীর মতোই দ্রুত চলাফেরা করতে পারেন (যদিও মাথার চুল প্রায় সব শাদা হ'য়ে গেছে)। অত্যন্ত সাবলীলভাবে অতীত ও

বর্তমানের নানা বিষয়ে কথা বলতে পারেন। আমরা আমাদের যুদ্ধ পূর্ববর্তী ইংলণ্ড ও জর্মনির মিলনের বিষয়ে যে জোর প্রচার একদা যৌথভাবে চালিয়েছিলাম সেইসব স্মৃতিচারণ করতে করতে মনে পড়লো—প্রিন্স লিচনোস্কির সঙ্গে আমাদের সেই বিখ্যাত দ্বিপ্রহরের আহারের কথা যেখানে শ তাঁকে গ্রে'র বিরুদ্ধে একটু তপ্ত করবার বৃথা চেষ্টা করছিলেন। তিনি তখন এখানে জর্মনি রাজদূত। তারপর শ বললেন এই গ্রীষ্মে রিচার্ড স্ট্রোস ও তিনি একসঙ্গে কাটিয়েছেন তার গল্প—"আশ্চর্যের বিষয় যে যতক্ষণ স্ট্রোস ও আমি ব্রাওনিতে একসঙ্গে ছিলাম কেউ আমাদের বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করে নি। কিন্তু যখনি জেনে টিউনি এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন তৎক্ষণাৎ ফোটোগ্রাফাররা আমাদের ছেঁকে ধরলো। আসলে তারা সবসময় ওখানে ছিলো, আমাদের চারপাশেই ছিলো, অনুসরণ করছিলো, লক্ষ্য করছিলো···· " তিনি টি ই লরেন্সের সম্পর্কে একটা গল্প বললেন, উনি শ'দের পারিবারিক বান্ধব, এবং প্রচারিত হবার বিরুদ্ধে তাঁরও একটু খেপামি আছে। লরেন্স যখন বললেন, তাঁর প্রত্যেকটি মুহূর্তেই প্রায় সাংবাদিকরা অনুসরণ করেন, শ তার উত্তরে বলেছিলেন "যথার্থই তারা আপনাকে লক্ষ্য করে কারণ আপনি সর্বদাই পাদপ্রদীপের আলোর মাঝখানে লুকিয়ে থাকেন।"

২২. পারী, নভেম্বর ২৭, ১৯৩১

ভার্সেইতে রাজকুমারী বাসিয়ানোর ওখানে দ্বিপ্রাহরিক ভোজে অন্যান্যদের মধ্যে আঁদ্রে জিদ-ও ছিলেন। আমাকে দেখে মনে হ'ল বেশ প্রীত হয়েছেন। আলাপচারীতার মাঝে আমি জর্মনির প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথাটাও উল্লেখ করলাম। জিদ বললেন, তাঁর কোনো সন্দেহ নেই যে সাধারণভাবে জনতার বৃহত্তর অংশের কাছে অর্থ অপ্রতুল, কিন্তু ফরাসীদের কাছে এটা বিশ্বাস্য ক'রে তোলা প্রায় অসম্ভব, কারণ যে সব ফরাসী জর্মনি থেকে ভ্রমণ শেষে ফিরছেন তাঁরা কেবল জর্মনিতে অকল্পনীয় অপচয়ের গল্পই করেন। শুধু তাই নয়, ফরাসীদেশে বাস করেন এমন অনেক জর্মন আছেন তাঁদের দেখে মনে হয় পুড়িয়ে ফেলার মতো প্রচুর অর্থ তাঁদেব করায়ত্ত। টেবলে বসার পর জিদ বললেন তিনি নাকি অদ্যাবধি 'জারাথুস্ট্র' পড়েন নি অথচ নীৎসের অন্যান্য

প্রায় সব রচনাই তাঁর পড়া। এই গ্রন্থের রচনাশৈলী তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। আরো বললেন, টোমাস মান তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করেছেন যে গ্যয়টে কখনো 'প্রমিথ্যূস' রচনা করেন নি, উনি কেবল জ্ঞাত আছেন গ্যয়টের 'প্যাণ্ডোরা' বিষয়ে আর তাই দুই-এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। আহারপর্ব সমাধা হ'লে আমি জিদকে সিনেমা ত্থে মিবাক্স পৌঁছে দিলাম কারণ উনি সেখানে লিলিয়ান হারভে কে দেখতে যাবেন ডের কোংগ্রেস তানৎস ছবিতে আমারি প্ররোচনায়।

২৩. বের্লিন, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৩২

আঁদ্রে জিদ এখানে এসেছেন। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন গ্রানভাণ্ড-এ টম কাকার কেবিন নামক গৃহপ্রকল্প। তাঁকে প্রকল্পটি অত্যন্ত প্রীত করেছে বোঝা গেল—'লা সিতে মাজিক্।' খুঁতখুঁত করতে লাগলেন ফরাসীদের পিছিয়ে পড়া দেখে—যখন স্থাপত্যবিদ্যা জর্মনিতে এতোটা উৎকর্ষ লাভ করেছে ঠিক তখনি ফরাসীদেশ এতোটা পিছিয়ে পড়লো কেন? তারপর আমরা গেলাম হেলেন ফন নোসতিত্-এর ওখানে চায়ে কারণ জিদ নিকারবোকার নামক মার্কিন সাংবাদিকেব সঙ্গে দেখা করবেন। নিকারবোকার মানুষটি ছোটোখাটো, দৃঢ়চেতা, লালচুল, রেখাময় অথচ তারুণ্যময় মুখশ্রী। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করলেন বিশ্বসংকট বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়ে। তিনি একটি গ্রন্থ লিখছেন যার বিষয়—এই সংকট কী কেবল পূর্বের অন্যসব সংকট থেকে "মাত্রিক তফাৎ" সম্পন্ন না "গুণীয় তফাৎ" সম্পন্ন। এখন স্মরণে নেই আমি কোন একজন দার্শনিককে উদ্ধৃত ক'রে বলেছিলাম, এমন একটা সময় কখনো আসে যখন মাত্রিকতা পরিবর্তিত হয় গুণীয়তায়। আমার ভয় হচ্ছে, এখন আমাদের সংকটের সেই সময়ই এসেছে। অর্থাৎ সংকটের বিপুল আয়তন এমন এক পর্যায়ে আজ পৌঁছেছে যে গতদিনের অন্যসব সংকট থেকে এর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন হ'য়ে গেছে।

২৪ বের্লিন, জুন ২৮, ১৯৩২

ফ্রাউ ফন ওসিয়েৎসকী টেলিফোন ক'রে জানালেন যে নাৎসীরা তাঁর গৃহের

সামনে জনবিরল রাস্তায় দিবারাত্র প্রহরা দিচ্ছে। বের্লিনের রাস্তায় ক্রমশ নাৎসীরা এক ভয়ের বাজত্ব বিস্তার করছে।

২৫. কান্‌স্, অগস্ট ১৪, ১৯৩২

মার্সেই-এর সংবাদপত্রের খবর—গতকাল হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকে চ্যানচেলর করতে রাজি হন নি। চূড়ান্ত আলোচনা মাত্র তের মিনিট চলে। অতঃপর কী? আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ অথবা গৌরবহীন নাৎসী আন্দোলনের পতন? একটা ব্যাপার ঠিক যে আমরা সবচেয়ে অন্ধকারময় অবস্থায় পৌঁছচ্ছি। বলা কঠিন—কে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিক্রিয়াশীল—স্লেচার না নাৎসীরা।

২৬. পারী, অগস্ট ২৬, ১৯৩২

ফরাসী কাগজে সবচেয়ে গরম খবর হচ্ছে জর্মনির রাজনীতি। প্রতিদিন লেখা হচ্ছে—হিটলার, ফন পাপেন, স্লেচার-দের সম্পর্কে। বেশির ভাগ ফরাসী নিজের দেশের বাজনীতির তুলনায় অনেক বেশি জর্মনির রাজনীতির খবর রাখে। ফরাসীরা পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে তাদের ঘরের কাছেই একটা আগ্নেয়গিরি জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—যা যে কোনো মুহূর্তে সেই দেশের নগরপ্রান্তর সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্, প্রকৃতির ক্রোধ, যার বিরুদ্ধে মানুষের কিছুই করার নেই—তা দেখবে বলে ফরাসীরা অপেক্ষা ক'রে আছে। হায়, জর্মনি, তুমি আবার হ'য়ে উঠলে "বিশ্বতারকা"। ফরাসীরা অনুভব করছে এক নতুন পৃথিবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এরা হয়ত বা বলশেভিকদের চেয়েও তাদের পক্ষে আশু বিপদজনক। অথচ এটাও ভাবছে যে এই নতুন তারকা জন্মের আগেই ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

২৭. বের্লিন, সেপ্টেম্বর ১, ১৯৩২

মার্কিন তাম্র সম্রাট গুগেনহেইম-এর সঙ্গে নৈশ আহার ছিল। ভান্দা ফনডের মারভিৎস্, যাকে আমি প্রায় তিরিশ বছর পরে দেখলাম, উৎফুল্ল কণ্ঠে জানালেন, তাঁর সব আত্মীয়-স্বজনই নাৎসী। মহিলা নিজে কিন্তু রাজতন্ত্র অনুরাগিনী। অবশ্য জাতীয়তাবাদে এবং সিমিটিক বিরোধী আন্দোলনে

আস্থাবতী। আমিও তাঁর মতাবলম্বী কিনা জিগগেস করলে জানালাম—না। নচেৎ আজ নৈশ ভোজে একজন জু'র আতিথ্য গ্রহণ করতাম না।·· ব্যারোনেস রেব্যে যিনি ১৯১৮ পর্যন্ত স্ট্রাসবুর্গে বাস করতেন এবং এখন পর্যন্ত যিনি নিজেকে একজন এলসেমীয়ান ব'লে ভাবেন, তিনিও নাৎসী অনুরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। তার মতে "আন্দোলনের" সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দিক হ'চ্ছে যে সাধারণ মানুষকে পর্যন্ত শেখানো হ'চ্ছে—তাদের ত্যাগের কথা অথচ গত যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র আমাদের শ্রেণীর লোকেরাই ত্যাগ স্বীকার করেছে। আমি বললাম, দুই-ই সমান। যুদ্ধে কয়েকলক্ষ মানুষ মারা গেল, কয়েক সহস্র মারা গেল অনাহারে। আমার আপনার কোনো আত্মীয় কিন্তু তখনও মরে নি।

শ্রীমতী গুগেনহেইম আদিম ও আধুনিক পরাবাস্তবতার চিত্র সংগ্রাহক। তিনি বললেন, "যদিও এই দুই শ্রেণীর মধ্যে তুলনা চলে না কারণ আদিকালীনরা অনেক বেশি দামী।"

২৮. বের্লিন, নভেম্বর ১৪, ১৯৩২

ফন পাপেন গতকাল তার পুরো মন্ত্রীসভার সঙ্গে পদত্যাগ করেছে। অবশেষে। এই সদাস্মিত হাস্যময় মূর্খ অপটু মানুষটা গত ছয় মাসে যা ক্ষতি করেছে এর পূর্বে অন্যকোনো চ্যানচেলর তা করতে পারেন নি। সবচেয়ে দুঃখের হচ্ছে—সে হিনডেনবার্গের সুনামের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে।

২৯. বের্লিন, জানুয়ারী ৩, ১৯৩৩

আমার দেওয়া দ্বিপ্রাহরিক ভোজের নিমন্ত্রণে যখন আমার অতিথি এসে পৌঁছুলেন—তিনিই নিয়ে এলেন হিটলারকে যে চ্যানচেলর করা হয়েছে—এই দুঃসংবাদ। আমি বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম। আমি এরকমটা হবে আশঙ্কা করি নি, অন্তত এত দ্রুত হবে তা বুঝি নি।

৩০. বের্লিন, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৩৩

লোর ভোজনালয়ে রাত্রের আহার শেষ করছিলাম, এমন সময় বুড়ো লোর নিজেই আমার কাছে উঠে এলো—খবর, রাইখস্ট্যাগ জ্বলছে। তখন রাত

দশটা। তাহ'লে পরিকল্পিত গুপ্তহত্যাটা ঘটেছে—অবশ্য যেমনটি আমরা ভেবেছিলাম তেমন হয় নি। হিটলার নয়—জ্বলছে রাইখস্ট্যাগ। এর শেষ পরিণতি যে কী তা কেউ জানে না।

৩১. ফ্রাঙ্কফুর্ট, মার্চ ৮, ১৯৩৩

সন্ধ্যায় আমি পারীর দিকে রওনা দিলাম।

কিছু মূল নামের তালিকা ও বাংলা হরফে ব্যবহৃত রূপ

Berlin—বের্লিন

Paris—পারী

London—লণ্ডন

Weimar—হ্বাইমার

Einstein—আইনস্টেইন

Jean Cocteau—জঁ৷ ককতো

Harold Nicolson—হ্যারোল্ড নিকলসন

Leonard/Virginia Woolf—লিওনার্ড/ভার্জিনিয়া·উলফ্

Yehudi Menuhin—ইহুদি মেনুহিন

Diaghilev—ডিয়াঘিলেভ

Hugo Von Hofmannsthal—হুগো ফন হফমানসন্তাল

Max Reinhardt—ম্যাক্স রেইনহার্ড

Richard Strauss—রিচার্ড স্ট্রোস

Raimund—রায়মুণ্ড

Arnold Zweig—আরনল্ড ৎসাইগ

Remarque—রেমার্কে

Maillol—ম্যালোল

Stresemann—স্ট্রেসমান

Eckener—একেনার

Koehl—কোহল

Rathenau—রাথেনো

Gordon Craig– গোর্ডন ক্রেইগ

Andre Gide—আঁদ্রে জিদ

Frau Von Ossietzky—ফ্রাউ ফন ওসিয়েৎস্কি

Foerster-Nietzsche—ফোয়েস্ট´র নীৎসে

Franz Von Papen—ফ্রানৎস ফন পাপেন

Hindenburg—হিণ্ডেনবুর্গ

Guggenheim—গুগেনহেইম

Wanda Von Der Maswitz—ভান্দা ফন ডের

Schleicher—সক্লেইচার

Paul Valery—পোল ভালেরি

Mallarme – মালার্মে

Eric Gill—এরিক গীল

Vollmoeller– ভোলমোযেলার

D'annunzio—দানানৎসিও

আলোক সরকার

শীত

নিরঞ্জন একটা অনাবশ্যকতা ওই এগিয়ে এগিয়ে চলেছে
নিরাসক্ত আর আত্মময়
ওই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঢুকলো অন্ধকার গলির মধ্যে
গলি থেকে বেরিয়ে আসছে আবার, ব্যাকুল আর উদ্‌ভ্রান্ত
তার অন্বেষণ ঠিক কোনখানে ?

আমরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতেই পারি না নিয়ম
ওই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঢোকা বেরিয়ে আসা উদ্‌ভ্রান্ত
বুঝতে পারি না লক্ষ্য আর ব্যর্থতা
বুঝতে পারি না মেঘ ভেঙে-যাওয়া মেঘ গড়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আবার

কেবল ওই উদ্বেগ চরাচর ব্যাপ্ত করা নিশীথিনী
আবশ্যকতা কোনো কিছুই নয় বৃক্ষ নেই, নেই কল্লোলিনী তটিনী।
শূন্যময় অন্ধকার ফুলে উঠছে বেলুন
রঙ ফিকে হয়ে ছলচ্ছল প্রবাহ রঙ ঘন হয়ে মরুধূসর।
আমরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের আক্রমণ করে শীত
বিশৃঙ্খল আর অনিশ্চিত—পরিব্যাপ্ত খরতা প্রতিমুহূর্তের দ্যুতি।
তামস নিরঞ্জন উদ্‌গ্রীব
আর সেই অনুপস্থিত নিশ্চয়তা। বটগাছের পাশ দিয়ে লাফিয়ে
হারিয়ে যাচ্ছে আবার।

নবনীতা দেবসেন

বিকেলবেলার গান

তোমার নামের প্রভা জ্যোতির্ময় করেছে বিকেল
চিকণ হাসির মধ্যে মখমলের বিছানা পেতেছো
বিকেলবেলার গান বাজিয়ে দিয়েছো দুই চোখে
নহবৎখানার মতো, ভেসে যায় দূরান্তে সে সুর
এইবারে ফুল চাই এ বিকেল ফুলের বিকেল
তারাফুল ফুটে উঠবে আকাশবাগানে কান্তিময়
উধাও সুগন্ধ হয়ে ঝেঁপে আসবে মৃদুল আঁধার
আলোফুল ঝরে পড়বে চোখের শয্যায় সুকোমল
তারার সুরভি ঠিক হৃদয়বিভার মতো চিকণ চিক্কণ
মিশে যাবে হাসির মখ্‌মলে

অঞ্জলিতে ধরে আছি বিকেলবেলার সুখ
দুরু দুরু কবোষ্ণ চড়ুই, নরম, জীবন্ত, পক্ষধর
আন্‌চান্‌ অস্থির প্রহর
বিকেল বেলার গানে, নক্ষত্রসুবাসে, থরথর
রাত্রি নেমে আসে
অঞ্জলিবন্ধনে কাঁপে প্রহরের ডানার উড়াল
একটুও আনমনা হলে আঙুলের শিক ভেঙে
লক্ষ্যহীন শূন্যে উড়ে যাবে—
অর্ধস্ফুট অঞ্জলিতে পড়ে থাকবে উষ্ণ শিহরণ
অনিঃশেষ প্রার্থনার মতন আফশোস।

তাই রুদ্ধশ্বাস, তাই এমন উদ্‌গ্রীব,
তৃপ্তিহীন, একাগ্র রয়েছি।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

নীলপদ্ম

(কমুদাব মৃত্যুতে)

'সরোত নীল জল অথৈ' তোমারই কথা শৈশবের নিরুত্তাপ বিস্ময় আমাদের টুকবো করে দিয়েছিল গুহায়িত মন্ত্রোচ্চারণের মত। সেই সুখী দিন আঃ আমাদের ভালবাসার দিনগুলিরে আমরা কী না চাইতেম। এখন বাতাসের মর্মোচ্ছ্বাসে আত্মন্ত স্বপ্নের স্বরধ্বনি উরুগুরু মাংসল শরীরের সেই নারী বাত্রি 'যার শরীরে বাঁধা' এবং পরাস্ত প্রেম যা আমরা চিনিনা। এবং আমি বড একা, বন্ধু কবি বড কেউ নেই আব, সকলেই ফিবে গেছে নিজ নিকেতনে, অথ তিলোত্তমা পুতুল অদ্যপি বুকেই বয়েছি। কী দুঃখে বল ধনি ভুলি ভুবন মাঝির হাট? এখানে নিবিড জোনাক জ্বলে চোখের চামবে ওখানে গোদাবরী সন্ধ্যায় হয় সতিমির কাঁসর। অবিশ্রান্ত গোধূলিতে বসন্তবেলা গেছে মোহন মুরলী গডাতে স্বর্ণকার কাকে আর খুঁজব আমরা। দেশান্তরে আর্ত্ত একটি নীলপদ্মের জন্তে কেবলই তৃষিত রইব।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

জীবনানন্দ

আমরা সকলে আসি চলি বলি, দেখি বা দেখি না,
আমরা সকলে এক-ই জমা ও খরচে। যা-ই দেখি
এ-ওর চোখের ছানি চোখে মেখে এক-ই সব।
আমরা সকলে।
এক-ই কথা বলি, অথবা বলি না,
ভিডের একটি মুখ, এক-ই স্বর, আমরা ভিড়ের
ভিতরে বাড়াই ভিড়। তবু, ভাবি আমরা একাকী।

শুধু তুমি কি করে যে, স্থির পায়ে চলে গেলে একা
কান্নার অতলে, আরো স্তম্ভিত গভীরে চলে গেলে
অথচ গেলে না। তুমি দুঃখের জগতে—স্থির
আপন বলয়ে। যেন চিত্রার্পিত। তুমি কোনো
—কোনো শব্দ যাবে না যেখানে,
সহজ স্বভাবে গিয়ে নিঃশ্বাসে নিবিড় হলে। আর
সুদূর মন্ত্রের কোলে সহজাত নিভৃত কান্নার
স্বেদে তাপে জন্ম নিল উচ্চারণ।
অনিবার্য, অসহায় গাঢ়

দেবতা যখন মূক, মন্ত্রধ্বনি তুমি দিতে পারো।

সুশীলকুমার গুপ্ত

কালান্তর

পালিয়ে এসেছি তাড়া খেয়ে
শ্বাপদের মতো। বাসভূমে সোনার সংসার
লণ্ডভণ্ড হল। গেল ভেঙে
তিলে তিলে গড়ে তোলা সাধের প্রতিমা। রাতারাতি
চেনা লোকজন বন্ধু প্রতিবেশী যা ছিল আপন
একেবারে পর হ'য়ে গেল কোন গূঢ় মন্ত্রণায়
বোঝার আগেই। উপড়ে তাজা মূল
রক্তঝরা স্বপ্ন বুকে শিকারীর নজর এড়িয়ে
এসেছি আরেক প্রান্তে, কিন্তু কোন দোষে
বুঝি নি, বুঝি না।

ভোলা কি এতই সোজা? মেরে ফেলা যায় টুঁটি টিপে
অবধ্য স্মৃতিকে? স্বপ্নে হানা দেয় অবিরত
অমর গানের নৌকা পুবালী নদীর স্রোতে নেচে
সত্তার গভীর ঘাটে; পাহাড়ের বাহুলগ্ন বনের ফুৎকারে
সমস্ত ধমণীশিরা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ওঠে, খোলে
নিরুদ্ধ কপাট, মাটিখনি থেকে উৎসারিত তরল সোনায়
হৃদয় সোনালী হয়, কথায় সোনার সঞ্চয়ন।

কান পেতে আছি,
বিভেদকামীর ফাঁদ ছিন্নভিন্ন ক'রে
কখন আসবে ছুটে অখণ্ড মধুর
উৎসুক আহ্বান।

গোবিন্দ চক্রবর্তী

পেন্সিল-স্কেচ

একটা, দু'টো, তিনটে চিল—
আকাশ বেশ মিষ্টি নীল,
মনের মিলই আসল মিল
নইলে কিছুই না।
গায়ে-মাথায় রোদের গুঁড়ো
ছোটো-বড় পাহাড়চুড়ো,
চম্পাহাটির পোল পেরিয়েই
ঘাঘরবুড়ীর গাঁ।

অন্ত্য নদী ঘুনিয়া
বন্য সে এক দুনিয়া

শালঘোরিতে ছৌ নাচে শাল
মৌঝুরিতে মৌ।
ছোকরার নাম মিঠুয়া,
চানমনি তার বৌ।

সেই রূপসী কালো শশী, কালো ভ্রমর চুল।
সেই কালিতে আলিক দিতে ফুল ফোটে শিমূল।
'টি'-'টি'-'টি' ডাকছে পাখী সময় শুয়ে ঘাসে,
কোন্ ঝর্না সরোদ বাজায় ফিনফিনে বাতাসে।
উস্‌মু-উস্‌মু ডিমের কুসুম ফাগুন মাসের রোদ,
পাকা গেঁহুর ক্ষেত পরেছে ধোপ-দেওয়া গরদ।
এই নিসর্গই কাব্যে ছড়ায় ইন্দ্রধনুর রং,
এই মানুষই কিন্নর হয়, কিন্নরী এবং।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

তাপসী

[শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্যকে]

আমার বয়সী উঠোনের করবী ফুলের গাছটা
মাঝে মাঝে হলদে ফুলের সজ্জায়
যুবতী সাজতো
আর যত রাজ্যের পাখী এসে সেই যুবতী কন্যাকে
কার আগমনের যেন সংবাদ দিয়ে যেতো
কিন্তু কেউ এলো না
আমি দেখলুম গাছটা শুকিয়ে গেলো

আমার এক সময়ে ইচ্ছা হয়েছিলো

আমি ঐ মৃত গাছটার জায়গায় দাঁড়াবো

আমি তপশ্চারনের ব্রত নিয়ে

দাঁড়িয়ে থাকা

এক ঠাঁই

শীত গ্রীষ্ম বাত্ত দুপুর

তারপর সে যখন আসবে

তখন তাকে বলবে—

আজ এসেছো

কিন্তু সে .নেই।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

জন্মমৃত্যু. ব্যক্তিগত

কোনো কোনো দিন আসে টুনিলতা রমণীর মতো
শূন্য হাতে, শুষ্ক বুকে শুষ্ক ঠোঁটে
কুঞ্চিত জঙ্ঘায় কাঁপে নিরর্থক বালিযাড়ি ঢেউ,
সেদিন আমার জন্ম অযোনিসম্ভূত।

কোনো কোনো রাত আসে অশ্বারোহী বর্বরের মতো
দৃপ্ত পদে, নগ্ন নাচে স্খলবস্ত্রে
পেশীর সঞ্চারে ছোঁড়ে নর্মসুখ স্মৃতি,
সেদিন আমার মৃত্যু অস্বাস্থ্যসম্মত।

তিলোত্তমা দিন আসে আবার কখনো ঠা-ঠা হেসে
হলুদ চিঠির মতো, আলোর ঠিকানা দেখে
তারা ঘর্মপাতে খোঁপা খুলে মুখোমুখি বসে
নক্সীকাঁথা নাড়াচাড়া করে সুগন্ধি উষ্ণতা নিয়ে।
আমি দেখি ইন্দুমতী আলোর প্রতিমা, মা-মাটির
বিস্ফার ব্যথায় আসে গর্ভাধান
বকুল-উৎসব, গন্ধস্বপ্নে খুঁজে যাই
আরো সব বকুলের জন্মকথা সুদূরমেদুর।

রাত্রি আসে প্রিয়তম টার্মিনাস, শীতল পাটির মতো
আরেক সান্ত্বনা নিয়ে, ঘুমের শিউলি ঝরে
কোমল মাংসের স্বাদে, অলাত আঙুলে আর
পেণ্ডুলামে, প্রবচন বকুল বল্কল
গা-ভরা ভেল্‌কির বাজি হেরে হয় নিস্তাপ বিশ্রাম।
মনে হয় রাত্রির আরেক নাম
মৃত্যু অভিরাম।
হে ঈশ্বর, জন্মমৃত্যু যা দিয়েছো সুস্থ-উৎস
মৃন্ময় ফসল, তা আমার সপ্তপদী স্নিগ্ধ অনুভব
ব্যক্তিগত॥

কল্যাণ সেনগুপ্ত

যূথভ্রষ্ট

কার সাধ্য একা থাকতে পারে ?
একটু বিচ্ছিন্ন হও। কাছে দূরে শুরু হয়ে যাবে
তোমাকে লক্ষ করে সুড়ঙ্গ খনন।
তোমার পায়ের নিচে মাটি
যাতে ধসে যায়।
তুমি যে সংসারে কারো সুখের গরল নও
শুধু চাও নিমজ্জন নিজের নির্জনে
এ-ব্যাথায় তুষ্ট হবে এত মূর্খ কাউকে ভেবো না।
বরং সবাই ভাববে তুমি কোনো কূট অভীপ্সায়
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে গোপন বিবরে লুকিয়েছ।

এবং অচিরে দণ্ডবিধানের পালা শেষ হবে।
যেটুকু দূরত্বে এসে আত্মার উত্তাপ পেতে চাও
সবাই তোমাকে তারো বহুদূরে নির্বাসন দেবে।
বন্ধুরা তোমাকে দেখে ব্যস্ততার অছিলায়
চকিতে অদৃশ্য হবে জনারণ্যে, নামগোত্রহীন।
বস্তুত জ্বালাতে এসে আত্মবীক্ষণের দীপমালা
দেখবে তুমি পূজা করো প্রাণহীন নিজেরই বিগ্রহ।
তার চেয়ে যূথবদ্ধ হও।
তুমি একলব্য নও কর্ণার্জুনবিবাদীও। কুরুকুলে তুমিও কৌরব।
তোমার নিয়তি, জেনো নির্বিশেষ থেকে
অসংখ্যের মাঝখানে আজন্ম বহন করা হৃদয়ের, শরীরের শব।

[illegible] দত্ত

ভুল একলব্য

হঠাৎ পথের মোড়ে, যখন রাস্তা ঘোলাটে এলোমেলো,
কাঁচা বয়সের কথা,
সাক্ষাৎ না হলে ভালো ছিল
একজন বিপ্লবী কবি, কি সমাজবিপ্লবীর সঙ্গে

রাত্রে ভালো ঘুম হতো
রক্তক্ষরণে ভিজে যেত না বিছানা
শরীর ফুলে ফুলে উঠতো না দুঃখের প্রহারে
সাক্ষাৎ না হলে আঙুল কেটে দিতে হতো না
একলব্যের।
চোরের ওপর রাগ করে আর মাটিতে নয়।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নশো ধাপ উঠে যাই....

নশো ধাপ উঠে যাই কটিকপাথর বেয়ে ঝোরা।
নড়বড়ে টেবিলে মাথা গুঁজে অঁাট করে ধরে আছি হাত তোমার।
পাথাল জমির চরে গা ডুবিয়ে কাদার স্বভাব চাখছি গায় বুকে।
ঝোরা কলকল করে ফুলে ওঠে রুপোছোপা ঘুমে।
নশো ধাপ উঠে যাই, চুড়োর মুকুটে পাক খায়
দিপ্ দিপ্ আকাশ...

বারোটা অনড় রাত। জেলখানার [illegible] মতো [illegible]।
বারোটা অনড়·· ঘুমবন্ধ হয়ে জেগে আছে [illegible]।

পাথাল জমির চবে কাদার সুতার চাখছি গায় বুকে।
ঝোরা কলকল করে দুলে ওঠে রুপোছোপা ঘুমে।
আঁচড়ে হিঁচড়ে তুলছ—রবারের বলের মতো গলে ঝরে যায় তার মাথা।
দলবাঁধা কুকুর হাঁকছে পালা করে ·নড়বড়ে টেবিল
ঝন্‌ঝন্ বেজে ওঠে—নশো ধাপ চুড়োয় আঁট করে ধরে আছি তোমার হাত···
আগুনমোমের মতো গলতে গলতে হঠাৎ কিছু নেই আর
আলগা মুঠোর মধ্যে—শিরশির করে ওঠে রাতের বাতাস—

খোরা শেষ করে ঘন ডুবনীল পিঞ্জরার আঁজি।
গোপন গলার রঙে ঘর গন্‌গন্ করে ওঠে।
পিছুসান দিয়ে চলে যায় যেন আঁচ গায়ে লাগে—আধাবুনো গাঁ,
পাথাল জমির চরে পা ডুবিয়ে কাদার সুতার চাখছি গায় বুকে।
কখন ঝলে পড়েছে মেঘবৃক্ষের ঢোলা ঢোলা পাতা, মাথায় লাগছে
আসুকিবাসুকি নাগ—লালনীল ফিতের বিদ্যুৎ—
দেয়াল দেয়াল ছিঁড়ে ফুঁসে ওঠে—বেনাগাল চুড়োর মাথায়
শেষ বাঁধটুকু ছিঁড়ে খসে গেল হঠাৎ—কালো তীব্র পাষাণপাতাল,
দশদিশ বাঁধা করে কালো তীব্র পাষাণপাতাল··
ধরে কল কল করে বেজে যায় একটানা ঘুম—

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ঝড়ের জন্য অপেক্ষা

ভারতবর্ষের আগে 'মহান' শব্দটি খুব সুন্দর মানায়,
আশ্বিনে মানায় চঞ্চল ঝলকে মেঘ হিমালয়ের চূড়ায়,
ওই সংকুল পাথর থেকে, [illegible]

নির্ঝরিণী নেমে এসে সবুজউল্লাসে এঁকে বেঁকে
নারীপুরুষের নামে কত নদনদী হয়েছে আর
ডিংডং ডিংডং ডিং
মন্দিরেও ঘণ্টার পৃথক সায়ংধ্বনি যখনি জেগেছে, বোঝা গেছে
এই দেশে আলাদা আলাদা বহু দেবদেবী রয়েছে
এবং মানুষও ভাত খেয়ে অথবা না খেয়ে ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেছে
যেন সে জ্যান্তই থাকে, উদ্গার তোলার মতো
খাদ্য যেন পায় তার ছেলে ছেলে-বৌ
অর্থাৎ মন্দিরে ঢুকে নিজের দেশের জন্য প্রার্থনা করে নি কেউ
তবু ভারতবর্ষের আগে 'মহান' শব্দটি বড় সুন্দর শোনালো।

বুদ্ধ অনেক প্রকৃত কথা স্পষ্ট বললেন, বহুদিন পরে
এযুগের মানুষদেবতা রামকৃষ্ণ আরো সোজা করে
শেখালেন ভালবাসা, দেখা গেল দিব্যোন্মাদ একজন ব্রাহ্মণ
সূর্যকে অবাক করে দেশের পতাকা তুলে দিচ্ছে
রাজনীতি নিশানের অনেক ওপরে। এখন
এরা কেউ মানচিত্রে নেই, শুধু 'মহান' শব্দটি রয়ে গেছে।

ভেবে দেখুন হে পাঠক, যে দুটি গ্রন্থের লক্ষ কোটি শব্দের গভীরে ভারতীয়
সভ্যতা, সমাজ, অহিংসা প্রভৃতি প্রিয়
নাম, সর্বনাম, ঐতিহ্যের ঠিকানা রয়েছে সেই রামায়ণ মহাভারত তো
আসলে যুদ্ধের গল্প, যেখানে হিংসায় মৃত্যু, গুরুজন হত্যা, রমনীর ঋতুরক্ষা সব
পেয়েছে লেখার গুণে ধর্মের সৌরভ
যেন হিংসাই প্রকৃত ধর্ম, কৃষ্ণের শেখানো ক্রোধ অর্জুনের অনিবার্য তীরে
মৃত্যু হয়ে ছুটে যায়, পাঁচটি জারজ পায় হৃতরাজ্য ফিরে,
রাজ্য না শ্মশান? সেই থেকে শ্মশানই এ দেশে কিছু সম্মান পায়।
এভাবেই মহাদেশ দেশ হয়, দেশ ক্রমশই ছোট হয় গ্রাম, গঞ্জ, রিক্ত পরগনায়,
পাঁচজনের যুদ্ধ শেখে জন্মসূত্রে ভারতবর্ষীয় জনগণ,

ভাতের জন্যও যুদ্ধ হয়, নেতৃত্বের জন্য হয়, ধর্মেরও থাকে বহু প্রয়োজন।
বহুদিন অপমানে, বহুদিন বেঁচে থাকার বিরক্ত বেদনায়
একজন ক্ষিপ্ত কবি চাঁদ, তারা, নারী সব সরিয়ে ধাকায়
লোলুপ বাঘের মতো 'মহান' শব্দের টুটি হিংস্র চেপে ধরে,
তারপর 'মহানের' মৃত্যু হলে পার্লামেণ্ট ভেঙে যায়
পার্লামেণ্ট ভেঙে গেলে পুনর্বার এসে যায় নির্বাচনের সময়।
এই নির্বাচনকেই আমার ভয়, আমরা বেছে নিই যাকে সেইতো দেখি
'হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা'
বলে। হিমালয় ক্রমশ গম্ভীর হয়
সমুদ্র, গাছপালা, সৌধ, নতুন ঝড়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কুয়াশা

কুয়াশায় হাত রাখলে নির্জনতা বুঝতে পারি
কেমন নিজের থেকে নিজে ভিজে বাতাসে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি

অথচ কথা ছিল কুয়াশা সরিয়ে সরিয়ে রোদ আনবে তুমি
শৈত উত্তাপ মেখে সবুজ ঘাসে পা রাখবো আমরা।

কথা ছিল। কথা থাকে।
এমনি করেই কুয়াশার পর কুয়াশা চাদর বিছিয়ে বিছিয়ে
হাতে হাত রাখা অরণ্যানীকে ঢেকে ফেলে মায়া জালে,

তুমি হয়তো পথ খুঁজে না পেয়ে অন্যমনে তারার ঠিকানা খুঁজেছো,
অথচ কথা ছিল সুসময়ে রাত্রি আনবে তুমি।

কথা ছিল। কথা থেকে যায়।

কুয়াশায় হাত রাখলে নির্জনতা একান্ত নিজস্ব॥

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

এইরকম

ঠা-ঠা রোদ্দও উৎসব
মুকুন্দ আলির কেরায়া নৌকো
পাট-পচা গন্ধ
কালীঘরের দেয়ালে ঝুলন্ত খাঁড়াটা একবার যদি
ছুঁতে পারতাম।

পদ্মপাতায় জল ঢালা আর জল ফেলা
খেরো খাতায়, হিজলের বনে ভিতু দুঃখ অপেক্ষা করত
উৎসব হাতের মুঠোয়
কালপুরুষের বেল্টের নিচে
আমাদের ছ'আনার জমিদারি।

শৈশব থেকে দূরে এই মৌসুমি মধ্যাহ্ন
বহুকাল পর নিজের সঙ্গে একা দেখা
কিছু কষ্ট—ঝেড়ে ফেলা দরকার,
কিছু কাপড়—একটি সুতোও গায়ে রাখার দরকার নেই
মাথার ভিতরে চড়া বাজনাটা বেজে যায়
ঝনঝন্ ঢংঢঙ ঝন্ ঝন্
নেমে আসে উঁচু দেয়াল
শৈশব যৌবনের মাঝখানে
প্রশ্নচিহ্নের মতো
নাচতে থাকে একটা সিঁদুর-মাখানো খাঁড়া।

সুরজিৎ ঘোষ

দেশ পরদেশ নয়

দেশ নয়, পরদেশ নয়
একটি কলমিলতা বেড়ে ওঠে স্নানপুণ্য জলে।
পরিচয় ছাড়িয়ে সে যতদূর লাবণ্য-সতেজ
টিনের মুকুট থেকে ততদূর আলো এসে পড়ে।

স্রোতের কলমিলতা জলের তলায় গাঢ় মুখ
সেই মুখ শিশুটির, আজ যার কঠিন অসুখ।

হাওয়ায় কলমিলতা, জলের মাথায় উঠে পড়ে,
দেশ পরদেশ নয়, হাসিমুখ, অচেনাঅসুখ
লুকোনো আলোয় নড়ে চড়ে।

সামসুল হক

অথচ সে

দাঁড়িয়ে থেকো না আমি বসো কিংবা হাঁটো
বসে থাকিস না তুমি পালক কুড়িয়ে ডানা বাঁধ
অথচ সে এইসব করতে না-পেরে একা শ্রেণীহীন কাঁদি
বিদ্রূপের মতো বসা ইঁদুর মতোন হেঁটে যাওয়া
পালক মানে কি লাল আর
ডানা মানে ভিখিরির ভাতের সুবাস
দুপুরে সে এইসব জানতে না-পেরে শিল্পে সজ্যহীন কাঁদি

তরবারি ভেঙে গেলে আমি-ই হয়েছো তরবারি
ভিক্ষাঝুলি উড়ে গেলে তুমি গিয়েছিস পম্পেইয়ের
পাইরোক্লাস্ট থেকে ধন্য নীবার কুড়োতে
অতিরিক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় SiO_2

অথচ সে এইসব কবতে না-পেরে একা শ্রেণীহীন কাঁদি

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দোষ দিও না

পাপের পথে পা দিয়েছি, পাপে ডুবছি, পাপে ভাসছি,
পাপের পথে এগিয়ে যাচ্ছি দ্রুত

এগিয়ে যাচ্ছি প্রলোভনের অদৃশ্য কুমন্ত্রণায়।

তবু আমার গতিবিধির দিকেই তোমাব নজর।
যেদিকে হাঁটি, সেদিকে তুমি হাঁটো।

দোষ দিও না তোমায় আমি নষ্ট করছি বলে।

বেণু দত্তরায়

রাজগীরের কবিতা

১. শেষরাত্রে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে চলেছি
স্নানের পোষাকে
অ্যাশফল্টের পুরানো রাস্তাটা
ডাইনে বিম্বিসারের মৃত নগরীর
কংকাল
হাওয়ার শীত-শীত আমেজ আলোগুলি
দাঁড়িয়ে
বার্মিজ বুদ্ধিষ্ট্ টেম্পল বাঁয়ে রেখে
ডর্মিটারী ওই দিকে—
জাপানী টেম্পলে কাল বিকেলে
হাওয়ায় মৃদঙ্গ বেজেছিল
মনে আছে ?

২. স্বপ্নের মতো মনে আসে এইসব
হাজার হাজার বৎসরের পুরানো স্মৃতি
স্বপ্ন ভেঙে
নৈরঞ্জনা একদিন ওইখানে ছিল, মস্ত
কালো পাথরে বাঁধানো মূর্তি, ভগ্ন
দেবদত্তের স্তূপ
আমরা হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি
মস্ত বড় গাছটা, রাজগীর
নিউপয়েন্টের আলো
বাতাসে শীত-শীত · টাঙ্গা দাঁড়িয়ে
গরম চাদরটা আনলে চলত

৩.

পুরাণের সরস্বতী চলেছেন পায়ের তলায়
কাঠের ব্রীজ, উপরে উঠবার সিঁড়ি
ধাপে ধাপে ধাপে
বাঁধানো চত্বর, আমরা
কত উঁচুতে উঠব ?
রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িতে রাত পৌনে চারটে

পরেশ মণ্ডল

দিনলিপি ১৯৮০

দেখতে দেখতে বছর চলে যায়
চলতে চলতে বরফ গলে যায়
আর পাহাড থেকে বেড়ে ওঠে একটা গাছ
কী নাম জানি না
গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ফুল
দেয়ালে
ঘরের মধ্যে অমাবস্যা কেননা লোডশেডিং
ক্যালেণ্ডারে দিনটা শুভবার রোববার
টেবিলে একটা বুদ্ধমূর্তি
পাথর হয়ে ছিল
এখন একটু নড়ে বসল

দেখতে দেখতে বছর চলে যায়
চলতে চলতে বরফ গলে যায়
আর পাহাড় থেকে বেড়ে ওঠে একটা গাছ

বাসুদেব দেব

ঝড়বৃষ্টি

কিছুই জানো না যেন তুমি
রান্নাঘরে সুগন্ধি ব্যস্ততা
আগুনের আঁচে রাঙা মুখ
বাগানের পিছে জমছে নিঃশব্দে মেঘের অভিমান
পুকুরে সে ছায়া পড়ে
কিছুই জানো না যেন তুমি
তুমি কি তোলো নি ঝড়
ভাঙো নি কাচের যত কিছু
ছিঁড়ে খুঁড়ে বুক তুমি চাও নি কি
তৃষ্ণার ছোবল
কৃষ্ণচূড়া
পেয়ালা পিরিচে শুধু কৃত্রিম লিরিক
আনমনে তোলো তুমি
চিনির কৌটোর কাছে বড়ই কাঙাল দুটি
পিঁপড়েকে দিতেছো প্রশ্রয়
কিছুই জানো না যেন
নিষ্ঠুর রমণী, তবে 'নমস্কার আজ তবে যাই'

'ঝড় নয় আজ কিন্তু বৃষ্টি হতে পারে'
জানালার দিকে চোখ তুমি যেন কিছুই জানো না

রবীন আদক

বাঁকুড়ার ঘোড়া

অন্ধকারের নাভি ছিঁড়ে উঠে এল চাঁদ,
আমাদের দু'চোখে তখন
জ্যোৎস্নার আরাম হাত-পা মেলে বসেছে।
আমরা একটা কংক্রিটের ব্রিজ পার হয়ে এলাম
নিচে অভ্রের বিছানায় দ্বারকেশ্বর
শহর তখনো দু'ঘণ্টা দূর।
আচমকা বিদ্যুতের চাবুক পড়লো ঈশান কোণে,
বিশাল একটা শাদা কালো মেঘ
জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে ছুটে এল যেন অশ্বমেধের ঘোড়া,
তার কপালের জয়পত্রে আটকে ছিল চাঁদ
ক্ষুরে বৃষ্টির মুক্তো,
আমরা পথের মধ্যে দু'হাতে মুক্তো কুড়িয়ে ভিজেছিলাম।
বাড়ি ফিরতে মাঝরাত
আকাশ তখন মাজা নীল,
উঠোন ভরে আছে চিত্রল হরিণের মতো জ্যোৎস্নায়,
বসার ঘরের টেবিলে বাঁকুড়ার ঘোড়া
তাদের পোড়া মাটির গায়ে ঘাম অথবা বৃষ্টির চিহ্ন নেই॥

জগত লাহা

আবার আয়না

প্রসিদ্ধ অভিনেতা হতে চেয়ে ছেলেবেলায় আমি
হরিতকি কাঠের একটা বিশাল আয়না কিনেছিলুম।
সেই আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি রোজ,

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হরবোলার মতো পার্ট বলতুম।
কথনো অশালীন ভুরু কুঁচকে ভেত্রাচোখে তাকিয়ে
থাকতুম। দোয়েলের মতো শিস দিতুম। ময়নার মতো
গান গাইতুম। রকবাজ ছোকরাদের মতো ভিলেনি
হাসি মকশো করতুম। পেঁচার মতো চোখ পাকাতুম।
বিড়ালের মতো গোঁফে তা দিতে দিতে কল্পিত ব্যক্তিকে
উদ্দেশ্য করে হাঁড়িচাচাকণ্ঠে ধমকে উঠতুম। বাঁদরের
মতো দাঁত খিঁচিয়ে এলোপাথাড়ি ভেংচি কাটতুম।
হর্ষ ক্রোধ বিষাদ—নানান মানবিক ভাব ফুটিয়ে নিজেকে,
বন্ধু এবং প্রতিবেশীকে মুহূর্তে হতবাক করে দিতুম।

তারপর ক্রমশ বড়ো হলুম, কিন্তু বড়ো অভিনেতা
হতে পারলুম না। আয়নাটা থেকেই গেল।
বিবর্ণ হল কিছুটা। চতুষ্কের চারপাশে মরচে
ধরল। গ্লাসটা হলদেটে এবং ঘোলাটে হয়ে এল।
এখন আমি আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালে
আয়নাটাও সরাসরি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। দাঁত বের করে হাসে।
চোখ পাকায়। গোঁফে তা দিতে দিতে ধমকাতে
থাকে। ক্রমাগত ভেংচি কাটে। হর্ষ ক্রোধ বিষাদ—
নানান সব ভাব ফুটিয়ে আমাকে অবাক করে দেয়।

স্বপন সেনগুপ্ত

কার্বিক চাতাল চেয়ে

কার্বিক চাতাল বেয়ে উঠে আসছে
[illegible] [illegible] হাঁস।

তার কোন ভয় নেই, ভীতি নেই—
ভয়ানক খাড়া কিংবা জলের পাহাড়,
রক্ত-অপরাহ্ন—
কোনদিকেই তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই

খর-ক্ষিপ্র বিস্ফুরণে এগিয়ে আসছে
চক্‌চক্‌ করছে তার পালক
অতলান্ত ভুলে যাওয়া স্ফটিক চোখ

ফেনিল ঢেউ কেটে কেটে ক্রমশঃ
এ গয়ে আসছে বিদ্যুৎ-ঝলকে
ক্রুদ্ধ চঞ্চু, আক্রোশী,
হয়তোবা আংশিক কামুক

চিড়ে ফেঁড়ে যেন দেখতে চায়
মৃত্তিকায়, বিশুদ্ধ সবুজে
পিষ্ট, জীবন্মৃত, রুটি ও ব্যথার কবলে
মানবীয় যান্ত্রিক [illegible]।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

হয়তো ভাবছো

হয়তো ভাবছো, ফিরতি ট্রামেই
বাঁধা বান্দার মতো এসে দাঁড়ালো আমার উঠোনে
বড়জোর কিছুদিন এ গলি ও গলি ঘুরে
পুনরায় [illegible] নতুন কোনো [illegible]
কেননা প্রবাদে আছে, এক বর্ষার জলে
হৃৎপিণ্ডের সমস্ত প্রদাহ জুড়োয়।

হয়তো ভাবছো, ফিরে আসব বলেই
অভিমানে ফোঁস করে একছুটে বাইরে এসেছি
হয়তো ভাবছো, এ আমাব প্রথাসিদ্ধ ভান।
কিন্তু মনে বেখো
অন্তর্নিহিত পুরুষ একবার আহত হলে
ভিখিরির অঞ্জলিও ডিনামাইট ছুঁড়ে-দিতে পারে।

যদি ফিরে আসি
দস্যুর পোশাকে এসে তছ্‌নছ্‌ করে দেব তোমাব প্রতিমা।

যতীন্দ্রনাথ পাল

দুপুরের দিকে

এইত প্রথম তুই পা বাড়িয়ে দিয়েছিস্ এমন একটা রাজ্যে
যাকে ঠিক জানিস্ না. বুঝিস্ না,
কচি নীল সবুজ শাখার মত সকালের থেকে
রোদভরা দুপুরের দিকে সবুজ মাঠের দিকে,

অরণ্য রয়েছে মনোরম, নাকি রহস্যে ভীষণ
ওখানে কোকিল ডাকে,
ওখানে কি শ্বাপদও রয়েছে ?
সবুজ মাঠটা যেন টেনে নিচ্ছে তুই চোখ দিয়ে .

অজগর অনেকেই বলে অজগর,
মোহন শরীর নাকি কুটিপাটি ছেঁড়াখোড়া
করে দেবে, যখন ওর ময়ূর-নাচে ভীষণ তন্ময়।
দাঁতে করে কল্‌জে চুষবে হায়েনারা;

ভয়ানক খর যে দুপুর

অশোক সেনগুপ্ত

বসে থাকে কেহ

সে কখনো আসে না
অন্তরে আলো জ্বেলে যার তরে
বসে থাকে কেহ।

যে আসে সে কভু সে না,
দিন কত হয় গত হয় চেনাশোনা
তারপরে দেখা যায় এতো আর কেহ।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরাধিকার

তোকে যে লুকিয়ে দেখি আজকাল
তুই টের পাস ?
ইচ্ছে ক'রে দূরে দূরে রাখি
পাছে তোর মাছরাঙা
আমাকে এড়িয়ে
উড়ে যায়।

অথচ, সকাল-সন্ধে
তোকে দেখা ছাড়া
কাজ নেই।
তোর শিশুশরীরের ননী
কার হাতে ভেঙেচুরে

গ'ড়ে উঠছে
নতুন শরীর।

তোর মুখে ছেলেমানুষীর সর
কেটে গিয়ে
দেখা দিচ্ছে আমার আদল,
আমাদের,
বাঁড়ুজ্জ্যেবাড়ির।
প্রপিতামহের জেদ
তোর রক্তে,
চওড়া হ'য়ে ওঠা কাঁধে
অকুতোভয় পিতামহ।

তোরই হাতে দিয়ে যাব, বংশধর,
উত্তরাধিকার।
তোরই বুক মুখে ক'রে
মুখে নেব তোর হাত থেকে
মুখাগ্নির নুড়ো নয়,
বংশের মশাল।

ব্রত চক্রবর্ত্তী

পাখী

একটি ছোটো পাখী আজ সকালবেলায় এসে
আমাকে জিজ্ঞেস ক'রছে আমি কেমন আছি।
এই পাখী অনেক পুরোনো পাখী, কয়েকবছর আগেও দেখেছিলুম
এই পাখী আমার আত্মার ভেতরে এসে কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করছে।

পাখী বিষয়ে আমি কম বুঝি কিন্তু আমি
আন্তরিকতা চিনি। বন্ধুদের শীতল অভ্যর্থনা যখন দুঃখ দেয়,
সম্মেলক সঙ্গীতের ভেতব বেসুরো লাগে আমার গানের গলা,
তীব্র শীতের দিনেও কাব কোটের আড়ালে ঘেমে উঠি
এক যুক্তিহীন বিষণ্নতায়, ঠিক সেইসব দিনে
আমি এই পাখীর উদার উপস্থিতি টের পাই।
টের পাই ঈশ্বরের মতো আমাব ভেতরে এসে সে আমাকে
বাজাতে শুরু ক'বেছে।
আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি বিষয়ে যত গল্প প্রচারিত আছে পৃথিবীতে
আমি সমস্ত পড়ি নি, তবু এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি
আমার দুঃখের দিনে এই পাখী কাছে এসে দাঁড়াবেই।
মনে হয়, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আত্মা এই
পাখীব খবর জানে। জেনে, স্থিব হ'য়ে আছে এই রুক্ষ পৃথিবীতে।

মঞ্জুভাষ মিত্র

শরৎকাল

সে যেন আসুক সে যেন আসুক
প্রতীক্ষাময় আমার প্রেম।

প্রতিজ্ঞা কত করেছি এবং
অবশেষে গেছি ভুলে
আমার ভয় ও আনন্দগুলি
ফোয়ারার মত রঙীন, গিয়েছে খুলে

তৃষ্ণার চাপে হৃদয় আমার
কালো হয়ে যায়। হে শরৎকাল

সে যেন আসুক সে যেন আসুক
আমার প্রেয়সী।

স্বর্ণ-রচিত সবুজপাথর
সুন্দর হাতে বেপমান
অতি বেড়ে যাওয়া নিষ্ঠুর ফুল
দৃশ্যেরা করে গন্ধ-গান

বনের ভিতর সবুজ পাতার
মতন চকিত তন্বী তরুণী
আজ তাকে দেখলাম
যেন বিষণ্ণ নীল ভায়োলেট।

সে যেন আসুক সে যেন আসুক
মোহময়ী ওই শরৎকাল।

মুরারিশংকর ভট্টাচার্য

কবিতা

দুঃখ যখন পাতাল ফুঁড়ে ওঠে
পাশেই তখন দাঁড়াও অনিকেত
হাজার সুখের আভাস দিয়ে বুকে
উত্তরণের পরাও উত্তরীয়।

দুঃখ যখন পাতাল ফুঁড়ে উঠে
হাত বাড়িয়ে হৃদয় ছুঁতে চায়
তখনি তোমার বজ্র ওঠে হেঁকে
জানিয়ে দিয়ে শুদ্ধ অভিপ্রায়।

অশোককুমার মহান্তি

দু'টান

মানুষের ভালোবাসা ঘর বাঁধতে বলে
ঈশ্বরের ভালোবাসা ভেঙে দেয় ঘর
আমি দোটানার মধ্যে বহুদিন এরকম যন্ত্রণাকে ভুলে যাই
বহুদিন যন্ত্রণা আমাকে অবসাদে ক্লান্ত করে
ক্লান্ত করে··
আমি শুধু ঘরে বাইরে ছোটাছুটি করি।
আগুন লেগেছে ঘরে আগুন লেগেছে দেহে
আগুন লেগেছে শিশ্ন আমার উদরে
মানুষের ভালোবাসা ঘব
ঈশ্বরের ভালোবাসা শূন্যস্থান নির্জন আথর
আমি দোটানার মধ্যে বহুদিন এক-কে দ্বিগুণ করে ফেলি।

আনন্দ ঘোষ হাজরা

পরিচিত ভাঁড়ের গল্প

শিরীষ ফুলের মতো রোদ বেয়ে একদা এনেছি সিন্ধুপার
ইত্যাকার ভেবে ভেবে হাতীর ছায়ার নিচে আমাদেব
পরিচিত ভাঁড়
কেঁদেছিলো, ভেবেছিলো মুখমণ্ডলের মধ্যবিন্দুর আগুনে
বয়স পুড়েছে দীর্ঘকাল ধরে,
অথচ কি বয়স্ক সেগুনে
বৃষ্টিভারে নত মেঘ ছোঁয় নাই অভ্রের মতো প্রতিভাসে?

শব্দ ক'রে হেসে পরক্ষণে
প্রখর মধ্যাহ্ন এলে আপন খুলির শূন্য স্তব্ধতাকে
সূর্যের আলোর দিকে ধ'রে
শমিত সামর্থ্য নিয়ে ফিরে গেলো ব্যস্ত যাদুঘরে ॥

অজিত বাইরি

সময় সব শোক ভুলিয়ে দেয়

সময় সব শোক ভুলিয়ে দেয়—
পুরনো কথাটাই আবার মনে পড়লো
দেওয়ালে টাঙানো দেখলাম যখন
তোমার প্রতিকৃতি।

তুমি একা। গলায়
শুকনো ফুলের মালা। প্রথম প্রথম
দু'চারদিন বদলানো হলেও
এখন আর হয় না।

এখন চায়ের টেবিলে প্রসঙ্গক্রমে
উঠে আসো তুমি। এবং তেমনি
আবার কথার আড়ালে হারিয়ে যাও।
কতগুলি ঋতু
তোমার মৃত্যুবার্ষিকী ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল
কেউ খোঁজ রাখে না।

শুকনো পাতার মত জড়ো হওয়ায়
এবং আবার উড়ে যাওয়া হাওয়ায়
তুমি একটি নাম।
সময়ের বিধান অগ্রাহ্য করা আমাদেরও অসাধ্য ছিল।

সুব্রত রুদ্র

বেঁচে থাকবে কেন

মানুষ বেঁচে থাকবে কেন যদি-না মাথা হারিয়ে ফেলে ?
তুমি কী জানো ? পৃথিবীর এদিকে অন্ধকার
নেমেছে। সমস্ত মানুষ গিলতে।
তুমি কী জানো ? পৃথিবী কোথায় আছে
আমি তা জানতাম না তাই এত কথা বলেছি
আমার ভয় হচ্ছে শূন্যে পৌঁছে যাবো আমরা।

রোজ সকালে গলায় দড়ি দিতে চাইছি আমি।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পথে

বেরিয়ে পড়েছি পথে
সুটকেশ সাথে নেই
কোথায় কোথায় যাব
নেই সেই তালিকাও।

বৌ আর বাচ্চাদের
সামলাতে ভীষণ ব্যস্ত
ট্রেনে লোকটির প্রশ্ন :
কোথায় যাবেন স্যার ?

কোথায় যে যাব আমি
কোথায় যে যেতে হয়

কোথায় যে যেতে নেই
আমি তার ছাই জানি।

সূর্য মরে যান দূবে—
দূর নক্ষত্রের আলো
বড়ো ম্লান গায়ে লাগে
শীত করে—শীত করে।

নিখিলকুমার নন্দী

কি সাহস।

ভীষণ টানছে তবু...
বিবিধ টাঙানো আয়োজন চারধারে বাধা এবং পরিধি
স্বহস্তনির্মিত কিছু সামাজিক সঙ্‌বদল গূঢ়ফণা ভান ও ভনিতা
ভয়ংকর আরূঢ় আসনে উপবিষ্ট
আর তার আয়ত নয়ানে দেবী-আরতির গন্ধধূপধুনো
ধূমময় আচ্ছন্ন সুন্দর

দূরকে কাছের করা কী কঠিন হিমের পাহাড়।

সহজ চাহনি দিয়ে খেয়া-পারাপার তার অকপট চাওয়া
দরজা-জানলা-খোলামেলা ইচ্ছাগুলি তথাপি অন্যায়
যদিও তা সৎ আন্তরিকতম গোপনের নিভৃত উত্থান
কী সাহসে থেকে থেকে স্পর্ধিত দাঁড়ায়।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

যাওয়া

পা বাড়িয়েই দাঁড়িয়ে আছি
তুমি এলে
যেখানে যেমন যা যা আছে
ঠিক তেমনি রেখে
কুণ্ঠাহীন যাবো
বড়ো জোর
পিছনে তাকাবো ফের্
দেখে নিতে মৃদু আলো
গাঢ় অন্ধকার ঘর।

তবু বলি
একটু অপেক্ষা করলে হত
কিছু দেনাপাওনা বাকি
কিছু পরিশোধ
গেরুয়া মাটির এই ঋণ
কাঙাল দুঃখিনী চোখে
অল্প একটু তৃপ্তির আঁচড়
টেনে দিতে প্রতিশ্রুতি
দেওয়া ছিল। যেন অই দুটি চোখ শুধু
আমার পিছন টান
যেতে যেতে
অল্পস্বল্প মন খারাপ হবে।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি একাই তার গান গাইবে

রাত্রি একাই তার গান গাইবে
একাই সে কথা বলবে নিজের সংগে
দুঃখে সে ভারাক্রান্ত করে তুলবে আষাঢের আকাশ
তোমার মনে পড়বে খুব সাধারণ সেই মেয়েটির কথা
খোলা মাঠের খোলা বাতাসে
যে তোমাকে প্রথম চুম্বন উপহার দিয়েছিলো
ভালোবাসার রক্তে রাঙা হয়েছিল মাটির পৃথিবী
এখন সেই বিমুগ্ধ স্মৃতি এতই সুদূর
তাদের উপন্যাসের ঘটনার মত মনে হয়
—তবু মনে হয়
রাত্রি একাই তার গান গায়
একাই সে কথা বলে নিজের সংগে

কিরণশঙ্কর মৈত্র

ভেসে যাই

মায়ের হৃৎপিণ্ডের তাপ ছিল না
বরং ফণীমনসার ঝোপে মাথা রেখে
কখনও মাধবীলতা
বুকের বাগানে, দাঁড়ে
যত্নে পোষা সবুজ ময়না,
আলোকিত পাইনের গান
যেখানে রোদ্দুর চাদর বিছায়

পাহাড়ী মেলায়—
খোলা হাওয়া মুখে মেখে
ভেসে যাই।

ভেসে যেতে হয়।

ব্রততী ঘোষরায়

বেণীবন্ধে পাপ রাখো

বেণীবন্ধে পাপ রাখো,
সবুজ পাখির অহংকার॥
নাম দাও উত্তর শাখায় যদি
পত্রবিন্দু দুহাতে ওড়ায় মিল
প্রশস্তি তবুও স্থির রেখাময়॥

যে জানে সে জানে সব পত্রময় ত্রুটি, ফেলে যায়
অন্তিম ঋণের দায়।
সেই তো রমণী কিম্বা
অশোধিত বৃক্ষরাজি
নির্মম মৃত্যুকে ভালোবাসা
সুধাপঙ্ক দুহাতে ভরানো॥

ফাঁক থাকে সময়ে ও ঘরে।
পাপ রাখো কররন্ধ্রে,
বৃষ্টিজলে
দীঘিতে, উদ্যানে॥

বরুণ মজুমদার

বিপন্ন দুঃখের কাছে

এখন মনের মধ্যে অতৃপ্ত কামনা
কে তুমি বিপন্ন দুঃখ, বিষাদের ঘরে
আমাকে দিয়েছো সঁপে অভিশপ্ত প্রেমিকের কাছে।
ব্যাপক তিমিরে একা দুর্বিনীত সম্রাটের মত
নিজ হাতে তুলে নেবো এই বেলা অতি সমারোহে
সুগন্ধি গোলাপচারা চিরকাল রোপণের ভার।

দেখেছি নদীর প্রান্তে বনানীর সঘন চূড়ায়
হলুদ রঙের রাখি নীড়ে তার মায়াবী শাবক।
রোজকার খেলাশেষে ছায়াঘন শীতের সকালে
আমাকে ঘুমোতে দাও, আমি শ্রান্ত জীবনের রণে।

তুমি হে বিপন্ন দুঃখ, বার বার অমলিন স্বরে
আমাকে ডেকো না যেন অতিব্যস্ত পাহাড়তলীতে।

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

রহস্যের সাদা পাল

জোয়ারে স্রোতের জলে আশা থাকে ভয় থাকে। মৃত্যু—

এ মৃত্যু কোমল জল, এ ভয় হারিয়ে
অন্ধকারে মাছেদের সুখ,
কিছু আশা জীবনের
রাজ্যে ফিরে আসা। চিরন্তন আশার সংগ্রাম

মৃত্যুর দরজায়। স্রোতে ক্লান্ত হলে চড়া পড়ে—
নতুন দ্বীপের বুকে তৃণাঙ্কুর, সবুজ সবুজ .....

সমুদ্রবাতাস বুঝি কানাকানি কথা বলে,
ঝড় হবে। জলের স্রোতের সঙ্গে জোট বাঁধা
মাঝিদের দাঁড় বাওয়া
গান গাওয়া অযুত যুগের, রহস্যের
থরোথরো বেপরোয়া সাদা সাদা মাস্তুলে উড়িয়ে।

মধুমাধবী ভাদুড়ী

এই সকালে

কচু পাতাটা দুলে উঠল
অথচ হাওয়া নেই
হয়তো ফড়িংটা উড়ে গেল।

এ সময়েই তিনটে ঘুঘু ডেকে চলে
অবিরাম ইলেকট্রিক তারে।
আর একটু পরে দুটি মেয়ে চলে যায়,
দূরে স্কুলের ঘণ্টা বাজবে।

এই সকালগুলো আমায় বড করেছে;
আমার মনে ইচ্ছে হয়,
সুখ দুঃখ বুঝতে পারি;
অনেক কিছুই চাইতে পারি। বা পারি না।

তবু অসহায়, পেতে পারি না কিছুই,
রোজ সকালে আমাদের চাকরটা
এখানে বসিয়ে রেখে যায়
বেলা হলে ইচ্ছে কটি দমবন্ধ ঘরে।

মানসী দাশগুপ্ত

বৃক্ষের মতন

কিছু নবীনতা ছিলো বাকি কোনদিন,
সমস্ত পুরোনো আজ। বেঁচে থাকা, মরণাপন্নতা,
বুকের ভিতরে কথা ছলছল অথবা গলার কাছে বেদনায়
অনির্বচনীয় সব এত বেশি জমা হয়ে উঠেছে কোটরে—
খুঁজলেও মিলবে না।
বাসাবদলের ইচ্ছে অনুভব করেছিল তাই
একজন সংসারী মানুষ।
এখন প্রাচীন তা-ও। শুধু পড়ে থাকা।
বসন্তসন্ধানী সূর্য, তেজ একটু মন্দ্র করে রাখো,
কাঠুরে অক্লান্ত হাতে সুনিপুণ আঘাতে কাটুক
জড়ের মাটির মায়া।
যে-মমতা সহস্র শিরায় পিছু টানে।
স্থবির বৃক্ষের আঙুলের অসফল মুঠি
বিনাশর্তে খুলে যাব বিনিঃশেষ আত্মসমর্পণে।

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয় পাখি

এসেই দেখি তোমার বাগানে
খেলা করে ছয় টিয়েপাখি
এডালে ওডালে ফেরে, সন্ধ্যা ভাষায়
পরস্পর কথা বলে, ঠোঁটে ঠোঁট রাখে।

রাস্তায় বিস্তর ধূলো—
ট্রাক, রিক্সা, বাস, পি পি জীপ,—
পাকালো পাতার ডাঁই, নেড়িকুত্তা,
কা কা কাক, পিলে-উদোম ছেলে,—
হঠাৎ ট্রেনের বাঁশি বাজে।
অর্থাৎ সম্পন্ন শহরের এই ইতিবৃত্ত। তবু
অনেক দূরের দেশ থেকে মেঘের জাজিমে
রোদের তির্যক সুতো বোনে তন্তুবায়
দৈবী চরখায়। বুক জুড়ে বাজায় দোতারা।

ছয়টি প্রমত্ত পাখি নিয়ে
টিয়ে-রঙ বয়স্ক বৃক্ষের মতো নতভার
ঘর করি দীর্ঘ কাল জুড়ে,
গার্হস্থ শাখায় দোলে ছায়া মায়া।
ছয় পাখি সন্ধ্যা ভাষায় কথা বলে
তারই তালে ফাঁক খুঁজে নিয়ে
কানে কানে কথা বলি যেখানে মনের
গহন গুহায় শুধু তোমার আমার
ছয় ঋতু সমুদ্র-সময় পারাপার।

ছয় পাখি ছয় দিকে ওড়ে,
ছয় ডালে বসে, মুখ নাড়ে,
কী ভাষায় গেয়ে ওঠে সপ্তমে অন্তর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

হাইওয়ের পাশে

দু'তিনটে শাদা পায়রা
সবুজ গাছের ডালে দাপাদাপি ক'রে
তারপর স্পষ্ট উড়ে গেলো।
হাইওয়ের পাশে, ছোট্ট চায়ের দোকানে,
সমাজ, সাহিত্য নিয়ে আমরা একে একে
কথা ব'লতে আরম্ভ করলাম।

কিছু দূরে, চুর্ণি নদী কচুরিপানার নীল ভাসিয়ে ভাসিয়ে
সমান্তরালভাবে চ'লে গেছে।
কিছু দূরে, ছোটো-নৌকো খেয়া-পারাপার করছে
সাইকেল, ছাগল, আর মানুষ উজিয়ে।

ইচ্ছে হ'লে, আমরা দূরে কৃষ্ণনগরের দিকে চ'লে যেতে পারি,
কিংবা, আরেকটু কাছে, রাণাঘাটে, জয়ের বাড়িতে—
কিন্তু এখন আমরা কোথাও যাবো না,
হাইওয়ের পাশে, এই ছোট্ট দোকানে
আমরা আরেকটুক্ষণ ব'সে থাকবো, কাপ হাতে নিয়ে।

শাদা পায়রা ফিরে আসছে টেলিগ্রাফের তার ঘেঁষে,
মস্ত রেন-ট্রির পাশে ধুতুরাফুলের চারা চমকিয়ে ওঠে ॥

অরুণ মিত্র

যেখানে আংঠায় রাখা

বাজারের পথে আপিসে ইস্টিশানে গুদোমে
কলকুঠিতে শয়তানের হো হো অষ্টপ্রহর ছিটিয়ে
গিয়ে আকাশে আওয়াজের ছটা সাপাটতানের
বাহাদুরি। তবু আসে সুগন্ধ সুস্বাদ আর ঝর্নার
ঠাণ্ডা রাস্তা থেকে উঠে আসে নেমে যায় রাস্তার
উপর দিয়ে রক্ত পার হ'য়ে পোড়োবাড়ির ধসে।
ওখানে আমি ফিরে যাব আমার জায়গায় আমার
দোমড়ানো হাত পা মেলে বসব আঙুলগুলো
খুলব বন্ধ করব সেই কোণ ঘেঁষে যেখানে সমস্ত
জ্বালা আংঠায় রাখা আছে।

কবি আপোলোনীয়র

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

[উইলহেলম্ আপোলোনারিস দ্য কন্টোউইট্‌স্কি ১৮৮০ খ্রীঃ ২৬শে আগস্ট রোমে জন্মগ্রহণ করেন। গীয়ম আপোলোনীয়র তাঁর ছদ্মনাম। মা পোলিশ, বাবা ইতালিয়ান, শরীরে একবিন্দু ফরাসী রক্ত নেই, তবু তিনি ফরাসী দেশেই শৈশবকাল থেকে লালিত হয়েছেন এবং খাঁটি ফরাসী কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। মডার্নিষ্ট আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। বহু ছোটখাটো সাহিত্য সমালোচনা-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৯১৩-য় ফিউচারিজম্-এর সপক্ষে ম্যানিফেষ্টো প্রকাশ করেন। সুররিয়ালিজম্ শব্দটি ব্রেঁত পেয়েছিলেন প্রথম আপোলোনীয়রের রচনায় যদিও এর বীজ নিহিত ছিল আরও আগে র‍্যাম্বোর লেখায় বা তারও আগে নার্ভাল বালজাকের রচনায়। নারী থেকে নারীতে প্রেমের পর্যটনে বিশ্বাস করতেন কবি। বিশাল চেহারা ছিল। কিছুটা অ্যাডভেঞ্চারের বলেই প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, মাথায় গোলার আঘাত লাগে, সে আঘাত আর সারে নি। বিয়ে করলেন, ছ'মাস পরেই, যুদ্ধ থামার আগের দিন, ১৯১৮-য়, তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শবদেহ বহন করেছিলেন পিকাসো প্রভৃতি শিল্পী-বন্ধুরা।

গত ২৬শে আগষ্ট কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার কবির জন্মশতবার্ষিকী পালন করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কবির বিভিন্ন লেখার একটি তালিকাও প্রকাশ করেন জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। . অনুবাদক]

গীওম আপোলোনীয়র একদা বলেছিলেন **'I am intoxicated of having drunk the whole universe'**। তাঁর নিজের মানসিকতা সম্পর্কিত এমন উন্মুক্ত স্বীকৃতি আর কোনো কবি বোধহয় করেন নি। তাঁর কবিতার এবং সমালোচনা কর্মের সবলতা ও দুর্বলতার মূলেও রয়েছে চতুষ্পার্শ্বের নিসর্গ, শিল্প

এবং মানবিক সম্পর্কের জন্য কবির এই সর্বগ্রাসী, সুগভীর তৃষ্ণা। খুব সাধারণ জিনিসের দিকে তিনি তাকাতে পারতেন। বন্দীশালার দেওয়াল বেয়ে-ওঠা সূর্যচ্ছটার দিকে তিনি তাকাতেন সেই বিস্ময়ে, যে বিস্ময়ে আদিমতম মানুষ তাকিয়েছিল নক্ষত্র এবং চন্দ্রের দিকে। একবার, ১৯১১-য়, প্যারিসের লুভার থেকে দা-ভিঞ্চির মোনালিসা চুরি করার মিথ্যে অভিযোগে কবিকে কিছুদিন বন্দীশালায় থাকতে হয়েছিল। কবির এই বিস্ময়ানুভূতির মধ্যে ছিল পুরান ও ইতিহাসের, অতীত ও বর্তমানের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ, এবং বস্তুত সব কিছুই যা এই পৃথিবীতে চলমান এবং যা অলঙ্কৃত করেছে অমরাবতীকে। এই সর্বব্যাপী দৃষ্টি নিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর শিল্প এবং কবিতা সম্পর্কিত নিরীক্ষা। কবি আবিষ্কার করেছিলেন, অন্তত আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিলেন সমস্ত জীবন, এই সব কিছুর মধ্যে এক স্পর্শাতীত ঘনিষ্ঠতা এবং এমনকি বিশ্বাস করতেন যে 'All the words I have to say have become stars'

আজ আপোলোনীয়র বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, যে-বিশ্বভুবনের কাছে তাঁর সত্তার সূক্ষ্মানুভূতি সমর্পিত ছিল, সেই বিশ্বভুবনকে তিনি কি সত্যিই করতলগত করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কি সেই সংহত ভিশন্ ছিল যা প্রকৃত মহৎ কবিতার নির্মাণে প্রয়োজন? ঐ সংহতিবোধই কাব্যের জগতকে শৃঙ্খলা দেয়, অর্থপূর্ণ করে তোলে। এবং কাব্যের অমরতাও আসে ঐ একই সূত্র থেকে। সেই শৃঙ্খলা, যা যে-কোন কবি-সত্তার গোড়ার কথা, তারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল আপোলোনীয়রের জীবন। কিন্তু, অন্যদিকে এক দুঃসাহসিক জীবনের প্রতি আসক্তি এই অনুসন্ধানকে ব্যাহত করেছিল। তাই, শৃঙ্খলার প্রতি আসক্তি এবং অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আবেগ, ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং নতুনত্বের জন্য আকুলতা, নিয়মানুবর্তিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতার জন্য আকুতি, এই বিরুদ্ধ ইচ্ছাগুলির সমন্বয়ে তাঁর কবিসত্তা ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। সমস্ত মহৎ আধুনিক কবিদের মতই আপোলোনীয়র ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দাবীকে এক জায়গায় মেলাতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই তাঁর কবিতায় এসেছে সেই বিরল স্বাভাবিকতা ও সহজধর্মিতা। যা স্বাভাবিক ও সহজ তার একটা নিজস্ব শক্তি আছে। আপোলোনীয়রের কবিতার সেই শক্তি বর্তমান।

একজন কবি তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তিনি যা দু-হাত তুলে দিতে পারেন আমরা শুধু তাই গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু, তবু আমরা তাঁর সহজাত সৃজনী প্রতিভার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি এবং যে সব অবস্থা বা পরিবেশ ঐ প্রতিভাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে প্রতিবন্ধক হয়েছে, তার আলোচনা করি। আপোলোনীয়রের ব্যক্তিজীবনে বেশ কিছু বিপর্যয় ঘটেছিল যা তাঁকে, আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাড়িয়ে ফিরেছে। পোলিশ মাতা এবং ইতালীয় পিতার স্বাভাবিক সন্তান হিসেবে আপোলীনেয়ারের জন্ম হয়েছিল রোমে। তিনি শৈশব থেকেই ফ্রান্সকে তাঁর স্বদেশ হিসেবে বেছে নেন। কবির প্রথম যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা লেখা হয়েছিল অ্যানি প্লেডেন্ নামে একজন ইংরেজ রমণীর প্রতি তাঁর প্রেমের অনুপ্রেরণায়। এঁর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয় জার্মানিতে। আপোলোনীয়রের রক্তে ছিল লাতিন শৃঙ্খলা এবং স্লাভিক স্বতঃ-স্ফূর্তির দুটি বিচ্ছিন্ন ধারা। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একজন ফরাসী হওয়া এবং গ্যালিক প্রতিভার বিশুদ্ধতা আয়ত্ত করা। জীবনের প্রয়োজনে কবিকে বহু বিচিত্র চাকরি করতে হয়েছে, খুব অল্প বয়সে। এই সময়েই তিনি সমকালের প্রথম সারির কবি ও শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ফরাসী জীবনে একটি অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ায় কবি আগ্রহী ছিলেন এবং সেজন্যই ফরাসী শিল্প ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যে নতুন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সে-সময়ে, তিনি তাঁর নেতৃপদ বেছে নিয়েছিলেন। কিউবিষ্ট শিল্পীদের বন্ধু আপোলোনীয়রই প্রথম 'সুররিয়ালিজম্' শব্দটি সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই পরবর্তীকালের সুররিয়ালিষ্টদের প্রথম পূর্বপুরুষ। অবশ্য দাদাইজম্ আন্দোলনের ভস্ম থেকে সুররিয়ালিষ্ট আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল কবির মৃত্যুর প্রায় ছ' বছর পরে। এই সময়েই ডিল্যানের নতুন ধাঁচের শিল্পের নামকরণ হয় অরফিজম্। এবং এই সমস্ত কাজে ফরাসীদের প্রতি কবির ভালবাসা প্রায় উগ্র স্বাদেশিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছেন কিন্তু আওয়েন বা রোজেনবার্গের মত এই লড়াইয়ের জন্য তাঁর কোনো বিশেষ দুর্বলতা ছিল না। ফরাসী কবিতার মতই তিনি যুদ্ধের উত্তেজনাকে মহিমান্বিত করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, 'The French are carrying poetry to all nations. All other languages seem to be silent so that the universe may better listen to the

voice of the new French poets' আপোলোনীয়র য়েটস্, রিল্‌কে এবং র‍্যামন হিমেনেথ্ এর সমসাময়িক কবি ছিলেন।

বিভিন্নতা এবং একটি স্থায়ী আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার প্রেরণাই ছিল নব্য আন্দোলনের প্রতি আপোলোনীয়রের গভীর অনুভূতি, বিশ্বাস এবং অসীম উদ্যমের উৎসে। তিনি নতুন আন্দোলনগুলির নামকরণ করেছেন এমন করে যাতে সেই আন্দোলনের সঙ্গে তার পরিচিতি সংযুক্ত থাকে। তিনি এইসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন, কেননা ব্যাখ্যাহীন এবং কিছুটা অবোধ্য আদর্শের মাঝখানে কবি অস্বস্তি বোধ করতেন। বোদলেয়ারের পর থেকেই ফরাসী কবিতা চলেছিল এক বিচিত্র আদর্শের জগতে। বিশশতকের প্রথম দুটি দশকে হেনরি বের্গস্-র Creative Evolution (১৯০৭) ফরাসী আদর্শবাদকে নতুন ব্যাপ্তি দিয়েছিল এবং ঠিক এই সময়েই সাহিত্যে সাঙ্কেতিকতা একটি নিঃশেষিত শক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছিল। ১৮৮৬ সালে যে সাঙ্কেতিকতা আন্দোলনের উদ্বোধন করেছিলেন জঁ মরিয়াস তাঁর 'লা ফিগারো' তত্ত্বের ঘোষণায়, সেই আন্দোলন দ্রুত তার যুক্তিমূল্য হারাচ্ছিল এই সময়ে, পারনাশিয়ানরা তাদের ভিত্তিভূমি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠছিল। নতুন আদর্শ, নতুন নীতি, নতুন আঙ্গিক এবং নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নবতর এক সাফল্যে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। আধুনিক কবিতা এবং আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে আপোলোনীয়রের আবির্ভাব। দূরদ্রষ্টা কবি একটি নতুন আন্দোলনের সূচনা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং এই আন্দোলনের প্রথম যুগের প্রবর্তকদের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। আপোলোনীয়র এই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা নিলেন, কোনো অহঙ্কারে নয়, গভীর এক সাহিত্যহিতকরী অনুপ্রাণনায়। তিনি তাঁর এই কর্মভারের বিভ্রান্তিকর জটিলতা ও বিপুল বিশালতা উপলব্ধি করেছিলেন। একটি আধুনিক যুগকে নব্য আধুনিকতায় ভূষিত করার কাজে তিনি নেমেছেন। এই নব্য আধুনিকতার সক্রিয়তা কবি প্রথম লক্ষ্য করেছেন চিত্রশিল্পে। ১৯০৭-এ তিনি যখন ব্রাক এর সঙ্গে পিকাসোর পরিচয় করিয়ে দেন, তখনই আধুনিক শিল্পকলা আন্দোলনের সূচনা হয়। আপোলোনীয়র প্রথম কাব্যগ্রন্থ Alcools এবং তাঁর প্রথম শিল্প সমালোচনা গ্রন্থ 'The Cubist Painters'

একই বছরে, ১৯১৩-য় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থটিতে কবি ঘোষণা করেন যে, সমাজে কবি এব' শিল্পীর ভূমিকা এক ও অভিন্ন The great poets and the great artists have as their social function that of ceaselessly renewing the appearance which nature puts on in man's eye, শিল্প এব' কবিতার কার্যাবলী এবং ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর এই বিবৃতি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ নয় কেননা শুধুমাত্র একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করা ছাড়াও শিল্প ও কবিতার আরও অনেক কিছু বরণীয় আছে। মানবধর্মের সগোত্র ক্রিয়াকলাপ হিসেবেই কবিতা ও শিল্পকে দেখেছিলেন এই কবি। এবং এই নতুন আলোকে শিল্প-কবিতাকে দেখাই ছিল নব্য আন্দোলনেব মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

আপোলোনীয়র প্রকৃত শিল্প সমালোচক ছিলেন না। অবশ্য কোনো কোন সময়ে তাঁর স্বজ্ঞা দিয়ে এমন কিছু বলেছেন যা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। কিন্তু তিনি কখনই একজন শিক্ষিত চিন্তাবিদ ছিলেন না এবং যদিও বহুব্যাপ্ত ছিল তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিগত প্রশিক্ষণেব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পেছিয়ে। শিল্প-সমালোচক হিসেবে তাঁব শুধু ছিল উপলব্ধির গাঢ়তা ও গদ্যের স্বচ্ছতা। কিন্তু শুধুমাত্র উপলব্ধির গাঢ়তা দিয়েই শিল্প-সম্পর্কে তাঁর একটি সুস'হত মতামত গড়ে ওঠে নি। এমনকি তাঁর বন্ধু ব্রাক একবার মন্তব্য করেছিলেন যে 'Apollinaire was a great poet and a man to whom I am deeply attached, but, let's face it, he could not tell the difference between a Raphael and a Rubens The only value of his book on Cubism is that, far from enlightening people, it succeeds in bamboozling them' আমরা অবশ্যই ভুলব না যে কিছু কিছু জায়গায়, কীটসের চিঠিতে কিছু মন্তব্যের মতই, আপোলোনীয়রের শিল্প-সমালোচনা আশ্চর্য দ্যুতিময়। উদাহরণত, বিমূর্ত শিল্প সম্পর্কে তিনি 'Cubist Painters'-এ লেখেন 'We are progressing towards an intensely new kind of art, which will be to painting what one had hitherto imagined music was to pure literature.'

নব্য আন্দোলনে শিল্প এবং কবিতার বিভিন্ন নীতিগুলির বিশুদ্ধ সারাংশকে একটি তত্ত্বে পরিণত করা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদর্শকে একটি সুতোয় বেঁধে

ফেলা ও পরিশেষে আধুনিক শিল্পের সেই ঐক্যবদ্ধ আকৃতিকে কোনো চিরকালীন সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাকে যুক্তিমূল্যে স্থাপিত করার প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবল আপোলোনীয়রের ছিল না। সমালোচক আপোলোনীয়রের প্রতিভা শিল্পের জন্য একটি মহান্ অনুপ্রাণনার দর্শন নির্মাণের কাজে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর সমকালের আধুনিক শিল্পীদের সুযোগ্য সংগঠক হিসেবে যিনি কখনই তাঁদেব ভালোবাসা দিযে প্রেরণা জোগাতে ভোলেন নি।

আপোলোনীয়র মূলত কিন্তু বেঁচে আছেন কবি হিসেবে। শুধু তেমন একজন কবি হিসেবে নন যিনি এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ফ্রান্সেব অন্যতম প্রভাবশালী কবি ছিলেন, তিনি এখন সকলের শ্রদ্ধেয় ক্লাসিকে রূপান্তরিত। ফরাসী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখন তাঁর কবিতা মুখস্থ করে, অধ্যাপকেরা তাঁর উপব বক্তৃতা করেন সরবোন-এ। কবি হিসেবে তাঁর গায়ে কোনো তত্ত্বের তক্‌মা আঁটা নেই। তাঁর কোনো কবিতাতেই এমন কোনো পঙক্তি নেই যাতে আধুনিকতার সচেতন আঙ্গিক আছে এমন কোন বিষয় নেই যা সমকালীন ফ্যাশানের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি আমাদের উপহার দেন কবিসত্তার বিশুদ্ধ গীতিময়তা, খুব সরল শব্দ নির্বাচনে। সহধর্মিতা ও স্বাভাবিকতা তাঁর কবিতার রচনাশৈলীর দৃষ্টি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভের্লেন-এর পর কোনো ফরাসী কবি আপোলোনীয়রের মত কবিতায় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আনতে পারেন নি। আমরা যারা মনে করি যে কবিতায যতিচিহ্ন ব্যবহার না-করা তাঁর আত্মাভিমানী আধুনিক অস্তিত্বের ফলস্বরূপ, ভুলে যাই যে, আপোলোনীয়রের কবিতা মূলত সঙ্গীত এবং এর যতিচিহ্ন নির্ধারিত হবে সাংগীতিক ছন্দের মাধ্যমে। তাঁর যতিচিহ্নহীন কবিতার স্বপক্ষে কবি এক চিঠিতে লেখেন: "As regards the punctuation, I cut it out merely because it seemed to me unnecessary, which it is, in fact, as the very rhythm and division of the lines are real punctuation and nothing else indeed "

কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আপোলোনীয়রের কবিতায় পূর্বসূরিদের হুবহু প্রতিধ্বনি পাই। জর্জ দুহামেল Alcools কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে বিস্ময়করভাবে আগ্রাসী সমালোচনা করেছেন ও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে তাঁর

বহু কবিতাই 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড', কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁর বিরুদ্ধে এই 'কুম্ভীলক'-এর অভিযোগ কবি খণ্ডন করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদের ভাষায় তাঁর রচনাশৈলীর একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়

"I do not think I have been imitative, since each of my poems commemorates an event in my life usually of a sad nature, but I have also had joys of which I have sung"

এই সাহিত্যের ইতিহাসের একটি মজার ঘটনা যে আধুনিকতার প্রবর্তক আপোলোনীয়র, যিনি সৃষ্টিশীল জীবনে দুঃসাহসিক কার্যকলাপে এবং সমকালীন সাহিত্য-দর্শনের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন, তাঁর চরম উৎকর্ষ লাভ করেন কবি হিসেবে তখনই যখন তিনি তাঁর আধুনিকতার রাজত্ব থেকে সানন্দে ছুটি নিয়ে চলে যান ঐতিহ্যের কাছাকাছি, বিষয়বস্তুতে ও রচনাশৈলীতে। এবং আজ তাঁর জন্মের একশ' বছর পরে আমরা যখন এই কবির সৃষ্টিকর্মের দিকে তাকাই তখন কবির নিজের ভাষাতেই তাঁর বিচার করতে ইচ্ছা যায়। Calligrammes (1918) কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'La Jolie Rousse' কবিতায় আপোলোনীয়র বলেছিলেন

'You whose mouth is made in the image of God's / Mouth which is order itself / Be lenient when you compare us / To those who were the perfection of order / We who seek adventure everywhere / Have pity on our mistakes have pity on our sins'

টীকা ও অনুবাদ :

অনুপ মতিলাল

অমিতাভ গুপ্ত

তিনটি কবিতা

সরস্বতী

কিছু আমাব ভাঙাচোরা, কিছু আমাব অবহেলায় ফেলা
কিছু আমাব ছড়িয়ে আছে দীর্ঘশ্বাসের স্তূপে
তাবই উপর একটি ছোটো, বিশ্বজোড়া হাত বেখেছে সে

অন্যহাতে রয়েছে তার বীণা।

আয়োজন

ফাঁদ পেতে বসেছে শিকাবী, তার গুঁড়ি মেরে বসার ভঙ্গীটি
দেখে বোঝা যায না কে বধ্য, কে-ই বা হন্তারক
কাদার উপব মুড়ে বসেছে তার হাঁটু—থাবায ভর দিয়ে
শরীরের উপরার্ধ
এবং ফাঁদের অন্যদিকে গব গর শব্দে ল্যাজ আছড়াচ্ছে শ্বাপদ
বাতাসে ভেসে আসছে নবমাংসের সুঘ্রাণ
কিন্তু ক্রমশঃই সে টের পাচ্ছে উভয়ের মধ্যে আছে এমনকিছু
যা অনতিক্রমনীয়।

অনুসন্ধিৎসা

তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লে ক্ষোভ আর অস্থিরতা বেড়ে ওঠে বাতাসে বাতাসে
তিনি শুধু অনাড়ষ্ট, ক্ষিপ্র, অনাহত
উলঙ্গ শিশুর সামনে দাঁড়িয়ে যেমন
স্নেহ ও কৌতুকভরা হাসি
ফুটে ওঠে মুখে

অথব প্রশ্নের কোনো শেষ নেই একটি ও তারপর আরো একাধিক
যোজনবিস্তৃত
বিধুর মাঠের মতো হা হা স্বরে জেগে ওঠে, 'কেন ? কেন তবু ?'

রেভতী বিশ্বাস

আলো-আঁধারি খেলা

আলোর সঙ্গে আপোষ ছিল না যখন
ভীষণ অন্ধকারও ভরাডুবি
জ্যোৎস্নার মতো সুখ তখন ভুতুড়ে ছবি
যে শিশিরে সিক্ত আঁধার গাঢ় জমে থাকে
তার ছোঁওয়া আমার ঠোঁটে বিঁধে যায় অকস্মাৎ
প্রাচীন মহিমার মতো আলো
ঘেরাটোপ পরে সতর্ক সাবধানী
তার বোরখার তর্জনী
নিরাপদ দূরত্বে আমাকে শাসায়
এই আলো-আঁধারি খেলা
আমার জন্ম-সহোদর

যেদিন তুলেছি পদ্মবীজ হাতের মুদ্রায়
আলোর ভ্রূকুটি মার্জনা করে নি
প্রথম শিখেছি যাদুকরের তুমুল চাতুরী
আঁধারের করোটি প্রকাশ্যে হেসেছে
বিপন্ন পর্যটন সেরে
জমির সীমানা নাগালের বহির্ভূত পড়ে থাকে

শুধু আর একবার জন্ম নেবো বলে
অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ে নি।

মোহিত চক্রবর্তী

যাওয়া

যেমন ইচ্ছে তেমনই যাবো
বললেই তো যাওয়া হয় না
উঠোন জুড়ে হাজারো বাধা
অন্তরঙ্গ ছুটির মেলা
এবং মুখের আত্মীয় আর
অনাত্মীয় সব একাকার
এসব ছেড়েও কয়েকটি গান কয়েকটি শিস
দোয়েল কিংবা চন্দনাটন্দনা
যেমন ইচ্ছে তেমনই যাবো
বললেই তো যাওয়া হয় না
কথায় বলে অন্তরঙ্গ
ভালোবাসাই ঘাতক সাজে
স্মৃতির নদী দুকূল ভাসবে
কাঁদায় এবং নিজেও কাঁদে
দুয়ার জুড়ে ক্রন্দসী মেঘ
দুয়ার জুড়ে সকল বাঁধন
আলগা হতে হতেও কেমন
শক্ত জমাট বরফি কাটা
জাফ্‌রী সাঁটা কোন জানলায়
হৃদয় তোমার নাচায় ত্যাখো
উড়াল দেবে অচিন পাখি
যেমন ইচ্ছে তেমনই যাবো
বললেই তো যাওয়া হয় না

অনুরাধা মহাপাত্র

কথা রাখুক

বাসকপাতা অঙ্গে ধরবো, মেঘ, ডাকবো তোমায়, লগ্ন আসুক
শালুকফুলে ফুলের ভরণ, হয়ে উঠুক নতুন বর্ষা, থরে থরে গহীগড়ন
কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পাতবো, হলুদ দেবো, পিঁড়ি জুড়ে নতুন জলের ঘটি
লক্ষ্মীমোহর, সিঁদুরেসাপ একেই নিয়ে রাখো বাসা দেবো, তোমার ঘরে থাকো
আজ তোমাকেই ভালোবাসবো খড়ের ছাউনি, বর্ষা-ভেজা থৈ থৈ জল শালুকফুলে
মাছির মত মেধাবীরাত তফাতে থাক।
তার জন্য চলায় পা, নষ্ট কপাল, শরীরভরা মাছরাঙা রঙ, ধ্বংস গাঙ জল
ট্রেনের শব্দ, বইয়ের গন্ধ, দেশলাই ও আয়না থেকে সে একবার সরে আসুক
শালুকফুলে, ফুলের ভরণ নিমন্ত্রণের লগ্নভরা চোখের পাতায়
সেই মেয়েটির ভাসার কথা ভালোবাসা বাকের বোঁটায় আমার কথা রাখুক।

হিমাংশু বাগচী

নিজস্ব বৃত্তের পথে

অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে আমার জীবন
বাগানের ফুলের কুঁড়িরাও ঝরে যাচ্ছে
আহত চাঁদ যন্ত্রণাদগ্ধ হচ্ছে আকাশের বুকে
তোমার কাছে গোপন আছে সুধা
তুমি আশ্চর্যভঙ্গিমায় মুছিয়ে দাও সমস্ত দুঃখ
এতকাল অসীম সাহসে অরণ্যে হাঁটতাম একাকী
পশুপাখির দল স্বেচ্ছাধীন নিজের পরিমণ্ডলে
ব্যাধরমণীর স্তন থেকে মাতৃরস গড়িয়ে পড়ছিল মাটিতে
তার সন্তান ছিন্ন হয়ে গেছে স্বর্গের ওপারে

আমি তার দুঃখে বঞ্চিত হই
বেদনার ভাষা অন্তরে আগুন জ্বালায়
অনিৰ্বাণ সেই শিখা
এখন লক্ষ্য করি আহত চাঁদ, ফুল, জীবন
সব কিছুই কেমন যেন ম্রিয়মান
অসহায় আমি নিজস্ব বৃন্তে ঘুরপাক খাই

শিশির গুহ

শুধু তুমি

তখন মোহর ছিল আয়ত্তে তোমার
কাজল মেঘের তাল, রূপের সমুদ্র
সব ছিল হাতের মুঠোয়।

রুমাল পাঠিয়েছিল হাস্নুহেনা দিয়ে
পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছি—
সাম্রাজ্যে লোভ নেই, কখনো ছিল না।

এখন বুকের মধ্যে বাঁশী
ফুল ফোটায় গান শোনায়
ছবি আঁকে স্বপ্নের তুলিতে
সে কেবল তোমারই প্রতিচ্ছবি।

নিমগ্ন চাঁদের জ্যোৎস্নায়
তোমাকেই ভাবতে পারি সমস্ত জীবন॥

কমলেন্দু দাক্ষিত

অন্য অধিকার

খাবার টেবিলে বসে একদিন শিশু কন্যার পাশে
বিষম লাগলো। গিন্নীর মতে, জননী হয়তো স্নেহে
দেশের বাড়িতে সেই মুহূর্তে নাম করে ফেলেছেন।

সবকিছু শুনে গম্ভীর মুখে ওইটুকু কচি মেয়ে
শুধু বলেছিল : বর্ষার দিনে যদি না গেঞ্জি পরো
দেখবে তাহ'লে অনেকে অমন করবে তোমার নাম।
শুনে হতবাক ঈর্ষাকাতর মেয়েটার টিপ্পনি,
বাপের ওপর অন্য কারুর মানাবে না অধিকার,

ভেবে দেখলাম, মিথ্যে বলে নি, যতো ছোট হোক না সে
হৃদয়কে নিয়ে বৈজ্ঞানিকের কারবার চলে না তো।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

কোথায় লুকোবি তুই

কার্তুজ এখনো আছে—বুক পকেটে আগুনের ফুল
যৌবনে উত্তাপ জমছে, সর্বাঙ্গে অমিত বিক্রম
প্রখর পৌরুষ কিন্তু—ট্রিগারেতে রেখেছে আঙুল
কোথায় লুকোবি তুই? এইবার নিশ্চিত অধম।

রক্তপাতে সূর্যোদয়—উঁকি দিচ্ছে সোনালী সকাল
মানচিত্রে হাসে ছাখ মার-খাওয়া মানুষের মুখ।

সিংহাসন পাল্টে যায়—শিস দেয় কালের রাখাল
হাতের বাঁশরী তার বাঁশী নয়—জলন্ত চাবুক।

কোথায় লুকোবি তুই? চতুর্দ্দিকে ফাটছে গ্রেনেড—
সদর দরোজা থেকে উঠে যাবে তোর নেমপ্লেট।

চিত্রিতা চট্টোপাধ্যায়

নীল ওড়না উড়ে যায়

নীল ওড়না উড়ে যায় কুয়াশায় ভিজে কার মুখ?
শিশিরে ধুয়েছে দেহ—জ্যোৎস্নায় ওড়ে তার চুল
চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে দাঁড়িয়েছে রূপের প্রতিমা
নিহিত মৃত্যুর ঘ্রাণ হিম ঠোঁটে,—তবু রূপ, অফুরন্ত রূপ

অসীম প্রান্তরে ঝরে· ঝরে যায় নিখিল ভুবনে।

দেবাশিস প্রধান

ঋণ

কয়েক বছর পর সেই পিতামহদের ঘরে
ঝন্‌ঝন্ কড়া নাড়লো
চক্রান্তের গভীর খপ্পরে মুষড়ে আছে লাঞ্ছিত কাহিনী,

প্রত্যয়ী যুবার দল হো হো করে হাসে,
নষ্ট স্তম্ভের মতো বৈপরীত্যে পড়ে থাকে পথের দু'পাশে।

সমস্ত জীবন ধ'রে হার মানে একক সৌহার্দ্য
গোপন অসুখ আর দগ্‌দগে ঘা

লালায় জিহ্বায় পুঞ্জিত মেঘেদের মতো
সোঁ সোঁ দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে দেয় অবাধ্য কুন্তল
ঝরায় হিমানী সংকেতে

কাল রাতে যুবাদের দল গভীর হয়েছে প্রেমে
নিথর জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে
চিত্রার্পিত যেন
ইতিহাস কেটেছে পোকায়।

ক্রমাগত ভোর হয় ঘুম ভাঙে
প্রত্যয়ী অর্জুন যুবা
জীবনযৌবন ঘর গেরস্থালী নিয়ে পড়ে থাকে
ব্যাপ্ত শুধু দাউ দাউ কবিতার কাছে
তাহাদের ঋণ।

দীপঙ্কর সেন

কেউ কেউ, আমি নয়

কেউ কেউ ভালোবাসা বাসে
আমি বাসি না,
আমার ভালোবাসা বাষ্পের মতো নিরাকার।

কেউ কেউ হাওয়া থেকে রস টানে
আমি টানি না,
তেমন মধুস্রাবী হাওয়া আমি পাই নি।

কেউ কেউ অমরত্ব দাবী করে
আমি করি না,
তাদের মতো আক্রহীন হতে পারি নি।

সন্ধ্যা ভৌমিক

তুমি আসবে কথা ছিল

বিশ্বাস করো সুদীপ্ত
তবুও আমি কাঁদতে পারি নি
অসহায় বৃক্ষের মত ঠায় দাঁড়িয়ে
ভিজতে চাই নি সারা রাত
বিশ্বাস করো
তোমার প্রতীক্ষায় সময় গুণে গুণে
রাত পোহাল
অথচ, তিক্তমুখে অভিশাপ দিতে পারি নি
উজ্জ্বল সূর্যটাকে
রাত্রির অন্ধকারকে আরো কিছু সময় ধরে রাখতে পারি নি
নিলর্জ্জের মত,

তুমি আসবে ভেবে।

ইন্দোনেশিয়ার পান্তুন বা ছড়া

'পান্তুন'কে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে 'ছড়া'ই বলতে হবে, কিন্তু এ ছড়ার জাত ছেলেভুলোনো-ছড়ার থেকে ভিন্ন। 'পান্তুন'কে বলা যায় লোককবিতা।

পান্তুনে সাধারণত চারটি চরণ, প্রতি চরণে চারটি পদ। একটি সুপ্রচলিত ইন্দোনেশীয় পান্তুন

ডারি মানা দাতাং লিন্তা ?
ডারি সাওয়া তুরুণ ককালী।
ডারি মানা দাতাং চিন্তা ?
ডারি মাতা তুরুণ কহাতি।

[বাংলা : কোথায় থিকা আইলোরে কেম্নো ?
খ্যাতের থিকা নামছে খালে।
কোথায় থিকা আইলো পীরিত ?
চক্ষু হইতে কইলজাতে চলে।]

পংক্তি বা 'চরণ' এবং 'পদ' বিষয়ের উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ছয় কিম্বা আট পংক্তির পান্তুনও আছে এবং প্রতি পংক্তিতে পাঁচটি অথবা তিনটি পদ থাকাও সম্ভব।

পান্তুনের জন্ম মালয় দেশে। বাংলাদেশে যেমন কবির লড়াইয়ের প্রচলন ছিলো, মালয়েও তাই। ধরুন একজন বললো, 'আঁধার কোণে পিপড়ের বাস'। চট করে উত্তর দিতে হবে 'লেপ মুড়ে তুই নাক ডাকাস।' লড়াইয়ে যে হারলো তাকে ঠাট্টা সইতে হয়।

হ্রদে ডুব এলো আমার পুত্তুর রাজার বেটা যে,
তোর ছেলেটা ব্যাঙের ছানা গর্তে ডুবেছে।
সোনার থালে নাইছে সে মোর পুত্তের সকল সাধ মেটে,
সিঁড়ির তলায় নাইছে যে তোর ছেলে বনের ছাগ বটে।
তাড়াতাড়ি চান সেরে রাজা হবে মোর পুত
বাটির ভিতর চানটি সারে ছেলে তোর কিম্ভূত।'

ইত্যাদি।

এইসব ছড়া মুখে মুখে ছড়ায়, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে।

ইন্দোনেশিয়ায় পান্তুনের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল পশ্চিম সুমাত্রায়। আজও জাভা বালিদ্বীপের তুলনায় সুমাত্রায় এর চল বেশি। বাড়িতে বিয়ে শাদী থাকলে তার জন্যে ছড়া কাটা হয়। সুমাত্রায় প্রচলিত একটি বিয়ের ছড়া :

'বিয়ে নয় চোখের টানে
বিয়ে হয় মনে প্রাণে।'

বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষে কবির লড়াই হয়।

কবির লড়াই ১.

বরপক্ষ :
কাঠের থালায় জন্মে হলুদ
নাড়িতে নাড়ি জোগায় মদত
আমরা বসি, আমরা বলি,
সোহাগ বসায় দিলাম গুবাক

কন্যাপক্ষ
কাঠের থালে বসছে যারা
নাড়ির টানে টানছে তারা।
আমরা বসি, আমরা বলি
জবাবটা দিই কী বাকছলি?
থালা নিয়ে হেলিক বেলিক
লাংসাৎ ফলের বাঁধছি ছাঁদা
লুকিয়ে দাঁতে সুপুরি কাটি
নইলে সোহাগ কেমন খাটি

২.

বিয়ের ছড়ার চেয়েও বেশি যার প্রচলন তা হলো হাসির এবং উপদেশমূলক ছড়া। এইবার তার কয়েকটি অনুবাদ করে দিচ্ছি। প্রথমটি সুমাত্রার।

ওদের দোকানে কাগজ বেচে
তাইতে আমরা চিরুণি
কুমীর দাদা চড়েন ডাঙায়
ছাগল দেখে জলে ঝাঁপায়

৩. পাসার মালায়ু ছড়া

ক. পারস্তে গেছি, সিয়াম দেখেছি
কিন্তু মেক্কা? সেটাই হয় নি।
সোহাগ করেছি, চুমুও চেখেছি,
কিন্তুক শাদী? সেটাই হয়-নি।

খ. গুরুমশাই লেখেন স্লেটে
একসপ্রেস চিঠি সেলয়াং[১] ছোটে।
সাত স্বর্গের খবর শরীরে
ভালবাসা বলে তাকেই তাকেই।

গ বানের ওপরে ডেকে এনো বান
আগের বৃষ্টি আজও ধরলো না।
কল্জেতে দ্বেষ হচ্ছে গভীর
কবেকার খেদ আজও কমলো না।

১ বাহামা ইন্দোনেশিয়া থেকে

পরিবেশন ও অনুবাদ কৃষ্ণা

শিল্পী গোপাল ঘোষ

উনিশশো আশির সুরু থেকেই আমরা বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিদের হারিয়েছি। এদের মধ্যে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, গায়ক, অভিনেতা প্রভৃতি রয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতিত্বে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী গোপাল ঘোষ এঁদের মধ্যে অন্যতম। গত চার দশক ধরে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছেন। তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে বিশেষ করে জল-রং এর প্রাকৃতিক চিত্র এবং রেখাচিত্রগুলি কলারসিকদের মুগ্ধ করেছিল। জন্ম ১৯১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর, কলকাতায়। পৈত্রিক বাসস্থান, পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রামে। শিল্পীর বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন জয়পুরে কেটেছে। জয়পুরের মহারাজা স্কুল অফ আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফটস্ থেকে শিল্প নিয়ে পড়শোনা করেন এবং ডিপ্লোমা পান। পরে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। জয়পুর আর্ট স্কুলে ছাত্রাবস্থায় তিনি সাইকেলে চড়ে সারা ভারত ঘুরে দেখার এবং ছবি আঁকার পরিকল্পনা নেন। তাঁর এই পরিকল্পনার সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন শিল্পীর চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখার দৃষ্টান্ত তুমি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছ! আমার ধারণা ভারতবর্ষের মানুষ একদিন তোমার চোখ দিয়ে ভারতের ঐশ্বর্যের ছবি দেখতে পাবে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর তখনকার আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন তোমার ড্রইং অসামান্য।

১৯৪৭ সালে দিল্লীতে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী হয়। ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু। ঐ বছরেই তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জহরলাল নেহেরু ও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনেও কয়েকবার পুলিশের নির্যাতন ভোগ করেছেন তিনি।

উনিশশো চল্লিশ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিএন্টাল আর্ট থেকে পাঠ শেষ করে বেশ কয়েক বছর আমি কর্পোরেশন ষ্ট্রীট হিন্দুস্থান বিল্ডিং এর চার তলার একটি মেসে থেতাম। সেখানে আচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও কালীপদ

ঘোষাল মহাশয় থাকতেন। আমি নিয়মিত তাদের কাছে ছবি আঁকা শিখতাম। তখন ইণ্ডিয়ান আর্ট সোসাইটীর কাজকর্ম প্রায় বন্ধ বললেই চলে। বেশ কয়েক বছর পরে ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কয়েকটি ছাত্র নিয়ে আর্ট সোসাইটী পুনরায় কাজ শুরু করে। তখন শ্রীনীহাররঞ্জন রায় উক্ত সোসাইটীব সেক্রেটারী। সেই সময় গোপাল ঘোষ মহাশয় শিক্ষকতা করতে আসেন। আমি কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছি এবং আলাপ করেছি। দেখতাম নিরলসভাবে ছবি এঁকে যাচ্ছেন। কত বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি জীবনে অফুরন্ত স্কেচ করেছেন যা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

উনিশশো বিয়াল্লিশে ক্যালকাটা গ্রুপে বিশেষ সদস্য হিসাবে যোগদানের পর থেকেই শিল্প জগতে একটা আলোড়ন আসে। তখন ১নং চৌরঙ্গী টেরাসে জে. এন মজুমদারের বাড়িতে ক্যালকাটা গ্রুপের বেশির ভাগ প্রদর্শনীয় হতো। যতটুকু মনে আছে ক্যালকাটা গ্রুপই প্রথম ঐ বাড়িটি প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহার করেন। পরে বহু চিত্র-প্রদর্শনী এই বাড়িতে হয়েছে। উক্ত গ্রুপের অন্যতম সদস্য শিল্পী পরিতোষ সেন মহাশয় বলেছেন গোপাল ঘোষ প্রাকৃতিক দৃশ্যে আনলেন এক নতুন ডাইমেনশন—সেটা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। ভারতীয় শিল্পে, পাশ্চাত্য কিম্বা চীনা জাপানী শিল্পের মত ল্যাণ্ডস্কেপের ট্র্যাডিশন ছিল না। গোপাল ঘোষই সর্বপ্রথম এক ধরণের নিসর্গ চিত্র আঁকলেন যার ট্রিটমেণ্ট সম্পূর্ণ ফ্লাট অথচ বর্ণে উজ্জ্বল। আলোছায়ার খেলা না দেখিয়ে পুরোপুরি টু-ডাইমেনশনাল ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছে বহুবার। প্রতিবারই তিনি শিল্প-রসিকদের বিস্মিত করেছেন রঙের স্নিগ্ধতা এবং সরল অথচ বলিষ্ঠ রেখার টানে। এই রূপদক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবি সংগ্রহ করে কোন মিউজিয়ামে স্থায়ীভাবে রাখতে পারলে ভাবিকালের শিল্পীদের যথেষ্ট প্রেরণা দেবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ-বিষয়ে সচেষ্ট হবার জন্য অনুরোধ জানাই।

শিল্পী গোপাল ঘোষ ৩০শে জুলাই ১৯৮০, বুধবার কলকাতা শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নির্মল দে

কয়েকটি প্রাচীন এবং নবীন কাব্যগ্রন্থ

১. বাসু ঘোষের পদাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

২. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ১ম খণ্ড। গ্রন্থবিতান। ৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। কলকাতা-২৬

৩. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত: লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে। প্রমা, ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা ১৭

4. Henry Louis Vivian Derozio Poems Oxford University Press, P17, Mission Row Extn Calcutta 13.

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন এমন বৈষ্ণব কবি এবং চৈতন্য-জীবনীর পদকর্তা বোধহয় বাসু ঘোষ ছাড়া খুব বেশী নেই। সেকারণে, চৈতন্যজীবনী রচয়িতৃ-কবিদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষের স্থান অত্যন্ত বিশিষ্ট। তিনি শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষই করেন নি, বরং দিবসরজনী এই মহান পুরুষটির সঙ্গী ছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় দেড়হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের মত প্রবাদ-পুরুষ আর জন্মেছেন কি না সন্দেহ, যিনি একটা গোটা জাতিকে, দেশকে, তার ধর্ম, সমাজচিন্তা এবং আচার আচরণকে আমূল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

বাসু ঘোষের পদাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রখ্যাত গবেষক এবং বৈষ্ণব-পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার। তাঁর অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করেছেন তাঁর কন্যা মালবিকা চাকী। এই সংকলনে ২১২টি পদসংখ্যা রয়েছে। সম্পাদিকা জানাচ্ছেন, ২০৪ সংখ্যক পদ অবধি অবশ্যই বাসু ঘোষের। কিন্তু বাকী আটটি পদ বাসু ঘোষের কিনা সন্দেহের বিষয়। পদগুলি বেশীর ভাগই রাগরাগিণীতে নিবদ্ধ। মল্লার, সুহা, শ্রীগান্ধার, বরাডী, পটমঞ্জরী (পঠমঞ্জরী), বিভাস, ভাটিয়ার, কেদার, ভুপাল (ভূপালি), পাহিরা (পাহাড়ী?) টুরী (টোড়ী?) প্রভৃতি রাগ এককালে বাংলার নিজস্ব সম্পদ ছিল, সংগীতবিষয়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কাল ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৪, যাঁর শেষার্ধ কেটেছে নীলাচলে। বাসু ঘোষ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবসানের পরও ২৭-২৮ বছর কর্মক্ষম ছিলেন এবং তাঁর পদে নরহরি সরকারের মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে। বাসু ঘোষের পিতা বল্লভ ঘোষ (মতান্তরে গোপাল ঘোষ) চাটিগাঁ থেকে এসে এ বঙ্গে বসবাস করেন, যার জন্মস্থান ছিল শ্রীহট্ট। বাসু ঘোষের অগ্রজ দু'ভাইও পদকর্তা ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের অন্তরঙ্গ আলেখ্য পাওয়া যায় কবির পদগুলিতে, বিশেষত, যে-'গৌরনাগর' ভাবের কবিতা উল্লেখ ক'রছেন সুকুমার সেন, তার অন্তরালে রাধাকৃষ্ণের লীলা স্পষ্টত অনুভব করা যায়। বাসু ঘোষই সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি নির্দ্দিষ্টরূপে বর্ণনা করেন

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, নক্ষত্র ফাল্গুনী

বাসু ঘোষের পদগুলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা ও বাল্যলীলা, নিমাই-এর ভাব-প্রকাশ, শ্রীগৌরাঙ্গের রাগ-বর্ণনা, গৌর-নাগরী ভাব, সন্ন্যাস লীলা, নীলাচললীলা এবং শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ক পদগুলি এক নিবিষ্ট আন্তরিকতায় আমাদের অন্য এক জগতের সন্ধান দেয়। ভনিতায় বাসু, বাসু ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি পাওয়া যায়। বাসু ঘোষের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রখ্যাত গ্রন্থগুলিতে। স্পষ্টতই এ থেকে আমরা মনে করতে পারি, বাংলা সাহিত্যে এই কবির স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাসু ঘোষ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবেরও অত্যন্ত প্রিয় কবি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ত্রিশ দশকের পরবর্তী সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। আমার কাছে এই অর্থে বিশিষ্ট যে, তিনি কোন বিশেষ ভঙ্গি বা বিশেষ দলীয় রাজনীতি আশ্রয় করে কবিতা লেখেন নি, যদিও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন অনেক সময়। তার অর্থ এই নয় যে তিনি কবিতা থেকে রাজনীতি বর্জন করেছেন। মোটেই না। কিন্তু যে-রাজনীতির তিনি সমর্থক, তাকেও তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করতে দ্বিধা করেন না। এ সততা এযুগে বিরল। তিনি কারো মুখ চেয়ে কবিতা লেখেন না—যখন কিছু বিপ্লবী কবিও

নানা আকর্ষণে নিজের অন্তরের ধ্বনিকে একপাশে সরিয়ে রেখেই কবিতা-চর্চা করতে দ্বিধা করেন না। মাথা মুহূর্তে তাঁরা নোয়াতে পারেন, বীরেন্দ্র চাটুজ্যে পারেন না। তিনি মাথা উঁচু রাখতে জানেন, যখন দেখি প্রভূত এবং সরকারী বেসরকারী সম্মান পেয়েও কোন কোন কবির কাছে আদর্শ নামক বস্তুটি কত ভঙ্গুর। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একারণে আমার কাছের কবি।

কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্যসংগ্রহ প্রকাশের একটা অসুবিধে আছে। তিনি যখন ভালো লেখেন, তখন তা উত্তুঙ্গ শীর্ষে পৌছোয়। আবার সাময়িক তাগাদায় বহু কবিতা তাঁকে লিখতে হয়—যা না লিখলে হয়তো কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেতো। সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে কবির, একথা মনে করেই তিনি অনেক সময় ইস্তাহার-জাতীয় পদ্য লেখেন। তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র কবিতা সংগ্রহ একটু 'রিস্কি'। প্রচণ্ড রোমান্টিক কবিতা রচনা থেকে ক্রমশ এক কবি কি করে সমাজসংসারকে নিজের বাসভূমি মনে করে' এক গভীর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন তারই মুখবন্ধ এই প্রথম খণ্ডের কবিতাবলী। এই গ্রন্থের বহু কবিতাই কবিতা রসিকের পড়া। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুকান্তের মত জন-প্রিয়তা অর্জন করেন নি, নানা কারণেই সেধরণের জনপ্রিয়তার প্রশ্ন আসে না; কিন্তু তিনি যে-জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে অর্জন করছেন তার ডালপালা বহুদূর প্রসারিত মনে হয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার অনুজ কবি, একমাত্র যাঁর প্রভাব, আমি অসংকোচে স্বীকার করি, আমার কোন কোন কবিতায় প্রত্যক্ষ করেছি। বড় কবির সম্ভাবনা রয়েছে অলোকরঞ্জনের মধ্যে। তিনি ভারতীয় ধ্যান এর সন্নিকটবর্তী হয়েছেন। এই ছোট্ট কবিতাটি পড়া যাক নিমগ্ন হয়ে

বাছুরের খুরে যতটুকু ধু'লো ওঠে
তার বেশি নয়। উৎসর্গের আগে
মহিষের কলামাত্রিক দু' শিঙের
মধ্যবৃন্তে যেটুকু চন্দ্র ধরে
তার বেশি আমি কাজে না লাগিয়ে দেখি
আনন্দ বলে কাকে।

কবিতাটির নাম 'আনন্দ'। এই ধারণা একান্তই ভারতীয়—অথচ এতে, এই বাক্‌ভঙ্গিতে, একটা বহমান আধুনিকতার সুর স্পষ্ট। অর্থাৎ কবি একালের, অথচ চিরকালের সংবেদনা তাঁর মানসমুকুরে প্রতিবিম্বিত। দ্বিতীয় কবিতাতেও সেই আনন্দের আভাস :

আমার সর্বনাশে
তখন অপার আনন্দ এক ' বন্ধু-অবন্ধুরা
সেই জোনাকির বাতিঘর ঘিরে আমার সঙ্গে ভাসে।

'মুক্তিসুখ' কবিতাটিতে ছড়ার এক আমেজ আছে, একটা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার আছে, কিন্তু তা গভীরে নিয়ে যায়। 'মায়াবী জল্লাদ' কবিতায় 'পেলব' শব্দটি আমার ভালো লাগে নি। শব্দের অর্থ নরম হতে দোষ নেই, কিন্তু শব্দটি যেন নরম না হয়, এই আমার বাসনা। রোমান্টিক কবির এহেন আর্তি লক্ষণীয় :

রাজপথে তুমি অক্ষরে অক্ষরে
রাত দশটায় শেফালি ঝরিয়ে পুলকে জর্জরিত
সবুজ এনেছো, দুঃখকে তুমি কেন ছাখো সুনজরে ?

অন্য ধাঁচের কবিতা পড়ছি, যেখানে শান্তিনিকেতনে এই কবির কৈশোর যৌবন কেটেছে, সেখানে তিনি একান্ত সহজ :

নিভল যেই প্রদীপ
খোয়াই থেকে উঠে এল
লালমাথা টিট্টিভ।

এই কবির কবিতায় নানাস্থানে রবীন্দ্রনাথ আছেন, আছে এই গ্রামবাংলার বাউল, আছে এক উদাসী দার্শনিক, আর রয়েছে এক আন্তরিক কবি, প্রকৃত অর্থেই কবি। হয়তো তাঁর বিদেশ-বাস তাঁকে আরো অন্তর্মুখী করে তুলবে মনে হয়।

যত দিন যাচ্ছে, আধুনিক বাঙালীর ইতিহাস-রচনায় ততই ডিরোজিও-র অবদানের কথা সবাই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করছেন। মাত্র বাইশ

বছরের স্বল্পায়ু জীবনে অনড় অচল স্থাণুর মত একটি সমাজকে যে-প্রবল ধাক্কা তিনি দিতে পেরেছিলেন আমাদের কাছে তা এক আশ্চর্য ঘটনা বলে মনে হয়, আজও। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ডিরোজিও বিষয়ে দুটি উক্তি করেছেন যা তাঁর জীবন-আলেখ্য-কে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে ১. Derozio is modern India's first patriot ২ Derozio, the first to contemplate an intellectual renaissance for an ancient civilization এবং ডিরোজিও-র এই চেতনার পেছনে কাজ করেছে তাঁর একটি নিশ্চিত দার্শনিক প্রত্যয়। এই প্রত্যয়টি হচ্ছে 'doubt as a gateway to faith', মধ্যযুগে রেনে দেকার্তে যুরোপীয় দর্শনচিন্তায় যে বিপ্লব আনতে সাহায্য করেছিলেন এই প্রত্যয় দ্বারা, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ডিরোজিও সেই কাজ করলেন কলকাতার বুকে বসে, বাঙ্গালী এবং ভারতীয় সমাজের জন্য।

এই বাইশ বছরের স্বল্প পরিসর জীবনে তরুণ যুবকটি ব্যবসাসূত্রে ভাগলপুরে নিসর্গশোভা নিরীক্ষণ করেছেন গঙ্গার ধারে ধারে, সাংবাদিকতা করেছেন নিপুণভাবে—যখন সাংবাদিকতা বিষয়টিকে মানুষ একটি জীবন-আদর্শের প্রতিরূপ মনে করতো—, হিন্দু কলেজে পড়িয়েছেন, অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন নানা পত্র-পত্রিকায়, নবীন ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বাধীন চিন্তায় এবং আরো কিছু করেছেন। কবিতা লিখেছেন তারই ফাঁকে ফাঁকে। বেঁচে থাকলে তিনি বড় চিন্তাবিদ্ হতেন না বড় কবি হতেন তা আমাদের গবেষণার বিষয়। কারণ পনেরো বছর বয়সে তিনি যে কবিতা লিখতে শুরু করেন তা ঝোঁকের মাথায় নয়, নিতান্ত সখেরও তা নয়। এবং তারপর ছ' সাত বছর ধরে তিনি নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও কবিতা লেখা থেকে নিবৃত্ত হন নি। বহু কবিতা তিনি উপহার দিয়েছেন যা কবিতা হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কবিতাবলীর নতুন সংস্করণ হাতে পেয়ে যে-কোন কাব্যরসিক খুশি হবেন। প্রকাশক জানাচ্ছেন, এই সংস্করণে মাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাগুলিই সংকলিত হয়েছে। এবং তার সংখ্যা কিন্তু কম নয়—যা দুশো পৃষ্ঠার পরিধি ছাড়িয়ে গিয়েছে মুদ্রণের ফলে। ডিরোজিওর প্রায় পূর্ণাঙ্গ জীবনী আমরা পাচ্ছি ব্রাডলে-বার্ট এর ভূমিকায়। এই ভূমিকাটি বহু পরিশ্রমে রচিত, পরবর্তী অনেক গবেষকের কাছে আকর গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করে, হিন্দু কলেজ থেকে

ডিরোজিওকে বিতাড়নের প্রশ্নে উইলসন সাহেবের সঙ্গে ডিরোজিওর পত্রালাপ পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় এই ভূমিকার মূল্য অনেক বেড়ে গেছে।

ডিরোজিওর এই কবিতাবলীর মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। 'নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বী' যে কবির কাছে প্রধান বিষয় এটি তিনি মনে রেখেছেন। তাই বাংলাদেশ, ভারতবর্ষের প্রবাহিনী গঙ্গা গ্রীস, ইট্যালী বার বার তাঁর কবিতায় এসেছে। এসেছে ফারসী বয়েৎ, নানা ধরণের সনেট। মনে রেখেছেন হিন্দু কলেজে তাঁর ছাত্রদের, শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ডেভিড হেয়ারকে, মনে রেখেছেন শেকস্পীয়ারকে ('রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নামক সনেটটি দ্রষ্টব্য), তাসো এবং সাফোকে বন্দনা করেছেন—সাফোর অপরিতৃপ্ত প্রেম বিষয়ে বলেছেন 'O ! how the gushing blood did inly flow !'—যার ভালোবাসার তুলনা হচ্ছে 'the raging of a storm'

বস্তুত এই কবিতাগুলির মধ্যে যুবক কবির যে হৃদয়-স্পন্দন শোনা যাচ্ছে অনবরত, তা প্রেম। স্বাভাবিক বয়ঃসন্ধির দুর্বার ভালোবাসা। এই চিন্তাশীল বিপ্লবী কিশোর তাঁর প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কি এমনভাবে প্রেম বিষয়ে এত সচেতন ছিলেন। ডিরোজিওর কবিতাবলী না পড়লে তাঁর জীবনের এই গোপন তথ্যটি আমাদের অজানা থাকত। এমনি আর একটি দীর্ঘ কবিতা 'Ada'র বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনী চোখ দুটিকে অশ্রুসজল করে তোলে। 'St Monan's bells are ringing' এরকম জায়গায় কোলরিজকে মনে পড়া আশ্চর্য নয়। নায়িকার জীবনকাহিনীকে কবি বলছেন 'A history of passion'—এই 'passion' কবির কাছে যৌবনের নিষ্পাপ স্বাভাবিক প্রেম।

ডিরোজিওকে প্রথম 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' কবি বলা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর বিষয়ে বলেছেন he is a Bengali poet who wrote his poems in English—একথা সম্ভবত অসত্য নয়। "The Fakeer of Jungheera' নামক দীর্ঘ কবিতায় আমরা কয়েকটি শব্দ অবিকৃত পাচ্ছি সূর্য, নলিনী, কামিনী, পবন, ব্রাহ্মণ, রাধিকা, অন্যত্র চন্দ্র শব্দটি পাচ্ছি! কবি অনায়াসে এই সব শব্দ ইংরেজী কবিতার মধ্যে চয়ন করেছেন। অবশ্য ব্রাডলে-বার্ট জানাচ্ছেন ভাগলপুরে থাকবার সময় গঙ্গাতীরবর্তী এই অঞ্চল কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, The Fakir of Jungheera was directly

prompted by these peaceful peasant scenes beside the Ganges'. ভাগলপুর এবং উত্তরবঙ্গ, মনে রাখতে হবে, তৎকালে একটি অবিচ্ছেদ্য বাঙ্গালী সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল।

কবির কিশোর-জীবনে আর একটি লক্ষণীয় বোধ কাজ করছিল। তা হচ্ছে মৃত্যুচিন্তা। 'The Tomb', 'Dust', 'The Poet's Grave' কবিতাগুলি তার সাক্ষ্য। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু এতো আসন্ন ?

There let his ashes lie,

Cold and unmourned ;...

There, all in silence, let him sleep his sleep !

ব্রাডলে-বার্ট তাঁর কবিতায় বায়রন এবং মুরের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু শেলীও অনুপস্থিত নয়। বরং বলা যায় সেযুগে সাধারণভাবে যে রোমান্টিক কাব্য-চেতনা কবিকুলকে আবিষ্ট করেছিল তাই ডিরোজিওর কবিতায় নানাভাবে স্পষ্ট অভিব্যক্ত এনেছে। শব্দচয়নে, রূপকল্প-নির্মাণে, স্বাভাবিক চিত্রধর্মিতায়, এবং একটি স্বাপ্নিল মানসিকতায়—বিশেষত প্রেম-বিষয়ে বিয়োগান্ত চেতনায়—এই সব ধরা পড়বে। Leaves' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে পড়া যেতে পারে। পড়া যায় এমনি আরো কবিতা, যেমন 'Night'

Swift as the dark eye's glance, or falcon's flight

Thought comes on thought, awakened to the night—

১৮৯২ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে ইংরেজী কবিতা খুঁজে পড়লে এজাতীয় পংক্তির আভাস—বরং বলা যায় বসাভাস—আরো মিলবে, যেখানে এই ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কবিকে কোলরিজ বায়রন শেলীর সগোত্র মনে হতে পারে।

অরুণ ভট্টাচার্য

নতুন কবিতা

[১৯৩০-৭০ এই পঞ্চাশ বছরের কবিতার পালাবদল শুরু হয়েছিল আরো কয়েকবছর পূর্বে। এবার পালাবদলের কেন্দ্রভূমি ছিল না কলকাতা। আবার গ্রাম বাংলা, কাঁটাবন, নদীনালা, আকাশের বিস্তার ও সহজ জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের কবির দল। একমাত্র "উত্তরসূরি" পত্রিকা সেই নতুন প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েছিল। পাঁচ বছর পূর্বে উত্তরসূরিতে এই কবিতার বিভাগটি, যা ছিল নেহাৎই পরীক্ষা, আজ তাই চৈতন্যের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে এসেছে তরুণ কবিদের শব্দের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে। এই "নিঃশব্দ বিপ্লব" কবিতার ইতিহাসে একটি পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে থাকবে মনে হয়। সম্পাদনা উত্তরসূরি]

সমীরণ ঘোষ

এই পথ

পথখানি দৌড়ে গিয়ে বহুদূর একটি বিন্দুতে আজ স্থির।
এইপথে তিনটি যুবক নেমে এলো প্রপাতের মতো
এইপথ প্রশাখায় ভেঙ্গেছে কোথাও। ভেঙ্গে গেলে
কোন্ দিকে তাহাদের নিয়ে যেতে পারে!

উত্তরে অরণ্য-শহর.
হাতির পায়ের দাগ যন্ত্রণার মত গেছে বনের ভেতর বহুদূর·
আদিবাসী যুবতীর পায়ে পায়ে প্রার্থনার মতো ঝুঁকে আছে অগ্নিপলাশ
এইখানে চিতার থাবা বুকে এসে বেজে যেতে পারে অকস্মাৎ।
কতোখানি সুখকর হবে যুবকের, কতোখানি অনিয়ম যাবে তাহাদের
সত্বের ভীষণ কাছাকাছি·· ···
না-কি দক্ষিণে? সমুদ্র আর শীতোষ্ণ বালির কাছে?
ঝাউ-এর জঙ্গল থেকে ছুটে আসে মোহন বাউল

সংগীত তাদের কোন্ মূর্তির কাছে নিয়ে যাবে ? বৃক্ষের কাছে।
তারা কী ঝাউ-এর পাশে সমান্তরাল হ'য়ে দাঁড়াবে কখনো।
একটি যুবক আজ পুড়ে-পুড়ে বুকের আগুনে,
ভাবে, এইসব গভীর রহস্যমালা পথ ও পথিক বিষয়ক..

সপ্তনির্জন। C/o কল্যাণ ভৌমিক। ১২৮/১৮ হাজরা রোড কলিকাতা ৭০০ ০২৬

মুকুন্দলাল গায়েন

দারুন অচেনা লাগে

আমরা রোজ বিকেলের দিকে মন্দিরে বেড়াতে যাই—
হাতে থাকে পবিত্র ফুলের গন্ধ-ভরা ডাল।
তারপর সন্ধের একটু পরেই ফিরে আসি,
আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে রাস্তা পার হই।
অনেকগুলি আঁকাবাঁকা অলিগলি ঘুরে—
ঢুকে যাই আমাদের পরিচিত অন্ধকার গলির ভেতরে।
কিন্তু আজ আর আমি চিনতে পারি না আমাদের
শম্ভুনাথ লেনের বাড়িটা, এবং আমাদের আশ-পাশের
প্রতিবেশী বাড়ীগুলো। দারুন অচেনা লাগে,
রূপকথার নগরী মনে হয় আমাদের আজকের এই
শম্ভুনাথ লেনের গলিটা ॥

জবগাছ। গোসাবা ৭৪৩৩৭০, সুন্দরবন, ২৪ পরগণা

মুরলী দে

কবিতার মতো

নীলছুরি দিয়ে আমি সাধের বালিশ কাটলুম
হাতে, হাতময় ছিল তৈল পদার্থ
বৃষ্টিফুলের মতো লেগে গেলো তুলো…
একটি শরৎকাল দীর্ঘ খরার মধ্যেও বয়ে নিয়ে এলো মেঘ !

আর আকাশের দিকে তাকিয়ে
মনে হলো—সমস্ত সুহৃদ বকগুলি
আমাকে ফেলে যাচ্ছে কোথাও।

ঘাসমাটি। ঠাকুরপুর, জয়কৃষ্ণপুর বাঁকুড়া

সুদীপ চক্রবর্তী

এই শোন প্রাচীব ভাঙছে

এই শোন ফুলেব কাছে যেও না প্রাচীব ভাঙছে
জানলায় হাত বেখে কাকে দেখি, কার কাছে যাওয়া যেতে পারে, সব দবজা বন্ধ
কাকে কি দিযেছি নিমন্ত্রণ, প্রেম, দুঃখ
এখনতো ফুলের সময, জানো প্রাচীর ভাঙছে, জানো এখন কী দারুন কম্পন
ভিতরে ভিতরে, এখন ফলের কাছে যেও না।

এই শোন চন্দন বনে যেও না এখন আগুন জ্বলছে
পাতাবাহারেব নীচে মাথা বেখে কাকে ভাবি, কার কাছে জানা যাবে স্বপ্ন, পাথব
এবং অন্বেষা, এখন কিছুই মনে থাকে না, কিছু না
এখন তো অরণ্যে নিনাদ, জানো চাঁদটা ভাঙছে, এখন কী মলিন
চন্দনবনে চাঁদে, এখন চন্দন বনে যেও না।
এই শোন এখন ফলেবা প্রাচীর ভাঙছে, চন্দন বনে আগুন জ্বলছে
এখন যেও না,
জানলায় হাত রাখো দুঃখি মানুষ।

কণ্ঠস্বর। C/o সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ১১/২ টৈমার লেন, কলিকাতা ৯

বঙ্কিম চক্রবর্ত্তী

রত্নাকর

নিজের ইচ্ছেমতোই তছনছ করছি, দা ভাঙবো বলেছিলাম
ভেঙে ছড়াবো বলেছিলাম প্রপিতামহের গাঁজার কল্কে,
কচুরিপানার ডোবা, মর্মস্পর্শী জন্ম-ভিখিরির টিনের কৌটো
কল্কের আগুনে জ্বালাবো বলেছিলাম চৌহদ্দি সতীনের রাজধানী।
এবার দয়া করে তোমরা কে কি উপহার দেবে দিয়ে যাও,
আমার পিরান নেই, পৈতে নেই, ঘর-দোরে এক ছটাক সুখ নেই
বাতলে দাও, পরম প্রশান্তি জুড়ে নিজের ইচ্ছেমতো কবে রত্নাকর হবো ?

নিজের ইচ্ছেমতো হেলিকপ্টারে যেমন উঠতি মহামানব
একদিনে স্বর্গ এবং নরক পরিভ্রমণ সেরে বুঁদ হ'য়ে
লক্ষ্মীর ভিটেতে চরায় সোয়া তিনশো ঘুঘু,
প্রভু হে, এমন অরূপ একটা বর দাও, যাতে
আমাব উকুন-পোষা বৌটাকে জ্যোৎস্নার রাজরাণী করতে পারি, তার
একঘাটে জল খাইয়ে বাঘ ছাগলের মিলন দিতে পারি।

নিজের ইচ্ছেমতোই ভাঙতে বসেছি চতুর্বর্গ যুদ্ধ প্রেম,
দাঙ্গা বাধিয়ে রেখেছি বুকে।
এবার নাকে দড়ি বেঁধে আমাকে বুঝিয়ে দাও
নিজেকে ছাড়া আব কি কি ভাঙলে তোমরা খুশী হবে এবং
ভোটাভুটি ছাড়াই আমি রত্নাকর হবো।

বেণুকা। C/o মনোরঞ্জন খাঁড়া। বর্ণন, মেচেদা, মেদিনীপুর।

জমিল সৈয়দ

কষ্টের মাস

মাসটি তো শেষ হয়ে এলো, তবে তুলো রোদে দিই
কাপড়ের কালিটিও যত্নে সাজিয়ে রাখি............

এই ব'লে নারীটি তাকায় মাসের শেষের দিকে—
ঋতুবদলের গন্ধে গন্ধে ভরে ওঠে রমণীকুসুম
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় মাস, মালঞ্চের ডাল জুড়ে কানাকানি,
সে কি তবে ক্রমশই বড়ো হয়ে যাবে, বড়ো হতে হতে
তুলোর গাছের নিচে সাজাবে ঝুলন, দে তোরা আঘাত দে
সর্বস্ব ঠেলাটি দিয়ে নাড়িয়ে দে ময়নামতী মেঘেদের সাজানো বাগান

যেতে যেতে দেখা হয়—পথের পাশেই ঘেরা তাঁবুটির নিচে
নারীর প্রফুল্ল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাসের সবুজ, মাটি খুঁড়ে বীজধান·· ···
খুরপি চালিয়ে দূরে—কাঁদো কাঁদো জলের ঢেউয়েবা, ওঠে-পড়ে,
ভাসিয়ে দেবেই ব'লে চারপাশ নিথর, সুমসাম
নিঃসীম ঘুমের ভেতরে মন আনচান করা ব্যথার বিশাল অর্থ
সে কি বোঝে—এইসব আনন্দনিহিতি।

মাস যায়, যাওয়ার সময় হলে বেনারসী শাড়িটির জমি জুড়ে
ফুল ফোটে, লজ্জায় আরক্ত চোখে দিগন্ত রেখার দিকে চুপিচুপি দেখে
সোনালী সবের চাদর উঠে আসে পা থেকে মাথায়, আল্‌তো নরম পালক
সুড়সুড়ি দিয়ে যায় পায়ের আঙুলে, আঃ এতো কষ্ট হয়,
'মাগো, এতো কষ্ট কেন।'

সারণি। C/o সুশান্ত গোস্বামী, স্টেশন রোড, দাঁতন ৭২১৪২৬ মেদিনীপুর।

অরূপ চৌধুরী

মেঘলা দিন বিষয়ক

বুকের পাশে কেউ জেগে নেই, গোপন অসুখ, বুক জ্বলে যায়
শূন্যঘরে মলিন শয্যা—চক্ষু আমার ঘুম ভুলে যায়
বাহির জুড়ে বিষণ্ণ দিন, মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি ঝরে
এইভাবে সব নির্জনতায় প্রহর কাটে নিরুত্তাপে

বুকের পাশে কেউ জেগে নেই, গোপন দহন, বুক জ্বলে যায়
পোকায় কাটে পাণ্ডুলিপি, হৃদয় আমার সাধ ভুলে যায়
এমন সময় কোথায় যাবো ··? কার দরোজায় প্রেমিক হবো ·?
ফুল্ল কুসুম মৃদুল মায়ায় কেউ কি আর আশায় আছে···?

ঘরের ভিতর তরল আঁধার, স্মৃতির ছায়া ঈষৎ কাঁপে
ঘাট আঘাটা রাস্তা ও মাঠ সব ডুবে যায় গভীর জলে
জলের ভিতর ধূসর ছবি, বৃক্ষশাখায় বৃষ্টি নাচে
অশ্রুপাতে শরীর ভাঙে উদ্ভাসিত রোদের খোঁজে·· ···

রেনেশাঁস সাহিত্য পত্রিকা। C/o অপূর্ব শীট, স্টেডিয়াম রোড়। বাঁকুড়া ৭২২ ১০১।

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

সখি, তোর

সখি, তোর এ রাস্তায় পা ফেলা নিষেধ

রাস্তার প্রহরী যারা, সহচরী সাক্ষী ও আসামী
সকলেই তোকে কেন দুষ্ট করে, চুরি করে তুই নাকি
চাঁদ দেখেছিলি ?
আহাঃ। চাঁদ নেই, ডুবে গেছে,
তবু তোর আনাগোনা শেষ আর হোলো না কিশোরী।

এখন পথের বুকে গড়ে ওঠে আদালত,
পা-ফেলা নিষেধ।

তুই কি পারবি সখি অগ্নি-পরীক্ষায় জয়ী হতে ?

কবিতা বিবর্তন/৪। C/o শ্রীগোপেশ রায়, 'মা সাবিত্রী সদন' বিষ্ণুপুর। গৌহাটি-১৬, আসাম

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

স্কেচ ২২

অনেক কঠিন ক'রে অর্গল বন্ধ করেছ, প্রচণ্ড জোর
প্রয়োগ করেছ তুমি, সব শক্তি কবেছ নিঃশেষ ?

কোথায় রেখেছ চোখ, দেখ নি কি বিরাট ফাটল
গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মত সজোরে ঢুকবে এসে ঝড় ।

তোমার পতন আছে ঐ ছিদ্রে, মৃত্যু আছে, সমস্ত বিকল
করবার দস্যু আছে, জানও না তার ছদ্মবেশ ।

সময়াতুগ । বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৬ । ৯/১ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

রাজকল্যাণ চেল

মানুষের দিকে

অন্য কোনদিকে যাওয়ার চেয়ে মানুষের দিকে যাওয়া ভালো
অন্য কোন কথা বলার চেয়ে মানুষের কথা বলা ভালো ।

পৃথিবীর হৃদয় বড কঠিন বার বার শিকড ছড়াতে গিয়ে আমি বুঝেছি,
কঠিন তবু যে মানুষটি বসে আছে একা তার সাথে চাই যোগ,
যে ক্ষতস্থানে কাপড বাঁধছে একা হাতে—
চলো তার ক্ষতস্থানে বেঁধে দিই কাপড়ের টুকরো ।

যে যেখানে ছিল সে আর সেখানে নেই, সমস্ত নোঙরের মুখ আজ লক্ষ্যের দিকে
অন্য কোন গল্প বলার চেয়ে মানুষের গল্প বলা ভালো
অন্য কোন দিকে যাওয়ার চেয়ে মানুষের দিকে যাওয়া ভালো ।

সপ্তর্ষি । C/o সুব্রত চেল, বেলবনী, বাঁকুড়া ।

কবিতা এবং কবিতাবিষয়ক

কাব্যগ্রন্থ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : মহাপৃথিবীর কবিতা ॥ কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩। টা. ৮·০০

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত : রাজার গাড়ি ॥ উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩। টা. ৮·০০

আহসান হাবীব : দু' হাতে দুই আদিম পাথর ॥ কথাসরিৎ, ১৬ দিলখুশ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২, বাংলাদেশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে ॥ প্রমা, ৫ ওয়েষ্ট রেঞ্জ, কলিকাতা ১৭

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত । স্মৃতি যখন সমুদ্র ॥ প্রাইমাপাবলিকেশনস্, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭

তুলসী মুখোপাধ্যায় : দুই বসন্ত (সম্পাদনা) ॥ অনুভব প্রকাশনী, ২৪/২ আর. এন. দাস রোড, কলিকাতা ৩১। টা. ৭·০০

দেবী রায়ের কবিতা। মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, ২৪ পরগণা ॥ টা. ৫·০০

সুব্রত রুদ্র : গাঢ়তম ছায়া ॥ ১২ অভয় সরকার লেন থেকে প্রকাশিত, কলকাতা ২০। টা. ১·০০

রূপাই সামন্ত : মুহূর্তেব পাপড়ি ॥ কস্তুরী প্রকাশনী, ফুলডাঙা, বাঁকুড়া, ২০০টি কবিতা, প্রতিটি কবিতার জন্য এক পয়সা।

অশোক সেন : মানুষ বড় রতন রে ॥ জোয়ার প্রকাশনীর পক্ষে পুষ্পজিৎ রায় ॥ রামকৃষ্ণপল্লী, মালদহ। টা. ৪·০০

ফিরোজ চৌধুরী ; তুমি ॥ স্বরলিপি, ২৩এ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা ৯ টা. ৫ ০০

কল্যাণ ভক্তচৌধুরী : দশজন কবি ॥ বাংলা প্রাচী প্রকাশন, ৪২ অরবিন্দ পল্লী, পোঃ ইচ্ছাপুর নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা। টা ৬'০০

কৃষ্ণা বসু : শব্দের শরীর ॥ ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা ৬ ॥ টা. ৪'০০

শীতল চৌধুরী : একাকী অলৌকিক ক্রন্দন ॥ সরকার ভবন, ফ্ল্যাট ৫, বহুবাজার, চন্দননগর, জেলা হুগলী ।। টা. ৪'৫০

কবিতা বিষয়ক

নলিনীকান্ত গুপ্ত : রচনাবলী ১ম খণ্ড ॥ সাহিত্যিকা। শৃঙ্খল, ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২ ॥ টা. ২৫'০০

সমীরকান্ত গুপ্ত : কাব্যালোকে ॥ শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২ ॥ টা. ৮'০০

আলফ্রেড এডওয়ার্ড হাউসম্যান ॥ কাব্যের স্বভাব ॥ অনুবাদ ভূমিকা ও টীকা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ টা. ২'২৫

অশোক মিত্র : কবিতা থেকে মিছিলে ॥ অয়ন, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯ ॥ টা. ১০'০০

অশ্রুকুমার সিকদার আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় ॥ অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬ ॥ টা. ২০'০০

উত্তম দাস : কবিতার সেতুবন্ধ ॥ কবি ও কবিতা প্রকাশন, ১০ বাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ॥ টা. ৯'০০

অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিণ্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রেসের ফোন : ৩৫-১০৮৭ ॥

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-)

আমরা দুজনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমার আমার মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-)

তোমার দেহ উঠ্‌তি ধানের মঞ্জরী।
আঁটো গড়ন, নধর চিকন, কচি কাঁপন শিষের
কেমন করে ধরি ?

তোমার দেহ রেশমী সুতোর জাল।
কামনারই ঠাসবুননে ময়ূরকণ্ঠী চেলি
পরবো কতো কাল ?

অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-)

গাছের সারির পিছে চুপি-চুপি কখন এখানে
এসেছে শবরী উষা, দাঁড়ায়েছে বনের আড়ালে,
পরেছে বিশাল খোঁপা, সদ্যফোটা রক্তজবা কানে,
বুকের কাঁচুলিখানি বিঁধে আছে মহুয়ার ডালে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-)

আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি,
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা॥

কবিতা পড়ুন

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-   )

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-   )

ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলঙ্কার
খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে
তিন ভুবনকে ঢেকে,

সে সময় আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ, যায়
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিরুদ্দেশে
দেখি আর ঘুম পায়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-   )

এখন আশ্বিন মাস। তাহলে কি গলুই ফিরাব ?
ফিরে যাক সনাতন আঙিনায় ?
আশ্বিনে বাড়ির কথা মনে পড়ে নৌকার মাঝির,
যেন নিশাকালে মনে পড়ে
নূতন ত্বকের নীচে পুরাতন রুধিরের কথা।

চৌদিকে ভীষণ ঝড় দিয়েছিল বিদায়-রজনী,
তবু মনে পড়ে।

॥ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ॥

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

পট-দীপ ধ্বনি 50 00
অমর ঘোষ

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী 5 50
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব 8 00
ড হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবভাবনা 9 00
ড সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত-রত্নাকর (অনুবাদ) 18 00
শার্ঙ্গদেব

চৈতন্যোদয 2 00
হরিশ্চন্দ্র সান্যাল

শিল্পতত্ত্ব 15 00
ড সাধনকুমার ভট্টাচার্য (ক্রোচে)

বাংলা লোকনাট্য-সমীক্ষা 16 50
ড গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ 14 00
ড সুধীরকুমার নন্দী

বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত 45 00
ড অরুণকুমার বসু

Studies in Aesthetics 10 00

Tagore on Literature & Aesthetics 8 50
Dr Prabasjiban Chaudhuri

Studies in Artistic Creativity 15 00
Dr Manas Ray Choudhuri

Indian Classical Dances 25 00
Sri Balkrishna Menon

Sociology of Planning 14 50
Dr. Sobhanlal Mookerjea

Tagore and the Perennial Problems of Philosophy 3 50
Dr. Sarojkumar Das

Chhau Dance of Purulia 10·00
Dr Ashutosh Bhattacharya

Ten Schools of the Vedanta,
Part I 6 00
Part II 7 00
Part III 22 00
Dr. Roma Choudhuri

Tragic Relief 12 00
Prof. P K. Guha

বিক্রয়কেন্দ্র

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
৫৬এ, বি টি. রোড, কলিকাতা ৫০

জিজ্ঞাসা, ১এ, কলেজ রো ও ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯

যোগাযোগ **এমারেল্ড বাওয়ার,** ৫৬এ, বি. টি. রোড, কলিকাতা ৫০

অরুণ ভট্টাচার্য প্রণীত

নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা

●

সম্প্রতি প্রকাশিত এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'শিল্পতত্ত্ব', 'সৌন্দর্যদর্শন' এবং 'সঙ্গীতে সুন্দরের ধারণা' বিষয়ক তিনটি বিভিন্ন পর্বে অতি দুরূহ বিষয় আলোচিত হয়েছে। স্বচ্ছ ও সহজ ভাষায় কাব্য নাটক সংগীত নৃত্য ও চিত্রকলা থেকে উদাহরণ সহ পরিকল্পিত এই গ্রন্থ লেখকের দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এক বিচিত্র আত্ম-আবিষ্কার। ভারতীয় রসতত্ত্ব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র অধ্যায় এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পী সাহিত্যিক স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য।
প্রচ্ছদ . মলয়শংকর দাশগুপ্ত। মূল্য ' টা ২৫ ০০

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক বাংলা কবিতা এবং নানা প্রসঙ্গ
[রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কবিতার বিস্তীর্ণ ইতিহাস এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হচ্ছে।]

কাব্যসাহিত্য সমালোচনা

১ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস
২. Tagore and the Moderns

কাব্যগ্রন্থ

১ সমর্পিত শৈশবে ২. হাওয়া দেয় (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ) ৩ ঈশ্বরপ্রতিমা ৪ সময় অসময়ের কবিতা ৫ সমুদ্র কাছে এসো (প্রকাশিতব্য) ৬ বারো বছরের বাংলা কবিতা (সম্পাদনা) ৭ চল্লিশ দশকের কবিতা (সম্পাদনা)

●

উত্তরসূরি প্রকাশনী . কলকাতা ৫০ ॥ ইণ্ডিয়ানা : কলকাতা ৭৩

সম্প্রতি প্রকাশিত

আনুষ্ঠানিক সংগীত : ২য় খণ্ড

উৎসবে আনন্দে শোকে পারিবারিক ও সামাজিক নানা উপলক্ষে গীত
পঁচিশটি গানের স্বরলিপি। মূল্য ১০.৫০ টাকা

আনুষ্ঠানিক সংগীত ১ম খণ্ড। মূল ৭.৫০ টাকা

মালঞ্চ নাটক

বহু-পরিচিত 'মালঞ্চ' উপন্যাসটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ,
গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। মূল্য ৫.৫০, শোভন ১০.৫০ টাকা

শান্তিনিকেতনের এক যুগ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গঠনকর্ম থেকে আরম্ভ করে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হয়ে যাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে, সুর মিলিয়েছিলেন তাঁর গানে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মননে—তাঁদের মধ্যে পরলোকগত বিশেষ কয়েকজনের স্মৃতি ও শ্রুতি-চারণ। শান্তিনিকেতন-জীবনের একযুগের উজ্জ্বল চিত্র। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র-শোভিত। মূল্য ২৪.০০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায়

শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী

'চার অধ্যায়' উপন্যাসের একটি মননধর্মী সনিষ্ঠ আলোচনাগ্রন্থ। রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও পাণ্ডুলিপি চিত্রে ভূষিত। মূল্য ১৫.০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

বিক্রয়কেন্দ্র . ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

শিক্ষার সম্প্রসারণে বামফ্রন্ট সরকার

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কি অর্জন করা গেছে—

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ, সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ে বেতন।

৩৪০০ বিদ্যালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ, ৩১ লক্ষ শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য, সমস্ত শিশুর জন্য সব ভাষায় বিনামূল্যে বই, খাতা, শ্লেট, মেয়েদের জন্য পোষাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, ১৩,৮০০ নূতন প্রাথমিক শিক্ষক।

৯০০ নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সকলের জন্য সরকারী অনুদান, ২৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ, মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, খেলা-ধূলা, বিজ্ঞানাগারের উন্নতি, ১০,০০০ নূতন মাধ্যমিক / প্রাথমিক স্তরে জীবনমুখী শিক্ষার পাঠক্রম, গণতান্ত্রিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন, গণতান্ত্রিক সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ সংগঠন।

১৩৭৫টি নূতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার যেখানে মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭০১টি, গ্রন্থাগারগুলির জন্য সাহায্য ১০গুণ বৃদ্ধি, বেসরকারী গ্রন্থাগারে সাহায্য, কোলকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২৬০৮/৮১

অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচুন
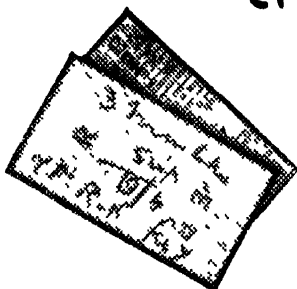
নিজের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করুন।

অন্যের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে পারতেন। ঝঞ্ঝাটের শেষ থাকত না।
পুরো ভাড়া এবং জরিমানা, মাঝ পথেই বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়া, ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস, ভাগ্য খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে।
অথৈ জলে শুধু শুধু ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন? মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে। পূর্ব রেলওয়েতে অন্যের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য লোক ধরা পড়ছেন।
টাকা দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন না। অনুমোদিত সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

With Compliments of

37 CHOWRINGHEE CALCUTTA 700 071

With compliments of

The Alkali and Chemical Corporation of India Ltd.

CALCUTTA BOMBAY MADRAS NEW DELHI

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥

॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পন্থাও একটাই—একমুঠো চালের মত নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

আপনারা দেখছেন শহর জুড়ে ভূগর্ভরেল তৈরীর কাজ চলেছে। কাজের জন্যে যানবাহনের পথ পাবিবর্তিত হয়েছে। তাতে আপনাদের যে অসুবিধে হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা সচেতন। তাই দ্রুত শেষ করার জন্য দিন-রাত অবিরাম কাজ চলেছে।
বিশ্বের কোথাও ভূগর্ভরেল তৈরীর কাজ আট বছরের কম সময়ে শেষ হয়নি। লণ্ডন নিউইয়র্ক প্যারিস, মস্কোব মত উন্নত শহরেও একই সময় লেগেছে। যদিও সেখানে বর্তমান কলকাতার মত এতো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। আশা কবছি অনেক বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা দ্রুত কাজ শেষ করতে পারব। আজকের এই কষ্ট স্বীকারেব মধ্যে দিয়ে আসবে আগামী দিনেব স্বাচ্ছন্দ্য। ভূগর্ভবেল আপনাকে দমদম থেকে টালিগঞ্জ ১৬ ৪৩ কিলোমিটার পথ পৌঁছে দেবে মাত্র ৩৪ মিনিটে। প্রতি তিন মিনিট অন্তব গাড়ি পাবেন। আপনাব যাত্রা হবে নিবাপদ শব্দবিহীন ও গতিময়।
আমাদেব আলাদিনেব মত আশ্চর্যপ্রদীপ নেই তবু যথাশীঘ্র কাজ শেষ করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

মেট্রো রেল
কলিকাতা

বাংলার দুঃস্থ তাঁতশিল্পীদের সেবায় এবং অনুরাগী ক্রেতাসাধারণের স্বার্থে—

কম দামে, সেরাগুণমান, কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্পে তৈরী সকল-রকম রেশম ও তাঁতবস্ত্রের বিচিত্র সমারোহ। তন্তুশ্রীর বস্ত্রসম্ভারে আপনার উৎসবের দিন মুখরিত হোক।

বিক্রয়কেন্দ্র : পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, নয়াদিল্লী, ব্যাঙ্গালোর এবং আগরতলা (ত্রিপুরা)

ওয়েস্টবেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম অ্যাণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ৭০০ ০১৩

Moments of
happiness..
moments for
Regent King
REGENT
KING
SAA/FD/19AC
Maximum price
Rs 3 50 for 20
Rs 1 75 for 10
Local taxes extra
STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

With the compliments of:

CHLORIDE INDIA LIMITED

Regd. office :

Exide House

59 E, Chowringhee Road, Calcutta-700 020

Main offices

Calcutta—Bombay—New Delhi—Madras- Nagpur

Jullundur—Lucknow—Bangalore

উত্তরসূরি : নিয়মাবলী

১. লেখা কপি রেখে পাঠান।

২ প্রকাশনযোগ্য বিবেচিত হলে অবশ্যই ছাপা হবে। চিঠি লেখার প্রয়োজন নেই।

৩. উত্তরসূরি কোন দল বা মতে বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাস করে, লেখা 'হয়ে উঠেছে' কিনা তার ওপর। বিশ্বাস করে, চিরকালের শিল্পসাহিত্য রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

৪. কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন কোন অবস্থাতেই প্রকাশিত হয় না।

৫ ২৭ বর্ষ থেকে গ্রাহক মূল্য সডাক বার্ষিক টা ১৫ ০০। এম ও. করে স্পষ্ট ঠিকানা লিখে পাঠান।

৬. সুস্থ কবিতা-আন্দোলনে সাহায্য করুন। প্রচার থেকে বিরত হ'ন।

সম্পাদক : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫০

ফোন : ৫২-২৪৫২

রামকিংকর-এর শিল্পকর্ম অবনীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শশালার সৌজন্যে

উত্তরসূরি ১০৯ কার্তিক-পৌষ ১৩৮৭ ২৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা

রামকিঙ্কর-কৃত অবনীন্দ্রনাথ একটি অসাধারণ ভাস্কর্য

●

সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরি ॥ ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড ॥ কলিকাতা ৫০ ॥ ৫২-২৪৫২

মেঘনাদবধ কাব্যে ভৌগোলিক স্থানবিন্যাস

গার্গী দত্ত

মেঘনাদবধ কাব্য রাম-রাবণের যুদ্ধের কল্পিত কাহিনী নিয়ে লেখা হলেও মধুসূদনের কল্পনায় এই কাহিনী প্রত্যক্ষ বাস্তবের মত সুনির্দিষ্ট ছিল, তার প্রমাণ এর কাহিনী স্থান ও কালের যুক্তিসঙ্গত বিন্যাসে পরিকল্পিত। এই কালবিন্যাস যেমন সুচিহ্নিত, এর স্থানবিন্যাসও তেমনি সুচিহ্নিত। স্থান ও কালের ঐক্যতত্ত্ব প্রাচীন গ্রীসের নাটকের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করত বলে লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্থান ও কালের ঐক্যের সঙ্গে ছিল ঘটনার ঐক্য। এই তিনটি ঐক্যর কাজ ছিল কাহিনীকে যুক্তির শৃঙ্খলে বদ্ধ করা। গল্পটা যেন বাস্তব বোধকে অতিক্রম করে না, যা সম্ভব তাই যেন ঘটানো হয়। রূপকথা বা আমাদের দেশের পৌরাণিক গল্পগুলির মাধুর্য যাই থাক, বাস্তবতার দিক দিয়ে এদের মধ্যে ছিল এই অভাব—স্থান ও কালের ঐক্য তাদের মধ্যে ছিল না। মধুসূদন তার কাহিনী-পরিকল্পনায় এই সূত্রটির প্রবর্তন করেছিলেন। নাটক বা মহাকাব্যে যে জীবনের অনুকরণ থাকে, তার তাৎপর্য এখানেই।

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে তিনটি ঐক্যই মেনে নিয়েছেন। অবশ্য এর ঘটনা-স্থানের দুটি স্তর আছে—একটি মর্ত্যলোক, একটি স্বর্গলোক। স্বর্গলোকের ঘটনায় অবশ্য এই ঐক্যের ব্যতিক্রম ঘটেছে। সেখানে যা ঘটছে, তার কালগত বিন্যাস ঠিক আমাদের সাধারণ যুক্তিবোধে মেলে না। স্থানগত ঐক্য কালগত ঐক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই স্থানের যুক্তিসিদ্ধতাও স্বর্গলোকের ঘটনায় ব্যাহত হয়। কিন্তু সেটা স্বর্গলোক বলেই গ্রাহ্য, তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। আবার মর্ত্যলোকে যা কিছু ঘটছে, মধুসূদন তাকে যুক্তিসিদ্ধ কালের মাত্রাধীন করেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণের বীরবাহু নিধন সংবাদ-শ্রবণে কাহিনীর আরম্ভ আর ইন্দ্রজিতের সৎক্রিয়ায় তার পরিসমাপ্তি। নয় সর্গে বর্ণিত সমগ্র ঘটনা ঘটছে তিনদিন দুই রাত্রি সময়ের মধ্যে। সমালোচকের মতে "কবির অনুপম কল্পনাগুণে, এই তিন দিন মাত্র ব্যাপী ঘটনা কত দীর্ঘ কালের কার্য্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয়"।[১] তার আগের আর কোনো বাঙালী কবি কাব্য-বর্ণিত ঘটনাকে একটা নির্দিষ্ট কালসীমায় বিধৃত

করেন নি। কেবল ঘটনার কাল নয়, একটা স্থানবিন্যাসও এই কাব্যেই আমরা প্রথম পেলাম। তাঁর প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভবের কাহিনী দেবলোকের, কতদিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয়েছিল তার আভাস যেমন কবি দেন নি, তেমনি স্বর্গলোকের অধিবাসীদেব চলাফেরার কার্যক্রমের কোন সুস্পষ্ট ক্ষেত্রনির্দেশও সেখানে নেই। ব্রহ্মলোক থেকে স্বর্গ মর্ত্যে তাদের অবাধ বিচরণ, হিমাচল বা সুমেরু অঞ্চল সবই মর্ত্যলোক থেকে বহুদূরে।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মর্ত্য ঘটনার কিছু স্থান নির্দেশ যে নেই তা নয়। বাস্তব সমাজচিত্র যেমন মঙ্গলকাব্যে প্রচুর, তেমনি ঘটনার স্থানরূপে বিভিন্ন দেশ গ্রাম নগরীর নামও উল্লিখিত। এ বিষয়ে মুকুন্দরামের কিছু ধারণা ছিল তা মনে করার কারণ আছে। তবু তাতে ধারাবাহিকতা বা সংলগ্নতার একান্ত অভাব। কালকেতুর বাক্যের আবাসভূমি থেকে গুজরাট কতদূরে সে ধারণা চণ্ডীমঙ্গল-কারের ছিল কিনা সন্দেহ, ধনপতি বাণিজ্য করতে সিংহল গেল কোন্ সাগর পাড়ি দিয়ে—সে জ্ঞানের পরিচয় নেই। তাঁদের স্থূল কল্পনায় দেব-মানবের বিচরণভূমি এক, কেবল বিচ্ছিন্ন অসংলগ্নভাবে কতকগুলি জায়গার নাম এসেছে স্থানগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াই। তাই পার্থিব সমুদ্রে 'কমলে কামিনী' দেখা সম্ভব হয়েছে আর বেহুলার কলার মাঞ্জাস বাংলার গ্রামের ঘাট থেকে পাড়ি জমিয়েছে স্বর্গে নেতা ধোবানির ঘাটে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কয়েকটি সুপরিচিত স্থানের নাম পওয়া যায—কাশী, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, যশোব, ভুবনেশ্বর, নীলাচল, দিল্লী। মানসিংহ কাব্যে ভবানন্দের দিল্লী যাত্রাব বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি কিছু ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যশোর থেকে গঙ্গাপার হয়ে দক্ষিণের পথ ধরে চলেছেন ভবানন্দ। মঙ্গলকোট, উজানী, বর্ধমান, মল্লভূমি, কর্ণগড় দক্ষিণে রেখে বাংলার সীমান্তে গিয়ে পৌছালেন। তারপর মেদিনীপুর, নারায়ণগড, দাঁতন, জলেশ্বর, রাজঘাট ছাড়িয়ে কটক, কটক ছেড়ে ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, আধার নালা, নীলাচল। এই পর্যন্ত কবির জ্ঞান বেশ প্রত্যক্ষ মনে হয়। তারপরেই সব জড়িয়ে গিয়েছে। নীলাচল ছেড়ে সেতুবন্ধ, কৃষ্ণা, কাঞ্চী মারাঠাদের দেশ। তারপরে গুজরাট মথুরা বৃন্দাবন, তারপরে দিল্লী। বোঝা যায় এ-দিকটা সম্বন্ধে কবির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব। তীর্থস্থানগুলির নাম তাঁর জানা আছে। সেইগুলিই ভারতচন্দ্র দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু ধারাবাহিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

তাঁর ছিল না। তবু মনে হয় ভারতচন্দ্রের কাব্য-কাহিনীতে কল্পনামূলক সৃষ্টি তেমন নেই। তাঁর মানুষগুলি, তাদের আচরণ, তাদের চিন্তাভাবনা সব প্রত্যক্ষ, তাদের বিচরণক্ষেত্রও আমাদের জানার পরিধির মধ্যে। কল্পনা দিয়ে স্থানগত ঐক্য রক্ষার তেমন প্রয়োজন ঘটে নি। তাঁর জানা ভৌগোলিক জ্ঞান যতটুকু ছিল, তাতেই কাজ চলে গিয়েছে।

মেঘনাদবধের কাহিনী রামায়ণ থেকে নেওয়া। এখানে কল্পনার অবকাশ প্রচুর। কল্পনা দিয়েই তাঁকে কাহিনীতে স্থানগত ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা আনতে হয়েছে। পৌরাণিক একটি খণ্ড কাহিনীকে মহাকাব্যের বিস্তার দিয়ে সম্পূর্ণ একটি কাল্পনিক কাহিনীতে সুস্পষ্ট এবং সুপরিকল্পিত স্থানবিন্যাসের মধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় কবিত্ব-কল্পনার যুক্তিসিদ্ধতা ও প্রত্যক্ষতা। তাঁর কল্পনার সৃষ্টি রাবণকে দিয়ে যেমন জীবনধর্মকে প্রকাশ করলেন, তেমনি কাহিনীকে একটি বিশ্বাস্য এবং সুস্পষ্ট স্থানবিন্যাসের আয়ত্তে এনে তাকে একাধারে বাস্তব ও মানবিক করে তুললেন।

লঙ্কাতে রাবণের প্রাসাদ দুর্গ প্রাচীর অশোকবন চণ্ডীর দেউল ইন্দ্রজিতের প্রমোদ কানন প্রভৃতি যে-সব স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের স্থান বিন্যাস সম্বন্ধেও কবির ধারণা ছিল স্পষ্ট। কোন্‌টা কোন্ জায়গায়, কোন্ দিকে অবস্থিত, কবি তার নির্দেশ দিয়েছেন। কবি কল্পিত এই চেহারাটি প্রথম সর্গের প্রথম দিকেই পাওয়া যায় প্রাসাদ শিখরে উঠে রাবণের বর্ণনায়। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাবণ ওপরে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে চাইলেন। এর মধ্যে কবির অভিপ্রায় একটু ভাবলেই বোঝা যায়। রাবণের প্রাসাদ এবং যুদ্ধক্ষেত্রের 'লে আউট' বা ছকটার একটা ধারণা তিনি পাঠকদের দিতে চান। "চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন সৌধ কিরীটিনী লঙ্কা মনোহরা পুরী।" লঙ্কার কেন্দ্রস্থলে আছে প্রাসাদ, তাকে ঘিরে অজস্র অট্টালিকা সৌধ, দোকান-পাট, বাগান, সরোবর, মন্দির। বিবিধ রত্নে পূর্ণ এই নগরীকে ঘিরে সুউচ্চ প্রাচীর, সশস্ত্র রক্ষীদল নগর রক্ষার জন্য প্রাচীরের উপরে প্রহরারত। প্রাচীরের চারদিকে চার সিংহদ্বার। বাইরে শত্রু সৈন্য বেষ্টন করে আছে। তারা যাতে প্রবেশ করতে না পারে তাই সিংহ দুয়ার চারটি বন্ধ। কিন্তু বাইরের দিক দিয়ে এই দুয়ারগুলিতে হানা দিয়ে আছে রামপক্ষীয় বীরের দল—উত্তর দুয়ারে সুগ্রীব,

পূর্ব দুয়ারে নীল, দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ, পশ্চিম দ্বারে রাম লক্ষ্মণ হনুমান বিভীষণ।
বাল্মীকি রামায়ণেও রাম সৈন্য পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রীসহ রাবণের সুউচ্চ প্রাসাদ শিখরে ওঠার কথা আছে

আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপাণ্ডুরম্।
বহুতাল সমুৎসেধং রাবণোৎথ দিদৃক্ষয়া ॥[২]

অপার দুঃসহ মহাবল বানর সৈন্য দেখে ক্রোধান্ধ রাবণ সারণের কাছে বানর যূথপতিদের পরিচয় জানতে চাইলে সারণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাদের পরিচয় দিল। তবে দ্বাররক্ষণ বর্ণনা মধুসূদনের কৃত্তিবাসের অনুরূপ।[৩] কেবল কৃত্তিবাসে পশ্চিম দুয়ারে একা হনুর কথা আছে। বাল্মীকির বর্ণনায় দ্বাররক্ষণ অনুরূপ। নীল অঙ্গদ ও হনুমান পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দ্বারেই আছে। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ উত্তর দ্বারে এবং বিভীষণ ও জাম্ববান মধ্যগুল্মে। রামায়ণে সৈন্য সংস্থাপনে একথা স্পষ্ট নয় যে শত্রুসৈন্য লঙ্কাকে বেষ্টন করে রেখেছে, কেবল যুদ্ধ প্রকরণটুকুই আছে সেখানে। ইলিয়াড মহাকাব্যে শত্রুসৈন্যের ট্রয় নগরীকে বেষ্টন করে রাখা এবং ট্রয়ের প্রাচীরের দ্বার রুদ্ধ রাখার উল্লেখ আছে। সে বর্ণনা মধুসূদনকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে

"শত প্রসরণে
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী
গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি
বেড়ে জালে সাবধানে কেশব কামিনী ,[৪]

এই শত্রুসৈন্য বেষ্টনের বাইরে অদূরে যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে মৃতদেহভুক্ শকুনি গৃহিনীর ভীড়। যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখতে পেল রাবণ। বিধির বিধানে ক্ষুব্ধ নৃপতি দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পেল সমুদ্রকে লঙ্কাদ্বীপকে বেষ্টন করে আছে যে অতল জলধি। "ফিরাইয়ে আঁখি" তার চোখে পড়ল রামের তৈরী "অপূর্ব বন্ধন সেতু"। তখনই মহামানী রাবণের মুখে উচ্চারিত হল তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ'। আত্ম হৃদয়ের সঙ্গে তরঙ্গোদ্বেল জলধির সাদৃশ্যানুভবের রহস্য ছাড়াও পাঠকের বিস্ময় জাগে মধুসূদনের অতিস্পষ্ট ভৌগোলিক বিন্যাসের শক্তি দেখে। এটা স্পষ্টই অনুমান করা যায় রাবণ প্রাসাদশিখরে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন,

একক্কালে সমগ্র লঙ্কার মানচিত্র তার চোখে পড়েছে, দূরে সমুদ্র, রামেশ্বরের কাছে সেতুবন্ধটি ডান দিকে মুখ ফিরিয়েই (পেছনে ঘুরে নয়) চোখে পড়ে। পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন অনুমান করার কারণ সমগ্র কাব্যের মধ্যেই এই পশ্চিম তোরণের কথা ঘুরে ঘুরে আসছে। মধুসূদনের বর্ণনায় মূল যুদ্ধশিবির পশ্চিম দিকেই। সেখানে রাম লক্ষ্মণ বিভীষণ প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয় প্রধানদের অবস্থান। চিত্ররথ সেখানেই সমুদ্রতীরে রামের শিবিরে দেব-অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে। প্রমীলা তার নারী বাহিনী সহ পশ্চিম দ্বার দিয়েই শত্রু সৈন্য বেষ্টন অতিক্রম করে রামের অনুমতি লাভ করে লঙ্কা প্রবেশ করেছে। আর চির-কোলাহল ময় পয়োনিধিতীরে রামচন্দ্রের শিবিরেই রাক্ষস সচিবশ্রেষ্ঠ গিয়েছিল ইন্দ্রজিতের সৎক্রিয়ার জন্য সাতদিন যুদ্ধ-বিরতির অনুনয় নিয়ে। শেষ পর্যায়ে এর পশ্চিমদ্বার দিয়ে শবযাত্রা চলেছে সিন্ধুতীরে। আত্মন এই পশ্চিম প্রীতি কি মধুসূদনের মনে পশ্চিমদেশ যাত্রা বাসনারই দ্যোতক? রাবণের সৌভাগ্য সূর্যের অস্তোন্মুখিতার দ্যোতনাও অসম্ভাবিত নয়।

কাব্যের প্রথমাংশেই সমগ্র লঙ্কাপুরীর চিত্র উপস্থাপনায় পাঠকের মন একটি বিশেষ দেশ ও কালে নিবদ্ধ হয়। ঘটনার ভূমি সংস্থানের জন্য মন প্রস্তুত হয় তবে এখনও কোন ঘটনার আরম্ভ হয় নি। এর পরেই প্রভাসা-নাম্নী ধাত্রীর বেশে রাক্ষসপুরী রাজলক্ষ্মী প্রমোদ উদ্যানে ইন্দ্রজিতের কাছে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দিলেন। বীরকুমার বিলাস বিভ্রম পরিত্যাগ করে কর্তব্য পালনের জন্য লঙ্কাপুরীতে গমন করল, প্রমীলাকে আশ্বাস দিয়ে গেল—

> ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
> কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
> রাঘবে।[৫]

প্রশ্ন জাগে এই প্রমোদ-উদ্যান কোথায়? অবশ্যই প্রাচীর-বেষ্টিত নগরের বাইরে। কারণ তৃতীয় সর্গে লঙ্কায় প্রবেশ করে পতির সঙ্গে মিলিত হতে প্রমীলাকে সৈন্যবেষ্টন ভেদ করতে হয়েছে। লক্ষ্মী বলেছেন—

> "যাই আমি যথা
> ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।"[৬]

'ধাম' বলতে এখানে নগরীকেই বোঝাচ্ছে কারণ দ্বীপটির বাইরে অবশ্যই

যায় নি তারা। লক্ষ্মী আকাশপথে যাত্রা করেছেন, তাই গতিপথ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ইন্দ্রজিৎও রথ পবনপথে চালিত করে নগরে ফিরে এসেছে। আকাশ পথে যে রাক্ষস-রথ চলত তার উদাহরণ রাবণের পুষ্পক রথ এবং সীতা-হরণ পন্থা। প্রমীলা ইন্দ্রজিতের প্রত্যাবর্তনে দেরী দেখে সন্ধ্যাকালে শতসখীসহ রণসজ্জা করে লঙ্কার কণকদ্বারে উপনীত হল—তার বিস্তৃত বর্ণনা সমগ্র তৃতীয় সর্গ ব্যাপী। সদাসতর্ক রাক্ষস সৈন্য শত্রুর উপস্থিতি অনুমানে গর্জন করে উঠল কিন্তু রক্ষঃ-কুল বধূকে দেখে হুড়কা টেনে বজ্রশব্দে দ্বার খুলে তাদের সানন্দে বরণ করেও নিল।

চতুর্থ সর্গের অশোক কানন কোথায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা একটু কঠিন। ইন্দ্রজিতের পরিণতির সঙ্গে এই অংশ ঘটনাগত ভাবে যুক্ত নয়, কবি নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তবু সীতার প্রতি তাঁর মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল, সর্বংসহা ধরিত্রীর মত অসীম ধৈর্যশীলা ক্ষমাপরায়ণা সীতার চরিত্র চিত্রণের সুযোগটি তিনি গ্রহণ করেছেন। চিরকালীন এই মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনাস্থলকে তেমনভাবে নির্দিষ্ট করারও হয়তো প্রয়োজন ছিল না। অশোক কানন প্রাচীরভ্যন্তরে, না বাইরে সেটা বোঝা যায় না। তবে নগর কেন্দ্র থেকে দূরে তাতে সন্দেহ নেই। মেঘনাদ সেনাপতি পদে বৃত হবার পর লঙ্কার প্রজাবৃন্দ যখন উৎসবে মত্ত তখন চেড়ীরাও সীতাকে পরিত্যাগ করে সে উৎসবে যোগ দিতে চলে গেছে, এই অবসরে সরমাসতী সীতার কাছে এসে তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনল। আবার দূরে তাদের প্রত্যাবর্তনের পদধ্বনি শুনে সীতা সরমাকে দ্রুত চলে যেতে বলেছেন[৭] এতে নগর কোলাহল থেকে অশোক কাননের নিরাপদ দূরত্ব প্রমাণিত হয়। লঙ্কার বীরশূন্য অবস্থা বলতে গিয়ে সরমা সীতাকে সাগরকূলে শবরাশির দিকে তাকাতে বলেছে[৮] তাতে ধারণা হয় প্রাচীরে দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ যে সীতাকে উপলক্ষ্য করে এত বড় সংগ্রাম, তিনি প্রাচীর বেষ্টনীর বাইরে ছিলেন এটা মনে হয় না—চেড়ীর প্রহরা সত্ত্বেও। আর চেড়ীগণ কত সতর্ক তা তো সরমার আসার সুযোগ থেকেই বোঝা যায়। এই অসংগতিটুকু সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

পঞ্চম সর্গে চণ্ডীর দেউলের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণ সুমিত্রা-জননী-বেশা স্বপ্নদেবীর আদেশে চণ্ডীর দেউলে পূজা দিতে গেল।

'লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে,
শোভে সরঃ, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।' ৯

পশ্চিমদিকের শিবিরে রামের অনুমতি নিয়ে লক্ষ্মণ 'নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।' সেখানে 'বীতিহোত্ররূপী' সুগ্রীব তাকে বাধা দিল, পরে পরিচয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিলে

'কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যান দুয়ারে
ভীমবাহু সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ দর্শন মূর্তি।'১০

এই সরোবর এবং দেবীমন্দিরও প্রাচীরের বাইরে, না ভিতরে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। নগরভ্যন্তরে লক্ষণ প্রবেশ করেছে ভাবা যায় না কারণ রাক্ষস প্রহরী প্রাকারোপরি সদা-জাগ্রত। আবার বাইরে অরক্ষিত অবস্থায় কেন দেব-দেউল থাকবে—বিশেষতঃ অন্য দেবগৃহসমূহ যখন নগরকেন্দ্রে। এখানেও সামান্য অসংগতি রয়ে গেছে। স্বচ্ছ সরোবরের জলে অবগাহন করে তীরবর্তী মন্দিরে ভক্তিভরে পূজা নিবেদন করে লক্ষ্মণ মহামায়ার প্রসাদ অর্জন করল, দেবী নির্দেশ দিলেন

'যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি
নিকুম্ভলা যজ্ঞাগারে পূজে বৈশ্বানরে।'১১

এই নির্দেশ থেকেও ধারণা জন্মায় নগরের বাইরে।

এ সর্গের শেষভাগেই ইন্দ্রজিতের রাস মন্দির, মন্দোদরীর মহল, শিবের মন্দির ও যজ্ঞশালার একটা সংস্থান-চিত্র পাওয়া যায়। উষাকালে প্রমীলাসহ মেঘনাদ শিবিকারোহনে মাতৃসকাশে চলল আশীর্বাদ প্রার্থনায়। মন্দোদরী তখন অনিদ্রায় অনাহারে পুত্রের মঙ্গল-হেতু শিবের মন্দিরে পূজারতা। পুত্র দুয়ারে দণ্ডায়মান এ সংবাদ পেয়ে লঙ্কেশ্বরী শিবালয় থেকে বেরিয়ে এসে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করলেন। মাতৃচরণ বন্দনা করে বীর মেঘনাদ কাননের মধ্য দিয়ে কুসুম-বিস্তৃত পথে ধীর গতিতে পদব্রজে চললেন যজ্ঞশালা অভিমুখে। যজ্ঞশালা একেবারে কাছে নয়, কারণ চোখ মুছে প্রমীলা—

'হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে
জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ।'[১২]

ষষ্ঠ সর্গের প্রথমেই জানতে পারি উদ্যান থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মণ রামের শিবিরে ফিরে এসেছে। এর পরে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাত্রা। এই যজ্ঞাগারটি কোথায়? লক্ষ্মণ ও বিভীষণ শিবির থেকে বেগে বহির্গত হয়ে 'চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।' যখন তারা প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছে তখনই মায়াদেবী সহ রমা পশ্চিমদ্বারের কাছে এসে পৌঁছালেন, উভয়ে প্রাচীরের ওপরে উঠে বিভীষণ সহ লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। রমার কর্তব্য শেষ, মায়ার হাতে বীরদ্বয়কে সমর্পণ করে তিনি নিজালয়ে (মনে হয় রাবণ রাজ্যে লক্ষ্মী-মন্দিরে) ফিরে গেলেন। অতঃপর লক্ষ্মণ হাত দিয়ে দ্বার উদ্‌ঘাটন করে নগর প্রবেশ করল। এবার মায়ার প্রসাদে অদৃশ্যভাবে চলেছে বলে আর নগর প্রবেশে বাধা নেই। পথে দুধারে লঙ্কার—

শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস, অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ, স্যন্দন, অগণ্য
অগ্নিবর্ণ, অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,[১৩]

দেখতে দেখতে অগ্রসর হল তারা। মধুসূদনের কল্পনা বলে এগুলি এখন আর কাল্পনিক নয়, একেবারে বাস্তব জগতের সুপরিকল্পিত নগরের নক্‌সা। ক্রমে ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়ে 'নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে রক্ষোরাজ গৃহ।' শত্রুসৈন্য যখন প্রাচীর গাত্রে প্রতিহত তখন যে-প্রাসাদের শিখরে রাবণকে প্রথমে উঠতে দেখেছি, স্বয়ং শত্রু তখন সেই প্রাসাদ সমীপে উপনীত, কিন্তু প্রাসাদের শোভায় সেও বিমোহিত। যে-প্রাচীর রাবণের পুরীকে সুরক্ষিত রেখেছিল, পুরীবাসীগণও বিশ্বাস করে যুদ্ধ তার বাইরেই হবে। প্রাচীরের ওপরে উঠে যুদ্ধ দেখার কথা বলছে তারা। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে শমনরূপী শত্রু এসে নগর-কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে তা তারা জানে না। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার নগরের মধ্যভাগেই।

কাব্যখানির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নগর প্রাচীরের কথা এবং চারটি সিংহ-

দ্বারের কথা (বিশেষতঃ পশ্চিম দ্বার, কেবল রাবণের যুদ্ধ যাত্রাকালে চার দ্বার দিয়েই সৈন্য বেরিয়েছে) পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থেকে মনে হয় প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গের একটি ছবি কবির মনের মধ্যে ছিল। দুর্গেব কেন্দ্রস্থল সাধারণতঃ পর্বতের উপরে থাকে, সেই সুরক্ষিত অংশ থেকে বাইরে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে। সমগ্র দুর্গের পরিধি ও বাইরের ভূমি এককালে চোখে পড়ে। দুর্গের সুরক্ষার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক প্রাচীর থাকে, বাইরেব দিকের প্রাচীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর জনবসতি, সৈন্যের আবাস, পশুশালা, দোকান বাজার ইত্যাদি থাকে আর কেন্দ্রস্থলে খাদ্য, অস্ত্র, ধনাগার, রাজন্যবর্গের বাস। প্রাচীরের উপর থেকে বাইরের দিকে নজর রাখা হয়, প্রয়োজনে ভিতর থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। প্রবেশ পথে সতর্ক প্রহরা। হায়দ্রাবাদের কাছে গোলকোণ্ডা ফোর্ট নাকি সাতটি বেষ্টনী-প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে বাসকালে কবি এরকমের কোন দুর্গ দেখেছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে রাবণের প্রাসাদের সুউচ্চ শিখরের উল্লেখ এবং রাবণের লঙ্কার শোভা, প্রাচীরের বাইরের সৈন্য বেষ্টন এবং রণক্ষেত্র, দূরে রাজ্য সীমায় সমুদ্র দর্শনের বর্ণনায় দুর্গ-পরিকল্পনার সঙ্গে একটা মিল দেখা যায়। এজন্যই কোথাও লঙ্কাপুরী বলতে কেন্দ্রস্থলকে বোঝায়, কোথাও বা কিছুটা বাইরের দিক বোঝায়। কল্পনা করতে দোষ নেই যে সবচেয়ে সুরক্ষিত অংশে রাজপ্রসাদ, যজ্ঞাগার প্রভৃতি এবং বাইরের দিকে বৃক্ষশোভিত উদ্যান, সরোবর, চণ্ডী দেউল, পশুশালা, অশোক-কানন ইত্যাদি। কবির কল্পনা অবশ্যই কোন কিছুকে হুবহু অনুসরণ করে না, তাঁর অনন্যনিরপেক্ষ স্বাধীন কল্পনাতেও এই ভূমি-বিন্যাস এসে থাকতে পারে। বাইবের যে প্রাচীরে রাক্ষস সৈন্য প্রহরা রত, মনে হয় সেটি নয়, ভিতরের প্রাচীরের দ্বারই অশনি-নিনাদে খুলে লক্ষ্মণ বিভীষণ একেবারে নগরের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়েছে।

প্রশ্ন জাগে লঙ্কা একটি দ্বীপ না নগরী। এ সম্পর্কে মধুসূদনের কল্পনাতেও একটু অস্পষ্টতা ছিল। কোথাও কেবল প্রাচীরবেষ্টিত নগরীটিকে বোঝান হয়েছে, কোথাও সমগ্র দ্বীপটিকে। রাবণের রাজত্ব সমগ্র দ্বীপ ব্যাপীই ছিল। রাজধানী লঙ্কা নগরী ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত। সমুদ্র পার হয়ে শত্রুসৈন্য রাজ্যে প্রবেশ করেছে কিন্তু প্রাচীর-বেষ্টিত নগরীর অভ্যন্তরে সমগ্র ঐশ্বর্যসহ প্রজাবৃন্দ ও

সৈন্যবাহনী নিরাপদে রয়েছে। গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে কবির মনে প্রাচীন গ্রীসের City State-এর ধারণাটি প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। একটি শহরই সেখানে একটি রাজ্য। সেই অনুসারে প্রাচীর বেষ্টিত লঙ্কার কনক নগরীই রাবণের সাম্রাজ্য। আবার তারই বর্ণনায় সমুদ্র-বেষ্টিত লঙ্কা—যা নাকি প্রাচীরে বাইরের শত্রু সৈন্য বেষ্টন, তার বাইরে যুদ্ধক্ষেত্র, দূরে ইন্দ্রজিতের প্রমোদ উদ্যানের 'বৈজয়ন্ত ধাম সম পুরী', সরোবর তীরের চণ্ডী দেউল সব কিছু নিয়ে—তাকে একটি বিস্তৃত রাজ্য বলেই মনে হয়। রাবণ তারই অধীশ্বর। সীতার উক্তিতে 'সাগরের ভালে সখি, এ কনকপুরী রঞ্জনের রেখা।'[১৪] লঙ্কা দ্বীপকেই বোঝানো হয়েছে। এই পুরীর ভৌগোলিক অবস্থানও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চবটি বন থেকে রাবন সীতাকে হরণ করে পুষ্পক রথে আকাশ পথে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পর্বত অরণ্য অতিক্রম করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছেছে।

রুদ্ধকক্ষ যজ্ঞশালাতে লক্ষ্মণ বিভীষণ প্রবেশ করল অদৃশ্যভাবে তখনই চরম মুহূর্ত সমুপস্থিত হল। কোশাকুশি নিয়ে ইন্দ্রজিত একাকী পূজায় বসেছে। জ্যোতির্ময় বেশধারী লক্ষ্মণকে দেখে আরাধ্য দেবতা বৈশ্বানর বলেই তার ভ্রম হয়েছে। লক্ষ্মণের পরিচয় জানতে পেরে নিরস্ত্র বীর প্রথমেই বলেছে—'ছাড দ্বার যাব অস্ত্রাগারে'। বোঝা যায় কবির ভুমি পরিকল্পনায় অস্ত্রাগার সন্নিকটেই। বিভীষণকে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখতে পেয়ে বীরের ক্ষুব্ধ উক্তি—

'এতক্ষণে, অরিন্দম কহিলা বিষাদে
জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিলা
যজ্ঞাগারে।'[১৫]

লঙ্কার রাস্তাঘাট, দুর্গের গোপন প্রবেশদ্বার ইত্যাদি অতি পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া জানা সম্ভব নয়—সেই ইঙ্গিতই বহন করছে। অভিজ্ঞ সেনাপতির মানসপটে যেমন সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে বিরাজ করে এবং তদনুযায়ী তিনি সুকৌশলে যুদ্ধ প্রকরণ প্রস্তুত করেন তেমনি রাক্ষস সৈন্যসজ্জা, তাদের রণবেশ, শোভাযাত্রা, গতিপথ ইত্যাদি এবং শত্রু-সৈন্যের অবস্থিতি ও চলাচল কবি মধুসূদন নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন। লঙ্কার শোভা বর্ণনা বা বিভিন্ন কাহিনীবৃত্তের স্থান নির্দেশে ছোটখাট অসংগতি চোখে পড়লেও যুদ্ধ

বিষয়ে কোন অসংগতি ধরা পড়ে না। ইলিয়াড কাব্য খুঁটিয়ে পড়ার ফল কিনা জানি না।

এই যজ্ঞাগার কল্পনা ও ইন্দ্রজিৎ বধ বর্ণনা মধুসূদনের সম্পূর্ণ মৌলিক। বাল্মীকি রামায়ণে আছে মৃত্যুর দিনে ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতামূর্তিকে বানর সৈন্যের সামনে খড়্গদ্বারা ছেদন করল। তাতে রাম শোকে মুহ্যমান হলে বিভীষণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে "আজ সে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম করবে, সেখানে অগ্নি ও দেবগণ গেছেন। এই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সে সংগ্রামে দুর্ধর্ষ হবে, তার ফলে আমরা সকলেই তার হাতে মরব। পাছে যজ্ঞে কোনও বিঘ্ন হয় সেজন্য সে মায়াদ্বারা বানরদের বিমোহিত করেছে। রাম, তুমি মিথ্যা শোক ত্যাগ করে এখানেই থাক, আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাব, লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে যজ্ঞ পণ্ড করবেন।"[১৬]

যজ্ঞ সমাপনান্তে মহাবনে নীল মেঘতুল্য ভীমদর্শন বটবৃক্ষের তলে ভূতগণকে উপহার দেবার পর যুদ্ধ করতে গেলে সে অবধ্য হবে। তাই লক্ষ্মণ আগেই তার সৈন্য ক্ষয় করতে আরম্ভ করল। সেনাগণ বিধ্বস্ত হচ্ছে শুনে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাম-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। মৃত্যুর পূর্বে সে নানাপ্রকার মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্রবাণে শিরস্ত্রাণ ও কুন্তলভূষিত ইন্দ্রজিতের মস্তক দেহচ্যুত হয়ে ভূতলে পড়ল। কৃত্তিবাস-রামায়ণে আছে লক্ষ্মণ সৈন্য সমেত গড়ের দ্বার ভেঙে প্রবেশ করেছে এবং যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়েছে :

> "গড়ের নিকট উপনীত মহাবল।
> ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশ সকল॥"[১৭]

মধুসূদনের গড় বা দুর্গের ধারণাটা এখান থেকে পাওয়াও অসম্ভব নয়। কৃত্তিবাস যজ্ঞস্থান বটবৃক্ষ তলাতেই নির্দেশ করেছেন.

> "মেঘবর্ণ বসে আছে বটবৃক্ষতলে।
> যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নাম নিকুম্ভিলে॥"[১৮]

বানর সৈন্যের নানা উৎপাতে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, মায়া দ্বারা রথ, রথাশ্ব এবং যুদ্ধবেশ সৃষ্টি করে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। বিপক্ষীয় অস্ত্রজালে বিভ্রান্ত হয়ে একবার

"ইন্দ্রজিৎ পালায়ে লঙ্কায় যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে ॥"[১৯]

গড়ের দ্বার ভেঙে তারা প্রবেশ করেছে। আবার সেখান থেকেও ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাতে পালাতে চেষ্টা করে—এ বর্ণনা লক্ষণীয়। তবে কি গড় লঙ্কার বাইরে? অনুরূপ সংস্থান মধুসূদনের কাব্যেরও স্থানে স্থানে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণের ব্রহ্ম-অস্ত্রে (ঐন্দ্রাস্ত্র নয়) ইন্দ্রজিতের মৃত্যু। মধুসূদন কিন্তু রণক্ষেত্রে মৃত্যু দেখালেন না। রুদ্ধকক্ষ যজ্ঞাগারে একাকী নিরস্ত্র বীর আক্রান্ত হ'ল, তার ক্ষণিক মনোবিকার ও ভীতির সঞ্চার, পরমুহূর্তে পূজোপকরণকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহারের চেষ্টা, মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণের অস্ত্রাকর্ষণে ব্যর্থতায় বীরেব অভিমান এবং অন্তিম মুহূর্তে মাতৃ-পিতৃপদদ্বয় এবং প্রেমময়ী পত্নী প্রমীলাকে স্মরণ—সব মিলে আশ্চর্য বাস্তব এবং মানবিক হয়ে উঠেছে। এমন উল্কা পতনের পর সিদ্ধকাম লক্ষ্মণ যখন শোকাকুল বিভীষণকে বলে—'যাইব চল যথায় শিবিরে চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে,[২০] তখন বিভীষণের মতোই পাঠকও অতল বেদনার ভাব-বিহ্বলতার জগৎ থেকে অকস্মাৎ রূঢ় বাস্তব জগতে ফিরে আসে। যে পশ্চিম দ্বার থেকে তাদের যাত্রা সুরু হয়েছিল সেখানেই আবার ফিরে চলল দুজনে।

তারপর রাবণের যুদ্ধযাত্রা। নিদারুণ শোকসংবাদ রাবণকে রুদ্রতেজে প্রজ্বলিত করল। প্রতিহিংসায় পরিণত শোক রাবণের হৃদয়কে উদ্‌বেল সমুদ্র-বিক্ষোভের মত রণোন্মাদ করল। 'অরাম অরাবণ বা হবে ভব আজি'—এই প্রতিজ্ঞায় সমগ্র লঙ্কায় সমরসজ্জার আয়োজন—তার সঙ্গে প্রকৃতিও উন্মত্তা হয়ে উঠল। জীমূতগর্জনে, চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ বিদ্যুৎ ঝলকে—লঙ্কায় যেন প্রলয় সমুপস্থিত। এ সময়ে যে সৈন্যদল চারদিকের দ্বার দিয়েই বেরোবে—তাই তো স্বাভাবিক।

"যক্ষ গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে।
গবাক্ষ-দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারিদ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে, গর্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য, দেববৃন্দ পশিলা সমরে।[২১]

এই যুদ্ধটা হয়েছে প্রাচীরের বাইরে, যুদ্ধান্তেও রাবণ ফিরে এসেছে প্রাচীরের ভিতরে। রাবণের উন্মত্ত রোষাগ্নি শক্তিশেল রূপে লক্ষ্মণকে মূহ্যমান করল। তাকে পুনরুজ্জীবিত করার উপায় দশরথের কাছে জেনে আসতে রামের পাতালে দীর্ঘপথ যাত্রার বর্ণনা অষ্টম স্বর্গ ব্যাপী। সে পথ বর্ণনায় নানা পুরাণের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে ভার্জিল দান্তে ও কাশীরামের অনুকরণ। বিশ্বাস-যোগ্য বাস্তব ভূ-বিন্যাসও সেখানে অপ্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে দ্বিতীয় সর্গে ত্রিদশ আলয়ের দেবদেবীগণের কার্যকলাপের কোন কাল পরিমাণ বা স্থান নির্দেশ করেন নি কবি। স্বর্গের কাহিনী যখন আরম্ভ হ'ল তখন সন্ধ্যা—'উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ আলয়ে' আর সন্ধ্যার পরে প্রমীলা সখী নৃমুণ্ডমালিনী-সহ যখন রামচন্দ্রের শিবিরে উপস্থিত হয়েছে তখন দেব-অস্ত্র রাম-শিবিরে পৌঁছে গেছে। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে দীর্ঘ প্রস্তুতি, চক্ষের পলকে তা পরিসমাপ্ত। মানবলোকের সময় দিয়ে দেবগণের আচরণকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই বহু যুগ সময়ে তাঁদের এক মুহূর্ত। ইলিয়ডের কবিও দেবগণের কার্য বর্ণনায় কাল নির্দেশ প্রযোজন মনে করেন নি। তাঁদের কায স্থান নির্দেশ, যাতায়াতের পথ বা দিক্ নির্দেশ করাও কবি মধুসূদন প্রয়োজন মনে করেন নি। মানুষের মাপে তাঁদের বিচার চলে না। লঙ্কা থেকে লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন, রতির সহায়তায় সাজসজ্জা সেরে ভবানী যোগাসন শৃঙ্গে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়ে মেঘনাদ নিধনের উপায় জেনে নিলেন, মায়াদেবীর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে চিত্ররথ মর্ত্যে রামশিবিরে পৌঁছে দিলেন—এসব ঘটেছে নিমেষের মধ্যে। তেমনি কে কেমন করে, কোথায়, কোন্ পথে গেলেন তারও কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ পাই না। ইচ্ছা মাত্রেই দেবগণের কাযসাধন হয় এটাই হয়তো কবি দেখিয়েছেন। মায়াদেবীর সাহচর্যে তাই রাম অনায়াসে পাতালে গমন করলেন। রামায়ণে রামের বহু অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মেঘনাদবধ আধুনিককালের কাব্য, মনুষ্যত্বের মহিমাই এ কাব্যের বাণী, তাই রামের অলৌকিক শক্তি বা দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি, রাক্ষসেরও কোন মায়াশক্তির বর্ণনা নেই। চরিত্রগুলি নিজেদের দেহবল ও চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়েই চিরকালের মানুষ হিসাবে সার্থক। কেবল মায়ার সহায়তায় লক্ষ্মণ অদৃশ্য রূপে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে এবং রামচন্দ্র পাতাল পরিভ্রমণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে এই অপ্রাকৃত বর্ণনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের কবিত্বশক্তি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে, এই সর্গটিই তাঁর দুর্বলতম রচনা। আর লক্ষ্মণও যখনই মায়ার ছলনা আশ্রয় করেছে, মনুষ্যত্বের বিচারে ইন্দ্রজিৎ রাবণের কাছে তখন সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। দেবতা ও মানুষের আচরণের সুস্পষ্ট পার্থক্যই মধুসূদন সচেতনভাবেই বজায় রেখেছেন। ষষ্ঠ সর্গে মায়াদেবী যখন কমলার স্বর্ণ-দেউলে অবতীর্ণ হলেন তখন তার কোন পথ নির্দেশ নেই। অথচ পরক্ষণেই লক্ষ্মণ বিভীষণকে নিয়ে অগ্রসর হবার সুবিস্তারিত পথ বর্ণনা, স্থান ও দিক্‌নির্দেশ। এর মধ্য থেকেই মধুসূদনের কাব্য রচনার গভীর প্রেরণার স্বরূপটি অনেকাংশে ধরা পড়ে।

আবার নবম অর্থাৎ শেষ সর্গে পাই সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ। বীর শ্রেষ্ঠ পুত্রের শোকে নিয়তি-নির্জিত রাবণ পুত্রের যথাবিধি সৎক্রিয়া করবার জন্য সাতদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখার অনুনয় জানিয়ে রাক্ষসসচিবশ্রেষ্ঠকে পশ্চিম দিকে রামের শিবিরে পাঠাল। সে শিবির প্রাচীরের বাইরে, সমুদ্রতীরে। রাম সম্মত হলেন। তিনি ধার্মিক এবং বীর। বিপক্ষীয় বীরকে সম্মান দেখানো বীরধর্ম। তাছাড়া প্রেতক্রিয়া তো ধর্মেরই অঙ্গ। 'ধর্মকর্মে রত জনে কভু না প্রহারে ধার্মিক।'[২২] ইন্দ্রজিতের মৃতদেহ ও চিতারোহণে-কৃতসঙ্কল্পা প্রমীলা সহ শোভাযাত্রা ধীর গতিতে এগিয়ে চলল। শববাহী রথে পতির মৃতদেহের পাশে প্রমীলা। রথের চূড়ায় ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজা। রথের আগে আগে চলেছে হস্তীপৃষ্ঠে দুন্দুভিবাদক, দুধারে ধ্বজাবাহী দল। রথের পশ্চাতে পদব্রজে চলেছেন শোকবিবশ রাবণ, তাঁকে ঘিরে মন্ত্রীদল। শোভাযাত্রার পশ্চাৎভাগে আবালবৃদ্ধবনিতা রক্ষোপুর-বাসী। তাদের পদভরে ধুলা উড়ছে আকাশে। কি সুস্পষ্ট বিন্যাস।

> "ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
> চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ নিনাদে।"[২৩]

নগরপ্রাচীরের পশ্চিমদ্বার অশনিনিনাদে খুলে বেরিয়ে এল শোভাযাত্রা। দশ শত রথীসহ অঙ্গদ চলল তার পিছনে বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনহেতু। দূরে অশোক কাননে বসে বৈদেহী সরমার মুখে শুনলেন—"সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে প্রেতক্রিয়া হেতু।" তারপরে—

'উতরি সাগরতীরে রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ।"[২৪]

চিতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'ল।

"সচকিত সবে
দেখিলা অগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীব বাসব বিজয়ী
দিব্য মূর্তি। বামভাগে প্রমীলা রূপসী।"[২৫]

অগ্র পশ্চাৎ, দক্ষিণ বাম, ঊর্দ্ধ অধঃ সমস্ত দিক ব্যাপী এক বিষণ্ণ অথচ রাজকীয় মহিমাময় চিত্র। অবশেষে জাহ্নবী জলে (এখানে সমুদ্রের পবিত্র বারি বোঝাচ্ছে) চিতা ধৌত করে রিক্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে সকলের লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন। কাব্যের পরিসমাপ্তিতে কবি রাবণের অতল বেদনার এক অপরূপ ক্লাসিক চিত্র রচনা করলেন। সমগ্র কাব্যব্যাপী লঙ্কারাজ্যের ঘটনাবলীর যে স্থান-ভিত্তিক স্পষ্ট বর্ণনা, এখানে তার চরম সার্থকতা। সমুদ্র বেলার উষর রিক্ততার পটভূমিতে রাবণ হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি।

মধুসূদন রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ বধের সংক্ষিপ্ত এবং অনেকাংশে অপ্রধান কাহিনীটিকে তাঁর মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য করলেন। পুরাণের অলৌকিক এবং অনতিস্পষ্ট কাহিনীটিকে কাল্পনিক বিস্তার দিতে গিয়ে তাকে এমন সুস্পষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত ভৌগোলিক স্থান ও দিক্‌নির্দেশের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারলেন যাতে তা একান্তভাবে বাস্তব ও মানবিক হয়ে উঠল। তাই কাব্যটি তাঁর আধুনিক চিন্তাভঙ্গীর একটি নিঃসংশয়িত প্রমাণ হয়ে রইল।

১. যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৫৬।

২. যুদ্ধকাণ্ড ২৬ সর্গ, ৫ শ্লোক

৩. কৃত্তিবাসী, রামায়ণ (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত) লঙ্কাকাণ্ড, বানর কর্তৃক লঙ্কার দ্বার রক্ষাকরণের নির্ণয়।

৪. মেঘনাদবধ, ১ সর্গ, ২৩৮-৪১ পংক্তি

৫ ঐ ১ সর্গ ৭১১-১৩ পংক্তি

৬ ঐ, ১ সর্গ, ৬১০ ১১ পংক্তি।

৭ ঐ ৪ সর্গ, ৬৮১ ৮৩ পংক্তি।

৮ ঐ, ৪ সর্গ, ৬৪৮ পংক্তি।

৯ ঐ, ৫ সর্গ, ১১৭ ১৮ পংক্তি।

১০. ঐ ৫ সর্গ, ২০৩-০৫ পংক্তি।

১১ ঐ ৫ সর্গ, ৩৪৮-৪৯।

১২ ঐ, ৫ সর্গ, ৫৭৮-৮০ পংক্তি।

১৩ ঐ, ৬ সর্গ, ৫৩৬ ৩৬ পংক্তি।

১৪। ঐ ৪ সর্গ ৬২৯ পংক্তি

১৫ ঐ, ৬ সর্গ ৫২০-২২ পংক্তি

১৬ রাজশেখর বসু কৃত অনুবাদ যুদ্ধকাণ্ড ২২ পরিচ্ছেদ

১৭, ২০ কৃত্তিবাসী রামায়ণ (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, লঙ্কাকাণ্ড, ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন ও মায়াসীতাবধ এবং ইন্দ্রজিতের পতন।

২১ ঐ, ৭ সর্গ, ৪৮৫-৮৯ পংক্তি

২২ ঐ, ৯ সর্গ, ১০১-০২ পংক্তি

২৩, ঐ, ৯ সর্গ, ৩১০-১১ পংক্তি

২৪, ঐ, ৯ সর্গ, ৩৩৮-৩৯ পংক্তি

২৫. ঐ ৯ সর্গ, ৪২৪-২৭ পংক্তি

শিল্পকর্মের দুই আশ্চর্য দিগন্ত : রামকিংকর ও গোপাল ঘোষ

অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী

১

ভারা বেঁধে কাজ হচ্ছিল, রামকিংকর টোকা মাথায় রিক্সা থেকে নামলেন, অসুস্থ ছিলেন। আসাম সরকারের জন্য গান্ধীজীর ভাস্কর্য—নন্দলালের ডাণ্ডী অভিযানের আদলে—পাদপীঠে ভাঙাচোরা দুর্গ প্রাসাদ ও নর করোটির আভাস—সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শক্তির অনিবার্য ধ্বংসের আভাস (যদিও রামকিংকর কখনো কখনো দাঙ্গার পটভূমিকায় নন্দলালেব ডাণ্ডী অভিযান এর আদলে তৈরী বলেছেন) নিয়ে তখন সমাপ্তির মুখে। তখন দুপুর। রামকিংকরের প্রায় সব মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য রাঢ়বঙ্গের গ্রীষ্মের দুঃসহ দুপুরে করা। তাঁর নিজের কথায় "আমি কাজ করেছি দিনেব বেলায় প্রখর রৌদ্রে। গ্রীষ্মকাল আমার বড় প্রিয়। যদিও বীরভূম গ্রীষ্ম দারুণ দুঃসহ তবুও এই সময়টা আমার প্রয়োজনে লাগত।" ঠা ঠা রোদ্দুরে পাখপাখালি পালানো গ্রীষ্মে খাঁ খাঁ, প্রায় জনশূন্য শান্তিনিকেতনে কখনো সিমেণ্ট মোরাম ছুঁড়ে মারছেন, কখনো ছেনী হাতুড়ি চালাচ্ছেন—প্রিয় শিষ্যদের সাক্ষাতেই প্রমাণ চারপাশের চেনাশোনা মানুষের সঙ্গে তার মিল নেই,—না জীবনচর্চায় না শিল্পকলায়। বাড়ীতে অর্থাৎ প্রায় ঘুপচি আঁধার ঘরে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা একই দৃশ্য দেখেছেন। আদুল গা বা ফতুয়া লুঙ্গি পরা রামকিংকর চেয়ারে বা তেলচিটে বিছানায় বসে—ছড়ানো ছিটানো এদিক সেদিকে কিছু ভাস্কর্য কিছু ছবি—বিড়ির বাণ্ডিল সস্তা সিগারেট। চৌকির তলায় কেউ দেখেছেন চিঠির বাণ্ডিল, খালি-বোতল বা ডালডার কৌটো। সম্পত্তি বলতে নিজের আঁকা ছবি। বিক্রী করতে চাইতেন না, তবে গুরু নন্দলাল যেমন অসংখ্য পোষ্টকার্ড স্কেচ,—চিঠি লিখেছেন বিলিয়েছেন—রামকিংকরও তেমনি। অনেকের কাছেই রামকিংকর আছে—যা চেয়ে আনা বা হাতিয়ে আনা। টাকা পয়সা রোজগার করেছেন কিন্তু উড়িয়ে দিয়েছেন। টাকার জন্য নিজের সৃষ্টি বিক্রী করতে চান নি।

অহিভূষণ মালিক লিখেছেন, 'I asked him if his works were for sale. He promptly replied "No" He is so fond of his works, he thinks them to be his son. How can one sell one's children.' কিন্তু তাঁর অনেক ছবিতে যেমন খেটে-খাওয়া দম্পতিযুগল অথবা জনমজুর মা যখন ফসল বুনছে বা ফসল তুলছে পাশে অনিবার্য কারণেই পড়ে আছে সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে অনাদৃত শিশু ঠিক তেমনি তাঁর আঁকা ছবি কী ভাস্কর্যও তেমনি অযত্নে পড়ে থেকেছে। K G Subramanyam তাই রামকিংকরকে ক্ষ্যাপা বাউল আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, "An artist crazy with his art, lost so much in his search as to forget both his person and his product, not concerned in the least whether it brought him name or fame or success" অধ্যক্ষ দিনকর কৌশিক অবশ্য এগুলি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাঁকুড়ার যুগীপাড়ার যে ছেলে পটোপাড়ায় মূর্তি গড়ত, থিয়েটারের সীন আঁকত বা তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের ছবি আঁকত আন্দোলনের খাতিরে—চোখে পড়ে গেল সে 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়ু'র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের, অবনীন্দ্রনাথ যাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে ঘরে। আজ বুঝতে পারি—আমাদের আর্ট ও আর্টিস্টদের কতখানি কল্যাণ তিনি করে দিয়ে চলে গেলেন।" এই শিল্পপ্রাণ জহুরীর চিঠি নিয়ে রামকিংকর এলেন শান্তিনিকেতনে। নন্দলাল ছবি দেখে বললেন 'তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?' একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা দু তিন বছর থাকো তো।" (মাষ্টারমশাই—রামকিংকর। নন্দলাল সংখ্যা দেশ, ১৯৬৬) কলাভবনে ছিল চিত্রকলা ভাস্কর্যের নানা গ্রন্থ, প্রিণ্ট। এছাড়া ১৯২১ থেকেই স্টেলা ক্রামরিশ পাশ্চাত্ত্য শিল্প-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতেন। রামকিংকর প্রসঙ্গে কিউবিজম্, সুররিয়ালিজম্, এক্সপ্রেসনিজম্ ইত্যাদি ধারার প্রভাব সম্পর্কে অনেকেই বলেন। ছবির প্রিণ্ট, এবং আলোচনায় রামকিংকর এগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া বা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন ঠিকই, ছবিতে পিকাসোর কিছু প্রভাব বা ভাস্কর্যে রদাঁর সামান্য প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকলেও কী অবনীন্দ্র নন্দলাল এর ওয়াশ বা নব্য ভারতীয় চিত্ররীতি তাকে যেমন গ্রাস করে নি, তেমনি পাশ্চাত্ত্য শিল্পধারাও

যেমন অনুকরণ করেন নি তেমনি বিশেষ প্রভাবও নেই। শ্রদ্ধেয় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় গগনেন্দ্রনাথের কিউবিজম্ এর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কিউবিজম্ এর তফাৎ আবিষ্কার করেছেন—রামকিংকর সম্পর্কেও এ সত্য প্রযোজ্য। আচার্য নন্দলালের কাছে শিল্পশিক্ষা ছাড়াও অস্ট্রিয়ার শিল্পী লিজভন্‌পট এবং বিশেষ করে মিসেস মিলওয়ার্ডের কাছে শিক্ষা প্রাথমিক ভিত গড়ে দিয়েছে তাঁর—নন্দলাল যাঁকে বলেছেন "তুমি তো সবই জানো।" কী ভাস্কর্যে কী আঁকা ছবিতে রামকিংকর নিজস্ব শৈলী অনবরত কাজের মধ্য দিয়ে চুঁড়ে চুঁড়ে বের করেছেন। তাঁর নিজের কথায় 'ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার সময় বার বারই যে কথাটা আমার মনে হতো, আমাকে স্বতন্ত্র হতে হবে। ভীষণভাবে স্বতন্ত্র, কোনো স্কুল অব আর্ট এর যোগ্য উত্তরসূরী বা অন্য কারোর মতো ছবি আঁকা—এসব করলে আমি নিজে শিল্পী হিসাবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত হ'তে পারবো না। এক্ষেত্রে আমাকে স্বার্থপর হতেই হ'বে। সেই সময় আমি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতাম, কোন্ আঙ্গিক বা মিডিয়াম, কোন্ বিষয়, কোন্ শৈলী এখনো ব্যবহৃত হয় নি।' মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যে রঁদা, এপস্টিন, মুর, ব্রাঁকুসি অবিস্মরণীয়। রামকিংকরের অধিকাংশ ভাস্কর্য মুক্তাঙ্গণ ভাস্কর্য—তিনি নিজেই বলেছেন "আমার প্রায় সমস্ত মূর্তিই খোলা আকাশের নিচে। ঘরের চৌহদ্দি থেকে আমি তাদের মুক্তি দিতে চেয়েছি।" রঁদার সঙ্গে নিজের এই মিল রামকিংকর নিজে খুঁজে পেয়েছেন যে রঁদার মতই তাঁর "প্রায় সব কটা মূর্তিই মুভিং। স্থবিরতায় আমার বিশ্বাস নেই।" রঁদাও তাই। বলতেন, 'মুভ মুভ। মুভমেণ্ট না হলে ক্যারেকটার জীবন্ত হয় না।' এ উক্তি যথার্থ। চলিষ্ণুতা এবং গতিময়তা তাঁর মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যের বড় বৈশিষ্ট্য—তাই এগুলি প্রাণবন্ত। গাছগাছালির মধ্য দিয়ে পায়েসের বাটি মাথায় 'সুজাতা' এগিয়ে চলেছে—ব্ল্যাক প্যাগোডা কি সঙ্গীত ভবনের আশেপাশে অথবা বিদ্যাভবন ছাত্রী আবাস এর আশেপাশে দাঁড়ালে,—নৈরঞ্জনা নদী তীরের 'সিদ্ধার্থে'র (তখনও তিনি বুদ্ধদেব হন নি) অভিমুখে—এ অভিজ্ঞতা জোছনা-ধোওয়া রাতে শান্তিনিকেতনে হয়।

বিদ্যাভবনের ছাত্রী আবাসের সামনে দাঁড়ালে তখন চোখে পড়বে মোষ-মাছ ভাস্কর্য। চোখে দেখা এক তাৎক্ষণিক মুহূর্ত ধরা আছে এই ভাস্কর্যে। "বাঁধ ছিল ভুবনডাঙায়। সব মোষ যেতে যেতে জলে পড়ে গেলো। আমি

দাঁড়িয়ে দেখলাম। লেজ দিয়ে গায়ে জল ছেটাচ্ছিলো। ওটা আমার মাছের মতো লাগলো।" এখানেও সেই চলিষ্ণুতা, গতি। ছাত্রী আবাসের পিছনে গান্ধীজী পথ মাড়িয়ে চলেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে—সাম্রাজ্যবাদীদের শাষক শোষকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে—মুহূর্তে চোখে ভাসে ডাণ্ডী অভিযানের সঙ্গীরাও যেন পিছনে ছুটছেন। কলাভবনের চৌহদ্দিতে আছে 'কলের পথে'—ভোরবেলায় কলের বাঁশি বাজছে, দেরী হ'বে—ছুটে চলেছে দুই সাঁওতাল যুবতী, পেছনে খেলতে খেলতে ছুটছে ছোট্ট একটা ছেলে। ভেজা কাপড় হাওয়ায় উড়ছে—শুকোচ্ছে, বাতাসে—কাঁচা রোদ্দুরে—পুরুষ্টু বাহু, বুক, উরুসন্ধি, জানু—আঁকা ছবির মেহনতি মানুষের সঙ্গে এর তফাৎ আছে—হাসি ঝলমল মুখ দুই যুবতীর। চোখে-দেখা সাঁওতাল যুবতীর প্রচণ্ড প্রাণশক্তির এবং গতির প্রকাশ এখানে। একটু দূরেই সাঁওতাল পরিবার (দুঃখের কথা, রামকিংকরের জীবদ্দশাতেই অনেকেই কলের পথে বা কলের বাঁশী এবং সাঁওতাল পরিবার গুলিয়ে ফেলছেন।) ফটোর নীচে পরিচয়ে এই ভুল যা এই মুহূর্তে মনে পড়েছে—১ সুজাতার মডেল বিখ্যাত শিল্পী জয়া আপ্পাস্বামীর অবনীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অ্যাণ্ড দি আর্ট অব হিজ টাইম—যে বই বেঙ্গল-স্কুল সম্বন্ধে জানতে হ'লে অপরিহার্য সেখানেও এই ভুল। ২ বিড়লা একাডেমীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা ১৯৭২ এর মার্চ এপ্রিল-এ রামকিংকরের ভাস্কর্য, তৈলচিত্র, জলরঙ ও ছাপাই ছবি এবং বেশ কিছু স্কেচের প্রদর্শনী করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ক্যাটালগে সাঁওতাল পরিবারের নীচে ছাপ আছে 'Way to market' (ক) আর কলের বাঁশী নীচে ছাপা 'Santhal family' ৩. প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়ুর পর বেঙ্গল স্কুল বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ছবি প্রচুর ছেপেছেন আনন্দবাজার-দেশ পত্রিকা। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু ৭ই মের 'আনন্দমেলা'য় কলের বাঁশির নীচে ছাপা হয়েছে 'সাঁওতাল দম্পতি' (ক) হাটের পথে এছাড়া শুভময় ঘোষের প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণে (দেশ বিনোদন ১৩৮২) ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে হারভেস্টার ভাস্কর্যের নামকরণ করা হয়েছে 'ছিন্নমস্তা'। একটি লিটল ম্যাগাজিন (স্বকাল) এ দেখলাম Head-less মানুষটি ধান ঝাড়ছে। ছবির প্রচুর প্রতিলিপি ছাড়া পাঠকের বুঝে উঠতে অসুবিধা হতে পারে ছবির নামে—যেমন বিড়লা একাডেমীর আলোচনা ও ছবি-সমৃদ্ধ ক্যাটালগে যা 'Autumn' দেশ বিনোদনে

তাই 'ক্লান্তি'। সাঁওতাল পুরুষের কাঁধে বাঁক—গোটা সংসার—জিনিষপত্র এবং ছোট ছেলে বাঁকে, সাথী যুবতী স্ত্রী—যার মাথায় বোঝা, এগিয়ে চলেছে প্রিয় কুকুরকে নিয়ে ধান কাটার মরসুমে কাজের ধান্ধায়। এখানেও গতি। এই প্রাণশক্তি ও গতিময়তার চূড়ান্ত প্রকাশ ১৯৩১ এরা কাস্ট স্টোন এর মিথুন।

কিছুদূরে এ্যাগ্রোর সামনে আছে ভিস্তিওয়ালা-চামড়ার থলি থেকে দেহ বেঁকে ঘুরে উবু হয়ে জল ঢালছে ভিস্তিওয়ালা। রামকিংকর নিজেই অবশ্য বলেছেন এটি "সুরেন আর আমি দুজনে মিলে করি।" জল রঙে আঁকা এক পা তুলে ছুটে-যাওয়া ঘোষ বা ঘোষের পিঠে বসা ঘরে-ফেরা মানুষ অথবা জলের মধ্যে সন্তরণশীল মাছের ছবিতেও এই গতি। দর্শন বিভাগে পুরোনো দোতলা বাড়ির চৌহদ্দিতে যে কম্পোজিশন আছে তাতে নারী দেহের নানা আদল। অতিথি নিবাসের বাতিদানে আছে পাখীর আদল। স্থির ভাস্কর (প্রতিকৃতি ভাস্কর্য বাদ দিয়ে) বলতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যক্ষ-যক্ষী—এর জন্য রামকিংকর প্রচুর খসড়া মূর্তি গড়েছিলেন।

রামকিংকর যখন কাজ শুরু করেন তখন ভাস্কর বলতে পুরুষানুক্রমে যারা পাথর কাজ করেন—উড়িষ্যা রাজস্থানের শিল্পীরা, দক্ষিণ ভারতের ধাতু, কাঠ, পাথর এর প্রথাগত শিল্পী এবং ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অ্যাকাডেমিক ভাস্কর দু-তিনজন। এখনও অধিকাংশ মানুষ দাঁড়ানো বা বসা কৃষ্ণনগরের 'ছাঁচের পুতুল'কে ভাস্কর্য মনে করেন। কলকাতার অধিকাংশ ভাস্কর্যই তাই—সেদেশে রামকিংকরের ভাস্কর্য নিয়ে ঝড় উঠবে, অথবা উদাসীনতা দেখা দেবে এ'ত স্বাভাবিক। রামকিংকরের রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছুদিন আগে ঝড় উঠল অথচ এটি অসাধারণ শিল্প-সৃষ্টি। যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ঝড় উঠত তাও বুঝতাম—যদিও অহিভূষণ মালিক এটি সম্পর্কে লিখেছেন, "The revolt against the cliches of academic art is complete, yet no one will mistake it for something other than a portrait of the poet."

প্রাচীন কাল থেকেই মাটি এবং নারী—যা ফসলের আধার—মানুষের বিস্ময় শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রীতি লাভ করেছে—জীবনের প্রয়োজনেই। এই 'ফার্টিলিটি কাল্ট' থেকেই ভারী উরু স্তন এর মাতৃকামূর্তি শত সহস্র পাওয়া গেছে—পৃথিবীর নানা জায়গায়। তাছাড়া ভারতবর্ষ সন্তান উৎপাদনকেও শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এর একটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ এবং একটি পঙ্‌ক্তির প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "সন্তান প্রজনন ক্রিয়াটিও শিল্পকর্ম. যে শিল্পকর্ম অন্যান্য শিল্পের মতই ছন্দোময় বলে আত্মসংস্কারের অন্যতম উপায়।" রামকিংকরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, "Is sex an intensive creative force?" রামকিংকরের সাফ জবাব, ' Sex is everything—without sex everything is barren" নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "মানুষের ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তির আবেগকে নিয়মে সংযমে শাসিত করে শক্তিতে রূপান্তরিত করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শিল্প সাহিত্যের চর্চা, যেহেতু এই নিয়ম সংযমের অনুশাসন ছাড়া অর্থবহ শক্তিগর্ভ শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি হতেই পারে না।" রামকিংকর তা পেরেছিলেন।

ভারতবর্ষ আদিম রিপুকে জীবন-এর অপরিহার্য অংশ মনে করেছে—খ্রীষ্টীয় 'আদিম পাপ'এর কোনো শুচিবাই তার ছিল না—ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্য যুগের স্থাপত্যে তাই এত মিথুন ভাস্কর্য। নরনারীর কামবদ্ধ ভাস্কর্যে দেহের শ্রী লাবণ্য যেমন ফুটেছে, তেমনি দেহগত মিলনের আনন্দ উল্লাস ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গ বেয়ে। ভারতবর্ষ দেহকে পাপ মনে করে নি, দেহকে মন্দির মনে করেছে, ঈশ্বরের আবাস অথবা আরাধ্য-আরাধ্যার সন্নিধানের সোপান মনে করেছে. তন্ত্রসাধক, বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থী, বাউল সম্প্রদায় সহ ভারতবর্ষের বহু উপাসক সম্প্রদায়। দেহ সম্বন্ধে ঘোমটা দেওয়া, ঘুণধরা, ভুকপুকে নীতিবোধ রামকিংকরকে স্পর্শ করে নি। সাক্ষাৎকারে রামকিংকরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "Do you think this middle-class morality and sexual inhibition have crippled our art?' রামকিংকরের জবাব, ' The great artists of the classical and mediaeval India could produce such great works because they did not suffer from all these moral hang-ups I believe in the freedom of an artist" (Hindusthan Standard : Diwali Annual 1972)

তাই রামকিংকর জীবনকে এঁকেছেন তার সমগ্রতায় ;—তাঁর কলের বাঁশিতে তাই যুবতী দেহের জলতরঙ্গ—উপচে-পড়া যৌবন, মিথুন মূর্তিতে জীবনের উল্লাস, ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট এ রাখা ব্রোঞ্জ-এর রমণী মূর্তি

পুরুস্টু বাহুমূল, স্তন যৌবন নিয়ে উপস্থিত—'হারভেস্টার' এই ভাস্কর্যও তার সেই জীবন যৌবনের জয়গান গাইছে—নগ্নিকা মূর্তি শিল্পের চূড়া স্পর্শ করেছে। যে নারী ফসল কাটছে বা ফসলের মাঠে কাজ করছে জলরঙ তেলরংয়ের ছবিতে তারও শক্তসমর্থ দেহ ফুটিয়ে তুলেছেন রামকিংকর—প্রাচীন উর্বরতা শক্তির উপাসক, যেন মাদার গডেসের উপাসক রামকিংকর। প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে রামকিংকরের দক্ষতার পরিচয় রয়েছে গাঙ্গুলী মশাই, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, এবং অন্ততঃ দুতিনটি রমণী প্রতিকৃতিতে। জয়া আপ্পাস্বামী সঙ্গত কারণেই লিখেছেন, "Ramkinkar is also a remarkable portrait sculptor. His portrait of a lady in bronze and the portrait head of Mr. Ganguli are masterpieces of draughtsmanship power and feeling."

রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল রামকিংকরকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। প্রভাস সেনের লেখায় দেখছি মাস্টার মশাই মাঝে মাঝে রামকিংকরকে কাজের ফাঁকে বিড়ি কি চা খেতে ডাকছেন—একথা ঠিক, বিশ্বভারতীর সেই টানাটানির যুগে অল্প সিমেণ্ট এবং সহজলভ্য বালি কাঁকরে রামকিংকরকে ভাস্কর্য কবতে হয়েছে—এগুলি ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে—রামকিংকর বেঁচে থাকতেই এগুলিব কোন কোনটিকে ব্রোঞ্জে ঢালাই করা যেতো। অগুন্তি ছাঁচের পুতুল বসছে যত্রতত্র। অথচ এ শতকের ভারতের সেরা ভাস্করের ভাস্কর্য ধ্বংসের মুখে।

রামকিংকরের আঁকা ছবি প্রসঙ্গে। চলচ্চিত্র পরিচালক প্রয়োজনে যেমন দ্রুত সঞ্চরণশীল স্ন্যাপশট্ ব্যবহার করেন তেমনি কয়েকটি ছবি খুব দ্রুত চোখের সামনে ভেসে উঠে সরে যায়—বুকের কাছে হাত কনুই ভাঁজ-করে-রাখা সেই মহিলার প্রতিকৃতি তৈলচিত্র—দুটি চোখে যার জীবনের সব কামনা তৃষ্ণা জড়ো হয়েছে, জলরংএ ভারী স্তন নিয়ে বসে আছে যে মা-কুকুর, জলরংএ ঝরনাতলার নির্জনে কলসী কাখে বালিকা, তৈলচিত্র গ্রীষ্মের দুপুর—যে দুপুরে ওরা কাজ করে, ১৯৪৮ এ জলরংএ আঁকা ছুটে-চলা অথবা খুটিতে-বাঁধা মোষ, শেওলা-সবুজ এর পটে কালচে সিঁদুরে লাল দুটি সর্বজয়া ফুল, মা ও শিশু (এচিং)—শিশু খাটিয়ায়, মা ঝুঁকে, শিশুর হাত মায়ের গলার মালার দিকে ভারী স্তন শিশুর ঠোটের দিকে এগোচ্ছে...এমনি কত ছবি।

একটানা ৫৫ বৎসর কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। সবচেয়ে আপন শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি বারবার এসেছে তাঁর আঁকা ছবিতে—"প্রত্যেক ঋতুরই নিজস্ব রং আছে, নিজস্ব আবেদন। এমন কি রাত দিন দুটোই আলাদা রূপ, ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। প্রতিটি ঋতুই সে অর্থে ইমপরট্যান্ট। আমার জল-রঙে আঁকা বিভিন্ন ল্যাণ্ডস্কেপে এসব ধরার চেষ্টা করেছি।" শুধু জলরঙে নয় পাশ্চাত্যের নানা শৈলী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন তৈলচিত্রে—সেখানেও বীরভূমের শরৎকাল, বসন্তকাল, কোপাই নদী, তালগাছ এঁকেছেন। বীরভূম ব্যতীত পুরী, রাজগীর, শিলং এবং নেপালের প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন—আঁকা-আকারে ছোট এই দৃশ্যচিত্রগুলি রামকিংকরের একান্ত নিজস্ব অঙ্কনরীতির সৃষ্টি—চেষ্টা করেও কারুর প্রভাব আবিষ্কার করা যাবে না। কখনও সেজান কখনও পিকাসোকে প্রিয় শিল্পী বলেছেন, "I like Cezanne very much" বা "পিকাসো আমার ফেভারিট", হয়ত একটি দুটি ছবিতে চকিতে সেজান (যেমন ললিতকলার রামকিংকর ২নং ছবি) বা পিকাসো উঁকি মারলেও প্রভাব খুঁজতে যাওয়া জীবনানন্দের বনলতা সেন এ এডগার অ্যালান পো-র 'To Helen' কবিতার প্রভাবের চাইতেও নিরর্থক হয়ে পড়ে। জয়া আপ্পাস্বামী ঠিকই মূল্যায়ন করেছেন, "Even the smallest drawings and etching shows an original vision and monumentality

২.

শিল্পী গোপাল ঘোষ কি ধাঁচের মানুষ ছিলেন তা জানতে বন্ধু বিনয় ঘোষের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিই যথেষ্ট,—বিনয় ঘোষ গোপাল ঘোষ এর সঙ্গে উড়িষ্যার কয়েকটি জেলার গ্রামগঞ্জ ব্যাপকভাবে ঘুরেছেন—"গোপাল ঘোষ শিল্পী কিন্তু তথাকথিত শিল্পীসুলভ ন্যাকামির কণামাত্র নেই তাঁর চরিত্রে। অত্যন্ত কর্মঠ, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব নিজে করতে পারেন এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করতে পারেন। পর্বতশৃঙ্গেই হোক, আর পাতালেই হোক পথচলায় তাঁর ক্লান্তি নেই। গরুর মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেছে দেখছি, ঘোড়াকে দেখেছি শ্রান্ত হয়ে ধুঁকতে, কিন্তু শিল্পীবন্ধু গোপাল ঘোষকে কখনও পথচলায় ক্লান্ত হতে দেখি নি।

তাঁকে একমাত্র ষ্ট্রীমলাইনড্ স্টীমইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ফ্লাস্কে একটু গরম চা আর থলে-ভর্তি সিগারেটের টিন থাকলেই হল—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত তিনি হেঁটেই মেরে দিতে পারেন, অবিচ্ছিন্ন ধারায় ধূমপান করে এবং মধ্যে মধ্যে গরম চা দিয়ে একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে।"

শিল্পী গোপাল ঘোষ পর্যটক গোপাল ঘোষও বটে। তাঁর নিজের কথায় "ঘুরেছি তো অনেক সারা জীবন—সমস্ত সময়টা ঘোরাতেই কাটত—সাইকেল নিয়েও ঘুরেছি বহুবার। সারা ভারত আমার দেখা।" জন্ম কলকাতায়, ছেলেবেলা কেটেছে হিমালয়ের কোলে সিমলায়। বাবা ছিলেন সামরিক বিভাগের ক্যাপটেন। ছেলের হাতে রঙ তুলি কাগজ তিনিই ধরিয়েছিলেন ছেলেবেলাতেই। "ছবি আঁকার ব্যাপারে আমার বাবাই ছিলেন প্রেরণা।" উত্তর প্রদেশের দুটি শহরেও কৈশোর ও প্রথমযৌবনের দিনগুলি কেটেছে—বেনারস আর এলাহাবাদে। বেনারসের গলি, পাণ্ডা তীর্থযাত্রী নদী ঘাট দারুণ ছাপ ফেলেছিল—প্রচুর এঁকেছেন প্রাচীন এই তীর্থক্ষেত্র নিয়ে। এলাহাবাদে অসহযোগ আন্দোলনে মেতেছিলেন বলে এবং চিত্রকলার প্রতি পুত্রের ঝোঁক দেখে জয়পুরের মহারাজার চারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন পিতা। জয়পুরে ছিলেন ১৯৩১-৩৫। জয়পুর সমেত রাজস্থানও তাঁর খুব প্রিয়। জয়পুর থেকে সোজা সুদূর দক্ষিণে মাদ্রাজে—বলা বাহুল্য, ভারতের সব কয়টি কলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তখন গুরু অবনীন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ—বেঙ্গল স্কুলের দিকপালরা। মাদ্রাজে তখন অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ। সামরিক বিভাগের ক্যাপটেনের পুত্র সম্ভবতঃ পিতার কাছ থেকেই কিছু গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন—যার একটি নিয়মানুবর্তিতা। এরকম বলা হয় যে রোজ অন্ততঃ একটি ছবি গোপাল ঘোষ আঁকতেনই—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-আহ্নিক কি গোয়ালার গোসেবার মত তা ছিল প্রাত্যহিক। শুধু শিল্পের প্রতি ভালবাসা থেকেই নয়—এই ইয়োরোপীয় সুলভ নিয়মানুবর্তিতা এবং অধ্যবসায় তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমন কি রোগশয্যাতেও। শ্রীপ্রভাত গুহর সৌজন্যে হাসপাতালে-আঁকা গোপাল ঘোষ এর একটা স্কেচ-বই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। গোপাল ঘোষ নিজেই লিখেছেন—"'Tropical Hospital P. P. Ward Bed no 5 এসব ছবি এঁকেছি। ৮।১০।৫৩ তারিখ থেকে (বিকাল) আঁকা চলছে: এবার আর রেখায় sketch করি

না, রং এ প্রাণভরে ছবি আঁকি আর বই পড়ি।" · গোপাল ঘোষ ৯।১০।৫৬ সময় ৬টা কলিকাতা পাশে লিখেছেন "তিন বৎসর আগেও Same hospital ও একই ward এ Bed No 4 এ প্রায় মাসখানেক ছিলাম। তখন কয়েকশত রেখায় নানান ছবি আঁকি।"

এই স্কেচ বই এ ৯।১০ এ আঁকা ১০টি ছবি, ১১ তারিখে ৪টি, ১৪ তারিখে আঁকা ১১টি মোট ২৫টি ছবি আছে। নীল রং এর ছড়াছড়ি এ স্কেচ বইয়ে,—নীল আকাশ, নীল পাহাড়, নীল সবুজের অরণ্য। এছাড়া লাল, গোলাপী, বেগুনী, হলুদ আর সবুজের ব্যবহার আছে। কয়েকটি ছবির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে এ স্কেচ বইয়ের—১. নীল আকাশ, নীল সবুজের জমাট অরণ্যে কমলালেবু রঙ। পর্বতচুড়া। খুব ভোরে পর্বতচুড়ায় এমনই সূর্য ঝরে। ২. বিস্কুট-রঙা কাগজে সাদার পটভূমিতে সবুজ পত্রশূন্য বৃক্ষকাণ্ড, পাখী। ৩ নীল, ইটরঙা নদী নৌকা মাঝি আকাশ, নদীর দুপারেই পাহাড—পাহাড়ে বেগুনে, নীল রং এর ছোঁয়া। চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জিন্দাবাহার শহর ঢাকা ছেড়ে ছবি আঁকার জন্যই মাদ্রাজে পাড়ি জমিয়েছিলেন ক্যালকাটা গ্রুপের পরিতোষ সেন—যাঁর অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি, "আমার প্রথম চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেবীপ্রসাদের কাছে নয়, গোপালের কাছে। প্রত্যহ ভোরে সে আমাকে টেনে নিয়ে যেত মাদ্রাজ শহরের পথে ঘাটের নানা দৃশ্য আঁকতে। ইতিপূর্বে এবিষয়ে আমার কোনো তালিমই ছিল না। তাঁর কাছেই আমি প্রথম ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকা শিখলাম।" শিল্পী পরিতোষ সেন যখন বলেন, "ছবি আঁকায এবং লেখা পড়ায় তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তিতা আমার কাছে আজও একটি আদর্শ হয়ে আছে"—তখনই ক্যালকাটা গ্রুপের আর এক বিখ্যাত শিল্পী রথীন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মেজাজের তফাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—অনেকদিন যাবৎ বছরে দু-একটিব বেশী ছবি রথীন্দ্র মৈত্র আঁকেন নি। সিমলা, বেনারসে, এলাহাবাদ, জয়পুর, মাদ্রাজের পর কলকাতায় থিতু হ'ন। অবশ্য একেবারে থিতু হবার লোক তিনি নন—"ঘুরেছি তো অনেক সারা জীবন"—সাইকেলে ভারত ভ্রমণে বের হ'ন—রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে জানিয়েছিলেন "শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তুমি ভারত ভ্রমণে বের হয়েছ। শিল্পীর চিত্রে তার উদ্দেশ্য সার্থক হোক, এই কামনা করি", বঙ্গশ্রী পত্রিকায় গোপাল ঘোষ নিজের আঁকা ছবি সমেত

এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। বঙ্গশ্রী পত্রিকায় তিনি ইলাসট্রেশনের কাজও করেছেন। কয়েক বছর পর গিয়েছিলেন বিষ্ণু দে-র সঙ্গে দুম্‌কা। সেখানে আলাপ হয় উইলিয়ম আর্চার এর সঙ্গে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ের এলুইন এবং আর্চার সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। পাহাড়ী চিত্রকলা, লোকচিত্রকলা ছাড়া আর্চার সাহেবের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল সাঁওতাল জীবনযাত্রা এবং সাঁওতালীদের সঙ্গীত নৃত্যের প্রতি। আর্চার সাহেবই গোপাল ঘোষকে সাঁওতাল পরগণার গ্রামে গ্রামে নিয়ে যান। তাঁর নিজের কথায় "ওদের ঘরবাড়ি, গৃহস্থলী নিকানো, মুরগী কাটা, মুরগীর লড়াই, দেওয়ালে ছবি আঁকা এই সব দেখে দেখে দিন কাটত। বেশ অনেকদিন ছিলাম দুম্‌কায়।" গোপাল ঘোষ বলেছেন, "দুমকার ল্যাণ্ডস্কেপ আমাকে টেনেছিল খুব।" আর এই দুমকা সিরিজের ছবি সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলেই একমত—এগুলি তুলনারহিত। অবশ্য কোন্ জায়গা যে সবচেয়ে বেশী ছাপ ফেলেছে তা বোধ হয় গোপাল ঘোষও জানতেন না—যেখানেই পর্যটক গোপাল ঘোষ সেখানেই শিল্পী গোপাল ঘোষের ছবি-আঁকার সরঞ্জামের বোঝা, যেখানেই ঘুরেছেন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছেন প্রচুর—বদ্ধ ঘরে বসে আঁকা নয়, রোদ ঝলমলে ভারতবর্ষ, রঙ আর মহাদেশের বৈচিত্র্য নিয়ে যে দেশ দ্বিতীয়রহিত,—যার কোথাও পাহাড়ের চূড়ায় রূপালী বরফ কোথাও ধূধূ আদিগন্ত বিস্তৃত সোনালী বালু, কোথাও তা থৈ থৈ সমুদ্র কোথাও বা জলশূন্য উষর লাল কাঁকুরে মাটি, এই দেখা যায় খালবিল, সবুজে সবুজ ঝোপঝাড় অরণ্য ঐ আবার ছড়ানো ছিটানো কিছু খেজুর, কী এক পায়ে দাঁড়ানো তালগাছ। কী রঙের বাহার সমস্ত দেশে ভূপ্রকৃতিতে, তার মানুষজনের পোষাকে পাগড়িতে। তাই পর্যটক শিল্পী গোপাল ঘোষের ছবিতে এত রঙের বাহার। যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অঙ্কনে গোপাল ঘোষের জুড়ি নেই সেই গোপাল ঘোষ যেমন কালিতুলিতে অসংখ্য ড্রয়িং করেছেন তেমনি জলরঙ, প্যাস্টেলে নানারঙে এই প্রকৃতিকে ধরেছেন। চোখে দেখা ভারতবর্ষের রঙের বাহার, রঙের প্রতি ঝোঁক এনে দিয়েছিল—মনে রাখতে হ'বে গোপাল ঘোষ শুধু ফুল ভালবাসতেন বলেই ফুলের ছবি আঁকেন নি, ফুল পাখীর অসংখ্য ছবি আঁকার পেছনে আর একটি কারণও ছিল, ফুল পাখীর ছবিতে নানারঙ ব্যবহারের সুযোগ আছে।

কোন্ জায়গা তাকে বেশী টেনেছিল? "বেনারেস, রাজস্থান, ঢাকা, হিমালয়ের যেকোন জায়গা, দুমকা সবই আমাকে টানে মাঝে মাঝে মনে হয় রাজস্থান বোধহয় সবচেয়ে বেশি। তবে বেনারেস নিয়েও তো এঁকেছি অনেক।' টেনেছে ভূপ্রকৃতি, টেনেছে রঙ আর পরিশ্রমী গোপাল ঘোষ সেই রঙ ছড়িয়েছেন কাগজে, ক্যানভাসে।

চীনদেশে কনফুশিয়াস, লাওৎসে এবং জাপানে শিণ্টো ধর্মমত এর প্রভাবে প্রকৃতির অনুধ্যান যেমন, ব্যক্তিজীবনে তেমনি চিত্রকলায় প্রভাব ফেলেছিল। সুঙ এবং মিঙ রাজবংশের রাজত্বকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রাঙ্কণে চীনা শিল্পীদের দক্ষতা চূড়ান্তে পৌঁছোয়। জাপান ও ল্যাণ্ডস্কেপ-এ অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। কামাকুরা ও আসিকাগা যুগে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কণে চূড়ান্ত স্ফূর্তি দেখি। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে চিত্রকলার অসামান্য দক্ষতা দেখালেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিত্রকলায় প্রকৃতি এসেছে প্রধানত পশ্চাদপট হিসেবেই। প্রতিবাদে, চকিতে অজন্তা ও সিওনবাসল, কী জাহাঙ্গীরের আমলের ফুল লতা পশু-পাখী, এবং রাজপুত কাংড়া চিত্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভেসে উঠতে পারে, কিন্তু থিতু হতেই হয় অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের শিলাইদহ দার্জিলিং পুরী রাঁচীর দৃশ্য-চিত্রে এসে। অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলালের অসংখ্য স্কেচের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে এবং যদিও বিষ্ণু দে মহাশয় যামিনী রায় এর ল্যাণ্ডস্কেপের প্রসঙ্গে লিখেছেন "আমি অন্তত কিছুতে ভুলতে পারি না। সংখ্যায় শতাধিক সেইসব বহির্দৃশ্য চিত্র" যার "বৈচিত্র্য ও অসামান্য দক্ষতায় অবাক হতে হয়", তবু দ্বিজেন্দ্র মৈত্রর এ উক্তিকে আমরা গুরুত্ব দি, "Gopal Ghose is the first successful interpreter of nature in the field of visual art Such an example of originality free from any semblance of imitation is, really, rare in modern Indian Art." এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও নিজের ঢাক নিজে পেটানোর যুগে শিল্পী পরিতোষ সেনকে আমরা শ্রদ্ধা না করে পারি না, কারণ তিনি সোচ্চারে বলেছেন, "গোপাল ঘোষ প্রাকৃতিক দৃশ্যে আনলেন এক নতুন ডাইমেনশন—যেটা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।…গোপাল ঘোষ সর্বপ্রথম এক ধরণের নিসর্গ চিত্র আঁকলেন যার ট্রিটমেণ্ট সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এবং বর্ণে

উজ্জ্বল। আলোছায়ার খেলা না দেখিয়ে পুরোপুরি টু-ডাইমেনশনাল ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।"

গোপাল ঘোষ এর সঙ্গে বেঙ্গল স্কুল এবং ক্যালকাটা গ্রুপ এর নিকট সম্পর্ক ছিল, কিন্তু বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক রীতির দিক থেকে কেউই তাঁর নিকট আত্মীয় নয়। 'বনলতা সেন' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবির মতই তাঁর ছবির ভাষাও তাঁর নিজস্ব। সে কলম অবশ্যই কাংড়া রাজপুত কলম নয়, বেঙ্গল স্কুলের অবনীন্দ্র, নন্দলাল-এর প্রেরণা এবং মাদ্রাজের অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদের শিক্ষা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথের মতো ওয়াশ ছবি আঁকার চেষ্টা সত্ত্বেও বেঙ্গল স্কুলের কলম নয়, যেমন জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবি আঁকলেও তা যেমন গোপাল ঘোষের নিজস্ব কলমের ছবি নয়, স্বক্ষেত্র নয়, তেমনি রথীন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, নীরদ মজুমদার, প্রদোষ দাশগুপ্ত, পরিতোষ সেন, শুভো ঠাকুর এর ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্য হয়েও (১৯৪৮-এ গ্রুপ ছাড়েন) তিনি মেজাজ (mood) বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং আঙ্গিক রীতিতে যেন ক্যালকাটা গ্রুপের কেউ নন—আমরা বলতে চাইছি অহিভূষণ মালিক যাঁকে সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার স্তম্ভ বলেছেন তিনি বেঙ্গল স্কুল বা ক্যালকাটা গ্রুপের সৃষ্টি নন। নিজেও লিখেছেন, "স্বাধীনতা পত্রিকা থেকে দুর্ভিক্ষের ঐ স্কেচ নিয়ে যেত আমার কাছ থেকে। অনেকে সেইজন্য আমাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়েছে। আমি বলতুম আমি সব 'ইষ্ট'—আসলে ইনডিভিজুয়ালিস্ট।"

পত্রিকার ইলাসট্রেশন এর কাজ কিছু করলেও গোপাল ঘোষ চিত্রকলায় শিক্ষকতা করেছেন ১৯৪০ থেকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট, স্কটিশ চার্চ কলেজের শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, শিবপুর বি ই. কলেজ এবং সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে। আঙ্গিক রীতি এবং মাধ্যম এরও পরিবর্তন হয়েছে বার বার। যখন যে মাধ্যম গ্রহণ করেছেন যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে—যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগার ঘটেছে—সেই মাধ্যমে অজস্র অথচ শিল্পমূল্যে অবিনশ্বর ছবি বেরিয়েছে। সে প্যাস্টেলই হোক, টেম্পারা কি জলরঙেরই হোক। তেল রঙেও এঁকেছেন। একই ছবি জলরঙও প্যাস্টেলে এঁকেছেন। সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য, বনস্পতি, ফুল, পাতা, পাখি, পশু অজস্র এঁকেছেন—বলতে বাধ্য হচ্ছি, শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় একসময়ে নিজের আঁকা ছবির কপি,

একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নিজেই করেছেন, গোপাল ঘোষ এর কোন ছবিতেই অন্য ছবির গোপাল ঘোষ উঁকি মারে নি।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ড্রইং দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সম্ভবত জলরঙ ও প্যাস্টেল যাদুকরের তা ছিল পেন্সিল ড্রইং। অহিভূষণ মালিক যথার্থই লিখেছেন 'প্যাস্টেল দিয়ে অমন পেইন্টিং করতে একমাত্র গোপাল ঘোষই পারতেন।' ভারতীয় চিত্রকলায় নিসর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন মর্যাদা দান এবং অঙ্কণ রীতি ও মাধ্যম মিশ্রণ, মাধ্যম ব্যবহারে স্বতন্ত্রতায়, একান্ত নিজস্ব কলমের মৌলিকত্বে গোপাল ঘোষ অবিস্মরণীয় শিল্পী।

['উত্তরসূরি' পত্রিকার জন্য রামকিংকর এবং গোপাল ঘোষ তাঁদের একাধিক শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছেন—যা গত দীর্ঘ বছরে ছাপা হয়েছে, জানিয়েছেন সম্পাদক শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য। এমন কি অরুণ ভট্টাচার্যের 'মিলিত সংসার' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদও শিল্পী রামকিংকরের। উত্তরসূরীতে প্রকাশিত এই দুই শিল্পীর এবং আরো আরো শিল্পীর ছবি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র চিত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারে। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ভেবে দেখতে পারেন। • লেখক]

পোলিশ কবি জেসলো মিলোস

১৯৮০ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন নির্বাসিত পোলিশ কবি জেসলো মিলোস। ইতিপূর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার বোরিস পাস্তেরনাক ও আলেকজান্দার সোলঝেনিৎসিন এই পুরস্কার অর্জন করেন। কিন্তু তিনজনই রাষ্ট্র কর্তৃক নানাভাবে বিড়ম্বিত। অথচ প্রত্যেকেই স্বদেশকাতরতায় বিষণ্ণ। ১৯১১ সালে জেসলো মিলোস লিথুয়ানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপের মানচিত্রে তখন পোলাণ্ড বা লিথুয়ানিয়ার কোন সীমারেখা চিহ্নিত ছিল না। তাঁব শিক্ষাব জীবন সুরু হয় উইলনো এবং প্যারিসে। স্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁর মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটে। যাকে বলা হয় 'ডাবল পারস্‌পেক্‌টিভ'। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সমভাবে বিচার করার প্রবণতা তখন থেকেই সুরু হয়।

উইলনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মিলোস কিছুদিনের জন্য স্থানীয় বেতারে যোগদান কবেন। সেই সময় তৎকালীন প্রশাসনেব পরিচালনায় দুর্নীতি তাকে গভীরভাবে পীড়িত করে। এবং বাধ্য হয়েই তিনি উইলনো ছেড়ে সংস্কৃতির পীঠস্থান ওয়ারশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

যুদ্ধকালীন পোলিশ গুপ্তসংস্থার একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি একটি কাব্য সংকলনেব গুরু দায়িত্ব বহন করেন আন্‌কন্‌কার্ড সঙ' (১৯৭২)। সেই সময় বহু ইংরেজী কবিতা অনুবাদে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এমন কি টি এস এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্য গ্রন্থকেও তিনি পোলিশ ভাষায় রূপান্তরিত করেন। ১৯৪৫ সালে মিলোস পোলাণ্ডের একজন কূটনীতিবিদ হিসেবে আমেরিকায় কার্যভাব গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কম্যুনিস্ট নীতির স্বরূপ তাঁর সম্মুখে উদঘাটিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসে অবস্থানকালে পোলিশ সরকারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সেদিন একজন পোলিশ কবির পক্ষে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু চরম সংকট মুহূর্তে নিজেব মানবিক বৃত্তিই জয়ী হয়েছিলো। তখন তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল তিনি পোলিশ কবি। আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে তিনি এখন কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাভিক ভাষার অধ্যাপক।

মিলোসের সাহিত্য জীবন সুরু হয় ত্রিশের দশকের প্রথম পর্বে। পোলিশ সাহিত্যে তখন বিভিন্নভাবে রোমান্টিসিজম্‌, সিম্বলিজম্‌, পারনাসিজম্‌ ও সমসাময়িক ইমেজিজম্‌ ও ফিউচারিজমের প্রভাব। আধুনিকতার তরঙ্গ তরুণ কবিদের একই সঙ্গে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে। তৎকালীন একটি প্রতিষ্ঠিত কবিগোষ্ঠী 'স্কামান্দার' এর উল্লেখযোগ্য অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইতিপূর্বে কুড়ি দশকে পোলাণ্ডে ঝঞ্ঝার মতোই কাব্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। অথচ ত্রিশের দশকে সেই ঐতিহ্যপূর্ণ 'স্কামান্দার' তরুণদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হলো না। এর অন্যতম দুর্বলতা ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সতর্কতার অভাবে। তখনও পোলিশ কাব্যে চারণ কবিদের জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে পড়ে নি। এই পর্যায়ে আধুনিক কাব্যে ব্যক্তিগত সমস্যা গৌণ হয়ে পড়েছে। সেই স্থান অধিকার করেছে সংগ্রামের সুর।

ত্রিশের দশকের পোলিশ সাহিত্যে রাশিয়ায় প্রবর্তিত সিম্বলিজমের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সেই সময় পোলাণ্ডের সর্বত্র সামাজিক ও বৈপ্লবিক প্রতিবাদ এক সর্বনাশা ভূমিকা গ্রহণ করে, যাকে বলা হতো 'ক্যাটাস্ট্রফি'। মিলোস সেই পরিস্থিতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এবং তিনি 'ক্যাটাস্ট্রফিজম্‌' এর একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তখন তাঁর বহু কবিতায় কখনো প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠতো আবার কখনো গভীর হতাশার সুর প্রতিধ্বনিত হতো।

এম জুকোনস্কি, এল সেনওয়াল্ড, জে জাগোবস্কি এবং জেসলো মিলোস এর মতো শক্তিশালী তরুণ কবিগোষ্ঠী অ্যান্টি-ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্বের মধ্যে অনুক্ষণ মগ্ন থাকেন। তখন পোলাণ্ডে আভাঁন্ত গার্দে আন্দোলন সুরু হয়েছে। অতি বিলম্বে এই তরুণ কবিগোষ্ঠী নব্য রীতির তরঙ্গে যোগদান করেন, যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রমে সেই কবিদের সম্মুখে রূঢ় বাস্তব ও চিরায়ত কালের উপলব্ধি উভয় সংকটের অবতারণা করে।

মিলোসের কাব্য আলোচনার পূর্বে তাঁর সার্থক গদ্যরচনার উল্লেখ এখনো একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। বোরিস পাস্তেরনাকের ড. জিভাগোর মতই পশ্চিম ইউরোপে অবস্থানকালে মিলোস রচনা করেন 'দি ক্যাপটিভ মাইণ্ড'। এই গ্রন্থই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত করে।

একজন সৃজনশীল লেখকের দায়িত্ব নির্যাতিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবলম্বন করেই মিলোসের গবেষণা গ্রন্থ : "দি ক্যাপটিভ মাইণ্ড"। এই রচনা প্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় ধ্রুপদী সাহিত্যের সমমর্যাদার জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখানে মিলোসেব সহজাত 'ডাবল পারস্পেক্টিভ' মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যতম চরিত্র বেটা প্রতিশ্রুতিমান লেখকের জীবিকা ছেড়ে সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। কারণ যে কোন ঘটনার বহিরঙ্গে একজন সাংবাদিক অতি সহজেই হস্তক্ষেপ করতে পারে। অথচ সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোন চরিত্রের অন্তর্জগৎ বা পরিস্থিতির নৈতিক মান নির্ধারণের কোন দায়িত্ব সাংবাদিককে বহন করতে হয় না। তা বলে সাংবাদিক হিসেবে নৈতিক দিক থেকে আপোস মনোভাব নিয়েও সে বাঁচতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ মিলোস লিখেছেন ব্যক্তিগতভাবে আমি আত্মবাদী কোন শিল্প-চর্চা পছন্দ করি না। আমার কাব্যই আমাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত করে রাখে, যার ফলে যেকোন সীমারেখা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি, বিশেষতঃ রীতির ক্ষেত্রে যে ধরণের অসাধুতা অবলম্বিত হয়। অবশ্য কোন কোন পর্যায়ে শিল্পী বা কবির অবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতারণাও পরীক্ষিত হয়। আমি সযত্নে সেই সীমা অতিক্রম করি না। যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোর চরম অভিজ্ঞতা আমাকে যেভাবে চিন্তিত করে তুলেছে তা হলো ব্যক্তিগত হতাশা বা পরাজয়কে, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়" (ক্যাপটিভ মাইণ্ড পৃ ২০৬)।

'ক্যাপটিভ মাইণ্ড' এর সর্বত্র এক নাস্তিবোধ। মন বাধ্যবাধকতায় শৃঙ্খলিত। গোঁড়ামীর প্রান্তে প্রসারিত দীর্ঘপথে একসময় অনুসন্ধান পর্ব সূচিত হয়। মিলোস মূল বিষয়ের বা বক্তব্যের প্রয়োজনে চারজন লেখকের জীবনীর সারাংশকে ব্যবহার করেছেন। চারজনই কমবেশী স্তালিন যুগের কম্যুনিস্ট পোলিশ সরকারের মুখপাত্র। আলফা একজন নীতিবাদী লেখক, বেটা হতাশ প্রেমিক, গামা ইতিহাসের ক্রীতদাস সদৃশ অনুগামী, ডেল্টা যেন মধ্যযুগের ফ্রান্সের প্রভেন্স প্রদেশের প্রেমমূলক একজন গীতি কবি। কিন্তু এঁদের কেউই ব্যক্তিগত জীবন বা সমষ্টিগত জনজীবনের কোন সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়। পরিবর্তে তারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিস্বার্থের বৃত্তে আবর্তিত হতে থাকে। আলফা শিষ্ট আচরণে শিক্ষিত একজন নীতিভ্রষ্ট লেখক হিসেবে পার্টির নীতির রূপায়ণে

প্রয়াসী হয়ে ওঠে। ব্যর্থ প্রেমিক বেটাকে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিতে হয়। গামা সেণ্ট্রাল কমিটির নির্বাচিত সদস্য এবং লেখক গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধায়কও বটে। তাছাড়াও অতিরিক্ত পরিচয় তিনি 'বিবেকের রক্ষক'। ডেল্টার কিছুই হলো না, বরং সে দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন হবু কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এখানে মিলোস সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করে সত্য প্রকাশে মগ্ন হয়েছেন। তখন তাঁর কাছে অখণ্ড সমাজের স্বার্থরক্ষা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

পরবর্তী রচনা 'নেটিভ রিল্‌ম'। আত্মজীবনী মূলক হলেও সর্বত্র বিশ্বজনীন উপলব্ধি বিস্তৃত। মিলোস ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের মায়াময় বিচিত্র রূপকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'ডাবল পারস্‌পেক্‌টিভ' প্রয়োগের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, একান্ত অন্তরঙ্গ বা গোপন জীবনচর্যা ও জনজীবনের গতিপ্রকৃতির পর্যবেক্ষণ যথাযথ হয়ে উঠেছে। আশ্চর্যভাবে লক্ষণীয়, মিলোস 'কাব্য' বা 'শিল্প' এবং 'রাজনীতি'কে একসময় বিনিময় হিসেবেও ব্যবহার করেন।

প্রসঙ্গত: মিলোসের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য

The vision of a small patch on the globe (Lithuania) to which I owe every thing suggests where I should draw the line A three year old's love for his aunt or jealousy to ards his father take up so much room in autobiographical writings because everything else, for instance the history of a country or a national group is tieated as something 'normal' and therefore, of little interest to the narrator But another method is possible. Instead of thrusting the individual into the foreground one can focuss attention on the background, looking upon oneself as a sociological phenomenon Inner experience, as it is preserved in the memory will then be evaluated in the perspective of the changes one's milieu has undergone. The passing over of certain period, important for oneself, but

requiring too personal an explanation, will be a token of respect for those underground that exist in all of us and that are better left in peace (pp 5-6)

এই গ্রন্থে ব্যক্তির ধারণা ও জনসাধারণের চিন্তাধারার মধ্যে মৌল পার্থক্য ক্রমে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় মানুষের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অথচ সে ব্যক্তিসত্তাকে সেখানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে পারে না। বরং মহাকালের মধ্যেই তাকে অবস্থান করতে হয়। মিলোসের ধারণায় জীবনের পরম উপলব্ধি হলো অস্তিত্ব ও গতির অনুষঙ্গে অনুক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন। এই পর্যায়ে রূঢ় বাস্তবের কোন অবস্থার মধ্যেই নিজেকে সমর্পণ করা চলে না।

বস্তুতঃ 'দি ক্যাপটিভ মাইণ্ড' ও 'নেটিভ রিলম্' মিলোসের অধিকাংশ রচনায় বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও সুরকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। এখানে অতীত এবং বর্তমান, ব্যক্তি এবং দল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির তুলনা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর স্বচ্ছ করে তুলেছে।

মিলোস ঔপন্যাসিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। 'দি ইউজ্যারপার্স' যুদ্ধোত্তর পোলাণ্ডের ঐতিহাসিক ঘটনার নাটকীয় বিবরণ। অধ্যাপক গিল বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং থুকিদিদিসের প্রখ্যাত অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। রাষ্ট্র তাঁর রচনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং গ্রীক সংস্কৃতির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে অধ্যাপক গিলের নাম ঘোষিত হয়। তিনি সেই ঐতিহ্য সংরক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং সুযোগবশতঃ থুকিদিদিসের রচনার অংশবিশেষ নিজের উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করতে থাকেন। মহাকাল অবিরাম এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। সেই ধারাবাহিকতায় একদিন পোলাণ্ড থেকে সব জর্মন অধিবাসীর বিতাড়া সম্পূর্ণ হয় এবং সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয় রাশিয়ানদের সদর্প আগমনে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। অধ্যাপক গিল তখনো অনুবাদ করে চলেন "এথেনিয়ানগণ তাদের প্রধান গন্তব্যস্থল সিসিলি অভিমুখে সমুদ্র যাত্রা করে। সেই সঙ্গে তারা বহন করে নিয়ে চলে যুদ্ধ এবং মিত্রশক্তি।"

মিলোস যুদ্ধকালীন পোলাণ্ডের গোপন প্রতিরোধ সংস্থায় একদা সক্রিয়

ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ওয়ারশ'র উত্থান, রাশিয়ানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পরিণতিতে পোসাওবাসীর মোহমুক্তি। উপন্যাসে এই পটভূমিকা কালেব তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। মূলতঃ 'ইউজ্যারপার্স' এক জটিল উপন্যাস। যুদ্ধের ভযাবহ বাস্তবতা, অবিরাম স্থান পরিবর্ত্তন, রাষ্ট্র বা দেশ দখল করাব প্রবণতা বুদ্ধিজীবীদের পর্যাযভুক্ত সব চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, অধ্যাপক গিলকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন দৃঢ় প্রত্যয়শীল মার্ক্সবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক, এবং বিশ্বের নানা সমস্যায় উদ্বিগ্ন বুদ্ধিজীবী। থুকিদিদিসের মন্তব্য এখানে খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ: "নিজের অপরাধের বিচারের জন্য এই পৃথিবীতে কেউই জীবিত থাকবে না।" মিলোস এই সময়কে মানুষের জীবনে ভীতি ও ত্রিশঙ্কুর অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর যুগের সর্বকনিষ্ঠ কবি হিসেবে মিলোস বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোযেমস অব্ দি কনসিল্ড টাইম' (১৯৩৩) পোলিশ কাব্য সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সমসাময়িক অগ্রজ কবিদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যর্থতা এই কাব্যগ্রন্থে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তখন মিলোসকে প্রচলিত ধারণার সীমারেখা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। এবং একজন রাগী তরুণের প্রতিমূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালে তিনি বিদ্রোহী সম্মানে ভূষিত হন।

ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক ও নৈতিক সংকটের মুখে কবি কাব্য বা শিল্পের প্রতি যথার্থ দায়িত্ব পালনে অতিমাত্রায় সচেতন। মিলোসের কাব্যে অলঙ্কারের শোভাবর্ধক প্রয়োগ মহৎ কবিতার প্রতিশ্রুতিকে বহন করে। যেমন 'আওয়ার কান্ট্রি'

Long trumpets high above the horizon
Rise slowly towards the lips.
Forests anchored in the skilled sky
Roads entangled as arms of an octopus
Wagging, nestled in hands
Trumpets blow upwards
Quiet, masculine, hard

We are greeted by them mourningly and simply
We fall in the sands of the roads, we rip
the grass , it hurts.
The melody resounds in the woods. It
burns like vitriolic acid

উইলনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে মিলোস তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রকাশক ছিলেন স্থানীয় এক ছাত্রসংস্থা 'সার্কল অব্ পোলিশ স্টাডিজ্'। সেই সময় পোলাণ্ডের কোন ব্যবসায়ী প্রকাশকই আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক যে কোন বিদ্রোহী কবির রচনা প্রকাশে অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে সাহসী হন নি। পাশাপাশি সাহিত্যপত্র 'লিটারেরী নিউজ্' শুধুমাত্র সাহিত্য সমবায়ের সভ্য ও অনুগামীদের নানাভাবে উৎসাহ দান করতো।

সমসাময়িক বহু লেখকদের তুলনায় মিলোস পোলিশ কাব্যজগতে এক দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কর্মজীবনের সূত্রে তিনি বিদেশের বহু লেখকের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে তিনি লিথুনিয়ান পরিবারের অস্কার মিলোসের ফরাসী কাব্যের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তখন নতুন নতুন সাহিত্য-ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। প্রচলিত গোঁড়ামী বা রক্ষণশীল ধারণা পরিহারে তিনি প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। কাব্যের বা নন্দনতত্ত্বের মৌল সমস্যা তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দিক থেকে উইলনো গোষ্ঠীর জাগারির সঙ্গে মিলোসের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু একদা সামাজিক দায়িত্বে তিনি অধিকতর মগ্ন ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'অ্যানথলজি অব স্যোসাল পোয়েট্স' (১৯৩৩) এই কাব্যসংকলন বামপন্থার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। মিলোসের 'ইন অনর অব্ মানি' ও 'এ স্টোরি' নির্বাচিত কবিতার অন্যতম। এখানে মূলতঃ সামাজিক প্রতিমার জড়বাদী ভাষ্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। যেমন

জীবনের বৃহৎ রণক্ষেত্রে মিস্টার প্রসিকিউটার
একই শক্তি তোমাকে আমাকে ঐক্যসূত্রে বাঁধে
দিনগুলোর অসাড়তা আমাদের শিরে
দুর্বহ তীব্র যেন কয়লার বিশাল খণ্ড

মাংস রুটি শিশুর কলহাস্য
এবং ভার্যার বসনের অধিকারে
বিষয় আদালতে তোমাকে অভিযুক্ত করে
জনগণের দীর্ঘঃশ্বাস শ্রুত হয়
সবুজ পোষাকে ক্রুশ দণ্ডায়মান
দেয়াল থেকে সূর্যের আলোতে
ঈগল দীপ্তিমান
কণ্ঠস্বরে আঘাত করো তোমার টুপীতে
স্বর্ণময় পুষ্পস্তবক স্থাপন করো মুদ্রার স্তবকে
মিস্টার প্রসিকিউটার।

মিলোসের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'থ্রি উইন্টার্স' (১৯৩৬) এ চিন্তার সঙ্গে শিল্পের সূক্ষ্ম উপলব্ধির সমন্বয় পরিবর্তনের সুরকেই যেন স্পষ্ট করে। কাব্যগত ঐতিহ্য অনুসরণ করে মিলোস শোকপূর্ণ কণ্ঠস্বরে রোমান্টিসিজম সঞ্চারিত করেন। যেমন "বার্ডস", "দি গেট্স্ অব্ আর্সেনাল"। অবশ্য সাইপ্রিয়ান নরউইড এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন 'এলেজি' দার্শনিক ও ধ্রুপদী মর্যাদায় সমৃদ্ধ ·

না, এর বিস্মরণে নয় স্মৃতিতে
গিরিশৃঙ্গের ঘন কুয়াশায় ও নয়
নয় রাজধানীর শ্রুতি পীড়িত শব্দে
শুধু শান্তির আশ্বাসে সমর্থ এই বিশ্ব

সংগ্রামের বর্ণগুলোর অতিক্রান্তিতে
হয় ক্রুশ অথবা প্রস্তর ফলক
যেন ট্রয়ের ধ্বংসের ওপর
ধ্বনিত বিহঙ্গের করুণ সঙ্গীত

প্রেম, আহার, পানীয় অনুক্ষণ
পথের অবিচ্ছিন্ন অংশ
কিন্তু দৃষ্টি এদের ওপর স্থির নয়

তন্দ্রাতুর নিদ্রালু নেত্রপল্লব নির্দয়
আলোতে ক্রমে দগ্ধ

তবুর সাক্ষাৎ লগ্নের পূর্বেই মহাকালের
ঘোষণা বিপদ সঙ্কেত

উপযুক্ত বিশ্বস্ত প্রাণী ক্ষণজীবী
মানুষের অস্তিত্ব
ব্যর্থভাবে দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন তীব্র আলোর ধাঁধায়
অধিকার বঞ্চিত
এবং ভূমি থেকে উদ্ভূত কণ্ঠস্বর
একি ব্যর্থ শোকযন্ত্রণার কালিমা
আমরা তোমাদের বলি, আমাদের
উত্তর পুরুষ ?

পূর্ববর্তী কাব্যের চেয়ে 'থ্রি উইণ্টাস'' মিলোসকে অধিকতর খ্যাতির সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে। এমন কি তাঁর কাব্যের কঠোর সমালোচক কে. ডাবলু জাওদজিনস্কি পর্যন্ত মিলোসের প্রসংশায় মুখর হয়ে ওঠেন। মিলোস এই কাব্যগ্রন্থে শব্দসূচীর বিন্যাসকে উহ্য রেখে বাক্যগঠন সংক্রান্ত এক কম্পিত প্রতিমা উদ্ভাবনে মগ্ন। ঐতিহ্যের রীতি তাই সাময়িকভাবে উপেক্ষিত।

যুদ্ধের পরবর্তীকালে মিলোসের বিস্ময়কর স্বাক্ষর 'রেসক্যু' (১৯৪৫)। এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই তাঁর কাব্যের বৈপ্লবিক বিবর্তন শুরু হয়। যুদ্ধের কবিতার মধ্যেও সেই সুর ধ্বনিত হতে থাকে। এই পর্বে কবিতায় করুণরসের সঙ্গে কল্পনার প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়েছে। নির্বাচিত শব্দের ব্যবহারে কাব্য শরীর রমণীয় হয়ে ওঠেছে। রোমান্টিসিজমের প্রভাব থেকে তখনো তিনি মুক্ত হন নি। সেই সময় মিলোস জনপ্রিয় সঙ্গীত থেকে লোকনীতির পরিকল্পনা আবিষ্কার করেন। তাঁর ট্রাজিক কবিতায় প্যারালালিজম ও ছন্দের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন কবিতা বিশ্বজনীন মানবিকবোধে সমৃদ্ধ ছিল।

মিলোস তাঁর সমসাময়িক নির্বাসিত কবি মিস্কিউমজ, স্লোয়াস্কি এবং

নরউইডের মতো রোমান্টিক পূর্বসূরীদের পথ কখনো এড়িয়ে যেতে পারেন নি। তবুও তিনি একজন আধুনিক বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত।

যুদ্ধোত্তর পোলাণ্ডে মিলোসের অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত ছিল। তখন থেকেই তিনি চরম সংকটের শিকার হয়ে পড়েন। একদিকে শিল্পের সৌন্দর্যের উপলব্ধি অন্যদিকে মস্তিষ্ক-প্রসূত তত্ত্ব। সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু এই অবস্থা ক্রমে কেটে যায়। তাঁর মধ্যে কাব্যিক অধিকার প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কবিতার প্রতি তাঁর কর্তব্য এক অটল মনোভাব সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে বিসদৃশ কাব্য গ্রন্থ 'রেসকু' মিলোসকে একজন বিদ্রোহী কবি হিসেবেও চিহ্নিত করে। 'সমাজবাদ গঠনে' এই কাব্যগ্রন্থের কোন ভূমিকা নেই বলে তিনি কঠোর সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন।

আমেরিকা অবস্থানকালে তাঁর কবিতা অনাড়ম্বর সাজে সজ্জিত। যুদ্ধের বিষয় এবং ভয়াবহ অবস্থা তাঁর কাব্যকে আর প্রভাবিত করতে পারে নি। বরং কবির একান্ত অনুভবগত প্রতিমা কাব্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে। ছন্দের প্রতিও তিনি আর পূর্বের মতো সচেতন নন। এযেন নতুন এক মিলোসের আবির্ভাব। এই পর্বে যুক্তিগ্রাহ্য দীর্ঘ কবিতা রচনায় তিনি মগ্ন থাকেন। কবির জীবনের গভীর ভাবনার মাধ্যম হিসেবে শিশু ভোলানো ছড়া রচনার রীতিকে গ্রহণ করেন। তাই কাব্যের ছন্দ কখনো মুক্ত কখনো আবৃত বা দুর্বোধ্য।

নির্বাসিত জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ডে লাইট' (১৯৫৫)—জন্মভূমির জন্য তাঁর মমতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। তাঁর একমাত্র পরিচয় মানুষ। তাঁকে ঘিরে রেখেছে স্মৃতি। স্বদেশ-কাতরতা আমাদের মনকেও সিক্ত করে।

আমার জন্মভূমি

নিজভূমে আমার প্রত্যাবর্তন হবে না
বৃক্ষরাজি শোভিত পল্লীর হ্রদ
এখনো দৃষ্টিপথে ভেসে বেড়ায়
ছিন্ন মেঘ
যখনই ফিরে তাকাই
গোধূলির আঁধারে জলমগ্ন অগভীর চড়ার
ফিসফিস শব্দ

শঙ্খচিলের তীক্ষ্ণ চীৎকার সূর্যাস্ত শীতল
সিক্ত
আরো উর্দ্ধে বুনোহাঁসের ডাক
আমার অমরাবতীতে ছায়ার হ্রদ নিদ্রায়
আমি আনত হয়ে দেখি
নিয়ে আমার জীবনের দীপ্তি
অতঃপর সবকিছু যেন আমাকে ভয়ে চমকিত করে
সেখানে, মৃত্যুর পূর্বলগ্নে আমাকে
পরম মুক্তি দান করে যায়।

১৯৫৭ সালে মিলোসের 'পোয়েটিক ট্রিটিজ' প্রকাশিত হয়। তার শিল্প চেতনা ও আদর্শগত বিশ্বের মধ্যে তখন তীব্র সংকট ঘনীভূত হয়েছে। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগের সংঘর্ষ ও অভিজ্ঞতা বহন করে মিলোসকে কাব্যরচনায় উদ্যোগী হতে হয়।

'পোয়েটিক ট্রিটিজ' আধুনিক কাব্যরীতির ক্ষেত্রে সাহিত্য ও সমাজবাদের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপক নিরীক্ষণ মাত্র। এখানে যুদ্ধের তাৎপর্য যুদ্ধোত্তর যুগের উভয়সংকট, আমাদের সমকালের ট্র্যাজেডি ও অ্যাবসারডিটির মধ্যে কাব্যের গুরুত্ব বিশেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই পর্বে কবি ভাষার উৎসসন্ধানে মগ্ন। ভাষার ব্যবহাব মূলতঃ যোগসূত্র রক্ষার সহজাত ক্ষমতা ধারণ করে।

"জন্মগত ভাষার লঘুকরণে
শব্দ যাদের কর্ণে পশে
দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয় আপেল বৃক্ষসারি, একটি নদী,
একটি বক্র পথরেখা
যেন এসবের দর্শন ঘটে বিজলী চমকে।"

এই কাব্যগ্রন্থে কবি আমাদের যুগের সব অশুভ-অমঙ্গলকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন। সেই কবিতার সমাপ্তি ঘটে :

সুখের দ্বীপে ? না তোমার মধ্যে
আমার মধ্যে হোরেশিয়ান স্তবকে বায়ু নিমজ্জিত করে
বিদ্যালয়ের ডেস্কে কলমছুরিতে ক্ষোদিত রেখা

লবনাক্ত নির্জন প্রান্তর আমাদের সন্নিকটে
কোনদিন উপনীত হবে না॰

মিলোসের 'গ্রীক পোর্ট্রেট' স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত। সূচনা পর্বে আমাদের সুদূর অতীতে নির্বাসিত করে এবং পরিণতিতে আমাদের উপস্থিতি ঘটে বর্তমানে বাস্তবের সান্নিধ্যে। তখন গ্রীক মুখোসের অন্তরালে অন্য এক অন্তরঙ্গ পরিচিত মুখ ভেসে ওঠে॰

আমি অতীতে
ফেলে আসি আমার স্বদেশ, বাড়ী এবং
রাষ্ট্র কার্যালয়
স্মরণ রেখো আমি লাভ বা রোমাঞ্চের
সন্ধানে নিযুক্ত
জাহাজের উপর আর আমি বিদেশী নই
রূপসজ্জাহীন মুখ আমার

মিলোসের সমগ্র রচনায় ভ্রমণের বিশেষ ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সঙ্গে অবিরাম নৈতিক অনুসন্ধান পর্বও বাদ পড়ে না। স্থানও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু স্থানের পরিবর্তন দ্রুত সম্পন্ন হয়। কারণ অস্তিত্ব ও গতি অবিরাম স্থান বদল করে। মিলোসের ব্যক্তিগত জীবন ও সমগ্র কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সেই অস্তিত্ব ও গতি অবিরাম নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে।

রাজা রাও-এর উদ্দেশ্যে মিলোসের কবিতা

রাজা আমার অনুরোধ, আমি জানি
সেই ব্যাধির কারণ

বছর বয়ে যায় আমি
মেনে নিতে পারি নে
যে প্রাসাদে আমার বাস
অনুভব করি হয়তো রয়েছি অন্য কোথায়

একটি মহানগরী, তরুরাজি, মানবের কণ্ঠস্বর॰…

পোলিশ কবি জেসলো মিলোস

কোথাও একদা সত্যিকার অন্তরঙ্গ একটি নগর ছিল
ছিল বৃক্ষরাজি, কণ্ঠস্বর, বন্ধুত্ব আর প্রেম

সংযুক্ত করো, যদি অভিলাষী হও আমার অদ্ভুত অবস্থা
সিজোফ্রেনিয়ার কিনারে
প্রত্যাশিত এক আশায়·

অবশেষে খুঁজে পেয়েছি এই তো আমার বাড়ী
এখানে, পূর্বে সমুদ্রের সূর্যাস্তের দীপ্তিমান অঙ্গার
সাগরবেলার অভিমুখে তোমার এশিয়ার সৈকত
বৃহৎ প্রজাতন্ত্রে পরিমিতভাবে কলুষিত।

বিজয় দেব

মহাভারতের দু'একটি ঘটনা : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

বহু পঠিত এ পয়ারের দু'টো শব্দ 'অমৃত' ও 'পুণ্য' আমাদের কাছে বিশেষ অর্থবহ বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, শব্দ দুটো নিঃসন্দেহে আমাদের এই মর্ত্যপৃথিবী ছাড়াও স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বের স্বীকৃতি বহন করে, দ্বিতীয়তঃ, পাপ-পুণ্যের যে বিশেষ ধারণা কাশীরামে উপ্ত, আজ তা বহুলাংশেই অনুপস্থিত। বিশেষতঃ যখন এই ঘোর ধর্ম-নিরপেক্ষতার যুগে হপ্‌কিন্সের এর সাথে একই চোখে দেখি 'why do sinners prosper ?' তখন প্রাচীনকালীন পাপ-পুণ্যের ধ্যান ধারণাটাকে শিকেয় না তুলে রেখে উপায় কি ? ওয়াজেদ আলি সাহেব ওঁর লেখার মধ্যে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের এক আবহমানকালীন ট্রাডিশন রয়েছে যা অসংখ্য পরিবর্তনেব মধ্যেও অপরিবর্তমানতায় বাঁধা। কিন্তু আলী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি ট্রাডিশন কোন গ্রামের সাতবুড়ো অশ্বত্থ গাছের নীচে ভাঙ্গা মন্দিরের অনড় অটল শিবলিঙ্গ নয়, যুগ হতে যুগে পরিবর্তনশীল জীবনের যে বৃহৎ স্রোত তারই চিহ্নবাহী এক উজ্জ্বল প্রয়োজনীয় অতীতকেই তো ট্রাডিশন বলবো। ট্রাডিশন নিয়ে এ কথা বলছি এই কারণেই যে প্রায়শই এমন একটা ওজর খাড়া করা হয়, 'তাসের দেশে'র সেই অকাট্য অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়মের মতো, 'মহাভারত' বা অনুরূপ কোন ধর্মগ্রন্থের কোন আলোচনা ধার্মিকের ভক্তিরসাপ্লুত দৃষ্টিকোণ ছাড়া সম্ভব নয়, তাতে ট্রাডিশন রসাতলে যায়। মান্ধাতার আমলের পুরাকালীন সেই ভক্তিরসের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে এমন হলফ করে বলা যাবে না। বিশেষতঃ, গ্রামে-গঞ্জে এবং শহরের উপকণ্ঠে ভাগবত পাঠের স্থানগুলোয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তথা বণিতার জনাকীর্ণতায় এ সত্য স্বীকৃত যে 'ভক্তিরসে নদীয়া 'ডুবু ডুবু' না হলেও এখনও ভক্তিরস সরস্বতী বা ইছামতীর মতো পুরো হেজেমজে যায় নি। কিন্তু আমাদের যুগটার কথা ভুলবো কেমন করে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দাঁড়িয়ে 'বেধর্ম্মী' 'যবন' যে গালই অদৃষ্টে জুটুক, যে কোন গ্রন্থ, তা 'ধর্ম'

কি 'অর্থ', 'কাম' কি 'মোক্ষ', জীবনের যা কিছু ছুঁয়েই হোক না কেন, তার পর্যালোচনা বৈজ্ঞানিক তথা যুক্তিবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়াই বিধেয়।

'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'—এ আপ্তবাক্য অর্বাচীন কালকে পরিহার করলে ভারতের ক্ষেত্রে একান্ত সঠিকভাবেই প্রযোজ্য। কি কাল, কি সাম্রাজ্য, 'মহাভারতে' উভয়েরই সীমানার বিস্তৃতি এতো বিরাট ও ব্যাপক যে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। প্রাচীন ভারতের এমন কোন ঠাঁই নেই যা 'মহাভারতে' অনুল্লেখিত বা অনালোচিত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এমন কোন দিক নেই যা ব্যাপক ও গভীরভাবে চিত্রিত হয় নি 'মহাভারতে'। সাহিত্য সমালোচকের নান্দনিক দৃষ্টিকোণ হতেই 'মহাভারত' যে শুধু মহৎ কীর্তি হিসাবে প্রশংসার অধিকারী তাই নয়, পুরাকালীন জীবনের এক উজ্জ্বল ও সত্য প্রতিবিম্ব হিসাবেও এ মহাকাব্য আমাদের কাছে শ্লাঘনীয়। এ আমাদের কাছে প্রাচীন ভারত-বিদ্যার বিশ্বকোষ।

ব্যাসদেব এ মহাকাব্যের রচয়িতা বা সংকলয়িতা যাই হোন না কেন, অসংখ্য জলছবির মতো পৃথিবীতে মানুষের প্রথম সৃষ্টিকাল হতে বহু বহু রাজার জন্ম-মৃত্যু একটা ধারাবাহিকতায় বাঁধা এ কাব্যে, একটা fantastic panorama উপস্থিত এখানে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে মহাকাব্যকারের শিল্পভাবনার ফলেই হোক বা অন্য যে কোন তাড়নার ফলেই হোক, তাঁর দৃষ্টিপাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দু'এক আদিপুরুষ সহ কুরু-পাণ্ডবদের জীবন কাহিনী, তাদের জীবনের নানা টানাপোড়েন, নানা সংঘাত ও নানা ঘাত-প্রতিঘাত। এবং একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না মহাকাব্যরচয়িতা কুরু-পাণ্ডবদের নাটকীয় এই জীবনেতিহাসের মধ্য দিয়ে তাঁর সমকালীন ভারতের ন্যায়-নীতি, ধর্ম-অধর্ম, আচার-আচরণের এক সম্যক ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

এখন, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপস্থাপনার আগে প্রাক্ স্বীকৃত হিসাবে সমাজ-তাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ হতে দু'টো জিনিষ উল্লেখ করতে চাই। প্রথমতঃ 'মহাভারত' যে সময়েই রচিত হোক না কেন, সে সময়ে রাজতন্ত্র তার প্রয়োজন-ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণী বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। দ্বিতীয়তঃ, আদিমকালের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটেছে। পুরুষ-শাসিত ও পুরুষ-প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পুরুষের অধীনতা স্বীকার

ঘটেছে পাকাপোক্তভাবে। আমরা জানি যে কোন সমাজের নীতি নিয়মগুলো গড়ে ওঠে সমাজের চালিকাশক্তি যে শ্রেণী তার সুখ সুবিধা ও পছন্দকে কেন্দ্র করে। 'মহাভারতে'র যুগেও এর অন্যথা হয় নি। তাই রাজতান্ত্রিক পুরুষেরা তাদের কামাচার তৃপ্তির সহায়ক হিসাবে নারীকে নানা নিগড়ের শিকলে বেঁধেছিল। তাই বহুবিবাহ পুরুষেব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে একস্বামীত্বর দুর্ভেদ্য আগল টানা ছিল। আমরা প্রায়শই প্রাচীন ভারতের নারীর মহিমার কথা উল্লেখ করি তার স্বাধীনতা সচেতনতাব কথা ব'লে। বৈদিক যুগের নারীদের ক্ষেত্রে হয়তো এই স্বাধীনতা কিয়দ্‌পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মহাভাবতের যুগে সে তো শূন্যে বিলীন। অবশ্য পরবর্তীকালীন বৌদ্ধযুগ বা মুসলমান সাম্রাজ্যের কথা যদি ধরি, তাহলে তুলনায 'মহাভারতে'র নারীকুল অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করেছে। বিশেষতঃ, বেশ কিছু ক্ষেত্রে কন্যাকে স্বয়ম্বরা করে নিজ পতি নির্বাচনে স্বাবীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কি বাজকার্য সম্পাদনে, কি জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, নাবী কোন বিশেষ ভূমিকা পালন কবেছে, 'মহাভাবতে' এ দৃশ্য বিরল। পাণ্ডবেরা মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কুন্তীর কোন প্রভাব অপরিলক্ষিত। দুর্যোধনকে পরিত্যাগের ব্যাপারে গান্ধারী নিছকই শুধু আকুল আবেদন করতে পারেন ধৃতরাষ্ট্রেব কাছে, কিন্তু রাজা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা উনবিংশ শতকের আলোকিত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি, 'মহাভারতের' চিত্রাঙ্গদা নিতান্তই অর্জ্জুনের সাময়িক শয্যাসঙ্গিনী, যার একমাত্র লাভ অর্জ্জুনপুত্রের জননী হওয়ার সৌভাগ্য। 'মহাভারতে' যেটা স্পষ্ট সত্য সেটা হোল নারী-পুরুষের কামাচারের আধার তথা তার পুত্রের জননী। অবশ্য তার যৌন ভোগলিপ্সায় পুরুষ কতকগুলি নির্দ্ধারিত মূল্যবোধ বা taboos অলঙ্ঘ্যনীয়ভাবে মেনে চলেছে। যেমন, যে কোন নারী-সঙ্গ লাভের প্রাক্‌শর্ত হিসাবে দেখা যায় পুরুষ হয় ধর্ম বিবাহ বা গান্ধর্ব-বিবাহ রূপ লোকাচার পালনের মধ্য দিয়ে সে নারীকে পত্নীরূপে স্বীকার করে নিয়েছে। এর অন্যথা পুরুষের ক্ষেত্রেও সমাজ-ধিকৃত অপরাধ বলে গণ্য হোত। তাই কামাতুর রাজা শান্তনু বিবাহ ব্যতিরেকে সত্যবতী সঙ্গ লাভে অক্ষম। আর পুরুষের ক্ষেত্রে যে taboo এমনভাবে মান্য, নারীর ক্ষেত্রে তো সেই নীতিধর্মের দেওয়াল আরও

ভীষনভাবে অলঙ্ঘ্যনীয়। প্রতিটি নারী মনে প্রাণে একস্বামীত্বের আদর্শে বিশ্বাসী। দ্বিচারিণী বা বহুচারিণী আখ্যা লাভ কোন নারী চায় না। তাই সমাজ-স্বীকৃত ন্যায়-নীতির স্খলন, যাকে আমরা সামাজিক ব্যভিচার বলতে পারি, তা প্রায় অ-দৃষ্ট। প্রাক্-বিবাহ জাত সন্তানকে স্বীকৃতিদানে কুন্তীর অক্ষমতা একথাই প্রমাণ করে যে ক্বচিৎ পদস্খলন ঘটলেও তাকে 'চুপ্, চাপ্' করে বিস্মৃতির অন্তরালে পাঠিয়ে দেওয়াই ছিল বিধেয়।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলোর আলোকেই মহাভারতে'র দু'টো ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই এখন, যা নিঃসন্দেহে taboo গুলোকে ভেঙ্গেছে কোন আড়াল আব্ডাল না রেখেই। যদিও 'মহাভারতে' প্রতিটি কার্যকারণ সূত্রেই ধর্মের জাল ছড়ানো রয়েছে ব্যাপকভাবে, কিন্তু ধর্ম-সম্পর্কিত রূপক গুলোকে লাটাইতে সুতো গোটানোর মতো গুটিয়ে রেখে দিই, ঘটনাকে ঘটনা বলে দেখেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। পাণ্ডুর শাপগ্রস্থতার রূপকটাকে সরিয়ে রাখি। বরঞ্চ একথাই বলি অপুত্রক পাণ্ডু তার বন্ধ্যাত্বজনিত সন্তান প্রজননের অক্ষমতায় স্থিরীকৃত। কিন্তু পুত্রহীন জীবন যে নিষ্ফল। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'— পুরুষের জীবনে সন্তান প্রাপ্তির বিশেষ গুরুত্বেরই প্রকাশ। তাই পুত্র লাভেচ্ছু পাণ্ডু কুন্তীকে অন্য পুরুষ সহবাসে পুত্র ধারণে প্রবুদ্ধ করেছে "হে কুন্তী! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ, অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদনে অনুজ্ঞা করিতেছি।" অবশ্য স্বামী-আদেশ সত্ত্বেও অন্য পুরুষ সহবাসে নারীর যে taboo তা কুন্তীর মধ্যে প্রবলভাবে উপ্ত। তাই স্বামীর এ ইচ্ছাকে সে ধিক্কারে জর্জরিত করেছে: "হে ধর্মাত্মন্! আমি তোমার ধর্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত, অতএব তোমার আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অনুচিৎ হইতেছে।" কিন্তু পুত্র মুখ-দর্শনে পাণ্ডু এতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কুন্তীর সব অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে সে আদেশ দিয়েছে "...কর্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে।" এরপর রাজার দ্বারা উপরোধিত কুন্তী রাজার অভিলষিত সন্তান উৎপাদনে ব্রতী হয়েছে। এবং এরই ফলশ্রুতি ধর্মের ঔরসজাত কুন্তীর গর্ভের বিবাহোত্তর প্রথম সন্তান

য়ের জন্মলাভ। কিন্তু মজার ব্যাপার এক পুত্রলাভে পাণ্ডু সন্তুষ্ট নয়, যুধিষ্ঠিরে ক্ষত্রিয় বর্মের পরিপন্থী ধর্মভাবের প্রাবল্য কুন্তীকে দ্বিতীয় সন্তান ধারণে আদেশ করার ওজর হিসাবে চিহ্নিত। প্রবল পরাক্রমশালী পুত্র লাভেচ্ছায় কুন্তী বায়ুর সহবাসকামী এবং ফলশ্রুতি ভীমের জন্ম। কিন্তু বারবার কুন্তীকে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী করার যে ইচ্ছা, সে কি কেবল অপুত্রক রাজার পুত্রলাভেচ্ছা প্রসূত? ইন্দ্রের সংসর্গে কুন্তীর তৃতীয় সন্তান উৎপাদন—অর্জ্জুনের জন্মলাভ আর এই তৃতীয় সন্তান সৃষ্টির সাফাই গাইতে ভীম জন্মের পরে পাণ্ডুর পুনর্বার চিন্তা 'কি প্রকারে আমার এক সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে? যথাক্রমে ধর্মভাবাপন্ন, প্রবল পরাক্রমশালী ও সর্বগুণান্বিত তিন তিন সন্তান জন্মের পরেও পাণ্ডুর কুন্তীকে আর এক সন্তান উৎপাদনের জন্য তাড়িত করার পিছনে কোন সদিচ্ছা কাজ করেছে? অবশ্য কুন্তী পাণ্ডুর এই চতুর্থবারের প্রস্তাব প্রশংসনীয়ভাবে ও দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখান করেছে "মহাত্মন। আর আমাকে পুরুষান্তর সংসর্গের অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পরপুরুষের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তর সংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে, পাঁচবার উক্তপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যা পদবাচ্য হইয়া থাকে ," কিন্তু আমাদের আলোচনায় কুন্তীর সাহসিকতা লক্ষ্যণীয় নয়। লক্ষ্যণীয় পাণ্ডুর বিভিন্ন হাবভাব ও কার্য্যাদি। স্ত্রীসংসর্গে স্বাভাবিক যৌনাচারে অক্ষম এক পুরুষের যৌন বিকৃতিই ধরা পড়েছে পাণ্ডুর ব্যবহারে, যখন সে স্ত্রীকে বারবার উদ্বুদ্ধ করেছে বিভিন্ন পরপুরুষের সংসর্গ যাপনে। রতিক্রিয়া-অক্ষম পুরুষের অন্যপুরুষের রতিক্রিয়া দর্শনে যে আনন্দ, জানি না মহাভারতে পাণ্ডুর ক্ষেত্রে সেরকম কোন নিদর্শন কার্যকরী কিনা। এ প্রসঙ্গে এলিজাবেথ-উত্তর ইংলণ্ডের অবক্ষয়ী যুগের কথা উল্লেখ্য। নাট্যকার ডেকার তাঁর নাটক 'The Honest Whore' এ দেখিয়েছেন কেমন করে এক পুরুষ পতিতাবৃত্তি হতে উদ্ধার পেতে আগ্রহী এক নারীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার পরও আবার তাকে প্ররোচিত করেছে বন্ধুর সাথে পতিতাবৃত্তিকে নিয়োজিত হতে। পাণ্ডু-কুন্তী সম্পর্কিত এ ঘটনা মহাভারত-কারের সমকালীন যৌন-ভ্রষ্টাচার তথা যৌন বিকৃতিরই পরিচয় বহন করে।

দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণার কি করে পঞ্চস্বামী লাভ হোল সে ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট কুন্তী ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে আগত অদেখা দ্রৌপদীকে 'ভিক্ষালব্ধ রমণীয় দ্রব্য' হিসাবে বর্ণিত হতে শুনে আদেশ দিলেন : 'বৎস। যাহা প্রাপ্ত হইযাছে সকলে সমবেত হইযা ভোগ কর।' আপাত দৃষ্টিতে এ ঘটনা মাতৃ-আদেশ পালনের পরাকাষ্ঠা হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী প্রাপ্তির আসল রহস্যও মহাভারতকার অনুল্লেখ্য রাখেন নি। " পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট ও তদ্‌গতচিত্ত হইলেন। তাহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের ইন্দ্রিযগ্রাম প্রমথিত করিযা অনঙ্গবিকার প্রাদুর্ভূত হইল। যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য সমুদয় স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জ্জনে লইযা কহিলেন, 'দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।" সামাজিক স্বীকৃতির তকমা এঁটে একই রমণীর একই সাথে পঞ্চপুরুষের ভোগ্যা হওয়াটা যে একটু অস্বস্তিকরভাবে বিশ্রী ব্যাপার এবং সমাজের অনুমোদন যোগ্য নয়, মহাভারতকারের এ ধারণাটা স্পষ্ট ছিল। তাই দ্রুপদরাজ-সভায় যুধিষ্ঠিরের এবম্বিধ প্রস্তাবের পিঠে দ্রুপদের 'অননুমোদনীয় গলা শোনা যায় "হে কুরুনন্দন। এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ আপনার উচিত হয় না।" পিতৃতান্ত্রিক এক বিশেষ সভ্যতার প্রেক্ষাপটে এ ঘটনা যে স্থিতিবান সামাজিক কাঠামোটাকেই ধ্বংসের প্রয়াসী, এই অনর্থ সম্বন্ধে সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ দ্বৈপায়নকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাচন 'হে তপোধন। জ্যেষ্ঠ সুশীল ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন? ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, সুতরাং ধর্মাধর্মের নিশ্চয় করা আমাদিগের অসাধ্য। অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চস্বামীর মহিষী হইবে, ইহা আমরা কোনরূপেই ধর্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না।' কিন্তু শুধু ধৃষ্টদ্যুম্ন কেন, গোটা সমাজই অনুমোদন না করুক, ভবিতব্য আর অলঙ্ঘ্যনীয় মাতৃ আদেশ পালনের দোহাই পেরে ব্যাপারটা ঘটেছে। আগেই উল্লেখ

করেছি মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মহাভারতীয় যুগে প্রচলিত ছিল না, তাই একথা ভাববার অবকাশ নেই যে স্বেচ্ছাচারিণী দ্রৌপদী আপন ইচ্ছানুযায়ী কখনও এ পাণ্ডব, কখনও ও পাণ্ডবকে কামসংসর্গে আহ্বান করেছে। আবার যুগটা যদি মহাভারতীয় না হোত এবং দ্রৌপদী যদি নিতান্তই এক রমণীয় বস্তু হিসাবে বর্ণিত না হোত, তাহলেও এ ঘটনার একটা সামাজিক নিয়মবদ্ধ কারণ দর্শাবার সুযোগ থাকতো। আমাদের দেশে নারীমুক্তি কতখানি সফল, তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু যৌনজীবনে নারীমুক্তির সাফাই গাইতে অনেক বড বড বুদ্ধিজীবি এবং কবি সাহিত্যিক এগিয়ে এসেছেন। আজকের প্রেক্ষাপটে সব নারীপুরুষই মনে মনে বহুবিবাহ পূজারী এবং সুযোগ পেলে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে প্রত্যেকেই সাবলীল ও অনুশোচনাহীন, এমনই এক তত্ত্বের প্রচারে উদ্বুদ্ধ সমরেশ বসু তাঁর 'প্রাচীর' উপন্যাসে। কাল ও দেশের গণ্ডী পেরিয়ে গেলে মহাভারতের ও কাহিনী তো কোন সাড়া-জাগানো ব্যাপারই নয়। কিংসলে এনিস এর নায়িকা সাইমন তার ভাল-লাগা পুরুষের পাশে শুতে শুতে বলে 'তুমি আমার ৪৪তম পুরুষ।' কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে 'ভাললাগা' কথাটা দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ 'প্রাণবান এক রমণীয় বস্তু'র উর্দ্ধে দ্রৌপদীর মূল্য কখনই নির্ণীত হয় নি, আর নির্ণীত হয় নি বলেই যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিই নয়, স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ করে খেলতে পারে। যাই হোক্‌, দ্রৌপদীর সকাম স্বাধীন অস্তিত্ব যদি থাকতো, তাহলে পঞ্চস্বামী নিয়ে ঘর করার একটা স্বাভাবিক কার্যকারণ নির্দেশ করতে পারতাম। ফ্রাসোয়া সাগাঁ তার 'The Four Chambered Heart' উপন্যাসে হৃদয়কে সমান চারভাগে বিভক্ত করে চারটে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে দেখিয়েছেন যে চারটে আলাদা আলাদা স্থানে একই সময়ে হৃদয়ের লেনদেন সম্ভব। হৃদয়ের চার প্রকোষ্ঠ তত্ত্বে যদি বিশ্বাস করি, তাহলে পাঁচ প্রকোষ্ঠে বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব নয়। আর দ্রৌপদীর 'বস্তু' পর্যায়ভূক্তি না ঘটলে ধরে নিতে পারতাম উনি পঞ্চস্বামীকে হৃদয়ের পৃথক পৃথক পাঁচ কোঠায় স্থাপন করে বেশ আয়েশেই দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে ও বালাই-এর কথাই ওঠে না।

এখন চিন্তা করুন তো, ঠিক বিবাহের পরেই দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডব পরিবেষ্টিত

অবস্থায় দ্রুপদ রাজগৃহে বাসরসজ্জায়। কোন্ imagery আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে? কসাইখানার ঝোলানো এক টুকরো মাংসকে ঘিরে লোভী চকচকে চোখে ক্ষুধার্ত পাঁচ শারমেয়ের উপবেশন? হয়তো উপমাটা একটু grotesque। কিন্তু Tolstoy এর সেই গল্পের প্রেক্ষাপট বোধহয় এই রকমই। বিজিত এক অঞ্চলের সরাইখানায় বসে বিজয়ী চাব কশাক সৈন্য ঐ অঞ্চলেরই নতুন মা-হওয়া এক যুবতীকে ধরে এনে কোল হতে কোলে স্থানান্তবিত করে তাস আর কাম দু'খেলারই একই সময়ে মজা লুটেছে। যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, পঞ্চপাণ্ডব পরিবৃত দ্রৌপদীর ছবিটা কোনক্রমেই সুখদায়ক নয়। একটা বিশেষ সভ্যতাব আঙিনায় দাঁড়িয়ে মহাভারতকারেব এ ধারণাটা প্রখর ছিল যে ব্যবহারিক জীবনে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী যৌন সম্পর্ক বেশ অস্বস্তিকর। তাই মহর্ষি নারদ মুখনিসৃত সুন্দ-উপসুন্দেব উপাখ্যানের উল্লেখ এবং উপসংহারে দ্রৌপদী সম্পর্কিত যৌন জীবনে পঞ্চপাণ্ডবেব এক অবশ্য পালনীয় 'code of conduct' এর সৃষ্টি. "মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ মহর্ষি নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ কবিয়া তাঁহাব সমক্ষে পবস্পর এই নিয়ম করিলেন যে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবে, তখন অন্যজন তথায় যাইতে পারিবে না, যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসব বনে বাস করিতে হইবে।"

ভারতচন্দ্রে বিদ্যা-সুন্দবের রতি ও বিপরীত রতিক্রিয়া বর্ণনা হয়তো রুচিশীল সংস্কৃতিবান পাঠকের কাছে অশালীন মনে হতে পারে, কিন্তু দুই অবিবাহিত যুবক-যুবতীর সকাম প্রেম, যারা বিবাহকার্যেব মধ্য দিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ে উন্মুখ, কখনই ভ্রষ্টাচার হিসাবে আখ্যাত হতে পাবে না। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করে একই নারীকে পাঁচজন পুরুষের যুগপৎ ভোগ, ভ্রষ্টাচার ছাড়া অন্য কোন নামেই আখ্যাত হতে পারে না। আবাব ইংলণ্ডের এলিজাবেথ-পরবর্তী যুগের কথা উল্লেখ করি। আমরা যাকে বক্তসম্পর্কিত নিষিদ্ধ সম্পর্ক বলি, সভ্যতার ক্রম অগ্রগতির সাথে সাথে সেই সেই ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্ক স্থাপন একান্তই নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হযেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ঐ অবক্ষয়ী যুগে নাট্যকারেরা সেই নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলোকেই নাটকে নানা রঙে, রসে চিত্রিত করলেন। আমরা জানি সামাজিক ঐ অবক্ষয়ের যুগে

ঐটাই ছিল স্বাভাবিক। 'মহাভারত' রচয়িতার সমকালীন অবক্ষয়ই কি উল্লেখিত ঘটনায় প্রতিফলিত? মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার অনুসন্ধিৎসু পর্যালোচনা মনে হয় এ সিদ্ধান্তকে অপ্রামাণ্য রেখে দেয় না। আর একটি ঘটনার উল্লেখ বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাবৎ মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মযাজক ও যাযিকাদের বহু ভ্রষ্টাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু এ কাহিনীও ভূরি ভূরি বিদ্যমান যে কোন আর্ত নারীর উদ্ধারে বলিষ্ঠ পুরুষ তার সর্বস্ব পণ তথা জীবন উৎসর্গ করেছে। শিভ্যালরি নিঃসন্দেহে পুরুষের এক প্রশংসনীয় গুন। কিন্তু কি ঘটেছিল দ্যুতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ করে যুধিষ্ঠিরের হেরে যাওয়ার পর? বিস্রস্ত-বেশ দ্রৌপদীকে দুঃশাসন যখন চুল ধরে টেনে এনে বিবস্ত্রা করার জঘন্য নোংরা কাজে লিপ্ত হয়েছিল, সভার কোন কোণ হতে কি বিন্দুমাত্র একাজ প্রতিহত করার চেষ্টা হয়েছিল? হয়নি যে তা আমরা দ্রৌপদীর দুঃশাসনকে উদ্দেশ্য করে ধিক্কারের বাণী হতেই জানতে পারি "হে দুরাত্মন! আমি রজস্বলা, তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণ সমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিস্, ইহারা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধহয় উঁহাদিগের ইহাতে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্মে ধিক!"

শুধু উল্লেখিত ঘটনাগুলোই নয়, এমনি আরও অসংখ্য ঘটনা আছে যা নিঃসংশয়ে এ সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে 'মহাভারতে এক অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থারই প্রতিফলন ঘটেছে।' বলাই বাহুল্য, মহাভারতের গুরুত্ব পর্যা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই মাত্র দুত্রকটি ঘটনার উল্লেখ তৎকালের সামাজিক ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়েই সামান্য ইঙ্গিত দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে।

পূর্ণেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

দুই পায়ে দুই কবি

অনুপ মতিলাল

এই শতকের প্রথমার্ধে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু ভাষাভাষী সৃষ্টিশীল সাহিত্যেই একটি সুনিশ্চিত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী প্রবহমানতার অনুষঙ্গে কিছুটা আকস্মিক ও সুফলা. যদিও, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এই অনিবার্য নতুন সংকেত, নতুন ব্যঞ্জনার প্রতিফলন প্রথমেই স্পষ্টত অনুভূত হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে 'সভ্যতার সঙ্কট' দেখেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছিল মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন। যুদ্ধজাত ক্লান্তি ও অনুর্বরতা, রক্তক্ষয় ও শূন্যতা এবং সেই সঙ্গে এদেশেও নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সামগ্রিকভাবেই বাংলা সাহিত্যে এনেছিল এক যন্ত্রণার্ত অভিজ্ঞতা। ইওরোপে দ্রুত-সঞ্চারী ফ্যাসীবাদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতা, স্বদেশে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, ডাণ্ডী অভিযান, বামপন্থী মতবাদের উত্থান, কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বঙ্গ বিভাজন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভ—মাত্র তিরিশ বছরের সংকীর্ণ ব্যাপ্তিতে, ঘনিষ্ঠ পারম্পর্যে সংঘটিত এই সব ঘটনায় স্বভাবতই দেশকাল আক্রান্ত হয়েছিল এক সুতীক্ষ্ণ অনিশ্চয়তায়। যেমন উপন্যাসে, ছোটগল্পে, তেমনি কবিতাতেও স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়েছিল এই সমকাল।

রবীন্দ্রনাথ নামক যে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এতদিন কাব্যাকাশে এক-মেবদ্বীতিয়ম্ ছিলেন, সুদীর্ঘ সত্তর বছরের কাব্যসাধনায় যে বটবৃক্ষ তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে সহসা মুক্ত হয়ে ভিন্নতর পথে যাত্রা, রাতারাতি অন্যতর মানসিকতার পরিস্ফুটন ইত্যাদি সমস্যায় সঙ্কটিত এবং গ্রহণে-বর্জনে, ঐতিহ্যে-আধুনিকতায়, সনাতনে-নতুনে বেপথুমান হলেন রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর প্রথম পঙ্‌ক্তি। প্রাক্তন বিশ্ববীক্ষার অবৈকল্যে আর আস্থা রইল না, একটা অহৈতুক নির্মম আন্দোলন আলোড়িত করল, মানুষের আপতিক ভিত্তি হ'ল নগ্ন—কবি নিয়োজিত হলেন অন্বেষণে। কীটস্ একবার মিল্টন

সম্পর্কে বলেছিলেন 'Life to him would be death to me'. রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও, সকল বিপন্ন দ্বিধা দুহাতে সরিয়ে দিয়ে, নতুন কবির দলও একই কথা ভাবলেন। রবীন্দ্র-গোলার্ধ থেকে মুক্তিই হল প্রাথমিক অন্বিষ্ট। এই কাব্যমুক্তি আন্দোলনের প্রগতি পরিক্রমার প্রথম পরিচ্ছেদটি তাই নানা সচেষ্ট সচেতনতার দ্বিধা থরথর চূড়ে স্থাপিত ছিল। অবশ্যই চিত্রকল্পের নতুনতায়, বক্তব্যের নতুনতর স্বাদে, উদ্যোগে, আবেদনে, অভিজ্ঞতার বিস্তৃতিতে কোথাও আন্তরিকতার অনটন ছিল না। ক্লাসিক মানসিকতায়, পাণ্ডিত্যে তাঁদের কবিতা এক অনবদ্য শৈলীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্র প্রভাবকে সজোরে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে এলেন বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, যাঁদের কাব্যকর্ম অমর পদবাচ্য হ'ল।

কিন্তু, বাংলা কবিতার এই দধীচি দলের প্রয়াসের ভেতর লুকিয়েছিল আগন্তুক সিদ্ধির বরাভয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন সমাপ্তির কাছাকাছি, তখনই, চল্লিশ দশকের গোড়ায়, বাংলা কবিতার মূল পরিবর্তনের যাত্রাকাল সূচিত হ'ল। সমাজচেতনার যে অত্যধিক তীব্রতা অব্যবহিত রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যের যুগলক্ষণ ছিল, এই দশকের কবি যেন ক্রমশই তার থেকে মুক্তি পেতে চাইলেন, আত্যন্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আড়ালে তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন গীতিময়তার করকমলে। বিষয়ে, বর্ণনায়, উপলব্ধিতে এক নবতর কাব্যচেতনা গড়ে উঠল। ছন্দে, শব্দে, উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে, দর্শনের বিভিন্নতায় এই প্রথম বাংলা কবিতা উত্তীর্ণ হ'ল এক অভিনব এবং পরিণত কাব্যলোকে। ব্যক্তিক চেতনার গাঢ়তা ছিল যুগধর্ম। জেকিস বারজাঁ (Jaques Barzun) বলেছিলেন, 'The first striking trait of the modern ego is self-consciouness' সেই আত্মসচেতন ব্যক্তিক চৈতন্যের সঙ্গে এই প্রথম সামাজিক চৈতন্য অন্তর্লীন হ'ল, এক নতুন ভাবনার বোধন বসল যেন আধুনিক বাংলা কবিতায়। এলিয়টের কবিতা বিষয়ে নব্য-চিন্তা 'Poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion' অর্থাৎ আবেগবর্জনেই কবিতার সিদ্ধি এ ধারণা শিরোধার্য করে এ যুগের কবিকুল কাব্যরচনায় মনোযোগী হলেন। বিভিন্ন চিত্রকল্প, ভঙ্গিমা, ছন্দ-মিল নিরন্তর আবিষ্কার করে অনেকেই অনুসন্ধানী প্রতর্ক থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছেন সেই প্রার্থিত প্রমিতিতে যেখানে বক্তব্য

যাই হোক্ না কেন, কবিতা সামগ্রিক অর্থে একটি পূর্ণ অবয়ব পায়, নিটোল পরিপুষ্টি লাভ করে। আলোচ্য সময়েই প্রথম শব্দ নিয়ে শুরু হয় অনিঃশেষ নিরীক্ষা। কেননা এঁরা সকলেই উপলব্ধ ছিলেন সচেতনভাবে যে অভিজ্ঞতাকে কাব্যের শরীরে সরাসরি অনুবাদ করার দায়িত্ব শব্দের। কিন্তু এই শব্দানুসন্ধান শুধুমাত্র শব্দের জন্যেই শব্দ উপাসনা নয় (যেমনটি হয়েছিল সমকালীন ফরাসী দেশে, le mot juste), কবিতার অন্বিষ্ট লক্ষ্য আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সন্নিপাতে এ শুধু শব্দকে মাধ্যম হিসেবে দেখা। (মনে পড়ে, সমকালীন অরুণ ভট্টাচার্যের 'কিছু কিছু শব্দ হাসতে জানে, হাসায় / কিছু কিছু শব্দ কাঁদতে জানে, কাঁদায়' এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'তুমি যত ধোঁকা দাও তুমি যত / চালাক মাছের মত দূরে দূরে ঘোরাফেরা করো, / আমারও ততই / জেদ বেড়ে যায়, আমি / শব্দ নির্বাচনে তত সতর্ক হবার চেষ্টা করি। / ডাইনে বাঁয়ে জমে আছে শব্দের পাহাড়।')

চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে অগ্রযাত্রায় আধুনিক বাংলা কবিতা যে বিস্ময়কর বাঁক নিয়েছিল তার সার্বিক মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের অভিপ্রেত নয়, কেননা তাহলে প্রায় বেশ কিছু কবির কাব্যকর্মের অনুপুঙ্খ আলোচনা অত্যাবশ্যক, প্রয়োজন দীর্ঘ পরিসরের। আমি বেছে নিয়েছি আপাত বিরোধী দর্শনের অথচ মৌলিক সাদৃশ্য-সম্পন্ন দুই কবিকে—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

টি এস এলিয়ট বলেছিলেন "Poetry not only must be found only in suffering but can find its meterials only in suffering" বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, বোধকরি অবচেতনেই, এই এলিয়টীয় দর্শন পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। তাঁর কবিতা প্রতিনিয়তই যেন সমকালীন যন্ত্রণায় আর্ত এবং অস্থির। তাঁর যে সব কবিতা স্মরণে স্থির হয়ে আছে দীর্ঘকাল, সেগুলির প্রতিটিই চিত্রিত করে সংবেদ্য পৃথিবীর যন্ত্রণা ও কান্না, ক্রোধ ও অস্থিরতা। তাঁর প্রতিবেশ ছিল বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ, তাই, স্বভাবতই, সংবেদনশীল কবি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কোথাও আত্মস্থ হয়ে তৃপ্ত হতে পারেন নি। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছরের কাব্যসাধনায় তিনি এখনও সুস্থির নন, অন্বিষ্ট সত্যের জন্যে অন্তর্দাহে এখনও এই কবি ক্লিষ্ট এবং জীবন-জিজ্ঞাসায় মুখর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবি বলছেন:

"শুধু বেঁচে বর্তে থাকাই তো একজন মানুষের অস্তিত্ব নয়। নিজের ছোট্ট চিলেঘরটিতে বসে একতারা বাজিয়ে সারাজীবন প্রেম আর অপ্রেমের গান গাওয়া—তাও নয়। মানুষ কোনো ঈশ্বর প্রেমিক বৃক্ষ নয়, সারাজীবন ধরে তাকে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে হয়। আর শুধুই কি রাস্তা হাঁটা? অর্ধেক জীবন তো তার পায়ের নীচে কোনো মাটিই থাকে না তাহলে কিরকম রাস্তা একজন মানুষের? একজন কবির?"

এই পায়ের তলার মাটিকে জানাই কবির কাছে পরমার্থ লাভ, কেননা জীবনের বোধে সজীব কোনো কবির পক্ষেই এই সত্য পরিহার্য নয়

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধ'রে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
যেই গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
পাখিদের ক্ষুধা মেটে,
ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম। (মহাদেবের দুয়ার)

যে-কবি কালের সঙ্গে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করছেন, বেদনার পীড়নে ক্লান্ত হচ্ছেন, ব্যক্তিত্ব ও সংগ্রামের দ্বিবিধ সত্তা যাঁকে মানবিক পৃথিবীর বোধে ভাবিত করে রেখেছে সেই কবিই কিন্তু ক্লান্তির সমুদ্র পেরিয়ে মাঝে মাঝে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে ওঠার আশায় বলিষ্ঠ, কেননা তিনি জানেন

"সমস্ত ব্যাপারটাই অনুভব করার। অনুভব কোনো প্রশ্নের উত্তর নয়। সময়, স্বদেশ, মনুষ্যত্ব—কবি, কবিতা, কবিতার পাঠক—কোথাও যদি একসূত্রে বাঁধা যেতো? হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতো। হয়তো একদিন সব প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে, যেদিন আমরা সবাই মিলে পরিশুদ্ধ হবো।" (শ্রেষ্ঠ কবিতা' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা)

ঠিক এমনই এক আশাবাদ হীরের টুকরোর মতো জ্বলে ওঠে কবির অনুভবে,

সেই দুর্লভ অনুভূতি সকল অনুতপ্ত বিষাদ, বেদনার্ত অস্তিত্বের উর্দ্ধে গিয়ে কবিকে স্থাপন করে এক নতুন জীবনেব প্রত্যয়ে :

· · সময় কি হয়েছে তখন ?
চোখ তুলে দীঘি বউ ফসলের ক্ষেতকে শুধালো
তারপর শান্ত হাতে খুলে নিলো বুকের বসন,
সরবতের মতো তার স্তনে মুখ রেখে দিলো আলো
শিশুর মতন হয়ে। পৃথিবীর সর্বত্র হৃদয়
এসে গেল, গানে তার ভরে গেল গানের সময়॥ (চেতনা-সময়)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছন্দ-চেতনা বড় বিস্ময়কর। দুঃখবোধে, অকল্যাণের অমোঘ আঘাতে যখন তিনি আক্রান্ত তখনও আবার যখন তিনি নিবিড় প্রেমের সমুদ্রে নিমজ্জিত তখনও, এই কবি ছন্দকে বুকের ভেতর শুনতে পান। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এই কারণেই যে ক্ষুব্ধতা ও প্রেম, মৃত্যু ও জীবন সর্বত্রই তিনি আদ্যপান্ত ছন্দোময়।

এক মারতে জানা যত সহজ
মরতে জানা তত সহজ নয়,
তাই কি ভাবিস্? তাই কি দেখাস্ ভয়?
এইটুকু তো বুকেব মণি
তাকেই আবার টুক্‌বো করা চাই?
ভুলেই গেছিস্ ওরা আমার ভাই। (একটি আত্মার শপথ)

দুই আলোর সায়া দু-হাতে ছিঁড়ে ফেলে
এখুনি কেন নিবিড় হয়ে এলে?
বলো, বলো,
শরীরে বুঝি শ্রাবণ এসে পড়েছে কেঁদে, বলেছে, 'দ্বার খোলো।'
... .
তনুতে কথা গানের মতো বাজে,
মুখের কথা হারালো কোন্ লাজে?
বলো, বলো,

শরীরে বুঝি মাতাল হাওয়া পাগল হয়ে বলেছে, 'দ্বার খোলো!'

(রাত্রি-কে)

খুব সহজ চিত্রকল্প নির্মাণে ও প্রতীকী শব্দের ব্যবহারে কবি অনায়াস। ভাষার ব্যঞ্জনা ও সুমিত কাব্যশরীর গড়ে তোলায় কবি অনবদ্য শিল্পী। তাই তাঁর কবিতা এত প্রাণবন্ত ও স্রোতস্বিনী নদীর মত বেগবতী। কোনো অবস্থাতেই জীবনের অবিনশ্বর সুর থেকে কবি বিচ্যুত হ'ন না, তাই, বামপন্থা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ হয়েও কবিতায় তিনি চিরন্তন সুষমায় মহিমাময় মহান্। সুবিন্যস্ত পরিমিতি তাঁর প্রায় সকল কবিতাতেই ছড়িয়ে আছে। শ্রেণীবৈষম্যে আক্রান্ত এই পাপদষ্ট সমাজের অনাচারের প্রতি ক্রোধ বর্ষণেও কবি কি অসম্ভব মিতবাক্। 'ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে' বা 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে' কবিতাগুলি বিস্ময়কর। কবির পরিমিতি বোধের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উদ্ধৃত করছি .

ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম
শঙ্খচুড়ের কান্না .
'এ আনন্দ অসহ্য, বোন,
দিস্ নে লো আর, আর না।'
জেগে উঠলাম দেখতে পেলাম
আর-না-দেবার সুখে
কেয়া ফুলটি ঘুমিয়ে আছে
বিষধরের বুকে। (ঘুমের মধ্যে)

বস্তুবাদী অভিজ্ঞতা-অবলম্বী ও চেতনার এবং প্রত্যয়ের ধারাবাহিক প্রবহমানতায় বিশ্বাসী কবি নীরেন্দ্রনাথ ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেও সমসাময়িকতাকেই তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন। অন্বেষণী এবং বিষয়বস্তু-মগ্ন এই কবি সমস্ত কাব্যজীবনে অভাবণীয় উদ্যোগে আঙ্গিকচর্চা করেছেন আর সেই চর্চার অনুষঙ্গে শব্দকেও ইচ্ছে মতন ব্যবহারে তিনি অসম্ভব দক্ষ। কবিতাই তাঁর অস্তিত্ব, কাব্য তাঁর রক্তের ভেতর খেলা করে। 'কখনো এর, কখনো ওর দখলে / গিয়েও ফিরি তোমারই টানে, কবিতা। / আমাকে নাকি ভীষণ জানে সকলে, / তোমার থেকে বেশী কে জানে, কবিতা?' 'নিজের

কাছে স্বীকারোক্তি' কবিতার এই ছত্রগুলি থেকে বোঝা যায় কবি কতখানি কবিতার কাছে কমিটেড্। কবিতার রহস্য তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে, নিজের ইগো-তে হেনেছে আঘাত, বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়েছেন কিন্তু তবু তাঁর সমর্পণের ভাষা খুব স্বচ্ছ 'আমি রাজ্য জয় করে এসেও / তোমার কাছে নত হয়েছি, কবিতা। / আমি হাজার দরজা ভালবেসেও / তোমার বন্ধ দুয়ারে মাথা কুটেছি,' কবিতাব কাছে এমন নিঃশর্ত্ত সমর্পণ আছে বলেই বিষয়বস্তু নির্বাচনেও কবির শুচিবায়ু মনোভাব নেই—যেমন করেই আসুক সে অন্যভাবে, সে-তো তবু কবিতা।

এক একটা কবিতা যেন বমনীর নখে, ওষ্ঠে, জঙ্ঘাদেশে, হাতের মুদ্রায়
বিষাক্ত ফুলের মতো ফোটে।
এক একটা কবিতা যেন ঝড়ের ভিতর হয়ে ওঠে
নিয়তির কণ্ঠস্বর। (কবিতা '৭০ : উলঙ্গ রাজা)

অভিজ্ঞতা-অর্জন বস্তুটি চলমান বলেই যে কোন কবিই তাতে আস্থাবান্ হতে ভালবাসেন। নীরেন্দ্রনাথ তাই জিজ্ঞাসু, পূর্বোক্ত কবির মতই তিনি জীবনের নানা কূট প্রশ্নে' ঘটনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনে উৎসুক। সব কিছুকে পরখ করে দেখে নিলে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয় গড়ে ওঠে আর সেই 'পরম প্রত্যয়েব শান্তি /' শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখে।' 'কবিতার দিকে' প্রবন্ধে নীরেন্দ্রনাথ বলছেন .

"হোক্ আর নাই হোক্, আমার চোখ আর কান আমি খোলা রেখেছি। টান-টান করে বাড়িয়ে রেখেছি আমার আঙুল। সব কিছু আমাকে শুনতে হবে। সব কিছু আমি ছুঁতে চাই। জানিয়ে যেতে চাই, কোন্ দৃশ্য আর কোন্ কণ্ঠ আমার কেমন লেগেছিল, কোন্ বিদ্যুৎবাহী তারকে স্পর্শ করে আমি কতটা শিউরে উঠেছিলুম।"

জীবনের প্রাত্যহিক আটপৌরে অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে তাই নীরেন্দ্রনাথ যে কবিতা রচনা করেছেন তা' টুক্রো টুক্রো মুহূর্তকে সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনায় বিধৃত করেছে। 'বাতাসী' 'কলকাতার যীশু', অথবা 'রাজপথে কিছুক্ষণ' কবিতাগুলিই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর সমকালীন শহুরে সভ্যতার প্রতিবেশ, সেখানকার দুঃখ-বেদনা, আর্তি, প্রচ্ছন্ন কৌতুকে খুব সহজ চিত্রকল্পে এবং শব্দে অনায়াসেই নীরেন্দ্রনাথের কলমে ধরা পড়ে। 'এবং নেড়ীকুত্তাটিকে খুব যত্ন করে

আমার / সোফার ওপরে বসাই।/ তারপর টেলিফোনের মাউথ পীসটাকে / তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি, / যদি বাঁচতে চাস্ হারামজাদা, / তাহলে আয়, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল্ / হ্যালো দম্‌দম্ · হ্যালো দম্‌দম্ হ্যালো।' প্রতিদিনের গার্হস্থ্য, মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতাকে মুখের কথায়, কথ্য ভাষায় কাব্য-অন্তর্ভুক্ত করে কবি সচকিত করেন, রচনা করেন কবিতাতে মাঝে মাঝে ছোটগল্পের মত নিপুন ডিটেল এবং চমক। 'আমি মশায় নামছি নে, / জায়গা যখন পেয়েই গেছি, / তখন এর উস্‌পার না-দেখে আমি ছাড়ব না।' বা 'এমন নয় যে শোবার দোষে ঘাড়ে ব্যাথা'—যথাক্রমে এস্‌পার উস্‌পার ও ঘুমের মধ্যে কলহ কবিতাদ্বয়ের ঐ ছত্রগুলি যে-কোন প্রাচীনপন্থী কাব্যপ্রেমিককে নিঃসন্দেহে বিব্রত করবে, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার এই নতুন ছন্দ ও আঙ্গিক-লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সহজেই পৌঁছে দেয় পাঠকের হৃদয়াভ্যন্তরে।

এই কবিই কিন্তু অন্যত্র জীবনের গভীরতর অন্বেষণে ভিন্নরূপে, গভীরতর চিত্রকল্পে উপস্থিত করেন নিজেকে, 'তারার তিমিরে' কবিতায় 'মনে হয় ভুলে গিয়ে ফুল, পাখি, পরিচিত বন্ধুদের নাম / আরো কিছুকাল এই অন্ধকারে থেকে যেতে হবে'—এই শেষ দুটি ছত্র অন্ধকারের উদ্বেগে বিপন্ন অথবা আলোর গোপন নিভৃত আকাঙ্ক্ষায় আশাবাদী কবিকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। 'অন্য যন্ত্রণার দিকে' কবিতায় যে শাশ্বত অনুসন্ধান, অন্বেষণের উল্লেখ, তা' এক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য এক শুদ্ধির অধ্যায়ে উদ্বর্তনের পরিচ্ছেদ। কিন্তু এই গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গেও মিশে থাকে কবির স্বভাবের গভীরে অবস্থিত সংস্কার, ঘরোয়া দুর্বলতা: 'একটা পরিচ্ছেদ আমাদের পিছনে পড়ে রইল। / থাক্। / পোড়া কাঠ আর ভাঙা কলসির দিকে / ফিরে তাকাবার নিয়ম নেই। / চলো, আর এক পরিচ্ছেদ আমাদের ডাকছে।'

সংস্কার, অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাস বারবার ঘুরে ফিরে নীরেন্দ্রনাথের কাব্যকর্মে এসেছে। নিরাভরণ ছন্দে, অনবদ্য প্রয়োগশৈলীতে রচিত এই কবিতাটি আমাকে টানে·

> হাত থেকে যদি চিরুনি খসে পড়ে, তাহলে কী হয়,
> আপনারা তা জানেন?
> জানেন না।

আমি কিন্তু জানি।
বাড়িতে কেউ-না কেউ আসে।
আঙুল দিয়ে যদি কেউ আঁচলটাকে বারবার জড়ায়,
বারবার জড়ায়,
তাহলে যে তার কিছু নিশ্চয়
অর্থ থাকে, আপনারা তা মানেন ?
মানেন না।
আমি কিন্তু মানি।
কেউ তাকে নির্ঘাত ভালবাসে।

(চিরুনি, নক্ষত্র জয়ের জন্য)

এই কবি কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জানেন যে কবিতা নেহাৎ ভাবনাবিলাস নয়, শব্দ-ছন্দের ছেলেখেলা নয়, তার সর্বোপরি এক চিরন্তনী সামাজিক ভূমিকাও রয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সমাজের সংগ্রাম, সেই সমাজেরই জাতক এই কবি, তাই কোথাও বা সেই বেদনার্ত, সকরুণ, দুঃস্থ সমাজের ভাষ্যকার হয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ, অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁর নৈতিক সংগ্রাম বেধেছে, এই অনাচারের সঠিক মূল্যায়নে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতই কখনো তিনি পৃথিবীর গভীর অসুখ দেখছেন, কবিতায় বিধৃত করেছেন সেই ক্ষুব্ধ মানসিকতা

এক দ্যাখো যদি পারো
ধূল্যবলুণ্ঠিত এই সংসারের সম্মান বাঁচাতে ··
দ্যাখো পারো কিনা
অন্য কিছু দিতে তার হাতে।
দ্যাখো পারো কিনা এই সংসারের অসুখ সারাতে।

(অসুখী সংসারে)

দুই. কলকাতা শহরে
পয়সা মেলে, টাকাটা সিকিটা তাও মিলে যায়
কিন্তু ভিক্ষা কিছুতে মেলে না।

(নিকেল তোমার জন্য)

তিন জানি রে সিতাংশু, তোর ঘরের চরিত্র আমি জানি।
ওখানে অনেক কষ্টে শোয়া চলে, কোনক্রমে
দাঁড়ানো চলে না।
(দুঃখের বাহিরে)

চার. যে পৃথিবী তোমাকে চায় নি,
তুমিও অক্লেশে তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারো,
(চতুর্থ সন্তান)

শুধুমাত্র লিরিকধর্মী কবিতাতেই নীরেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত অথবা তিনি শুধুই প্রত্যক্ষ জীবনের ফটোগ্রাফিক ডিটেল বচনায় ব্যস্ত এই হেন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওপরের ছত্রগুলি তুলে ধরেছি এবং জেনেছি যে শুধুমাত্র ছন্দের ব্যবহার ছাড়া যন্ত্রণাদগ্ধ এই সভ্যতার অন্ধকারের বুক চিরে যেমন মানবিক অন্য দুই সমকালীন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তেমনি নীরেন্দ্রনাথও, যদিও তাঁর ভাষ্য পৃথক।

কবিতা ছাড়া অন্য কিছুকেই তাঁর বক্তব্যের মাধ্যম হিসেবে কবি কল্পনা করিতে পারেন না। নীরেন্দ্রনাথের যেন কোনো প্রার্থিত লক্ষ্য নেই, সময়ের সিঁড়ি বেয়ে তিনি কোনো বাঞ্ছিত শীর্ষে উঠে যেতে চান না। তাই মনে হয়, যে কবি বলেন, 'প্রতিটি নিঃশ্বাসে/যা-কিছু গ্রহণ করছি বুকের ভিতরে,/যা-কিছুতে হাত রাখছি, কিংবা বাঁ পায়ের/লাথি মেরে হটাচ্ছি যা-কিছু,/তাহাই কবিতা? সেই কবি বেশীটাই তাৎক্ষনিকতায় বিশ্বাসী হবেন, এতো স্বাভাবিক। অন্বেষী কবির অন্বেষার ফসল যদি পূর্ণাঙ্গ না হয় তবে তা তো সমকালের ঘেরাটোপে মাথা কুটে মরবে। কবি নিরীক্ষামগ্ন, শব্দের প্রয়োগে অতি সচেতন, অঙ্গিকেব নিত্যনতুন গবেষণায় পরিশ্রমী—কিন্তু চিরকালীন কাব্যের কাছে তাঁর সমকালীন আবেদন কতটুকু ধরা থাকবে, এই নিয়ে বড সংশয় হয়, যদিও জানি, অনেকটা নীরেন্দ্রনাথের স্বীকৃতি থেকেই, তিনি নিজে এ নিয়ে মোটেই ভাবনাচিন্তা করতে চান না। হয়তো, তার কাব্যদর্শনের এইটেই মূল উপজীব্য। এই সাময়িক পৃথিবীতে সাময়িকতাকেই জীবনের দৃশ্যপটে ধরে রাখা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গদ্য

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথে বেশ কিছু পেছনে গেলে সাধারণ প্রায় সকলের মুখে একটা অনুযোগ শোনা যেত—সেটা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে। যে অনুযোগ কমে নি, বরং প্রতিদিন বেড়ে বেড়ে আজ অভিযোগের সুরেই এসে দাঁড়িয়েছে। তা হল কবিতা আর কই? কবিতা বলে এখন কিছু আছে নাকি। না ছন্দ, না মিল এ আবার কি ধরণের কবিতা? একে গদ্য বললে ক্ষতি কি। অর্থহীন কিছু শব্দকে গদ্যভঙ্গিতে লিখে ছোট-বড় করে সাজিয়ে দেওয়া যদি কবিতা হয় তাহলে অমন কবিতা পড়ার দরকার নেই।

পাঠকদের এই সাধারণ বিরক্তি, এই অনীহা লক্ষ্যণীয়। যদিও এখানে আমি কবিতা কেন গদ্যর কাছাকাছি হয়ে গেল তা নিয়ে কোনো আলোচনা করছি না। এই লেখার বিষয়বস্তু কবিতা নিয়ে নয়, বরং গদ্য নিয়ে। হ্যাঁ, বিশেষ একজনের গদ্য লেখার বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে কবিতার প্রতি সাধারণ এই অভিযোগটুকুকেই আমি প্রথম তুলে নিলাম।

আমি যাঁর গদ্য নিয়ে আলোচনা করব তাঁর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ গদ্য পাঠক তাঁর গল্প উপন্যাস প্রভৃতি পড়ে স্বতই অভিযোগ করতে পারে—এ আবার কেমন গদ্য? এতো গদ্যের ভঙ্গিতে সাজানো পাতার পর পাতা কবিতা।

ছোট-বড় লাইন করে আরো কিছু দুর্বোধ্যতা মিশিয়ে দিলেই এঁর লেখাগুলো স্বচ্ছন্দে কবিতা হয়ে যেত। লেখক কি গদ্য লিখতে বসে ভুল করে কবিতা লিখে বসেছেন? সত্যিই এমন কথা মনে পড়ে যখন আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমগ্র গদ্য-সাহিত্য পড়তে থাকি।

সবচেয়ে বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একেবারেই গদ্য সাহিত্যিক, কবিতা তিনি কদাচ লেখেন নি, অন্তত ছাপার অক্ষরে তাঁর কোথাও কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না, অথচ আজকের গল্পকার ঔপন্যাসিকদের লেখা পড়তে বসলে তাঁকে এই একটি ব্যাপারের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে হয়। নিরেট তার ঠাস-বুনোন গদ্যগুলো যেন কেমন করে

অনায়াস কবিতা হয়ে যায়, যা মনে হয় লেখবার সময় কিংবা লেখার পরেও তিনি টের পান না।

এই প্রসঙ্গে প্রয়াত আর একজনের কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে—তিনি কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতোই যাঁর গল্পানুক্রমে ছিল কবিতার রহস্যময় রূপান্তর।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দীর্ঘদিন গল্প উপন্যাস লিখছেন, তাঁর ছোট গল্প বোধ হয় বাস্তবতার দিক দিয়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী—অথচ সেই বাস্তব, জীবন-সংগ্রামে অন্তর্লিপ্ত গল্পগুলির মধ্যেই কবিতার ছন্দ যেন পরম্পরা রক্ষিত হয়ে স্বতোৎসারিত হয়েছে, যা তাঁর সমকালীন অন্য কোনো লেখকের রচনায় পাওয়া যায় না একমাত্র কমলকুমার মজুমদার ছাড়া। যদিও দুজনের গদ্যশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের।

আমার মনে হয় প্রতিটি লেখকের ভেতরেই অগোচরে একজন কবি বাস করে, যার প্রেরণায় লেখকের রচনা রসোত্তীর্ণ হয়। কিন্তু সেই লুকিয়ে থাকা কবি রচিত গদ্যে ক্বচিৎ নিজেকে জাহির করে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বেলায় ঘটেছে ব্যতিক্রম। এখানে হৃদয়স্থিত কবিমন যেন অহরহ তাঁর রচনার মধ্যে নিজেকে বিশেষ এক মহিমায় হাজির করে পাঠককে অপূর্ব এক কল্পলোকের মায়াময়তায় নিয়ে যায় বাস্তবের সিঁড়ি ভেঙে।

'শালিক কি চড়ুই' গল্প বেশ কিছুকাল আগের, তার অনেক পরের গল্প 'গিরগিটি', তারও পরের রচনা 'আলোর পাখি'—অথচ বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েও এরা যেন একটা সামগ্রিক সময়কে ধরে রেখেছে, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সময়ের সঙ্গে জীবনের অপূর্ব সহবাস।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনায় যেন তুলির পর তুলি দিয়ে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প এঁকে গেছেন, তা এত অনায়াস, এত সুসম, যা একজন সমসাময়িক কবির নামকরা খুব বেশি কবিতার মধ্যে দেখা যায় না।

নির্জনতা, গাছগাছালির নিবিড় মায়ামমতা, সময়ের ভয়ঙ্করতা, জৈবিক ক্ষুধার প্রাকৃতিক নগ্নতা, ভাল লাগার মাধুরী মেশানো বিষন্নতা, জীবনের অমোঘ পরিণতি, নিষ্ঠুর নিয়তির আয়োজিত সত্যতা এ সব কিছুই তিনি এর নির্লিপ্ত মন নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় গদ্যে।

যা আসলে গদ্য হয়েও কবিতার কাছাকাছি, কাছাকাছি না বলে অনুগামী বা অনুসারী বলাই ভাল।

'মীরার দুপুর' 'সূর্যমুখী' উপন্যাসে, 'গ্রীষ্মবাসর'-এব মতো উপন্যাসোতাম বড গল্পে কি যাদুর কাঠি তিনি ছুঁইয়ে দিয়েছেন যা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। পাতাব পর পাতা পডতে ক্লান্তি আসে না। এ গদ্য পুরনো হয় না বারংবার পঠনেও, কারণ এ যে কবিতার সমগোত্রীয়।

জ্যোতিবিন্দ্র লিখেছেন প্রচুব। তাঁব লেখাব বিষয়বস্তু আজকের ক্ষয়ে আসা মধ্যবিত্ত সমাজের রূঢ বাস্তবতাকে নিয়েই। কাল্পনিক কোন গাল-গল্পের অবকাশ তাঁব রচনায় নেই, অথচ সেই রচনাব বর্ণনা বচন ক্ষমতা, শব্দ নির্বাচন, বাক্য বিনাস, রূঢতাদেব আডাল কবে উজ্জ্বল এক বর্ণময়তা প্রাণ পেয়ে হৃদয়ে সবটুকুকে গ্রাস কবে। প্রেমের ব্যাপাবে, প্রত্যাখ্যানে, জৈব চাহিদায, দৈনন্দিন অভাব অভিযোগে সর্বত্রই কবিতায সহস্পর্শ ঘিরে থাকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প উপন্যাসকে—যা অন্য কোনো লেখকের রচনায এমন নিবিড হযে ওঠে না।

শহুবে জীবনে অভ্যস্থ হয়েও জ্যোতিবিন্দ্র কোথায় যেন নাগবিক নন। তাব সারল্য, তাঁব সৃষ্ট চবিত্রগুলোও অধিকাংশই শহুবে মধ্যবিত্ত জীব, অথচ এক নিবহঙ্কার গ্রাম্য অকপট বোধ থেকে তাদের তিনি তুলে ধবেছেন নিজেব এক প্রত্যয়সিদ্ধ কায়দায় যা কবিতায় সাফল্যর বহন কবে।

'বন্ধুপত্নী' গল্পের পবিবেশ বিষণ্ণতা গল্প শেষ হয়ে যাবার পব তাব বস মনকে এমন এক জায়গায় পৌছে দেয যা আপাতবুদ্ধিতে পৌছনো যায় না, শুধু উপলব্ধির পথ ধবে পাঠককে মোহগ্রস্থ ক'রে ধীবে ধীবে নিযে যায। জ্যোতিরিন্দ্র এই অনায়াস-সিদ্ধ তাঁর সাহিত্য জীবনে ঈশ্ববেব অকৃত্রিম আশীর্বাদ বলেই আমাব বোধ হয়েছে, আব একমাত্র এ কাবণেই তাকে হিংসা করতে ভয়ঙ্কর ইচ্ছে করে। আবার আর একদিকে মনে হযেছে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট এই গদ্যভঙ্গির জন্য—যা গদ্য হয়েও অনাবিল কবিতা, তাঁর জনপ্রিয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে অনেকাংশে।

দীর্ঘদিন লিখেও, অনবদ্য সব গল্পের জন্ম দিয়েও, শরীরের লোমকূপে লোমকূপে রোমাঞ্চ ছড়িয়েও তিনি যে জনপ্রিয় হতে পারেন নি এটা পাঠকমাত্রেরই জানা। এর কারণ তাঁর গল্পে সেই জিনিস রযেছে যা একমাত্র বিদগ্ধজন ও রসবেত্তা

ছাড়া সহজে গ্রহণ করতে পারেন না—তিনি সহজ সাধারণ পরিবেশ রচনা করেও কোথাও এক দুবালেখ্য গভীরে চলে যান যাঁর অর্থ সাধারণ পাঠক খুঁজে পায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আমার মতে লেখকদের লেখক—তিনি লেখকদের জন্যই যেন লেখেন। বোধহয় অনুচ্চারে বলতে চান দেখ কবিতা কত সুন্দর, কত গভীর, কত ব্যঞ্জনাময়। যেমন কবিরা, লেখকদের লেখক।

তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন' যেখানে কবিতার কোনো প্রশ্রয়ই নেই, সম্পূর্ণ ঝরঝরে গদ্যের পরিবেশ, সেখানেও তিনি ঝক্‌ঝকে ভাষার শৈলী ও রীতিত্বকে পদ্যতে নিয়ে এসেছেন পরম অবহেলায়। আসল বড় লেখক মাত্রেই বড় কবি—একথা হয়তো প্রমাণ করা যায়, তবু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যে কোনো লেখা নিয়ে প্রমাণ না করেই সহজে বলতে পারা যায় এই গদ্য পদ্যছন্দে লেখা নয় তো ? এবং একথাও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যায় এমন নিটোল সুন্দর কবিতা লেখবার জন্য লেখক সামান্যতম সচেতন চেষ্টা করেন নি। তাঁর অবচেতনে এক এক অনন্ত কবিতার ভাণ্ডার রয়ে গেছে যা থেকে তিনি তুলে তুলে পাঠকদের এতকাল উপহার দিয়ে আসছেন।

তাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গদ্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি বিপরীত দিক দিয়ে শুরু করেছিলাম—আজকের আধুনিক কবিতা সম্পর্কে পাঠকদের যে অভিযোগ তা কতখানি কবিতা, তেমনি বহু পাঠকই চোখ বুঁজে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কোনো গল্প বা উপন্যাস পড়ার পর জানতে পারে এইসব মুক্তোর মতো দ্যুতিময় রচনাগুলো সত্যিই গদ্য।

সকল লেখকেরই লেখার কিছু কিছু পরিবর্তন উত্তরণ দেখা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। যত বয়স বাড়তে থাকে তত লেখার মধ্যে অভিজ্ঞতার উপলব্ধির চেতনার পরিপূর্ণতার ছাপগুলি ক্রমনিয়মানুসারে এসে যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তা পাই না। অদ্ভুত তার ক্ষমতা। সেই প্রথম বয়স থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় চার দশক জুড়ে তিনি এক ধরণের গদ্য লিখে আসছেন যা প্রথমদিন যেমন চমকপ্রদ ছিল আজও তাই। তখন যেমন জীবনের যে আলোছায়া তাঁর লেখাকে ঘিরে ছিল আজও তেমনি মগ্নতা চেতনায় আলো আঁধারিতে তা ছেয়ে আছে। লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে আমি কিছু বলছি

না, কিন্তু গদ্যভঙ্গিতে কোনো ফাঁকি নেই, কোনো কায়দা নেই—অকপটে তিনি কাপড়ের পাটের পর পাট খুলে ধরছেন একই নিপুণতায়।

একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া যাক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প থেকে

শিশুরা ঘামছে

স্বপ্ন দেখে একটু হাসছে।

স্বপ্ন দেখে একটি কাঁদছে।

শিশুরা একরকম।

বাবারা একরকম না। একটি বয়স্ক মানুষে আর একটি বয়স্ক মানুষ থেকে সাত হাত দূরে থেকেছে।

আজ দুজন এসে রকে বসেছে। পাশাপাশি বসেছে।

বৃষ্টি হবে কি ?

বসন্তে বৃষ্টি হলে মন্দ কি। দুটি বাবা এই প্রথম কথা বলল।

দেখুন, খুব পোকা উড়ছে।

পোকারা আলোর কাছে ছুটে এসেছে।

মালাই বরফ যাচ্ছে।

ডাকুন-না।

দুটি বাবা এক হয়ে গেছে। মাছ ধরতে না পেরে কবিতা লিখতে না পেরে প্রায় বুড়িয়ে যাওয়া দুটি মানুষ শিশু হয়ে গেছে। মাছ পোকা মালাই বরফে একরকম উৎসাহ, এক স্বাদ। বসন্তের বৃষ্টি দক্ষিণের হাওয়া। এক রং। একরকম অবসাদ। কখনও কখনও বাবারা শিশু হয়।

[দুই শিশু : আজ কোথায় যাবেন]

অজয় দাশগুপ্ত

বৃটিশ কাউন্সিলে কবি টনি কোনর

ব্রিটিশ কাউন্সিল ডিভিশনের ক'লকাতা শাখা প্রায়ই আমাদের ইওরোপীয় এবং মুখ্যত ইংলণ্ডীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সমকালীন ধারার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দেন। এমনই এক উদ্যোগে, বেশ কিছুদিন আগে, ক'লকাতায় এসেছিলেন ওদেশের এক বিশিষ্ট সাম্প্রতিক কবি, টনি কোনর (বর্তমানে মার্কিন প্রবাসী)।

জন অ্যান্টনি অগষ্টাস কোনরের জন্ম ম্যাঞ্চেষ্টার-এর ল্যাঙ্কাশায়ার শহরে, ১৯৩০-এ। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ট্যাঙ্ক ড্রাইভার ও পরে টেক্সটাইল ডিজাইনার হিসেবে মূল্যবান যৌবন অতিবাহিত করেন। ষাটের দশক থেকেই তার আশৈশব সাহিত্য-সাধনার ফললাভের সূচনা। ১৯৬১-৬৪, তিনি বোল্টন টেকনিকাল কলেজে লিবারেল ষ্টাডিজ-এর সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৭-৬৮ মার্কিন মুলুকের ম্যাসাচুসেটস্-এ আমহার্ষ্ট কলেজে ভিসিটিং পোয়েট হিসেবে কবিতা-বিষয়ক বক্তৃতা করেন। ১৯৬৮-৬৯ ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ওয়েসলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিটিং পোয়েট ও লেকচারার পদে বৃত হ'ন। ১৯৭১ থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন।

বিভিন্ন সময়ে লেখা এই কবির একগুচ্ছ কবিতা হাতে এসেছে।' নিঃসন্দেহে, সাম্প্রতিক ইংরেজী কবিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রাসঙ্গিকতায় টনি কোনর একজন ব্রাত্য। কবিতা পড়লে মনে হয়, জীবন ও শিল্প দুই-ই কবির কাছে খুব জরুরি। কবিতাকে তিনি ডেকরেটিভ্ আর্ট মনে করেন না এবং স্বভাবতই সাহিত্যে কলাকৈবল্যে তাঁর বিশ্বাস নেই। কিছুটা খাপছাড়া, বাউণ্ডুলে মানসিকতা, যা শুধু কবির কাছেই প্রত্যাশিত, তাঁর কবিতার পঙ্ক্তিগুলিতে সহজেই চোখে পড়ে। অনুপুঙ্খ শব্দের চাতুরীতে গাঁথা চিত্রকল্পের পরম্পরায় চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে পারেন এই কবি। বর্ণিতব্যকে হুবহু আবহমণ্ডলে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসেও তিনি সফল। কোনরের কবিতা পাঠ করলে তাঁর দুই শালপ্রাংশু পূর্বসূরি, এলিয়ট এবং পাউণ্ডের চেয়ে মার্কিনী কবি রবার্ট ফ্রষ্টের কথাই বেশী মনে পড়ে।

টনি কোনরের কবিতার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, তিনি নিরুচ্চার শব্দে সোচ্চার বক্তব্য বুনে ফেলতে পারেন অনায়াসে। কবিতার জন্য আলাদা কোন বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট থাকে না, কবি জানেন। তাই গার্হস্থ্য জীবনের টুকিটাকি দুঃখসুখ, শৈশবের ফেলে-আসা স্মৃতি এবং বিবাহ এবং জাতির সেবা—সবকিছু নিয়েই গড়ে ওঠে কবিতা। একটি পূর্ণাবয়ব কবিতার শরীরে শব্দের আপাত বৈভব নেই, আছে প্রকৃত আধুনিক মানের উৎকৃষ্ট সহজধর্মিতা। যা স্বাভাবিক ও সহজ তার নিজস্ব একটি শক্তি থাকে। এবং সেই অর্থে টনি কোনর শক্তিমান কবি।

'Flights' কবিতাটির বিষয়বস্তু ফেলে-আসা শৈশবের স্বর্ণময় দিনগুলির রোমন্থন এবং শৈশবকে হারিয়ে ফেলার হা-হুতাশন। বস্তুত, শৈশবের সারল্য, গোপনতা ও সহজলভ্যতা ক্রমে যৌবনে কবিকে পঙ্গু করে, চলৎশক্তি রহিতও করে দেয়। যে-কবি তাঁর শৈশবে মাটি থেকে মাত্র আট ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেখেছেন জীবন, সকলের আড়ালে শুনেছেন বহু কলহ ও কথোপকথন এবং কখনই যে-সব অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক মনে হয় নি, সেই-কবি মধ্য জীবনে উপনীত হয়ে বলেন

In mid-life I neither fly
nor receive the frustrated dead
The days are women's bakeing smells,
and the demanding cries of children

অথবা খুব সহজ করে কোনর বলেন যে শৈশবের সেই 'gift of flight' বয়স বাড়লে কেমন উধাও হয়ে চলে যায়, যৌবনকে ফেলে রেখে যায়, অশক্ত, দুর্বল, 'Youth crippled the gift somewhat' বা 'By eighteen I could not rise at all' পঙ্‌ক্তি দুটি হতাশ্বাসের ভারী সবল স্বীকৃতি মনে হয়।

পিতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 'A death in the family' কবিতাটিতে সংবেদনশীল কোনরের পরিচয় মেলে। নিপুণ এবং গোছানো শব্দের বেড়া দিয়ে ঘেরা কবিতাটিকে খুব আধুনিক ছোটগল্পের মত মনে হয়। 'End of the world' কবিতার শুরুতেই চমকে উঠি

The world's end came as a small dot
at the end of a sentence.

হঠাৎ একদিন ঈশ্বর সমাহিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন 'I do not love you' পৃথিবীর মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই অপ্রেম একদিন পৃথিবীকে হঠাৎ নিশ্চিহ্ন করে। কিন্তু কবির মনে হয় যে অমন নিষ্ঠুর ঘোষণার মুহূর্তে ঈশ্বরের কণ্ঠও কম্পিত ছিল। পৃথিবীর ভয়ঙ্কর শূন্যতার বর্ণনায় কবি লেখেন

no softening tact, no lover's cant
but sudden vacuum, total eclipse
at sense and meaning.

এখানে lover's cant এবং total eclipse শব্দ দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শূন্যতার বর্ণনায় অসাধারণ বলে মনে হয়।

'A Face' কবিতায় দোকানের জানলায় ঝুলে-থাকা একটি বিচিত্র মুখ কবির সত্তাকে আলোড়িত করে:

Then there's its passionate life
Which I'm sure I 'll never know
How it behaves in private
When I forget it in grief,
anger, terror, pity, joy
or feeding an appetite

স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত এইসব অনুভূতির কথা কবির জোবালো অথচ নম্র আঙ্গিকের মধ্যে ধরা পড়ে গভীর দ্যোতনায়।

টনি কোনরের কবিতার জন্ম হয় তাৎক্ষণিক অনুভবের চকিত মুহূর্তে, আহৃত আবেগের বিলম্বিত রোমন্থনে এই কবির বোধহয় আস্থা নেই। কবিতার আগমনে কোনো আবাহন নেই, ঢাক-ঢোল পেটানো উৎসব-বর্ণাঢ্য নেই, (এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবিরুল ইসলামের একটি কবিতা 'কবিতা যখন আসে, আসে: / কোনো আবাহন নেই গাড়ি জুড়ি নেই / অদূর দুয়ারে কেউ প্রস্তুত থাকে না / বাজে না রাত তিনটের অ্যালার্ম / কিংবা নোটিশ নেই এক-মিনিটেরও· ·) তবে, ঋদ্ধি, সংহতি, ধ্বনি-গৌরব, ভাবনা-দ্যোতনা বা চিত্রকল্প-অনুষঙ্গে কোনর এখনও তাঁর সাধনার সিদ্ধিতে পৌঁছোন নি। বিশেষত, সম্প্রতিকালে তিনি দীর্ঘ এবং জটিল মননের কবিতা লিখছেন যখন

তখনই বড মাপের ব্যাপ্তিতে নিজের সীমাবদ্ধতা হারিয়ে ফেলছেন। কিন্তু কবি হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবন-পঞ্জী দেখলেই বোঝা যায়, বাস্তবতার বহু দুর্গম উপল-খণ্ড পেরিয়ে শুধু কবিতার জন্যেই বেঁচে আছেন এই কবি। তাই তিনি সত্যবাদী, সোজা-সরল মানুষ। জীবনের কথা বলতেই ভালবাসেন।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, এ যাবৎ (১৯৬২ থেকে) টনি কোনরের আটটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। অন্য একটি নর্মান নিকলসনের সঙ্গে যৌথভাবে। কবিতা লেখা ছাড়াও মাঝে মধ্যে নাটক লেখেন এবং অনুবাদ করেন। ফ্রান্সিস ফোড নামক এক মহিলাকে ১৯৬ তে বিয়ে করেন। বর্তমানে এঁদের তিনটি সন্তান। চুয়াল্লিশ, ব্রেনার্দ অ্যাভিনিউ, মিডল্‌টন, কানেকটিকাট, শূন্য ছয় চার পাঁচ সাত, ইউ এস এ—এই ঠিকানায় বর্তমানে বসবাস করেন। ব্রিটেনে তাঁর কবিতা এখনও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য মনে করা হয় যে টনি কোনর সেই শ্রেণীর কবি যিনি 'now bringing new life to English Verse' (Saturday Review, 1968) এবং 'undoubtedly one of the best and most authentic of recent British Poets (Poetry, January, 1969)। ব্রিটিশ কাউন্সিল এমন আরও অনেক কবিদের কলকাতার কাব্যপিপাসু মানুষের মুখোমুখি নিয়ে আসুন, আমাদের আবেদন। কেননা, কবিতার তো কোন সীমান্তরেখা নেই।

অনুপ মতিলাল

কয়েকজন তরুণ কবি

অশোক সেনের দ্বিতীয় কবিতার বই 'মানুষ বড় রতন রে'—নামের মধ্যে দিয়ে কবির বক্তব্য স্পষ্ট। অশোকের অন্বিষ্ট শুভ্র অমলিন নিষ্পাপ জীবন। তবু চাওয়া পাওয়ার মধ্যে কোন মিল নেই—চাওয়া পাওয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। ফিরতে হয়—অশোক লেখেন' পারিজাত কবে ফুটবে মা? / আমি জানতে চাই / তুমি দরজা খোলো / অন্য একটি কবিতায় অশোক জড়িয়ে ধরতে চান নিবিড় মমতা দিয়ে। অশোক বলেন 'দ্যাখো এই হাতে কোন পাপ নেই'। অশোক ফিরে আসেন নিজের গভীরে যেখানে কোন পাপ নেই। অশোক লেখেন—'বাউল হে গান ধরে / হিংসা থাকে একমাস / আমরণ থাকে শুধু উষ্ণতা প্রণয়'। অশোক আবার আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'সমর্পণের হাত মেলেছি আমি / ভালোবাসার দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরো'।

অশোক তাঁর দ্বিতীয় বইয়ে প্রতিশ্রুতির চিহ্ন রেখেছেন। আশা করব তিনি ভবিষ্যতে লিখবেন।

'শব্দের শরীর' কৃষ্ণা বসুর প্রথম কবিতার বই। কবি কখনও চলে গেছেন 'হিরণ্ময় নদীর কিনারে' অথবা 'অরণ্যে আদিমতায় আমাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যায় / সেই মধ্যরাতের সর্বনাশা চাঁদ' কিংবা রক্তের গভীরে অনুভব করেছেন নিষ্পাপ বালকের কথা। কবিতার শব্দ সযত্ন নির্বাচিত। কবিতার মধ্যে তাঁর ভাবনা অনায়াসে বিচরণ করে। তাঁর চোখে 'স্মৃতি এক আশ্চর্য্য কাবুলী। অতীতের থেকে উঠে আসে। কবি বলেন, 'তার নষ্ট ঋণ কোনদিন শোধ হয় না। শুধু সুদটুকু নিয়ে চলে যায় একক আধারে—অতীতে।

কবি শীতল চৌধুরীর প্রথম কবিতার বই 'একাকী অলৌকিক ক্রন্দন'। কবির কবিতায় বিষাদ, বেদনা এবং প্রেম প্রভৃতি এসেছে। কোন কোন কবিতায় এক রহস্যময়তা এসেছে—'বাঁশি' কবিতাটি। শীতল লিখেছেন, 'ছিন্ন দুপুরে বাঁশি বাজে / কার বাঁশি? প্রথমে যে প্রশ্ন কবিতার শেষে আবার সেই প্রশ্ন ঘুরে এসেছে। কবিতাটি পড়বার পর বুকের গভীরে এক ধরণের তীব্রতা

আনে। শব্দচয়ন এবং চিত্রকল্প রচনায় কবি খুবই সচেষ্ট। 'পদচ্ছায়া' কবিতাটির আরম্ভে আমাদের ধাক্কা দেয়। 'চলে যাচ্ছে আমার শব্দের ধনুক ও ব্রহ্মজ্ঞান / চলে যাচ্ছে আমার ময়ূরপুচ্ছ পালক ও স্রোত / চলে যাচ্ছে আমার ত্রিকালের বাঁশি ও সামগান / কবিতাব শেষে ভাঙনের ছায়া—'ভাঙছে তিল তিল করে ধ্বসে পড়ছে। আমার মেরুণ ঘর চিত্রিত জানালা'।

'সন্নিকটে যাব কবে' কবি হিমাদ্রি দত্তব প্রথম কবিতার বই। বাবোটি কবিতা বইটিতে আছে। হিমাদ্রির কবিতায় জড়িয়ে আছে বোমান্টিকতা আবাব রাজধানীব জীবনেব রুদ্ধ জটিল বিষাদ ও বেদনা। হিমাদ্রির কবিতায় বৈচিত্র্য আছে। তাঁব 'শোক' কবিতাটি পাঠককে বিষাদে আচ্ছন্ন করে। হিমাদ্রি লেখেন 'আলজিভ চাপা দিয়ে, বেড়ে ওঠে হাসপাতালেব সফেদ পাঁচিল ? / ভিতরে সাদা চাদব মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, পঁচিশ বছর যুবকের হুঙ্কার ধ্বনি / এমন কেউ কি নেই কাছে পিঠে, কপালে যে হাত রেখে / বলে ওঠে—নদীর পাড়ে বৃষ্টি পড়ে এখন একটু ঘুমো। সরু জলের মত এক চাপা শোক / ইদানীং প্রতিটি বিকেলে গড়ায় বুক থেকে সমস্ত শরীর—কবিতাটি এক ধরণের রোমান্টিক হাহাকারে ভেঙে পড়ে। হিমাদ্রি অনুভূতির আরো গভীরে গিয়ে আমাদের আবো কবিতা শোনাবেন আশা করব।

পববর্তী আলোচিত কবিতার বই কোনো একজন কবির নয়। দশজন কবির কবিতা নিয়ে সংকলন—'দশজন কবি।' সম্পাদনা করেছেন কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী। এই বইয়ের প্রথম কবি শম্ভুনাথ হাজারী। তাঁর কবিতাব নাম 'রূপতীর্থ।' দীর্ঘ কবিতা। মিলযুক্ত। ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে তিনি কবিতার রূপ দিয়েছেন। দ্বিতীয় কবি ছদ্ম নামে লিখেছেন—তীর্থপথিক নামে। তাঁর কবিতায় রয়েছে আধ্যাত্মিকতা, দর্শন এবং প্রেম। কবিতাগুলো পাঠকের ভাল লাগতে পারে। ভাল লাগবে 'বাজাও এবার বাজনা বিসর্জনের কবিতাটি। এই বইয়ের পরবর্তী কবি বিশ্বনাথ ঘোষাল। আধুনিক কবিতার মেজাজ, সুর এবং শৈলী বিশ্বনাথ ঘোষালের কবিতায় অনুপস্থিত। তাঁর কবিতা স্পষ্ট এবং তাঁর বক্তব্যও সোজাসুজি। এরপর চিন্ময় কুমার মজুমদার। চিন্ময়ের কবিতার স্নিগ্ধতার জন্য ভাল লাগবে। এঁর পরে স্থান পেয়েছে গোপাল চন্দ্র পোদ্দারের কবিতা। তাঁর কবিতার মূল সুর প্রেম। সহজ, প্রগাঢ় ও তীব্র তার

কবিতাগুলোর আবেদন অনস্বীকার্য। বরুণ চক্রবর্তীর সাতটি কবিতার সুর বিদ্রোহের আগাছা উপড়ে ফেলে নতুন দিনের। এর পরের কবি সুপ্রিয় গুহঠাকুরতার সুরে বাস্তবতা, নতুন দিনের জন্য। তাঁর কিছু কিছু কবিতায় প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল চিহ্ন বর্তমান। কান্তিপ্রকাশ গুপ্ত পরের কবি। ভাল লাগবে 'নিষ্প্রতীক অভিমান শ্রাবণে শ্রাবণে' বা ভবিতব্য নদী ও কবিতার স্নিগ্ধ সুর। সমসাময়িক ঘটনায় চিত্রাংকণ করার ক্ষমতা আছে। এরপরে পৌষালী পোদ্দারের কবিতা। গ্রাম বাংলার নদী, খাল বিল তাঁর কবিতায় এসেছে। কবিতাগুলো নরম ও স্নিগ্ধ। তবে আশা করব জীবনানন্দর প্রভাব অতিক্রম করে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন। সব শেষে সম্পাদক কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরীর কবিতার আলোচনা। তাঁর কবিতা স্পষ্ট অথচ স্নিগ্ধ। 'বুদ্ধদেব বসু' কবিতাটি আন্তরিকতায় উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ। 'আদর্শ' কবিতাটিও উল্লেখ করবার মত।

প্রদীপ মুন্সী

শিল্পী ত্রিভঙ্গ রায়

চিত্রশিল্পী, শিশু-সাহিত্যিক ও মৃৎশিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ত্রিভঙ্গ রায়। বর্ধমান জেলার বনপাস গ্রামের কামারপাড়ায় ১১ আশ্বিন ১৩১৩ সালে জন্ম। পিতা রোহিনী কুমার রায়, মাতা ভদ্রা দেবী। বালক ত্রিভঙ্গের গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া সুরু হয়। শৈশব থেকেই আপন মনে মাটি দিয়ে দেব-দেবীর মূর্ত্তি গড়া ও রং তুলি সাহায্যে পট লেখা তার নিত্য কর্ম ছিল। বালকেব হাতের কাজ দেখে একসময শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব (অগ্নিযুগেব যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়) খুবই মুগ্ধ হন এবং অবসর পেলেই চন্না আশ্রমে যেতে বলেন। পাঠশালাব পডা শেষ কবে বোলপুর স্কুলে ভর্ত্তি হন। স্বামীজিব নির্দেশ মত ড্রইং ও ছবি আঁকায় মননিবেশ কবেন। কিছুদিন পব স্বামীজির একান্ত চেষ্টায তাঁর অনুরাগী উত্তর কলিকাতা নিবাসী জীবনতারা হালদার মহাশযেব নিকট ত্রিভঙ্গবাবুকে পাঠান। হালদার মদাশয়ের সঙ্গে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব মেজদাদা সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব জামাতা সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়েব বিশেষ পবিচয়। ত্রিভঙ্গবাবু সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আলাপ কবিয়ে দেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বালকেব আঁকা ছবি ও ড্রইংগুলি দেখে মুগ্ধ হন এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান (ইং ১৯২৮ সালের শেষ দিকে)। ত্রিভঙ্গ রায়ের হাতের কাজ দেখে শিল্পীগুরু উৎসাহ দেন ও জোড়াসাঁকোয় আসতে বলেন। তাবপব থেকে চলল তাঁব শিক্ষা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে। এই ভাবে কয়েকমাস শিক্ষার পর ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ষ্টুডিও ঘরে ঢুকেই শিল্পীগুরুর নজর পড়ল একখানি ছবি "রাহুলের পিতৃধন প্রার্থনা"। ছবি দেখে অবনীন্দ্রনাথ খুশি হলেন। অবনীন্দ্রনাথ তরুণ শিল্পীকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্টাল আর্টসে শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। অল্পদিনেই তিনি ভারতীয় শিল্পধারায় ছবি এঁকে শিল্পরসিকদের প্রশংসা লাভ করেন। বহু চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্বর্ণ-পদক লাভ করে।

বাল্যবস্থা থেকেই ভারতীয় দেব দেবী সম্বন্ধে—পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ পড়া ও জানার আগ্রহ ছিল। শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করে বহু ছবি এঁকেছেন। ছবি আঁকার সঙ্গে সাহিত্য চর্চাও করতেন।

পরবর্তীকালে তিনি লেবেল ডিজাইন, বই এর প্রচ্ছদপট, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি নানা ধরণের কাজ করতেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে সাবলিল রেখার মাধ্যমে ছবির বিষয়গুলি (illustration) রূপায়িত করায় তিনি অশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এসময় লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' সজ্জার অন্যতম সদস্য শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই চেষ্টায় দীর্ঘদিন বম্বাইতে চলচ্চিত্র ব্যবসায়িদের তাগিদে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সাজসজ্জার ডিজাইনের কাজ করে প্রশংসা লাভ করেন। চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তায় ত্রিভঙ্গবাবু কানপুর যান। সেখানে সিংহানীয়াদের দেবালয়গুলির দেওয়ালে তাঁর আঁকা ফ্রেসকোর কাজগুলি স্মরণীয় করে রেখেছে। মার্বেল পাথরের উপর বিভিন্ন রং এর পাথর সেট করে ঐ ছবিগুলি তৈয়ারী করা হয়েছিল। অবসর পেলেই অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন পদ্ধতিতে ওয়াশের ছবি আঁকতেন এবং পূজা-অর্চনার জন্য মাটি সাহায্যে দুর্গা প্রতিমা, সরস্বতী, বুদ্ধ, বালগোপাল ও রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি তৈয়ারী করারও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ত্রিভঙ্গবাবুর আঁকা ছবি ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ও বিভিন্ন ব্যক্তির সংগ্রহে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শশালাতে তার আঁকা কয়েকখানি ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে।

চিত্রশিল্পী ছাড়াও শিশু সাহিত্যিক হিসাবে ত্রিভঙ্গবাবুর পরিচিত রয়েছে। রূপকথা, গৌতম বুদ্ধ, রাঙাদির রূপকথা, ছুটির চিঠি, বাঙালা মায়ের রূপকথা ইত্যাদি লেখার রূপকথার গল্পগুলি পড়ে 'ঠাকুমার ঝুলি' প্রণেতা শ্রদ্ধেয় দক্ষিনা-রঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয় লিখেছিলেন, 'তাহার লেখার মধ্যে রূপকথার স্বাদ পাই।'

'অমৃত' সপ্তাহিক পত্রিকায়—১১শ বর্ষ ২৮ সংখ্যা-২রা অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ থেকে ১১শ বর্ষ ৫০ সংখ্যা—৮ই বৈশাখ ১৩৭৯ পর্যন্ত, মোট ২৩টি সংখ্যায়—"সংলাপে অগ্নিযুগ স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীমদ স্বামী নিরালম্ব)"

রচনাটি থেকে অগ্নিযুগের অনেক নেপথ্য কাহিনী জানতে পারা যায়। শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ত্রিভঙ্গ রায় ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬, ৭৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

নির্মল দে

রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার আর্ট গ্যালারী

রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার জন্মলগ্ন সূচিত হয়েছিল ১৯৬১ সনে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রাক্কালে একটি মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হল—রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গত দু'শ বছরের সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থ ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ও নবজাগরণের বিষয়কে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে বাস্তব ঐতিহাসিক গুরুত্ব সহকারে সশ্রদ্ধ ভাবে তুলে ধরা। রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালা কর্তৃপক্ষ গত আঠারো বছর ধরে সেই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার সযত্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

গত আড়াই বছর ধরে দু'শ বছরের জীর্ণ এই ঐতিহাসিক গৃহকে অনেক চিন্তা, অধ্যাবসায় এবং সরকারী অর্থানুকূল্যে সংরক্ষণ করার সাধ্যাতীত চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই সংরক্ষণ কালের ফাঁকে ফাঁকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রদর্শশালা কর্তৃপক্ষ এখানেই গত ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতার আধুনিকতম আর্ট গ্যালারীর উদ্বোধন নিষ্পন্ন করলেন।

আর্ট গ্যালারী প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্যায়ের সংরক্ষণ কর্ম হল—দীর্ঘ আঠারো বছর যাবৎ সংগৃহীত শিল্পকলার নিদর্শনগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ দান করা। এজন্য ল্যামিনেশন, লাইনিং, বিজ্ঞান সম্মত পুনরুদ্ধার এবং ফিউমিগেশন সবই ব্যাপকতম পর্যায়ে এদেশে প্রথম করলেন এই প্রদর্শশালার ব্যবস্থাপকগণ। তাঁদের তৃতীয় পর্যায়ের সংযোজন হল—প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রিত মিশ্র আলোর ব্যবহার, ইনকানডেসাণ্ট ও

ফ্লুবাসেণ্ট আলোক বীক্ষণকে এদেশে প্রথম মিশ্রিত প্রয়োগ মূল্য দেওয়া হল আলোর প্রতিপালনকে নিবপেক্ষ করে।

আলোব এবংবিধ প্রক্ষেপণের ফলে শিল্প সম্পদের জীবন দীর্ঘ করা ও বর্ণ বিভ্রম পরিহাব করার ক্ষেত্রে স্বতোৎসারিত সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হয়েছে। চতুর্থ সংযোজনটি হল—প্রদর্শিত চিত্র বস্তুর স্রষ্টাদের দ্বিভাষিক জীবন পঞ্জী বচনা। এ জাতীয় প্রচেষ্টা কোন সংগ্রহশালার পক্ষে এই প্রথম বলে মনে করা হচ্ছে। পঞ্চমত, আধুনিক বাঙ্গলার তথা ভারতীয় চিত্রকলার দ্বি-স্তর ক্রিযাকলাপ দর্শন ও অধ্যয়নের সুযোগ সীমিত পবিধির মধ্যে এই প্রথম হল।

এই দ্বি স্তর পর্যাযে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার বিন্যাস করা হয়েছে ঐতিহাসিক, গৃহগত, শিল্পগত ও শিল্পীগত গুণানুসারে।

একদিকে দেখানো হয়েছে জোড়াসাঁকোর কৌলিক গৌরবকে প্রায় অদর্শিত গিরীন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমবেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রবোধেন্দুনাথ, সুনয়নী দেবী, প্রতিমা ঠাকুর, সুভো-ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ, ব্রতীন্দ্রনাথ, অলোকেন্দ্রনাথ প্রভৃতির জলরং, প্যাস্টেল, ক্রেয়ন ইত্যাদি মাধ্যমে অঙ্গিকগত রচনার মধ্য দিয়ে। এই সব রচনায় এককালে ষ্টাডির গুরুত্ব বা পরবর্ত্তীকালে সৃজনমূলক কম্পোজিশনের বা বস্তুনিরপেক্ষ বিষয় বা আধুনিক চিন্তাব সংযোগ ও বিক্রিয়া কিভাবে একটি পরিবারের মধ্যে সম্বলিত হয়েছে এবং কিভাবে সেই পারিবারিক প্রভাব একটি জাতিব শিল্পকলার জাগরণে সহায়ক হতে পেরেছে তা অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাবে পরম্পরা রক্ষা করে সজ্জিত করা হয়েছে। এই পরিবারের প্রভাব নিয়ে বা নিজস্ব চেষ্টায় যাঁরা বাঙ্গলা তথা ভারতীয় চিত্রকলাকে নতুন সম্পদ দান করেছেন তাঁদের অনেকেরই প্রতিনিধি-মূলক চিত্র এই শাখার অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে রয়েছেন অসিতকুমার হালদার, মুকুলচন্দ্র দে, নন্দলাল বসু, সুবেন্দ্রনাথ কর, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ ঘোষাল, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ পাল, প্রশান্ত রায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ত্রিভঙ্গ রায়, সুশীল সেন, কমলারঞ্জন ঠাকুর ও প্রিয়প্রসাদ গুপ্ত, এই শাখার আধুনিক সংযোজন হয়েছে নীরদ মজুমদারের চিত্রে।

অত্যাধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম আন্তর্জাতিক শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জন্ম

একটি পৃথক কক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে আছে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত রচিত ২৭ খানি চিত্র। অসাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষণাক্রান্ত এই সাতাশ খানি চিত্র।

হিরণ্ময় রায় চৌধুরী, সুধীর খাস্তগীর ও রামকিঙ্কর বাইজের চারখানি ভাস্কর্য নিদর্শন প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য ধারার চিত্রকল্পশাখায় টমাস রুডস্, এ, এস, হ্যারিস, উইলিয়াম বিচী, ব্যারণ ডি সুইটার, জেমস্ আর্চার, জর্জ বিনেরী, প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য শিল্পী, সৌতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পরেশনাথ সেন, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের অসাধারণ সব প্রতিকৃতি চিত্র এবং মূলতঃ ঠাকুরবাড়ীর যৌথ প্রতিকৃতির সংগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে।

সমব ভৌমিক

কবিতা, কবিতা-বিষয়ক ও অন্যান্য

কাব্যগ্রন্থ

মলযশংকর দাশগুপ্ত	বাঘাম। বুক ট্রাস্ট, ৩০/১বি কলেজ রো, কলিকাতা ৯। টা ১ ০০
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায	ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে। প্রকাশক সুভাষ ভদ্র। ২৪/১ ক্রীক রো, কলকাতা ১৪। ৩০ পয়সা
কালীকৃষ্ণ গুহ	এক বছরের সামান্য কবিতা। প্রকাশক: গৌতম সেনগুপ্ত ২/এল কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা ১৯। টা ১ ৫০
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	নিরন্ত নিরিখ। প্রজ্ঞা, ৭৭/১ মাহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯। টা ৫ ০০
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়	পিকাসোর নীল জামা। দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ৫ ০০
উত্তম দাশ	জ্বালামুখে কবিতার। কবি ও কবিতা, ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। টা ৫·০০
দেবপ্রসাদ ঘোষ	জর্নাল ও অন্যান্য কবিতা। পূর্বাশা, ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা ৯। টা ৫ ০০
সামসুল হক	সোনার ত্রিশূল। ইণ্ডিযানা, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ৫ ০০
মঞ্জুজেশ মিত্র	কেন প্রতিধ্বনি। পথিকৃৎ, ৭ যতীন বাগচী রোড, কলকাতা ২৯। টা ৩ ০০
বাপী সমাদ্দাব আলোক সোম বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী	চরাচর, আমাদেব। প্রকাশক নব শ্রী, দেউলপাড়া, নৈহাটী। টা ৫·০০

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	:	খিলানের শাদা অহংকার। মহাপৃথিবী, ১১ ঠাকুরদাস দত্ত ১ম লেন, হাওড়া। টা ১ ৫০
কমলেন্দু দাক্ষিত	:	মধ্যরাত্রে শেষ নৌকো। অনন্ত প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ৫·০০
জীবন গঙ্গোপাধ্যায়		কবিতার বুকেই। এষা, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা ৮৪। টা ১·০০
দীপা চক্রবর্তী	.	প্রিয় শব্দ প্রিয় কবিতা। প্রকাশক সৈকত হাজরা, ৫, কে এল. চাটার্জি স্ট্রীট, বেলুড় মঠ, হাওড়া। টা ১·১০
রাজকুমার রায়চৌধুরী	·	নগ্ন শাদা হাড়। বাল্মীকি প্রকাশনী, ৩৭ কালনা রোড, বর্ধমান। টা ২·০০
হিমাংশু জানা		প্রতিশ্রুত নই। বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা ৯। টা ৩ ০০
শৈলেনকুমার দত্ত		অমৃতে অথৈ। পত্রমিতা, ৫৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। টা ১·০০
Sibnarayan Ray (ed)		Vak An Anthology of Poems and Translation, Writers Workshop, 162/92 Lake Gardens, Calcutta 45 Rs 20 00
সন্দীপ ঠাকুর এইকো ঠাকুর সুশান্ত বসু (অনু)		কোটি পাতার ছন্দ · জাপানী কবিতাগুচ্ছ। রূপা, ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। টা ১৫·০০

কবিতা-বিষয়ক

সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী	:	নবীনচন্দ্রের কাব্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা ৬। টা ১৫·০০
Sibnarayan Ray	:	Apartheid in Shakespeare and Other Reflections, United Writers. 70/2 Beliaghata Main Road, Calcutta 10, Rs. 45·00

অন্যান্য

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় : শরৎ সাহিত্যের স্বরূপ। রূপা, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১৩। টা ১৮.০০

অরুণ ভট্টাচার্য . ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস। উত্তরস্থরি প্রকাশনী, প্রাপ্তিস্থান : ইণ্ডিয়ানা ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১৩। টা ৪৫ ০০

মানসী দাশগুপ্ত : ভেলা। পথিকৃৎ, ২৪ পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা ২৯ টা ৬.০০

অমিতাভ ঘোষ শান্তিনিকেতনের শান্তিদেব। বিশ্ববীণা, ৩/১ পঙ্কজ-মল্লিক সরণি, কলকাতা ১৯। টা ১০ ০০

য়াসুনারী কাওয়াবাতা : তুষার গ্রাম। সন্দীপ ঠাকুর (অনু) রূপা, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১৩। টা ৬.০০

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিন্টসিথ ১১৬ বিবেকানন্দ রোড কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

UTTARSURI 109 Vol. 28 No. 1 Rs. 3·00

মধুমেহ

(ডায়াবিটিস)

মধুমেহ যা ডায়াবিটিস নামে পরিচিত, দেহে ক্লোমগ্রন্থী বা প্যানক্রিয়াসের স্বাভাবিক ক্ষরণ কোন কারণে ব্যাহত হলে এই রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এই অবস্থায় রক্তে শর্করার ভাগ বৃদ্ধি পায়, সেজন্য খাদ্যে মিষ্ট দ্রব্য নিষিদ্ধ হয়ে থাকে।

কিন্তু ডায়াবিটিক রোগীগণ মিষ্ট আস্বাদের জন্য অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে মিষ্টতাকারক কয়েক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ভাবিত হয়েছে। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ মিষ্টান্নে ব্যবহার না করে এক প্রকার শর্করা যা মিষ্টিফলে পাওয়া যায় অনুরূপ শর্করা দিয়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ব্যবহার সর্বপ্রথম কে. সি দাশের সংস্থা প্রণয়ন করে। এই শর্করার বিশেষত্ব যে খাওয়ার পর পরিপাক হয়ে রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রণ হতে অনেক দেরী হয়, সেজন্য এই অবসরে শরীরে দগ্ধ হয়ে কতকটা নিশ্বাসের সঙ্গে বাহির হয়ে যায় এবং কিছুটা অন্ত্রনালী দিয়ে নির্গত হয়ে যায়। রক্তে সেজন্য শর্করার আধিক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

মিষ্টান্নে ইহার প্রয়োগ সেণ্ট্রাল ফুড ল্যাবোরেটরি দ্বারা অনুমোদিত।

●

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

১১ এসপ্লানেড ইষ্ট

কলিকাতা

Regd. with the Registrar of Newspapers for India R. N. 8571/57

কবিতা পড়ুন

মনীন্দ্র রায় (১৯১৯-)

তবু কুমোরের মত শিল্প স্নাত চেতনা আমার
কাঠামোয় খড় বাঁধে, তাল তাল বোবা মাটি ছেনে
মূর্তি গড়ে। কেননা জীবন এক ধৈর্যময় গবেষণাগার—
বিশাল কয়লার খাদে হীরা রেখে যে বলে বেছে নে।

চিত্ত ঘোষ (১৯২০-)

প্রতিধ্বনির পেছনে পেছনে কারা
গোধূলিছায়ার আলোকিত মুখ খোঁজে।
হেঁটে হেঁটে হেঁটে কবে আমি সেই
শুদ্ধ সীমায় যাবো।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২১-)

হঠাৎ কালো হাওয়ায় তাজ কিসের গুঞ্জন।
যন্ত্রে যদি মেলাই হাত মেলায় হাত মন,
কিসের গুঞ্জন।
স্তব্ধ মেঘ লক্ষ বুকে হৃদয় দেয় শোধ।
যন্ত্রণায় যুদ্ধ। প্রতিরোধ।

জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-)

গুলমোরের হলুদ ছড়ানো এভেন্যুয়ে
আর্ট স্কুলের তরুণ ছেলেটি
যতক্ষণ রোদ ছিল আকাশের ছাদে
দেখেছে দুচোখ ভরে যতদূর দেখা যায়
বুনো পারাবত ওড়া—
শাস্তাদির আত্মার মতন॥

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

পুঁথি পরিচয় ১-৪	পঞ্চানন মণ্ডল	টাকা ৯৫·০০
রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয় ১	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৫·০০
রবীন্দ্র রচনা কোষ -৩	চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি	৫১·০০
রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন	সান্ত্বনা মজুমদার	২৩·০০
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ	অমিয়কুমার সেন	৬·০০
স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য	পশুপতি শাশমল	৩৪·০০
আধুনিক ওড়িয়া কাব্যধারা (নবজাগরণ যুগ)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৪৫·০০
চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা	ভি. ভি. ওয়াজেলওয়ার	১২·০০

The Decline of Buddhism in India	R. C. Mitra	Rs. 24 00
Introduction to Parsee Religion, Customs & Ceremonies	Madhusudan Mallik	12·00
Religious Movements in Modern Bengal	Benoygopal Roy	10 50
Indian Art and Aesthetics	H. Mitra	35 00
Poetry of Yeats	S C Sen	12 00
A Study of Universals	S. Sen	30 00
Charyagitikosha	P C. Bagchi & S B Sastri	15 00
Asvaghosa . A Critical Study	B N. Bhattacharya	60 00
Rasacandrika I II	S. N Ghosal	27·00
Tagore's Educational Philosophy	S C Sarkar	7 50

VISVA-BHARATI RESEARCH PUBLICATIONS
COMMITTEE, SANTINIKETAN
PIN - 731 235

উত্তরসূরি ১১০/১১১

জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতার দুই প্রধান কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য একত্রে ৪টি কবিতাগ্রন্থ পরপর বাঙালী পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন।

১. হাওয়া দেয় (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ)

২ প্রেমের কবিতা

৩ নিসর্গ বিষবৃক্ষ

৪. প্রতিবাদের প্রতিরোধের কবিতা

কবিদের স্ব-নির্বাচিত এই ক'টি কাব্যগ্রন্থে বাঙালী পাঠক শতাব্দীর হতাশা-যন্ত্রণা, আলো, অন্ধকার, বিশ্বাস ও প্রতিরোধের কবিতা পাবেন যা একালে যেমন, চিরকালীন কাব্যের দরবারেও তেমনি স্থির আসন লাভে সমর্থ হবে।

প্রচ্ছদ মলযশংকর দাশগুপ্ত॥

উত্তরসূরি ॥ ৭বি ৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

ইণ্ডিয়ানা ॥ ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

দি বুক হোম ॥ ৩২ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

এক দশক পর

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো:

মলযশঙ্কর দাশগুপ্তের

কাব্যগ্রন্থ

পাখি জানে

প্রচ্ছদ। রঘুনাথ গোস্বামী

দাম। ৬'০০

প্রাপ্তিস্থান: উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলি-৭৩

বুক ট্রাস্ট ৩৯/১ বি, কলেজ রো। কলি-৯

নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলি-৭৩

প্রাহিনী প্রকাশনী। ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

অদ্বৈতবাদের প্রাচীন কাহিনী : স্বামী বিদ্যারণ্য ॥ ১৫.০০
আর্য্য মঞ্জুশ্রী সাঙ্গিতী ॥ সম্পাদনা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ॥ ১৫.০০
বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ড নরেশচন্দ্র জানা ॥ ১৫.০০
চণ্ডীমঙ্গল রামানন্দ যতি বিরচিত : অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১৫.০০
দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা : শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ২০.০০
এগারটি বাংলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্য নিদর্শন সম্পাদনা . অমরেন্দ্রনাথ রায় ॥ ৬.০০
গোপীচন্দ্রের গান ॥ সম্পাদনা . ড আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ ১০.০০
গোবিন্দ বিজয় : ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র ॥ ২৫.০০
জ্ঞান ও কর্ম · গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬.০০
মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতা) ড রমেশচন্দ্র মজুমদার ॥ ৫.০০
মনসামঙ্গল ॥ দ্বারিকা দাস সম্পাদনা · ড বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ॥ ২৫.০০
মহাভারত . কবি সঞ্জয় বিরচিত । ড মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ ॥ ৪০.০০
মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাট্য সাহিত্যের অবদান . যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ ৩.০০
মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল দিলীপকুমার রায় ॥ ৫.০০
মৈমনসিংহ গীতিকা · ড দীনেশচন্দ্র সেন ॥ ২০.০০
রাজা রামমোহন সম্পর্কে অরবিন্দ গুহ ॥ ৩.০০

●

প্রকাশন বিভাগ
৪৮, হাজরা রোড
কলিকাতা-১৯

বিশেষ সুযোগ

১৩৮২ সালের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে সাধারণ ক্রেতাদের ২০% ও পুস্তক বিক্রেতাদের ৩০% বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে।

১. **আশ্রমের রূপ ও বিকাশ** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা, আশ্রমের শিক্ষা এবং আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—এই তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। নন্দলাল বসু-কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রে শোভিত। মূল্য ১·২৫ টাকা।

২ **কবির ভণিতা** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের 'সূচনা' রূপে মন্তব্যের একত্রে সমাহার। মূল্য ২·৫০ টাকা।

৩. **খৃষ্ট** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে খৃস্টের জীবন ও বাণীর যে-সব ব্যাখ্যা করেছেন ও কবিতা রচনা করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন এই গ্রন্থে সেগুলি সমাহৃত। মূল্য ৩·৫০ টাকা।

৪. **পল্লীপ্রকৃতি** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ দেশের পল্লী-সমস্যা ও পল্লী-সংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী—শ্রীনিকেতনের আশা ও উদ্দেশের ব্যাখ্যা—অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। সচিত্র। মূল্য ৪·৫০ টাকা।

৫. **সঞ্চয়** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধর্মের নবযুগ, ধর্মের অর্থ, ধর্মশিক্ষা, ধর্মের অধিকার ইত্যাদি আটটি প্রবন্ধ। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবির প্রদত্ত ভাষণ। মূল্য ২·৮০ টাকা।

৬ **কুরুপাণ্ডব** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত

বাংলা রচনারীতিতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্যতা—উভয়েরই পরিচয়ের জন্য গ্রন্থখানি উপযোগী। মূল্য ৩·০০ টাকা।

৭. **রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা**

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা, রবীন্দ্র-রচনা এবং রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ রচনা সংগ্রহ। মূল্য প্রথম খণ্ড ১৫·০০, দ্বিতীয় খণ্ড ২০·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয়. ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

English Literature

Oxford Companion to English Literature

Compiled and edited by SIR PAUL HARVEY
revised by DOROTHY EAGLE

Described by *The Times* as 'one of the marvellously useful books which seem to have no right to be as good as they are the right length, the right shape, and remarkably cheap' it is the standard work of reference for all readers of English literature for over forty years, including details of authors, works, plots, characters, European and classical mythologies, critics, obscure allusions, and of literary quirks and fancies Rs 160

Shakespeare : The Globe and the World

S SCHOENBAUM

A great Shakespearean scholar draws on the resources of the Folger Library, the greatest Shakespeare collection in the world, to support and substantiate his reconstruction of Shakespeare's life and times with a colourful display of illustrations of rare books and manuscripts, prints, drawings, scene and costume designs, and a wide range of memorabilia $ 24 95 / $ 9·95

A new addition to our growing CULT series

Doctor Faustus : Christopher Marlowe

Edited by KITTY DATTA

With a long introduction relating the play to the Faustus tradition, Lutheranism, the tradition of diabolism and magic and Calvinism, an overview of the critical issues associated with the play, a glossary of terms, extensive annotations, and appendices reproducing relevant excerpts from the English Faust Book, and textual variants Rs 14 50

Subjectwise stocklists on request

Oxford University Press
P17 Mission Row Extension
Calcutta 700 013
DELHI BOMBAY MADRAS

সম্প্রতি প্রকাশিত

শূদ্রক-বিরচিত

মৃচ্ছকটিক অনুবাদ : শ্রীসুকুমারী ভট্টাচার্য ৯'০০

ধর্মানন্দ কোসম্বীর

ভগবান বুদ্ধ অনুবাদ শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য ১৫'০০

উর্দু উপন্যাস 'এক চাদর ময়ইলি সি'-এর বঙ্গানুবাদ

ময়লা চাদর অনুবাদ শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য ৫'০০

গুজরাতি উপন্যাস—পান্নালাল প্যাটেলের

জীবী অনুবাদ : প্রিয়রঞ্জন সেন ১০ ০০

শ্রীসুকুমার সেনের

বাংলার সাহিত্য ইতিহাস ১৫ ০০

ও

Sunitikumar Chatterji
Scholar and Virtuoso ৫'০০

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র স্টেডিয়াম কলিকাতা-২৯ 46-1399

॥ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন ॥

রাজশেখর বসু'র

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত

মহাভারত (সারানুবাদ) ৪৫'০০

বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ) ৩৫'০০

অপ্রকাশিত রাজশেখর (অপ্রকাশিত রচনাবলী) ৫ ০০

চিত্রিতা দেবী'র

পূর্ণের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ (আলোচনা) ১৫'০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

শরৎচন্দ্র (জীবনী) ১০'০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ৭৩

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

পট দীপ ধ্বনি	অমর ঘোষ	50·00
রবীন্দ্র-সুভাষিত	বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	12·00
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	5 50
রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব	ড হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	8·00
ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ	ড হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	4 75
রবীন্দ্র দর্শন	ড. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	16·00
শিবভাবনা	ড সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	9 50
সংগীত-রত্নাকর	শার্ঙ্গদেব (অনুবাদ)	18 00
চৈতন্যোদয়	হরিশচন্দ্র সান্যাল	2·00
জ্ঞানদর্পণ	হরিশ্চন্দ্র সান্যাল	3 00
শিল্পতত্ত্ব	ড সাধনকুমার ভট্টাচার্য	15 00
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু	ড ধীরেন্দ্র দেবনাথ	6·00
বাংলা লোকনাট্য-সমীক্ষা	ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	16 50
রবীন্দ্রদর্শন অভীক্ষণ	ড সুধীরকুমার নন্দী	14 00
বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত	ড অরুণকুমার বসু	45 00

বিক্রয়কেন্দ্র

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
ও ৫৬এ, বি. টি. রোড, কলিকাতা ৫০

জিজ্ঞাসা, ১এ, কলেজ রো ও ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

যোগাযোগ : এমারেল্ড বাওয়ার, ৫৬এ, বি. টি. রোড, কলিকাতা-৫০

জন্মদিন

"শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই, যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব। বলে যাব এ প্রহসনের
মধ্য-অংকে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধদেশ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

●

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি এ ১১৫২৬/৮১

এইচ. এম. ভি'র

রবীন্দ্র-বন্দনা

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে এইচ এম ভি'র এবারের শ্রদ্ধার্ঘ্যে নিবেদিত হয়েছে ৬টি নতুন স্টিরিও এল-পি রেকর্ড। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পরিবেশনায় ও অভিনব পরিকল্পনায় প্রতিটি রেকর্ডই হয়ে উঠেছে উপভোগ্য

সুরের পথের হাওয়ায় হাওয়ায়
ECSD 2626 স্টিরিও
১৬টি রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই অসাধারণ এল-পিতে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সাগর সেন, সংঘমিত্রা গুপ্ত ও অরুন্ধতী হোম চৌধুরী। কয়েকটি স্মরণীয় গান—চরণ ধরিতে দিয়ো গো, ওই যে তরী, পথে চলে যেতে, আমার পরান যাহা চায়, যদি বারণ কর তবে, হে সখা বারতা পেয়েছি ইত্যাদি।

বিরহ মধুর হল আজি ECSD 2627 স্টিরিও
এই রেকর্ডটিতে সংকলিত হয়েছে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, অঘ্য সেন ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ১৬টি একক রবীন্দ্রসঙ্গীত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান—অলকে কুসুম না দিয়ো, তুই ফেলে এসেছিস কারে, পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে, দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে, তোমায় আমায় মিলন হবে বলে প্রভৃতি।

শেষের কবিতা ECSD 2623 স্টিরিও
এই প্রথম রেকর্ডে পরিবেশিত হল একটি উপন্যাসের বুদ্ধিদীপ্ত পাঠ যা রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে আদরণীয় হবে।
নির্দেশনা : বিকাশ রায়
সংযোজন-যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অংশগ্রহণে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিলি চক্রবর্তী নীলিমা দাস ও অন্যান্য গ্রন্থনা : বিকাশ রায় পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ

আজি এ আনন্দসন্ধ্যা
ECSD 2621 স্টিরিও
সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ১৯৮০-র ৮ জানুয়ারী রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত 'অভিনন্দন-সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানে পরিবেশিত ১৭টি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংকলন।
সুচিত্রা মিত্র—যদি প্রেম দিলে না প্রাণে, গানগুলি মোর শৈবালেরই দল, হৃদয়ের এ কূল ও কূল মেঘের পরে মেঘ জমেছে ইত্যাদি।
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—সখী, আঁধারে একেলা ঘরে, যদি তারে নাই চিনি গো, আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ইত্যাদি।

ঋতু গুহ ECSD 2624 স্টিরিও
শিল্পীর প্রথম এল-পি রেকর্ডে সংকলিত হয়েছে ১২টি রবীন্দ্রসঙ্গীত। যেমন—কোন শুভখনে, তুমি জাগিছ কে আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা সারা বরষ দেখিনে মা।

সুনীল গাঙ্গুলী ECSD 2620 স্টিরিও
ইলেকট্রিক গীটারে পরিবেশিত হয়েছে তুমি রবে নীরবে আমার মল্লিকাবনে, তবু মনে রেখো বাজে করুণ সুরে ইত্যাদি অতি জনপ্রিয় ১৪টি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর।

এইচ এম ভি ডীলারের কাছে অনুসন্ধান করুন

HMV হিজ মাস্টার্স ভয়েস

HMV/1 81
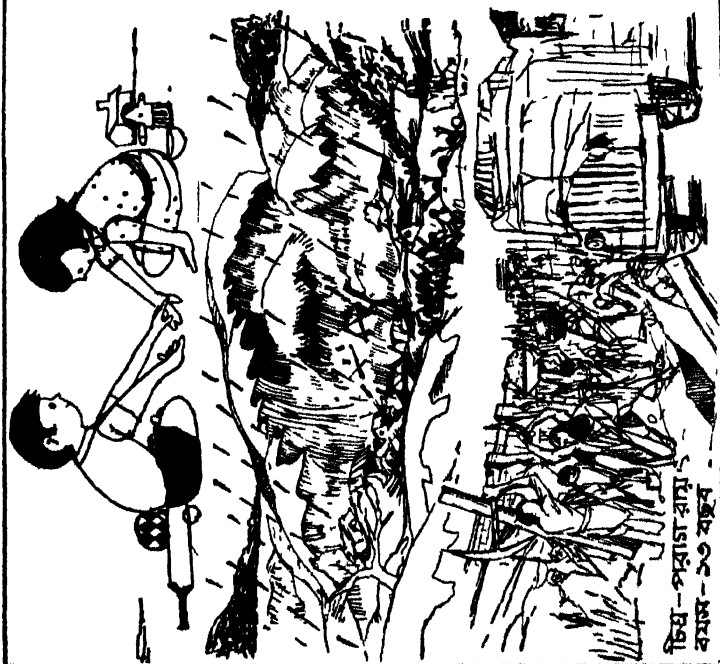
হুকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চাম কাটে মজুমদার
ধেঁয়ে এলো দামোদর
দামোদরের দুকূল জুড়ে
বাজবিষ্টি ঝমঝম
বান রুখতে বাঁধ বাঁধে
কাজ কম্ম হরদম।
বাঁধ বাঁধতে হলে বেলা
বেড়ে যাবে বানের ঠেলা
ভাতে পড়ুক মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি
হোকনা কোদাল ভোঁতা....
দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন
চিত্র—পরাগ রায়
বয়স—১৩ বছর

YOU GROW
WE PRESERVE
AND NATION MARCHES
TO PROSPERITY

For scientific preservation & storage of Agril & Industrial materials,
For easy credit facility against pledge of Warehouse Reciepts,
For disinfestation service,
Please contact

WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION

(*A Government Undertaking*)

6A, Raja Subodh Mallick Square (4th Floor)

CALCUTTA 13

Phone No. 26-6050, 26-6061, 26 6052, 26-6063

॥ জাতির সেবায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ॥

নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থায় অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল সরবরাহে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নে আমাদের অক্লান্ত প্রয়াস এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের শিল্প উপনগরী আজ নূতন উদ্যোক্তাদের শিল্প ভাবনার প্রথম আশ্বাস। এই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সরকারী এবং মিশ্র উদ্যোগে অবিলম্বে একাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা গড়ে তোলার এক পরিকল্পনায় আমরা হাত দিয়েছি। কর্মসংস্থান ছাড়াও এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য নূতন উদ্যোক্তা তৈরী করা। বিপণন সহায়তায়ও আমরা সম্প্রতি এক কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছি।

ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশে আমরা সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতাপ্রার্থী ॥

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম,
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
(৪র্থ তল)
কলিকাতা ৭০০০১৩

মামনের স্বপ্ন

আধো চোখ দিকে পাকা গিন্নীর মতো তাতু বলল : দেখেছিস ? বাড়ীর সামনেটা কি রকম করে ফেলেছে, টিন দিয়ে ঘিরে রাস্তাঘাট খুঁড়ে একাকার।

পাশে বসেছিল মামন বলল : বলছিস কি ? ওতো পাতাল রেল তৈরী হচ্ছে।

তাতু বলল না হাতি। বাবা বলেছে, ওই পাতাল রেল-টেল এ জন্মেও হবে না।

মামন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল : কাল নেনো পাতাল রেল এর গপ্প বলছিল মামাকে নেনো বলে ডাকে মামন।

কি বলছিল ?

বলছিল কি, এই তো আর কটা বছর মাত্র। তার মধ্যেই পাতাল রেল এর কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন মামনকে আর বাসে করে স্কুলে যেতে হবেনা। সামনের মোড় থেকে উঠবে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে স্কুলে গিয়ে নামবে। গুঁতোগুঁতি ভীড় নেই। নিশ্চিন্তি।

তাতু চোখ বড় বড় করে মামনের কথা শুনছিল। মামন বলল : স্কুলের বাস কি বিচ্ছিরি বাবা সেই সকালে বাসে ওঠো, আর স্কুলের শেষে বাড়ী ফিরতে বিকেল পেরিয়ে যায়।

তাতু বলে উঠল : বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি।

অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচুন

আপনার নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে পারতেন। ঝঞ্ঝাটের শেষ থাকত না।

পুরো ভাড়া এবং জরিমানা, মাঝ পথেই বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়া; ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস, ভাগ্য খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে।

অথৈ জলে শুধু শুধু ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন? মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে। পূর্ব রেলওয়েতে অন্যের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য লোক ধরা পড়ছেন।

টাকা দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন না। অনুমোদিত সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

তন্তুজ

সকল কাজে সকল সাজে
বাঙলার তাঁতের কাপড়

॥ প্রধান কার্য্যালয় ॥

৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৪

দূরভাষ : ৩০-৩৫৫৮

সুপরিমাপ, সুক্ষ্মবুনন, রঙবেরঙ সৌন্দর্য্যে
আধুনিকতা ও বৈচিত্র্যের সুচারু সমন্বয়

॥ নগর কার্য্যালয় ॥

৪৫, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭২

দূরভাষ : ২৬-৮০ ২, ২৬-৬৩৪৭, ২৬-৮৬৭৯

॥ জনতা কাপড় 'তন্তুজ' বিপণিতে পাওয়া যায় ॥

উত্তরসূরি ॥ আবেদন / নিয়মাবলী

১. গ্রাহকবর্গের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁদের স্ব স্ব চাঁদা যা বাকী তা নতুন বর্ষে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন।

২. বহু গুণীজনকে আমরা উপহার স্বরূপ পত্রিকা পাঠাই। পত্রিকা-বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত এবং সমালোচনা পাঠালে সম্পাদক উপকৃত হবেন।

৩. উত্তরসূরি নতুন লেখকদের সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাঁদের কাছে অনুরোধ, লেখা পাঠান, ভালো লেখা। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. কুরুচিকর বিজ্ঞাপন কোন শর্তেই ছাপা হয় না। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে অনুরোধ, সুন্দর শোভন সুরুচির পরিচায়ক বিজ্ঞাপন দিন।

কর্মাধ্যক্ষ · উত্তরসূরি ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, সিঁথি। কলকাতা-৭০০০৫০। ফোন ৫২-২৪৫২

রবীন্দ্র সংখ্যা উত্তরসূরি ১১০ মাঘ-চৈত্র ১৩৮১ ২৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা

প্রবন্ধ

স্মৃতিকথা

●

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরি । ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড । কলকাতা-৫০ । ফোন : ৫২-২৪৫২

উত্তরসূরি ১১১ । বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৮ । ২৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

উত্তরসূরি । ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড কলিকাতা ৫০ । ফোন : ৫২-২১৫২

শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

রবীন্দ্র-জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতা

অরুণ ভট্টাচার্য

উনিশশো একচল্লিশে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ। পঞ্চাশ দশকের মধ্যপাদে জীবনানন্দ গেলেন, সুধীন্দ্রনাথও মাত্র কয়েক বছর বাদে। আধুনিক কবিতার দুই অভিভাবক বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য কয়েক বছরের মধ্যেই চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ এবং এইসব কবিদের চলে-যাওয়ার মধ্যে ভারতবর্ষ, বিশেষত, বাংলাদেশে উত্তাল তরঙ্গ। উনিশশো সাতচল্লিশের ভারতবর্ষ। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে যে সময় এক করুণ ইতিহাসে পর্যবসিত হয়ে রয়েছে, আজও। নতুন দিল্লীতে যখন উৎসবের জয়ধ্বনি, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে তখন ক্রন্দনরোল। এখনো তা থামে নি। উনিশশো পাঁচ এ বৃটিশ শাসকবর্গ যা করেছিলেন সাময়িক ভাবে, স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ তাকে স্থিরনিশ্চয় রূপ দান ক'রে পাকাপাকি ভৌগোলিক সীমানা নির্দ্ধারণ করে দিলেন। দুই বাংলা বিভক্ত হ'ল। এক তৃতীয়াংশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত। দুই-তৃতীয়াংশ তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হল। ভাগ্যদেবতার পরিহাস এই, এক-তৃতীয়াংশ ভূমি-সীমানা হতে খুব বেশী মুসলমান শ্রেণী ওপারে যায় নি, কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিসীমানা থেকে হিন্দু অধিবাসীরা প্রায় সবাই প্রাণভয়ে এক তৃতীয়াংশ ভূমি-সীমানায় এসে আছড়ে পড়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে সেই জের অদ্যাবধি টানতে হচ্ছে। আরও কতকাল, কে জানে! স্বাধীনতা-উত্তর কবিতা আলোচনায় এই পটভূমিই একমাত্র নয়, কিন্তু অপরিহার্য। বিক্ষুব্ধ বাঙালী, চিন্তাশীল বাঙালী, ভাবুক বাঙালী, প্রেমিক বাঙালী—বাঙালী চরিত্রের বিচিত্র বহুমুখিন্ আপাত-বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন তার কাব্যসাহিত্যে থাকবেই, এ কথা বস্তুগতভাবে সত্য। এই বহুমুখিন্ চরিত্রের ভিত্তিমূলে নিদারুণ ট্রাজেডি তাকে একই সঙ্গে বিরক্তি, হতাশা, ক্রোধ, অভিমান এবং বিরোধী-রাজনীতির প্রতীক-চিহ্নিত ভাবে দাঁড় করিয়েছে। বাঙালী স্থবির নয়, গতিবিধি যারা চিহ্নিত জাতি; মিশ্রণের মধ্যে ইতিহাসে চঞ্চলতাকে সে সজীব জীবনের মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ

করেছে। কাব্য তার হৃদয়ের মর্মমূলে। সুতরাং কবিতাতেই প্রতিবিম্বিত রূপ লাভ করেছে বাঙালীর এই চরিত্র, স্বাধীনতা অর্জন এবং দেশ-বিভাগজনিত এই আনন্দ-বেদনা স্থায়ীভাবে ক্রোধ বিরক্তি এবং হতাশায় অভিমানে এক বিচিত্র অনুষংগে রূপ লাভ করেছে। অবশ্য, একমাত্র সত্য কথা এটা নয়। অন্ধকারকে দূর করে একসময় আলোকবর্তিকা আমাদের নিরাশা থেকে রৌদ্রপ্রভাতে নিয়ে যায়। গত আট দশ বছরের কবিতায় এক নতুন ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। আগেও দেখতে পেয়েছি, মাঝে মধ্যে। সে যা হোক। সমকালের কবিতা আলোচনায় প্রধান অসুবিধে, সমালোচক তার সময়ের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ অভিঘাত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন না। অসুবিধে আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে, সেই সমালোচক যদি আলোচ্য সময়সীমার অন্তর্ভূক্ত একজন কবি হন। নাটকের দৃশ্যাবলী বা চিত্রপট দেখবার জন্য যেমন, একটি আনুমানিক দূরত্ব থাকা প্রয়োজন, সমালোচককেও সেই দূরত্ব মনের মধ্যে গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হয়। স্ব-কালের কাব্য-আলোচনায় একজন কবির এই অসুবিধে দেশে কালে লক্ষ্য করা গেছে। 'আধুনিক', 'সাম্প্রতিক' 'সমকাল' ইত্যাদি সময়সীমা-দ্বারা চিহ্নিত কালের কবিতা আলোচনায় যুগধর্ম এবং কালধর্ম বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে আমাদের সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। অনেক সময়েই দেখা গেছে, যুগের চাহিদা মিটেছে, কালের অনন্ত সীমানার অংশভাক্ তিনি হতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্র-লালের কবিতা এর স্বাক্ষর, অনেকাংশে নজরুলের কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যপক্ষে, যতই দিন যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে আমরা আধুনিক বা সমকাল ইত্যাদি সীমানা থেকে পৃথক করে কালের প্রবহমানতায় দেখতে পাচ্ছি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ প্রায় এই ত্রিশ বছর স্বাধীনতা-উত্তর কাল। অর্থাৎ বর্তমান আলোচনার সময়-সীমা। সাম্প্রতিক কবিতা বলেই একে চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যদিচ 'আধুনিক' শব্দটি ব্যবহার করলেও খুব অন্যায় হবে না। ১৯৩০ থেকে সাধারণভাবে বাংলা আধুনিক কবিতার সূত্রপাত মনে করা হয়ে থাকে, যে সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর রচনার ধারা নতুন করে বদলে দিলেন। আপাতত মনে হ'ল কবিরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে নতুন শব্দ শৈলী, ছন্দের পরীক্ষা দ্বারা কবিতার দিগন্ত বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭

সময়-সীমাকে আমরা আলোচ্য কালের ভূমিকারূপে গণ্য করতে পারি—এই সময়ের কবিতার মূল কাব্যলক্ষণগুলি আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। কোন কালের সাহিত্যসৃষ্টিই কিছু ভুঁই-ফোঁড় নয়। ১৯৪৮-এ যে-কবি নতুন করে কবিতা লিখেছেন তিনি ১৯৩০-এর কবিকে হয় আত্মস্থ করবেন, নয় সচেতনভাবে এক পাশে সরিয়ে রাখবেন। আর যদি তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী কবি হন, নিজের রাস্তা নিজে খুঁজে বার করবেন, যেমন করেছিলেন উইলিয়াম ব্লেক। এসব নানা কারণেই এই সতেরো বছরের কবিতার পটভূমি অপরিহার্য। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ এবং অবশেষে প্রত্যক্ষ ধাক্কা ভারতবর্ষকে, বিশেষত পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাংলা দেশকে,—বর্তমানের পূর্ব এবং পশ্চিম সম্মিলিত-ভাবে—সামলাতে হয়েছে। বোমাবর্ষণ, আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ পরপর ছায়াছবির মত এই সব ঘটনাবলীর সময়কাল মাত্র আট বছর, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭। পশ্চিমবঙ্গ এখনো পর্যন্ত সুস্থির হয় নি। যদি সেকারণে কখনো ক্রোধ, কখনো হতাশা বাংলা কবিতায় আত্মপ্রকাশ করে তাই হবে স্বাভাবিক। এর অগ্নপ্রান্তও যে নেই তা নয়। বিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রতিফলন শুধু বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে না। কখনো তা সমাহিতি এবং সংযমের মধ্যেও রূপ পায়, নতুন দ্যোতনায় তাকে দেখা যায়। বাংলা কবিতায় তাও দুর্লভ নয়। দুটি কবিতার অংশ থেকে আমার বক্তব্যের অনুরণন শোনা যেতে পারে:

১. ঘুমুতে চাই আমি মাটিতে বুক মেখে
মরণ চাই আমি আকাশে মুখ রেখে;
তবুও হাঁটে তারা কৃষ্ণ বলরাম,
অন্ধ কুরুরাজ, কুরুক্ষেত্র।

তোমরা ফিরে যাও। কোথায় দ্বারকায়
নারীর দেহমদে পশুরা লুব্ধ;
কোথায় শিশুকেও জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়
আহত নেকড়েরা; এমনি যুদ্ধ!

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: প্রস্তাব)

২. ...ফুল থেকে অন্যফুলে কী করে যে প্রজাপতি কোন পথ বেয়ে
হাওয়ার তরঙ্গ তুলে চলে গেল দেখতে পেল কিনা ?
হে সুন্দর যৌবন কেন আত্মমুগ্ধ প্রাণের ছলনা,

কী করে যে প্রজাপতি...জানি না জানি না।

(মলয়শংকর দাশগুপ্ত . কী করে যে প্রজাপতি)

প্রথম কবির জন্মসাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে, দ্বিতীয় কবি জন্মেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে। মানসিকতার পার্থক্য, যদি যুগধর্ম দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে, অনিবার্য। দুটি কবিতায় দেখতে পাচ্ছি পৃথক ভাবনার অনুষংগ। মহাভারতের পটভূমিকা আশ্রয় করলেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে সমাজ এবং সাংস্কৃতিক ক্ষরণের ভয়াবহ চিত্রের মধ্য দিয়ে ক্রোধ, বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুজ কবি প্রজাপতির প্রতীকটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'হাওয়ার তরঙ্গ তুলে' প্রজাপতির চলে-যাওয়া 'সুন্দর যৌবন' কি দেখতে পেয়েছিল ? এই কবিতার অভিঘাত, একেবারেই বিপরীত পটভূমির আশ্রয়ে, স্নিগ্ধ এক ভাবলাবণ্য যোজনা করেছে।

'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করছি', আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর এই সংজ্ঞার সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। কেননা এখানে তিনি আধুনিক কবিতার ভূমিকে চিহ্নিত করেছেন, ঘটনার উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু তিনি যখন ইঙ্গিত দিয়েছেন 'হয় তো এঁরাই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবেন যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিচেতনাসম্ভূত নয় সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত' তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী মেনে নিতে দ্বিধা হয়। আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পাদনাকালে অন্যতম সম্পাদক আইয়ুব সাহেব এই কথাগুলি বলেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, আধুনিক কবিতার প্রাণপুরুষ জীবনানন্দ বিষয়ে একটি কথাও তিনি বলেন নি। সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে, সমর সেন, বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেই—এবং বুদ্ধদেব বসুকে মনে মনে তিনি আধুনিক কবিতার নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। হয়তো একজন জীবনানন্দ নন, একজন অমিয় চক্রবর্তী নন (এঁর কথাও

ভূমিকাতে নেই)—সকলের সম্মিলিত অবদানেই আধুনিক কবিতার সৌধ গড়ে উঠেছে। তথাপি, এ তর্ক থেকেই যায় যে ব্যক্তিচেতনা-সম্ভূত কবিতা এবং সমাজবোধের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কবিতার স্থির লক্ষণগুলি কি কি? আইয়ুব সাহেব রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, 'তার জন্য কবির চাই শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, চাই ডায়েলেকটিক দৃষ্টি, চাই ইতিহাসের অর্থনীতি-মূলক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস।' প্রশ্ন জাগে, যে-কবি একজন 'ব্যক্তি' তিনি কি সমাজ বহির্ভূত? প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে স্বেচ্ছানির্বাসিত, জনসমাজবিহীন সমুদ্র-সৈকতে তিনি কি স্বপ্নে আচ্ছন্ন? তেমন অবস্থাতেও আমরা—তেমন অভিজ্ঞতার নিরিখেও—উঁচুদরের সাহিত্য পেয়েছি। এপ্রসঙ্গ বাদ দিয়েও একথা বলা চলে, কোন যুগেই কোন কবি সমাজ-বহির্ভূত জীব ছিল না। সমাজ-বোধের ভিত্তি চ্যসারের কাণ্টারব্যরী টেলসেও পাকাপোক্ত মিলবে—তার জন্য চ্যসারকে ডায়েলেকটিক দৃষ্টিভংগী অর্জন করতে হয় নি। আধুনিক কালের যে কবিকে উনি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে মনে করেছিলেন এই সব গুণাবলী তাঁদের মধ্যে বিধৃত রয়েছে বলে, দুর্ভাগ্যত তিনি কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছেন। বিশেষ একটি সময়সীমার মধ্যে সমর সেনের তৎকালীন কবিতায় যে ভবিষ্যতের চেতনার ইঙ্গিত ছিল—তাও নিতান্ত সাময়িক ভাবনাতেই পর্যবসিত হয়েছিল। সমর সেনের কবিতা বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সে-যুগের রচিত কবিতাবলী এই মুহূর্তে—বলা যেতে পারে, পঞ্চাশ দশক থেকেই—তরুণ কবি-কুলের ওপর আর কোন প্রভাব ফেলে নি। আধুনিক বাংলা কবিতা আইয়ুব সাহেব-নির্দেশিত পথে কিন্তু এগোয় নি, যদিচ শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সরকার পর্যন্ত এই বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পের রহস্য কি তাই চিরকালই unpredictable? পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত কবিতার ধারায় আবার নতুন করেই 'ব্যক্তি' মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—যদি আইয়ুব সাহেবের কথামত ব্যক্তি-চেতনা ও সমাজ চেতনা বিষয়টিকে আমরা চিন্তারাজ্যের পৃথক প্রকোষ্ঠ বলেই ধরে নিই। বড় কবিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-চেতনা সমাজ-চেতনা ইত্যাদি বিষয়গুলি পৃথক প্রকোষ্ঠ দাবী করে না। একটি সমগ্রতায় এসে বিলীন হয়, যেমন শেকস্‌পীয়ারে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ব্যক্তিচেতনা সমাজচেতনা ইত্যাদি কথাগুলি, অন্তত শিল্প-বিচারে, একান্তই ভুল পথ-প্রদর্শক। কোন ব্যক্তিই সমাজ-বহির্ভূত

নয়। তাঁর যে কোন চিন্তাই সমাজের অন্তর্ভূত ব্যক্তি মানুষেরই চিন্তা। বিশুদ্ধ কল্পনার রাজ্যে বাস করেও কোলরিজের 'কুবলা খান' রচনা সম্ভব এবং আজও তা সমান আদরণীয়। অথবা বৈষ্ণব কবিতার রসঘন অস্তিত্ব বা রামপ্রসাদের আন্তর উদ্বেলতা এবং বাউল সাধকদের গূঢ় চৈতন্যের উৎসার সম্ভব।

হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় চিন্তায় মার্কসবাদী, স্বাভাবিক কারণেই এমন একটি দৃষ্টিভংগীর তিনি সমর্থক যার দ্বারা কবিতা বা শিল্পকে বিশ্লেষণ করাই তাঁর স্বধর্ম। মজা এই, মার্কসবাদী দেশগুলিতেও আজ শিল্পচেতনা ব্যক্তিত্ব, অথবা সমাজ চেতনা সম্ভূত ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তার উল্টো ঢেউ উঠেছে। তাঁরাও আর, যাঁরা কিছুটা স্বাধীন চিন্তা করতে অভ্যস্ত এবং সাহসী প্রত্যয়ের অধিকারী, ফ্রেমে-আঁটা কথাবার্তা বলছেন না—তোতাপাখির শেখানো কথাবার্তার বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন।

বাংলা কবিতার আলোচনায় এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল। কেননা, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ এই পর্বে, তথাকথিত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শিল্প সাহিত্য বিচারের মূল নিরিখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে কারণে জীবনানন্দের মত কবি এঁদের কাছে প্রায় অনুচ্চারিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধন্যবাদ বুদ্ধদেব বসু এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে, যাঁরা এই কবিকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। সমর সেন, যথেষ্ট বন্দিত এবং নন্দিত হয়েও, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই 'মিছিলের মুখ' লেখবার পর থেকে এখন যে কবিতা লিখে চলেছেন—তা সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামক বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ একজন ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবিরই কবিতা। মিছিল, দাংগা, সংঘর্ষ, লক্-আউট, ঘেরাও ইত্যাদি বিষয়গুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্জাত কবিতা তা নয়। অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ক্রমশ নতুন এক রাস্তার দিকে এগুচ্ছেন যা মার্কসীয় তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

বাংলা কবিতার এই ভূমিকায় দেখা যাবে, প্রায় সবাই তৎকালীন অ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন—কারণ ফ্যাসীবাদ তখন সমগ্র মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই সেদিন বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণু দে হাত মিলিয়েছিলেন, তারাশঙ্কর এবং মানিক পাশাপাশি বিবৃতি দিয়েছেন। ফ্যাসীবাদ নির্মূল হল। ১৯৪৫-এর পর থেকে নতুন করে পৃথিবীর দেশগুলি

দুটি শিবিরে ভাগ হতে থাকলো। গণতান্ত্রিক দুনিয়া এবং কমিউনিষ্ট দুনিয়া। কমিউনিষ্ট দেশগুলি ক্রমশ নিজেদের সংহত করবার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে আত্মহননের দিকে যেতে শুরু করল। কোন্ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র যে 'আজ প্রকৃত মার্কস্‌বাদী তাই এখন গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'প্রকৃত মার্কস্‌বাদী' তত্ত্বকথা বলেন এরকম সাত আটটি দল এক এই দুর্ভাগা বাংলা দেশেই রয়েছে! এবং এর ঢেউ ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা দেশের সাহিত্য এবং কবিকুলের ওপর বর্তেছে। যাঁরা কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী কবি তাঁদের মধ্যেও কবিতার নানা চেহারা। অবশ্যই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সাহিত্যে তাই আমরা আশা করব, কিন্তু ব্যক্তিকে যদি 'সমাজ চেতনায় উদ্ভূত কবি' বলে মার্কা-মারা করে দেওয়া হয়, তবে আশা করব সেই সকল কবিদের কবিতায় এক ধরণের সুস্থ নিশ্চিত আদর্শবাদ লক্ষ্য করা যাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একাধিক কমিউনিষ্ট কবি আজকাল যে-সব কবিতা লিখছেন—দু চারজন পরিচিতিও লাভ করেছেন—তাঁদের কাব্যে না রয়েছে সৎ আদর্শের আভাস, না একটি স্থির বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য। তাঁদের অনেকেরই কবিতা বরং বহুনিন্দিত 'ব্যক্তিসচেতন' কবিদের সক্ষম বা অক্ষম অনুকরণ। উদাহরণ দিতে লজ্জা বোধ করি। এও দেখেছি, কোন সাচ্চা কমিউনিষ্ট কবি একটি কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী পত্রিকায় মারদাঙ্গা কবিতা লিখছেন, আবার সেই কবিই (এঁদেরই ভাষায়) তথাকথিত 'প্রতিক্রিয়াশীল' কোন সাপ্তাহিকে সুযোগ পেলেই অন্য চরিত্রের পদ্য ছাপছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে, আগেই বলেছি, মুক্তির বা আনন্দের বান ডাকে নি। এই হতভাগ্য বাংলাদেশে গর্ব করবার মত এখন কিছুই নেই। দেশগঠনের বিরাট কর্মযজ্ঞে বাঙালীর স্থান এমনিতেই সঙ্কীর্ণ। সারা ভারতবর্ষের মানচিত্রে বাংলাদেশ এবং সংস্কৃতির যেটুকু মর্যাদা তা প্রায় একাই রবীন্দ্রনাথকে বহন করতে হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পরেও এই সব কথা মনে রেখেই বাংলা কবিতার একটা সুস্থির বিচার করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের সমকালের উল্লেখযোগ্য কবি কারা ছিলেন? অতুলপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলাল নিঃসন্দেহে। তারপর? মোহিতলাল যতীন্দ্র সেনগুপ্ত নজরুল? তারপর? অবশ্যই জীবনানন্দ। প্রায় একা জীবনানন্দ। যিনি রবীন্দ্রনাথের অমিত প্রভাবকে এক পাশে এবং অনায়াসে সরিয়ে দিয়ে নিজের রাস্তা করে

নিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে একটি প্রশ্ন আমার মনে এসেছে। জীবনানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই একটি বিশেষ চৈতন্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। 'কবি জীবনানন্দ' প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ ঢেউ জীবনানন্দের তীরে আঘাত করেছে। আইয়ুব সাহেব নির্দেশিত বা হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঈপ্সিত পথে বাংলা কবিতা এগোয় নি। এগিয়েছে একান্তই 'নির্জন' কবি জীবনানন্দের নির্দেশিত পথে। শিল্প এবং কাব্য ইতিহাস প্রমাণ করেছে—কোনো বাঁধাধরা রাস্তায় তারা চলতে অভ্যস্ত নয়—কবিতা এবং শিল্প—শব্দের মতই—উইট্‌গেনস্টাইনের ভাষায়—কোন সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা পড়ে না। ডায়েলেক্‌টিকস্‌ তত্ত্বে তো নয়ই।

অবশ্য ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ মনীশ ঘটক বুদ্ধদেব বসু সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আছেন আমাদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে। লিখছেন অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন অরুণকুমার সরকার। রয়েছেন চিত্ত ঘোষ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অলোকরঞ্জন আলোক সরকার এবং শঙ্খ ঘোষ, এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। রয়েছেন কবিতা সিংহ, মানস রায়চৌধুরী, তারাপদ রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আরো কবি যাঁদের বহু কবিতাই কবিতার নিরিখে সমান উত্তীর্ণ এবং আমার তাঁরা প্রিয় কবি। আমি শুধু বহু পরিচিত কবিদের নামই করেছি। অল্প পরিচিত কবিও অনেকে আছেন যাঁদের কবিতা রসের বিচারে বহু পরিচিতদের থেকে শিল্প বিচারে ন্যূন নয়। মলয়শংকরের মত ম্রিয়মান কবির কবিতা-পংক্তি উদ্ধার করে আমি একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছি, অথবা কালীকৃষ্ণ গুহ-র কবিতা থেকেও উদ্ধার করা সম্ভব, বাংলা কবিতা জীবনানন্দের অমিত প্রতিভা-প্রজননের মধ্য দিয়ে আজ বহুবল্লভা। নীরেনের 'বাতাসী' কবিতাটির সঙ্গে সঙ্গেই মানস রায়চৌধুরীর 'দিনযাপন' পড়তে ইচ্ছে করে, সুনীলের কোন হৃদয়-নিংড়ানো পংক্তির পাশেই ত্রিশ-অনূর্ধ্ব কবির ছোট্ট একটি লিরিক বুকের মাঝে ধাক্কা দেয়। বাংলা কবিতা তাই এখন এক বহু নদ-নদী শাখানদী খাল বিল বিস্তৃত মহাদেশ। উজ্জ্বলতা, কত প্রশান্তি, কত বিক্ষোভ, কত বেদনা। অরুণকুমার সরকারের প্রচণ্ড দুর্দমনীয় আকর্ষণ যে প্রেমের কবিতা তারই পাশে শঙ্খ ঘোষের স্থির জীবনজিজ্ঞাসার প্রশ্নগুলি। আলোক সরকার বা অলোকরঞ্জনের জগতে প্রবেশ করলে সেখানেই

চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। শক্তি'র অসামান্য শব্দ-চয়নিকার প্রেক্ষাপটের চালচিত্রে যে সব নবনব উন্মেষ তার সঙ্গে কোথায় মিল পাই দূর বাংলার কোন তরুণতম কবির দুচারটে হঠাৎ-ছিটকে-আসা দুরন্ত পংক্তি। বাংলা কবিতার এই জোয়ার সম্ভব হয়েছে ১৯৩৯-৪৭-এর কয়েকটি উন্মুখ বছরের জীবকোষে। ওদেশে রয়েছেন শামসুর রাহমান, আমাদের বন্ধু কবি, ওদেশের তরুণদের কবির কবি।

উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে কয়েকটি নাম আমাদের কাছে গায়ত্রী-মন্ত্রের মত। ফ্রয়েড, মার্কস্, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রঁলা, টলস্টয়, মানবেন্দ্রনাথ—আরো আছেন কেউ কেউ। প্রত্যক্ষত বাংলা কবিতায় যাঁদের কর্মধারার বা চিন্তাসূত্রের নিরিখ রয়েছে—এমন কয়েকটি নাম। কোন না কোন ভাবে এঁদের ব্যক্তিত্ব বা চিন্তাজগৎকে পাশ কাটিয়েযাওয়া সম্ভব হয় নি কবিদের পক্ষে—সাহিত্যিকদের পক্ষে। আমি কবিতার 'ফর্ম'-এর প্রসঙ্গে বলছি না। 'ফর্ম' হয়তো 'কনটেণ্ট'কে নিয়ে জড়িয়ে থাকে—হয়তো বা 'কনটেণ্ট'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—সে-তর্কে আপাতত না গিয়ে অথবা ফর্ম-কনটেণ্টের অদ্বৈতরূপ মুহূর্তে, ক্রোচে-পন্থীদের বক্তব্য অনুযায়ী ইনট্যুইশন-এক্সপ্রেশনে, ধরা পড়ে সে প্রশ্নকেও দূরে রেখে একথা বলতে চাই, কবিতার জন্য যে স্বকাল, স্বদেশ এবং বৃহত্তর পৃথিবীর মানচিত্র আমাদের সামনে নিয়ত ভেসে ওঠে তাকে চেনবার জানবার এরং দুহাত দিয়ে ধরবার জন্য এই বিশ্বনাগরিকতার দ্বারস্থ আমাদের হতে হয়েছে। কবিরা আজ বাংলাদেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামে বসে তুলসীমঞ্চের ম্রিয়মান প্রদীপটিকে স্মরণ করে কবিতা লিখলেও এই সব বিশ্বপথিক মানুষদের কথা মনে রাখেন। মনে রাখতে হয়।

কিন্তু এখানে একটি সংশয় দেখা দিয়েছে। বিশ্বনাগরিকতার শরিক হতে গিয়ে আমরা বহু সময়ে স্বভূমির রস আহরণে বঞ্চিত হয়েছি। তাই দেখেছি পঞ্চাশ-ষাট দশকগুলির কবিতাতে বিদেশী ফরাসী জর্মন কবিদের অন্ধ অনুস্মৃতি। এমনকি প্রথম সারির কবিরাও যেন ভুলে গেলেন বাংলাদেশের শাক্‌লা বা দোপাটি বা চন্দনবীচির কথা। জীবনানন্দের কবিতায় যে গ্রামবাংলার মুখ আমাদের অন্তরের গূঢ় গোপন স্থানে আঘাত দেয়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রভাস' কবিতায় যে সর্বভারতীয় পটভূমির স্থিরনিশ্চয় প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করি, সেসময়কার কারো কারো কবিতাতে আবার যেন বড় বেশী বিদেশীয়ানা

আমাদের ক্লিষ্ট করে। একথা অবশ্যই সত্য—এখন কলকাতা, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো বা বেজিং একই আকাশের নীচে, একই মানচিত্রের অন্তর্গত—তথাপি যে-ফুলটি আমার বাড়ির প্রাঙ্গনে যে-রঙ যে-আহ্লাদ নিয়ে ফুটবে তা সহস্র মাইল দূরে উষর প্রান্তরে ফুটবে না। কবিতা সম্পর্কে শিল্প বিষয়ে এ মত বোধহয় নিশ্চিত। কেননা, যেখানেই তা প্রাণের স্পর্শে দ্যুতিময়, সেখানে বিশেষ মাটির গূঢ় গাঢ় রসসঞ্চয়।

চল্লিশ দশকে—অর্থাৎ সেই সময় থেকে যাঁরা কবিতা লিখলেন আমাদের সমবয়সী কবির দল—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন এবং লোকনাথ ভট্টাচার্য এখনো সমভাবে সক্রিয়। জগন্নাথ চক্রবর্তী বা নরেশ গুহ কবিতার জগৎ থেকে বোধহয় কিছুটা সরে গিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয়—পূর্বোক্ত চারজন কবি—চারটি পৃথক ঘরকে আশ্রয় করে রয়েছেন। অভিজ্ঞতার ব্যপ্তিতে এবং বিষয়ের অগাধ বিচরণেও তেমনি, মননের গভীরতায় এবং কবিকর্মের সুচারু দক্ষতাতেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্রমশ নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন। তিনি একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী কবি। কিন্তু যে সব অম্লান মুহূর্তে তিনি তাঁর বিশেষ বিশ্বাসটুকুকে প্রবহমান মানবিকতার সঙ্গে একাত্ম করতে পেরেছেন সেখানে তিনি অনায়াসেই অত্যন্ত সার্থক। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে যে শিল্পীর 'ডিটাচ্‌মেন্ট' রয়েছে, যে 'অবজেকটিভিটি' মাঝে মাঝেই দেখা যায় তা বড় দুর্লভ :

> দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ যায়,
> দেখি, আর ঘুম পায়।

এই সব পংক্তি বড় গোপন স্থানে আঘাত দেয়। স্থান কালের উর্ধ্বে নিয়ে যায় এই সব চেতনা—যা বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ বা ইংরেজী কবিতায় কখনো সখনো কীটস্‌কে মনে পড়ায়।

আমার সমকালের কবি নরেশ গুহ বা জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতায় একধরণের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ আছে যা পাঠককে মুহূর্তে কাছে টানে। যুদ্ধ বা যুদ্ধপরবর্তী সাময়িক ঘটনাবলী নরেশ গুহকে প্রত্যক্ষভাবে তত আঘাত হানে নি, কিন্তু জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতায় একটি সচেতনতা কাজ করেছে যা মানবিক হৃদয়-দৌর্বল্যকে সজাগ করে। শুদ্ধসত্ত্ব বসু বা বটকৃষ্ণ দাস কবিতার 'ফর্ম'

নামক প্রারম্ভিক বিষয়ে অতি-সচেতন। মৃগাঙ্ক রায় আবার লিখেছেন—সহজ কবিতাই যাঁর নিরাভরণ সৌন্দর্য। শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ ধর, যাঁরা সম্প্রতি খুবই গভীর ভাবনার কবিতা আমাদের উপহার দিচ্ছেন, মনে হয় যেন, নিজের 'জট' ক্রমশ খুলতে খুলতে এগুচ্ছেন। এই সময়কার আরো কিছু কবিদের কথা আমার জানা, যাঁরা ক্রমশ লেখা বন্ধ করে দিলেন, যেমন সুনীল চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। দিলীপ রায়ের কথা বিষণ্ণ চিত্তে স্মরণ করি।

অব্যবহিত পরের কবি প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ সেনগুপ্ত, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত এবং বটকৃষ্ণ দে। এঁরা সবাই লিরিকধর্মী কবি। কল্যাণ সেনগুপ্ত ইদানীং রীতিমত ভালো লিখছেন। রাজলক্ষ্মী দেবী এবং বাণী রায়ের কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কবিতা সিংহর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু আর যাঁদের নাম করতেই হবে তাঁরা নবনীতা দেবসেন, প্রকৃতি ভট্টাচার্য, বিজয়া মুখোপাধ্যায় এবং কেতকী কুশারী ডাইসন। এঁদের কাউকেই 'মহিলা কবি' বলে পৃথকচিহ্নিত করবার মত কারণ ঘটে নি। নবনীতা বা বিজয়ার কবিতায় মননধর্মিতার ছাপ রয়েছে বিশেষভাবেই, সেখানে প্রকৃতি ভট্টাচার্য একটি, ছোট হলেও, নিজেব জগৎ নিপুণভাবে গড়ে তুলেছেন। স্বদেশরঞ্জন দত্ত, শোভন সোম, আনন্দ বাগচী বা ঐ সময়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সুরজিৎ দাশগুপ্ত ক্রমশ কবিতা থেকে দূরে সরে গেছেন, যদিচ সকলের মধ্যেই একদা পূর্ণ প্রতিশ্রুতির লক্ষণ ছিল। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এবং অমিতাভ দাশগুপ্তেরও, একধরণের স্মার্টনেস পাঠককে উজ্জীবিত করে, কিন্তু সাময়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারাই বোধহয় বড় কবির লক্ষণ—এখানে দুই অমিতাভকেই ভাবতে হবে মনে হয়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতায় যে দার্শনিকতার আভাস আসে তাকে লাবণ্যে মণ্ডিত করবার দায়িত্ব থেকে কবি অব্যাহতি পাবেন না নিশ্চয়ই এবং এই প্রসঙ্গেই উল্টো কথা বলার রয়েছে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে—তাঁর কবিতার অসাধারণ লাবণ্য সত্ত্বেও কাব্যপাঠক আরো গভীর 'গভীরতা' আশা করে। অথচ হালকা চালে গভীর কথা শুনিয়েছেন সার্থকভাবে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সার্থকতার সঙ্গেই। তুষার চট্টোপাধ্যায় কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, পবিত্র মুখোপাধ্যায় বহু 'স্পর্ধার কবিতা' আমাদের উপহার দিয়েছেন, আত্ম-উন্মোচনেরও। দিব্যেন্দু

পালিতের কবিতায় রাজার বাড়ির কথা আমার চিরকাল স্মরণে থাকবে—এমন একটি সার্থক প্রতীক-ভাষ্য দুর্লভ। পরিশ্রমী কবি শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতাবলী কাব্যপাঠককে রীতিমত ভাবায়। মিষ্টি হাতের কবি বলে খ্যাতি ছিল অরবিন্দ গুহর, 'সমাজ সচেতন' কবি আখ্যা পেয়েছিলেন তরুণ সান্যাল। এঁরা বোধহয় আর কবিতা-লেখায় উৎসাহী নন। কিম্বা জানি না, মগ্ন হয়ে আছেন নিজস্ব বৃত্তে। পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল নন্দী, অসিতকুমার ভট্টাচার্য এবং শান্তিকুমার ঘোষ নিরলস কবিতাচর্চা থেকে বিরত হন নি। হন নি সুশীলকুমার গুপ্ত, আশিস সান্যাল, পরিমল চক্রবর্তীও। রীতিমত ভালো লিখছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, কবিরুল ইসলাম, গৌরাঙ্গ ভৌমিক। এঁদের কবিতায় অস্বাভাবিক দ্যুতি ছিটকে আসে। বাসুদেব দেব ছিমছাম, ফিটফাট, দুরন্ত। শংকর চট্টোপাধ্যায়কে মনে পড়ে—যিনি বেশ কিছু উজ্জ্বল কবিতা আমাদের উপহার দিয়ে কোন 'রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের' দিকে যাত্রা করেছেন।

এদেরই পরপর বিনয় মজুমদারের কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছে। এঁর কবিতা পাঠককে উৎসুক করে, মনে হয় ক্রমশ এঁর কাছাকাছি চলে যাই। উৎপলকুমার বসু একদা বহু ভালো কবিতা উপহার দিয়েছিলেন, এখন কি বিদায় নিয়েছেন কবিতার আসর থেকে। অকালে তুষার রায় এবং সুব্রত চক্রবর্তী চলে গেলেন। তুষারের 'ব্যাণ্ডমাস্টার' রীতিমত বিস্ময়কর কাব্যগ্রন্থ। এবং তরুণ সুব্রত বেশ কিছু কবিতা উপহার দিয়েছিলেন যা আমার মত প্রৌঢ় কবির কাছেও ঈর্ষণীয়। আরো লিখছেন কবিরা, শুধু কলকাতায় নয়, মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে, আলিপুর দুয়ারের জঙ্গল থেকে, বাঁকুড়ার রুক্ষ প্রান্তর থেকে কখনো কখনো সাড়া-জাগানো কবিতা আমার কাছে ছিটকে আসে। সচকিত হই, উৎফুল্ল হই। যুগপৎ আশা এবং সাহস জাগে। আমাদের কয়েকজনার নয়, জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় দুচারজন বড় কবির নয়, বহু কবির মিলিত ভালোবাসায় প্রবহমান বাংলা কবিতা এখনো প্রাণচঞ্চল, উন্মুখর তার কলধ্বনি, ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়।

এবারে কিছু বিষয়গত ধারণার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করি। স্বাধীনতা-উত্তর যুগকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। ১৯৪৭-১৯৫৫ প্রথম

পর্যায়। দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মহামারী ইত্যাদি। এর মধ্য দিয়ে কবিতায় যে সবসময় এধরণের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়। ১৯৫৫-১৯৭০ এ এবং ১৯৭০ থেকে এ পর্যন্ত আরো দুটি পর্যায় ভাগ করা যায়, সময় অনুযায়ী। 'তথাকথিত' সমাজসচেতনতা প্রথম পর্যায়ে প্রায় সকল কবিকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেল প্রেম, দেহচেতনা—এমনকি আত্মরতি বিষয়টি কবিতায় ভয়ানকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলো। এ সময় লক্ষণীয় যে মার্কস্‌বাদী কবিরা প্রত্যক্ষভাবে এধরণের আত্মকেন্দ্রিক এবং দেহসর্বস্ব কবিতাকে থিসীস হিসেবে নস্যাৎ করতে চাইলেও তাঁদের অনেকেই এজাতীয় কবিতায় হাত মক্স করেছেন। ১৯৭০ থেকে তরুণ কবিগোষ্ঠীর মধ্যে আরো একটু গভীর আত্মবীক্ষার প্রশ্ন দেখা দিল। কবিতা হিসেবে এসকল যে কালের স্থায়ী আলমারিতে স্থান করে নেবে এখুনি তা মনে হয় না, কিন্তু বাংলা কবিতায় আত্মবীক্ষার ব্যাপারটি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিল—সেই সুধীন্দ্রনাথের পর থেকে। আমি একথা বলি না, প্রত্যক্ষভাবে সুধীন্দ্রীয় প্রভাব এঁদের মধ্যে বইছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে—কিছুটা কবি ডানের মত—একটা 'মেটাফিজিক্যাল বায়াস' কবিতায় অনুপ্রবেশ করছে। বাংলা কবিতা আরো দশবারো বছরে কোথায় পৌঁছুবে জানা নেই—যে দ্রুতগতিতে ফর্ম, কন্টেন্ট, ভাববিলাস, বিদ্রোহ, মগ্নচৈতন্য, আত্মরতি এসব বিষয় কবিতায় এসে যাচ্ছে তাতে সেই শিল্পের বিশেষণেই আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে যে **art is ever elusive**; বাংলা কবিতা যদি এভাবে নিজের পথ করে নেয়, ক্ষতি কি?

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের ইংরেজী রূপান্তর : রবীন্দ্রনাথ ও স্টার্জ মুর

বিজিতকুমার দত্ত

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে রোটেনস্টাইন, ইয়েটস এবং পাউণ্ডের কাছ থেকে যখন তাঁর 'সঙ অফারিংস'-এর অনুবাদ কবিতাগুলির জন্যে অশেষ প্রশংসা পেলেন তখন যে তিনি খুশী হয়েছিলেন সে বিষয়ে জানতে পারি সে-সময়ে লেখা তাঁর পত্রাবলী থেকে। তাঁর কবিতা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে তিনি যে তৃপ্তি পাবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৯১৩ সালের ১৮ মার্চ অজিত চক্রবর্তীকে -লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন 'বাংলায় যখন কবিতা প্রথম লিখ্‌ছিলুম তখন সেটা কেবলমাত্র কবির সঙ্গে কাব্যের মিলন ঘটেছিল। অর্থাৎ তখন আমার মনের সামনে আর কোনো অভিপ্রায় স্পষ্টত জাগ্রত ছিল না। এখন যখন এগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসেছি তখন আমার বধূর হাতের অন্ন সকলের পাতে পরিবেষণ করবার জন্যে ভোজের নিমন্ত্রণ করা গেছে। সুতরাং এর আনন্দ অন্যরকম। এই যজ্ঞের আয়োজনের উৎসাহে আমার মনকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। বারবার ঘুরে ফিরে কাটছি কুটচি মাজচি ঘষচি— একটা যেন ধুম পড়ে গেছে।'

'সঙ অফারিংস'-এর কবিতাগুচ্ছ কবির একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার ফসল— একটি বিশেষ ভাবনার প্রতিফলন। স্বভাবতই তাঁর ইচ্ছা হল অন্যান্য রচনারও অনুবাদ করতে। দেশে-বিদেশে তাঁর গুণমুগ্ধরাও তাঁকে অন্যান্য রচনার অনুবাদে উৎসাহ দিতে লাগলেন। উপরের পত্রে 'ধুম পড়ে গেছে' সেই কথাই প্রমাণ করে। এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অনুবাদ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। অত্যন্ত দ্রুততালে তিনি অনুবাদ করে যেতে লাগলেন। অন্যদেরও তাঁর রচনাবলীর অনুবাদকর্মে প্ররোচিত করলেন। কোন্ রচনা অনুবাদযোগ্য, অনুবাদে কোন্ পদ্ধতি নেওয়া উচিত এসব ভাববার বোধ করি সময় তাঁর ছিল না। বিদেশীদের কাছে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ বড় বেশি ব্যাকুল তখন। দেশে ফিরে এসেও তিনি বিদেশীর ভালোবাসাকে সযত্নে

জ্ঞাপন করেছেন। এবং মাঝে মাঝে তাঁর রচনা তর্জমার সাহায্যে বিদেশীদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এইরকম একটি অনুবাদকর্ম হল 'Karna and Kunti.' রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্বন্ধে এডওয়ার্ড টমসন সর্বদা অনুকূল মত দেন নি। কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রনাথের যে ক'টি তর্জমা সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করেছিলেন তার মধ্যে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' অন্যতম। তিনি বলেছেন, 'only Karna and Kunti seems to me adequately translated'.

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর ইংরেজি তর্জমা 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় বার হয় ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে। তর্জমায় অনুবাদকের নাম ছিল না। ঐ বছরেরই জুলাই মাসে 'মডার্ন রিভিউ'-তে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়। এবারেও অনুবাদকের নাম ছাপা হয় নি। 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' -এর অনুবাদক যে রবীন্দ্রনাথ এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের 'The Fugitive' ও পরে 'Collected Poems and Plays'এ গ্রন্থভুক্ত হয়। 'মডার্ন রিভিউ'-তে প্রকাশিত অনুবাদের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত অনুবাদটির কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

'কর্ণ কুন্তী-সংবাদ' কাব্যনাট্য। ইংরেজি তর্জমা সংলাপময় গদ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ কবিতার অনুবাদে গদ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। গদ্যে কবিতার মেজাজ মর্জি যতটা রক্ষা করা সম্ভব ততটাই তিনি করেছেন। কবি স্টার্জ মুর 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে'র অনুবাদটি পড়ে খুশী হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষ্যের কাব্যনাট্য-রূপ দিতে চেয়েছিলেন। স্টার্জ মুর কাব্যনাট্য রচনায় সাফল্যলাভ করেছিলেন। কবিসমাজে তাঁর নাট্যকবিতা সমাদৃত হয়েছিল। এই কারণেই বোধ করি তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' ('চিত্রাঙ্গদা'র ইংরেজি রূপান্তর) এবং 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২২ সালের ২ মে তারিখের একটি পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন "আমি 'কর্ণ ও কুন্তী' কাব্যে রূপান্তরিত করে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। আমার মনে হয় আমি একেবারে অকৃতকার্য হই নি যদিও মূলের থেকে এর পরিবর্তন অনেকটা বেশি। আপনি কি কোনো পত্রিকায় এটি ছাপাতে আমাকে অনুমতি দেবেন? যদি 'আর্টস লীগ সার্ভিসে'র সদস্যবৃন্দ এটি মঞ্চস্থ করতে চায়—যেই ইচ্ছা তাঁরা প্রকাশ করেছেন—তাহলে কোনো দক্ষিণা আপনি অথবা

আমি না পেলে তাঁরা অভিনয় করবার অনুমতি পাবে কি ?" 'আর্টস লীগ সার্ভিস' কোম্পানি সিঞ্জের 'রাইডার্স টু দি সী'র সুন্দর অভিনয় করেছিল—একথাও মুর রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মুর যে অভিনয়ের জন্যেই রূপান্তর-কর্মে উৎসাহী হয়েছিলেন এই পত্র থেকে তাও জানতে পারি। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ মুরের রূপান্তর পড়ে খুশী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি তর্জমায় বাংলা রচনাকে হুবহু অনুসরণ করার প্রয়াস আছে। যদিও মূলের কোনো কোনো শব্দ, উপমা, চরণ ইংরেজি তর্জমায় বাদ পড়েছে। অজিত চক্রবর্তীকে তিনি তাঁর অনুবাদকর্মের আদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন, 'বস্তুত নিজের লেখা ত ঠিক অনুবাদ করা যায় না। কারণ, নিজের লেখার উপর আমার অধিকার ত বাইরের অধিকার নয়, তা যদি হত তাহলে প্রত্যেক কথাটির কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হত। কিন্তু আমি তা করিনে। আমি কবিতার ভিতরের জিনিষটিকে ইংরেজিতে লেখবার চেষ্টা করি। তাতে ঢের তফাৎ হয়ে যায়। আমি না বলে দিলে তোমরা বোধ হয় অনেক কবিতা চিনতেই পারবে না ' এই রবীন্দ্রনাথের তর্জমার বিশিষ্ট রীতি।

মুরের কাছে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' 'প্রোফাউণ্ড' মনে হয়েছিল। এর কাব্যগুণ মুরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি বাংলা রচনার পরিচয় পান নি, পাওয়া সম্ভবও ছিল না, কারণ মুর বাংলা জানতেন না। কিন্তু বাংলা রচনা যে আরও সুন্দর—এ বিষয়ে মুর নিশ্চিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা পড়েই মূল সম্বন্ধে মুরের কৌতূহল জাগে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তর্জমার দ্বারা মুরের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এটা অনুবাদ-কবিতাটির সাফল্য সূচিত করে নিশ্চয়ই। কিন্তু মুর অনুবাদটিতে কিছু অভাবও লক্ষ্য করেছিলেন। তা না হলে তিনি আবার রূপান্তরে অগ্রসর হবেন কেন ? 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' এর তর্জমায় রচনাটির নাট্য অংশ উপেক্ষিত হয়েছে এরকমই মুরের মনে হয়েছিল। মুর রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুসরণে একটি নাট্যকাব্য রচনায় আগ্রহী হলেন।

মুর এবং রবীন্দ্রনাথের রূপান্তরের মিল-অমিল সন্ধানের আগে রবীন্দ্রনাথ মূল-কে কেমনভাবে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করলেন তা দেখা যাক। কর্ণ আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে

কর্ণ নাম যার
অধিরথসুতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি—কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ।

বাংলা কাব্যনাট্যের নাম 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'। ইংরেজি অনুবাদে 'সংবাদ' বর্জিত। 'রাধাগর্ভজাত' কথাটিরও অনুবাদ নেই। কুন্তী যেখানে উপস্থিত সেখানে 'রাধা'র উল্লেখ প্রত্যাশিত। কর্ণের পালকমাতার কথা দর্শক-পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংঘাতের মৃদু কম্পনটিকে ধরে রেখেছিলেন বাংলা রচনায়। 'মাতঃ' সম্বোধনটিও ইংরেজি অনুবাদে বাদ পড়েছে। নারীর প্রতি বীর কর্ণের শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমবোধ এই সম্বোধনে প্রকাশিত হয়েছিল। নারীমাত্রেই জননী সম্বোধনে ভূষিত হওয়ার অর্থ জননী পূজার্হা। অনুবাদে কি এই দ্যোতনা পরিস্ফুট করা যেত না? কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে কুন্তী বলেছিলেন,

বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় কবায়েছি তোরে বিশ্বসাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্বলাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

তর্জমায় পাই, I am the woman who first made you acquainted with that light you are worshipping দেখা যাচ্ছে শেষ দুই চরণের তর্জমা করা হয় নি। অথচ এই বিশেষ মুহূর্তটির জন্যে কুন্তীকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কত দ্বিধা, কত সঙ্কোচ কাটিয়ে কুন্তী আজ আপন পুত্রের করুণাপ্রার্থী—সে বেদনা ঐ দুই চরণে শুদ্ধ হয়ে আছে। কর্ণ বলেছিলেন তিনি সন্ধ্যাসবিতাব বন্দনা কবতে গঙ্গার তীরে এসেছেন। তর্জমায় সন্ধ্যা-সবিতার কিরণকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা রচনায় আগে 'জীবনের প্রথম প্রভাতে' এবং 'বিশ্বসাথে' কুন্তী কর্ণকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা রচনায় 'জীবনের প্রথম প্রভাতে' অনেক বেশি আন্তরিক। জীবনের জড় সে মাতৃগর্ভ পর্যন্ত পৌছায়। কুন্তীর নিবেদনের পর কর্ণ বলেছিলেন,

দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্যকরঘাতে

শৈলতুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ 'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরে
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে
তোমা সাথে হে অপরিচিতা।

'নতনেত্রকিরণসম্পাতে'র অনুবাদে কেবল 'eyes' ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'নতনেত্র' শব্দে কুন্তীর অপরাধবোধ সূচিত হয়েছিল। 'সূর্যকরঘাতে শৈলতুষারের মতো'—অনুবাদে পাই 'Kiss of the morning sun melts the snow on a mountain top.' মূল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ সরে গেলেন। kiss কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। এই 'চুম্বন' মাতার পুত্রকে স্নেহচুম্বনের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'তব কণ্ঠস্বর · বেদনা'-র অনুবাদ 'your voice rouses a blind sadness within me of which the cause may well lie beyond the reach of my earliest memory.' এই অনুবাদ ব্যাখ্যামূলক। স্পষ্ট করবার প্রবণতা। গদ্য-অনুবাদে কাব্যের অতিরিক্তটুকু হারিয়ে গেল। শেষ দু'ছত্রের অনুবাদে 'রহস্য-ডোর' কেবলমাত্র mystery-তে সীমাবদ্ধ। 'ডোরে'র মাধুর্যটুকু বাদ পড়াতে মূলের রসগ্রহণে বাধা হল।

কুন্তী আত্মপরিচয় দিয়ে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করছেন। হস্তিনানগরে অস্ত্র-পরীক্ষার স্থলে কর্ণ অস্ত্রপরীক্ষায় উদ্যত হলে কৃপ কর্ণের বংশপরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। কর্ণের নীচবংশে জন্ম জেনে তাঁকে অস্ত্রপরীক্ষা থেকে বিরত করা হল। কর্ণ লজ্জিত। সমস্ত ঘটনাটির নীরব সাক্ষী মাতা কুন্তী। তাঁর বুক ভেঙে গেলেও সেদিন তিনি কর্ণকে পরিচয় দিতে পারেন নি। সে বেদনার কথা কুন্তী স্মরণ করলেন এই সন্ধ্যায়,

যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে—কাহার নয়ন
তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিস-চুম্বন।

এই অংশের অনুবাদ এইরকম, 'Who was that unhappy woman whose

eyes kissed your bare, slim body through tears that blessed you'. 'অভাগিনী' এবং 'বাক্যহীনা'র অনুবাদ একটি মাত্র শব্দ unhappy দ্বারা করা হল। Unhappy আক্ষরিক নয়, ভাবানুবাদও নয়। 'বাক্যহীনা' শব্দটি এখানে কোনোমতেই বাদ দেওয়া যায় না। 'স্নেহক্ষুধার ··· বক্ষে' অনুবাদে নেই। এমন হতে পারে ইংরেজিতে এই ইডিয়ম নেই। অথবা বিদেশী মানুষ বুঝবে না বলে রবীন্দ্রনাথ এই অংশটি বাদ দিলেন? এই অমূল্য উপমাটি পরিত্যক্ত হওয়াতে মূলের আবেদন ইংরেজিতে সঞ্চারিত হল না।

প্রত্যাখ্যাত হলে কর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন,

আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষে অগ্নিসম তেজে
কে সে অভাগিনী।

কুন্তীর এই উক্তিতে নির্বাক কর্ণের লজ্জিত হওয়ার চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। কর্ণের অপমান কুন্তীকে ক্ষুব্ধ করেছে, তাঁর চিত্তকে দগ্ধ করেছে। অভাগিনী কুন্তী সে অপমান সেদিন সহ্য করেছিলেন নিজেকে দগ্ধ করে। এই সংবাদ এখন কর্ণকে নিশ্চয়ই বিচলিত করেছে। ইংরেজি অনুবাদে এই সংবাদ-অংশটি সম্প্রসারিত। কুন্তীর আবেগের উত্থান-পতনটি সযত্নে রচিত। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ, 'You stood speechless, like a thunder cloud at sunset flashing with an agony of suppressed light', 'আরক্ত আনত মুখ'-এর অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ একটি উপমার আশ্রয় নিলেন। আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে রবীন্দ্রনাথ যখন এই চরণটি লিখেছিলেন তখন তিনি বজ্রগর্ভ মেঘের কথা ভেবেছিলেন। ঐ বিশেষণগুলি (আরক্ত, আনত) আসলে ঐ রকম একটি বিস্তৃত উপমার নির্যাস। অনুবাদে মূলের গূঢ় অর্থকে দীপ্ত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। হস্তিনানগরে দুর্যোধন কর্ণকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সেদিনের কুন্তীর অপার আনন্দ আজ কর্ণের গোচর করলেন তিনি।

ধন্য তারে।
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি

উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক-সাথে। * * *
সেইক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি যে তোমারে ওগো বীরমণি,
আশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

রবীন্দ্রনাথ এই চরণগুলির অনুবাদ করেছেন কেটে ছেঁটে, 'But there was one woman of the Pandava house whose heart glowed with joy at the heroic pride of such humility ,—even the mother of Arjuna !' বীরাঙ্গনা মাতার ছবি ফুটেছে এই অনুবাদে। কিন্তু 'অশ্রুবারি-রাশি' দিয়ে অভিষেক করার মধ্যে যে বেদনামাধুর্য ঝরে পড়েছে বাংলা রচনায় অনুবাদে তা নেই। 'বীরমণি' কথাটির ইংরেজি অনুবাদ সম্ভব কিনা জানি না কিন্তু এই শব্দটিতে মাতৃস্মৃতির যে মধু সঞ্চিত রয়েছে তাতো পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথ কি সমস্যায় পড়েছিলেন তা আমাদের স্পষ্ট জানা নেই, দেখা যাচ্ছে এখানে সমস্যার সমাধান হয় নি।

এরপর কর্ণ কুন্তীর যুদ্ধক্ষেত্রে আসার কারণ জানতে চাইলেন। কেননা তিনি তো 'কুরুকুলসেনাপতি'। কর্ণের এই উক্তি কুন্তীর কাছে মর্মান্তিক। এখানে কুন্তীর মথিত চিত্তের দীর্ণ উচ্চারণের প্রত্যাশা জাগবে দর্শকের। কুন্তী উত্তর দিয়েছিলেন, 'পুত্র ভিক্ষা আছে— / বিফল না ফিরি যেন।' অনুবাদে 'আমি কুরু সেনাপতি' পরিত্যক্ত। এবং কুন্তীর উক্তির অনুবাদ এইরকম 'I have a boon to crave'. দ্বিতীয় ছত্রটি অনুবাদে অনুক্ত। কর্ণ এরপর বললেন, 'ভিক্ষা মোর কাছে! / আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর / যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।' অনুবাদে পাই, 'Command me, and whatever manhood and my honour as a kshatriya hermit shall be offered at your feet', 'পৌরুষ' এবং 'ধর্ম'র অনুবাদ manhood এবং honour কোনো দিক থেকেই সমর্থন করা যায় না। বিশেষত ধর্ম কথাটির মধ্যে ভারতীয় 'ধর্ম' পালনের যে অলঙ্ঘ্য নির্দেশ রয়েছে সে ভাবটি অনুবাদে স্পর্শ করতে পারে নি। কুন্তী কর্ণকে পাণ্ডবশিবিরে ফিরে আসবার জন্যে ব্যাকুল আহ্বান জানালে কর্ণ বললেন,

সাম্রাজ্যসম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহ মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

এই অংশ অনুবাদে বর্জিত। এর কোনো সদুত্তর আমাদের জানা নেই। যাই হোক, কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে কুন্তী বলেছিলেন,

পুত্র মোর, ওরে
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি এক দিন—সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে—
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহো আপনার স্থান।

ইংরেজি অনুবাদে এই অংশের মাত্র এই সংবাদটি পাই, 'Your own God-given right to your mother's love' বলা বাহুল্য, কর্ণের সংশয়কে যখন অনুবাদে কিছুটা অনুক্ত রাখা হয়েছে তখন কুন্তীর উত্তরের অংশেও অনুরূপভাবে কিছু বর্জিত হবে সন্দেহ নেই। কুন্তীর মাতৃহৃদয়ের আবেগঘন রূপটি অনুবাদে দেখানো হল না। 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে'র দর্শক-পাঠকের কাছে আবেদন রয়েছে কাহিনীটির গীতিধর্মিতায়। গদ্য-অনুবাদে সে গীতিধর্মিতা বর্জিত (সর্বদা নয়) হওয়ায় মূলের লিরিকমাধুর্য থেকে আমরা বঞ্চিত হই। কোনো কোনো জায়গায় সেই কারণে অনুবাদ নিরুত্তাপ।

কুন্তীর ব্যাকুলতা কর্ণকে স্পর্শ করেছে। তিনিও হৃদয়াবেগে বিগলিত। তারই ফলে দেখি কর্ণ স্মৃতিরোমন্থনে করুণ। কর্ণ বলছেন, 'পুরাতন সত্যসম / তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।' অনুবাদে পরিত্যক্ত। কর্ণ বলছেন,

গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃতি আলয়ে,
চেতনাপ্রত্যূষে। * * *

অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।

অনুবাদে এ দুটি অংশ একটি বাক্যে পরিণত, 'Your voice leads me back to some primal world of infancy lost in twilight consciousness'. বাংলা রচনায় 'মায়াচ্ছন্ন লোক', 'বিস্মৃত আলয়', 'চেতনাপ্রত্যুষ' কত অর্থবহ। এসব শব্দ ব্যঞ্জনাগর্ভ। রোমাণ্টিক মায়াবী জগৎ ও জীবনের এক রহস্যলোক উদ্ঘাটন করে শব্দগুলি। অনুবাদে এসব বাদ পড়ায় ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে গেল। ইংরেজি বাক্যে লিরিকের বড়ই টানাটানি।

স্মৃতিচারণার মুহূর্তেও বর্ণ কিন্তু আত্মবিস্মৃত নয়। সেজেন্যেই তিনি কুন্তীকে সম্বোধন করেন, 'রাজমাতঃ অয়ি'। কর্ণের দোলাচলচিত্তের নাটকীয় প্রকাশ এইভাবেই দেখানো হয়েছে। অনুবাদে কথা দুটি নেই। কর্ণের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনি,

'জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ'—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি।

অনুবাদে আছে "open your veil, show me your face!" her figure always vanished. দ্বিতীয়, তৃতীয় চরণের এই অনুবাদ নিতান্তই দায়সারা গোছের। কর্ণের 'তৃষার্ত উৎসুক স্বপন' স্বপ্নের শরীরী রূপ নিয়েছে। স্পর্শকাতর শরীর মাতৃদেহের মধ্যে তৃষ্ণার শান্তি খুঁজেছে। অনুবাদে তৃষ্ণার তীব্রতা হারিয়ে গেছে। দুঃসহ বেদনায় কর্ণ কুন্তীকে বলেছেন, 'কোথা যাব, লয়ে চলো'। কুন্তীও বলেছেন কর্ণকে পাণ্ডবশিবিরে যেতে। কর্ণ বললেন,

হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন। হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে! দেবী কহো আরবার
আমি পুত্র তব।

ইংরেজি অনুবাদে এই চরণগুলি পিষ্ট হয়েছে। কর্ণের উক্তি এইরকম, Am I there to find my lost mother for ever?' মূলে দেখতে পাই কর্ণের

স্বপ্নের ঘোর এখও কাটে নি। তাঁর বঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষোভও উচ্চারিত হয়েছে। কর্ণের গতিপথ চিরদিন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। ধ্রুবতারার প্রতি নির্ভরতা কর্ণের নেই। ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং ভাগ্যগর্বিত কর্ণ-পাণ্ডবপুত্রদের প্রতিতুলনা ঐ চরণগুলিতে বিস্তৃত। এই অংশের শেষ বাক্যটি কর্ণের আর্তনাদ। অনুবাদে এইসব ভাবনা, বেদনা অনুচ্চারিত রয়ে গেল। কুন্তী কর্ণকে পুত্র বলে সম্বোধন করলে কর্ণ তাঁর ভাগ্যহত জীবনের জন্যে কুন্তীকে অভিযুক্ত করছেন। কেন কুন্তী কর্ণকে নির্বাসন দিয়েছিলেন ? কেন তিনি অবজ্ঞাত ? তারপর কর্ণ বলেছেন,

কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ
সে কথার দি'য়োনা উত্তর।

অনুবাদে আছে, 'Leave my question unanswered। Never explain to me what made you rob your son of his mother's love !' কর্ণের উক্তিতে বিশ্ববিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল। ইংরেজি রূপান্তরে বিশেষের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলা রচনায় সামান্য থেকে বিশেষে চলে আসা। সামান্যকে উল্লেখ করার জন্যে কুন্তীর প্রতি কর্ণের অভিযোগ আরও মর্মান্তিক, আরও ব্যাপক। কর্ণের শেষ বাক্যটির (কহো মোরে, / আজ কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।) রূপান্তর এই রকম, 'Only tell me why you have come to-day to call me back to the ruins of heaven wrecked by your own hand ?' এ নূতন সংযোজন। বাংলার সাদামাঠা বাক্যটি ইংরেজিতে উপমাসমৃদ্ধ হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই রূপান্তর কর্ণের বেদনার গভীর রূপটিকে স্পষ্ট করেছে।

কুন্তী শেষ পর্যন্ত বলেছেন, 'ভৎ'সনা তোর শতবজ্রসম / বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম শত খণ্ড করি।' তর্জমায় পাই, 'I am dogged by a curse more deadly than your reproaches.' শতবর্ষের ভয়ঙ্করতা এই তর্জমায় উন্তাসিত হল না। কুন্তীর হাহাকার,

তবু হায়,
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে।

ইংরেজি তর্জমায় আছে, 'Through the great rent that yawned for my deserted first-born, all my life's pleasures have run to waste' এই তর্জমা মূলকে স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু 'run to waste'-এর দ্যোতনা সমাপ্তির। মূলের ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতা এবং বিশ্বব্যাপী ভাবের অনুরণন ঐ বাক্যাংশে নেই। কুন্তী আরও বলেছেন,

বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতারে।

কুন্তীর এই অনিঃশেষ যাত্রার অম্লান চিত্র অনুবাদে ধরা পড়ে নি। অনুবাদকের এই স্বাধীনতা কতটা গ্রহণযোগ্য সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তিত করে। অমিয় চক্রবর্তীকে -লেখা বেশ কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে তিনি কত অবহেলা করেই না অনুবাদ করেছিলেন।

এর পর দেখি কর্ণের অনমনীয় দৃঢ়তা চূর্ণ হয়ে যায় কুন্তীর হাহাকারে। তিনি বলেন, 'মাতঃ, দেহো পদধূলি, দোহো পদধূলি, / লহো অশ্রু মোর।' অনুবাদে দ্বিতীয় চরণটিকে পাই। কিন্তু প্রথম চরণে কর্ণের হৃদয়ের আলোড়নটির প্রকাশ ঘটেছে নাটকীয়ভাবে। দুবার 'দোহো পদধূলি' উচ্চারিত হওয়ায় কর্ণের হৃদয়াবেগের তীব্রতা ফুটেছে। দ্বিতীয় চরণে সেই তীব্রতার অবসান। অনুবাদে অবশ্য একটা শান্তশ্রী ফুটে উঠেছে, কিন্তু নাটকীয় উত্তেজনাটুকু বাদ পড়ে গেছে। এরপর কুন্তী কর্ণকে নিজ অধিকার বুঝে নিতে বলেছেন,

রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো হে বৎস উদ্ধার।
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত

গাহিবেন বেদমন্ত্র—তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্নসিংহাসনে।

রবীন্দ্রনাথ এতগুলি চরণের অনুবাদ করেছেন মাত্র একটি ছত্রে, 'Be that as it may, come and win back the kingdom which is yours by right' প্রথমত, এতগুলি নামের সঙ্গে বিদেশীদের পরিচয় দেবার দায়িত্ব অনুবাদক নিতে চাইলেন না বলে অনুবাদে বাদ দেবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, মহাভারতীয় সংস্কার বিদেশীদেব থাকবার কথাও নয়। তৃতীয়ত, নাটকীয়তার দিক থেকেও সংক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ ভেবে থাকতে পারেন। এর পর কর্ণ বলেন,

মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে।

কুন্তীর পক্ষে বঞ্চিত কর্ণকে আবার মাতৃস্নেহ ফিরিয়ে দেওয়া সাধ্যাতীত — এই কর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ। এর অনুবাদ এইরকম, 'The quick bond of kindred which you severed at its root is dead, and can never grow again' ইংরেজি বাক্যটি সংবাদ বহন করে—বাংলা রচনায় লিরিকের বেদনা। কর্ণের কথায় হতাশায় কুন্তী ভেঙ্গে পড়েন, 'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর / দণ্ড তব।' অনুবাদে আছে, How God's punishment invisibly grows from a tiny seed to a giant life! রবীন্দ্রনাথ একটি উপমার সাহায্য নিয়েছেন। এ উপমা খ্রীষ্টীয় দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিক থেকে এই উপমা প্রয়োগের নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে।

বাংলা রচনায় এর পর কর্ণের বিদায় সম্ভাষণ। রবীন্দ্রনাথ এখানে মূলের যথাযথ রূপ অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন। কেবল শেষ তিন ছত্রের

শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেন নি। এমন হতে পারে যে কুন্তীর আবেদন

প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে কাহিনীটির শেষ হওয়া উচিত—রবীন্দ্রনাথ এরকমই ভেবেছিলেন। উদ্ধৃত তিনটি ছত্রের পূর্বে চারটি ছত্রে কর্ণের নির্মম অথচ করুণ বিদায়বার্তা উচ্চারিত,

> জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
> নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
> আমার নির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী
> দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।

এইখানেই যথার্থ নাটকের শেষ। পরের তিনটি ছত্র মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের মহিমাদ্যোতক কিন্তু শিল্পের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয়। হুমায়ুন কবীর এই কাব্যনাট্যটি অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এই তিন ছত্র বাদ দেন নি। তাঁর অনুবাদ এইরকম (Humayun Kabir · One Hundred and one Poems by Rabindranath Tagore), Only this benediction leave for me. Neither the lure of victory nor of fame nor of realm may ever turn me from the path of rectitude.

স্টার্জ মুর কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের কাহিনীটির নাম পরিবর্তন করে দিলেন। Karna and Kunti এই নামটি তাঁর পছন্দ হয় নি। তিনি কাহিনীটির নাট্যসম্ভাবনার দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন বলেই এ কাহিনীতে মাতা এবং পুত্রের দ্বন্দ্বটিকে প্রধান করতে চেয়েছেন। স্টার্জ মুর কাহিনীটির নাম দিলেন The Foundling Hero. এই নামকরণে নায়কের পরিচয়হীন এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত রূপের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তিনি 'Hero' অর্থাৎ বীর। নামকরণে মুরের নৈপুণ্য সহজেই লক্ষ করা যায়। মুর বাংলা জানতেন না বলে রবীন্দ্রনাথের বর্জিত অংশের রূপান্তর করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। মুর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অবলম্বনে যে কাহিনীটি রচনা করেছেন সেকথা জানিয়েছেন গোড়াতেই Adapted from English translation of Rabindranath Tagore's poem, Karna and Kunti. বিদেশীদের বোঝার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কর্ণ-কুন্তীর পরিচয় দিয়েছিলেন মাত্র দুটি ছত্রে। মুর সে পরিচয় আরও একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। কর্ণকে পরিত্যাগ করলেও কর্ণের কৌরব শিবিরে যোগদান পর্যন্ত

কুন্তী যে সব কিছুই জানতেন সে-কথা মুর তার 'পরিচয়ে' বলেছেন। কুন্তী যে পাণ্ডবজননী। সে জন্যে কর্ণ যে তাঁর পুত্র একথা তিনি গোপন রেখেছিলেন।

মুর নাটক আরম্ভ করেছেন এইভাবে। তৃতীয় বন্ধনীতে নাট্যনির্দেশ 'পর্দা উঠে গেলে দেখা গেল কর্ণ গঙ্গাতীরে ধ্যানমগ্ন। একজন নারী একটু দূরে, তিনি বসলেন। ক্ষণকাল নীরবতা।' মঞ্চসচেতন মুর যথার্থ নাটকীয় রীতিতে কাব্য-নাট্যের সূচনা করলেন। মুরের বিবরণে কুন্তী প্রথমে 'একজন নারী' রূপে পরিচিত। বলা বাহুল্য, নাটকীয় কৌতূহল বজায় রাখবার জন্যে কুন্তীর পরিচয় তিনি গোপন রাখলেন। কর্ণ পরিচয় দিলেন। অস্তগামী সূর্যের বন্দনা করছেন তিনি। কুন্তী জানালেন, যে-সূর্যের বন্দনা করছেন কর্ণ সেই সূর্যের সঙ্গে তিনিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কর্ণকে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বলেন, I do not understand মুরের নায়ক কিন্তু কুন্তীব এই উক্তিতে উত্তেজিত হয়ে উঠলে 'What can those words mean ? Wild as lunacy !' মুরের রূপান্তরে প্রশ্নাত্মক বাক্যটি তীক্ষ্ণ, শাণিত। দ্বিতীয় বাক্যটি একজন সৈনিকের উক্তি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। দুটি বাক্যই নাটকীয় উত্তেজনায় ভরপুর। এর পর রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বলেন, 'Your eyes melt my heart .' কিন্তু মুরের রূপান্তরে কর্ণের তেজোদ্দীপ্ত রূপটি অক্ষুণ্ণ, 'Yet their tone touched with flame this conscious cheek,' 'flame' কথাটি লক্ষণীয়। কর্ণের হৃদয়ের উত্তাপকে ঐ একটি শব্দের সাহায্যে দর্শক শ্রোতা স্পর্শ করে। কর্ণের উত্তাপ যখন শান্ত হ'ল, তাঁর চিত্তে তখন আবেগের ফল্গুধারা। রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন বরফাচ্ছাদিত পর্বতের সঙ্গে। যেমন করে বরফ গ'লে পর্বত উদ্ভাসিত হয় তেমনি করে কর্ণের কাঠিন্য গলে যায়। কিন্তু মুরের রূপান্তরে পাই

> To flush some snow-capped mountainous event
> Long hid in night. How thine eyes sadden me !

আগের বাক্যে পেয়েছি flame, অর্থাৎ কর্ণের হৃদয় জ্বলে উঠছে এবং তারই আভাস তাঁর মুখে। সে মুখ আরক্তিম। বরফাচ্ছাদিত পর্বতে গুহায়িত বহুকালের কোনো ঘটনা ঝিকিয়ে (flush) উঠছে কর্ণের হৃদয়ে। এর পরই কর্ণের বেদনার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় কর্ণের নম্ররূপের পরিচয়—মুরের রূপান্তরে কর্ণের পুরুষোচিত দৃপ্ততার প্রকাশ। কুন্তীর অপ্রত্যাশিত উক্তিতে,

Things that not even thought-winged memory

Can travel to, so far they lie behind,

Might yield such power as over-glooms my soul.

রবীন্দ্রনাথের ভাবকে ছুঁয়ে মুর কর্ণের বক্তব্যকে বিস্তৃত করেছেন। মুর কর্ণকে যেন একটু প্রগল্‌ভ করে তুললেন। আসলে বীর চরিত্রের ভাষণে যে অতিশয়িত রূপ সেক্সপীরীয় নায়কচরিত্রে লক্ষ করা যায় মুর সেই রীতিই এখানেই অনুসরণ করেছেন। উপমাসমৃদ্ধ (though'-winged memory can travel so) ভাষণ নায়কের রোমান্টিক বৈভবকে সূচিত করে। কর্ণ সেইরকম বীর। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ এরপর বলেন, 'Tell me, strange woman, what mystery binds my birth to you'. মুরের রূপান্তরে পাই, 'What mystery, O strange woman, links my birth/And earliest hours to thee ?' 'O' অব্যয়টি নাটকীয় গুণে সার্থক, 'earliest hours' বোধ করি কুন্তীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা (তিনি বলেছিলেন সূর্যের আলো-কে তিনিই প্রথম কর্ণকে চিনিয়েছিলেন)। অথবা রবীন্দ্রনাথের 'earliest memory'র প্রতিধ্বনি। কুন্তী কর্ণকে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। অস্ত গেলে তিনি আত্মপরিচয় দেবেন। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে সূর্যকে (prying sun) অন্তকালের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফেলুক এরকম বুঝিয়েছেন। মুর সূর্যের সম্বন্ধে লিখেছেন The scrutiny of day's eye'. মুরও এখানে অলঙ্কারের লোভ ত্যাগ করতে পারেন নি। রোমান্টিক কল্পনা এই উপমানকে টেনে এনেছে।

এরপর কুন্তী আত্মপরিচয় দিলেন। মুরও পাত্রীর (কুন্তীর) পরিচয়ে The woman পরিবর্তন করে লিখলেন Kunti. কুন্তীর পরিচয় পেয়ে কর্ণ বিস্মিত। 'Arjuna's mother ? Kunti ? ' কুন্তীও ঢোক গিলে বললেন 'Mother of Arjuna ..of thine opponent.' সংলাপে এ ধরনের ফুটকি ব্যবহারের তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়। চরিত্রগুলির দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে ঐ ফুটকি ব্যবহারে।

কুন্তী কর্ণের হস্তিনা নগরে প্রবেশের দৃশ্যটি যখন স্মরণে এনেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন 'কর্ণের প্রবেশ যেন নবোদিত সূর্যের মতো', স্টার্জ মুর উপমাটিকে বদলে দিলেন, 'So morning challenges night's brightest star !' মুর

কর্ণের অস্ত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রটিকে এই উপমার দ্বারা দর্শকের গোচর করালেন। অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণই মুরের বর্ণনার লক্ষ্য, বলা বাহুল্য, brightest star অর্জুন, এবং morning কর্ণ। উপমাটি সুন্দর। কর্ণের উপস্থিতিতে কুন্তীর চিত্তে যে স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল তার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় পাই, Whose eyes kissed your bare, slim body through tears that blessed you এখানে পাই কুন্তীর চোখের জলে চুম্বন। মুরের রূপান্তর এইরকম,

What wretched woman was it kissed thy limbs
With looks as fond as lips, if less courageous?

looks এর সঙ্গে lips এর উপমা গড়ে তোলাতে বক্তব্য স্পষ্ট হ'ল বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের সৌন্দর্য হারিয়ে গেল। আবার দৃশ্যেন্দ্রিয়ের (looks) সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রিয়ের (lips) যোগাযোগ ঘটিয়ে মুর দৃশ্যটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছেন —এও অনস্বীকার্য। কর্ণকে ব্রাহ্মণ কৃপ বংশগৌরবের খোঁটা দিলেন। কর্ণ নির্বাক। রবীন্দ্রনাথের তর্জমা, এই রকম, 'like a thunder-cloud at sunset flashing with an agony' মুর রূপান্তরিত করলেন,

Like full charged thunder-cloud at sunset, halted
By the sun's will to end both day and storm
With glory, bidden retire, though swollen with hail,
Loud claps and bladed light, even thus thou stoodst,
An agony of worth suppressed.

মুর রবীন্দ্রনাথের উপমাটিকে বিশদ করেছেন। বলা বাহুল্য, রোমাণ্টিক নাটকে উপমা নির্মাণের রীতিনীতি মুর এখানে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন। এই উচ্ছ্বাস ঘটনায়, চরিত্রে এবং দৃশ্যে অনেক সময়েই ব্যাপ্তি এনে দেয়।

কর্ণকে দুর্যোধন অঙ্গরাজ্যের অধিপতিরূপে বরণ করলেন। কর্ণ বিনয়ের সঙ্গে তা গ্রহণ করলেন। পাণ্ডবরা বিদ্রূপ করলেন। চিকের আড়ালে থেকে কুন্তী সব দেখলেন। দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কুন্তীর চিত্ত অভিষিক্ত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ কুন্তীর মুখে এই ভাষা দিয়েছেন, 'Praised be Duryodhana' আর মুর লিখলেন 'Blessed be he, Duryodhana'. এই শব্দের পরিবর্তনে দুজনের রচনায় কুন্তীচিত্তের দুই রূপ প্রকাশিত হয়। উভয়ের বর্ণনাই স্বাস্থ্য

কাল পাত্র উপযোগী। কিন্তু মুর বাংলা না জেনেও বাঙালী মায়ের স্নেহময়ী রূপটিকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। কর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত হলে পাণ্ডবেরা ক্রূর হাসিতে ধিক্কার দিয়েছিল কর্ণকে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কুন্তী কর্ণের গৌরবে গর্বিত এবং দীপ্ত। স্টার্জ মুর কিন্তু কুন্তীর মর্মবেদনাকেও উদ্ঘাটিত করলেন,

and yet

One heart thronged round by those insulters, glowed
While thine heroic meekness proudly braved them
Glowed...

কর্ণ যে পাণ্ডবের ধিক্কারকে অহঙ্কার দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন মুর-অঙ্কিত কুন্তীর চোখে তা সহজে ধরা পড়েছিল। আসলে মুর দেখেছেন কর্ণের 'বীরত্বকে। সেজন্যে 'অহঙ্কার' এবং 'উপেক্ষা' এই বীর চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব। কেবল তাই নয়, কর্ণ-চরিত্রের পূর্বাপর সামঞ্জস্যও এইভাবে রক্ষিত হয়েছে।

কুন্তীর কথায় কর্ণ বিচলিত হন নি। রবীন্দ্রনাথ কর্ণের গম্ভীর রূপটিকে চিত্রিত করেছেন। কেবল একটি প্রশ্নে But what brings you here alone, Mother of kings, মুর রূপান্তরে ঈষৎ বদলে দিলেন,

But what should bring thee alone at nightfall,
Mother of kings?

'at nightfall' এবং 'alone' এ দুটি শব্দ কুন্তীর আগমনে কর্ণের বিস্ময়বোধকে বাস্তব ভূমিকায় স্থাপিত করলেন মুর। কুন্তীর আবেদনের উত্তরে কর্ণ ক্ষত্রিয়-রূপে সব দিতে পারে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। মুর এই অংশ বর্জন করলেন। কেন? ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা সম্বন্ধে বিদেশী পাঠক কিছু জানেন না বলে? এই অংশ বাদ দেওয়ায় কর্ণের চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিকই অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেল।

কুন্তী কর্ণকে বুকে টেনে নিতে চাইলে কর্ণ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, a small chieftain of lowly descent. মুরের রূপান্তর দেখুন a paltry chieftain born / Wrechedly, meanly bred?' যতদূর বুঝি, মুর শ্লেষটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেন আরও ঘনিষ্ঠভাবে। দ্বিতীয় ছত্রের Wretchedly কর্ণের বাল্যকালের স্মৃতিকে আরও নিবিড়ভাবে দর্শক স্পর্শ করতে পারে। কুন্তী পুত্রস্নেহাতুর—তৃষিত বক্ষে ফিরে আসবার জন্যে কুন্তী ব্যাকুল প্রার্থনা

জানালেন। বিধাতার অধিকারেই কর্ণ ফিরে আসুক একথাও কুন্তী জানালেন। রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় আছে God-given right. মুর এও বর্জন করেছেন। পরিবর্তে মাতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসাব অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই ভালোবাসার অধিকারেই কর্ণ কুন্তীকে মা বলে গ্রহণ করুক।

বলা বাহুল্য, কুন্তীর স্নেহকাতরতায় কর্ণ অভিভূত। তিনি স্মৃতিরোমন্থন করছেন। তখন সমস্ত চরাচর অন্ধকারে লুপ্ত। প্রকৃতি স্তব্ধ। রবীন্দ্রনাথের গদ্য অনুবাদে নির্জনতার এই গম্ভীর রূপটিব সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। মুরও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। মুরের ভাষায় একটু অতিরিক্ত আভা পাই যেন। বর্ণনায় বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আভা। কিছু অংশ তুলে দিই,

Augmenting dusk
Subdues earth, silence weighs the waters down .
Thy voice draws me apart, bids fade afar
These neighbour camps and river, and lo ! I grope
Through that first world I knew and recollect
So sparely, for some clue to thy late speech.
In vain ! .....

যথার্থ নাটকীয় ভাষায় মুর কর্ণের ভাবনাকে স্পষ্ট করেছেন। আমরাও যেন কর্ণের শৈশবস্মৃতির সেই ধূসর প্রান্তে চলে যাই সন্তর্পণে। কর্ণের উক্তি এইভাবে বিন্যস্ত হওয়ার ফলে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'এর কি রীতিতে অনুবাদ করা উচিত আমরা যেন তা জেনে যাই। কর্ণ যখন কুন্তীর সঙ্গে কথা বলছেন তখন দূরে পাণ্ডবদের শিবিরে আলো জ্বলছে—এদিকে কৌরব শিবিরের। যেন এক আসন্ন বিপর্যয়ের স্তব্ধতা এখানে বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে পাই, 'like the suspended waves of a spell-arrested storm at sea'. মুরের কল্পনা পরিবেশের ভয়ঙ্করতা আরও ঘনিষ্টভাবে স্পর্শ করছে, 'Like swollen waves heaved up on a black sea, / Yet movelessely suspended.' এই উপমাটি নাটকীয় চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব এনে দিয়েছে।

কুন্তীর সমস্ত বেদনাকে ছাপিয়ে কর্ণের কারুণ্য কিভাবে প্লাবিত হয়েছে মুরের রূপান্তরে—তা দেখা যাক,

Thy voice asserts thee Arjuna's mother. Yet
Breaks into sobs with knowledge of what woman
Gave birth to me.

সমুদ্রের রুদ্ধ তরঙ্গ Breaks into sobs—এইখানে উপমাটির সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ আক্ষরিক। মুর নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন।

যাই হোক বিচলিত কুন্তী কর্ণকে দ্রুত পাণ্ডবশিবিরে চলে আসতে বলেছেন। কর্ণও যেন প্রস্তুত। কর্ণের কাছে, 'যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ—মিথ্যা মনে হয়।' রবীন্দ্রনাথ মূলে সেই তর্জমায় একটি নূতন উপমা যুক্ত করেছিলেন, 'Victory and fame and the rage of hatred have suddenly become untrue to me, as the delirious dream of a night in the serenity of the dawn.' এখানে গদ্যে রং ধরে পদ্যের। মুর উপমাটিকে বাদ দেন নি। কিন্তু বদলে দিয়েছেন,

as frantic nightmare
Shows in the moist serenity of dawn

frantic nightmare অথবা delirious dream of a night-এর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, কোন্‌টি কাব্যনাট্যের পক্ষে উপযোগী ভাষা—ভাববার বিষয় বটে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় আবেগের স্পর্শ বেশি যদিও সে আবেগ গদ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। এরপর কর্ণ কুন্তীকে জিজ্ঞেস করলেন কুন্তী যেখানে কর্ণকে নিয়ে যেতে চাইছেন সেখানে তিনি কি মা-কে ফিরে পাবেন? কুন্তীর মথিত চিত্তের একটি মাত্র বাক্য পাই বাংলা রচনায়, 'পুত্র মোর।' মুর চমৎকারভাবে এখানে একটি নাটকীয় কার্যের বর্ণনা দিয়েছেন। কর্ণের কথা শোনার পর কুন্তীর উক্তির আগে তৃতীয় বন্ধনীতে আছে 'about to embrace him'. মাতার দুবাহুর মধ্যে পুত্রের ঝাঁপিয়ে পড়ার কী ব্যাকুলতা প্রকাশিত হল ঐ নাটকীয় নির্দেশের জন্যে। এরপরই কুন্তীর উক্তি 'O, my son!'

কুন্তীর ব্যাকুল আহ্বানকে কর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন। কাব্যনাট্যের এই অংশটি মাত্র ঘটনার উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছে। কর্ণের আবেগ এখানে রুদ্ধ, কিছুটা থমথমে—যেন একটা প্রাসাদে বন্দী এক নিঃসঙ্গ মানুষের ব্যর্থতা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মুর কর্ণের হৃদয়ের এই আরোহণ অবরোহণ-কে লক্ষ

করেছেন। তিনি এখানে যথার্থ নাট্যভাষাকে খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আর অনুসরণ করছেন না, কর্ণের রুদ্ধকণ্ঠ এবারে পাষাণ ভেদ করে বেরিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় আবেগের তীব্রতা অবশ্যই আছে কিন্তু তা গদ্যে বিন্যস্ত হওয়ায় ঈষৎ বিবরণধর্মী। মুরের ভাষা,

Not yet !

I have a mother gentle, meek and dear,
Who gave me her best life, day after day.
Thou thirstest for my love , must she not hunger,
If now I quench thy thirst ? What through this glory
Thou offerest me be mine, it cannot be
So mine is the place I fill ! Thou thirstest ?
Why, then, was I flung out like weed torn up
From its first soil, across king's garden wall ?
Why was this murderous gulf set 'twixt myself
And Arjuna, converting to the dire
Attraction of hate that of kind, near kinship ?
(a pause)
Thy silence aches, I feel thy shame work through
The darkness, till that tingles and my flesh
Dreads its contact. (pause)

I clench thy dumbness here

As the wise hand will crunch the stinging weed
Never reply ! Leave thou my question...
As is a child exposed in homeless night !

এই উক্তিতে মুর তৃতীয় বন্ধনীতে দুবার a pause ব্যবহার করেছেন। এতেই বোঝা যাবে মুর আবেগের আরোহণ-অবরোহণকে কত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। গতি-বিরতির সংঘাতে ভাষা কখনও উত্তাল কখনও নম্র।

এরপর মুর রবীন্দ্রনাথকে প্রায় বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। বিশেষণ,

কর্তা, ক্রিয়া, কর্মের কিছু অদলবদল নিশ্চয়ই আছে। কুন্তী যখন বুঝলেন কর্ণ কিছুতেই পাণ্ডবপক্ষ নেবেন না তখন আত্মধিকারে নিজের ভাগ্যকে তিনি মেনে নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বিধাতার শাস্তি একটি ক্ষুদ্র বীজরূপে ছিল। আজ তা মহীরুহে পরিণত। রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ অবশ্য মুর গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখেছেন,

The devious hazards of confused events,

Returned a giant foe to smite he sons .

Punished of God am I !

এই রূপান্তরে তৃতীয় চরণটি নিঃসঙ্গতার দ্যোতক। কর্ণ তো এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। কর্ণের বিদায় সম্বোধন যেমন করুণ তেমনি শান্ত,

আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম।

রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় পাই, 'Peaceful and still though this night be, my heart is full of the music of a hopeless venture and baffled end'. বাংলা রচনার 'স্তব্ধতা' এবং 'শান্তরূপ'—যা অনন্ত রাত্রি এবং আকাশকে পরিব্যাপ্ত করে আছে তর্জমায় তা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। মুরের রূপান্তর এইরকম,

This heart beats to the tune of hope forlorn,

Drums to a baffled close !

রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় পাই কর্ণ কুন্তীকে অনুরোধ করছেন কৌরবপক্ষ ছাড়বার কথা কুন্তী যেন না বলেন। মুর একে একটু প্রসারিত করলেন,

Never ask me then,

To leave my valiant Kauravas to their doom,

Thou canst not offer terms which they can take ;

And I embrace no fortune they share not.

এখানে কর্ণের সততা পরিস্ফুট। একজন যথার্থ বীরের ধর্মপালনের আন্তরিকতাও এই রূপান্তরে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। গোড়া থেকে মুর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই লক্ষ করে এসেছিলেন। যবনিকা যখন নেমে আসে তখন মুর তৃতীয় বন্ধনীতে লেখেন as she turns to go, the scene closes, মুর শ্রব্য নয়—কাহিনীটিকে দৃশ্যই করতে চেয়েছেন।[২]

১. স্টার্জ মুরের রচনাটি দুষ্প্রাপ্য। মুরের রচনাটির সঙ্গে পাঠকের পরিচিতির জন্যে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি। এই রচনাটি লণ্ডন থেকে শ্রীমতী অরুনিমা রায় ফোটোকপি করে আমাকে পাঠিয়েছেন।

২. বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অমিত চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্টার্জ মুরের পত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীভবতোষ দত্ত। সেজন্তে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয়

মঞ্জু ঘোষ

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয় 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভার' ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই[১] বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত ও অভিনীত হয়। অভিনয়ের তারিখ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী। সাধারণী পত্রিকার[২] বিবরণে জানা যায়:

"কল্য শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবনে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়াছিল। · ··· তাহার পর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নামে একটি গীতিকাব্য অভিনীত হয়।"

ইন্দিরা দেবী তাঁর 'শ্রুতি ও স্মৃতি'-তে এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "জ্যোতিকামশায়দের কি এক বিদ্বজ্জন সভা ছিল, তাতে বঙ্কিমবাবু আসতেন, আর সেই উপলক্ষেই প্রথম 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয় শুনেছি।"[৩]

এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত বিদগ্ধ সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, বিহারীলাল গুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতিরাও এই সভায় যোগ দিয়ে অভিনয় দেখেন। সাধারণের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম অভিনয়। এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর এবং 'মানময়ী'তে ইন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর এই দুটি অভিনয় তাঁর পরিবারের লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার ব্যাপারে বিশেষ করে সুর রচনার কাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে কোন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন নি। তিনি সংগীত ও কনসার্টের ভার নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রধান

ভূমিকায় এই অভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"এই দুটি গীতিনাট্যের (বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া) অভিনয়ে আমি-ই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল।"[৪] বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এই অভিনয় বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় উপস্থিত[৫] ব্যক্তিদের মুগ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে[৬] এই অভিনয়ের প্রশংসা করেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই মুগ্ধ হন যে তিনি একটি গান রচনা করে ফেলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই অভিনয় না দেখেই কেবলমাত্র অভিনয়ের সংবাদ[৭] পেয়ে খুশী হয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র[৮] লেখেন। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'শ্রুতি ও স্মৃতি'তে লিখেছেন '

"রবিকাকা যখন বাল্মীকি সেজে মধ্যমে 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা' তাঁর তখনকার পূর্ণস্বর সুকণ্ঠ রামপ্রসাদী সুরে গাইতেন তখন সে যে কি থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি হত তা' যারা না দেখেছে না শুনেছে, তাদের কি করে বোঝাব।"[৯] সরস্বতীর ভূমিকায় প্রতিভা দেবীর অভিনয়ও সুন্দর হয়েছিল। সাধারণী পত্রিকার[১০] বিবরণে পাওয়া যায় .

" প্রতিভা নাম্নী তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগদেবী রূপে অভিনয় করেন। বঙ্গ-কুল-কুমারী কর্তৃক রঙ্গাব্দী এই প্রথম উজ্জ্বলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ ভূমির নব কলেবরের এই অভিষেকক্রিয়ায় প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন। তিনি সুকণ্ঠা, গীতিনিপুণা সতেজনয়না এবং ধীরপদবিক্ষেপকারিণী। তাঁহার গীতিভিনয়ে দর্শকবৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন।"

প্রথম দস্যুর ভূমিকায় অক্ষয় মজুমদারের অভিনয়ও প্রাণোচ্ছল হয়েছিল। পরে অভিনীত 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বহু অভিনয়ে এই ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি প্রচুর প্রশংসালাভ করেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ছাদে পাল খাটিয়ে, ষ্টেজ বেঁধে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়। কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'অতীতের স্মৃতি'তে বলেছেন "১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম অভিনয়ের সময় একটু দুর্ঘটনা ঘটেছিল মনে হয়। ষ্টেজ বাঁধা হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছাদে। ঝড় উঠে সমস্ত বাঁশের কাঠামো ভেঙেচুরে একেবারে তছনছ করে দেয় তবু এই অভিনয় বন্ধ হয় নি।"[১১]

এই অভিনয়ের উৎসাহের ও মঞ্চসজ্জার উল্লেখযোগ্য বিবরণ রয়েছে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে। তিনি বলেছেন - "প্রথম যখন ইহাদের বাড়ীতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয় হয় তখন জ্যোতিবাবু নূতন শিকারী, বন্দুক চালনা প্রভৃতিতে তখন তাঁহার প্রবল ঝোঁক, অভিনয় উপলক্ষে তিনি নিজেই শিকার করিতে বাহির হইলেন, সত্যিকারের পাখী দেখাইবেন এই অভিপ্রায়। কিন্তু বিধাতার এমনি পরিহাস যে, সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তবু একটা পাখীও মারিতে পারিলেন না। শেষে সন্ধ্যার পর হতাশ হইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি কতকগুলি জীবন্ত বক লইয়া যাইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে দুইটি বক ক্রয় করিয়া পথে মারিয়া বাড়ী আনেন। তাহাই অভিনয়ে প্রদর্শিত হইয়াছিল।"[১২]

এই অভিনয়ে মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করাব চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য 'বাল্মিকীপ্রতিভা'র পূর্বে ঠাকুরবাড়ীতে নব নাটকের অভিনয়ের সময় দৃশ্যগুলিকে বাস্তবানুগ করা হয়েছিল এবং এই দৃশ্যসজ্জা খুব প্রশংসাও লাভ করেছিল।[১৩] প্রথম অভিনয়ের এক সপ্তাহ পরেই আবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয়।[১৪] ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কালমৃগয়া' থেকে কিছু অংশ নিয়ে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। এর পূর্বে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র যেসব অভিনয় হয় তা প্রথম সংস্করণকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম অভিনয় হয় ১২৯২ সালের ২০শে ফাল্গুন। এই অভিনয়েও রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকার অভিনয় করেন।[১৫] এরপর আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য টাকা তুলবার প্রয়োজন হলে বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হয় ষ্টার থিয়েটারে টিকিট বিক্রী করে।[১৬] বাল্মীকিপ্রতিভার সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অভিনয় হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে।[১৭]

এই অভিনয়ের ইতিহাস সম্পর্কে ইন্দিরাদেবী লিখেছেন :

"বাবা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) একবার বিলেত থেকে আসবার সময়ে তাঁর সহযাত্রী তখকার লাটপত্নী লেডী ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ী আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ...কলকাতায় আসবার পর লাটপত্নী এই নিমন্ত্রণরক্ষার অভিপ্রায় জানালে তাঁর জন্য বাল্মীকিপ্রতিভার একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা

হয়।"[১৮] লেডী ল্যান্সডাউনের সঙ্গে ছোটলাটপত্নী লেডী এলিয়ট ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ।[১৯] ফলে নানারকম ব্যবস্থাও হয়েছিল। এবারের অভিনয়ে ষ্টেজ সাজানোর ভার পড়েছিল নীতিন্দ্রনাথের উপর। তিনি নানাভাবে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বিভিন্ন দৃশ্যগুলিকে বাস্তবানুগ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ষ্টেজে বনজঙ্গল, পদ্মবন ও বৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছিল। পিছনে আয়নাতে আলো ফেলে বিদ্যুৎ এবং ছাদের এপাশ থেকে ওপাশ দম্বেল গড়িয়ে গড়িয়ে সেইদিনের আওয়াজও করা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'তে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।[২০] দিনেন্দ্রনাথ দস্যু সেজে তাঁর টাট্টু ঘোড়ার পিঠে লুঠের মাল বস্তা বোঝাই করে ষ্টেজে হাজির হয়েছিলেন।[২১] 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বিভিন্ন চরিত্রের সাজসজ্জাতেও এবার কিছুটা নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য দস্যুদের থেকে বাল্মীকিকে আলাদা করার জন্য পিঠের দিকে লম্বা জোব্বা মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। একটা শাঁখও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে দস্যুদের ডাকবার জন্য।[২২] বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটির সঙ্গে আমরা পরিচিত তা এই সময়ই তোলা হয়।[২৩]

দস্যুদের কাবুলীওয়ালাদের মতো সমস্ত ঢাকা পোষাকে সাজানো হয়েছিল। এর আগের সব অভিনয়ে দস্যুদের সারা-শরীর ঢাকা পোষাক ছিল না। খালি গায়ের উপর বুকে সরু লাল শালুর ফেটি বাঁধা থাকতো। কিন্তু এবারের অভিনয়ে সাহেব-মেমরা আসবেন। তাঁদের সামনে খালি গায়ে অভিনয় করা ঠিক হবে না তাই কাবুলীওয়ালাদের মতো পোশাক তৈরি করা হয়েছিল।[২৪]

অক্ষয় মজুমদারের দস্যু সর্দারের সাজটি চমৎকার হয়েছিল। তাঁর বিশাল ভুঁড়ির উপর বালিশ বেঁধে সেটিকে আরও বিশালরূপ দেওয়া হয়েছিল। অভিনয়ও করতেন-দুর্দান্ত। কোন অবস্থাতেই কেউ তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারতো না। এবারের অভিনয়ে তিনি ষ্টেজে একটু অসুবিধায় পড়েছিলেন কিন্তু সেটাও প্রবল প্রতাপের সঙ্গে মানিয়ে দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "সিন উঠল। এখন অক্ষয়বাবুর পালা, তিনি কেন জানি না, পাশ থেকে ষ্টেজে না ঢুকে ও পাশ দিয়ে ঘুরে মাঝখান দিয়ে ভিতর থেকে রী-রে-রে বলে

হাঁক দিয়ে যেই তেড়ে বেরিয়েছেন, নিতুদা অনেক-সব দড়িদড়ার কীর্তি করেছিলেন বলেছি, এখন তারই একটা দড়িতে অক্ষয়বাবুর গলা গেল বেঁধে। কিছুতেই আর খোলে না। মহাবিপদ; আমি পিছন থেকে আস্তে আস্তে দড়িটা তুলে দিতেই অক্ষয়বাবু একলাফে ষ্টেজের সামনে গিয়ে গান ধরলেন

আঃ বেঁচেছি এখন।
শর্মা ওদিক আর নন।
গোলমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন
সা—ক সটকেছি কেমন।

এই গান গাইতেই, আর তার উপর অক্ষয়বাবুর গলা, চারিদিক থেকে হাততালি পড়তে লাগল। প্রথম গানেই এবারে মাৎ।[২৫] লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে মামুলি পৌরাণিক রীতি অনুসারে লাল ও সাদা জরির বেশে সাজানো হতো।[২৬] এই অভিনয়ে সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ইন্দিরা দেবী।[২৭]

রথীন্দ্রনাথ এই অভিনয় সম্পর্কে বলেছেন :

......it was performed in the courtyard of our house in the presence of Lady Lansdowne. The cast drawn from our own family, were nearly all accomplished musicians and some of them no mean actors" [২৮]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের লেডী ল্যান্সডাউনের পার্টিতে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের পর আর তেমন কোন অভিনয়ের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। আবার অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"Passages were obtained on a boat sailing from Calcutta to London. The evening before the boat sailed there was a party at Sir Ashutosh Chaudhuri's palatial residence, where a performance of father's operatic play 'Balmiki Pratibha' was given. Preparations had been going on for a long time and Dinendranath had been chosen to play the part of 'Balmiki'. Father, of course, had to be present." [২৯]

বিলাতযাত্রার আগে এই যে অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে এটি হলো

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চের অভিনয়ের বিবরণ। বিলেত যাওয়ার দিন স্থির হয়েছিল ১৯শে মার্চ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই যাত্রাদিনের কথা নির্ঝরিণী সরকারকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন।[৩০] কিন্তু এই নির্দিষ্ট দিনে তাঁর বিলেত যাওয়া হয় নি, লোকজন ফুলমালা নিয়ে জাহাজ ঘাটে উপস্থিত হলেও অসুস্থতাবশত কবি সেবার যেতে পারলেন না।[৩১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রাঁচিতে লেখা ডায়েরী থেকে ঐ বিষয়ে কিছুটা জানা যায়। তিনি লিখেছেন—"..আজ মেজবৌঠানরা নিশ্চয়ই আসবেন ..কিন্তু এলেন না। আজ তাঁর চিঠি পেয়ে জানলুম বাল্মীকি-অভিনয়ের সাজের ভার তাঁর উপর পড়ায় আটকে পড়েছেন।[৩২]

রবীন্দ্রভবন পাঠাগারে রক্ষিত 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয়পত্রী থেকে জানা যায়, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২২ মার্চ শক্রবাব কলকাতায় আবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয়। এবারে দিনেন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। লক্ষ্মীব ভূমিকায় অভিনয় করেন শোভনা দেবী [৩৩] এবং সরস্বতীর ভূমিকায় অশোকা দেবী।[৩৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ওই তারিখে লেখা ডায়েরীতেও [৩৫] এই অভিনয়ের বিবরণ রয়েছে। তিনি লিখেছেন—"আজ রাত্রে বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হল। ইন্দুমাধব মল্লিকের পাশে বসেছিলুম। লাহোরিণীর সঙ্গে দেখা হল। রবি গিয়েছিলেন। Lady Hardinge এর খুব ভালো লেগেছিল।"

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৫ইমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মদিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমার জন্মদিন। ৬৩ বৎসরে পদার্পণ করলুম। আজ ২৫।২৬ জন নিমন্ত্রিত এসেছিল, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'' গেয়ে শুনিয়ে দিলুম।" তাঁর ডায়েরীর বিবরণে দেখা যায় নানান উপলক্ষে তিনি 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গেয়ে শোনাচ্ছেন।[৩৬] রাঁচিতেও তিনি একবার 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় করান।[৩৭] ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর কলকাতার ইম্পিরিয়াল ফাণ্ডের সাহায্যার্থে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় হয়।[৩৮] এই অভিনয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন সংগীতসংঘ। অভিনয়পত্রী ছাপা হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের ছবিসহ। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এই অভিনয়ে দস্যু দলে ছিলেন।

বাল্মীকিপ্রতিভার পরবর্তী অভিনয়ের লিখিত বিবরণ ঠিকমতো পাওয়া যায় না। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার বিবরণে দেখা

যাচ্ছে ওই বছর চারবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হচ্ছে। এর মধ্যে ২৬শে ভাদ্রের অভিনয়ে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বিবরণ ঠিকমতো পাওয়া না গেলেও 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বহু উপলক্ষে বহুবার অভিনীত হয়েছে। ইন্দিরা দেবী বলেছেন

"এই এক বাল্মীকিপ্রতিভা যে কতবার কত সূত্রে অভিনীত হয়েছে এবং আত্মীয়বন্ধুব মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অপ্রত্যাশিত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা বলতে গেলে একটা বই হয়ে যায়".[৩৯] বহুবার অভিনয় দেখার ফলে এই গীতিনাট্য ঠাকুর পরিবারের অনেকেব মনে একটা ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব ডায়েরীতেও দেখেছি কোন একটা উপলক্ষে তিনি বাল্মীকিপ্রতিভা গেয়ে শোনাচ্ছেন। প্রতিভা দেবীর বোন অভিজ্ঞা সম্পর্কে ইন্দিবা দেবী বলেছেন—"অভি একাসনে বসে সমস্ত বাল্মীকিপ্রতিভা বা মায়ার খেলার গানগুলি প্রথম থেকে অভিনয় করে গেয়ে শ্রোতাদেব মুগ্ধ করে রাখতে পারত।"[৪০]

গগনেন্দ্র-কন্যা সুজাতাদেবী তাঁব স্মৃতি কথায় বলেছেন 'বাল্মীকিপ্রতিভার' অভিনয় কতখানি তাঁর পিতার মনে ছাপ বেখেছিল। তিনি বলেছেন " ... একবার একটা চাবফুট কাঠের স্টেজ তৈরী করেছিলেন তাতে সীন, ড্রপসীন ফুট-লাইট ছিল। কতকগুলি চার ইঞ্চি সাইজের বিবি পুতুল কিনে এনে, তাদের সাদা পোষাক পরিয়ে মাথার চুল দিয়ে মুখে পেন্ট করে ঠিক করলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কয়েকটি দৃশ্য দেখাবেন। স্টেজে ডাকাতদের সর্দার ভুঁড়ি ফুলিয়ে তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনদেবীরা নাচছে। বাল্মীকির সঙ্গে লক্ষ্মী সবস্বতীকেও দেখিয়েছিলেন। এটা দেখবার মতো হয়েছিল।[৪১] স্টেজ বানিয়ে দৃশ্যের কথা ভাবতে গিয়ে গগনেন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কথা-ই মনে হয়েছিল। আর এই মনে হওয়ার পিছনেই ছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা'র বহুল অভিনয়ের প্রভাব।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম গীতিনাট্যটি তাঁর শিক্ষানবিশীর যুগে রচিত হলেও এর মধ্যে তিনি এমন ভাবনার, চরিত্রের, সুবের ও অভিনয়ের সংস্থাপন করেছিলেন যে ঠাকুর পরিবারে রচিত অন্য অনেক নাটকের অভিনয় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের বিবরন-ই প্রমাণ দেয় যে পারিবারিক নানা উৎসব

অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বাইরের নানা প্রয়োজন এই গীতিনাট্যটির অভিনয়ের কথা-ই সকলে মনে করেছেন। এদিক থেকে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রথমদিকে রচিত হলেও এর আকর্ষণীয় ক্ষমতা আজও অটুট।

১ ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ ঠাকুরবাড়িতে এই সভা স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তের বৎসর। শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশমহাশয় এই সম্মিলনের নামকরণ করেন।

২. ১২৮৭, ১৭ই ফাল্গুন, ইং ১৮৮১, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

৩. ইন্দিরা দেবী। শ্রুতি ও স্মৃতি, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পৃঃ ৩৬

৪., ৫ জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী শতবার্ষিক সং ১০ম খণ্ড। পৃঃ ৯১

৬. দ্রঃ বঙ্গদর্শন। ১২৮৮, আশ্বিন পৃঃ ২৮

৭. দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ১৩৭৭ পৃঃ ১০৩

৮. দ্রঃ প্রিয়নাথ সেন। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃঃ ২০৯

৯. ইন্দিরা দেবী। শ্রুতি ও স্মৃতি। পৃঃ

১০. সাধারণী, ১২৮৭, ১৭ই ফাল্গুন ইং ১৮৮১, ২৭শে ফেব্রুয়ারী

১১ অতীতের স্মৃতি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্রঃ গীতবিতান, ১ম বর্ষ ১৩৫০ মাঘ। পৃঃ ৬০

১২ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৩২৬ পৃঃ ১৬২

১৩. তদেব পৃঃ ১০৮

১৪. অভিনয়ের তারিখ ১৮৮১, ৫ই মার্চ শনিবার, ১২৮৭, ২৩শে ফাল্গুন শ্রীপঞ্চমী তিথি। দ্রঃ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। রবিচ্ছবি, ১৯৬১ পৃঃ ৯৫

১৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড ১৩৭৭ পৃঃ ৩১৬

১৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। ঘরোয়া ১৯৭১ পৃঃ ১২৩

১৭. শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা পৃঃ ৪৯

১৮. ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রস্মৃতি, ১৩৬৭ পৃঃ ৩১

১৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। ঘরোয়া ১৯৭১ পৃঃ ১২৫-১৩২

২০. তদেব পৃঃ ১২৮

২২. তদেব। পৃঃ ১২৬

২৩. শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা। পৃঃ ৬০

২৪. অবনীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ। ঘরোয়া পৃঃ ১২৪-১২৫

২৫. তদেব পৃঃ ১২৭

২৬ ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রস্মৃতি। পৃঃ ৩৮

২৭. শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা।

২৮, Rathindranath Tagore : On the Edges of Time. 1958, Page 15

২৯. তদেব। পৃঃ ১১১

৩০ দ্রঃ চিঠিপত্র (১ম খণ্ড) ২২ সংখ্যক পত্র।

৩১ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, রবীন্দ্র সংস্পর্শে জয়ন্তী উৎসর্গ পৃঃ ১৯৩

৩২. দ্রঃ Ms. 354 (D) 1912, 1st March

৩৩ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

৩৪ আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী-পরিবারের কন্যা

৩৫ দ্রঃ Ms. 354(D) 1912, দিনলিপির তারিখ—22nd March Friday. Calcutta.

৩৬ দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী Ms. 354 (C)

৩৭ অভিনয়ের তারিখ 1918. 18th June

৩৮. দ্রঃ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিতে অভিনয়ের অনুষ্ঠানসূচী।

৩৯. ইন্দিরা দেবী, রবীন্দ্রস্মৃতি ১৩৬১ পৃঃ ২২

৪০. ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রস্মৃতি। পৃঃ ২২

৪১. সুজাতা দেবী। স্মৃতিকথা। গগনেন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা

একটি রবীন্দ্রগল্প : অন্য দৃষ্টিকোণ

ক্ষেত্র গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের গল্পের শব্দধৃত শরীরের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে তার অনেক লুকোনো রূপের খোঁজ মিলবে, অনেক অনেক নিভৃত স্বাদ পাওয়া যাবে, পড়তে গিয়ে এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে। এখানে 'মানভঞ্জন' গল্পের কথা বলব। এই এই লেখাটি নির্বাচনের বিশেষ কারণ এটুকুই, লেখাটি নানা চিন্তা জাগিয়ে তোলে। [অবশ্য এ-রকম আরও বহু গল্প আছে।] গল্পটি সে-দলের নয়, দুকথায় যারা ফুরিয়ে যায়।

অনেকটা ক্ষমতা এবং বেশ কিছু দুর্বলতা থাকায় কখনো এ-গল্প পাঠককে ভীষণ উৎসাহিত করে, কখনো ম্রিয়মান। কলকাতা শহরের গল্প, অনেকটা কলকাতাকে নিয়েই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ, নগরকেন্দ্রিক সমাজবাস্তবতার একটা অধ্যায় তীক্ষ্ণভাবে ধরা হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে গ্রাম অনেক বেশি এসেছে, কিন্তু শহরের জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে দুর্ভেদ্য ছিল, এ-কথা বলা চলল না। কলকাতা এ-গল্পে শুধু পটভূমি নয়, অনেকখানি বিষয়ও বটে।

রবীন্দ্রনাথ গল্পের গোড়া বেঁধেছেন গোপীনাথ শীলের বাড়ির সামান্য একটু ছবি দিয়ে : রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকার সর্বোচ্চতলের ঘরে

> গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপ ফুলের গাছ—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইঁট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এনগ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে,...

এই একটি বর্ণনায় গোপীনাথদের শ্রেণীস্বভাব ফুটে উঠেছে। ধনবানের উচ্চতল প্রাসাদ, সেখানে টবে বেল-গোলাপ এবং অবরোধে যুবতী স্ত্রী ফুটে থাকে। ছাতের চারধারে উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে সামান্য ফাঁক দিয়ে বাইরের জগৎ কতটা-বা দেখা যায়,—শুধু জানা যায় যে বন্ধন কঠিন, অন্তরাল দুর্ভেদ্য। চূড়ান্ত

হল 'শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তি'র ফটো—গৃহস্বামীর রুচি ও লালসার নিদর্শনই নয়, নায়িকার কামনাতুর চরিত্রের তথা প্রবৃত্তির-তাড়িত গোটা কাহিনীর দিক থেকেও ইঙ্গিতবহ।

কলকাতার ধনী বাবু সম্প্রদায়ের গোপীনাথ,—তার এই গৃহবর্ণনা থেকে শুরু করে ইয়ারবন্ধু, থিয়েটার-বিলাস, রক্ষিতা অভিনেত্রীর সঙ্গ প্রভৃতি পরিচয়ে—সুনিশ্চিত শ্রেণী-প্রতিনিধি। এরকম বাবু বাংলা সাহিত্যে অনেক দেখেছি, গোপীনাথ অবাক করে না। রবীন্দ্রনাথ এখানে সার্থক চিত্রকর, কিন্তু চরিত্রে ব্যক্তিগত কোনো অভিনব ও স্বতন্ত্র মাত্রা বা জটিলতা আনতে প্রয়াসী নন। গোপীনাথের মনের হদিশ নেবার চেষ্টা যদিও লেখক একবার করেছিলেন। যেমন

> গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ।

এখানেও ভাষার আবেষ্টনী ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ, জীবনরহস্যে নামার সিঁড়ি নয়। এ ধরণের লম্পট ইয়ারবাজ বাবুদের বিদ্রূপ আহত করতে আরও ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেই মধুসূদন, দীনবন্ধু দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এ-কাহিনী ব্যঙ্গ রসাব্যয়ী প্রহসন নয়, সমাজহিতও নয়। যদিও কলকাতার অলস ধনী-সমাজ পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থের বিলাসী অপচয় নিয়ে গল্পের একটি প্রান্ত দখল করে আছে, আর আছে কলকাতার সমকালীন পেশাদারী থিয়েটারের দুনিয়া। রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবে ছিলেন অন্য প্রান্তের, পাবলিক স্টেজের সঙ্গে তাঁর কখনো আত্মীয়তা ঘটে নি। কিন্তু বহিরঙ্গ অভিজ্ঞতা ছাড়াও তিনি সমাজবাস্তবতার নানা স্তরের মর্মভেদে সমর্থ ছিলেন—যে-কোনো বড় লেখককে তা হতে হয়। মঞ্চের নায়িকার ভূমিকা-বিপর্যয়, লম্পট ধনীর পেট্রনেজের স্বরূপ, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে-যাওয়া রমণীর থিয়েটারে আশ্রয় গ্রহণ, অভিনেত্রীর রক্ষিতা জীবন, দর্শকের রুচি প্রসঙ্গ বিশিষ্ট কাহিনীর সূত্র ধরে এলেও প্রতিনিধি স্থানীয়।

রবীন্দ্রনাথের এ গল্পে তিরস্কার আছে। তার সবটাই গোপীনাথের উচ্ছৃঙ্খল লাম্পট্যকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গল্পটি গোপীনাথের নয়, তার স্ত্রী গিরিবালার। লেখকের ক্যামেরা ঘুরে ঘুরে শীলেদের তেতলা বাড়ির ছাদ, শোবার ঘর, গৃহবধূ

গিরির রূপযৌবনে নিবদ্ধ হয়েছে, তারপরে তার হৃদয় তথা চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করেছে। সেখানে ব্যঙ্গ নেই। নায়িকাকে ঘিরে ভাষা যৌবন-সৌন্দর্যে ও বাসনায় মদবিহ্বল হয়ে উঠেছে। ভাবের মতো ভাষাও ফেনিল—

> মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িল যায়, নবযৌবন এবং নবীনসৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে—তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুর নিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্রভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই বর্ণনা অবশ্য ছবি হয়ে উঠেছে, আর রবীন্দ্র-গল্পে শব্দে-গড়া নানা ছবিই আমরা দেখে থাকি। স্থির বা গতিশীল, কোথাও তা চলমান দূর থেকে গেছে, কাছ থেকে দূরে, কাল থেকে কালান্তরে। যেমন, 'নিশীথে'। কখনো দুই বিপরীত দৃশ্য যার পটবদল ঘটে মুহুর্মুহু। যেমন, 'কঙ্কাল'-এ। ধ্বনিময় চিত্র বাক্যহীন স্তব্ধতা ফোটাবার জন্য এসেছে 'মহামায়া'য়। এ-ছবি আরেক ধরণের। স্থির নয়, চলমানও নয়। আসলে এই নারীর প্রতিকৃতি ফ্রেমের সীমা ভেঙে 'চঞ্চল' 'তরল' 'উদ্দাম' 'উচ্ছৃঙ্খল' হয়ে উঠেছে। পটের সমতলে একে আটকে রাখা যাচ্ছে না। 'মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া' পড়ে যায়, গিরিবালার যৌবন যেমন তার 'সর্বাঙ্গে…ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে' তেমনই এই ছবি শাসন-সংযমের রাশ ছিঁড়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। এই ছবিই গিরিবালার চরিত্র। একটি বহির্মুখিতা, অস্থির চাঞ্চল্য, নৈষ্কর্ম্যের উদ্দামতা, আপনাকে ব্যক্ত করার অন্যকে আকর্ষণ করার ব্যগ্রতা তার 'বাহুর বিক্ষেপে' 'গ্রীবার ভঙ্গীতে' এবং আরও বেশি করে 'নূপুর নিক্কণে' 'তরল হাস্যে' 'ক্ষিপ্র ভাষায়' 'উজ্জ্বল কটাক্ষে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ছবি উদ্ধার করা যাক, যা ঠিক এই বর্ণনার সর্বোত্তম সহযোগী।—

> আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে, চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দ দন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—

দৈনন্দিন চুল-বাঁধা নয়, বিশেষ কারণেও তার এই প্রসাধন নয়। 'অসময়ে' শব্দটি লক্ষ্য করার—এবং ব্যাপারটা যে অকারণ তা সহজে বোধগম্য। এর উৎস তার স্বভাবের ভেতরে। যে ছবিটা সে নিজেকে নিয়ে এভাবে তৈরি করল তাকে এককথায় বলা যায় 'সেক্সি'। 'দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া' বাক্যাংশের ইঙ্গিত ভুল হবার নয়।

গিরিবালার রূপের বর্ণনা গল্পের গোড়ার দিকে তিন অনুচ্ছেদ জুড়ে আছে। শব্দসংখ্যা তিনশ সাত। বেশ বিস্তৃত বলতে হবে। সচরাচর এমন থাকে না। একটা অকারণ চাঞ্চল্য,—বাস্তবে যা নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ দেহভঙ্গিতে তাতে ক্রিয়ার বিভ্রম সৃষ্টি। সুন্দরী যুবতীর এই জাতীয় কাজকেই সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা শৃঙ্গারের অনুভাব বলতেন। বঙ্কিমচন্দ্রে শব্দ-নৈপুণ্যই মতিবিবির রূপকে 'ভোলাপশাস' করে তুলেছিল। রচনারীতির পার্থক্য সত্ত্বেও এখানে তার সাদৃশ্য আছে। আরও সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজের গল্প 'কঙ্কালে'র নায়িকার সঙ্গে। কঙ্কালের সেই রূপসী এবং গিরিবালা যে-সব দিক থেকে তুলনীয় এবং অ-তুলনীয়ও বটে তা সূত্রাকারে বিশ্লেষিত হচ্ছে—

১. দুজনেই অসামান্য রূপসী, সে রূপে যৌবনের মদ-বিহ্বলতা। কিন্তু গিরিবালা সেক্সি, অপরা সেনশুয়াস।

২. রূপ সম্বন্ধে এরা অতি সচেতন। কঙ্কালের নায়িকা আত্মরূপ মুগ্ধও। আপন সৌন্দর্যসম্ভোগে তার নার্সিসাস-বৃত্তি। জটিল আত্মিক ব্যাধিতে ঐ রূপ তার অস্তিত্বের মূলে ক্ষয় ধরিয়েছিল। গিরিবালা অনেকটা সাংসারিক, তার মন সহজ পথের, যদিও দাসীর সাহচর্য ও স্তুতির ধরণে কিছুটা স্থূলতা, ক্বচিৎ মানসবিকারের (মনস্তত্ত্ববিদেরা যাকে লেসবিয়ান-ইজম বলেন) আভাস।

৩. রূপের শক্তি বিশ্বজয়ের—পুরুষকে পদানত করবার—এই বোধ এদের তীব্র, পুরুষ ক্ষণকালের জন্য জীবনে এসেছে এবং মিলিয়ে গিয়েছে—দুজনেরই। গিরিবালার ক্ষেত্রে ঐ পুরুষ তার স্বামী, তার বাস্তব দৈনন্দিন সংসর্গে—বিরূপতায় সে পীড়িত। একদিক থেকে দেখলে তাই তার সংগ্রাম বঞ্চিতা গৃহবধূর মুক্তির সংগ্রাম। কঙ্কালের রূপসী যে-পুরুষকে পেয়েছিল সে অনেকখানি তার নিজের কল্পনা দিয়ে তৈরি। তার মুক্তি সেই ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন বিসর্জনে বা আত্মহত্যায়।

আসলে কামোদ্দীপক রূপযৌবন সত্ত্বেও গিরিবালা পারিবারিক-সামাজিক, এবং যখন সংসারত্যাগী তখনও থিয়েটারী দুনিয়ার প্রান্তিক সমাজে আশ্রয় নিয়েছিল। ওই তার মুক্তি। ভেবে-চিন্তেই লেখক তার নাম দিয়েছেন গিরিবালা। যদিও বাঙালির পরমপ্রিয় পর্বতকন্যার প্রসঙ্গ উপমাচ্ছলেও তোলেন নি, কারুণ্য সঞ্চারের কিছু চেষ্টা করেন নি। ঐ নামের কোমল অনুষঙ্গও গিরিবালার মূল ধাতুতে নেই। গল্পে-ঘটা পরিণাম ছিল তার স্বভাবেই। শুধুই স্বামীর অত্যাচারের ফল নয় তার অভিনেত্রী জীবনে প্রবেশ। সে-জন্যই এ সমাজ-সমীক্ষার নিদর্শন নয়—'কি ভাবে গৃহবধূ বেশ্যা-অভিনেত্রী[১] হয়ে ওঠে'। তার মন আর তার জট-পাকানো জীবন, ব্যক্তি-চিত্তের কুটিলতা আর সামাজিক টানা-পড়েন মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক। তার প্রতি মমতায় দ্রব হবার সুযোগ রাখেন না। কিন্তু পাঠককে সে বিষণ্ণ করে, বহু দর্শকের উল্লাসধ্বনির সম্বর্ধনায় তার রূপের পুজো—এই মূঢ় অহঙ্কারেও। সে নরম শান্ত ভালো মেয়ে নয়, কল্যাণী গৃহবধূ নয়। কিন্তু তবু সে 'গিরিবালা', বাঙালি ঘরের মেয়ে, যার যূপের দুটি কাঠ তৈরি করেছে নিজেব স্বভাব আর স্বামী-সমাজ মিলে। কঙ্কালের নায়িকার কোনো নামই নেই, সে বঞ্চিতা বিধবা হলেও তা গল্পের দূর পটভূমি। অনামা সেই রূপসী তার তীক্ষ্ণবোধে, মৌনপ্রায় আত্মসমাহিত নির্জনতায় একটা ঝুলন্ত করোটি—অস্থির দিকে আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে—সেখানে জীবন প্রশ্রয় পায় না, সে গিরিবালা নয়।

এ গল্পের প্রধান দুর্বলতা দৃষ্টিকোণ বদলে যাওয়ায়, ঘটনায় চমৎকারিত্ব আনার জন্যই অভিনেত্রী গিরিবালাকে হঠাৎ হাজির করতে লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গল্পে দেখার জানলাটার পরিবর্তন ঘটালেন। দীর্ঘ প্রথম পরিচ্ছেদ পড়ি গিরিবালার দৃষ্টিতে। অনেক ছোট দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গোপীনাথের চোখে পাঠককে চোখ রাখতে হয়। সে দেখায় বিস্ময় ক্রোধ অপমানিতের লাঞ্ছনা—এসব থাকলেও আমাদের কিছু যায় আসে না। সেটা কাহিনীর বাইরের মহল। গিরিবালার মন কোথায় গেল ?

১. সমকালে এই বিশেষ শব্দটিই ব্যবহৃত হত।

রবীন্দ্রসংগীতের রূপান্তর

মীনাক্ষী মিত্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ও পরিমার্জন নিজেই ঘটিয়েছেন। গানের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন ও পরিমার্জনা (একই গানের ভিন্ন পাঠ) অবশ্যম্ভাবীরূপেই এসেছে।

কবির এহেন রূপান্তর (কবিতা থেকে গান এবং গান থেকে কবিতা) সম্বন্ধে বেশ কিছু বলার আছে। গানের পাঠান্তরে নতুন গান যেমন পাওয়া যায় তেমনি অনেক কবিতা রূপান্তরিত হয়ে গান-রূপ লাভ করেছে, অন্যদিকে আগে গান হিসেবে সৃষ্টি হয়ে পরে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কবিতা হয়ে উঠেছে— এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। গীতিকবিতা একই কালে গান ও কবিতার গুণসম্পন্ন—দেশান্তরে ও যুগান্তরে 'লিরিক' নামে এর পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এর যেন বিশেষ সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় কারণ তাঁর গদ্য, পদ্য সব রচনাতেই প্রায় এই লিরিকের গুণ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে বর্তমান। 'লিপিকা'তে সুরসংযোগ অনায়াসেই সম্ভব—এমন ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। আমরা জানি, কবিতার ছন্দকে বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় সুর দিতে চেষ্টা করে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার মধ্যে বিশেষ কোন ভেদকে স্বীকার করতেন না। তাঁর হৃদয়ভাব উন্মোচনে কবিতা ও সংগীত ছিল যুগ্মবাহন। এই রূপান্তরের মধ্যে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ যুগপৎ গান ও কবিতা, দ্বিতীয়তঃ, কবিতা থেকে গানে রূপান্তর, তৃতীয়তঃ গান থেকে কবিতায় রূপান্তর। দুএকটি গানের বিশদ আলোচনা করে প্রতিটি শ্রেণীকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপান্তরের প্রথম শ্রেণীতে (যুগপৎ কবিতা গান) যে গানগুলিকে ফেলা হয়েছে, কবিতা হিসাবে তাদের জন্ম আগে, না গান হিসাবে তাদের সৃষ্টি আগে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলবার পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ রচনারই দুই রূপের সৃষ্টি কাছাকাছি সময়ে বা একইকালে, যেমন 'খাঁচার পাখি ছিল' (সোনার তরী'র 'দুই পাখী' কবিতা) রচনাটির সময়

১২৯৭ সালের ১৭শে আষাঢ়। ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণে এটি 'নরনারী' শিরোনামে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসেই ঐ পত্রিকাতেই এই কবিতার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে প্রথম রচনাকাল, কবিতা হিসাবে পত্রিকায় প্রকাশ, এবং সুরসংযোজনার কালের মধ্যে ব্যবধান খুবই অল্প। এই কারণেই এগুলিকে যুগপৎ কবিতা ও গান বলে ধরা যেতে পারে। 'আমি নিশি নিশি কত' (বিরহ, কড়ি ও কোমল) কবিতার রচনাকাল শ্রাবণ, ১২৯৩। ১২৯৩ (ভাদ্র-আশ্বিন) সালের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় এর গানরূপ পাওয়া যায়। (স্বরলিপি গীতিমালা ১৩০৪)। 'বন্ধু কিসের তরে' ('হতভাগ্যের গান' কল্পনা) কবিতার রচনাকাল ১৩০৪ সালের ৭ই আশ্বিন। পরিবর্ধিত একটি রূপ পাওয়া যায় ১৩০৫ সালের ৭ই আষাঢ়। ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসে 'ভারতী'তে এর গানরূপের উল্লেখ আছে (হতভাগ্যের গান। বিভাস—একতালা)। 'এবার চলিনু তবে' (বিদায়। বিভাস। কল্পনা) কবিতার জন্মলগ্ন ৭ই আশ্বিন ১৩০৪। 'গান' বিভাস শিরোনামে এর সংগীত রূপ পাওয়া যায় ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসে 'প্রদীপ' পত্রিকায়। এই শ্রেণীর রচনাগুলির কবিতা ও গানরূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর নেই।

রূপান্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত (কবিতা গানে পরিণত/রূপান্তরিত) গানগুলি কবিতা হিসাবে আগে রচিত, সাধারণত : বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে এর গীত-রূপটি পাওয়া যায়। যেমন ক্ষণিকার 'কৃষ্ণকলি' কবিতার রচনা ৪ঠা আষাঢ়, ১৩০৭। এটি গানে ('কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি') পরিণত হয়েছে দীর্ঘদিন পরে ১৩৩৮ সালে। কবিতায় ও গানের মধ্যে পাঠভেদ কিছু নেই। এ ধরণের রূপান্তরে অন্যান্য কিছু রচনায় আবার দুই রূপের মধ্যে যথেষ্ট পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষণিকার অবিনয় কবিতার প্রথম রচনাকাল ১লা আষাঢ়, ১৩০৭। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন যে কবিতাটি সুরারোপিত হয় ১৩৪০ সালে। এই 'হে নিরুপমা' গানটি চারস্তবক সমন্বিত। কিন্তু 'অবিনয়' কবিতায় স্তবক ছিল পাঁচটি। স্তবকবিন্যাসে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কবিতার তৃতীয় স্তবকটি গানে প্রথম স্তবক হয়েছে :

'হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা

(গী. বি ২৮৬৷৩৭)

মনে হয় গান বলেই যেন গানের প্রসঙ্গটিকে এখানে আগে এনেছেন। কবিতার দ্বিতীয় স্তবক গানে শেষ স্তবকে পরিণত। কবিতার স্তবকে আছে :

'হে নিরুপমা
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ ,
করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে
মারিছে উঁকি।
বাতাস করিছে দুরন্তপনা
ঘরেতে ঢুকি।'

এ জায়গায় গানে কিছু পাঠের বদল ঘটেছে—

'হে নিরুপমা'
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে॥'

কবিতার দ্বিতীয় স্তবককে গানের শেষে আনলেন বলে বক্তব্যকে যেন একটু পরিবর্তিত করতে হল। কবিতার মাঝখানে যা বলা হয়েছিল তা দিয়ে যেন গানের শেষ করা যায় না। বক্তব্যকে আরও যেন কিছুটা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়েছে, গানের পাঠের উপযুক্ত কিছু কথারও আমদানি করতে হয়েছে।

যেসকল রচনা কবিতা হিসাবেই বিশিষ্ট, অথচ তার সবটায় বা অংশে বা তার রূপান্তরে সুরসংযোজনার ফলে গান বলে স্বীকৃত, সেগুলিও এই শ্রেণীতে ধরা হয়েছে। যেমন চিত্রা কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতা 'উর্বশী' (প্রথম রচনা ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২) আটস্তবক বিশিষ্ট। ১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণে এই কবিতার কিছু অংশে সুর দেওয়া হয় শাপমোচন উপলক্ষে। গানে স্তবক মাত্র দুটি।

প্রথম স্তবক অবিকৃত, কবিতার চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকের অংশ মিলিয়ে গানের শেষ স্তবকটি তৈরী। পূরবী কাব্য গ্রন্থের 'আন্‌মনা' (প্রথম রচনা ১৮ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতায় দুটি স্তবক। এ কবিতায় সুরসংযোজিত হয় ১৩৩৮ সালে শাপমোচন উপলক্ষে। গানে কিছু ছত্র বাদ পড়েছে। কবিতার প্রথম স্তবকটি গানে পুরোপুরি গৃহীত, দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম ছত্র কয়েকটি বাদ পড়েছে।

সুরসংযোগের সহায়তাকল্পে যে শব্দগত পরিবর্তন ঘটে তা সাধারণতঃ তৎসম শব্দের তদ্‌ভব রূপান্তর এবং যুক্তবর্ণের সরলীকরণ। কিন্তু কিছু গানে তার উল্টো পদ্ধতিও দেখা যায়। যেমন উপরে উদ্ধৃত আন্‌মনা কবিতায় আছে :

আন্‌মনা গো আন্‌মনা
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনবনা।

গানে 'মালা' কে করেছেন মাল্য :

'আনমনা, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনবনা। (গীবি ৩০৪ ॥ ৮০)

কবিতাটির মধ্যে অনেক যুক্তস্বর ও তৎসম শব্দ আছে। রবীন্দ্রনাথ গানে সেগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে, একটি মাত্র সরল শব্দকেও সংস্কৃত করেছেন। স্বরবর্ণের অর্থাৎ স্বরের আশ্রয়ে সুরবিহারের সুবিধে থাকে এটা সাধারণভাবে সত্য হলেও বিশেষ গানের, বিশেষ ছন্দের বা সুর—তালের প্রয়োজনে তথাকথিত যুক্তাক্ষরের বা রুদ্ধদলেরও যে উপযোগিতা আছে, সেকথাই এখানে আরও বেশী করে প্রমাণিত হয়েছে। এরকম আরও কিছু গানের উল্লেখ করা যায় : ওগো বধূ সুন্দরী—গী বি ৫০৫ ॥ ১৯৯ নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়—ঐ ৪৪৭ ॥ ৫৫ মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি—ঐ ৫.০ ॥ ৬০৬ নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র প্রভৃতি—ঐ ৫১৮ ॥ ৭৯

গানের উপযোগী শব্দ বদল এবং নতুন শব্দের আবির্ভাব—এই প্রসঙ্গে পূরবী কাব্যের দীর্ঘ কবিতা 'পঁচিশে বৈশাখ' (প্রথম রচনা ২৫শে বৈশাখ ১৩২৯) এবং তার রূপান্তরে 'হে নূতন' (গী বি ৮৬৮ ॥ ১১) গানটির কথা বলা চলে। এই কবিতা ও গানের রূপান্তরে (সুরারোপ ২৩ বৈশাখ ১৩৪৮) কিছু শব্দের পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো :

কবিতায়—'তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন'

গানে—'তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন'

কবিতায়—'ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়'

গানে—'ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়'

'কুজ্ঝটিকা', 'অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়' প্রভৃতি শব্দ গদ্যাত্মক—এই কারণে সুর তাতে বাধা পেত বলে মনে হয় এই পরিবর্তন। কুজ্ঝটিকা ও কুহেলিকা, অনন্ত ও অসীম প্রায় সমার্থক শব্দ, কিন্তু গানে দ্বিতীয় শব্দগুলির প্রয়োগ যেন বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

মানসী কাব্যগ্রন্থের 'তবু' কবিতার প্রথম রচনাকাল ১২৯৪ সালে .৫ই অগ্রহায়ণ (ইংরাজী ১৮৮৭ খ্রীঃ)। এটি গানে রূপান্তরিত হয়েছে বেশ কিছু সময় পরে (১২৯৯ সালের চৈত্রমাসে (১৮৯৩ খ্রীঃ)। এর স্বরলিপি ভারতীতে প্রকাশিত হয়। দুটি রূপ পরপর উদ্ধৃত করলে রূপান্তরটি স্পষ্ট হবে ·

তবু : মানসী

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

তবু মনে রেখো, যদি বড় কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি—
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদ ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা।

তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

গীতবিতান ৩৩০ ॥ ১৫১

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে :
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি
তবু মনে রেখো ॥
যদি জল আসে আঁখি পাতে
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদপ্রাতে—
তবু মনে রেখো ॥
যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে
তবু মনে রেখো ॥

বৈচিত্র্যপিয়াসী রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমসাময়িক মানসিকতার প্রভাব প্রায় লক্ষ্য করা যায়। কালপ্রভাবে সেই কবির মনোভাবনার (Poetic mood) পরিবর্তনও ঘটেছে বারে বারে, রচনাতেও তার ছাপ পড়েছে যথারীতি।

'তবু' কবিতাটি মানসী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। কালানুক্রমে মানসীর কবিতাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মে থেকে ১৮৯০ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মানসীর কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। মোটামুটি এক এক ঝোঁকে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা লেখা হয়ে যায়, তারপর কবিতা লেখার বিরতি। এইভাবে চার ঝোঁকে মানসীর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। 'তবু' কবিতা মানসী কবিতাবলীর প্রথম পর্যায়ভুক্ত।

মানসীর কবিতাবলীর পর্যায়গত পার্থক্য কেবল কালগত দূরত্বের জন্ম নয়, একঝোঁকে কবিমনের এক একটি বিশেষ মানসিকতা ঐসব কবিতাগুচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে। নবজাতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে'। মানসী ঋতুর প্রথম দফার কবিতার মধ্যে

'কড়ি ও কোমলে'র দেহাশ্রিত প্রেমের প্রতি সহজ অবসাদবোধ অথচ তারই প্রতি এক অনিবার্য মমতাবোধের দোলাচল বৃত্তিতে কবিমন অকারণ বেদনাবোধে উদাসীন। এই কবিতায় কবি একদিক থেকে অনুভব করছেন কড়ি ও কোমলের যে প্রেমবোধ তার থেকে বিদায় নেবার সময় এসেছে, অথচ সেই জীবন্ত প্রেমচেতনার মধ্যে কবির অবস্থান কি একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে? সেই 'পুরাতন প্রেম' কি একান্তই নিরর্থক?

কড়ি ও কোমলের প্রেমচেতনা নিরুপাধি প্রেয়সীর মূর্তিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে এই 'তবু' কবিতায়। দেহাশ্রিত প্রেমের জন্য আক্ষেপ এই কবিতায় অনেকটা রক্তমাংসের ব্যক্তিগত উত্তাপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয়। এই ব্যক্তিগত প্রেমের স্পর্শ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কড়ি ও কোমল থেকে কিছুদিন পর্যন্ত অনুভব করা গেলেও রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা নৈর্ব্যক্তিক। তাঁর কাব্যে প্রেমের সর্বজনীন, সর্বকালীন রূপকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

রূপান্তরিত গানের পাঠের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কবিতার ঐ জীবন্ত আক্ষেপ উদ্বেলতার তীব্রতা সেখানে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বের ব্যক্তিগত অনুভবের উত্তাপ আকৃতি পিছনে সরে গেছে, এগিয়ে এসেছে কাব্যের রূপসুষমা। এই গানটির সৃষ্টিকালে কাব্যজগতে সোনার-তরী রচনার ঋতু চলমান। রবীন্দ্র কবিভাবনা তখন আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত, অসীমাভিসারী। সোনার তরী রবীন্দ্র-রচনায় নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-পিপাসার এক স্বর্ণযুগ। এছাড়া রূপগঠনগত সৌন্দর্যের প্রতি কবি চিরকালই সচেতন। শব্দ প্রয়োগ ও রূপকল্পের দিক দিয়ে কড়ি ও কোমলের প্রথমার্ধে লিখিত 'তবু' কবিতাটি ছিল অনেকখানি নিরলংকার। সুশৃঙ্খল রূপসুষমা (ধ্বনির ঝংকার, ছন্দের সুসংগঠন, শব্দাবলীর লালিত্য) গঠনের চেষ্টা সে রচনাতে ছিল প্রচ্ছন্ন। কবিতার পাঠে যা সহজ, সরল খুঁটিনাটি প্রত্যক্ষভাষণের সহজ আবেদনে ব্যক্ত, পরবর্তী গানের পাঠে তা আরও সুষমা-মণ্ডিত, ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। কবিতায় details গানে কমেছে স্বাভাবিক ভাবেই।

'তবু মনে রেখো—যদি ভাহে মাঝে মাঝে
উদাস-বিষাদ-ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,

অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা

এই একই বক্তব্য গানের পাঠে আরও সুন্দর ও গভীর ব্যঞ্জনাময় :

যদি জল আসে আঁখি পাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদপ্রাতে—
তবু মনে রেখো॥

বাণীর পরিবর্তনে, বলবার কৌশলে গানের পাঠের আবেদন আরও সার্থক ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে বলা যায়।

পুরবী কাব্যগ্রন্থের 'বদল' কবিতাটির প্রথম রচনাকাল ১৩৩১ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখে। আধার পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে জানা যায় যে এটি গানে রূপান্তরিত হয় ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। দুই রচনার বিষয় এক হলেও কাঠামো, প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে। এই দুইয়ের রূপান্তর লক্ষ্য করার মতো :

বদল . পুরবী

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি,
আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল।
শুধালেম তারে, যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।'
হাসি কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী,
'এসো-না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অশ্রুর রসে ভরা।'
চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার—
নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।

আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগন দেশে,
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।'

গীতবিতান ৩৬৭ ॥ ২৪৫

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা॥
সহসা আসিল, কহিল সে সুন্দরী 'এসো-না বদল করি'।
মুখপানে তার চাহিলাম, মরি মরি, নিদয়া সে মনোহরা॥
সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা, চাহিল সকৌতুকে।
আমি লয়ে তার নবফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' যেতে যেতে কয় হেসে, দূরে চলে গেল ত্বরা।
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা॥

পাশাপাশি দুটি পাঠ রেখে দেখা যায় যে গানের তুলনায় কবিতা বর্ণনার দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবিতায় রয়েছে ধারাবাহিক কাহিনীর অনুষঙ্গ, গানে তা বেশ কিছুটা সংকুচিত। কবিতার বিভিন্ন সংলাপ ও বর্ণনা গানে বর্জিত হয়েছে, কোন অংশ সংক্ষেপিত ও রূপান্তরিত। যেমন কবিতার প্রথম অংশে নায়কের প্রস্তাব শোনা যায়:

শুধালেম তারে, 'যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।'

গানে এ প্রস্তাব অনুপস্থিত বলা চলে। কবিতায় শেষাংশে যে একটি তাপদগ্ধ দিনের চিত্র অঙ্কিত—তার বর্ণনা গানে পাওয়া যায় না। গানের পাঠ সংক্ষেপিত হওয়ায় বলা চলে যে সেখানে আভাসের আধিক্য দেখা দিয়েছে। গানে এই ইঙ্গিতের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, কারণ গান প্রধানতঃ বাণীপ্রধান

বর্ণনাময় হবে না, তাকে সংকেতময় হতে হবে। তাই স্বাভাবিক কারণেই কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা গানে বর্জিত। গানে আকস্মিকতা অনেকক্ষেত্রে যেমন এ গানে বেশি। নায়কের প্রস্তাব ব্যতিরেকেই নায়িকা প্রস্তাব এনেছে :

'সহসা আসিল, কহিল সে সুন্দরী 'এসো-না বদল করি'।

এই 'সহসা' শব্দটির মধ্যেই একটি আকস্মিকতা, একটি নাটকীয়তা ধ্বনিত।

রবীন্দ্রকাব্যে যে বিচিত্ররূপিণীর সাক্ষাৎ বহুভাবে পাওয়া গিয়েছে, এ দুই রচনার 'নিদয়া সে মনোহরা' যেন তারই অন্যতমা। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী'র কথা মনে আসে। 'বদল' কবিতার নায়িকা গীতরূপের নায়িকা অপেক্ষা যেন অনেক বেশি প্রগলভ, কৌতুকময়ী, বিচিত্ররূপিণী। মনোহারিত্বের তুলনায় নিষ্ঠুরতা তার কোন অংশে কম নয়। গানের নায়িকা অনেক বেশি স্নিগ্ধ শুধু নয়, সে বেদনাবিধুরাও বটে। কৌতুকের মাধ্যমে হলেও সে সুচিন্তিতভাবে বেদনার ভার গ্রহণে সম্মত। কবিতায় কিন্তু এই সম্মতি বা অভিপ্রায় যেন এসেছে খানিকটা লীলাচ্ছলে—তাই সেক্ষেত্রে সে অধিক কৌতুকময়ী। গানের নায়িকার মতো ততটা নিদয়া নয়।

দুটি রচনার নায়ককেই 'মায়ার খেলা'র নায়কের সঙ্গে তুলনা করা চলে। জীবনোল্লাসের দিকেই এদের অধিক আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য পরিণামে এ চরিত্র হৃদয়কে স্পর্শ করে। এরকম অনেক গানের কথাই বলা যায়, কিন্তু বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় তাই কয়েকটির শুধুমাত্র উল্লেখ করেই এখানে থামতে হচ্ছে :

কড়ি ও কোমলের 'আমি ধরা দিয়েছি গো' (হৃদয় আসন) কবিতার ১-৮ ছত্র গানে পরিণত হয়েছে। গান রচনা ('এ শুধু অলস মায়া') সম্পূর্ণ কবিতাটি গানে গৃহীত। মানসীর 'কে আমারে যেন' (ভুলে) কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক রূপান্তরিত গানে নেই। 'সোনার তরী'র 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ' (হৃদয়-যমুনা) দ্বিতীয় স্তবক বাদে গানে গৃহীত। চিত্রার 'কেন নিভে গেল বাতি' (দুরাকাঙ্ক্ষা) পুরোপুরি গানে রূপান্তরিত। চৈতালি কাব্যের 'তুমি পড়িতেছ হেসে' দ্বিতীয় স্তবক বাদে গানে পরিণত। কল্পনা কাব্যের 'ওই আসে ওই অতি' (বর্ষামঙ্গল—১৭ বৈশাখ, ১৩০৪) গানে রূপান্তরিত (পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক বর্জিত)। সুরারোপ শেষবর্ষণ গীতাভিনয় উপলক্ষে (১৩২৩)। 'সে আসি

কহিল প্রিয়ে' (স্পর্ধা) সম্পূর্ণ কবিতা গানে গৃহীত। ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'নীলনবঘনে' (আষাঢ় ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) গানে পরিণত (যথাক্রমে কবিতার ১, ৩, ২, ৪ স্তবক গানে গৃহীত)। 'হৃদয় আমার' (নববর্ষা—২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) কবিতার ১, ৬, ৮ স্তবক গানে পরিণত। 'যাবই আমি যাবই' (বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী) পরিবর্তন পূর্বক যথাক্রমে কবিতার ২, ৪, ৩, ৫ স্তবক গানে গৃহীত। শিশু কাব্যের 'তোমার কটিতটের ধটি' (৫ শ্রাবণ, ১৩১০, খেলা) কবিতার ১, ২, ৪ স্তবক (২টি স্তবক বাদ) গানে গৃহীত। সুরারোপ গীতোৎসব (১৩৩৮) উপলক্ষে। বলাকা কাব্যের 'তুমি কি কেবলই ছবি' (৩ কার্তিক, ১৩২১) দীর্ঘ কবিতাটির সূচনার ৯ ও শেষ স্তবকের ১০ ছত্র গানে গৃহীত। সুরারোপ শাপমোচন (১৩৩৮) উপলক্ষে। মহুয়া কাব্যের বেশ কিছু সম্পূর্ণ কবিতায় ('বাহির পথে বিবাগী হিয়া,' 'প্রাঙ্গণে মোর,' 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা,' 'আমার নয়ন তব নয়নের') সুরারোপ হয়েছে ১৩৪০ সালের ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে। কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল ১৩৩৪-৩৫ সালের যে কোন মাসে।

রূপান্তরের তৃতীয় শ্রেণীতে (গান কবিতায় পরিণত / রূপান্তরিত) যে গানগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি গান হিসেবেই আগে রচিত, পরে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কবিতায় পরিণত হয়ে কাব্যগ্রন্থে স্থান করে নিয়েছে। রচনাগুলি যে প্রথমে গান হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল তার পক্ষে পাণ্ডুলিপি, সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রভৃতি প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'একি সত্য সকলই সত্য' রচনাটির কথা এখানে বলা যেতে পারে। মজুমদার পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথের একটি খসড়া খাতা। এতে 'একি সত্য সকলই সত্য' রচনাটি পাওয়া যায়, রচনা তারিখও কবির হাতে লিখিত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এর 'রবীন্দ্রজীবনে গীত রচনার একটি অজ্ঞাতযুগ' প্রবন্ধে (শারদীয়া দেশ ১৩৭৮) একথা উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীকানাই সামন্ত তাঁর 'কবিপ্রতিভা' গ্রন্থের শেষে উপরিউক্ত পাণ্ডুলিপি ধৃত গানের তালিকা দিয়েছেন। খসড়া খাতাতে ঐ গানের যে রূপটি পাওয়া যায় তা গীতবিতানে প্রকাশিত গানের পাঠের সঙ্গে অভিন্ন এবং গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা ঐ গানের যে স্বরলিপি চিত্র মুদ্রিত আছে তার সঙ্গেও কোন অমিল নেই। এই সকল প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে গান হিসাবেই এ রচনা

প্রথম ১৩ই আশ্বিন ১৩০৪ এ রচিত হয়। পরে কল্পনার 'প্রণয় প্রশ্ন' কবিতাটি এই গানেরই রূপান্তরিত পাঠ। এইরকম বেশ কিছু গান পরে কবিতায় রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে নতুন চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ করে সানাই কাব্যগ্রন্থে এই ধরণের দৃষ্টান্ত খুব বেশী। 'যদি হায় জীবন পূরণ' গানের (প্রথম রচনা আধার পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী: ১৪-২২ মার্চ, ১৯৩৯) পরিবর্তিত কবিতারূপ (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) উদ্‌বৃত্ত নামে সানাই কাব্যে স্থান পেয়েছে। দুটি রূপকে চোখের সামনে রাখলে প্রথমে দুটিকে একেবারে পৃথক রচনা মনে হয়:

গীতবিতান ৫৬২ ॥ ২২৮

যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে জানে—
চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
ভাবনার প্রাঙ্গণে ॥
বৈশাখের শীর্ণ নদী ভরা স্রোতের দান না পায় যদি
তবু সংকুচিত তীরে তীরে
ক্ষীণধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,
পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি ॥
মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।
দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত
যত্নে ধরে রাখি,
সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন ॥

উদ্‌বৃত্ত : সানাই

তব দক্ষিণ হাতের পরশ
করনি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলোছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন।

বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রমাদ না দিল যদি.
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসী মন।
যতটুকু পাই ভীরুবাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।

সানাই কাব্যগ্রন্থের 'উদ্‌বৃত্ত' কবিতার প্রথম স্তবকে আছে দৃঢ় বঞ্চনার কথা, তারপর উপমা দ্বারা সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

'তব দক্ষিণ হাতের পরশ
করনি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলোছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে অলিপন।'

'তব দক্ষিণ হাতের পরশ' বলতে যাঁরই কথা কবি এখানে বলতে চান, তাঁর সেই দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত। কবি তাঁর জীবনের সেই পরিচালককে যেন উদ্দেশ্য করে বলছেন যে 'তোমার এই দেওয়া-না-দেওয়াটা আমার জীবনের ভাবনার প্রাঙ্গণে যেন আলোছায়ার আসা যাওয়ার মতো'—অর্থাৎ ব্যাপারটি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। দ্বিতীয় স্তবকে উপমা দিয়ে শুরু—বঞ্চনার উপলব্ধি আবার শেষে এসেছে। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে যেন একটাই তত্ত্ব ছড়িয়ে আছে। দুটি স্তবক একই বক্তব্যের প্রকাশ—যার সূচনায় ও শেষে বিষয়, মাঝখানে বিষয়ী। কবিতার পরিশেষে (৩য় স্তবকে) নৈরাশ্য থেকে সান্ত্বনার সন্ধান—যে নৈরাশ্য প্রথম স্তবকের এবং দ্বিতীয় স্তবকের শেষে।

গানের পাঠটি 'হায়' (নৈরাশ্যসূচক), 'যদি' (অবলম্বনশীল) অব্যয় দিয়ে

আরম্ভ হলেও বেদনাবোধের প্রাবল্য যেন কিছুটা কম। নৈরাশ্য, অপূর্ণতাবোধ বা বেদনা কবিতায় গানের পাঠের তুলনায় যেন একটু বেশি সোচ্চার।

'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে জানে—

গানের সূচনায় বেদনাবোধ সত্ত্বেও সেই বেদনা নিশ্চয়াত্মক প্রতীতিতে পরিণত— 'মন তবু জানে জানে'। এই পলাতক পরশখানি যা দেয় তাই যেন 'পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি'। অকৃপণকরের পরশে জীবনের পূর্ণতা না ঘটলেও যতটুকু পেয়েছি তাতেই ধন্য হয়েছি—এই মনোভাব অন্য একটি গানের ছত্রকে স্মরণে আনে :

'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' (গী. বি ২৩৪ ॥ ৫৭৫) শেষ চরণে বলা হয়েছে যে দুই হাতের অঞ্জলি পেতে যেটুকু লাভ হয়েছে সেটিকেই ভাগ্য বলে মেনে নিতে হয়। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সেই পূর্ণতা অর্জনের প্রত্যাশা যেন কবিতা অপেক্ষা গানে কিছুটা বেশি।

কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক জুড়ে যে তত্ত্বটি ছড়ানো, গানে যেন তাই সংহত রূপে প্রকাশিত। কবিতার 'বৈশাখে কৃশ নদী' অপেক্ষা গানে 'বৈশাখে শীর্ণ নদী' কথাটি যেন অনেক নিকট সম্পর্কের শব্দ। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের শেষাংশটি অনেক বেশি কাব্যোৎকর্ষপূর্ণ বলা যায় :

'শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারায়
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসী মন।'

তবে গানের এই অংশ যেন কিছুটা মানবিক, হৃদয়ের কাছের ব্যাপার।

'তবু সংকুচিত তীরে তীরে
ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,
পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি ॥

বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গির বিচারের দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় কবিতার বক্তব্য যেন বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে উচ্চস্তরের দিকে। অন্যদিকে গানের বক্তব্য যেন অনেকটা মানবিক হয়ে উঠেছে।

'ধূসর জীবনের গোধূলিতে' গানটি' দুটি রূপ গীতবিতানে পাওয়া যায়, সানাই কাব্যগ্রন্থের 'নতুন রঙ' কবিতাটি এই দুটি গানরূপেরই পরবর্তী কাব্যরূপ :

গীতবিতান ৩৬৫ ॥ ২৩৬

(আধার পাণ্ডুলিপি অনুসারে রচনা ১৽৩৯ সালের ১৪ থেকে ২২ মার্চ -এর মধ্যে যে কোনদিন)

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি
সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী,
তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে ॥
দেখি তার বিরহী মূর্তি বেহাগের তানে
সকরুণ নত নয়ানে।
পূর্ণিমা জ্যোৎস্নালোকে মিলে যায়
জাগ্রত কোকিল-কাকলিতে, মোর বাঁশির গীতে ॥

গীতবিতান ৩৭৪ ॥ ২৫৬

(আধার পাণ্ডুলিপি অনুসারে রচনা ১৯৩৯ এ ২২ থেকে ২৮ মার্চ এর মধ্যে)

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি।
বসন্তের ফুলের পরাগে যেই রঙ জাগে,
ঘুম-ভাঙা পিককলিতে সেই রঙ লাগে,
যেই রঙ পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্লসপ্তমীর তিথি ॥
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে,
সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝর কল্লোলে,
দক্ষিণ সমীরণে ভাসে, পূর্ণিমাজ্যোৎস্নার হাসে
সে আমারি স্বপ্নের অতিথি ॥

সানাই : নতুন রঙ (রচনা ১৩ জানুয়ারী, ১৯৪০)

এ ধূসর জীবনের গোধূলি
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,

মুছে আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জন গীতি।
ফাগুনের চম্পকরাগে
সেই রঙ জাগে,
ঘুম ভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রঙ লাগে,
সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি।
এই ছবি ভৈরবী-আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি।

১৯৩৯ সালের ১৪ থেকে ২২শে মার্চ এর মধ্যে লেখা 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি' গানটি এবং ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪০'এ লেখা সানাই অন্তর্গত 'নতুন রঙ' কবিতার পাঠটি তুলনা করে পড়লে কবিজীবনের শেষপর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ কি এক বিস্ময়কর শিল্পকৌশলের অধিকারী হয়েছিলেন তা অনুভব করা যায়। এক একটি রচনাকে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে কি অপূর্বভাবে নতুন করে তুলতেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই দুই পাঠের মাঝামাঝি আর একটি পাঠের কথা উল্লেখ করতে হয় সেটি গীতবিতানের অন্যতম পাঠ।

এই রচনাত্রয় জীবনের শেষ পর্বে রচিত—জীবনের অন্তদিগন্তে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর বার্ধক্যজয়ী শিল্পীমনের এক অলৌকিক কাল্পনিক ভাবনার কথা বর্ণনা করেছেন। জীবনের একদা রঙীন প্রাঙ্গণ ধূসর হয়ে এসেছে। কবি দীর্ঘ-জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন—কিন্তু স্তিমিত ইন্দ্রিয়চেতনায় ক্ষীণ হয়ে আসা স্মৃতিচিত্রগুলিকে চিরকালের মতো আজও কবি তাঁর অপরাজিত কল্পনার তুলির অভিনব স্পর্শে উজ্জ্বল করে তুলতে সমর্থ। শিল্পীমনের অতৃপ্তির প্রেরণায়,

তাঁর পরিণত কল্পনাশক্তির ইসারায় সেই বিবর্ণ স্মৃতি পটটিতে নতুন রঙ লাগিয়ে চলেছেন—হয়তো এ পুরোনো কাঠামোর আধারে নতুন ছবি গড়ে উঠল কারণ স্মৃতিচিত্র দীর্ঘদিন পরে অটুট থাকা সম্ভব নয়।

তিনটি ভিন্ন পাঠের মধ্যে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে গান হিসেবে প্রথমে রচিত পাঠটির কাব্যসম্পদ খুবই উচ্চাঙ্গের। কবিতার তুলনায় এ পাঠে transferred epithet অলংকারের বাহুল্য ঘটেছে—যেমন ধূসর জীবন, ক্লান্ত আলো ইত্যাদি। নতুন রঙ' কবিতার প্রথম দুই স্তবকের ভাব সংহত হয়েছে গানের প্রথম তিনছত্রে :

> 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি।
> সেই সুরের কথা মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী
> তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে॥' (গী বি ৫৬৫ ॥ ২৩৬)

এই ভাবনাই কবিতাতে দুই স্তবক মিলিয়ে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ কবিতার প্রথম স্তবকের ভাবনার প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় স্তবকে প্রবাহিত। প্রতি স্তবকের শেষে শেষ চরণের অন্ত্যানুপ্রাস যেন গানের ধুয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।

গানের যে দ্বিতীয় পাঠ পাওয়া যায় তা কবিতার নিকটবর্তী। কবিতায় এ বর্ণনাই অনেক বাস্তবমূর্তি পেয়েছে। গানের এই পাঠের অন্ত্যানুপ্রাসগুলিকে কবি তাঁর পরবর্তী কবিতার পাঠে প্রায় যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। গানের প্রথম পাঠে যে সুর নিরালম্ব, নিরুপাধি, অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, তা দ্বিতীয় পাঠে স্পষ্টতর। প্রথম পাঠে 'সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি···· ' গানের দ্বিতীয় পাঠে সে গান আর কারও নয়, ব্যক্তিস্বাক্ষর মুদ্রাঙ্কিত মোর গীতি। গানের প্রথম পাঠের সংহত পাঠ দ্বিতীয় পাঠের মাধ্যমে কবিতায় হয়ে উঠেছে অনেক বেশি স্পষ্ট ও বস্তুনির্ভর।

শব্দসমাবেশের অবর্ণনীয় মাধুরী কবির অলৌকিক শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করে। 'গুঞ্জনগীতি' কথাটির সৌন্দর্য এ প্রসঙ্গে মনে আসে। কতকগুলি image যেমন সুন্দর তেমনি গভীর আভাসময়। যেমন 'সেই রঙপিয়ালের ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি' বা 'যেই রঙ পিয়াল ছায়ায় ঢালে শুক্ল সপ্তমীর তিথি', 'বুকের লালিম রঙে রাঙানো'—এ যেন বার্ধক্যজয়ী কবির বহু অভিজ্ঞতাপূর্ণ প্রেমের মৃদুকোমল 'লালিম রঙ'।

এছাড়া নানা গান পাওয়া যায় যেগুলি প্রথমে গান হিসেবে লিখিত হয়ে পরে কবিতায় রূপান্তরিত। 'জানি তোমার অজানা' (১৬ চৈত্র ১৩৩২), 'অনেকদিনের আমার যে গান' (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ পূর্ব), 'আরো একটু বোসো তুমি' (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ পূর্ব), 'কাহার গলায় পরাবি গানের' (২৯ মাঘ ১৩৩৪) প্রভৃতি গানগুলি পরে মহুয়া কাব্যে যথাক্রমে উদ্‌ঘাত (২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫), পুরাতন (পৌষ ১৩৩৫), গুপ্তধন (১৪ কার্তিক ১৩৩৫), নিবেদন (২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫) প্রভৃতি নামে নতুন রূপে স্থান করে নিয়েছে।

সানাই কাব্যগ্রন্থের দেওয়ানেওয়া (পরিবর্তিত কবিতা-রূপ ১০ জানুয়ারী ১৯৪০), আহ্বান (১০ জানুয়ারী ১৯৪০), কৃপণা (জানুয়ারী '৪০), প্রভৃতি কবিতাগুলির গান-রূপ ছিল যথাক্রমে 'বাদল দিনের প্রথম' (৩০ জুলাই, ১৯৩৯), 'এসো গো জেলে দিয়ে যাও' (১ আগষ্ট ১৯৩৯), 'এসেছিনু দ্বারে তব' (আধার পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩৯)।

গুরুদেব, শৈলদা এবং আমাদের ২৫শে বৈশাখ

তেরশো আশির শেষপ্রান্তে বসে আমি আজ স্মরণ করছি তেরশো চল্লিশ দশকের ২৫শে বৈশাখের দিনগুলিকে—। যে দিনগুলি আমার কেটেছে অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমায়, শৈলদার দেশ এবং আমারও দেশ ছিল। প্রতি বছর এই দিনটিতে আমার সকলের আগে মনে পড়ে আমাদের শৈলদাকে, (এখানকার শৈলজাদা) তারপর মনে পড়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে। নীতিগতভাবে হয়তো গুরুদেবকেই আগে স্মরণ হওয়ার কথা। কিন্তু আমার জীবনের একটা দুর্ভাগ্য যে, গুরুদেবকে আমি কখনো দেখি নি চোখের সামনে। তিনি আমার ধ্যানের বস্তু। আর সেই ধ্যানের মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছি শৈলদার কাছে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন আমার বয়স ১৫-১৬ হবে। ইংরাজী ১৯৩৪-৩৫ সাল হবে। প্রতি বছর যখন চৈত্র মাসের "যাই যাই"— তখন থেকে আমাদের নেত্রকোণার ছোট্ট প্রাচীন শহরে ২৫শে বৈশাখের প্রস্তুতির সাড়া পড়ে যেতো। কবে শৈলদা আসছেন সবার চোখে সেই জিজ্ঞাসা। শৈলদা থাকতেন উকিল পাড়ায়। লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করেই শৈলদা চলে আসতেন নিজের জন্মস্থান নেত্রকোণায়। আমরা তখন সব পাড়ার মানুষ এক হয়ে যেতাম শৈলদার ডাকে। চলতো ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠানের পাঠ বিতরণ ও রিহার্সেল। রিহার্সেল হতো স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে—রোজ ছুটির পর।

তখনকার দিনে আমাদের অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ আজকার মত সবার মনে স্থান পান নি। আমি ছিলাম অতি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা গান বাজনা খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু বাইরে গিয়ে অথবা বাড়ীতে মাষ্টার রেখে এখনকার মত মেয়েদের গান শেখার চল বড একটা ছিল না বাবা ও মায়ের কাছেই আমার গান শেখা আরম্ভ হয়েছিল। রোজ সকাল সন্ধ্যায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাবার প্রেরণায় গলা সাধা চলতো। ক্রমে

গান-জানা মেয়ে বলে পরিচিত পরিজনদের কাছে আমার বেশ নাম হয়েছিল, এখন মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারি—সংগীত শাস্ত্রের কিছুই জানা হয় নি।

রবীন্দ্রসংগীত আমাদের বাড়ীতে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। লুকিয়ে শিখতে হতো রবীন্দ্রনাথের গান। আমার বাবা রবিবাবুর (রবীন্দ্রনাথের) গান শুনলে রেগে যেতেন। বলতেন "কাঁদুনে গান"। যারা রবীন্দ্র-সংগীত গাইতেন তাদের বলা হতো "রবিঠাকুরের চেলা"—। আর রবীন্দ্রজয়ন্তীর নামে অনেকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। এ হেন স্থান, কাল পাত্র নিয়ে ছিল শৈলদার কাজ।

আমার বাবা শৈলদাকে খুব স্নেহ করতেন। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গান গাইবার জন্য আমার ডাক পড়তো প্রায় প্রতিবছরেই। কিন্তু যেবার শৈলদা কোন কারণে নেত্রকোণা যেতে পারতেন না, সে বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে আমাকে অংশ নিতে বাবা অনুমতি দিতেন না। বাবা বলতেন "শৈলজার কথা আলাদা, ওঁর ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের উপর কোন কথা চলেনা।" মোট কথা, আমার বাবা ছিলেন শৈলদার গানে মুগ্ধ। সে গান কোন্ গান, কার গান এই প্রশ্ন বাবার মনে আসতো না।

আমাদের ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠান হতো বেশীর ভাগই স্থানীয় "দত্ত হাইস্কুলে"। প্রায় প্রতি বৎসর সেদিন যথারীতি কালবৈশাখীর ঝড় উঠতো সন্ধ্যাবেলায়, নয়তো নামতো মুষলধারে বৃষ্টি। স্কুলঘরের টিনের চালে রাজসমারোহে কান-ফাটা শব্দে প্রকৃতিদেবী বর্ষার কবির আবাহন বাদ্য বাজাতেন। আমরা ছেলেমেয়েরা পূজারীর সাজে শৈলদার মুখের দিকে তাকিয়ে, পত্রপুষ্পে, ধূপগন্ধে সজ্জিত গুরুদেবের প্রতিকৃতির তলায় বসে থাকতাম। কখন বৃষ্টি থামবে, আর আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে পারবে।

আমাদের সময়ে গানের দলের মেয়েদের পোষাক ছিল—গেরুয়া ছোপানো লালপেড়ে শাড়ী আর লাল শালু কাপড়ের তৈরী ব্লাউজ। ব্লাউজের ডান হাতের উপরে রবীন্দ্র-টাইপে লেখা "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" কথাটা সাদা সুতোয় সেলাই করে লেখা থাকতো। এলোচুলের খোঁপায় পত্রপুষ্পে গুজে, চন্দনে ছোপানো বেলফুলে আঁকা টিপ কপালে। আমরা বরণডালা নিয়ে গুরুদেবকে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করতাম একজন একজন করে। শৈলদার সেদিন অন্যরূপ দেখতাম। এক জ্যোতির্ময় মূর্তি, শ্বেতশুভ্র সাজে বিস্ময়-স্তব্ধ নিবেদিত প্রাণ শৈলদা সর্বাগ্রে

গুরুদেবকে মাল্যভূষিত করে পূজারীর ভক্তি-অর্ঘ্য ঢেলে দিতেন। তারপর আমরা একে একে তাঁকে অনুসরণ করতাম।

ছেলেদের সাজ ছিল কাঁধে রূপালী রাংতা বসানো পাড়ে আর আঁচলে ঝলমল গেরুয়া চাদর। সাদা ধুতি পরণে আর কপালে সেই চন্দনের ছাপ। বেদ গান "যদেবি প্রস্ফুরন্নিব—" দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতো। আমাদের মনে একটা পূজা পূজা ভাব হতো সেদিন। সেদিনের শৈলদার কণ্ঠ ছিল উদাত্ত, ভাব মাধুর্যে ভরপুর। আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইতেন। সেদিনেব সেই আনন্দের স্মৃতি আজও মনে নবীনতার ছোঁয়া দিয়ে যায়।

আজকাল শুনতে পাই শৈলদা নাকি গান গাইতেন না—শুধু এস্রাজ বাজাতেন। কথাটায় মনে ব্যথা লাগে। বরং বলা যায়—এস্রাজের ঝঙ্কারের সঙ্গে শৈলদার গানের সুর এক হয়ে যেতো, সেই দুই সুরের দ্বৈত ঝঙ্কাব আমরা শুনেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শৈলদা এস্রাজ বাজিয়ে আমাদের গান শুনিয়েছেন। শান্তিনিকেতন থেকে দেশে গেলে প্রথম দেখা হতেই বলতেন— "এবার গুরুদেব অকৃপণ হাতে ডালা ভ'রে দিয়েছেন।" সেই গানের ডালা আমাদের কাছে ঢেলে দিয়েই ছিল তাঁর তৃপ্তি। জানিনা কণ্ঠ মাধুর্যে, এবং রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ উত্তরস্মৃরি আজকাল কজন আছেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে অনুষ্ঠান-সূচীর বৈচিত্র্যের দিকে শৈলদার খুব লক্ষ্য ছিল। একক সংগীত, দ্বৈত সংগীত, সম্মিলিত সংগীত, গানে গ্রন্থনায় বর্ষামঙ্গল, ঋতুমঙ্গল আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য—ইত্যাদি সবই অনুষ্ঠান সূচীতে স্থান পেত। শৈলদা একবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে গাইবার জন্ত আমাকে "যৌবন সরসী নীরে" এই গানটা শিখিয়েছিলেন, আমিও খুব যত্ন করে গানটা শিখেছিলাম। কিন্তু ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে শৈলদা আমাকে গানটার উচ্চগ্রামেব লাইনগুলি দাগ দিয়ে বললেন যে ঐ লাইনগুলি আমাকে গাইতে হবে না—, বললেন, ঐ লাইনগুলি তিনি নিজে গাইবেন। আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম—তবে কি ঐখানটায় আমার সুর ভুল হচ্ছে? কিন্তু আমি তো ঠিক তাঁর মত করেই গাইতে চেষ্টা করেছি। যাই হোক শৈলদার নির্দেশ-মতই গান হলো—, গান খুব ভাল হলো। পরে জানতে পেরেছিলাম—যে

ওটার নাম "ডুয়েট গান"। সেদিন সত্য চৌধুরী (আমার ভাই) গেয়েছিল—"জাগো হে রুদ্র জাগো" আর তার সঙ্গে ছিল রমলা গুহের রুদ্র নাচ। অপূর্ব।

আর একবার শৈলদা আমাকে "কাঁদালে তুমি মোরে" গানটা একক গাইতে দিয়েছিলেন। ২৫শে বৈশাখ এলো। আমরা অনেকেই গান গাইলাম। বিমল চৌধুরী গেয়েছিলেন—"যদি জীবন পূরণ নাই হলো—" আমি গাইলাম—"কাঁদালে তুমি মোরে—।" শৈলদা ও তাঁর মামা সুরেশ মজুমদার—এঁরা দু'জনে আমার দুপাশে এস্রাজ বাজালেন। গান ভাল হলো—শৈলদা খুশীর হাসিতে তা জানালেন। অনুষ্ঠান শেষ হলো।

কিন্তু কদিন পর তীব্র সমালোচনা বের হলো "ভাস্কর" নামে তখনকার এক সাপ্তাহিক কাগজে। ময়মনসিংহ থেকে বোধহয় কাগজটা বের হতো। গানের লাইন তুলে তুলে তীব্র সমালোচনা। "ভালবাসার ঘায়ে—" "তোমার অভিসারে—"—"দিবে না তবু ছেড়ে—" ইত্যাদি কথা একটি কুমারী মেয়ের মুখে নিতান্ত অশোভন এবং অশ্লীল। রবীন্দ্র জয়ন্তীর উদ্যোক্তা শৈলজাবাবুর রুচিকেও প্রশংসা করা যায় না ইত্যাদি। শৈলদা কাগজটা এনে আমাকে পড়তে দিলেন। আমি লজ্জা বোধ করলাম। তখন ছিল জীবনের নিতান্ত সরলতা ও নির্ভরতার বয়স। শৈলদা আমার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিলেন।

পূর্ব বাংলার ঐরূপ জনমানবের কাছে, যেখানে পরাজয় এবং বিদ্রূপই ছিল প্রধান প্রাপ্য, যেখানে যশ ও সুনাম ছিল বাড়তি পাওনা, সেখানে বীরোচিত মন নিয়ে, সাধকের মতে শৈলদা কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে চলেছিলেন। সেখানকার মানুষের মনে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তিকে। আজ মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কলমে বুঝি শৈলদারই মনের কথাটা—"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে।"

কয়েক বছর আরও কেটে গেল। শৈলদার আশা আর এক ধাপ এগিয়েছে। এবার রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য আর গীতিনাট্য উপহার দিলেন তিনি নেত্রকোণার মানুষকে। প্রথমে করালেন 'চিত্রাঙ্গদা'—নমিতা রায় ১১।১২ বছরের একটি মেয়ে—চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় দর্শকদের সম্মোহিত করেছিল। তারপর হলো 'পরিশোধ' (শ্যামা) মুকুল সেন শ্যামার ভূমিকায়—মুকুল বর্ধন বজ্রসেনের ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করেছিল। আমাকে দিয়ে গড়ালেন এদের গয়না। নিজের

হাতে পেষ্টবোর্ড কেটে, নানা ডিজাইনে অলঙ্কাভরণ, রাংতা আর পুঁতির সোনালি, রূপালি আভায় ঝলমল। নিজের হাতে শৈলদা সাজাতেন। একাধারে দৃশ্যসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, প্রযোজনা, নির্দেশনা সব কিছুই শৈলদা। যন্ত্রের সুর বেধে দেওয়া সবি আমরা বিস্ময়ে চেয়ে দেখেছি আজও কাণে শুনতে পাই শৈলদার কণ্ঠে—"রাজার আদেশ ভাই চোর ধরা চাই—'। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী অভিনয় দেখতে দেখতে অধীর আগ্রহে ভেবেছে—"What comes next"?

এরপর এলো "চণ্ডালিকা।' মুকুল বর্ধনকে সাজালেন প্রকৃতি—আমাকে মায়া। বাদলাকে দইওয়ালা ও চুরিওয়ালার ভূমিকায় আর একজনকে। বাদলাকেই পরে আনন্দের ভূমিকায় দেখালেন। চণ্ডালিকায় মায়ের ভূমিকা আমার কাছে কিছুটা অস্বস্তিকর লেগেছিল। কিন্তু শৈলদার ইচ্ছার বাইরে তো যাওয়া যায় না। আমাকে সাজিয়েছিলেন, শ্রদ্ধেয় করুণাকেতন সেনের স্ত্রী মিসেস সুধা সেন। শ্রীযুক্ত সেন ছিলেন তখন নেত্রকোনা মহকুমার এস. ডি. ও. এঁদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কাজে কর্মে।

এর পরের ধাপে শৈলদার ভীষণ দুঃসাহসিকতা ও একগুয়েমীর পরিচয় পাই। সেবার ২৫শে বৈশাখে শৈলদা ঠিক করলেন আমাদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-নাট্য অরূপরতন (রাজা) করাবেন। নাটকের বিষয়বস্তু সব বোঝালেন আমাদের। সুদর্শনা সুরঙ্গমার ভাবমূর্তি ব্যাখ্যা করলেন। আসল রাজা, নকল রাজা ঠাকুরদা—সবার পরিচয় ব্যাখ্যা করলেন। এক কথায়—এই রূপক নাট্যের উচ্চ-ব্যাখ্যা আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিলেন। নাটকটি আমাদের কাছে ভাল লাগলো, আমরা সবাই খুসী হলাম। শৈলদা প্রথমে আমাদের গানগুলি শেখাতে আরম্ভ করলেন। প্রস্তাবনায়—"চোখ ওদের ছুটে চলে গো—" গানটা শেখালেন। তা ছাড়া সবাইকেই শেখালেন,—"আজি দখিন দুয়ার খোলা—" "আমরা সবাই রাজা" "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে—" ইত্যাদি ঠাকুর্দার ভূমিকার জন্য শেখালেন—"আমার জীর্ণ পাতায় যাবার বেলায়—" সুদর্শনার ভূমিকার জন্য শেখালেন—"খোল খোল দ্বার", "প্রভু বল বল কবে" "আমি যখন ছিলেম অন্ধ", "আমার—অভিমানের বদলে আজ—" ইত্যাদি। আমাদের প্রস্তুতি অনেকটা এগিয়ে গেল। আমাদের সময় মাইকের

চল ছিল না এখনকার মত। কাজেই অভিনয়ে অকৃত্রিম কণ্ঠদান অপরিহার্য্য ছিল। ভারি বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা উচ্চকণ্ঠে পাঠ মুখস্থ করতাম।

পুরো নাটকের রিহার্সেল শুরু হবে। শৈলদা বললেন, পুরুষের ভূমিকায় ছেলেরা পাঠ করবে—মেয়েরা আর পুরুষ সাজবে না। পাঠ বিতরন শুরু হলো। সুদর্শনা, মুকুল বর্ধন—সুরঙ্গমা, বিমল চৌধুরী ঠাকুর্দা, বাদলা নকল রাজা, আর আসল রাজা হবেন চিক্কণবাবু অথবা তারুমামা। সব কিছুই প্রায় সবাই মেনে নিল। কিন্তু গোল বাধলো রাজার পাঠ নিয়ে। নেত্রকোণার মত গেঁয়ো শহরে ছেলে-মেয়ের ডায়লগ কল্পনাতীত। কিন্তু শৈলদা অটল। সকলে বিপদ গুণলো। শৈলদার গোঁয়ার্তুমির কিছু কিছু সমালোচনাও হলো। কিন্তু শৈলদার যুক্তির মূল কথা ছিল "শান্তিনিকেতনের মত করে অনুষ্ঠান করার আমাব নিজের দেশে—এ আমার অধিকার" একনিষ্ঠ গোঁয়ার শৈলদার পক্ষে কেউ গেল না। আমিও আপত্তি জানালাম রাজার ভূমিকায় ছেলেদের অংশ গ্রহণে। লোক নিন্দাকে আমরা বড় ভয় করতাম। বাদলার দিদি মিনুকে রাজার পাঠ দিতে আমি শৈলদাকে অনুরোধ করলাম। শৈলদা খুবই মর্মাহত হলেন। তাঁর শান্ত সৌম্য মূর্তি গাম্ভীর্যের পাথরে পরিণত হলো। সেই সঙ্গে আমাদের আনন্দ উচ্ছ্বলতাও নিবে গেল। শৈলদাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস কারো নেই। আমরা ঠিক করে নিলাম—অরূপরতন আর হবে না।

বেশ কয়দিন কেটে গেল। একদিন একজন সাহস করে "অরূপরতন" হবে কিনা শৈলদাকে জিজ্ঞেস করলো। কারণ আমরা সবাই তো অর্দ্ধপ্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। এ সময় এরূপ আকস্মিক ছেদ পডায় আমরা একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম। শৈলদা রায় দিলেন সবাই চাইলে হবে। রিহার্সেল শুরু হয়ে গেল। রাজার পাঠ কাউকে দেওয়া হলো না। শৈলদা রিহার্সেলের সময় ঐখানটা শুধু একবাব পডে যেতেন পরের ভূমিকায় এগোবার জন্য। আর সকলেই—যাব যার পাঠ বিহার্সেল দিতে লাগলো। ২৫শে বৈশাখ কবিবন্দনা ও কয়েকটি নির্বাচিত গান ও আবৃত্তি দিয়ে শুধু তারিখ-পালন করা হলো। প্রকৃত অনুষ্ঠানের দিন কিছু পিছিয়ে দেওয়া হলো।

অনুষ্ঠানের আগের দিন ষ্টেজ ও ড্রেস রিহার্সেলের জন্য আমরা সদলবলে স্থানীয় আঞ্জুমান হাই স্কুলে সন্ধ্যাবেলা মিলিত হ'লাম। শৈলদা হল ঘরের

শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে সবার কণ্ঠ সেখানে পৌঁছে কিনা পরীক্ষা করিতে লাগলেন এবং সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখনও আমরা কেউ জানিনা যে, রাজার পাঠটা কে করবে। শৈলদা নাকি একদিন কাকে বলেছিলেন যে, রাজা ছাড়াই "অরূপরতন" হবে। আমরা একটা ধাঁধাঁর মধ্যে রয়ে গেলাম। ষ্টেজ রিহার্সেলের দিনও শৈলদাই রাজার পাঠ পড়ে গেলেন। পরদিন অনুষ্ঠান। শৈলদা একসময় আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন যে রাজা অহঙ্কারী সুদর্শনাকে তো দর্শন দিচ্ছেন না, সুদর্শনা শুধু রাজার কণ্ঠস্বরই শুনতে পাবে—আর শৈলদা নিজেই সেই নেপথ্য পাঠে—রাজার কণ্ঠ দেবেন। সুদর্শনার সাজে সজ্জিতা হয়ে সেদিনকার সেই অপূর্ব অনুভূতি আজও আমি অনুভব করি। মনে আছে—সেই অন্ধকারের দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে আমি আপন সত্বা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কি এক অপূর্ব অনুভূতিতে সে দিনের সুদর্শনা চোখের জলে ভেসেছিল। অভিনয় শেষে শৈলদার একনিষ্ঠতা, জেদ এবং সর্বোপরি তাঁর একক ক্ষমতা দেখে সবাই নির্বাক বিস্ময়ে পরাজয়ের জয়ে গর্ববোধ করেছিল। আজকার এই লেখা শুধুই স্মৃতিচারণ।—ভুলে যাওয়া আধো-মনে-পড়া সম্পদ তো আরও পেয়েছি—শৈলদার কাছে। সে সব বলা তো সম্ভব নয়। শৈলদার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু আছে কিনা আমি জানি না। এই সর্বত্যাগী মানুষটির জীবনবোধ গুরুদেবের জীবনসত্বায় এক হ'য়ে মিশে আছে। আর শৈলদার কাছে যা পেয়েছি যা নিয়েছি—তুলনা তার নাই।

প্রমীলা দত্ত (চৌধুরী)

উত্তরস্মৃতি ১১১

স্বতন্ত্রভূমিতে চারজন কবি : কিছু অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ

বিজয় দেব

[এক]

কবিতার স্বরূপ নির্ধারণে মৃত্যুর একযুগ পূর্বে একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন—কবিতা কবির অবিলম্ব দুঃখকে সহৃদয় পাঠকের পরীক্ষা ও আলোচনার বিষয়ীভূত করে তুলবে। বস্তুতঃ সেই অভিপ্রায়ই সর্বসমক্ষে কবিসত্তার একধরণের উন্মোচন। একদা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি হার্ডি বেদনার মুহূর্তে রচনা করেছিলেন বিয়োগান্তক কবিতা। এমন কি এক গভীর সংকট কালে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতা অস্তিত্ব এবং জীবনের দেবত্বকে ভাবাবেশে সঞ্চারিত করে। হাইনরিখ জিমার গুরুত্ব আরোপ করেন "We think of egos, individuals, lives, not of life"

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিশের দশকের কবিগণ একান্ত স্বাধীন চেতনা বহন করে সৃষ্টিপর্বে মগ্ন হলেন। শুরু হলো নিজস্ব কণ্ঠস্বরের ব্যাপক অনুসন্ধান। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধারার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রবণতাও অনুভব করলেন। তখন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে নব্যরীতির পন্থা আবিষ্কারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। অবশ্য স্বাতন্ত্র্যের শিরোপায় ভূষিত হয়ে পুনরায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বেই প্রত্যাবর্তন শেষ করলেন সেই কবিগণ। কবি অমিয় চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন "এ হলো পারম্পর্যের সৃষ্টিতত্ত্ব", তিনি সেখানে শিল্পে ও সাহিত্যে বিশ্ব-প্রপঞ্চের প্রতি স্থির দৃষ্টি স্থাপন করে কাব্য রচনায় উদ্যোগী হতে কবিগণকে আহ্বান করেছেন। চল্লিশ দশকেই কবি সমর সেন সবাইকে চমকিত করে কাব্যরচনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি ক্রটী স্বীকার পত্রে অবশ্য উল্লেখ করেছেন: "সে সব দিনগুলোতে কাব্য বস্তুতঃ বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের অংশরূপে চিহ্নিত ছিলো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের অন্তর্গত জ্ঞানের শর্তও সেখানে গভীরভাবে নিহিত।

যেমন আব্দুল করিম খাঁ, যামিনী রায়, বাক্, বিটোফেন, মার্ক্স, লেনিন এমন কি ফ্রয়েড, শেলী রবীন্দ্রনাথও পর্যাপ্ত নয়। ইংরেজ লেখকগোষ্ঠীও যথেষ্ট নয়।"..

মহাযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায় কিছু সংখ্যক কবিকে দায়িত্ব সচেতন করে। অবশ্য স্বাভাবিকভাবে মহাযুদ্ধ প্রায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। তখন শব্দমূল বা ধাতু-সংক্রান্ত দিক থেকে এক অনাবিষ্কৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বৈকি। একজন কবি বা গল্পলেখকের উপর অর্পিত কর্ম—অভিজ্ঞতার সান্নিধ্যলাভের অনতিবিলম্বে শব্দগত বা অভিধানগত পরিভাষার ঘনিষ্টতা অধিকার করা। যদিও স্বাধীনতা উত্তর ভারতে এই সব কাব্যচর্চায় প্রাক-স্বাধীনতা সময়ের ঝোঁকও লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ তা হলে কি এইসব কবিদের রচনায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রযাস কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি?

অমিয় চক্রবর্তী এক তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কেত দান করেছেন: "আধুনিক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মান আশ্চর্য ভাবে ভারসাম্য বহন করে চলেছে। তার একমাত্র কারণ হলো তাঁর কবিপ্রতিভা পূর্ণ কাব্যিক দায়িত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুগকে গ্রহণ করেছে।"

আধুনিক কবিতা প্রকৃতি এবং মানুষের সংকল্প বা অভিলাষের সঙ্গে সাময়িক যোগসূত্র রচনা করে। সেই পর্যায়ে ঐক্য বা একত্বের জ্ঞান শিল্পীর কাছে নতুন দায়িত্ব অর্পণ করে। যুদ্ধ ও সভ্যতার মহাপ্লাবন এবং একটি যুগের অবিরাম ট্র্যাজেডিও কবিদের সচেতন ক'রে সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে। রবার্ট লিণ্ড বলেছেন' "কাব্য এক দ্বৈত উৎসমুখ থেকে প্রবাহিত। যেমন উপযোগবাদী জনক এবং সৌন্দর্যচেতনাময়ী জননী থেকেই কাব্যের উদ্ভব ঘটে। কবি অমিয় চক্রবর্তী উপযোগবাদী জনক সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। অনিবার্য-ভাবে তিনি নন্দনতত্ত্বের জননীর আবশ্যিক কর্তব্য ও বিশুদ্ধতায় আঘাতও করেন। তখন তিনি সামাজিক দায়িত্বের বা বিশ্বাসের নিকট সমর্পিত।

মার্ক্সবাদে অনুপ্রাণিত কবি বিষ্ণু দে নিওমেটাফিজিক্যাল কবি হপ্‌কিন্সকে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজনে। তিনি সেখানে মায়াকভস্কির মতো সামাজিক এবং আত্মিক সংকটের প্রয়োগকরণের দায়িত্বও সমর্থন করেন, একটি কবিতার অন্তরালে যা অবিরাম সক্রিয় তা হলো.

১. ব্যক্তির আংশিক অস্তিত্বের ওপর এক গোষ্ঠীভুক্ত কর্মের বিন্যাস স্থাপিত হয়। ২. সমগ্র কবিতায় বিচ্ছিন্ন সংলাপ ঐকতানিক যাদুমন্ত্রের সম্পূর্ণতা দান করে। ৩. কবি এখানে মুক্ত কণ্ঠে 'ভাবপ্রবণতা বিমুক্ত'কে অভিযুক্ত করেন এবং সংবেদনশীলতা ও সমন্বয়ে যোগসূত্র নিয়ে রচনায় উদ্যোগী হন।

এই সব নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কখনো কখনো জনসাধারণের জন্য একান্ত ভাবে সমর্পিত কাব্য থেকে কবিগণ দ্রুত প্রস্থান করেন নির্বাচিত সমষ্টির কাছে। এই গোষ্ঠীভুক্ত কবিগণ "গোঁড়া বলে চিহ্নিত নয়" মন্তব্য কোন এক প্রতিষ্ঠিত কবির। এই যুগের কবিদের প্রবণতা হলো জনগণের কাব্যকে পরিহার করে আইভরি টাওয়ারের দিকে নিজেদের গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট করা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, অরুণ ভট্টাচার্য এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যরীতি বিশেষ ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত। অলোকরঞ্জনের কবিতায় নিত্য প্রবাহিত সুরমূর্ছনায় এক মরমীয়ার অন্বেষণ। শব্দ ভেঙেচুরে তিনি নির্মাণ করেন এক শিল্প-সৌধ। শব্দের আভিধানিক মুক্তিদানে কবি একান্তভাবে মগ্ন। অরুণ ভট্টাচার্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের রাগে বাঁধা পর্দা নিয়ে শব্দগত রাজ্যে প্রবেশ করেন। একদা এই জগৎ তাঁকে ঘনিষ্ঠ করে রাখতো, ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে দিগন্তের তমালকুঞ্জ থেকে বাঁশীর সুর যেন অনুসন্ধানের পর্বকে নির্দিষ্ট করে। শঙ্খ ঘোষের সহজ রীতি কখনো দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতা বলে চিহ্নিত। তাঁর কাব্যের পটভূমিকায় বিরাজমান ম্যাকবেথ অদ্ভুত মানুষের অবস্থা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। তিনি প্রত্যাশা করেন পাঠক যেন উদ্বুদ্ধ হয় তাঁর কাব্যের অতলে তাকে আবিষ্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা চটকদার, বুঝিবা ছন্দের সুষমায় সজ্জিত কখনো সমতাহীন। অথচ মহনীয় অনিশ্চিতের উপাদান সংগ্রহ করে কবি ইঙ্গিতময় করে তোলেন—যেমন তিস্তা, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, চালসা, সামসিঙ। এদের প্রতিধ্বনি স্বভাবতঃ এক অনুপ্রাশজাত জগৎ সৃষ্টি করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাব্যকে কয়েকটি অংশে বিভাজিত করেছেন—কেমন—ক. প্রতিদ্বন্দ্বী দুদল খেলোয়াড় দ্বিধাবিভক্ত। খ. করাতের সাহায্যে দিবারাত্র খণ্ডিত। গ. সমগ্র বিশ্বজগৎ একটি ফুটবল মাত্র।

আধুনিক বাংলা কাব্যে সম্প্রতি ব্যক্তিগত সম্ভাবনার প্রকাশকে ত্বরান্বিত

করে। কবি আবেগ বা অর্থের সাহয্যে গ্রহণ করেন না বরং কবিতার অন্বেষণে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখেন। কখনো সৌন্দর্যের মধ্যে সত্য উপলব্ধিই একদা কীটসের তত্ত্বকে প্রসাধিত করে। চল্লিশের দশকের কবিগণের সম্মুখে অবস্থিত সংকট তাঁদের সচেতন করে। সেই সময় স্রষ্টা তাঁর গ্রাহক সম্বন্ধেও দায়িত্ব অনুভব করেন। পঞ্চাশের দশকে কাব্যের গুরুত্ব প্রসঙ্গে প্রধান ভূমিকা গ্রাহক তথা পাঠকের। পরবর্তী পর্যায়ে যাটের দশকে স্রষ্টা তখন স্বাধিকার সচেতন।

জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-যুগপরবর্তী বাংলা কবিতা এক মরুভূমি সদৃশ প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত ঐতিহ্যের অনুশীলন শুদ্ধ। এমন কি ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা নেই, বরং করুণভাবে উপেক্ষিত। এখন স্বাভাবিক ভাবে অনুকরণপ্রিয়তা কবিদের উত্তেজিত করে। বিদেশী সভ্যতার মান এবং সমৃদ্ধিব প্রলোভন কবিদের নতুন করে অনুপ্রাণিত করে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত কবিগণ অন্তর্ভুক্ত। এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বীটনিক বা হাংরি জেনারেশনের সুর লক্ষ্য করেছিলেন। এই পর্যায়ে সমগ্র কাব্যজগতে কোন ব্যক্তিগত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি বরং বলা যেতে পারে, সামগ্রিক প্রচেষ্টা বাংলা কাব্যকে ব্যথিত করেছে। কবিতা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত নয়। এটি অনাস্থা থেকে শক্তিব প্রয়াস মাত্র। এবং অতি আধুনিক কবিমন স্বাতন্ত্র্যবোধে নিজেদের পরিচিত করতেও উৎসাহ অনুভব করেন নি, অথচ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তীব্র দীপ্তিতে কবি অনায়াসে এক রূপকথা, বিশ্ব নির্মাণ করতে সমর্থ হন। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবানন্দ দাশ অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগণ।

পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী কবিগণ অনুক্ষণ সমাজ বা সমসাময়িক সমস্যা বা জৈবিক প্রশ্নকে হৃদয়ে বরণ করে কাব্যরচনায় তন্ময় হয়েছেন। সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের আদি যে প্রশ্ন তা যেন অনুপস্থিতই থেকে যায়। আমি কে? এই স্বরূপ উন্মোচনের সাধনা ও পরিলক্ষিত হয় নি। সুতরাং উপলব্ধির জগতে তখন এক শূন্যতা বিরাজমান।

প্রসঙ্গতঃ ক্লান্তির সুর যখন বাংলা কাব্যকে পীড়িত করে রেখেছে তখন ব্যাতিক্রমে উজ্জ্বল ক'জন কবি স্বকীয় রীতির বৈশিষ্ট্যে পাঠকদের সঞ্জীবিত করে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ঐতিহ্যের অনুশীলনে শব্দ বা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র রীতি এবং জীবনদর্শন।

[দুই]

"যৌবনবাউল' কাব্যগ্রন্থ বাঙালী কাব্যরসিক মহলে প্রথম বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এই কাব্যগ্রন্থই রীতি এবং উপলব্ধির মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় রচনা। সামগ্রিক প্রয়াসের ধারাবাহিকতা মুক্ত থেকে প্রসন্ন এক একক বিশ্ব রচনা। জনমানসেব মধ্যে তাঁকে যেন মুহূর্তেই চিহ্নিত করা যায়। এ রীতি ভিন্ন, নির্মাণ-কৌশল ভিন্ন, জীবন-অন্বেষণও ভিন্ন।

'যৌবনবাউল' এব ঐকতান গায়ক দলের মেলায় প্রবেশেব পূর্ববর্তী অংশ 'উৎসর্গ' কবিতা কবি মরমীয়া অভিজ্ঞতার আনন্দরূপে পরিপূর্ণ। তাঁর হাতে দোতারা, পরনে গৈরিক বাস। আর নৃত্যে-সঙ্গীতে ছড়িয়ে পড়ে জীবনের রহস্য। বাউলেব আর্তি বারবাব ঝবে পডছে

পটভূমি অন্ধকার আপন স্বত্ব অধিকার
বাখুক আমি শরীর নোয়াবো না।
একটি মাত্র রাখাল যাক এ মাঠে একলা প'ড়ে থাক
নীরবে আমি এ মাঠ ছাডবো না।

কবি অলোকরঞ্জন জীবনের অতলে ডুব দিয়েছেন, প্রয়োগকর্ম বাউলের, অনুশীলন করেন অনুক্ষণ আপন ঐতিহ্যের, তিনি যোগ কবেন বাউলের সুর এই বিশ্ব-পরিক্রমার। পরম জিজ্ঞাসার শাশ্বত রূপকে গ্রহণ করেছেন আপন স্বভাবে : তাই তো অলোকরঞ্জন ব্যক্তিগত অনুভবে স্বয়ং বাউল। যৌবনবাউলের এই প্রস্তাবনা শেকস্‌পীয়ারের নাট্য মুখবন্ধের অনুকরণে প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য ভাবে স্থাপন করে নিজস্ব রীতিতে।

একদা বিস্ময়কর কবিতা 'অন্ধ বাউল'এ কবি অস্তিত্বের অতি নিবিড় উৎস-মুখে ধ্যানমগ্ন। আমি কে? কি সেই স্বরূপ? সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যে অবিরাম অন্বেষণ তারেই অন্তর্গত অলোকরঞ্জন। ভারতবর্ষের অস্তির অনুভবে

নিজেকে সমর্পিত করেছেন অতি সন্তর্পণে। অবশ্য বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণিক ভীরুতা ভিন্ন একবিশ্ব উন্মোচিত করে আমাদের সম্মুখে। উদ্যানের সৌরভে মুগ্ধ অনুভূতি। কিন্তু কোথায় সৌরভের উৎস? এ প্রশ্ন তো অনাদিকালের।

"আয় তাকে মন করবি চুরি,
সে আছে কোথায কেউ জানে না—
অথবা সে যেন অধবা সুবাস।"

তাকে লাভ করার কামনা অলোকরঞ্জনের মধ্যে গভীর বেদনা সৃষ্টি করে। শুরু হয অন্বেষণ, বাউলের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে বাউল সঙ্গীত, প্রতীচ্যের প্রভাবে নাস্তির সংশয়ে অলোকরঞ্জন ক্ষতবিক্ষত হন নি বরং অস্তির প্রশান্ত ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেছেন, মুক্তির সন্ধানে তিনি নিজেই ব্যাকুল হন নি, সেই সঙ্গে শব্দ পরিবেশকেও মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। এখানে অলোকরঞ্জন এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রতিটি শব্দ ও দ্যোতনা বাউলমনকেও একই সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করে রেখেছে, তাঁর কণ্ঠভরা গান আমাদের মুগ্ধ করে, এমন কি আমার মধ্যে এক উদাসী বাউলকে অধিষ্ঠিত করে। তখন অনিবার্যভাবে বাংলা কাব্যের পোড়া-মাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাউলের সঙ্গীতরসের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

'নিষিদ্ধ কোজাগরী'র মধ্যখানে অলোকরঞ্জন এক নতুন বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে। শব্দের বিন্যাসে নানা ভাবে সমন্বয় যোগাযোগ প্রভৃতির খেলা চলেছে অবিরত। ভিন্ন এক সংস্কৃতি, নতুন এক ঐতিহ্য তাঁর লীলাভূমির চতুর্দিকে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছে, অথচ দূর থেকে ভেসে আসছে যমুনা পুলিনের বাঁশীর সুর, অলোক-রঞ্জন তখন শিল্পী, ময়দানে, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের মধ্যে সেতুরচনার দায়িত্ব যেন তার ওপর অর্পিত। কিন্তু বিশ্বে শোনিত-স্রোত প্রবাহিত, তা সত্ত্বেও দূরদেশী রাখালের সুমধুর বাঁশীর সুর তাকে গৃহছাড়া করে। ব্যাকুল হৃদয়ে পথে বেরিয়ে আসেন।

"আমিও, অথচ যে-রাখাল দূরদেশী,
আমি তাঁর কাছে সপেছি মনপ্রাণ,"

অথবা

"রাখালিয়া গীতি হাতে নিয়ে ভাজিল,"

এই কবিতায় অলোকরঞ্জন যেমনি দুটো ঐতিহ্যের মধ্যে অঙ্গুরী বিনিময় সম্পন্ন করেছেন তেমনি ইংরেজী শব্দ ও বাংলা শব্দের সহবাস্থান পরিবেশ রমণীয় করে তোলার প্রয়াসী হয়েছেন, অবশ্য তিনি খুবই শব্দ-সচেতন বলে দুটো ভাষার স্ব স্ব প্রতিমা স্পষ্টতা লাভ করেছে। প্রসঙ্গতঃ অলোকরঞ্জন দ্রুত ধাবমান কালের স্রোতে অবস্থান করেও যেন অবিচল নির্বিকার। কারণ ঐতিহ্য তাঁর চেতনার অভ্যন্তরে আপন নিয়মে কাজ করে চলেছে।

'রক্তাক্ত ঝরোখা'য় পরম বিশ্বাস অনুসন্ধান পর্ব। ঈশ্বর। নির্ভরতা। পরিবেশ ও যুগ-মথিত ব্যক্তির বিশ্বাসের অন্বেষণ এক নতুন সুরের দিগন্তে অলোকরঞ্জন নিজেকে সাময়িক নির্বাসিত করেন। তাঁর বিস্মিত দৃষ্টিতে রক্তাক্ত ঝরোখা। অতীত উচ্চারিত। বৌদ্ধ জৈন বা যজুর্মন্ত্রের ব্রাহ্ম মুহূর্তে আবাহন গান—গৃহকোনে মাধবী কাননে অতি নিভৃতে অবস্থান করে। দ্বিধা তাকে ক্ষণিক বিচলিত করে। একি পরমার্থ অনুসন্ধান? না একদিকে গৃহকোণ অন্যদিকে অনন্তকালের যন্ত্রণায় মানুষের এক অগ্নিপরীক্ষা। তিনি অমোঘ নিয়মে প্রত্যক্ষ করেন:

"হেমন্ত বুদ্ধের ঋতু, জৈন সন্ন্যাসীর ঋতু শীত,
কার ধর্ম বেছে নেবো? যজুর্মন্ত্রের উচ্চারণে
.. ..

.. . ...
নিয়ে গেছে যে নারীর বহিরঙ্গ তীব্র একরোখা
ক্ষুধার্ত বালক ভাসে নির্বাণের সুনীল সাগরে
বাতিঘরে হেমন্ত নিশীথসূর্য রক্তাক্ত ঝরোখা।"

হৃদয় মন এক রূপকল্প জগৎ নির্মাণে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিমা শোনিতে সিক্ত। জাফরি-কাটা বাতায়নে অনাবিল মৃদুমন্দ আশ্বাসের এবং নির্ভাবনার সমীরণ বয়ে চলেছে। ধীরে প্রবাহিত রক্তের রঙে সুপ্ত যন্ত্রণাকে উত্তেজিত করছে। অলোকরঞ্জন হৃদয়ের এই দৃশ্য অবলোকন করে স্তব্ধ। চিরায়ত মাথুরের বেদনা পরিবেশকে বিষন্ন করে তুলেছে।

"তমাল ডালে পল্লবিত মেরুণরঙের রোদ্দুর"

শোনিত-সিক্ত হৃদয়ের গবাক্ষের অন্য প্রান্তে রয়েছে চিরকালীন কামনা। এ তমাল তো বাসনা কামনারই বৈভব। মুহূর্তে অলোকরঞ্জন এ যুগের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করেন :

"পূর্ণেন্দু আমাকে তুমি বাগানের মধ্যে নিয়ে চলো,
পূর্ণেন্দু, চুম্বন দাও আমাকে, সন্তান না দিয়ে।"

তাহলে কি যৌবনবাউলের 'অধরা' বিস্মরণে অদৃশ্য? তিনি দিক পরিবর্তনে সচেতন। স্বরূপ অনুসন্ধান এখনো অব্যাহত। এক গভীর অন্তর্গত বিষাদ অলোকরঞ্জনকে শুদ্ধ করে। এমন কি উত্তরাধিকারে তা সমর্পণও করেন

"তোমাকে সব দিলাম ভালবেসে
তুমি ওদের দিয়ো—"

'রক্তাক্ত ঝরোখা'র শব্দচয়ন যেমনি এক মায়াজাল রচনা করে তেমনি কবির ইতিহাস-সচেতন উপলব্ধি কাব্যকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

একটি ঘুমেব টেরাকোটা: অলোকরঞ্জন শিল্প-চৈতন্যেব অন্তর্গত সত্তাব সান্নিধ্য লাভ করেছেন। শুদ্ধচৈতন্যে তিনি নিজেকে অতি নম্রভাবে নিবেদন কবেছেন। মন্দির গায়ে শোভিত পোড়ামাটির শিল্পকর্ম রাগসঙ্গীতের বিলম্বিত সুরকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখে। সৌন্দর্যচেতনা কবির উন্মোচন-মুহূর্তকে দ্রুত করে। এইক্ষণ রাতেব মালকোষ রাগের। যেমন—"ট্রেন থামলো সাহেবগঞ্জে,"

ট্রেন চললো থার্ডক্লাসের মৃণ্ময় কামরায
দেহাতি সাতজন
একটি ঘুমে স্তব্ধ অসাড় নকশাব মতন।"

জীবনের একটি রূপ মাত্র। তিনি স্রষ্টিকর্তা। অনুভবের বিশ্বে তাঁর স্বাধীন বিহার। এই মুহূর্তে মানুষের অবিনশ্বর চিত্রকে স্থির করে রেখেছেন। সৌন্দর্য-তত্ত্বের আদর্শ দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে প্রায় অদৃশ্য। এখানে কবি অলোকরঞ্জন কীটসেব 'গ্রীসিয়ান আর্ন' এর সুরকে যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। বস্তুতঃ এই কবিতা এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

গিলোটিনে আলপনা : অলোকরঞ্জনের সম্মুখে নিয়তি। কালের প্রবাহ ঘটনা সমষ্টিকে গ্রহণ করেছে। একমাত্র মানুষ অসহায়। একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস যেন। কখনও মানুষের দায়িত্ব উপলক্ষের মধ্যেই সীমিত। সাময়িকভাবে বাউলের বসন অন্তর্হিত বুঝি বা।

"ফাঁসির মঞ্চে ঈশ্বরী এক, সকল দেহে স্তন
শতলক্ষ নারীর যৌথ আত্মবিসর্জন
গড়েছে এই ঈশ্বরীকে যদিও অন্ধ সে
স্তনের চোখে তাকিয়ে আছে
একি অপার করুণা তার ঘাতকের উদ্দেশে।"

নিয়তির রূপ অন্ধ, সে ক্রীড়নক মাত্র, অথচ তার ওপর ঈশ্বরীর অপার করুণা, অলোকরঞ্জন স্ব-ভূমি বিচ্যুত, অনুভবের কুরুক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য। বাস্তব তাকে বিব্রত করে, অস্থির এবং উত্তেজিত করে। কিন্তু পলায়নের পথ যে রুদ্ধ, তাহলে রহস্যের কারণ কি ? অনুসন্ধান ? পরবর্তী স্তরে গভীর উত্তরণ ! বিষণ্ণতা বা হতাশাও আচ্ছন্ন করে না। প্রতিনিয়ত সংঘটিত ঘটনা তো নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত।

"তার আগেই তো আমরা মৃত
মৃতদেহের পরেও এত মোহ।"

মায়াবদ্ধ জীব এই অভিজ্ঞান আমাদের। পরিধি প্রশস্ত নয়, এমন কি পরিসীমা অতিক্রমণের প্রয়াসও প্রায় দুর্লভ। সুতরাং প্রতীক্ষার পরম লগ্নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হয়। বিশ্বরূপ দর্শনের লগ্ন। গাণ্ডীব ত্যাগ বিনা তো তা সম্ভব নয়। অন্তিম মুহূর্তে তাই নিয়তি আমাদের আলোকিত করে। অলোকরঞ্জন এই পর্বে নিজেকে পূর্ণভাবে নির্বিকল্প স্তরে স্থাপন করেছে।

সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' অলোকরঞ্জন পরিণত, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য সমভাবে অনুশীলনের বৃত্তে ধরা পড়েছে। কবি, বয়সে বা কালের চক্রে আহত। সামর্থ্য লুণ্ঠিত। তাঁর অন্তরজগতে গৃহকাতরতা, কখনো ক্ষ্যাপা বাউলের দিগন্তবিস্তৃত গান। শব্দ স্বাধীনতা লাভ করে যেন সঙ্গীতময়। কবির ব্যাকুল হৃদয় দশদিগন্ত জুড়ে বিরাট কম্পন সৃষ্টি করে।

অলোকরঞ্জন গৃহকাতর, গৃহে প্রত্যাবর্তনের কামনা তাঁকে বিষণ্ণ করে ।

তারপর যত দুঃখী দেশ মিলে তৃতীয় পৃথিবী
ভারতবর্ষের চেয়ে দুঃখী দেশ আমার হৃদয়"

এ যেন কান্না। অথচ বহুদূর থেকে ভেসে আসছে বাউলের গান।

তিসি বনে একা শিশু ভেসে আছে নিশুতি উদাস।'

বিস্মৃত নয় কবি, সমগ্র জীবনব্যাপী যে বাউলকে হৃদয়ে পালন করে এসেছেন তারই প্রতিধ্বনি সর্বত্র। বাংলা শব্দ ভেঙ্গে কখনো গড়ে এক যাদুকরী ক্রীড়ায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। নির্মিত হয়েছে শব্দের বিভিন্ন প্রতিমা। এই কাব্যগ্রন্থে মরমীয়া মনের ওপরে বাস্তবের প্রতিক্রিয়া মৃদু সমীরণে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তখন অলোকরঞ্জন তৃতীয় বিশ্ব-প্রসঙ্গের দায়িত্ব বহন করে নিজেকে প্রসন্ন করে তোলেন। সময় ও স্থানের ধর্মকে উপেক্ষা করার এক বিনীত প্রতিরোধও গড়ে ওঠে।

বাংলা কাব্য জগতের আধুনিক পর্যায়ে অলোকরঞ্জন এক বলিষ্ঠ রীতি প্রবর্তনের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। ঐতিহ্যের অনুশীলনে ও উপলব্ধিতে এক চিরায়ত অনুসন্ধান পর্ব তাঁর অন্তরশরীরে সক্রিয়। বাউলের কণ্ঠ-নিঃসৃত সুর বয়ে চলে সর্বত্র। ক্লান্ত পাঠক তখন নতুন রসে রসিক হয়ে ওঠেন।

"দেশ বিদেশের বাসা আমার যখনই যাই আমি
হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশী।
বাজাতে গিয়ে ঠোঁট ছড়ে যায়
সুরের রক্তে বাঁশী ভেজায়।"

অলোকরঞ্জনের সত্তার অনু-পরমাণু পূর্ণতানে ঐতিহ্যের স্নানে পরিশুদ্ধ। কোথাও আর সংশয় নেই বিকার নেই। বাসনা কামনারও অবশিষ্ট নেই। সর্বত্যাগী বাউল, তাঁর হৃদয়ে সদা প্রবহমান আনন্দরস, অধরাকে পাবার ব্যাকুলতা তাঁর সর্ব দেহে, এই ঐতিহ্য অলোকরঞ্জনকে স্বতন্ত্র কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে, প্রসঙ্গত আইরিশ কবি ইয়েটস যে কেল্টিক মীথে আত্মাব অধিকার বহন করে চলেছিলেন—অলোকরঞ্জনও সার্থকভাবে সেই অঙ্গীকারকে মর্যাদায় সম্ভ্রমে অধিষ্ঠিত করেছেন॥

[তিন]

অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় সমকালের আর্ত চিৎকার নেই। বাচনিক-স্নিগ্ধ, অন্তর্মুখী মননে সমৃদ্ধ। মেজাজে ও শব্দচয়নে লাবণ্যময়, কবিতার শরীর নির্মাণে তিনি মগ্ন। স্বভাবতঃ জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরবর্তী যুগে যে কাব্যরচনার প্রয়াস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্ভর নয় বরং অনুসরণে অনুকরণে প্রভাবে সামগ্রিক প্রচেষ্টা মাত্র, সেখানে অনিবার্যভাবে ক্লান্তির অসুস্থ হাওয়া প্রবাহিত, কবিদের মধ্যে জৈবিক তাড়না বা সাময়িক পরিবেষ্টিত সমস্যাই প্রধান। অন্তরশরীর আবিষ্কারের ক্ষীণমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই। সেই লগ্নকালে অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার বহিরঙ্গ শিল্প-অনুরাগে অলোকরঞ্জন, শঙ্খ ঘোষ, কখনো বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে সৌহার্দ্য রচনা করে।

ভিন্ন স্বভাবে এই চারজন কবি, প্রত্যেকেই নিজস্ব বৃত্ত পরিক্রমায় অক্লান্ত। সহজাত শিল্প-নির্মাণে সবাই দক্ষ। কাব্যের নির্দিষ্ট কোন নির্বাচিত বিষয় নেই—বরং উপলব্ধির এক শিল্প রূপান্তরে এই কবিগণ বিশুদ্ধ। তাঁদের একমাত্র কামনা শুদ্ধ চৈতন্যের সান্নিধ্যলাভ। ব্যক্তিস্বরূপ নিরূপণের দায়িত্ব বহন করে কখনো কখনো কালের প্রবাহকে উপেক্ষা করে না। প্রত্যেকেই সময়ের স্রোতে সন্তরণ পটু। অথচ উদ্ভূত সীমাহীন প্রশ্নের সমাধানে ভাবমুক্ত হবার প্রবণতাও লক্ষ্য করার মতো। অনাদি জিজ্ঞাসা সম্পর্কিত যথার্থ উত্তর কবিকেই দান করতে হয়। কবি অরুণ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বভাব-কবির ঐতিহ্য রক্তে বহন করেন। শুদ্ধ চৈতন্যে অঙ্গীভূত হবার ধ্যানে তাঁরা নিবিষ্ট। সুতরাং কাব্যে পূর্ণতা রচনার প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হলে সে দায়িত্ব পাঠককেই বহন করতে হবে।

'মিলিত সংসার' কাব্যগ্রন্থে অরুণ ভট্টাচার্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ চলমান সংসারের এক নিরুপম খুশিকে আবিষ্কার করেছেন। গানের সুর সেই সংসারের গৃহকোণে অনুরণিত হচ্ছে। যৌথ দায়িত্ব যৌথ সুখ তো অপার আনন্দেরই প্রকাশ। তখন এ পৃথিবীতে মৃত্যু নেই। তীব্র উপেক্ষা মৃত্যুকে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। অরুণ ভট্টাচার্যকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে এই পৃথিবী, মানুষ ভালোবাসা স্বাধীনতা, পার্থিব নিয়ম ও মানুষের এক নির্বিকল্প অবস্থা কাব্যকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

"মাছেদের মিলিত সংসারে
হাসিখুশি সোনাঝরা দিন
এবার ফুরোলো। অতএব
খেলাঘরে যদিও রঙিন
আশা ছিল স্বপ্ন ছিল তার
বর্ণালী আঁশের ঝিকিমিকি
মৃত্যুকে অবজ্ঞা জানাবার"

এই বিশ্ব-প্রজনন জন্ম মৃত্যু নিয়মে পরিক্রমণশীল। তা সত্ত্বেও মৃত্যু জীবনের বর্ণালী আঁশের দৌরাত্ম্যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয়। বরং মৃত্যু প্রায় অবহেলিত। এ কি গীতার কোন একটি অংশের উপলব্ধি মাত্র। কবি এখানে খুবই আবেগবিহ্বল। সুতরাং শব্দের মায়াজাল যেন কবির প্রয়াসকে চিহ্নিত করে বিশেষভাবে।

'সমর্পিত শৈশবে'. প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি তাঁর মধ্যে প্রায় সমাপ্ত। বর্তমান থেকে নিষ্কৃতিলাভ অতি দ্রুত তাঁকে নির্বাসিত করে শৈশবের প্রান্তরে, পাহাড়ের চূড়ায়। অথচ এই বয়স কত গন্ধময়, নির্মম নিদারুণ সর্বত্র হাহাকার। চিন্তাভাবনার কোমল স্পর্শ কি তাহলে নিঃশেষ?

"নিম্নে এই ভয়াবহ মানুষের শব
দেখতে দেখতে কখন তার উজ্জ্বল শৈশবে
ফিরতে পারবে ভেবে এক অপার ইচ্ছায়
গাঢ়বর্ণ পাহাড়টাকে বারবার জড়িয়ে ধরছে।"

অরুণ ভট্টাচার্য ক্রমশ বাস্তবকে অনুভব করছেন। নির্মম যন্ত্রণা পার্থিব শৃঙ্খলে বাঁধা। ক্ষমা নেই। ভয়াবহ পরিস্থিতির এই রূপ প্রত্যক্ষ করে' কৈশোরের দিনগুলোর মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করতে চান। অরুণ ভট্টাচার্যের মধ্যে এই পর্যায়ে বাস্তব ঘনিষ্ঠতা সাময়িক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মানসিকতা তখনও পরিবেশ-নির্ভর হয়ে ওঠে নি। 'সমর্পিত শৈশব' কাব্যগ্রন্থেই সর্বপ্রথম তাঁর কবি-চরিত্রটিকে আমরা ধরতে পারছি। অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বাস্তবের চিত্র মিলিত হয়েছে লাবণ্যময় গীতিধারায়।

'ভয়ঙ্কর ভাবনা' কবিতাটির রূপ বাস্তবেরই প্রতিধ্বনি। কবি পীড়িত, ভীত সন্ত্রস্ত। এই বিশ্ব জটিল বাস্তবের ছবি মাত্র। তিনি অসহায়, ছিন্নমূল। অপ্রসন্ন মানসিকতা বহন করে অগ্রসর হয়েছেন তিনি

"আমি আর উঠব না, নামবো না কখনো আবার
যেমন আছি হে একলা স্থাণুবৎ নিশ্চিন্ত দুপুরে।"

আশা আর প্রজ্জলিত নেই। সময় বিভিন্ন চিত্র নির্মাণ করে চলেছে, হাহাকার আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করে' সুতরাং একটি আশ্রয় নিতান্ত প্রয়োজন। নিমজ্জিত ব্যক্তির বাঁচার প্রচেষ্টা যেন। অস্থিরতা কবিকে তাড়িয়ে ফিরছে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, এতো বিশ্বাসের চিত্র নয়, বরং হতাশার জটিল আবর্তে শৃঙ্খলিত। মুক্তি নেই, বরং স্থবিরতা ক্রমে আক্রান্ত করে তাকে।

'বাড়ি' অরুণ ভট্টাচার্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা। তাঁর কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হিসেবে 'বাড়ি' সুচিহ্নিত। এই পর্বে ক্ষণিক যেন নিজেকে অন্বেষণের বেদনা অনুভব করছেন। আবেগ বা পৃথিবী একদা তাঁকে পরিবেষ্টিত করে রাখতো। কিন্তু

"সারারাত আমার মধ্যে
অন্য কে কে যেন কথা বলছে,
সে ভাষা আমি বুঝি নি।"

এই তো পথের সুরু। স্বরূপ-নির্ণয়ের দীর্ঘ পথযাত্রা। আত্ম-জিজ্ঞাসার এতো সুন্দর বর্ণনা সচরাচর বাংলা কাব্যে দেখা যায় না। অরুণ ভট্টাচার্যের মধ্যে তখন যেন নির্দিষ্ট জীবন রহস্যময় হয়ে ওঠেছে। রীতির দিক দিয়েও এই কবিতা আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

'সময় অসময়ের কবিতা'. এই পর্বে যৌবনের বর্ণাঢ্য আড়ম্বর সম্পূর্ণ। সম্রাটের ভূষণে তিনি সজ্জিত। অথচ সেই মহাকাল গ্রাস করে সব। পার্থিব অস্তিত্ব একসময় হৃত সর্বস্ব অবসন্ন। 'নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বী'র যে ব্যঞ্জনা অরুণ ভট্টাচার্য এই কাব্যগ্রন্থে যেন সেই তলকে আশ্রয় করতে চেয়েছেন।

"রাজা আমার
ভর সন্ধ্যেবেলা ওই শেষ-সূর্যের পাগলকরা

গোধূলি আলোয়

তোমাকে চিনতে সত্যি বড কষ্ট হয়।

এই পর্যায়ে শুধুমাত্র অন্বেষণের পটভূমিকা রচিত। অনাবৃত সত্য প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা ক্রমে সঞ্চিত হচ্ছে। 'তুমি কে?' অনুসন্ধান কাব্যে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার অবতারণা করেছে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে এই কবিতা স্থায়ী অনুরাগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে মনে হয়।

কখন তোমার ডাক শুনব' কবিতটিতে পূরবীর বিষণ্ণ চেতনাকে উন্মুখ করে। কুয়াসার গাঢ়তা অতিক্রম করা প্রায় দুরূহ। কিন্তু আত্মমগ্ন কবির কাছেই একমাত্র এই ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

"আমার স্বপ্নের ধ্বনিরা কেউ কেউ

তোমার কাছে যেতে চায়

তুমি শুনতে পাও না।"

এখানে অরুণ ভট্টাচার্য জীবনের দিক পরিবর্তনে নিজেকে প্রায় প্রস্তুত করে রেখেছেন। এইতো ক্রান্তিকাল। শিল্পীর ব্যঞ্জনা এই কবিতার পরম সম্পদ বিশেষ।

'এই মুহূর্তে চিরকালীন' যেন প্রি-র‍্যাফেলাইটদের রীতি বা ধর্মকেই সঞ্জীবিত করে রেখেছে। এই চিত্রময় অনুভূতির প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবে এক পরিণত শিল্পী বহন করছেন। জল-রঙে আঁকা। আনন্দের উজ্জ্বলতায় বর্ণাঢ্য। চেতনায় নিত্য বহমান। অরুণ ভট্টাচার্য চিত্র-শিল্পী নন, তা সত্ত্বেও চিত্র নির্মাণ-কৌশল তাঁর অজানা নয়। মনে পড়ে

"গাছের পাতার এক সবুজের কত রঙ দেখতে পাও সুরেশ,

এক সবুজের কত রঙ।"

শিল্পী গোপাল ঘোষকে উৎসর্গীকৃত কবিতায় তিনি দ্বিতীয়বার বর্ণচ্ছটা আবিষ্কার করেছেন যেন।

"ঈশ্বরপ্রতিমা" · এই কবিতারচনার পর্যায়ে অরুণ ভট্টাচার্য যেন অলোকরঞ্জনের সন্নিকটবর্তী। অলোকরঞ্জন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত এক বাউল, অরুণ ভট্টাচার্য মরমীয়া সুরের সন্ধানে করছেন ইতস্তত।

"অন্ধকার বাড়ি" আশ্চর্য এক রীতি-সমৃদ্ধ কবিতা। শুরু তো অন্বেষণে?

ডিলান টমাসের প্রতিধ্বনি যেন এই কবিতায় সঞ্চারিত। রহস্যকে অনুভব করে নিজেকে খুঁজতে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। অন্ধকার পরিমণ্ডলেই তো দীপ্তিমান সত্তা প্রসন্ন হয়ে ওঠবে। সহজ করে নয়, বরং জটিলতার বাজ্য অতিক্রম করে তাকে লাভ করা। অরুণ ভট্টাচার্য এই কবিতায় নিশ্চিন্ত এক মরমীয়া সুরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

"ডাকতে ডাকতে আমার হাত শীতল হয়ে আসে
হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে, চোখ ক্রমশ জ্বলতে থাকে।
অরুণ বাড়ি আছো , অরুণ।"

এতো আত্ম-আবিষ্কারের চিরায়ত অনুসন্ধান। সমগ্র কাব্য ক্রমে দর্শনে ও ব্যঞ্জনায় এক অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতে রূপান্তর লাভ করে।

অরুণ ভট্টাচার্য বুদ্ধি এবং বিবেকে নিয়ন্ত্রিত। 'শব্দ দ্রুততর শোনা যাচ্ছে' কবিতায় তিনি অনুক্ষণ শব্দ-প্রতিমার নুপুর নিক্বণে সচেতন। বিশ্ব-নিখিলের রহস্য উন্মোচনের সম্ভাবনার উপলব্ধি যেন তাঁকে অতি দ্রুত অবসন্ন করে তুলছে।

"সামনে তাকাতে চাই না, আমি পিছনে ফিরতেও না
বড ঘুম আসছে আমার, শুধু আমাকে ঘুমোতে দাও।"

অরুণ ভট্টাচার্য মরমীয়ার মতো নিজেকে সমর্পিত করেন। এই অনুভব কি তাঁর আয়ত্তের সীমায়। ঐতিহ্যকে অরুণ ভট্টাচার্য অনুশীলনে ধ্যানে আত্মস্থ করেছেন। তারই পরিণতি এই সৃষ্টি। এই কবিতায় ব্যঞ্জনায় শব্দের প্রতিমা-নির্মাণে এবং উপলব্ধির নিষ্ঠায় বাংলা কাব্যজগৎকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বিশেষত্ব সর্বত্র শব্দ ক্রমে দ্রুততর শোনা যাচ্ছে। কবিতাটির চিত্রকাব্য পাঠক মনে অনায়াসে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গতঃ 'ঈশ্বর প্রতিমা' ও 'সময় অসময়ের কবিতা' কাব্যগ্রন্থের কবিতা সম্বন্ধে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মন্তব্য বিশেষ এক রীতিকে স্পষ্ট করে· "দুখানি বই প্রায় এক সঙ্গে পড়ছি· .মগ্ন উন্মোচনের মতো মনে হচ্ছে।" অমলেন্দু বসু অরুণ ভট্টাচার্যের "শুভ্র নীলিমার স্বপ্ন" কবিতা প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করেছেন . "এই শ্লেষ প্রয়োগ চল্লিশের দশকে ক্রমেই কমে এসেছে, কারণ ধ্বংসের পাশেই আবার নির্মিত হচ্ছে বিশ্বাস-প্রাকার······নিবিড় অন্ধকার মিলিয়ে যায় অস্তির আলোকে।"

[চার]

নিবিড় মায়ায় শিল্প-সুষমায় অন্তরে অনুক্ষণ স্মৃতি নির্মাণ করে চলেন শঙ্খ ঘোষ। শব্দ ছন্দ যুগ্মভাবে কাব্যকে প্রসন্ন করে। কিন্তু ঐতিহ্য অনুভবের অন্তর্গত নয়। বরং ম্যাকবেথ-এর ভূমিকা প্রায় বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত। মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণে তাঁর সময় অতিবাহিত। কারণ এই মানুষ essence এবং anguish এর উপসর্গের বৃত্তে আবর্তিত। হয়তো কখনো কখনো এই পরিমণ্ডল থেকে অব্যাহতি লাভে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একটি পলাতক মনের সৃষ্টি হয়। উদাসীনতা তাঁর রক্তে ক্রমে প্রবাহিত হতে থাকে।

> "মনে রেখো একজন শারীরিক যজ্ঞ হয়ে
> ফিরে গিয়েছিল এই পথে"

একান্ত ছন্দহীন পরিবেশেও নিজেকে আমূল প্রত্যক্ষ করাই শঙ্খ ঘোষের একদা ঈপ্সিত ছিল, আত্ম-আবিষ্কারে মগ্ন থেকেই তিনি বিশ্ব-নির্মাণে এক অসাধারণ কুশলী শিল্পী।

> "তখন দুজনে জানে, যা কিছু এসেছে ফেলে ঘরে
> সবই ছিল সুখময়, শুধু সুখে ধমনী ছিল না।"
>
> (আদিম লতাগুল্মময়)

ইতিহাস বা ওপারে অতীতের সমৃদ্ধ পৃথিবীতে আশ্রয় প্রার্থনা করা তাঁর সুপ্ত অভিলাষ। জীবনানন্দের সেই পংক্তি 'অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে' চকিতে মনে পড়ে।

'দিনগুলি রাতগুলি' পর্বে শঙ্খ ঘোষ পূর্ণভাবে পার্থিব। এক বিশ্বনিখিলের মুক্তিকামনায় ব্যাকুল। পরিবর্তে নিজেকে বিদ্ধ বা আহত হতে হয় তাতেও বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। যদি পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর দেহ বিলীন হয় তবুও। এখানে কবি একজন অতি-সংবেদনশীল পৃথিবীর মানুষ মাত্র।

> 'আমার জীবন থেকে বড়ো
> পৃথিবী বিস্তৃত করো দৃঢ় মেঘে তৃণে সূর্যে ভয়
> জীর্ণ তার ঝড়ে।"

এই কামনা তাঁকে জীবন-প্রেমিক করে তুলেছে। এই পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত রয়েছে তাঁর সহৃদয় কামনা।

"সত্তা" (নিহিত পাতালছায়া) কবিতা শঙ্খ ঘোষের মধ্যে অনুসন্ধানের বীজ রোপন করেছে। জীবন-চর্যার অনুষঙ্গে অন্তঃকারীদের স্পর্শলাভের সুপ্ত ইচ্ছা তাঁকে কখনো কখনো অস্থির করে. "শব্দগুলি অন্ধকার নীরব, নিঃশ্রেয়/ এখনো না, আমি সীমার প্রান্তে আসি নি।"

'সত্তা'র আবিষ্কারে অন্ধকারে অভিযান পরিচালনা একান্ত প্রয়োজন। শঙ্খ ঘোষ 'শব্দগুলি'র শরীর অবলম্বন করে ক্রমে অন্য এক মূর্ত প্রতিমার সন্ধানে বেরিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' ও 'আদিম লতাগুল্মময়'। পর্যায়ে কবি শান্ত স্থির এবং অতি পরিমিত, দুঃখ কষ্ট পার্থিব নিয়ম আর তাঁকে বিব্রত করে না। ম্যাকবেথের পর্যবেক্ষণ যেন ক্ষান্ত, বুঝি বা সমাপ্ত। কালের বিরাট রূপ তাঁর অন্তঃশরীরের ছায়া বিস্তার করেছে। তাই দুঃখ সুখ সব যে স্মৃতিতে সমর্পিত তার বোধ সমগ্র চেতনায়, তিনি সেই অবকাশ মুহূর্তে শুদ্ধ চৈতন্যের দুর্লভ স্পর্শ কামনায় ব্যাকুল।

"প্রচ্ছদ পড়ুক চোখে শান্তি হোক শিরা
ভুলুক দিনের যত সমবেত ভুল
দুঃখ রেখে যাক মুখে চন্দন প্রলেপ—"

শঙ্খ ঘোষ অভিজ্ঞতার আলোক বহন ক'রে জ্ঞানের বরলাভ করেন। এ জীবন আর বাসনা নয়, এ জীবন সুখে দুঃখে নির্বিকার। এ বোধ তো কবিকে অনুসন্ধানের প্রতিশ্রুতিকেই আহ্বান করে।

শব্দ নিয়ে মন নিয়ে বোধ নিয়ে লুকোচুরি খেলা, রহস্য আবৃত জীবন তারও ও নানা খেলা, নানা রূপ এই ভাবনায় শঙ্খ ঘোষ এক আনন্দের প্রবল ঝঞ্ঝা বইয়ে দেন। মুহূর্তে মেঘের সঞ্চার আবার পলায়ন, এরই মধ্যবিন্দুতে একটি জীবন। ব্যঞ্জনায় এই কবিতা একটি অসামান্য সঙ্গীতের সুমধুর রেশ রেখে যায়

যা মেঘ যা উড়ে যা
কিশোরী রূপপুরে যা

* * *

যা মেঘ যা দূরে দূরে যা
সমস্ত রূপ পুড়ে যা।"

শঙ্খ ঘোষ রূপ অরূপের লীলাখেলায় অনুক্ষণ মগ্ন। ভারতের সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই শঙ্খ ঘোষ এই যুগ এই পৃথিবীকে একান্তে ভালবেসেছেন। তিনি কখনো প্রগলভ হয়ে পড়েন নি এবং তাঁর গতিপথকে কখনো মন্থরও করেন নি। শঙ্খ ঘোষ আধুনিক বাংলা কবিতায় এক প্রসন্ন অথচ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

[পাঁচ]

শক্তি চট্টোপাধ্যায় শব্দে ছন্দে এক মাদকতা সৃষ্টি করেন। তাঁর কাব্য অনুপ্রাসে যে ছন্দ রচনা করে তাতে কাব্যের শরীর আশ্চর্য রমণীয় মোহময় হয়ে ওঠে। সময় সময় লঘু হাওয়াতেও তিনি হৃদয়ে ঝড় তুলতে জানেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় শুধুই কবি। তাঁর অন্তরে বাউলের মতো এক ভিন্ন পুরুষের অবস্থান, সে কবি। আধুনিক কবি যখন অনুকরণকে একটি ঐতিহ্য হিসেবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেই গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র, তিনি কি পূর্বসূরী কি বিদেশী কারুর কাছেই বিনীত-চিত্ত নন। তিনি মাটির দেশকে মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই ধূপগুড়ি ময়নাগুড়ি এসব স্থান তার মধ্যে এক অন্তঃশরীর নির্মাণ করেছে। সাম্প্রতিক কবিতা যখন একক প্রচেষ্টার কোন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রায় অসমর্থ তখনই তিনি অন্যতম স্বতন্ত্র কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। কবিতায় তিনি সুরও বেঁধে দিয়েছেন। অনুসরণ করেছেন নিভৃতে রবীন্দ্রনাথকে কখনো জীবনানন্দকে, অনুকরণের কোন প্রমাণ রাখেন নি। বলা যেতে পারে, আত্মস্থ করেছেন শ্রদ্ধেয় কবিদের। তিনি তাই সুনিপুণ শিল্পী। অবশ্য, 'তুমি কে?' এই অন্বেষণ তাঁর ভাবনার গভীরে এখনো কোন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে পারে নি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই পৃথিবীকেই অতি সযত্নে গভীরে মমতায় হৃদয়ে বরণ করে রেখেছেন।

"প্রভু হে কেন শুকালো ফুল, মুড়ালো গাছ পীতল মালা
দরদী মুখে মলিন হাসি বুঝি নি ছিল শিলাকূট

প্রিয় আমার নিয়েছো সব ভ্রান্ত কল্প, নীরব, লুলা
স্বপ্ন নওে স্মৃতি নাও পদ্মনাভ অক্ষিপুটে।"

শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বপ্ন বা স্মৃতির অনুষঙ্গে জীবনকে গ্রহণ করেন নি। বরং এ জীবনের সব যেন তাঁর কাছে এক সঙ্গীত, এখানে শুধু আনন্দ, মৃদঙ্গের বাদ্য জীবনকেও ছন্দোবদ্ধ করে তুলেছে। শব্দ স্পর্শের অন্তর্গত পার্থিব সম্পদকেই তিনি একমাত্র হৃদয়ে গ্রহণ কবতে অভিলাষী। কালের প্রবাহে সব গ্রাস করলেও কবিকে বিষণ্ণতা বা হতাশা কখনো বিচলিত করে নি। সান্ত্বনাব প্রতিশ্রুতি প্রবাহিত হয় ধমনীতে এই হয়তো নিয়ম।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দের' জগত থেকে তিনি সরে এসে যে কবিতাবলী উপহার দিয়েছেন তার নামপত্র "ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো।"

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবনবিলাসী কবি, এ পৃথিবী তার হৃদয়। কিন্তু এই পর্বের কবিতায় তিনি যেন হৃদয়ের অবস্থান অনুসন্ধানে মগ্ন। জটিলতার আবর্তে 'আমি কে?' 'আমি কি?' এই অন্বেষণ তাঁকে পাগল করে, ক্ষণিকের জন্য তাঁকে গেরুয়া বসনে সজ্জিত বলেও ভ্রম হয়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় কি বাউলের একতারাব সুরে মগ্ন?

এখনো ছিলো অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা।"

এই ছন্দ লালিত্যে রবীন্দ্রনাথের সুর কানে বাজে। অনুকরণ নয়, অনুসরণও নয়। তবু কোথায় যেন ইঙ্গিতে তার কিছুটা জানিযে দেয়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবনের রহস্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, জীবন অন্ধকাব ও জটিলতার মধ্যে অবস্থিত। হৃদয়কে খুঁজে নেবাব প্রযোজনে তাই তাঁকে বাউল হতে হয, বাউলের হাতেই যে সেই হৃদয়পুরের চাবিকাঠি। এই প্রচেষ্টা স'ত্যিই শক্তিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে বা'লাব কাব্যজগতে। পৃথিবীর বিশাল প্রাকাব ধ্ব'স করে রহস্যময় বিশ্বে পদার্পণ করার এক প্রতিশ্রুতি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। শব্দের দ্যোতনা ব্যঞ্জনা এবং উপলব্ধি এক চিত্রকাব্য রচনা করেছে, শক্তি সেখানে এক সুনিপুণ শিল্পী।

'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' কবিতাবলীতে অনুপ্রাসে নির্মিত এক বিস্মিত জগৎ, যাদুকরী মোহে শব্দে ছন্দে এমন কি কাব্যশরীরে শক্তি স্বভাবশিল্পী, এই পৃথিবী

বিষণ্ণ করে না ক্লান্ত করে না। জীবনের ধর্মকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে শক্তি বিচলিত নন, তাই সান্ত্বনার প্রয়োজন একেবারেই অর্থহীন, উপলব্ধি তাঁর স্পষ্ট এবং গূঢ়। তিনি ক্রমে এক নির্বিকল্প অবস্থা লাভ করতে চান।

"হারায় ওরা হারায় ওরা এমনি করে হারায়
বাধা যে দেয় তাকে এবং সম্মুখে পা বাড়ায়।"

এতো স্বাভাবিক। সমাধানও অসম্ভব নয়। এই বোধ বহন করেই শক্তি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছেন ক্রমশ, আরো ক্রমশ।

অরুণ ভট্টাচার্য

মহাকবি ভাস স্মরণীয়েষু

প্রতিমাগৃহের কাছে একরাশ বাতাস বহিছে।

প্রতিমাগৃহের কাছে আমাদের
নতজানু হতে হবে।

ওইখানে উন্মুখর ইতিহাস
আমাদের বলে গেছে
মানুষের মৃত্যু আছে। মানুষের
দেশকালসন্ততিব মৃত্যু নেই।

প্রতিমাগৃহের কাছে আমাদের
পিতামহীদের শব
উন্মনা বাতাস ঘিরে আজো স্থির
হিরণ্ময় বয়ে গেছে।

প্রিয় শব্দ জাদুকবী

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। হঠাৎ
আমার কাঁধের ঝোলা থেকে
প্রিয় শব্দগুলি হুদ্দাড়
সামনের পুকুরে লাফ দিয়ে
মুহূর্তে সব মাছ হয়ে গেলো। দেখতে থাকলুম, ওদের
কি অগাধ মুক্তি।

সাঁতার দিচ্ছে এধার ওধার। জলে
ঘাই মারছে দু-চারবার। তলিয়ে যাচ্ছে
কোথায় অন্ধকারে।

সেই থেকে সারা রাত্রি
পুকুরপাড়ে বসে থাকলুম, চোখ ফেটে
জল এলো, আমার
চোখের জলে পুকুরপাড় ভেসে গেলো,
জল থইথই উজাড়-করা মাঠে
মাছগুলি আবার, রুপালি মাছগুলি
আমার কোলের কাছে চলে এলো।

আমি আদর করে তাদের গায়ে হাত বুলোতেই
একে একে সব মাছগুলি,
কী আশ্চর্য ছাখো,
আমার সব প্রিয় শব্দ হয়ে আমারই কাছে ফিরে এলো।

নিছকই খেলা

বুড়ো বাজিকর মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে
খেলা দেখাচ্ছিল। নিছকই খেলা।
আমরা তিনবন্ধু বসেছিলাম তিন দিকে। বাজিকর
ঠিক যেন টিপ করে আমাদেরই দিকে স্পষ্ট তাকালো
ইঙ্গিতে জানালো
তার কাছে চলে আসবার।

তিন দিক থেকে আমরা গেলাম বাজিকরের দিকে। বাজিকর
একটি রুমাল দিল, নতুন রুমাল।
একটি রুমাল তিন বন্ধুকে।

দেখতে দেখতে একটি রুমাল তিনটি রুমালে পরিণত হল।
আমরা তিনবন্ধু মিশে গেলাম এক দেহে,
অস্পষ্ট কানে এলো দর্শকদের প্রচণ্ড উত্তেজনা।

খেলা, নিছকই খেলা দেখাচ্ছিল বাজিকর গোধূলির শেষ বেলায়।

একরাশ গন্ধের আড়ালে

নতুন বাড়িটায় ঢুকলে ঝকঝকে সাদা চুনকামের গন্ধ।

নতুন বাড়িটায় এখনো
লোকজন আসে নি। আমি
নির্জন ঘরগুলোর মধ্যে, বারান্দায়, চিলেকুঠিতে,
ঠাকুরদালানে ঘুরে বেড়ালাম ইচ্ছেমত।
একটা আশ্চর্য গন্ধ নিয়ে
ঘুরে বেড়ালাম, একটা মাতাল হাওয়া
শিরশির করে গায়ে জড়িয়ে রইলো শীতসকালে চাদরের মত।

এই নির্জন বাড়িটায় আমাকে থাকতে হবে। এবং
নিঃসঙ্গ। শুধুমাত্র সকালসন্ধ্যায় সূর্যরশ্মি
পায়রাগুলির পালক জড়িয়ে
ঘুলঘুলি পার হয়ে আসতে পারে যেন। চুনকামের গন্ধ সরিয়ে।

আর কিছু নয়।

পাখিরা ঘুম যায়

আমার বুকের কাছাকাছি কে যেন
নির্জন দুপুরে খেলা করে। সেসময়
পাখিরা ঘুম যায়।

পাখিরা ঘুম যায়। সেসময়
মাছেরা জলের ওপর ঘাই মারে। ছলাৎছল
ছলাৎছল, সারা শরীরে মৈথুনের
উপলব্ধি হয়।

উপলব্ধি হয় যেন নির্জন দুপুরে রমণীরা
নিটোল স্তন দুটি রৌদ্রে মেলে ধরে,
সূর্যরশ্মি গুড়ো গুড়ো হয়ে রমণীদের শরীর জুড়ে
ফাল্গুনের অলসতা এনে দেয়।

মাছেরা জলের ওপর ঘাই মারে। পাখীরা ঘুম যায়,
নির্জন দুপুরে কে যেন আমার
বুকের কাছাকাছি খেলা করে।

চিরদিনের

কাল রাত্রে আমি ভুবনের বাড়ি যাবো ভেবেছিলাম।

ভাবনার মুহূর্তমধ্যে আমি
ভুবনদের হলঘরে পৌঁছে গেলুম।

হলঘরের মাঝখানে ডাইনিং টেবল,

হরেকরকম মজাদার খাবার।   তার চারপাশে
বসেছে লাল নীল বেগুনি সবুজ মৌমাছিদের মেলা।

তাকিয়ে দেখি ভুবনের আলমারি থেকে
বইগুলি সব একে একে নেমে আসছে।   আমি
নির্বোধের মত ভুবনের দিকে তাকিয়ে।
একটি টকটকে লাল-বাঁধানো বই
আমার সামনে এসে মাটিতে মেলে ধরলো শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা।
বললো, ভাখো তো কিছু বুঝতে পারো কিনা।

কালো অক্ষরের পরিবর্তে আমি স্পষ্ট দেখলুম,
অনিন্দ্য নারীদেহ,
পুরুষের বুকে মাথা রেখে বিশ্রস্ত ক্লান্তিতে।

বেলা বহে যায়

(অগ্নি-কে)

এমনি এক একটা দুপুর যায়।

রৌদ্র আসে যায় ছাতিমতলায়, মেঘ জমে
পুকুরপাড়ে।   গা ভাসিয়ে মহিষের দল
স্নান করে দামাল শিশুর মত।

এমনি এক একটা দুপুর যায়

ঘণ্টা বাজে স্কুলবাড়িতে, নারকোল গাছের আড়ালে
গড়ানো সূর্যের আলো, হলুদ প্রজাপতি
নীলমণিলতার আড়ালে গা ঢাকা-দেওয়া, এই সব
আরো সব দুপুর-গড়ানো বিকেলে।

এমনি যায়, দুপুর বহে যায়।
ট্রেণের হুইস্‌ল্‌, মাঝ-স্টেশনে আচমকা
এঞ্জিনের ধুয়ো-ঝাড়া। উড়াল বকপাখির অথৈ শূন্যে
আলগা গা-ভাসানো, এই সব
জীবনাযপনের খেলা-খেলা।

এমনি এক একটা দুপুর যায়,
বেলা বহে যায়।

আমন্ত্রণলিপি

এসো, আমরা সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে
চৌরাস্তার মোড়ে
যে যার পথ হেঁটে যাই।
সার্কাসের লাল-নীল মুহূর্তগুলি
গাছগাছালির অন্ধকারে
বহুদিন নিঃশ্বাস নিতে পারবে। আমরা ততক্ষণ
আর এক সীমান্তে।

হয়তো বা আর এক চৌরাস্তার মোড়ে
সার্কাসের জন্য মশাল জ্বালাবো।

আমন্ত্রণলিপি ছাপা হবে ·
বাজিকরের ইন্দ্রজাল দেখতে চলে আসুন,
এখনো কিছু জায়গা আছে।

কাবপভ-কবচনয় কাহিনী

কাগজে দেখছি দুটি মানবসন্তান আজ প্রায়
এক মাস হ'ল দাবার ঘুঁটি চেলে যাচ্ছে। ক্রমাগতই
কিরতি খেলা হচ্ছে। কী যে প্যাঁচ, কোথাকার
ঘোড়া কোথায় যাচ্ছে, হাতি অথবা রাজা স্বয়ং
এদিক ওদিক নড়ে চড়ে বসছে। অথচ
দেখুন একবার, কেউ হঠবার পাত্র নয়।

বস্তুত হার-জিৎ কোনটাই ঘটনা নয়। শুধুমাত্র
ঘটনা হচ্ছে
হাতি ঘোড়া এবং পদাতিক
সবাই মিলে উন্মুক্ত প্রান্তরে
যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে। গাছ-পিঁপড়ে কাঠ-পিঁপড়ে
কিছু উড়ন্ত ঘাস-ফড়িং
সবাই মিলে নিরাপদ আস্তানা থেকে
এই সব খেলা দেখে বৌ ছেলেমেয়েদের কাছে
রাত্রিবেলা মজাদার গপ্পো বলছে।

বাঁশিওয়ালা

আমার লেখার টেবিলের ওপর বসেই, কী আশ্চর্য ছাখো,
একটা বাঁশিওয়ালা সুর ধরেছে। সেই সুর
যা শুনলে মুহূর্তে
সমস্ত গা গুলিয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে, যেন
মন্ত্রপুতঃ সাপটি হেলেদুলে তার প্রচণ্ড ফণাটি
বাঁশিওয়ালার দিকে মেলে ধরেছে।

বাজাও, বাঁশিওয়ালা বাজাও।
আমার শীতল শরীরের ধমণীতে
আমার বিষমন্ত্র যেন ওঙ্কারধ্বনিতে পরিণত হয়। বাজাও।

এরা দুজন, এই বাঁশিওয়ালা আর সাপটি
কী জ্বালাতন করছে আমার লেখার টেবিলে। কবিতা
লিখতে দেবে না মনে হচ্ছে। শুধু শুনছি। শুধু দেখছি
সাপটির আদর, বাঁশিওয়ালার আদর। যেন বিশ্বভুবন
ওদের সঙ্গে মাখামাখি। যেন আমি, আমার কলম,
আমার সব কিছু অবান্তর। শুধু
ওরাই দুজন।

বাজাও, বাঁশিওয়ালা বাজাও।

সমুদ্র কাছে এসো

আমার বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা থেকে
সমুদ্র দেখতে পাই, অনুভব করি

এর আয়তন, গাঢ় নীলিমা এবং
বিস্তার।

এই বারান্দায় বসে উন্মুখ ঝাউগাছের শিহর এবং
সমুদ্রকন্যাদের মৈথুন দেখা যায়।
দেখি ধীবরদের নগ্ন উল্লাস।

এসব কথা, মনে হতে পারে, দিবাস্বপ্ন।
কিন্তু আমি অনুভব করি
আমার স্নায়ুর উত্তাপ এবং
লক্ষ্য করি ধমনীর ভিতর
রক্তকণিকার দ্রুত সঞ্চার।

সমুদ্র কাছে এসো। তোমার ঊর্মিরাশি
আমার বালিশে বিছানায়
কিছু শঙ্খমালা উপহার দিয়ে যাক।

অর্থহীন সংলাপ

আপনি কি আমাকে চেনেন, অথবা
আমিই কি আপনাকে সুস্থির জানি! অথচ দেখুন,
আমরা তো একই বাড়িতে, পাশাপাশি ঘরে
দীর্ঘ যৌবন কাটালুম।

আয়নায় তাকালে আমার মুখে ভাঁজ দেখতে পাই
আপনার মুখের কালো রেখাটি

একান্ত দর্পণে আপনিও দেখে থাকেন।
আমরা বয়সে বাড়ছি—একই সঙ্গে, একই
বাড়ির পাশাপাশি ঘরে।

অথচ আপনি কি সত্যি আমাকে চেনেন?
আমিও কি আপনাকে, আজও।

এসব প্রশ্ন এবং তার উত্তর বরং জমা থাক
উত্তরপুরুষের জন্য।

অনন্ত বাসরে যাবো

কন্যা তোকে যৌবন দিয়েছি
দিয়েছি অতুল রূপরাশি।
তোকে পুরুষ দিয়েছি
সহবাসে যার
যৌবন উদ্বেল হবে।
কন্যা তোর শরীরের ভাঁজে
অম্লান মিথুন-মূর্তি, তোর
শিশুর আদল
প্রপিতামহের মুখে।

কন্যা তোর মুখশ্রী এবার
সমুদ্রমন্থিত
কল্যাণী লক্ষ্মীর।

এবার আমাকে ছুটি দে, আমি
অনন্ত বাসরে যাবো।

বাড়ি-ফেরা

(অনুপ -কে)

মাঝরাস্তায় প্রায়শই আমার
হোঁচট খেতে হয়।
ছোট বড় গর্ত , ঝোড়ো হাওয়ায়
নিশ্চিত ঠাহর পাইনে, কোথাকার পথরেখা
কোথায় মিশেছে, কি
একান্তই মেশে নি। হয়তো বা খানাখন্দের পাড়ে
বেতগাছের, কাঁটালতার ঝোপে গিয়ে
ঢাল জমেছে। আমার
সময় বড় কম। তাই তাড়াহুড়ো, তাই
হুদ্দাড় এলোমেলো পথ-চলা, তাই
কিছু টের পাই নে।
পড়ি-মরি করে ছুটতে থাকি
যেখানে বাঁধ-বলে-ভাবছি-সেই নিশানার দিকে।

পৌঁছুতে পারি না তবু। ঠিকমত। ঠিক সময়ে।

ফেরবার পথে পা দুটিকে টেনে টেনে চলি ,
যদি লক্ষ্যে পৌঁছুতে নাই পারি, পেছনে
হাঁটতে হাঁটতে একসময়
বাড়ির দরজায় ফিরতে পারবো।

আকাশকে নানাভাবে দেখতে চাই

আমি আকাশকে নানাভাবে দেখতে চাই। এবং
বিভিন্ন সময়ে। কখনো মধ্যরাত্রে ছাদে

চিৎ হয়ে শুয়ে, কথনো নিঃসঙ্গ দুপুরে
পশ্চিমের জানালা থেকে। ধু ধু প্রান্তরের মাঝে
দাঁড়িয়ে থেকে আকাশকে অন্যভাবে দেখা যায়,
বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের ভালোবাসায়।
মাঝ পদ্মায় স্টিমার থেকে কৈশোরের
আকাশ দেখা। এবং
বিভিন্ন বয়সে।

ইদানিং আকাশকে আমি ঘরের চৌহদ্দির
মধ্যে দেখতে ইচ্ছা করি। বলি,
তুমি আমার কাছে এসো, বিছানায়
ব'সো, আমার আতপ্ত শরীরে তোমার
লাল টকটকে শাড়ি বিছিয়ে দাও।

আকাশ ভাঙার মুহূর্তগুলি

এই মুহূর্তে মনে হ'ল টেবল্‌-ল্যাম্পটা ভেঙে
টুকরো টুকরো হয়ে গেল,
ভাঙবার মুহূর্তে এক একটা সরু
বিদ্যুৎরেখা আমাকে চারিপাশ থেকে
ঘিরে ধরলো। আমি
তার আবর্ত থেকে কিছুতেই আর
বেরুতে পারছি না।

সম্ভবত এইরকমই হয়, ভরসন্ধ্যের
পূর্বমুহূর্তে আকাশ এমনি করে ভেঙে ভেঙে যায়।

অস্তসূর্যের মেঘেরা
ছিন্নভিন্ন হয়ে হালকা নীল ঈষৎ রক্তিম বা
কোমল গোলাপী আভার ভালোবাসা বিতরণ করে।

টেবল্‌-ল্যাম্পটার ভাঙা কাঁচগুলো
সযত্নে রেখে দিয়েছি। হয়তো কোনদিন
আকাশ ভাঙার মুহূর্তগুলি
আমাকে কেউ উপহার দিতে পারে।

দীর্ঘ উপমা

তার মুখশ্রীতে মেঘবর্ণ প্রাসাদের ভাস্কর্য
তার শাড়ীর আঁচলে যৌবন খেলা করে
বক্ষোবাসে উদ্দাম হাওয়া বহে যায়।
আমি তাকে চিনতে পারি নি।

তার চিবুকে কর্ণমূলে, ওষ্ঠের
ঘন সান্নিধ্যে বিদ্যুৎরেখা, তার
বহুবল্লভা হৃদয় নিংড়ে এই যৌবন
দ্রুত যায়, দ্রুত বহে যায়।
আমি তাকে চিনতে পারি নি আজও।

তবু তার যৌবনকে ভালবাসতে সাধ যায়
তার বহুবল্লভা হৃদয় নিংড়ে
কি সুখ কি দুঃখকে নিজের কাছে বন্দী করে রাখি।

আমি তাকে আর চিনতে চাই না। কেননা জানি
তার দুরন্ত যৌবন আমারই বাসনার কোন
দীর্ঘ উপমা।

কুমারকিশোরকে মনে পড়ে

মাঝে মধ্যেই আমার মুখ বদলে যায়,
নাক চোখ ভুরু ওষ্ঠ সব কেমন অচেনা মনে হয়
দর্পণে ছায়া পড়লেই
কেমন দূরত্ব ঘনিয়ে আসে।

সম্ভবত সেই কুমারকিশোর বয়স থেকেই
এরকম হয়ে আসছে। সম্ভবত
শৈশবের হাতছানি
ফিরে ফিরে ডাকছে।

দর্পণে তাকাতে বড় ভয়। বড়
উতল দীর্ঘশ্বাস। হায়, আমার সেই
কুমারকিশোর।

দেবতা জানেন

আমার দেবতা জানেন, আমি
আজো পর্যন্ত কোন খেলায়

জিততে পারি নি। সেই
বালকবয়স থেকে আমার
পিছনের সারিতে বসবার আসন।
সেই কৈশোর থেকে বৃথা স্বপ্ন-দেখা।
সেই যৌবন থেকে পরাজয়ের স্মৃতি
আমি বহন করে আসছি।

আমার দেবতা জানেন, আজ আমার
যাবার লগ্ন এলো।

এই মুহূর্তে আমি একটিমাত্র খেলায় জিতেছি, আমি
আমার দেবতাকে বুকের মধ্যে স্থির
দেখতে পাচ্ছি।

আমার দেবতা।

নিছক স্বপ্ন

দ্রুত বাড়িটা পার হয়ে চলে যাচ্ছিলাম, বারান্দার
দিকে না তাকিয়ে। যা ভয় করছিলাম ঠিক তাই, কিছুদূর
এসে পিছন থেকে ডাক শুনলাম, আপনাকে
যে ডাকছে।

এ ডাক ফেরাবার সাধ্য নেই আমার জানতাম, রাহুগ্রস্ত
যেন, টিমিটিমি পায়ে সেই বাড়িটার
সেই বারান্দার সেই দেওয়াল-বেয়ে-ওঠা আশ্চর্য গাছটার
কাছে দাঁড়ালাম। আসুন। দরজার-আড়াল-করা

কপাট থেকে সেই বীণানিন্দিত কণ্ঠের
ধ্বনি। কে যেন আমাকে হাত ধরে ধরে
সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিয়ে গেল। দরজার
কাছে এসে দাঁড়ালুম, সেই মেহগনি রঙের
বর্মি টিকের পোষাকী আলমারি, ছায়া পড়ছে
দুজনার, একসঙ্গে, যা একদা আমাদের
কত স্মৃতির গন্ধ হয়ে আছে আজও।

আসুন। ঘরে ঢুকতেই সমস্ত রক্ত যেন দ্রুত
শিরার ভিতর যাতায়াত শুরু করল, যেন ট্রেনের হুইসল্, যেন
এঞ্জিনের ঘটা-ঘটাং শব্দের ব্যস্ততা। সেই আশ্চর্য সুন্দর
সেই স্মৃতিগন্ধবহ ঘরের উত্তরে দক্ষিণে দুটি সুঠাম পালঙ্কে
দুটি দেহ স্থবির। দেহ নয়, স্পষ্ট দেখলুম দুটি অপছায়া
শবাসনে স্থির। ঝকঝকে দাঁত, কান, ইন্দ্রিয়ের
শীতল আরাম। আসুন। সে যেন ভয়-তাড়াবার
মন্ত্রধ্বনি আমার।

যে গোপন ঘরটিতে আমরা বিশ্ব থেকে পৃথক
হয়ে সময় চুরি করে নিতুম সেখানে
যাবার কথা হল। তার সেই শীতল হাতে আমার
তপ্ত হাত রাখতে বলল।

মশারি ছিন্নভিন্ন, জানালার বিলাসিনী পর্দায়
চিড় ধরেছে, পুরনো অয়েল-পেন্টিঙ্
এখনো স্থির। বসুন। আমার
স্নায়ু, শরীরের প্রতিটি রক্তকণা, সমস্ত
স্বেদবিন্দু উত্তাল।
তারপর আমার কিছু মনে নেই।

কমলেশ চক্রবর্ত্তী

প্রথমা রাধা

কেউ দূর থেকে পবিত্রাহি ডাকে
এই নামে , অনেকদিন শুনিনি
শুনলেই চমকে উঠি বিভুঁয়ে
রাধা-রাধা—ট্রেণের বাঁশীর শব্দ
নাম কাঁপে বিশাল আকাশ জুড়ে
নিচে শাখায় শাখায় ছায়াদের খেলা
খুঁজে পাওয়া ভীষণ কঠিন কারণ
জামাটা ময়লা, চুলে মর্মরিত পল্লবের
ধূসরতা অথচ লুকানো নেই—হয়নি প্রতীকী

ইস্টিশনে থামা ট্রেন ত্যাখে
বিস্ফারিত স্ফটিকের মতো চোখে

তবে কি আমিও নেমে যাবো ট্রেন থেকে
খুব নিচু হ'য়ে সবিনয়ে তার মুখ
ফর্শা রুমালে মুছায়ে—নশ্বর কোনো উপহার ?

এতো ধূর্ত হওয়া সাজে না—শুধু বলা যায়—
এই গণ্ডী টেনে দিলাম বিশ্বের দিকে
সাবধান রাধা—কখনো হয়ো না পার ॥

দ্বিতীয়া রাধা

ট্রেন থেমে গেলে পাতা ঝরে যায়
কিছুক্ষণ নীরব দর্শক হ'য়ে দাঁড়ালে একেলা
দেখা হবে ছদ্মবেশী কিশোরীর ম্লানমুখ,

বনফুল, কিছু লতাগুল্ম, শ্যামল দূর্বার মঞ্জরী,
দলছুট গাভী উচাটন প্রান্তর সীমায়,
তবু একা ফিশফিশ কথা কবে তির্যক পথের রেখা
কাছে-দূরে যেখানে ভুবন তোমাকে ছুঁয়েই
চৈতন্যের সাহচর্য পায়।
প্রতিদিন ট্রেণ থামে কোনো ইস্টিশনে
অথবা তিন নম্বর গুমটির কাছে
পাতা ঝরে কিশোরীর সম্মুখে পাশে পদমূলে—
অলৌকিক এই ঘটনার পরিণতি না জেনে, সে
উদ্বেলিত হাতে বিদায় জানায়—ট্রেণ-পথ-উদ্ধারণ
যা কিছু ঘিরিয়া আছে চরাচর
যা কিছু পেছনে রেখে যেতে হবে—
সমর্পিত সকল আশ্রয়।

অসুখ

আমার হয়েছে এক গভীর অসুখ
আরোগ্যের অতীত যা—
রক্ত নাকি বুকের ভিতর উৎফুল্ল কীট
যাদের আমিও ছদ্মবেশী মৃত্যু ভেবে হয়েছি প্রগাঢ়

যৌবন বস্তুত সোনার কপাট
পেছনে উঠোন জমকালো প্রাচীন প্রাসাদ
অর্গলমুক্ত গবাক্ষ বিনিদ্র ইশারা
উধাও দিগন্তে—
কবে সেই পথে হেঁটে যেতে যেতে নিঃশব্দে মসৃণ
বাঁশের বিবর্ণ পাতা দেখেছিলাম

আসলে তা ছিলো আমারই অতীত
ইচ্ছা অনিচ্ছার অবতীর্ণ দিনরাত্রি
যুগল সর্পের খেলা ছোটোবেলার চোখে
নতুন বস্ত্রে তার চিহ্ন ধরে রাখা
অথবা যা কিছু প্রাপণীয় সব ভুলে
গভীরে গভীরতর রোষে গোপন অসুখ
ছদ্মবেশী মৃত্যু ভেবে প্রগাঢ় যৌবনে
পৌঁছে গিয়েছিলাম নিঃশব্দ বিকেলে।

জন্ম ১৯৩৮, বর্ধমান। প্রথম কবিতা অধুনালুপ্ত উত্তরবঙ্গ পত্রিকায়, নাম মনে নেই। কোন কাব্যগ্রন্থ নেই। একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছে আছে।

সুশীলকুমার গুপ্ত

শীত

পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, মাথায় উত্তাল
রঙিন বোঁচকায় বাঁধা সোয়েটার শাল।
সুদূর কাশ্মীর থেকে কলকাতার ঘরে
উষ্ণতা বিলিয়ে যায়,
তবু তীব্র জ্বরে

কলকাতা কাঁপছে রাত্রিদিন।
পারো যদি আন তবে, নির্মম কঠিন
সে উষ্ণতা যাতে গ'লে শীত
ফুলের বন্যায় মোছে করুণ অতীত,
মানবিক উষ্ণতায় করে জড়াজড়ি
সভ্যতার জীব,
মিথ্যা হানাহানি মৃত্যুর প্রহরী।

অধিকার

কেড়েছো মরার অধিকার।
আরও কত শাস্তি আছে,
হে সভ্যতা, বল এইবার।
ভিক্ষা করা অপরাধ,
খুঁটে খাওয়া মানা,
আভিজাত্য সুরক্ষায় আছে সান্ত্রী থানা।
ক্ষুধারোগে মারবে তুমি আইন মাফিক,
জীবন-যৌবন কিনবে বিনামূল্যে
কালের বণিক।
তুমি মারলে নেই কোনো দোষ,
ধর্মাধিকরণ আছে,
তদন্তের নকশা-কাটা সোনালী পাপোশ।
তা'তে জুতো মুছে ঢুকবে ঘরে,
প্রশংসার পাখি ডাকবে
বেতারে খবরে।

হে সভ্যতা, তুমি বন্দী আজ
আমারই মতন,
বল কিভাবে বাঁচাবে
রুগ্ন সংসার সমাজ।

আকর্ষণ

নেই তার কোনো আকর্ষণ,
কণ্টকিত সময়ের শীতার্ত শয্যায়
প'ড়ে আছে মৃতের মতন।

নিহত বিশ্বাস,
　　চূর্ণ স্বপ্ন,
　　　　চ্যুত প্রেম ,
সে মহান শতাব্দীর করুণ শিকার।
মধুপেরা ফিরে গেছে,
　　দেহ জুড়ে লোভের প্রহার ,
সংসার নিয়েছে তুলে
　　শোণিতের হেম।

সভ্যতার সহোদবা ভুলের পুতুল
কি ক'রে প্রতিমা হবে ?
　　রক্তময় ফুল
ফিরে পাবে নক্ষত্রের মূল ?

সুশীলকুমার গুপ্ত। জন্ম ১৯২৬। জন্মস্থান হুগলী জেলার তারকেশ্বরে। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'রাত্রিশেষে অধুনালুপ্ত ছোটদের 'মাসপয়লা' মাসিক পত্রিকা (মাঘ ১৩৪৪)-য়। কাব্যগ্রন্থ "রৌদ্র-জ্যোৎস্না' (১৯৫১), 'আলোর আকাশ' (১৯৫১), 'কবিতা, তোমাকে' (১৯৭৭) ও 'Most Beloved' (1979)। কাব্যনাটক 'সমান্তরাল'।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

শুধু-ই বিষাদ সাক্ষী

শুধু-ই বিষাদ সাক্ষী
শুধুই বিষাদ
হে আমার অমল প্রতিমা।

কতোই যে জ্বলে গেল জীবনের খাণ্ডব-দহনে

কাকলীমুখর যতো ছায়াগুলি অগম গহনে
যতোদূর নিভৃতির সীমা—
শুধু-ই বিষাদ সাক্ষী, শুধু-ই বিষাদ!
শুধু সেই মুখরেখা, অমলিন, মবে না, মরে না …
এ যে কোন্ শ্বেতপদ্ম, পাপড়ি কি কখনও ঝরে না,
সে কিশোরী অমল মহিমা।
কতোই সহজে সব চলে গেল, কতোই সহজে
এই কান্না, অধরে ধরে না।
শুধু-ই অঙ্গার হয় অস্থি-শিরা-পেশীর প্রাসাদ
আমাব তো কথা নেই, কী নিরর্থ বাদ-প্রতিবাদ
শুধু-ই বিষাদ সাক্ষী, শুধু-ই বিষাদ
রে কাল নিষাদ
হায় স্বপ্ন বিস্ময় গরিমা॥

আলাদিন, ওরে আলাদিন

পাথর সরিয়ে দাও, পাথর সরিয়ে দাও, পাথর সরিয়ে দাও, আমি
শুধু শ্বাস নেব শুধু, শুধু একবার শ্বাস। যাদুকর ওরে যাদুকর—
তোর হাসি কী দারুণ। পিশাচেরও চোখে জল, অথচ কী অবিচল তুই!
সমস্ত জীবন তোর করতলগত ফল,-বিনিময়ে এ কোন্ প্রদীপ?
কখনও জ্বলে না আলো, মলিন বিবর ছেড়ে উঠে আসে ধূমল দানব
কেবল-ই আদেশ দাও, কেবলই আদেশ একি। শুনি এই অসহ্য আদেশ!
পালঙ্কে প্রতীক্ষা করে সমস্ত রজনি-যাম ভাষা-নেই-সম্রাট দুহিতা
দলিত দেহেব স্বাদ নিয়ে ফিরে আসি স্বেদে স্নান করে গ্লানির গভীরে
কেবল-ই আদেশ দাও, কেবলই আদেশ দাও, ক্ষমাহীন ধূমল দানব!
সম্রাট প্রতীক্ষা করে, দাস দাসী কোলাহল, আর আমি শুনি সারাদিন
এ কোন্ পৃথিবী তোর চারিপাশে এলোমেলো,·· আলাদিন ওরে আলাদিন

কে তোর জীবন কেড়ে, এ-ভাবে ছড়ালো পথে, ভেঙে দিল ধুলোয় [illegible]
বিনিময়ে একি দীপ। কখনো জলেনা আলো। একি দীপ ধাতু না [illegible]
মা-র ছেলে ঘর ছেড়ে, বেলা যেত পথে পথে, বিকেলে আকাশ ঘুড়ি, পরে—
মায়ের হাতের-স্বাদে-মাখাভাত মুখে আর মায়ের নিবিড় গাঢ় স্বরে
কোমল ঘুমের তাপ। সে কোথায়- সে কোথায় ? চারিপাশে ভাঙাচোরা
[illegible]
মাথায় কি ঝিঁঝি ডাকে, কে যে সারাদিন ডাকে, আলাদিন ওরে আলাদিন
কে তোর জীবন কেড়ে এমন প্রদীপ দিল, আলো যাতে কখনো জলে না।

সময় সময়াতীত

প্রাকার-পরিখা চিহ্ন, দরোয়াজা গম্বুজ মিনার
শাহ কি সম্রাট কেউ ছিলেন, এ বিশাল চত্বরে
এখন ট্যুরিস্ট ঘোরে, বীরপুঞ্জ শায়িত কবরে
চারিদিকে ধুধু মাঠ · ইতস্তত শূন্য জলাধার।

কতোটুকু চোখে পড়ে তোমার চতুর ক্যামেরার॥
কতোদিন সঙ্গে রহে ভ্রমণ কি রমণের স্মৃতি ?
ফাঁপানো চুলের কূলে বাতাসের পরকীয়া প্রীতি।
পৃথিবীর জপমালা আবর্তিত শুধু বারবার
সময়ের শবাসনে উদাসীন ধ্যান করে কার ?
শালিখ ওড়ায় ধুলো, কাঠবিড়ালীর ছুটোছুটি
এই নিয়ে সারাদিন খেলা করে পরমা প্রকৃতি
এবং নক্ষত্রপুঞ্জ, আকাশ বিস্তৃত অন্ধকার॥

জন্ম ১৯৩১ কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'সমুদ্রের প্রতি', প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বাতাবরণ। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ আলাদিন, ওরে আলাদিন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভালবাসার ভুবন আমার চোখের জলের ভুবন
কারা যেন চোখের জলকে অপবিত্র বলে
তার পাপ লেগেছে তোকে, পাপ লেগেছে আমার কবিতায়।

যাদের আছে তিনটি লেজ তারা কেমন আগুন হয়ে জ্বলে,
পবিত্র হয়। সেই কবিতা লিখতে গিয়ে আমি
ঘুরেছি মহাভারত—পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে, কুরুক্ষেত্রের
ধর্মযুদ্ধে, গিয়েছি দ্বারকায়,
দেখেছি যুদ্ধে আগুন আছে, নেই শুধু সেই পাঁচটি
গ্রামের ধর্মীয় ভূস্বামীর

রাজা হওয়ার স্পর্ধা। চোখের জলে কর্ণের শীতল ছুটি পা
ধুয়ে দিচ্ছেন রাজাধিরাজ—ধর্মেও সেই পাপ লেগেছে, ভুবন,
কবির আদিম পাপ।

৭ জুলাই ১৯৮১

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

'এক্ষুনি রোদ্দুরের দল এসে
ব্যারিটন শুরু করে দেবে'
বলল কেউ 'তোমরা এখন
যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো'—
শুনে কিন্তু কেঁপে উঠল খুব

যারা এইখানে এতক্ষণ
রোদ্দুরেই গান গাইছিল
কিন্তু তারা কোনো দল নয়,
বন্ধু তাই মানদণ্ড জানে
তাই বুঝি একরঙা রোদ্দুরের দল
তাদের ভীষণ সাজা দেবে।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ঘুনের মতো একা কাঙাল

কে দোলাচ্ছ বাতের কালো গোলাপটাকে।
আমি তো হাত পেতেই আছি হাওযার বাঁকে—
একটি দুটি গন্ধ দিও খোঁপা খুলে।

গন্ধগুলো বাজিয়ে সুরে রাত ফুরুলে
চলে যাব গরঠিকানা শতচ্ছিন্ন—
অভিমান বা বিরহ নয়, নয় অচিহ্ন,

শুধু অমোঘ ঘুনের মতো একা কাঙাল
পেরিয়ে যাব সমাজবিধি সুখের নাগাল ॥

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতা-ঝবাব দিনে

জ্বরের ঘোরে পাতা-ঝরার শব্দ শুনি
মন-ছুঁই ঝড়ের বাতাসে।
বলেছিলে

পাতা ঝরার দিনেও পাশে থাকবে
বাতাসের মন-ছুঁই আঁচলে
জড়িয়ে।
অথবা নতুন পাতায় নতুন ফুলের
সাবেকি গন্ধ ফুটতেই
রিক্ত ডাল।
রিক্ত আমার মুকুল-ছুট প্রাঙ্গণ
তোমার নাগাল-ছুট চিন্তায়
বিজড়িত।
গাছের আড়াল থেকে গাছ তো সরে না?
বৃক্ষ-ছুট শাখা তো মরে না, তবু
বলেছিলে।

১ কার্তিক, ১৩৮৪

একটু কাঁদুক

দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে—
রাস্তার মোড়ে বাঁক নিয়ে
চলে গেলে—
আকুল হাত-নাড়া, মেঘলা চোখ।

আহা, একটু কাঁদুক—
কান্না না হলে বুকের আকাশে
তারা ফোটে না।

২১ বৈশাখ, ১৩৮৪

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

ইচ্ছা

[লোরকা থেকে]

কেবল তোমারই হৃদয়ের উষ্ণতা, আর কিছুই না।
আমার দেবোদ্যানে কোনো কোকিল নেই, নেই বীণার স্বর,
মহতা নদীর সঙ্গোপনও আছে একটি ছোট ঝরনার।
নেই বাতাসের বর্শা মুকুলিত পত্রে, হয়না এক্ষণে পাতা ঝরামর্মর।
মহতি আলোকে জোনাকি জ্বলিবে পরস্পরে
মাঠে বিনিময় ভাঙা চাহনির।
এক পরমা বিশ্রান্তি, সেখানে আমাদের চুম্বন রণিত
কথার প্রতিস্বরে হবে নিবারিত দূরত্বের
এবং তোমারই হৃদয়ের উষ্ণতা বিনা কিছু আর না।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

তোমার স্পর্ধা

তোমার দীপ্ত অহংকারে আমার কথা ছত্রখান হয়ে যায়,
কথারা নতজানু হয়ে শব্দের সম্ভার
তোমাকে নিবেদন করে,
তুমি শুনেও শোনো না,
শুধু দু' চোখ ভরে ঘৃণা
ছড়িয়ে দিতে দিতে চলে যাও হাওয়ার আড়ালে
হাওয়ার আড়ালে আরও হাওয়া
ঘৃণার দহনে জ্বলতে জ্বলতে
একদিন প্রতিদিন

নতজানু শব্দপুঞ্জ
ভিতর থেকে ভালোবাসায় উড়ে উড়ে যায়

তোমার চারপাশে আমার কথা, কিছু সংলাপ
টুকরো ভাবনা

একদিন প্রতিদিন জলতে জলতে
ভিতরে ভিতরে ভালোবাসায় সোনা হয়
তোমার দীপ্ত অহংকারে কথারা তবু থেকে থেকে
নতজানু
তুমি তবু ঘৃণা ছড়িয়ে দাও
এবং যতই ঘৃণা ছড়াও, ততই আমার শব্দপুঞ্জ
তোমাকে খুঁজে খুঁজে গভীরভাবে স্পর্শ করে,
তোমার স্পর্ধা
আমাকে ভালোবাসতে শেখায়।

কালীকৃষ্ণ গুহ

অপেক্ষা

সারাদিন তার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকি, সিগারেট খাই।
সে যখন আসে, একটিও কথা বলতে
পারি না—
সিগারেটের প্যাকেট শূন্য, অবিন্যস্ত চুল

চারদিক হাহা শূন্যতা ·

বাসুদেব দেব

সেই গেলাশ

এই সেই গেলাশ কোন আঙুলের ছাপ নেই
কোন পাপ নেই কোন পানীয় নেই
কোন শোক নেই কোন স্মৃতি নেই
ঝকঝকে, প্রথম, যান্ত্রিক, কম্পাশহীন

হেমন্তের নরম বালিশ ঘিরে এখন বাদামি হাওয়া
মানুষজন চলে যাবার পর
আবছা অন্ধকারে পতঙ্গদের ঘোরাফেরা
সবাই চলে যাচ্ছে একে একে, এরকমই নিয়ম
বেহায়া বলীয়ান সেই গেলাশ
ঘরের শূন্যতার মধ্যে
উৎসব
সেই গ্রাম্য ব্যাকুল ঠোঁটের অস্ফুট দুঃখ, বাঁশবাগানের ছায়া
আর খুব কাছে নারী তোমার ঘামতেল মাখা
মুখের ঢল, আবেগমাখা কাঁপন,
আমার শ্রাবণ

বুক পুড়ে যায়, শহর পোড়ে, ওড়ে ধুলো ঝড়, বৃষ্টির চাবুক
মানুষজন চলে যাচ্ছে একে একে, ফেলে যাচ্ছে, এ রকমই নিয়ম
কেবল সেই গেলাশ··একা···কেবল সেই গেলাশ

শান্তিকুমার ঘোষ

রেলগাড়ী চলেছে

রেলগাড়ী চলেছে সূর্যোদয়ের বিপরীত মুখে
মেঘ ছেয়ে আছে নীলা আকাশ

আরো নিবিড় গোটা পাহাড় থেকে সানু
পাতাহারা গাছ,—তরুর ভেতর
শুধু পলাশের রক্তিমা

মানুষের হাতের স্পর্শে সেজে উঠবে ওই খেত-জমি
নতুন-ছাওয়া কুটির
নামবে তাদের জন্য
দেব-করুণা

কেতকী কুশারী ডাইসন

যেমন শোবার ঘরে

যেমন শোবার ঘরে কচি বাচ্চা কেঁদে উঠলে
রান্নাঘরে মায়ের বুকে
ব্যথায় দুধ নেমে আসে,

যেমন দুধ দোয়ার আগে
ভরা বাঁট টনটনায়,
সারি সারি, আতুর, ডাকে গাভীরা,

তেমনই ব্যথা দেয় আমাকে
আমার সব কাজে
দিনে রাতে আমার ভালোবাসারা।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রার্থনার ইচ্ছা

দুটো হাত জুড়ে ত চেয়েছিলুম

বাড়ি ফিরলে আলো নেই
একটা মুখের সঙ্গে আরেকটা মুখ
তার সঙ্গে আরেকটা মানে একটাই মুখ

এই কিনা দিনের আলোয় দেখাদেখি—
যখন ঢালি লাল
গেলাসে পড়লেই সাদা

যেখানে যেখানে হাত
কাঁটাতারের বেড়—
ভোঁতা পিন নিয়ে
গ্রামোফোনের রেকর্ড ঘুরছে—

দেখার মুখ ছোঁয়ার জল
এবং এইসব খুঁজতে খুঁজতে
দু হাত জোড় করার চেষ্টা—

প্রার্থনার অন্ধকার তো পাওয়াই গেল না

মানসী দাশগুপ্ত

বৃক্ষের মতন

কেন যে এমন একা-একা লাগে অথচ
সবাই চেনা, সবই চেনা। গলির ভিতরে
জলে ভিজে কালো পাতা, কালো, কিন্তু সবুজ তো ছিলো ?

তা নইলে পাতা আর কী রকম হয় ?
হেঁট মুখে যেতে যেতে মুখ তুললেই অন্য চোখে ছায়া
দেখি আঁকা মুখ, রঙীন, বানানো,

কথা বললে চমকাই   কে ডাকে এবং
কেন ?   এ তো সে গলার স্বর নয়—যে গলার গানে
'নতুন ফাগুনে যবে' ফিরে ফিরে গুঞ্জরিত কলি

বেজেছিল, বেজে উঠেছিল।

তবু ডাকে, নিশি ডাকে
'প্রতিশ্রুতি, পথ হারিয়েছ ?'

২.

যখন আসবে রাম, দৃষ্টি গেল, দেখতে পাবো না।
তুমি যে তুমিই ছিলে, না-জেনেই চলে যেতে হবে।
যে তোমার প্রতীক্ষায় ঘামে ঘামে রোমাঞ্চ শিশির
অশ্রুর মতন জমে যেন সে আমার চোখ
জল ভরে রেখে দেয় পা দুটি ধুইয়ে দেবে বলে—
সে চরণরেখা পথে পড়লো কি ?   চোখে পড়বে না।
অবশ্য তোমার স্পর্শে রোমকূপ চক্ষু হয়ে যায়,
স্বেদ দিবা চন্দনের মতো সাজে আরতি থালায়—
তুমি কী না পারো রাম।
অরাতিদমন, যুদ্ধ, অকালবোধন,
মায়াময় মিত্রতায় বর।ভয়দান,—সমস্ত তোমার সাধ্য।
স্বেচ্ছায় সম্পৃক্ত, কাঙ্খিত সুখের স্বাদ ওষ্ঠে রাখো,
পান নাহি করো।   অথচ আশ্চর্য দেখো, হারানো শরৎ
ফিরে দিতে তুমিও পারো না।

পরিমল চক্রবর্তী

আলো

ঘুম থেকে উঠেই প্রথম দৃশ্য চোখে পড়লো :
অন্ধকার থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এসে আলোর শিশুরা
সারাটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। .
তারপর কখন ধীরে ধীরে সকাল গড়িয়ে
দুপুর হ'লো, দুপুর গড়ালো বিকেলে,
বিকেল গড়ালো সন্ধ্যায়
এবং তারপর ঘনালো রাত্রি, অন্ধ রাত্রি। . .

প্রদ্যুম্ন মিত্র

অচেনায়

সমস্ত বাতাস তোমার মুখের দিকে ছুটে যায়,
একরাশ অন্ধকার ফ্রেমে আঁটা তোমার মমতা
আর্ত ঢাকে চোখ, ভুলে গেছ
আজীবন করুণাহীনতা,

আমারও মরণসন্ধি ওইদিকে বেহুঁশ হটেছে
সমস্ত দুপুর বেলা বৃক্ষ তার শিকড়ে ফিরেছে
রৌদ্রের পরাঙ্মুখী ঝড় এলো আর্ত নিশিডাকে,
চৌচির বনের ক্ষুধা ছিঁড়ে ফেলে গল্পের জ্যোৎস্নাকে ॥

জগত লাহা

গদ্য-পদ্য সম্পর্কে

আজকাল কি সব লিখছেন মহাশয়
গদ্য
পদ্য
একেবারে ঝুলঝাল—
হচ্ছে না
কিস্‌সু হচ্ছে না।

মসৃণ ম্যাপলিথো কাগজের ঝকমকে লাইনো টাইপে
জাগ্রত মানুষ কই ?
সবাই এখন বিনিদ্রায় কিংবা নিদ্রাসীন কেন ?
সেইসব শ্রমশীল যুবা
এবং মর্মগ্রাহী লজ্জাশীল নারীরা কোথায় ?
সেই স্মৃতিময় প্রকৃতি
এবং প্রীতিময় ঈশ্বরকেই-বা কোথায় বিদেয় দিলেন ?

আপাতত কিছুদিন ছুটি নেন :
হাঁ হাঁ, ছুটি নেন—লাগাতার মাস-ছয় ঠেসে ঘুমোন
ঘুম ভাঙলে আড়মোড়া ভেঙে শীতের খোলসটা ছেড়ে ফেলুন
তারপরে আস্তিন গুটিয়ে শাদা পালকের কলম বাগিয়ে
এন্তার লিখতে থাকুন—

যেমন গদ্যের অনুপ্রাসে যুবক
পদ্যের অন্ত্য মিলে নারী
আর গদ্য-পদ্যের অলৌকিক বিন্যাসে : অর্ধনারীশ্বর ॥

আনন্দ ঘোষ হাজরা

পাতা ঝরে   ঝ'রে যায়

ভাখো পাতা ঝ'রে গেছে বিপর্যস্ত চূর্ণ মেঘ জলহীন
কৃশ ও পাণ্ডুর
পোশাকবিহীন বৃক্ষে নগ্ন শাখা ঘোরতর রাত্রির মতন
এবং বৃক্ষের নিচে সারি সারি মৃতদেহ, মানুষের এবং পশুর—
কালো শাখা প্রশাখায় ভিড় করে স্বাভাবিক অসংখ্য শকুন
এইবার ছিঁড়ে খাবে পচা মাংস তাহাদের বীভৎস শীৎকার
তাদেরই কানের কাছে মনে হবে অফুরান আনন্দ সংগীত।

অথচ এখানে এই বৃক্ষতলে চাষীদের হাট ছিলো, মানুষের ভিড়
সম্পন্ন শাখায় ছিলো অবিশ্রাম সশব্দ সবুজ
পাখিদের অনিবার বক্ররেখ উড্ডীন উল্লাস
তখনই হয়তো কেউ সখ ক'রে পুষেছে খেচর বাজ
হয়ত উদ্দেশ্য ছিলো কিছু
তখনই হয়তো কেউ সখ ক'রে পাখিদের অমোঘ আহ্বানে
সাড়া দিয়ে
বহু পাখি পুষেছে বাড়িতে দানা দিয়ে
চানা দিয়ে, পাখিদের রূপান্তর কখন ঘটেছে হায়
কেউ তো জানে না।

পাতা ঝ'রে যাবে ব'লে দিন যায় রাত্রি যায় মাস যায় বছর বছর
পাতা ঝরে, ঝ'রে যায়, নগ্ন হয়, কালো হয় বৃক্ষ শাখা
ম'রে যায় মানুষের দল
অজস্র শকুন এসে উড়ে বসে চেয়ে দেখে তাহাদের জলন্ত সময়
ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে শেষে কঠিন নিরেট লৌহবলয়ের মতো মনে হয়।

অশোককুমার মহান্তী

ঈশ্বরের মুখ

মুখখানি তার নিপাট ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময় কাকে যেন ভালো বেসে বেসে
সে জানে সর্বদা করুণ কাতর নেত্রে কেউ তার দিকে চেয়ে রয়
এবং সে কামনা ও কাম্য কর্মফলে কখনো স্ববাস ছেড়ে
প্রবাসের দিকে মুখ রাখে

কোথাও নিষ্পত্তি নেই, অনন্ত আকাশ হয়ে ভালোবাসা পথ ভাঙে
যতদূরে মানুষেরা হেঁটে যেতে পারে
বিজনে নির্জনে কিংবা জনতায় সাগরে পর্বতে
যেখানে যেখানে তারা ঘর বাঁধে, সেখানে সে আগেভাগে
বসে থাকে স্থির
মুখখানি উজ্জ্বল আগুন যেন, দাহ কিংবা নয়ন আরাম
নিপাট ছড়িয়ে যায় বিশ্বময় কাকে যেন ভালো বেসে বেসে

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিবোধ

চাঁদ, না চাঁদের মায়া
হলুদ নদীতে ?
লি পো তো প্রেমিক,
হাঁটুজলে ডাকিনীর ছায়া
টেনে নিয়ে গেল তাকে
অজানা পাড়িতে।

দেবতা কি অধিষ্ঠাতা
খচিত নীলের?
থেলিস ভাবুক,
উল্টে-পাল্টে আকাশের পাতা
নক্ষত্র তাড়িয়ে শেষে
ডোবে সে কুয়োতে।

এভাবে হাতছানি ছায়
জ্ঞান ও কবিতা,
আমি, বিরোধ দেখি না
মৃত্যুর কামড় নিতে চাই শুধু
প্রেমিকার দাঁতে।

কিরণশঙ্কর মৈত্র

মা

মা, তোমাকে মনে পড়ে না
তুমি শুধু স্মৃতি ছবিতে, মালায়,
সে-ছবি ভেসে গেছে
পুব বাংলার উজানে

মা, তোমাকে মনে পড়ে না,
শুধু দীর্ঘশ্বাস, দৌড়
চারিদিকে হায়েনা, ভালুক,
বা উদ্যত গভীর খাদ,
কখনও অজান্তে কপালে হাত রেখে
সঞ্জীবনী বিদেহী কল্যাণ কামনা।

মা, তোমাকে মনে পড়ে না—
উজ্জ্বল আলো, টুং টাং,
স্বপ্নলোক, সুবাসিত নারী ,
পিঁড়ি-পাতা ভুলে গেছি
সিঁদুর সীমন্তিনী মঙ্গল-প্রতিমা

মা, তোমাকে মনে পড়ে না--
সাত সাগর, অন্তরীক্ষে উন্মাদনা
মৃত্যু খেলে যায় পলকে পলকে :
মোহিনী মর্মর-নারী, স্পন্দিত স্তন
জীবন ঝিলিক হানে একটি অক্ষরে

মা, তোমাকে মনে পড়ে না ॥

গোকুলেশ্বর ঘোষ

নাস্তিক

তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমি চলেছিলাম ভুলপথে
অগ্নিদগ্ধ মৌমাছি যেমন অন্ধ হ'য়ে ঘুরে মরে আপন মৌচাকে
তোমার ছলনা যদি আজো দেখে থাকে ভুল পথ
জীবনের সকল প্রয়াস যদি হয় ভস্মে ঘৃতাহুতি
তোমার প্রতিমা আমি ধ্বংস করবো আগুনে পুড়িয়ে
যে-ভাবে নাস্তিক তার ঈশ্বরকে চরম শাস্তি দেয় ।

মুরারিশংকর ভট্টাচার্য

দেখি নি এমন পবাভব

দেখি নি এমন পরাভব ভাবি নি কখনো
নিজেই নিজস্ব যুদ্ধে রক্ত মেখে ফিরি
প্রতিটি সন্ধ্যায়, তবু কোন সন্ধি নেই ;
প্রত্যহ প্রত্যুষে তুমি রণক্ষেত্রে ডেকে
নিয়ে যাও।

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

অনন্বুসন্ধান

এখনও তো তোর জলে-জঙ্গলে বাস
কবে গৃহবাসী হবি ?
ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকা সব শেষ
জীবনের সব ছবি
তোকে তো আমি খুঁজিই-নি তাই
গিয়েছি জলের ধারে
বালিপাথরের স্বচ্ছ আলোয় মাছেদের ঝিলিমিলি
আমাকে যখন ফিরিয়েই দিলি বারবার, তিনবারে
পদ্মপাতায় মাছেরা বলল , হায়, কাকে খুঁজেছিলি !

সব ছেড়ে দিলে কিছুই থাকে না বেদনার সম্বল
আমাদের কাছে খুলে বল্ তোর সবটুকু অন্বেষা
নিয়ে যাব তোকে দুপুরের কাছে ঐ দূর মেঘে মেশা
দুপুরের ঘরে জমা আছে এক নীল জলপদ্মল

কৃষ্ণা বসু

আসলে নিজেই সে

আসলে নিজেই সে একটি কবিতা।
সে যে কেন কবিতার কাছে যায়।
প্রাণপণে নিজেকে মন্থন করে তুলে আনে
নোনা স্বাদ, গন্ধ, ভ্রম, অন্তহীন পাপ,
তার সমস্ত শরীর জুড়ে মেদুর কবিতা ঘনিয়েছে,
পায়ের পাতায় তার পদ্মপাতার কারুকাজ,
স্তনের গভীরে তার ডুবে আছে সমুদ্রের প্রগাঢ় বিস্ময়,
তাকে ঘিরে তাকে পেয়ে কবিতাই জেগে ওঠে,
তবু কবিতার জন্য তার ঘুম নেই।
শৈশব মন্থন করে পুরোনো কাঁথার গন্ধ,
জলে ডোবা দালানের ছবি, বন্যার সকাল,
সমবয়সীর মুখে শীতের কুলের স্বাদ,
সব সে ছিঁড়ে টেনে এনে সাজায় কবিতা,
আর নিসর্গ সাজিয়েছে তাকে
ভুরুর ভঙ্গির থেকে চিকণ চিবুক,
আঙুলের ডগা থেকে ঊর্ধ বাহুমূল,—
কবিতার মতো এই তার তরঙ্গে তরঙ্গে জেগে ওঠা,
সে যে কেন কবিতার কাছে যায়
—এ রকম ভেবে সেই যুবা
ম্লান মুখে হেঁটে গেল প্রত্যাখ্যাত আপন আঁধারে—

দীপঙ্কর সেন

নবজাতকের প্রতি

নির্নিমেষ দৃষ্টি রাখো হৃদয়ে
যে হৃদয় বনবাসী হরিণ।

সেই প্রেমে হৃদয় মেলাও
যে প্রেম নিষিদ্ধ ফল হলে ক্ষতি নেই।
বনবাসে প্রেম হোক সাথী
বনবাস নিসর্গ চিত্রের।

চিত্রে সেই সাঁওতাল-যুবক
যে যুবক জীবন-প্রেমিক।

বিমান ভট্টাচার্য

এখানে গানেব চেয়ে

এখানে
গানের চেয়ে বাজনা বেশী
আলোর চেয়ে আঁধার বেশী
মানুষ না
নিন্দুক প্রতিবেশী
লজ্জার মাথা খেয়ে
করে পরচর্চা নীতি
দেশের এই রীতি
সামনে গেলে
মারবে পিছন থেকে

উপরে উঠিয়ে দিয়ে
মই কেড়ে নেবে, এখানে
জীবনের চেয়ে মৃত্যুর ভয়
কিছুটা বেশী , প্রাণ যায় তবু
যারা গান গায় কিঞ্চিত সুখের
শোনা যায় না

এখানে
গানের চেয়ে বাজনা বেশী ।

শান্তি সিংহ

দুটি শ্লোক

১. কাল নয়, বহতা প্রেমের স্রোতে উঠে এসো আদর্শ মননে,
শিল্পে উজ্জীবন হোক .
স্বাধ্যায় চেতনা আজ বড়ো বেশী প্রয়োজন, ভয়ংকর দিনরাত
খুবলে নিচ্ছে তাজা কল্জে, বারুদ কার্তুজ আজ উদ্যানের বাহার বাড়ায়,
এ সময় হড়কা বানের মতো প্রেম হোক, সুষুম্নায় ঊর্ধ্বমুখী বজ্রসংবেদন ।

২. মশা মাছির মতো ভন্‌ভনিয়ে সরে যায় সহস্র মানুষ
কেন্নো কেঁচোর মতো বুকে হেঁটে বেঁচে থাকে প্রবল বর্ষায়
কিছু সামাজিক প্রাণ ঘোলা জলে ধৈবতে রাগিনী নাকি অর্কেস্ট্রা বাজায়
কোটিকে গুটিক লোক বুকের গুহায় খোঁজে আত্মার আলোক !

সমীর চৌধুরী

মুখ

মাঝে মাঝেই কিছু অমলিন মুখের স্মৃতি
বড়ই ভাবিয়ে তোলে আমাকে।

কোথায় যে দেখেছি তাদের, কবে যে দেখেছি
কিছুতেই মনে পড়ে না।
এখন তাকাই সেদিকে শুধু, ম্লান মুখ, বিষণ্ণ চোখ
কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেখানে
গোপন হত্যার দলিল, প্রিয়জন হারানোর শোক,
কাটা দাগ, ব্রণ, চাপা কান্না ঠোঁটের ফাঁকে,
মাঝে মাঝে পথ হাঁটি আর দেখি—
এইসব কাটা চেরা মুখ, অভিমানী ঠোঁট
অমলিন মুখের স্মৃতি বড়ই সুদূর অনর্থক খুঁজি—
নিজেরও মুখে বুঝি কবে যেন তার পড়েছে আঁচড়।

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

পাহাড়ে ঢেকেছে সূর্য

পাহাড়ে ঢেকেছে সূর্য
গুহাবাসী আগে টের পায়
পায় না চুড়োয়-ঘোরা
মৌমাছি
পন্নগ
ছদ্মবেশে নেমে-আসা
স্ফটিক চন্দ্রমা

অমল পাল

কোন দিকে

কোন্ দিকে যাবো ?
কোন্ পথে গেলে, রক্তে পায়ের ছাপ পড়বে না ?
কোন্ পথে, ভাই বা বন্ধুর লাশ প'ড়ে নেই ?

কোন্ দিকে তাকাবো ?
ওদিকে স্বৈরিণী পাড়া :
আমার সাধের বোন বন্ধক দিয়েছি।
ওদিকে চৌমাথা মোড়
বাটি হাতে বিকলাঙ্গ পুত্রকে রেখেছি—

কোন্ দিকে তাকাবো ?
বলো, কোথায় পালাবে ?

অরুণা বসু

কোথাও গোপন কিছু

খুঁজতে যাবে কি দূরের
চৌরাস্তায় ? না দাঁড়িয়ে-
থাকা বাসস্টাণ্ডের বাসের ভিতরে ?
হেঁটে যাবে ওই পদ্মদিঘির পাড়
ধ'রে সাঁকোর ওধারে ? না, খুঁজতে
যাবে নৈহাটী পার ক'রে ব্যাণ্ডেল-
চার্চের মধ্যে ?

কোথাও যেও না
নিরুদ্দেশের খোঁজ পাবে
তোমার ওই অন্তর কোণে
যদি থাকে, থাক আজো
একান্ত গোপনে ॥

শিশির গুহ

ভেতরে বাউল

ইচ্ছে ছিল না ফিরে আসার
তবু আসতে হোল—
সাজানো বাগান, গেরস্থালী ছেড়ে।
কি ভেঁপু বাজিয়েছ গভীর ভেতরে
কে যেন হুকুম পাঠালো
—ছাড়ো ছাড়ো সব আমার আমার
কে কার হে এই নকল সংসারে!

বড় মায়ার মধ্যে আছি—
আমার ঘরের দেয়ালে থাকতো
যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথের ছবি
রজনীগন্ধরা পা ডুবিয়ে টবে,
তোমার ভাল লাগার জন্য আমি
মাঝে মাঝে আবৃত্তি করে উঠতাম তারস্বরে।
সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি হতেই
খাবার টেবিলে মুখোমুখি
না বলা কয়েক লক্ষ কথা
বলে উঠতাম আমরা।

এর ভেতরেই তুমি ডাক পাঠালে।
যারা অক্লেশে সব ছেড়েছুড়ে যায়
তারা নমস্য, আমি পারি না
আমার ভীষণ কষ্ট হয় ভেতর থেকে
অথচ তোমার আহ্বান ফেরাতে পারি না
শঙ্খের মতন বুকের ভেতর বাজে
বাউল হয়ে মন কোথায় যায় গেরস্থালী ছেড়ে॥

দীপংকর কর

প্রতিবেশী ভায়োলিন বাদকের উদ্দেশ্যে

তুমি একটি ছড় টানলে
ভায়োলিনে
দুঃখরা সব এল
আর একটি ছড় টানলে
ভায়োলিনে
দুঃখরা মেঘ হয়ে গেল
আরও একটি ছড় টানলে
ভায়োলিনে
বৃষ্টি নেমে এল
আর, আরও একটি ছড় টানলে
ভায়োলিনে
মাটি ফুল ফলে ভরে উঠল

এভাবে ছড় টানতে টানতে
তোমার ভায়োলিন
একসময় ডুকরে কেঁদে উঠল।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শূন্যতা

মেয়েটাকে যেই ছেড়েছি অ্যাকোরিয়াম জলে
সিঁটিয়ে গেলো, চমকে গেলো, উঠলো, কেঁপে ভয়ে,
অমন হিজল শরীরখানা ছোট্ট হতে হতে
ককিয়ে ওঠে, 'এমন জলে মানাই নাকি আমি ?'

তখন তাকে আবার তুলে দিলাম সমুদ্দুরে,
উঠলো তুফান, ঢেউএর কাঁপন মাতলো তাকে নিয়ে
তার সে শরীর কাঁপলো ফুলে, ছাপিয়ে গেলো জল—
বিশাল হতে হতে তাকে পেলো না কেউ খুঁজে।

রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়

চর

মধ্যিখানে চর সৃষ্টি হয়, দেখি
এতটা দেখাও কেন নদী, বড্ড বেশি না ?
ঝর্‌ঝর্‌ করে বালি ঝরে পড়ছে, মনে হয়
তুমি সমস্ত সময় ধরে শয্যায় শুয়ে।
পাগল-করা দৃষ্টি চোখ ঝল্‌সে দেয়, তবু মন ঠিক রেখে
চোখে চোখ রাখতে গিয়ে পুরনো স্মৃতি টুকরো হয়ে যায়
ছুটো সাপ বেদেনীর হাতে ঝুল্‌তে ঝুলতে চলে যায়
সব কিছু পড়ে থাকে—।
ছুঁতে গেলে দেখা যায় মধ্যে মধ্যে নুড়ি
ঝিনুকের, শামুকের অবশিষ্ট দেহ।

শ্যামলজিৎ সাহা

স্রোত

পর্দায় কাউকে নয়, অদ্যাবধি কাউকেই দেখি না দারুণ কাছাকাছি।
এইদিনে অসহায় ছুটে আসে নীলবাড়ি ঘিরে
সব ধাঁধা মোছাঁপোছা অসম্পূর্ণ চোখ।
বাজছে দুন্দুভি সব রকমের। আছি ওষ্ঠে গ্রীবায়, থাকি না পুচ্ছে।

গালিফ স্ট্রীটের রাস্তা। তিনদিকে সরু গলি ঢোকাফাটা সমস্ত রকম লালগাড়ি।।
ফাঁকা দূরদেশে কোথাও রোদের স্রোত নতুন মধ্যাহ্ন ঘিরে দূরতম
অন্ত্যমিলনে গভীর প্রত্যক্ষে আসে না মানুষ, না পাথর। সারাবেলা
এই পথে বিনা পরিচয়ে কেউ আসতে চাইলে অবাধ নির্দিশে কেন
ঘটে যায় কত সমর্পণ। নিয়ম ভাঙার সুপরিসরে আজ
সোমবার সুরু হক, সারা সপ্তাহের হিম আলো।
এই চোখে নানারঙ ঘোড়া উড্ডীনে দেখায় কত ছুটি ওড়াচ্ছে আকাশ-স্মরণীক।

এই মুখে আলাপ, প্রত্যহে এই কথা সকলেই মানে, মানি আমরাও।
তার মানে উপস্থে দু'জনে আছি আমি, তার ছায়া
অন্য কেউ কাছে আসতে চাইলে দেখে এসো রোজ অস্ত্রশস্ত্র।
মিলন কখনো টলমল নিবিড় মর্মকে রাখে না কী স্রোত।

সৈকত রক্ষিত

এ মানুষ আর সে মানুষ

এতো যখন মানুষ
দুটো নষ্ট হলেই কি ?
মরা মানুষ ঝরা মানুষ
গলা-পচা-কাটা মানুষ

এ মানুষ আর সে মানুষ
সবাই নাকি মানুষ ?

জলের মতো বইছে মানুষ
পাতার মতো উড়ছে
দুটো মানুষ নষ্ট হ'লে
কার কপালটা পুড়ছে ?

মানুষ বলে, মানুষ আয়
দু'জনেরই এক বিছানায়
সোহাগ আছে আদর আছে
তোর কী মানুষ চায় ?
—নদীর মতো লম্বা মানুষ
গাছের মতো শক্ত
এইটে যদি থাকতো।
ধুলোর মতো সস্তা মানুষ
পাথর বুকে রাখতো ?

মাটির মানুষ পাথর হ'য়েও
সইতে পারে নি
এতো যখন মানুষ
দুটো নষ্ট হ'লেই কি ?

পুলকেশী কতদূর যাওয়া হবে তোর

পুলকেশের অস্থির অদ্ভুত চোখে ভারতের মানচিত্র স্পষ্ট হলে তথায়
দীর্ঘ কয়েক হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত দুই সৈকত-খণ্ডের ছবি একদিন
আলোকিত হলে শপথ বাক্যের মত গভীর গম্ভীর কণ্ঠে সে স্বগতোক্তি করে,—
'আর কখনো আমি পাহাড়ে যাব না।'

অন্যদিন

পশ্চিম থেকে কিছুটা নীচু হয়ে দূর আর্যাবর্তের উত্তর ধরে পুবের দিকে চলে গেছে
ঢেউ ঢেউ যে উত্তুংগ পর্বত—তার কোন শৈলশহরে অবস্থানকালে
পুলকেশ একইরকম গভীর গম্ভীর কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে,—
'আর কখনো আমি সমুদ্রে যাব না।'

দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামে দোল খাচ্ছে অস্থিরতা নামে প্রচণ্ড অসুখ। তবু
কোনক্রমেই সে মূঢ় নয়। অন্তর-বাহির উভয় প্রদেশ জুড়ে
পাগল উত্তাল কালো মেঘ হননে যতই তৎপর হোক, বিষণ্ণতার অনুগত হতে
শেখে নি সে। শুধু অস্থিরতা নামে বিষম অসুখ। তাহলে, পুলকেশ,
কতদূর যাওয়া হবে তোর?

সত্যসাধন চেল

মুখ

তুমি তো এখনো আছো এই শীতে ঘুমের ভিতরে,
গান্ধার শিল্পের মতো প্রীতি ও বন্ধনে স্থির প্রেমে ,
তুমি না থাকলে সই কে জাগাবে শস্যহীন মাঠ,
কে বাজাবে শাঁখ. পুজোর আল্পনা এঁকে ধান-দূর্বায়-পল্লবে
কে সাজাবে প্রতিমা মন্দির,
কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিলে, দেখে নিও পরাণের মা
হোরতুকী ফুলের মতো, শান্ত ওই চৌরিপাতা মুখ,
জেগে উঠবে আবার আমাদের আশ্বিনের মাঠে।

ঊর্ধ্বেন্দু দাশ

শব্দব্রহ্ম

খেলার নিয়মে কিছু ভুলচুক—
ভুলের আড়ালে কোনো পাপ,
একদিন খেলাচ্ছলে সহসাই ভুল ভাঙে, ভেঙে যায় কাঁচ—
তখন দর্পণ জুড়ে প্রত্যয়ের ছন্নছায় তুলোট্ উড়াল ;
ভস্মের অতলে জলে ধূপের মতোন প্রিয়-স্মৃতির কুসুম,
বীজপত্র, প্রত্নশস্য, রতিমুদ্রা, বংশ লতিকা।
যশোধারা! এই ভুল নাভিমূলে তোমার ত্রিশূল,—
এই পাপ তোমার তূণীর।

এভাবেই প্রাতিস্বিক শব্দের মিছিল, একদিন
অতর্কিতে থেমে যায় : সমস্ত জগত যেন শব্দহীন এক ফ্রিজ্ শট্,—
ডায়ালে কাঁটার ফাঁকে নির্ভুল সময় ঘুরছে—শব্দ নেই ;
নিসর্গের হাত ধরে যথাবিধি ঋতু বিবর্তন—কোনো শব্দ নেই,
শরীরে হোমাগ্নি জ্বেলে বালিকা যুবতী হচ্ছে,—
প্রজাতির অমোঘ বিধানে
মানুষের জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, যুগান্তের উত্থান-পতন—
অথচ কোথাও শব্দ নেই।
খেলার নিয়মে তবু ভুল ভাঙে, যথারীতি সরে যায় কাঁচ—
বিষাদ-দর্পণে ওড়ে স্মৃতির বিবর্ণ ছাই, বীজশস্য, তমসুক, আহত কুসুম :
যশোধারা! ভস্মগর্ভে মেলে ধরো তৃতীয় নয়ন।

ঋবি ভট্টাচার্য

অন্তর্জলে খেলে

কখন কী ভাবে খেলে শব্দ বর্ণমালা
তুমি জানো, আনন্দপুরুষ ?

হাড়গোড় বের করা চোয়াড়ে বৃক্ষের মতো
নির্ঘুম যন্ত্রণা নিয়ে তুমি থাক হলুদ সভায়।

গন্ধ নেই বর্ণ নেই ফুল
এও এক অভিজ্ঞতা ফুলের সময়।
দেয়ালে দেয়ালে ছায়া ছায়ানৃত্য খড়ের কাঠামো
উঞ্ছবৃত্তি মানুষীর প্রেত
তোমার দুপুর ভোর কিশোরীর ফ্রক শাড়ি
কেটে যায় বর্ণচোরা ইঁদুর সময়।
কী দিয়ে জুড়াবে তুমি আমার দু'চোখ
স্বপ্নহীন নীল অন্ধকার

সংশয় অসুখ লজ্জা ছাড়া
আর কোন গল্প আছে, অন্য কোন, ভিখিরি মেয়ের ?

অন্তর্জলে খেলে অজান্তে মৌরলা মাছ
দোহাই ফেলো না জাল, চুপ।

দিব্য মুখোপাধ্যায়

আলাপ

ক্রমশঃই ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টে যাচ্ছে
আজ থেকে আবার শুরু হল ম্যানড্রেকের নতুন গল্প

ডাউন ট্রেনে চড়ে একদিন দেখে আসব
কেমন আছে বিশু আর বিশুর বৌ।

কেদার ভাদুড়ী

রাধা

তোমাকে বিষন্ন দেখি, দুর্মদ আগুনে পোড়ে মুখ
কি হলো কি, তুমি বলো, কি হলো যে, মেয়ে :
কোনোদিকে দৃষ্টি নেই, স্থিরবদ্ধ সত্য অভিজ্ঞানে
শূন্যে ওড়ে পুষ্পমেঘ, শিকড়ে মাখিয়ে

সহস্র মাটির কাব্যে কৃষ্ণকাম রসের অধীরে
রাধা নামে ব'সে আছো অযুত নিযুত বর্ষ যমুনার তীরে।

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

বাস্তু

যেখানে সবাই ছিল এখন সেখানে কেউ নেই
থাকার মহিমা আর নেই,
যা-কিছু এখন শুধু লতা ও গুল্মের অধিকারে।

আমার মায়ের বাড়ি পরিত্যক্ত অন্ধকারে
বন্দী হোয়ে আছে,
সারাদিন পোড়োভিটের আনাচে-কানাচে
ঘুঘু ডাকে, পাতা ঝরে, বিপর্যস্ত হাওয়া
বয়ে যায়,—
শালের জঙ্গলে চাঁদ ওঠে নির্জন একাকী সন্ধ্যায়।
পিছনে বনাঞ্চল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হোতে থাকে,
'চূর্ণি' মানে নদীর বিজনে জাগে মন্দিরের চূড়ো ;
ঈশ্বর থাকেন বড একা, সঙ্গীহীন।
তাঁর জন্যে আমার মায়ের প্রদীপ জ্বলে নাকো,
স্মৃতিতে জীর্ণ হয় রাত, রাতের মলিন।

কীরকম মায়া লাগে, সজল কষ্ট এসে অনুনয় করে,
সে ব্যথা অসীম মনোময়,
বাস্তুভিটের টান মায়ের স্নেহের চেয়ে বড় মনে হয়

দেবী রায়

কয়েকটি কবিতা

১. মাছ

এক গভীর জলাশ্রয়ী মাছ
আরো গভীরতরের সন্ধান
পেতে চেয়ে, পাঁকে
তার সর্বাঙ্গ ডোবাচ্ছে।

২. কথা

কথা, চল্‌তে থাকে
বিষয় থেকে
বিষয়ান্তরে যায় ;

কথা কেবলি
ঘূর্ণিজালে
পাক খেযে ঘোরে।

৩. অবহেলা

উনি নমস্য ব্যক্তি
ইনি ?
হুঁজি পেঁজি

হেলা-কে কোরো না-হেলা
আঙুল উঁচিয়ে শুধোয়, এক নগণ্য অবহেলা।

হরপ্রসাদ মিত্র

সবগম

রসিকগঞ্জে যেতে যেতে হাওয়াগাড়ির যাত্রী
শুরদুপুরে বোশেখ মাসে দেখ্‌তে একটি পাত্রী
—না, না, নিজেব জন্যে নয়।
মতিবাবুর ছেলের জন্যে—তাও কি বলতে হয়?

সেদিন সে কী গরম। এবং দেউলিয়ায় গিয়ে
গঞ্জের সেই দোকানগুলির একটিতে পৌছিয়ে
অশোকবাবু চায়ের সঙ্গে দিলেন কিছু খাদ্য
স্বাদ ছিল তার সরেশ।—এবং পথেই ছিল বাদ্য।
আহা, তা মোটেই নয় কানে শোনার
তা মোটে নয় শ্রব্য।

শুধু গোলাপ এবং যুঁই।
সংগীতসমুদ্রে কী যে সরগমে পৌছোই।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাবা দিনেব হাব

সারা দিনের হার বুকে চেপে বিছনা নিবিয়ে শুয়ে আছি।
ঘুম আসে না। চারধার দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে ঝুলকালির আঁচ।
এক বিন্দু পুঁতিব দানার মতো সুখকাঁটা গুমরে উঠল,
ভেতরকোটর থেকে উঠে এল ভ্রমরগুঞ্জন। ঘুম আসে না।

ডানা-খসা গুঞ্জনের খেদ—একটানা—
পাথরবিচির মতো বুক বুকে চেপে শুয়ে আছি।
নেবা বিছানার আঁচ—কেন এত জেগে আছো? কেন?
শালুক ফোসকা-দাগা চলপুকুরের কালো ঠোঁটে
ঢেউয়ের কনক পুঁতি ছিঁড়ে খসে যায়। ঘুম আসে না।

সাময়িকপত্র বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি]

১ পত্রিকার নাম : উত্তরস্মৃতি

২. ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

৩. প্রকাশ স্থান : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড,
কলিকাতা ৫০

৪. মুদ্রক : শ্রীরমেন রায়, প্রিণ্ট্‌স্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

৫ সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য
৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০

৬. প্রকাশক অরুণ ভট্টাচার্য, ৯বি ৮ কালিচরণ ঘোষ রোড,
কলিকাতা ৫০

৭. মালিকানা/অংশীদার অরুণ ভট্টাচার্য, ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড
কলিকাতা ৫০

আমার বিশ্বাস মতে উপরোক্ত সমস্ত তথ্য সত্য

স্বাঃ অরুণ ভট্টাচার্য

প্রকাশক

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রিণ্টস্মিথ ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রেসের ফোন : ৩৫-১০৮৭॥